রাহুল সাংকৃত্যায়ন

আমার জীবন-যাত্রা

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

সতীশ মিশ্র
সৈকত রক্ষিত

রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি

Amar Jiban-Yatra, Bengali Translation of
Rahul Sankrityayana's *Meri Jiban-Yatra*

প্রচ্ছদ
স্বপন রুদ্র

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ১৯৫৩

ফটোটাইপসেটিং
আই· ই· আর· ই
২০৯এ, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশনা
ভুবন ভট্টাচার্য
রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রাক্-কথন

জীবন-যাত্রার দ্বিতীয় খণ্ডটিও আমি প্রথম খণ্ডের সঙ্গেই (১৯৪৪ অক্টোবরে) লিখে দিয়েছিলাম, কিন্তু কয়েকটি কারণের জন্য তা এখন পাঠকের হাতে পৌঁছচ্ছে। এই খণ্ডটি লেখার ব্যাপারে শ্রীসত্যনারায়ণ দ্বিবেদীর কলমের সাহায্য পেয়েছি, তার জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

জীবন-যাত্রার এই খণ্ডের পরেও 'আমার জীবন-যাত্রা' এখন চলছেই এবং এখন তৃতীয় খণ্ডটি লেখা প্রয়োজন, কিন্তু তার জন্য আমাকে আমার ষাট বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার (৯ এপ্রিল ১৯৫৩) প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। এমনিতে আমার কলম বিশ্রাম নিচ্ছে না, কাজেই সে-কারণে পাঠকের কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না।

এই খণ্ডের শিরোনামগুলোতে অনেক জায়গায় ত্রুটি ঘটে গেছে, তাই পড়ার আগে পাঠক যদি তা বিষয়-সূচি অনুসারে সংশোধন করে নেন তাহলে ভাল হয়।

নৈনিতাল

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

মুখবন্ধ

'মেরী জীবন-যাত্রা'র প্রথম খণ্ডে রাহুল বলেছেন—বৈরাগ্যের, জ্ঞানলিপ্সার ও ভ্রমণ-তৃষ্ণার ভূত তাঁর ওপর সওয়ার হয়েছিল। এই তিনটি ভূতের তাড়নায় তাঁর বিরামহীন পরিক্রমা দেশে, বিদেশে। 'মেরী জীবন-যাত্রা'র দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯২৭ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তাঁর অভিযাত্রার কাহিনী বিবৃত। সংক্ষেপে বলা যায়—এই সময়ের মধ্যে তিনি শ্রীলংকায় গিয়েছিলেন তিনবার, তিব্বতে চারবার, নেপালে দুবার, সোভিয়েত দেশে দুবার, ইরানে দুবার। এ-ছাড়া ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও আফগানিস্তানে ভ্রমণ। আবার এই সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয়বার প্রায় সমগ্র ভারত পরিক্রমা। এই সতের বছর সতত সঞ্চরমান রাহুল সাংকৃত্যায়নের জীবনের বহুমুখী প্রয়াস—জীবন ও সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্বব্যাপী বিরামহীন অন্বেষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। অধ্যয়ন-অন্বেষণের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা আন্দোলন ও কৃষকের সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণ, কারাবাস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগান্তকারী প্রভাব, মার্কসবাদে উত্তরণ—এই সবই ঘটে গেছে এই সময়ের মধ্যে। এরই মধ্যে লিখেছেন বিস্তর, ভাষাকে গড়ে নিয়েছেন, ব্যক্তিগত জীবন, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কখনই উদ্দেশ্যবিহীন কোনো চর্যাতে নয়। সমগ্র মানবজাতির জন্য জ্ঞান, সৌন্দর্য ও ভালোবাসার অনিঃশেষ ঐশ্বর্যের সন্ধান তাঁকে ক্রমাগত অগ্রসর করেছে সেই পূর্ণতার প্রতি যেখানে মানবতার শত্রুদের হাত থেকে যন্ত্রণায় কাতর মানুষকে উদ্ধার করা যায়। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা যায় এক নতুনতর সভ্যতা, মানুষকে ঘিরে সেখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যের নিত্য উৎসব, আকাশে নক্ষত্ররাজির অনির্বাণ আলো।

সবকিছুকে অবশ্যই ছাপিয়ে যায় তাঁর চারবারের তিব্বতযাত্রা, যার ফসল তাঁকে বিশ্বের বিদ্বৎমণ্ডলীতে কালজয়ী প্রতিষ্ঠা দেয় বিশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ এই অভিধায়। অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ও বিলুপ্ত পুঁথি তিনি উদ্ধার করেন, ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক'সহ। শ্রীলংকার বিদ্যালংকার পরিবেনের ত্রিপিটকাচার্য রাহুল প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় নিজের জীবন বিপন্ন করে নেপাল থেকে দুর্গমতম পথে তিব্বতে পৌছন। সমগ্র তিব্বতে ছড়ানো অসংখ্য প্রাচীন বিহার থেকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে উদ্ধার করেন ভারতের 'হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ জগৎ'। একক প্রচেষ্টায় এই অসাধারণ কীর্তির দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত সম্ভবত নেই। শুধু দুঃসাহসিক নয়, খুবই শ্রমসাধ্য ছিল এই পুঁথি উদ্ধারের কাজ। রাহুল লিখছেন, তৃতীয়বার তিব্বত-ভ্রমণের সময়—'২৫ মে-র স্মরণীয় দিনটি এল। আমি 'ছগপে-লাখঙ'-এর গ্রন্থাগারের খাড়া, লম্বা ও ভয়ঙ্কর সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার সময়ে আমার বিশেষ আশা ছিল না যে এখানে কোনো সংস্কৃত পুস্তক থাকতে পারে। ওপরে উঠে ডানদিকের ঘরে ঢুকলাম।' ঘরের ভেতরে কত শতাব্দীর যে ধুলো জমে ছিল তা বলা শক্ত। ঘরে ঢুকতেই ধুলোয় ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। তিনি দেখলেন দেয়ালের তাকে কাপড়ে জড়ানো বা এমনিই বাঁধা কয়েক হাজার বই। তারই ভেতরে লুকিয়ে আছে

তালপাতার পুঁথি, সেখানেই রক্ষিত আছে বৌদ্ধশাস্ত্রের হারানো রত্নরাজি। এর পরে দীর্ঘকাল তিনি এই পুঁথি অধ্যয়ন করেছেন, সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। পুঁথিপত্র, অমূল্য চিত্রপট পাটনা মিউজিয়ামে দান করেছেন, আকাশ ছোঁয়া দামে বিক্রির প্রলোভন তুচ্ছ করে। যদিও আর্থিক বিচারে তাঁর তখন অতি দীন দশা। জীবনের এই পর্বে আর্যসমাজী রাহুল শুধু যে বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার ও অধ্যয়ন করলেন তা নয়, শ্রীলংকায় বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। বুদ্ধের একটি বাক্য—'আমি তোমাকে যে ধর্মোপদেশ দিয়েছি, তা নৌকোর মতো নদী পেরোবার জন্য, মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য নয়'—রাহুলকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি লেখেন—'যে জিনিসের জন্য আমি এতকাল ঘুরে বেড়িয়েছি, আমি তা পেয়ে গেছি।' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—'ঈশ্বর ও বুদ্ধের একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। এই সত্য স্পষ্ট হতে লাগল যে ঈশ্বর কাল্পনিক বস্তু। বুদ্ধের বক্তব্যই যথার্থ।' তিনি ঈশ্বরকে পুরোপুরি বর্জন করলেন, বুদ্ধকেই মেনে নিলেন। এই অনুভবকে বাস্তবে প্রয়োগ করবার তাগিদেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হলেন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ও কৃষকের সংগ্রামে, পরবর্তীকালে কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মীরূপে। মানুষের দুঃখমোচন ও বহুজনহিতের লক্ষ্যে বুদ্ধ ও পরবর্তীকালের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সাহস ও আত্মত্যাগ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বারবার তাই জ্ঞানের উচ্চশিখর থেকে তিনি বাস্তবের কঠিন ভূতলে নেমে এসেছেন, সরাসরি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। শুধু তাদের সংগ্রামে অংশীদার হওয়ার জন্যই নয়, আহরিত জ্ঞানভাণ্ডার তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেও। তিনি বৈষ্ণব ও আর্যসমাজী আস্তিক্য থেকে বৌদ্ধ নাস্তিকতায় চলে গিয়েছিলেন। এরপর বৌদ্ধ নাস্তিকতা থেকে মার্কসীয় জড়বাদী নাস্তিকতায় তাঁর উত্তরণ ঘটে। এই নাস্তিকতাকে গ্রহণ করে তিনি নিপীড়িত, দলিত মানুষের উদ্ধারের মধ্য দিয়ে, নিজেরই উজ্জ্বল উদ্ধারের পথ খুঁজেছিলেন, যদিও কম্যুনিস্ট পার্টির বন্ধনকে তিনি পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি।

নিছক পথচলার আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছেন রাহুল। আগেই বলা হয়েছে ভ্রমণ ও জ্ঞানলিপ্সা রাহুলের চরিত্রের দুটি মৌল প্রবৃত্তি। নিজেই লিখেছেন—'ভ্রমণের মতো পড়াশোনার রুচি আমার স্বভাবের মধ্যে ছিল। তাই যতক্ষণ তা (পড়াশোনা) উগ্ররূপ ধারণ না করেছে, ততক্ষণ ঘুরে বেড়ানো আমার কাছে অত্যন্ত জরুরি ছিলো।' রাহুল কথিত 'বৈরাগ্যের ভূতে'র চেয়েও শক্তিশালী আরো দুটি ভূত—পরিব্রাজন ও জ্ঞানতৃষ্ণা—তাঁর ওপর সওয়ার হয়েছিল সারাজীবন। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাই তাঁর যাযাবরবৃত্তির মূলাধার। তিনি জানতেন স্থবির মানুষের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জঙ্গম মানুষ নিত্য নতুন জ্ঞান আহরণ করে। প্রতিনিয়ত জীবনকে, জগতকে বিস্ময়ভরা চোখ মেলে দেখে। ক্রমে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের কৃত্রিম পার্থক্যের বোধ লোপ পেয়ে সেই মানুষ অখণ্ড মনুষ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

'মেরী জীবন-যাত্রা'র এই দ্বিতীয় খণ্ডে রাহুলের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর সমারোহ। বিবিধ ঘটনা ও কিছু অঘটন আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী মনে হলেও, আসলে তারা পরস্পর পরিপূরক, নিরবচ্ছিন্ন, হয়তো বা অনিবার্যও। এ-সবের মধ্যে

মুখবন্ধ

দিয়েই রাহুল নিজেকে পর্বে পর্বে উন্মোচিত করে চলেছেন। শুধু এই খণ্ডেই নয়, 'মেরী জীবন-যাত্রা'র প্রতি খণ্ডের প্রতিটি পৃষ্ঠাই এক সচেতন জীবন-শিল্পীর আত্মোন্মোচনের ভাষ্য, যেখানে তিনি নিজের সঙ্গে এই বিশ্বমণ্ডলের, প্রবহমান মানব সভ্যতার সংশ্লেষণ ঘটিয়েছেন। এই ভাষ্য তাই শুধু রাহুল সাংকৃত্যায়নের জীবন-চরিতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় নি, হয়ে উঠেছে এক নতুন মানব-ইতিহাস—আধুনিক মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির দিশারী।

এই দ্বিতীয় খণ্ডে রাহুলের জীবনের সতের বছরের শেষ দুটি বছরকে আমরা বর্জন করেছি, যা তৃতীয় খণ্ডের শুরুতে সংযোজিত হবে। রাহুলের অনুপম ভাষ্য বা বিবরণী কখনই ছদ্ম-পাণ্ডিত্যের ভারে ন্যুব্জ নয়। একান্তই সহজ, সরল, অলঙ্কারবর্জিত তাঁর রচনা, যা সাধারণ পাঠকের মর্মে প্রবেশ করে অনায়াসে। আমরা ভাষান্তরকরণের ক্ষেত্রে সর্বত্র লেখকের এই ধরনটিকে অনুসরণ করেছি, যাতে রচনারীতির সারল্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সাজানো শব্দ, অকারণ উপমা বা অভিজাত বাচনভঙ্গী আরোপ করে লেখকের সজীব ও খাঁটি ভাষাকে কখনোই ভারাক্রান্ত করে তোলার চেষ্টা করা হয় নি। হয়তো তার জন্য অনেক সময় যথার্থ প্রতিশব্দটি খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়েছে। তা সত্ত্বেও কখনোই ভাবানুবাদের আশ্রয় নেওয়া হয় নি। আব এইভাবে অনুবাদ ও সম্পাদনা করতে গিয়ে মূলগ্রন্থের অনেক জায়গায় আমরা নানা ধরনের ছোটোখাটো অসঙ্গতি ও মুদ্রণ-ত্রুটি লক্ষ করেছি। যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে সেইসব অসঙ্গতিকে সংশোধন করার। কিছু জায়গায় পাঠকের সুবিধার্থে বা প্রয়োজনের তাগিদে সম্পাদকমণ্ডলী (স·ম·) পাদটীকা দিয়েছেন। তবে মূল-পাঠে আগ্রহী পাঠক লক্ষ করবেন, একটি ছোট অনুচ্ছেদের মধ্যে লেখক পর পর বহু বিষয়ের উল্লেখ করছেন। অনেক সময় যার কোনো কালানুক্রমিক অনুপুঙ্খ বিস্তৃতি নেই। তার পরেই লেখক আবার তাঁর পরিচিত উচ্ছ্বাসহীন, ঈষৎ রঙ্গপূর্ণ ঢঙে ফিরে আসছেন। এতে লেখকের গদ্যের ধ্বনি বা ছন্দোময়তা বিঘ্নিত হয়েছে বলা যায় না। এই ধরনটি আসলে একজন খাঁটি ভবঘুরে মানুষের যথার্থ প্রকাশ। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। তাই এই জীবনযাত্রায় কখনো তিনি তাঁর কথা তড়িঘড়ি বলেছেন, কখনো বা ধীরে-সুস্থে, হেলে-দুলে। এই তো জীবনের ছন্দ। একই সঙ্গে শ্লথতা ও দ্রুতি, কটুতা ও মাধুর্য—কখনো মানুষের ক্ষুদ্রত্বের প্রতি বিদ্রূপ ও পরিহাস, আবার কখনো মুক্ত করতলে মানুষের কাছে প্রেম, মৈত্রী ও করুণা ভিক্ষা। আর এই সব কিছু নিয়েই যেন একটি জীবনের বহু জীবনের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া।

তুষারকান্তি তালুকদার
সভাপতি
রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ কমিটি

বিষয়-সূচি

পঞ্চম পর্ব

অনুসন্ধান, পর্যটন

লংকার উদ্দেশে যাত্রা, ১৯২৭	১
লংকাতে উনিশ মাস ১৯২৭-১৯২৮	৫
লংকা থেকে প্রস্থান	১৭
নেপালে অজ্ঞাতবাস	২৫
তিব্বতে সওয়া বছর	৩৮
লংকায় দ্বিতীয়বার, ১৯৩০	৯২
সত্যাগ্রহরে জন্য ভারতে, ১৯৩০-৩১	৯৭
লংকায় তৃতীয়বার, ১৯৩১-৩২	১০৮
ইউরোপ যাত্রা, ১৯৩২-৩৩	১১১
ইংল্যান্ড আর ইউরোপে	১১৯
ভারতের শীতে, ১৯৩৩	১৫২
দ্বিতীয় লাদাখ যাত্রা, ১৯৩৩	১৫৫
দ্বিতীয় তিব্বত যাত্রা, ১৯৩৪	২০০
শীতকালে, ভারতে	২৬০
জাপানে	২৬৯
কোরিয়ায়	২৯৬
মাঞ্চুরিয়ায়	৩০১
প্রথম সোভিয়েত দেশ দর্শন	৩০৭
ইরানে প্রথমবার	৩১৯
মৃত্যুর মুখোমুখি	৩৩০
তিব্বতে তৃতীয়বার, ১৯৩৬	৩৩৮
ইরানে দ্বিতীয়বার, ১৯৩৭	৩৮৭
সোভিয়েত দেশে দ্বিতীয়বার	৩৯৩
আফগানিস্তানে, ১৯৩৮	৪১৬
ভারতে, ১৯৩৮	৪২৪
তিব্বতে চতুর্থবার, ১৯৩৮	৪২৬

ষষ্ঠ পর্ব

কৃষক-মজদুরদের জন্যে

পরিস্থিতির অধ্যয়ন ৪৩৯
কৃষক সত্যাগ্রহ ১৯৩৯ ৪৪৪
আর এক নতুন জীবনের আরম্ভ, ১৯৩৯-৪০ ৪৭৭
জেলে উনত্রিশ মাস ৪৮৯

পঞ্চম পর্ব

অনুসন্ধান, পর্যটন

১৯২৭-১৯৩৮

লংকার উদ্দেশে যাত্রা, ১৯২৭

ধূপনাথ এখন আমাদের আরো কাছের হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আগ্রহ অনুসারে আমার সুলতানগঞ্জ হয়ে, যেখানে তিনি সেই সময় বনৈলীর রাজকুমারের খাজাঞ্চীর চাকরি করতেন, কলকাতা যাবার কথা ছিল। ধূপনাথ আর তাঁর ভাই দেবনারায়ণ সিংহ তহশীলদারও বড় স্নেহপরায়ণ এবং উদার মানুষ ছিলেন। এখন পর্যন্ত ঈশ্বরের ওপর থেকে আমার বিশ্বাস পুরোপুরি চলে যায়নি কিন্তু নাস্তিকতার কথা—বিশেষ করে সমাজের প্রতি বিদ্রোহের বিষয়ে—আমি খুব বলাবলি করতাম। বৃদ্ধ দেবনারায়ণবাবুকে আমি দেখতাম যে, তিনি এসব ব্যাপারে নিজের শিক্ষা এবং সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হলো, তিনি নিজের খুড়তুতো ভাই এবং সৎভাইদের গোটা পরিবারকে সংযুক্ত ও স্নেহবদ্ধ দেখতে চাইতেন। এবং এর জন্যে তিনি নিজের মনকে যথেষ্ট দাবিয়ে রাখতে সমর্থ ছিলেন। ধূপনাথ এখনও বৈরাগ্য আর বেদান্তের বেড়াজাল থেকে বেরোতে পারেননি, কিন্তু এক-এক করে আমার কাছে তাঁর হৃদয়ের সারল্য, উদারতা এবং বোধ আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এবার আমার আলখাল্লা খুলে পণ্ডিতের বেশে যাবার কথা ছিল, যার জন্য তিনি ভাগলপুরী চাদর আর এক-আধটা কাপড় এনে দিলেন। আমি যাতে তৃতীয় শ্রেণীতে চড়ে লংকা পৌঁছতে পারি, সেই টাকারও ব্যবস্থা করে দিলেন।

৮ মে ভোরবেলা আমি সুলতানগঞ্জ থেকে হাওড়ার গাড়ি ধরলাম। পথে বোলপুর স্টেশনে নামলাম। শান্তিনিকেতন দেখার ভীষণ ইচ্ছে ছিল, আর ভারতবর্ষ থেকে বাইরে যাবার আগে তাকে দেখে নিতে চাইছিলাম। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত ঐ সময় ওখানে না ছিলেন কবিবর রবীন্দ্র, না ছিলেন অন্য কোনো বিশিষ্ট শিক্ষক। মে মাসটা শান্তিনিকেতনেরও শান্তি ভঙ্গ করে দেয় এবং সমর্থ লোকেরা পাহাড়ের ওপরে পালিয়ে যাবার জন্যে উতলা হয়ে ওঠে।

কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটিতে (৯—১১ মে) থাকলাম। সম্ভবত অনাগরিক ধর্মপাল সে-সময় ইউরোপ গিয়েছিলেন। বুদ্ধগয়া কমিটির সূত্রে ব্রহ্মচারী দেবপ্রিয়র সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি আমার লংকা যাবার সিদ্ধান্ত বেশ পছন্দ করেছিলেন। ভিক্ষু শ্রীনিবাস আমার সম্বন্ধে ভিক্ষু নারাবিল ধর্মরত্নকে লিখে দিয়েছিলেন। তিনি বিদ্যালঙ্কারের ছাত্র ছিলেন আর ভারতের প্রচারক হওয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত

করছিলেন। তাঁর কাছেও তাঁর বিহারের তরফ থেকে কোনো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে পাঠাতে খুব অনুরোধ করা হয়েছিল। নারাবিলজী আমাকে বেতনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, 'আমার বেতনের দরকার নেই। খাওয়া, পরা আর বইপত্র পাওয়া দরকার আর সবচাইতে জরুরি হলো পালি পড়ার ভালো ব্যবস্থা যেন থাকে।' এই ব্যাপারে তিনি আমাকে পুরোপুরি আশ্বস্ত করলেন। তক্ষুণি তিনি বিদ্যালঙ্কারকে টেলিগ্রাম করে দিলেন আর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে রাহা খরচের জন্য একশো টাকা এসে পড়ল।

সাদা ধুতি, পাঞ্জাবী আর চাদরের বিনীত পোশাকে কিছু বইপত্তর নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে মাদ্রাজ মেলের ইন্টার ক্লাসে চড়ে বসলাম। খড়্গপুরের পর থেকে এই পথেই দুবার রেলযাত্রা করেছি, তাই বাইরের দৃশ্যে কোনো নতুনত্ব আমার চোখে ধরা পড়ল না। রাস্তার মাত্র একটি ঘটনা মনে আছে। আমি খাবার জন্যে রেস্তোঁরা-কারে (ভোজন-গাড়ি) খাবার খেতে গিয়েছিলাম। খানসামা খাবার দাবারের সঙ্গে ছুরিকাঁটা রাখল। আমি তো এসব কখনও ব্যবহার করিনি, কাছ থেকেও কাউকে ব্যবহার করতে দেখিনি। ফলে ওগুলো খাওয়ার সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধক হতে লাগল। খানসামার আর সহ্য হচ্ছিল না। সে বলে উঠল, 'রেখে দিন ছুরি কাঁটা, হাত দিয়েই খান।' আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম।

ইচ্ছে ছিল মাদ্রাজে (১৪ মে) আনন্দভবন হোটেলে উঠব কিন্তু রিক্‌শাওয়ালা অন্য একটা হিন্দুস্থানী হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলল। ধনুষ্কোটিগামী মেল ট্রেন বারো ঘণ্টা পরে রাতের বেলায় ছাড়ার কথা ছিল। তাই আমি শহরের পরিচিত জায়গাগুলোতে ঘোরাফেরা করে পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চাইলাম।

নারাবিলজী বলে দিয়েছিলেন যে, মাদ্রাজ থেকে কলম্বোর টিকিট যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর কাটি। নাহলে মণ্ডপম্ (রামেশ্বরম্)-এ 'কোয়ারানটাইনে' পুরো একটি সপ্তাহ পড়ে থাকতে হবে। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট নিয়ে মেল গাড়িতে চড়লাম। তখন সেই সময়ের (১৯১৩) সেই ঘটনার কথা মনে পড়ছিল যখন আমাকে বাঢ় এর উকিলসাহেবের সঙ্গে জোর-জবরদস্তি করে এই মেলে তুলে দেওয়া হয়েছিল, যদিও সম্বল ছিল শুধুমাত্র সয়দাপেট পর্যন্ত টিকিট। আর নামিয়ে দেওয়ার পর মনে ভারী আরাম হয়েছিল। পরসাতে থাকার সময় আমি বরাবর দ্বিতীয় শ্রেণীতেই যাতায়াত করতাম, তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা আমার কাছে নতুন জিনিস ছিল না। তবু ওর কমোডের ব্যবহার এখনো আমি জানতাম না।

মণ্ডপম্-এ সিলোন সরকারের কর্মচারীরা এসে টিকিট দেখল, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করল। ডাক্তার এসে নাড়ি টিপে ধরল। ধনুষ্কোটি থেকে স্টিমারে চড়লাম। চোদ্দ বছর আগে ধনুষ্কোটি দেখেছিলাম। লংকা ফেরত কিছু পাঞ্জাবী শিখ আমার সামনেই কানপুরের এক শ্রেষ্ঠী পত্নীকে পোখরাজ এবং আরো দু-এক ধরনের রত্নখণ্ড দেখিয়েছিল। সেই সময় লংকাকে এক অদ্ভুত ধরনের দ্বীপ মনে হয়েছিল। আজ আমি তার কাছাকাছি ছিলাম, এবার আর তাকে ততটা অদ্ভুত লাগছিল না। তাহলেও আমার মনে এক ধরনের ঔৎসুক্য ছিল। জাহাজে চড়লে সমুদ্রপীড়া, গা গোলানো আর বমির কথা আমি শুনেছিলাম, তাই মাদ্রাজ থেকে বেশ কিছু কাগজী লেবু নিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু আধঘণ্টা চলার পরেও

যখন সেই চিত্তাকর্ষক এবং ভীতিপ্রদ অনুভূতিটি আমার হলো না, তখন দু-তিনটে বোতল লেমোনেড এমনিই খেতে থাকলাম। সমুদ্রযাত্রাটি ছিল মাত্র দু-ঘণ্টার, তার মধ্যে আবার কোনোদিকেই কিনারা দেখা যাচ্ছে না—এরকমটা মিনিট কয়েক ছিল।

১৫ মে যখন আমাদের স্টীমার গিয়ে তলেমন্নার বন্দরে পৌঁছল তখন আঁধার নেমে এসেছিল। আমি স্টীমারে থাকতেই কিছু ভারতীয় টাকাকে সিংহলীয় নোট আর রেজগিতে বদলে নিয়েছিলাম কিন্তু এখনও তাদের বিনিময়-মূল্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। স্টীমারের কাছেই কলম্বোর ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। অফিসাররা তদারকী করছিল। আমি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে চড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। শ্রীনারাবিল ধর্মরত্ন আর ভিক্ষু শ্রীনিবাস-এর কাছে লংকার প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং তার জলবায়ু সম্বন্ধে অনেক শুনেছিলাম। সেসব দেখার জন্য বড় লালায়িত ছিলাম, কিন্তু ঐ রাত্তিরবেলা দেখার সুবিধে ছিল কোথায়?

সকাল হতেই আমি উঠে বসলাম। বাইরে সারিবদ্ধ নারকেল গাছের ছিমছাম বাগান একের পর এক চলে আসছিল। মাঝে মাঝে খড় বা বিলিতি খাপরায় ছাওয়া বাড়ি ছিল। বাড়িগুলোর সামনেটা তখনও ফুল, পাতা আর কাগজের লণ্ঠন দিয়ে সাজানো ছিল। লোকেরা বলল, বৈশাখী পূর্ণিমার জন্য এই সাজানো। ভগবান বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি আর নির্বাণের দিন হওয়ায় এটি বৌদ্ধদের কাছে পরম পূণ্য দিবস। এতদিন ধরে শুনে আসা বুদ্ধের নামের প্রতি এখন এক বিচিত্র ধরনের আকর্ষণ, এক অদ্ভুত মাধুর্য, এক বিশেষ আত্মীয়তা অনুভব করছিলাম।

১৬ মে নারাবিলজী বলে দিয়েছিলেন যে মরদানা স্টেশনে নেমে আবার উল্টোদিকে এক স্টেশন পিছিয়ে গিয়ে কেলনিয়া আসতে হবে। তিনি আমার রওনা হবার খবর দিয়ে তারও করে দিয়েছিলেন এবং কোনো একটি লোক মরদানা গিয়েও ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। আরেকটা ট্রেনে করে কেলনিয়াতে নেমে আমি বিদ্যালংকার বিহারের সম্বন্ধে খোঁজ নিলাম এবং অল্প আয়াসেই পাকা সড়ক ধরে সেই রাস্তার দিকে এগোলাম যেটা বিহারের ভেতর গেছে।

চারদিকে সবুজ-সবুজ নারিকেল এবং অন্য গাছপালা, আর জলভর্তি খেতগুলোর বিদ্যালয়কে দ্বীপে পরিণত করার এই দৃশ্যটি অনির্বচনীয় এবং চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

আমি ধুতি চাদরে উত্তর ভারতীয় বেশে ছিলাম। সেটা তামিল পোশাক থেকে ভিন্ন হওয়ার কারণে বিহারের সন্ন্যাসীদের এটা বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ইনিই 'দম্বদিউ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতুমা' (জম্বুদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতজী)। যতক্ষণে আমি ডানদিকে একটা দোতলা বাড়ি আর বাঁদিকে 'ধর্মশালা' (ব্যাখ্যানশালা) এবং ঘণ্টা-মিনার পার হয়ে পশ্চিমের বাংলোতে পৌঁছলাম, ততক্ষণে আমার আসার খবর বিহারের প্রধান লুনুপোকুনী শ্রীধর্মানন্দ নায়ক-মহাস্থবিরের কাছে পৌঁছে গেছে, আর সেখানে অনেক শিক্ষক এবং বিদ্যার্থী ভিক্ষুও জমা হয়েছে। আমার বসার জন্যে একটি চেয়ারের পকেট সংস্করণের মতো ছোট মাচুলি রাখা ছিল।

আমি মহাস্থবিরকে বিনম্রভাবে প্রণাম করলাম। তিনি সংস্কৃত ভাষায় পথের কুশল সংবাদ জানতে চাইলেন। প্রথম দর্শনেই মহাস্থবিরের ঠোঁটে পরিসীমিত হাসি, চোখে

স্নেহের দ্যুতি আর মধুর ভাষণ আমার মন থেকে নতুন জায়গায় আসার অস্বস্তি দূর করে দিল। তখনও পর্যন্ত আমার না হয়েছিল মুখ ধোয়া, না জলখাবার খাওয়া, তাই প্রথমে সেজন্যে আমাকে ছুটি দেওয়া হলো। উত্তর দিকের সার দেওয়া ঘরের মধ্যে একটা মস্ত খোলামেলা পশ্চিমের ঘর আগে থেকেই আমার জন্যে গুছিয়ে রাখা ছিল। সেখানে ঝাড়ামোছা করা পালিশওলা টেবিল, একাধিক চেয়ার, একটা আলমারী এবং নতুন সাদা ছোট্ট মশারিসহ পালঙ্ক ছিল। খাওয়ার জন্যে আমি পাউরুটি মাখন দুধ আর চিনির কথা বললাম, আর বলে দিলাম যে আমি নিরামিষ আহারই পছন্দ করি—এসময় আমি মাংসাহারের পক্ষপাতী হয়ে উঠতে পারিনি।

এখানকার অধ্যাপকদের, ছাত্রদের আর তাদের থাকার জায়গাগুলো দেখে যখন আমি তাদের সঙ্গে ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের তুলনা করতাম, তখন আকাশ পাতাল ফারাক মনে হতো। এদের অঙ্গভঙ্গী অনেক সংযত ছিল, ব্যবহার খুব মার্জিত, জামাকাপড় খুবই পরিচ্ছন্ন, ঘর এবং ঘরের জিনিসপত্র তকতকে করে ঠিক-ঠিকভাবে রাখাছিল। আমার ঘরের জিনিস দেখে তো আমার মনে হলো যে, পরদেশ থেকে আসা শিক্ষকের আরামের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়াই উচিত। কিন্তু পরে যখন অন্যান্য ভিক্ষু বিদ্যার্থীদের ঘরও দেখলাম, সেখানেও সেই পরিচ্ছন্নতা, সেই চকচকে বার্নিশ করা কালো টেবিল আর চেয়ার ছিল, টেবিলের ওপর ঝালরওলা সুন্দর টেবিলল্যাম্প, পালঙ্কের ওপর সাদা মশারী টাঙানো ছিল আর ছিল সাদা চাদর, ওয়াড়ে ঢাকা বিছানা বালিশ। তখন প্রথম প্রথম আমি এতে একটা শৌখিনতার গন্ধ পেতাম কিন্তু অল্পদিন পরেই বুঝলাম যে শৌখিনতার ধারণাটা আসলে আপেক্ষিক। যেটাকে এক জায়গার শৌখিনতা ধরা হয়, সেটাই অন্য জায়গায় জীবনের সাধারণ আবশ্যকতা হতে পারে। লংকার সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান আমাদের এখানকার চেয়ে উন্নত হওয়ায় ওখানে ওগুলোকে শৌখিনতা বলা চলে না।

বিদ্যালঙ্কার পরিবেণ (বিহার)-তে কয়েক ঘণ্টা থাকার পরেই আমি বুঝতে পারলাম এখানেও আমার আন্তরিকতার অভাব ঘটবে না। এবার ভবিষ্যতের কর্মসূচি তৈরি করার দরকার ছিল—বিদ্যার্থী কি পড়তে ইচ্ছুক আর আমার পালি পড়ার কাজ কিভাবে চলবে। বিদ্যালঙ্কার ভিক্ষুদের বিদ্যালয়, এখানকার অধ্যাপকরাও সবাই ভিক্ষু। শুধু কিছু সংস্কৃত আর আয়ুর্বেদের ছাত্র বাদে, যারা দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টা পড়ে বাড়ি চলে যেত। আঠারো কুড়িজন ছাত্র আর তিন-চার জন অধ্যাপক কাব্য, ব্যাকরণ এবং ন্যায় পড়তে চাইছিলেন। সংস্কৃত আর পালি মিলিয়ে-মিশিয়ে আমার আর ভাষাজনিত কোনো অসুবিধে রইল না, পড়াবার মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃতকে ব্যবহার করতে লাগলাম। সংস্কৃত আর পালির ওপর নির্ভর করে থাকার একটি ফল হলো এই যে, লংকার ভাষা সিংহলী হিন্দির খুব কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও আমি সেটা শিখে উঠতে পারলাম না।

বিহারের শুরু থেকে ওপরের দিকের প্রায় সবশ্রেণীর ছাত্র এবং সমস্ত অধ্যাপক সংস্কৃত পড়তেন। ওখানকার সংস্কৃত শেখার পদ্ধতিও উত্তর ভারতের পণ্ডিতদের মতো পুরনো ছিল। শুরু থেকেই ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করানোর অভ্যেস বাদ দিয়ে আমি এমন একটা পদ্ধতিতে পড়ানো স্থির করলাম, যাতে অল্প পরিশ্রম আর সময়ের মধ্যেই ছাত্রের নিজের

সাফল্য সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। তাই পড়াবার জন্যে আমি পাঁচটা বই তৈরি করলাম, যার মধ্যে চারটে বই ভাষা আর ব্যাকরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং পঞ্চমটি ছিল ছন্দ-অলংকারের সম্মিলিত বিষয়ক। প্রথম তিনটে বই কয়েক বছর আগেই সিংহলী হরফে সিংহলী ভাষায় ছাপা হয়েও বেরিয়েছিল। ব্যাকরণের পড়ুয়াদের জন্যে আমি লঘু এবং সিদ্ধান্ত কৌমুদীর চেয়ে ভাষাবৃত্তি আর কাশিকাকে প্রাধান্য দিলাম।

লংকাতে প্রথম বারের ১৮ মাসের নিবাস গুরুত্বপূর্ণ পঠন-পাঠনের জীবন ছিল। সারা দিনরাতের আট-নয় ঘণ্টা যেত খাওয়া-শোয়া-ঘোরাঘুরিতে, বাকি সময়ের মধ্যে পাঁচ ঘণ্টা পড়ানো আর আট-নয় ঘণ্টা নিজের পড়ার জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। ভোর হতেই ঘুম থেকে উঠে পড়তাম। শৌচাদি, হাতমুখ ধোয়া সেরে কুয়োতলায় স্নান করে নিতাম। ঘরের দরজা ভেজিয়ে কয়েক মিনিট শীর্ষাসন করতাম। ততক্ষণে পাউরুটি মাখন দুধ চিনি আর নারকেল-সজনের টক ঝোল এসে পড়ত। আমি বেশ কিছুদিন ধরে তৃপ্তির সঙ্গে ঐ ঝোলটা খাচ্ছিলাম। ঐ ঝোলের একটু তলানি পড়ে থাকতো, যেটা দেখতে মোটা করে বাঁটা হলুদের মতো। কিন্তু খেতে সুস্বাদু। হপ্তাকয়েক বাদে একদিন আমি জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওটা হলুদ নয়, সমুদ্রের শুকনো চিমড়ে মাছের (উম্মলকড) গুঁড়ো। ওখানে ওটা মশলা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নিরামিষ আহারে বিশ্বাস আমার আগে থেকেই টলে গিয়েছিল। ছোটোবেলায় যখন আমার প্রিয় ব্যঞ্জন মাছ খেতাম, আমার পরম বৈষ্ণব কণ্ঠীধারী দাদু-দিদা কখনো তার যোগান দিতে দ্বিধা করেননি। এখন হপ্তা দুয়েকের ওপর উম্মলকড়ের টুকরো উদরস্থ করার পরে তার থেকে আবার নিজেকে বঞ্চিত করা আস্ত বোকামি বলে মনে করলাম।

লংকাতে উনিশ মাস

১৬ মে ১৯২৭ — ১ ডিসেম্বর ১৯২৮

লংকাতে ভিক্ষুদের দুটি প্রধান কেন্দ্রের মধ্যে বিদ্যালঙ্কার বিহার একটি। ছাত্র এবং অধ্যাপকের সংখ্যার দিক দিয়ে কলম্বোর বিদ্যোদয় বিহার বড় ছিল কিন্তু তার মূল কারণ ছিল কলম্বো শহরে বিহারটির অবস্থান। বিদ্যালঙ্কারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীধর্মালোক মহাস্থবির এবং বিদ্যোদয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসুমঙ্গল মহাস্থবির গুরুভাই ছিলেন। গভীরভাবে পালি-ত্রিপিটক অধ্যয়নের জন্যে একই সময় এই দুটি বিহার স্থাপিত হয়। বিদ্যোদয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুমঙ্গল মহাস্থবির তাঁর সময়ের একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ধর্মালোক মহাস্থবিরের শিষ্য শ্রীধর্মারাম মহাস্থবির লংকার সমসাময়িক পালি-সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শ্রীধর্মারামের শিষ্য, শ্রীধর্মানন্দ মহাস্থবির, যিনি বর্তমানে বিদ্যালঙ্কারের প্রধান, তিনি পালি ব্যাকরণের পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন।

বিদ্যালঙ্কার বিদ্যালয়ে ঐ সময় প্রায় দেড়শো বিদ্যার্থী (বিদ্যোদয়ে পাঁচশোর কাছাকাছি) পড়ত, যার মধ্যে জনা চল্লিশেক ওখানেই থাকত, বাকি আশেপাশের ছোটো ছোটো মঠে (বিহারে) থাকতো আর পড়ার জন্যে দুপুরের পর বিহারে চলে আসতো। ভিক্ষুদের পড়ার গতিটা বড়ই ধীর ছিল। তাঁরা ভাবেন এত তাড়াহুড়ো কিসের, সারাটা জীবন তো পড়ার জন্যেই আছে। এর জন্যে আমার নিশ্চয়ই আফশোশ হচ্ছিল, যে ওরা আমার সময়কে পুরো কাজে লাগাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও আমার নিজের পড়াশুনো মাস পেরতে পেরতে বড় দ্রুতগতিতে এগোতে লাগল। আমি প্রথমে সুত্তপিটকের গ্রন্থগুলো দিয়ে আরম্ভ করলাম। সংস্কৃতের খুব কাছাকাছি বলে পালি আমার কাছে সোজা ছিল আর ভারতে থাকতে আমি নিজে নিজে ওটা পড়তেও শুরু করে দিয়েছিলাম। পড়ার জন্যে আমি নিজের বইগুলো কাজে লাগাতাম। আর ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর ওপর চিহ্ন দিয়ে রেখে পরে সেগুলো নোটবুকে টুকে ফেলতাম। নায়ক মহাস্থবির, আচার্য প্রজ্ঞাসার, আচার্য দেবানন্দ, আচার্য প্রজ্ঞালোক প্রত্যেকের কাছ থেকে দেড়-দু ঘণ্টা করে নিতাম তবু আমার পড়ার তৃপ্তি হতো না। পালিত্রিপিটকে বুদ্ধকালীন ভারতের সমাজ, রাজনীতি আর ভূগোলের সুপ্রচুর উপকরণ আছে। সেগুলো আমার ইতিহাস সম্পর্কিত খিদেকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। পালিটেক্সট সোসাইটি (লণ্ডন)-এর ত্রিপিটক সংস্করণগুলোর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা আগুনে ঘি দেওয়ার কাজ করল আর পালিটেক্সট সোসাইটি জার্নালের পুরনো সংখ্যাগুলো আমি পড়ে ফেলতে বাধ্য হলাম। তারপব ব্রিটেনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি আর সীলোন, বঙ্গ এবং বোম্বাইতে তার শাখাগুলোর পুরনো জার্নালগুলো গুছিয়ে পড়তে শুরু করলাম। হাজারীবাগ জেলে থাকতে আমার ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আর এখনো তো এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকার সব কটা খণ্ড পড়ে শেষ করলাম। ছ-সাত মাস যেতে যেতে ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান—গুণ ও পরিমাণ দুটোতেই এত বেড়ে গেল যে, যখন মারবুর্গ (জার্মানি)-এর প্রফেসার রুডাল্ফ অটো বিদ্যালঙ্কার বিহারে এলেন, তখন আমার সঙ্গে আলোচনা করে তিনি অবাক হলেন যে আমি কোনোদিন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম না। বস্তুত, এই সমস্ত যোগ্যতার কৃতিত্ব এই ক-মাসের পড়াশোনাকে দেওয়া যায় না। আগের থেকেই আমার খানিকটা এলোমেলো ভাবে অল্পবিস্তর পড়ে ফেলবাব অভ্যাস ছিল। ডি· এ· বি·কলেজে পণ্ডিত ভগবদ্দত্তর সম্পর্কে গবেষণা-পত্রিকাগুলোর দিকে কিছুটা দৃষ্টি নিশ্চয় গিয়েছিল কিন্তু পূর্বসূরীদের জ্ঞান কাজে লাগাবার মহত্ত্ব এখানেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম। যখন-তখন পড়া সংস্কৃত দর্শন এবং কাব্যগ্রন্থ, ইতস্তত ঘুরতে-ফিবতে চোখে দেখা ভৌগোলিক তথা স্থানীয় ভাষাগুলোব বৈশিষ্ট্য—এই সমস্ত ধরনের জ্ঞান আমার মস্তিষ্ক আর স্মৃতির গভীরে নাড়াচাড়া দিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দিতে সমর্থ হয়েছিল।

আড়াই হাজার বছব আগের সমাজ আর সেই সময়ে বুদ্ধের যুক্তিপূর্ণ সরল এবং তীক্ষ্ণ বাক্যের স্বাদ আমি তন্ময়ভাবে গ্রহণ করতে লাগলাম। ত্রিপিটকে বর্ণিত শ্লেষ এবং অলৌকিকত্ব তাদের অসম্ভাব্যতার দরুন আমার তাচ্ছিল্যের বস্তু ছিল না। বরং উপভোগের জিনিস ছিল। আমি বুঝতাম, পঁচিশ-শ বছরের প্রভাব ঐ সব বইয়ের ওপর পড়বে না তা

হতে পারে না। অসম্ভব বাক্যগুলোর মধ্যে বুদ্ধ সত্যিই কতকগুলো বলেছেন, তা আর আজ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু ছাই ঢাকা অঙ্গার বা পাথরে ঢাকা রত্নের মতো মাঝে মাঝে এসে পড়া বুদ্ধের মনোরম বাক্য আমার মনকে সবলে নিজের দিকে টেনে নিত। যখন আমি কালামদের দেওয়া বুদ্ধের উপদেশ—যে কোনো গ্রন্থ, পরম্পরা বা প্রবীণ ব্যক্তির কথা স্মরণ করে কদাপি কোনো কথা মান্য করবে না, সর্বদা আগে নিজে যাচাই করে নিয়ে তবে তা অনুসরণ করবে—পড়লাম তখন হঠাৎ মন বলে উঠল—এই হচ্ছেন একজন মানুষ, সত্যের ওপরে যাঁর অটল বিশ্বাস, যিনি মানুষের স্বতন্ত্র বুদ্ধির মহত্ত্ব যে কি তা বোঝেন। যখন আমি 'মজ্‌ঝিম-নিকায়'তে পড়লাম—তোমাকে আমি যে ধর্মোপদেশ দিলাম তা ভেলার মতো। এতে করে তুমি পারে পৌঁছবে বলে, মাথায় করে বয়ে বয়ে বেড়াবার জন্যে নয়, তখন মনে হলো এতদিন ধরে যে জিনিসের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তা পেয়ে গেছি।

শুরুর দিনগুলোতে একদিকে আমার মনের এই দশা ছিল, তার ওপর অন্যদিকে পড়াবার সময়ে ছাত্রদের ঈশ্বর শব্দের অর্থ বোঝাতে বেশ মুশকিলে পড়ে যেতে লাগলাম। এই সময় আমার আর্যসমাজী এবং জন্মগত সমস্ত চিন্তা লোপ পাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত, এই সৃষ্টির একজন কর্তাও যে আছেন—এইটুকু মাত্র বিশ্বাস রইল। আমি ভাবতাম, ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা মানুষের স্বাভাবিক। আবার আমি এখানকার বুদ্ধিমান ছাত্রদেরও দেখলাম, তাদের এ-বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না। প্রকৃতির বিকাশ, তার দৈনন্দিন ঘটনাগুলোর জন্যে আমি যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্বের আবশ্যকতা অনুভব করতাম, এরা সেগুলোকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে নিস্তার পেয়ে যেত। বৌদ্ধধর্ম হলো নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী—একথা আমি নানা সংস্কৃত বইতে পড়েছিলাম, কিন্তু সেখানে সেগুলো ঘৃণা প্রদর্শনের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আমার হৃদয়ে সে রকম কোনো প্রভাব পড়া তার অনেক আগে থেকেই অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল না যে, আমাকে ঈশ্বর অথবা বুদ্ধ যে কোনো একজনকে বেছে নেবার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। প্রথম প্রথম আমার চেষ্টা ছিল ঈশ্বর আর বুদ্ধ দুজনকেই একসঙ্গে নিয়ে চলার, কিন্তু তাতে পদে পদে আপত্তি উঠতে লাগল। দু-তিন মাসের ভেতরেই আমি বুঝে ফেললাম যে, এ প্রচেষ্টা বেকার। বিকেলের দিকে ঘণ্টাখানেক আমি কেলনিয়া থেকে তলেমন্নারগামী ট্রেনের রেললাইনের ওপর বেড়াতাম। আমি একা বেড়ানোই পছন্দ করতাম এবং প্রায়ই একা থাকতাম। সেই সময়ে আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব এত জোরালো হতো যে, মাঝে মাঝে আমার ভয় করতো—কখনো সামনে বা পেছন থেকে আসা ট্রেন খেয়াল করতে না ভুলে যাই! কি ভাগ্যি যে দুজোড়া লাইন ছিল তার যেদিক থেকে ট্রেন আসার কথা সেদিকে মুখ করে বেড়াতাম। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ঈশ্বর আর বুদ্ধ একসঙ্গে থাকতে পারবেন না এবং এটাও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে, ঈশ্বর স্রেফ কাল্পনিক বস্তু, বুদ্ধ যথার্থ বক্তা। তখন কয়েক হপ্তা ধরে মনে আরেক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হলো। মনে হতে লাগল, চিরকাল ধরে চলে আসা একটি বড় অবলম্বন লুপ্ত হতে চলেছে। কিন্তু আমি সর্বদা বুদ্ধিকে আমার পথপ্রদর্শক করেছিলাম, তাই কিছুদিন পার হতেই ঐসব কাল্পনিক

ভ্রান্তি এবং ভীতি মনে পড়লে নিজের সারল্যের জন্যে হাসি পেত। যখন ৫ জানুয়ারি (১৯২৮) ব্রহ্মচারী বিশ্বনাথ এলেন, তখন দেখি তিনিও একই মানসিক অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যেখানে ওই পুরো সংঘর্ষটার ধকল একা আমার ওপর দিয়েই গিয়েছিল, সেখানে তাঁর বেলায় আমার অভিজ্ঞতা কাজে লাগল আর তিনি খুব অল্পদিনের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হয়ে গেলেন। এখন আমি ডারউইন-এর বিবর্তনবাদের সত্যতা বুঝতে পারছিলাম। এইবার মার্কসবাদের সত্যতা মন এবং মস্তিষ্কের কাছে অবধারিত বলে মনে হতে লাগল।

বিদ্যালঙ্কার বিহার কাণ্ডী যাবার সড়কের ওপর অবস্থিত, কলম্বো শহর থেকে দূরে। শহর থেকে দূরে থাকাকে আমি নিজের ক্ষতির বদলে লাভজনক বলে মনে করতাম। তবে প্রায় প্রতি রবিবারে আমি কলম্বো যেতাম। তার কারণ সিংহল শাখার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে পড়তে যাওয়া আর পরে কলম্বোর পরিচিত ভারতীযদেব সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার ইচ্ছে ছিল। অবশ্য পরে গ্রন্থাগারে যাওয়াটা অনাবশ্যক হয়ে গেল যখন শ্রী ডি· বি· জয়তিলকের কৃপায় ওখানকার বই আমার বিদ্যালয়ে পৌঁছে যেতে লাগল। শ্রী (পরে স্যার) ডি· বি· জযতিলক বিদ্যালঙ্কার-এর অধিপতি শ্রীধর্মাবাম-এব শিষ্য ছিলেন তাই বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর গভীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঐ সময়ে তিনি লংকাব বৌদ্ধদেব সর্বমান্য নেতা, তথা সরকাব দ্বারা পুষ্ট সিংহল-কোষ-এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। নব সংস্কারের পরে প্রধানমন্ত্রী হয়ে গত দশ-এগারো বছবে তিনি যেখানে পৌঁছেছেন তখন অবশ্য রাজনীতিতে সেই অব্দি পৌঁছননি। কলম্বোতে গোড়াব দিকেই সম্ভবত, পণ্ডিত জগতরামের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। লংকাবাসীরা উত্তব ভারতকে জম্বুদ্বীপ আব দক্ষিণ ভারতকে ইণ্ডিয়া বা দমিল বলে। যেখানে জম্বুদ্বীপেব প্রতি তাদেব অপার শ্রদ্ধা, সেখানে দমিল বা ইণ্ডিয়ার নামোচ্চারণ করলেই গত বাইশশো বছবেব বাজনৈতিক সংঘর্ষেব কটু স্মৃতিগুলো প্রবল হয়ে ওদের মনে ঘৃণার উদ্রেক কবে দেয়। পণ্ডিত জগতরাম জম্বুদ্বীপেব জ্যোতিষী হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এক বোববাব আমি তাঁব সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমার উত্তর ভারতীয় বেশ দেখেই তিনি সমাদর কবে বসালেন। লেমোনেডের বোতল আর পান আনালেন। পান এখানেও মাদ্রাজের মতো, চুন লাগানো আলাদা আলাদা পাতা সুপাবি দিয়ে খয়ের ছাড়া খাওয়া হয়। তাঁব গৌরবর্ণ, লম্বা এবং খুব বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও সুস্থ শরীর পাঞ্জাবের আভাস দিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করে জানলাম তিনি জম্বুর বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর জীবন কাহিনী পুরোটা অবশ্য আমি শুনিনি। তবে তাতে অসাধাবণত্ব অবশ্যই ছিল। হিন্দিটা কোনোমতে পড়ে ফেলতেন, সংস্কৃতেব জ্ঞান না থাকারই মতো। কিন্তু তখন তিনি সারা লংকাব সর্বশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যদ্বক্তা জ্যোতিষী বলে পরিগণিত হতেন। জ্যোতিষবচন মানার ক্ষেত্রে সব ধর্মের লংকাবাসীই একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে। আমাদের এখানেও এমন লোকের অভাব নেই তবে 'স্যার' আর নানা উচ্চ-খেতাবধারীদের মোটর জ্যোতিষীজীর বাড়ি ধরনা দিয়ে আছে—এখানে এমন উপলক্ষ খুব কম হয়। পণ্ডিত জগতরাম কোনো সার্কাসে খেলা দেখাতেন, যেখানে কিছু মারাঠী আর অন্য লোকেরাও ছিল। একবার তাঁদের দল লংকায় এলো। তাঁর খানিকটা

জ্যোতিষের জ্ঞান ছিল। দেখলেন লংকার ভূমি এর জন্যে বড়ই উর্বর, তাই তিনি এখানেই রয়ে গেলেন আর নিজের সাধারণ বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে একজন সফল জ্যোতিষী বনে গেলেন। সেই সময়ই এক তামিল অব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁর প্রেম হয়। আমার পক্ষে তো বোঝাই মুশকিল ছিল যে, এমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান লোক ওই কুরূপার প্রেমপাশে আবদ্ধ হলো কি করে? কিন্তু 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে গর্দভী হ্মপ্সরায়তে।' অথবা 'মন দেওয়া'র ব্যাপার হতে পারে। তাঁর চার ছেলের মধ্যে বড় ইংরেজি জানত আর বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করত। পরেরটা লণ্ডন থেকে বি এস সি পাশ করে এ্যাডভোকেট হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ছোট দুজন স্কুলে পড়ছিল। শহরে তাঁর দুটো ভালো বাড়ি ছিল আর ভালোমত টাকা জমানো ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। কলম্বোতে দুজন হিন্দিভাষী ডাক্তার ছিলেন—দুজনেই কানপুরের আশপাশের বাসিন্দা ছিলেন। একজন তো মাসে প্রায় পাঁচ-ছশো টাকা আয় করতো কিন্তু বোতলের কল্যাণে বাড়ি ভাড়া দেওয়াই তাঁর পক্ষে মুশকিল ছিল। দ্বিতীয় জন খুব বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর দেশের স্ত্রীর গর্ভজাত একটি মেয়ে ছিল। যাকে আমাদের এক তরুণ বন্ধু, রাওয়ালপিণ্ডির দাস বিয়ে করেছিল। সে জাহাজের চাকরি আর করাচীর রেস্তোরাঁয় কাজ করতে করতে কলম্বো পৌঁছে ছিল। আগে সে মদন থিয়েটারের সিনেমার রেস্তোরাঁতে কাজ করত। পরে ফটোগ্রাফি সম্পর্কিত জিনিস ফেরি করতে থাকে। আমাদের এখানে সে প্রায় আসত। একদিন সে বড় মজার গল্প বলছিল। সিংহলীদের জ্যোতিষ বিষয়ে দুর্বলতার কথা তার জানা ছিল। তাই ফটোর ব্যাপারে ঘোরাফেরার সময়ে সে জ্যোতিষ বিদ্যাতেও হাত পাকাচ্ছিল। তবে বলছিল, 'এখন আর আমি ঐ পয়সাকে নিজের কাজে লাগাই না'। একদিন এক সিংহলী ভদ্রলোকের বাংলোতে সে গেছে। জ্যোতিষ সংক্রান্ত প্রশ্ন হতেই সে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বাড়ির ছেলেপুলেদের সংখ্যাও গুণে বলে দিল। এর পরে আর গৃহস্থদের ওর ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর সন্দেহ হয় কি করে? আমি জানতে চাইলাম, 'তুমি বাচ্চাদের সংখ্যা কি করে বলে দিলে?' চটপট জবাব দিল, 'যাবার সময় যে ওদের মোটরের ওপর খেলতে দেখেছিলাম।'

কলম্বোতে পরিচিতদের মধ্যে শ্রী গোবিন্দ সুন্দর পারমার এবং পণ্ডিত রবিশংকর গুজরাতী বড় সহৃদয় এবং সজ্জন ছিলেন। দুজনেই গুজরাতী বোহরা শেঠের ওখানে গোমস্তা ছিলেন। বোহরারা মুসলমান কিন্তু নিজেদের গুজরাতী ভাষার জন্য তাদের বড় গর্ব রয়েছে। তাঁরা গুজরাতীতেই নিজের হিসেব-টিসেব রাখতো। ইসলাম-এর যদি কোনো জিনিস আমার খুব খারাপ লাগে তবে তা হলো স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা আর বিদ্রোহের ভাব। আর যেখানে এটা থাকে না, সেখানে আমি এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের খুব প্রশংসাকারী হয়ে পড়ি।

গোবিন্দ ভাই সর্বদা চাইতেন যেন দুপুরের খাবারটা আমি তাঁর ওখানেই খাই। বিদ্যালঙ্কারের পাঁউরুটি-দুধ-মাখন আর ঝালের চোটে ধুয়ে খাওয়ার যোগ্য মাছ-মাংসের বদলে হপ্তায় একবার গুজরাতী খাবার—যা আমাদের বিহার-যুক্তপ্রদেশের খাবারের সামান্য রূপান্তর মাত্র—আমার পছন্দ হবে না কেন? প্রায়ই সকালে মরদানা স্টেশনে বুখারী হোটেলে মুর্গ-মুসল্লম আর চা খেতাম। দুপুরে খেতাম গোবিন্দভাই কিংবা

রবিশংকর ভাইয়ের ওখানে নিরামিষ গুজরাতী খাবার।

ডিসেম্বর (১৯২৭) কংগ্রেসের অধিবেশন মাদ্রাজে হলো। রাজেন্দ্রবাবুর চিঠি এসে গিয়েছিল যে, কংগ্রেসের পরে তিনি সিংহল দেখতে চান। আমি তাঁকে আসতে লিখলাম আর দর্শনীয় স্থানগুলোতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করলাম। ফোর্ট স্টেশনে ১ জানুয়ারি (১৯২৮)-এর ট্রেনে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আর অনেক গ্রামবাসী বাঙালী এলেন। আমি তাঁদের কলম্বোর দর্শনীয় জায়গা এবং কেলনিয়ার প্রাচীন বিহার দেখিয়ে নূর-এলিয়া, কাণ্ডী আর অনুরাধপুরের জন্যে বাসে রওনা করে দিলাম। ৩ জানুয়ারি রাজেন্দ্রবাবু সদলবলে পৌঁছলেন। কলম্বোর ডক, মিউজিয়াম, টাউন হল প্রভৃতি দেখাতে দেখাতে হেবলক টাউনের সেই নতুন বিহারটিও দেখালাম, যেটি এক কোটিপতি পিতা তাঁর তরুণ পুত্রের শহীদ হওয়ার স্মারক হিসেবে বানিয়েছিলেন। এই তরুণটির সিংহলী জাতীয়তাবাদের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল। স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যদের মধ্যে সে একজন অফিসার ছিল। যুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে সিংহলী-মুসলমান ঝগড়াকে উগ্র রূপ ধারণ করতে দেখে ইংরেজরা লংকাতে সামরিক আইন ঘোষণা করে দিল, আর সেই মার্শাল ল-তে যারা বলি হয়েছিল তাদের মধ্যে পিতার একমাত্র পুত্র এই তরুণটিও ছিল। তাকে গুলি করে মারা হয়েছিল। পিতা তার স্মরণে এই ছোট কিন্তু ভারী সুন্দর বিহারটি বানিয়েছিলেন। মূর্তি এবং ভিত্তিচিত্র বানাবার জন্যে সিংহলের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী নিযুক্ত করা হয়েছিল। সিংহলের বৌদ্ধমন্দিরগুলোর অদ্বিতীয় পরিচ্ছন্নতা এখানেও ছিল। প্রধান দ্বারের এক পাশে ভেতরের দিকে ঐ তরুণটির একটি রঙীন ছবি ছিল। কেলনিয়ার বিহার দেখে দলটা কিছু সময়ের জন্য বিদ্যালঙ্কার বিহারেও এলো। নারকেলগাছের ঘন ছায়া, নিরিবিলি শান্ত স্থানে ঐ বিহারটিকে দেখে আমার দেশের ভাই খুব খুশি হলেন।

দ্বিতীয় দিন আমরা একটা কি দুটো বাসে নূর-এলিয়া অভিমুখে রওনা হলাম। নূর-এলিয়া লংকার সিমলা, ছ-হাজার ফিট ওপরে। বিষুবরেখা থেকে চার পাঁচ ডিগ্রি উত্তরে হওয়ায় এখানে বৃষ্টিপাতের কম-বেশি ছাড়া অন্য সময় আবহাওয়া একই রকম থাকে। এখানকার পাহাড়ে জঙ্গল আছে কিন্তু দেবদারুর মনোহারী সৌন্দর্য আর শীতের তুষার দেখা যায় না। সারা দিন ধরে রাস্তার বন, পর্বত, গ্রামীণ কুটির আর বাজারের দোকান দেখতে দেখতে আমরা সন্ধের আগে নূর-এলিয়া (নগর-আলোক) পৌঁছলাম, একটা হোটেলে থাকতে চাওয়ায় হোটেলওলা প্রথমেই না বলে দিল। তার না বলার কারণ ছিল। কালকে আসা ভারতীয়রা নাওয়া-ধোওয়া, পেচ্ছাপ-পায়খানার ব্যাপারে তাদের ভীষণ অজ্ঞতা আর বেপরোয়া মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু যখন সে জানলো যে আমি বিদ্যালঙ্কার বিহারের অধ্যাপক এবং এরা সবাই আমার সঙ্গী, তখন জায়গা দিল। বেশির ভাগ লোক তো আলাদা আলাদা ঘর নিয়ে থাকলো, কিন্তু টাকা কম থাকার এবং সনাতনধর্মী হওয়ার জন্যে কিছু লোককে নিচের একটা ঘরে থাকতে দেওয়া হলো। যাইহোক, আর সব ব্যাপারে যদিও আমার সঙ্গীরা আমার হুঁশিয়ারী আর ভারতের বদনামের দিকটা খেয়াল রাখছিল, কিন্তু একজন এম· এ· 'সনাতনী' বিদ্বান রাস্তার কলে গিয়ে স্নান করতে সংকোচ করলেন না। এটা তাঁর মাথায় এলো না যে, খাবার জলের

কলের ওপর গা-ধোওয়া জলের ছিটে পড়লে লোকে তা বরদাস্ত নাও করতে পারে।

সকালবেলা আমরা সীতা-এলিয়া দেখতে গেলাম। লংকা যখন রাবণের দ্বীপ, তখন তার রাজধানী আর হরণ করে আনা সীতাকে রাখারও একটা জায়গা নিশ্চয় থাকবে। বাবু মথুরাপ্রসাদ স্থানটির নির্জনতা আর রমণীয়তা—পাশে বয়ে যাওয়া স্বচ্ছতোয়া ছোট নদী আর পাহাড়ের গায়ে ফুলে লাল 'অশোক' গাছগুলো দেখে বললেন, 'ঠিক, এটাই মহারাণী জানকীর অশোকবন।' বড় শ্রদ্ধাভরে তিনি অশোকের পাতা নিজের কাছে রাখলেন। আমি পাশের পাহাড়ের ঘাসের নিচে দেড়-দু ফুট মোটা কালো মাটি দেখিয়ে বললাম, 'আর এই দেখুন সোনার লংকার দহন।' লংকা সম্বন্ধে জিগ্যেস করায় আমি বললাম, 'রাবণের কাহিনীর সত্যতার ব্যাপারে আমি দিব্যি গালতে রাজি নই, তবে যদি কিছু থেকে থাকে, তো এই।'

ওইদিনই আমরা কাণ্ডী চলে এলাম। ওখানকার দন্তমন্দিরটা দেখা দরকার ছিল। দন্তমন্দির বৌদ্ধদের কাছে এক পবিত্র তীর্থস্থান হয়ে গিয়েছে। তাঁদের বিশ্বাস যে এটাই ভগবান বুদ্ধের আসল দাঁত। আবার এও জনশ্রুতি আছে যে, পোর্তুগীজরা আসল দাঁতটা পুড়িয়ে ফেলেছিল। যদি এই দাঁতটা আকারে-প্রকারে সেই দাঁতটার মতো হয়, তাহলেও তো বলতে হবে যে, সেটাও নকল দাঁতই ছিল। আবার বুড়ো আঙুলের মতো মোটা, প্রায় এক ইঞ্চির দাঁত কি কখনো মানুষের হয়? তবে শ্রদ্ধার সামনে তর্কের কি জোর খাটে?

কাণ্ডী একটি সবুজে ভরা রমণীয় পাহাড়ী স্থান। এইজন্যে 'জনু বসন্ত ঋতু রহী লুভাই'[1] বলা যেতে পারে। বিষুবরেখার কাছাকাছি হওয়ায় এখানে ঋতুর বেশি পরিবর্তন চোখে পড়ে না আর যে ঋতুটি বারোমাসই থাকে তাকে আমরা বসন্তই বলতে পারি। কাণ্ডীতে লংকার ভিক্ষুসংঘের মহানায়ক থাকেন। এই সময়ে সেখানে ইউনিভার্সিটি ছিল না কিন্তু নগরটি খুব পরিচ্ছন্ন আর তার সরোবরটি ছিল বড় সুন্দর।

কাণ্ডী দেখার পরে আমাদের মোটর-বাস অনুরাধপুরের দিকে চলল। রাস্তা খুব ভালো আর তা গাছগাছালিতে ভরা পার্বত্য এলাকার মধ্যে দিয়ে গেছে। পথে কোথাও কোথাও কোকোর বাগান দেখা গেল। ঐদিন সন্ধেয় আমরা অনুরাধপুর পৌঁছলাম।

অনুরাধপুর হলো লংকার পুরনো রাজধানী। এখান থেকেই লংকার ইতিহাস শুরু হয়েছে এবং বৌদ্ধধর্মেরও। প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারক অশোকপুত্র খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এখানেই ধর্মের পতাকা পুঁতেছিলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মই এই দ্বীপের প্রধান ধর্ম হয়ে রয়েছে। অনুরাধপুর আজ রাজধানী নয়, আবার তাকে ছোটো শহরও বলা চলে না। নগরের দর্শনীয় ধ্বংস দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে। রত্নমাল্য (রুবণ্বলি) চৈত্য একটি ছোটোখাটো পাহাড়। আরো কতই না ধ্বংসপ্রায় স্তূপ আছে। আমরা এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে বোধিবৃক্ষের নিচে পৌঁছলাম। ওখানে কয়েক-শ বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছিল। অশোক কন্যা ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা বুদ্ধগয়ার অশ্বত্থগাছের একটি শাখা নিয়ে এখানে এসেছিলেন, এটি সেই ঐতিহাসিক বৃক্ষ—এই বলে রাজেন্দ্রবাবুকে আমি গাছটির

[1] তুলসীদাসের *রামচরিত মানস* থেকে উদ্ধৃত।—স·ম·

বৈশিষ্ট্যের কথা জানালাম। তাতে তিনি বললেন, 'এই শাখা বুদ্ধগয়ার অশ্বত্থগাছের, যার জন্য বিশেষ উপায়ে ইঞ্জিন রেখে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর আমাদের ওখানে মূল বোধিবৃক্ষটির যে কি কদর সে আমরা জানি। বুদ্ধগয়ার মন্দিরটাকে দখলে এনে আসলে আমরা অন্যায় করে চলেছি।' আমি বললাম, 'এই জন্যেই আমি বলছিলাম, বুদ্ধগয়ার মন্দিরের ষোলো আনাই বৌদ্ধদের হাতে দিয়ে দেওয়া উচিত।'

অনুরাধপুর থেকে ট্রেন ধরে রাজেন্দ্রবাবুর দল তলেমন্নার তথা ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। সঙ্গহীন হবার পরে আমার একটু খালি খালি বোধ হতে লাগল।

কিছুদিন বাদে ৭ জানুয়ারি ব্রহ্মচারী বিশ্বনাথও এসে পৌঁছলেন। একমা থেকে কাপড় রাঙিয়ে বেড়ানোর জন্য বেরিয়েছিলেন, এতদিন ধরে তিনি বেড়াচ্ছিলেনই। তাঁর সঙ্গে আমার বরাবর চিঠির আদান-প্রদান ছিল। আমি তাঁর কাছে ঐতিহাসিক স্থানগুলোর যাত্রাপথের একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ত্রিপিটক পড়ার সময় এবং পুরনো গবেষণা পত্রিকা আর পুরাতত্ত্বের রিপোর্টগুলো আদ্যন্ত পড়ে স্থানমাহাত্ম্য সম্পর্কে আমি আরো সচেতন হয়ে উঠছিলাম, সেই জন্যে বিশ্বনাথের লংকা পৌঁছনোর আগে ওই জায়গাগুলো ঘুরে আসাটা জরুরি মনে করেছিলাম। তাঁর এই যাত্রাতে—শুধু বুদ্ধগয়া, নালন্দা, রাজগীর ইত্যাদিই নয়—বৈশালী, কুশীনারা, লুম্বিনী, জেতবন, সংকাশ্য, মথুরা, গোয়ালিয়র, সাঁচী, অজন্তা, ইলোরা, পুনা, ব্যাঙ্গালোর এসবও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমার বহু বছরের অভিজ্ঞতায় তাঁর যথেষ্ট লাভ এবং যাত্রার আনন্দ দুটোই হলো। লংকা আসতে মণ্ডপম্-এ যাতে কোনো হয়রানি না হয়, সেজন্যে আমি তাঁর একটা মিউনিসিপাল পারমিট পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আর অধীর আগ্রহে আমি তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলাম।

আমি ওখানে থাকায় ব্রহ্মচারী বিশ্বনাথের (ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ন) একদিনের জন্যেও জায়গাটা অচেনা বলে মনে হয়নি। পড়াশোনার ব্যাপারে আমি যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করে রেখেছিলাম, এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরে সেটা পাকা করে দিলাম। পালি আর সংস্কৃত পড়া জরুরি ছিল, আমিও সেইজন্যে সময় দিতে থাকলাম। বিকেলে এক-দেড় ঘণ্টার জন্যে আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম, আর সেই সময় আমরা নিঃসংকোচে নিজেদের মানসিক সমস্যাদি নিয়ে বাদানুবাদ করতাম। ঈশ্বরের ধারণা তাঁর পক্ষেও চিন্তার কারণ ছিল। তিনিও বুঝতে পারছিলেন—এক খাপে দুটি তলোয়ারের মতো বুদ্ধের সঙ্গে ঈশ্বরের থাকা অসম্ভব। শেষে আমার মতো করে আর অপেক্ষাকৃত কম সময়েই তিনিও ঈশ্বরকে শিশুর কল্পনা বলে চিনতে পারলেন। তখন নিজের সেই মানসিক টানা-হ্যাঁচড়ার দিনগুলোকে নিজের কাছেই হাস্যাস্পদ বলে ঠেকল। মাত্র কয়েক দিন পর্যন্ত তিনি ব্রহ্মচারী বিশ্বনাথ হয়ে রইলেন, তারপর সাধু হয়ে তাঁর নাম হলো আনন্দ। আমি ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছিলাম যে, লংকা থেকে একবার তিব্বত যাওয়া জরুরি। কেননা ওখানে না গিয়ে বৌদ্ধদর্শনের শিক্ষা এবং ভারতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বিষয়ক জিজ্ঞাসা পূরণ হতে পারে না। আমি এটাও জানতাম যে, তিব্বতে লুকিয়ে-চুরিয়েই যেতে পারি এবং তাতে আমার ভিক্ষু হওয়াটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমি ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এখন ভিক্ষু হতে চাইতাম না।

লংকার ঐ সময়কার জীবন বড় দ্বন্দ্বহীনতার জীবন ছিল। যদিও সেই সঙ্গে তা গভীর অধ্যয়নেরও ছিল। নায়কপাদ (মহাস্থবির শ্রীধর্মানন্দ) আমার শারীরিক আরামের দিকে খুব নজর রাখতেন। তাঁর আক্ষেপ ছিল যে, আমি সিংহলী খাবারগুলো তেমন রুচি নিয়ে খাই না। আসলে, ওখানকার রান্নায় লাল লংকা আর মশলার প্রাচুর্য আমার সহ্যের বাইরের জিনিস ছিল। কখনো-সখনো আমার পছন্দসই মাছ রান্না হতো, তবে মূলত আমি মাখন, দুধ, পাঁউরুটি আর আলুসেদ্ধ, পেঁয়াজ এবং তরকারি খেয়েই থাকতাম। আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকত। পড়ার জন্যে পালি ভাষার বই আর নানা গ্রন্থাগারের বই আমার জন্য মজুত ছিল, তাছাড়াও প্রতিমাসেই ভারত কিংবা ইউরোপ থেকে তিরিশ-চল্লিশ টাকার বই আনাতাম। সঙ্গ দিতে, আলাপ-আলোচনা করতে বিহারের ছাত্র এবং অধ্যাপকদের পেতাম, পরে আনন্দজীকেও পেয়েছিলাম। আর এটাই ছিল আমার নিশ্চিন্ত ও নির্দ্বন্দ্ব থাকার কারণ।

একভাবে দেখতে গেলে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দেই আমার সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়েছিল। যদিও আমার প্রথম হিন্দি প্রবন্ধ 'ভাস্কর' (মীরাট)-এ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছিল। এবং তার পরেও যখন-তখন হিন্দি, উর্দু পত্রিকাতে লিখতাম। তা হলেও এখান থেকেই ধারাবাহিক ভাবে লংকার সম্বন্ধে আমি কিছু প্রবন্ধ 'সরস্বতী'র জন্যে লিখেছিলাম। লংকায় থাকাকালীন সেগুলোর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমি জানতে পারিনি। ঐ সময় লংকা নিয়ে কিছু প্রবন্ধ 'বিশ্বমিত্র' (দৈনিক) আর 'মিলাপ' (দৈনিক)-এও লিখেছিলাম।

আমার কাছে পাঠরত ছাত্রদের মধ্যে জনাকয়েক বিহারের বাইরে থেকেও আসত। শ্রী কন্দৈয়া ছিল জাফনার তামিল তরুণ। তার সংস্কৃত পড়ার খুব সখ ছিল, কিন্তু তাদের তামিল ভাষাতে সংস্কৃত শব্দকে প্রায় বয়কট করায় তাকে প্রতিটি কথা নতুন করে শিখতে হচ্ছিল আর তাতে তাকে বেশ অসুবিধেয় পড়তে হচ্ছিল। তাও সে বহুদিন পর্যন্ত টিকে ছিল। আমি ওর কাছ থেকে ফ্রেঞ্চ শিখতাম। ওর সূত্রে আমার জাফনা দেখার সুযোগ (৩-৯ নভেম্বর ১৯২৮) মিলল। সেখানকার গ্রাম, লোকজন, ঘর-বাড়ি দেখে মনে হয় যেন মাদ্রাজেরই একটি টুকরো। ব্রাহ্মণের সংখ্যা যদিও নগণ্য, তবু ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা মাদ্রাজের মতোই প্রবল। জাফনার তামিলরা বড় উদ্যমী। রোজগার করতে সিঙ্গাপুর, পিনাংগ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এতোর পরেও এরা মাদ্রাজের তামিলদের মতো মহা সুদখোর চেটী বা ব্যবসাদার নয়। আবার ওদের অধিকাংশ যে রবার বা চা-বাগানের কুলী তাও নয়।

শ্রী জুলিয়াস ভি-লানরলও অনেক সময় ধরে সংস্কৃত পড়তে আসতেন। তাঁর পিতৃসূত্রে বংশ পরিচয় হলো যে, তিনি এক ফ্রেঞ্চ সামন্তের সন্তান, যিনি কাণ্ডীর স্বাধীনতার দিনগুলোতে এসে সিংহল-রাজের কৃপাপাত্র হয়ে পড়েছিলেন। সিংহলে ধর্ম, বর্ণ আর জাত-পাতের ভেদ খুব কম এবং এর কৃতিত্ব বৌদ্ধধর্মের। লানরল মশায়ের গায়ের রং তো এখন সাধারণ সিংহলী পুরুষদের মতো। কিন্তু ডাক্তার ক্যাসিয়াস পরেরা এবং তাঁর ভাইয়ের মতো ইউরোপীয় বর্ণসম্পন্ন এখনকার ইউরোপীয় ছেলেদেরও সিংহলীদের সঙ্গে মিশে যেতে কোনো অসুবিধে হয়নি। বিয়ে-থার সময়ে লোকেরা আদপেই ধর্মের কথা মনে

আনে না। স্বামী খ্রীস্টান আর স্ত্রী বৌদ্ধ—এমন উদাহরণ হাজারটা আছে। মুসলমান আর তামিল হিন্দুদের মধ্যে বিয়ে হয় না, তবে এর কারণ মূলত সাংস্কৃতিক আর ঐতিহাসিক।

লংকাতে উনিশ মাস থাকার সময়ে যখন-তখন ঘোরার সুযোগও আমি পেয়েছিলাম। অনুরাধপুরে সর্বপ্রথম আমি মেলার সময় গিয়েছিলাম। লংকার বিভিন্ন কোণ থেকে হাজার হাজার নরনারী মোটর-বাসে চড়ে এসেছিল আর একটা খোলা জায়গায় সার দিয়ে মোটরগুলো দাঁড়িয়েছিল।

অনুরাধপুর সম্পর্কে সেই সময় আমি 'সরস্বতী'তে একটা সচিত্র লেখা লিখেছিলাম। এই যাত্রায় (১৩-১৯ জুন ১৯২৭) আমি অনুরাধপুর থেকে মহিন্তলে আর ত্রিঙ্কোমলে (লংকার পূর্ব তটবর্তী) গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কাকবর্ণ বিহার যাওয়া খুব ভালো হয়েছিল। জাফনা, অনুরাধপুর, ত্রিঙ্কোমলে এখনও লংকার অন্তর্গত। একদা সিংহলীদের পূর্বপুরুষরা ভারত থেকে এসে এখানেই বসবাস শুরু করেছিলেন। কিন্তু আজকের এইসব অঞ্চলের শহর ও বাজারগুলোতে বিদেশীর মতো এক-আধজন সিংহলী স্ত্রী-পুরুষকে দেখা যায়, মনে হয় যেন উটকো এসেছে। এসব অঞ্চলে সিংহলী ভাষা পর্যন্ত কেউ বোঝে না[১]। ত্রিঙ্কোমলে থেকে আমরা নৌকোযোগে সমুদ্রের একটি ছোটো খাড়ি পার হলাম। জোর হাওয়া বইছিল, তাই একবার পাল ভেঙে একপাশে লট্‌কে গেল আর নৌকো কাত হতে শুরু করল। যাক, কোনো দুর্ঘটনা হয়নি। নাহলে, ঐ বড় নৌকোতে বহু স্ত্রী-পুরুষ যাত্রী চড়েছিলেন।

ওপারে তামিল ভাষাভাষী মুসলমানদের গ্রাম ছিল। সম্ভবত আমাদের পায়ে হেঁটেই যেতে হয়েছিল। মনে আছে, মহাবলী-গঙ্গা পার হবার পরে আমার খুব খিদে পেয়েছিল, তখন কোনো সিংহলী গৃহস্থ টিনের স্যামন মাছ টাটকা পেঁয়াজ দিয়ে আমাকে দিয়েছিলেন। পথে যাত্রীদের থাকার জন্যে কিছু পান্থশালা ছিল, সেখানে চাটাইও পাওয়া যেত। কিন্তু শুঁটকি মাছের গন্ধের চোটে আমার তো নাক ফেটে যাচ্ছিল। কাকবর্ণ বিহারের (সেরুওয়াবিল) স্তূপ জঙ্গলের ভেতরে। অধুনা কিছু জমি সাফ করা হয়েছিল (কিন্তু সেই স্তূপের আশপাশের জঙ্গলে এখনও বন্যজন্তুর ভয় ছিল। ভিক্ষুরা নিজেদের অস্থায়ী আবাস বানিয়ে নিয়েছিল) আর স্তূপটি মেরামত করার কাজও অল্প-বিস্তর শুরু হয়ে গিয়েছিল। যদি অনুরাধপুরের মতো এখানে রেল, মোটর-গাড়ির সুবিধে থাকতো তাহলে কাকবর্ণ বিহার সিংহলী ভিক্ষু এবং গৃহস্থদের একটি সুন্দর ও ঘন জনপদ হয়ে উঠতে পারতো।

দক্ষিণ পূর্ব কোণ বাদ দিলে সিংহল (লংকা) দ্বীপের প্রায় সব অঞ্চলেই আমার যাবার সুযোগ এসেছিল, আমি তার জন্য সুযোগ বের করে নিয়েছিলাম। মনে করতে পারছি না গাল থেকে তিস্‌সমহারাম আর খত্তরগম্ একবারেই গিয়েছিলাম না দু-বারে। এই দুটি জায়গা লংকার দক্ষিণাঞ্চলে। তিস্‌সমহারাম কোনো কালে সমৃদ্ধ নগর ছিল কিন্তু সে তো কয়েক হাজার বছর আগেকার কথা। এখন ইতস্তত সিংহলীদের গ্রাম। পুরনো সরোবর থেকে জলসেচ করা ধানের ক্ষেতে বছরের বেশির ভাগ সময় সবুজের ঢেউ খেলে যায়।

[১] দেখুন আমার 'লংকা'

খত্তরগম্-এ কার্তিকের মন্দির আছে। এখনও পর্যন্ত এর চারপাশে ঘোর জঙ্গল, কয়েক মাইল ধরে তা পেরিয়ে তবে মন্দিরে পৌঁছনো যায়। আমি রাতের বেলা একজন ভিক্ষুর সঙ্গে জঙ্গলের প্রান্তবর্তী গ্রামে পৌঁছেছিলাম। লংকার সমস্ত বড় গ্রামে একটা ভিক্ষু-বিহার থাকাটা আবশ্যক। আমরা গ্রামের বাইরে সেই বিহারটিতে আশ্রয় নিলাম। রাত বেশি হয়ে গেছে বলে তখন না এলেও, পরদিন ভোর না হতেই জম্বুদ্বীপের পণ্ডিতের নাম শুনে, অজস্র গৃহস্থ তালপাতায় লেখা কোষ্ঠী নিয়ে এসে হাজির হলেন। কপাল ভালো, ততক্ষণে আমরা গরুর গাড়ি চড়ে খত্তরগম্-এর উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছি। জঙ্গলের রাস্তায় আমার সঙ্গী বলতে-বলতে যাচ্ছিল যে, এখানে এখনো বুনো হাতি আছে, আর তারা মাঝে মাঝে পথিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে এমন করে বলছিল, মনে হচ্ছিল যেন আমাদের গাড়িটাও এখন-তখন উল্টে পড়তে চাইছে। খত্তরগম্ একটি ছোটো পাহাড়ী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে কার্তিকের মন্দির তথা বৌদ্ধবিহার ছাড়াও একটি হিন্দুমঠ এবং দু-চারটে অন্য ঘর আছে। আমরা কোনো মেলার সময় গিয়েছিলাম, তাই হাজার-হাজার তামিল হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ এসেছিল। এদের অধিকাংশই চা, রবার বাগানের কুলি। দোকানদারেরা খড়ের ঝুপড়ি বানিয়ে নিয়েছিল। আমরা বৌদ্ধবিহারটিতে উঠেছিলাম কিন্তু উত্তর-ভারতীয় হিন্দু-সন্ন্যাসীর কথা শুনে আমি হিন্দু মঠেও গেলাম। ধূনী জ্বলছিল, চিমটে আর কলকে মজুত ছিল। হরিণের ছাল অথবা কম্বলের আসনে একজন মাঝবয়সী গোঁসাই সাধু বসেছিলেন। সিংহলে গাঁজা নিষিদ্ধ বলে আড্ডা জমছিল না। আমার পোশাক দেখেই তিনি আসন দিয়ে বসালেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম, তাঁর জন্ম যুক্তপ্রদেশের কোনো জায়গায়, তীর্থ যাত্রা করতে রামেশ্বরম্ এসেছিলেন। এই মঠটি রামেশ্বরমের মঠের শাখা, তাই সেখান থেকে তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। গাঁজার অভাব ছাড়া তাঁর আর কোনো অভিযোগ ছিল না। তিনি নিরক্ষর মানুষ ছিলেন, তবে অনেকদিন থাকতে থাকতে তামিল আর সিংহলী ভাষা মোটামুটি বলতে পারতেন। সঙ্গে এক নেপালী যোগিনী ছিলেন, যাঁকে দেখে তাঁর চেয়ে কম বয়সী মনে হলো। এই ঘোর জঙ্গলে, জন্মস্থান থেকে এত দূরে, নিজের প্রিয় গঞ্জিকা সেবনে বঞ্চিত হয়েও তাঁর মন বসানোতে এই যোগিনীটির হাত কম ছিল না। সন্তানের জন্য মঠ দেখে যেন গৃহস্থের ঘর বলে মনে না হয়—ব্যস্, এই শর্তে যোগী-যোগিনীর সংসর্গ কি আর এমন খারাপ।

যখন অন্ধকার হয়ে গেল তখন খত্তরগম্-এ কার্তিকের পুজোর জন্য যেসব তামিল নরনারী এসেছিলো, তারা মাটির পাত্রে আগুন জ্বালিয়ে মাথার ওপরে ধরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো এবং একান্ত শ্রদ্ধাভরে আধা-জংলী স্বরে জয়ধ্বনি দিতে লাগলো। মন্দিরের প্রধান ছিলেন সিংহলী বৌদ্ধ, আর সেটা তামিল হিন্দুরা পছন্দ করতো না—তবে এসবই স্রেফ প্রণামীর ভাগ-বাঁটোয়ারকে কেন্দ্র করে। নইলে সিংহলীরা বিষ্ণু, বিভীষণ-এর মতো কার্তিককেও একজন বড় দেবতা বলে মান্য করে। গৃহস্থরা তাঁর পুজোও নিজস্ব ঢঙে করে থাকে। ভিক্ষু যদি পুজো না করে, তার কারণ হলো—দেবতারা তো সবাই গৃহস্থ—ভিক্ষু মাথা নত করলে দেবতার অনিষ্ট হতে পারে। তাঁর মাথাটি পর্যন্ত খসে যেতে পারে। দেবতাকে আশীর্বাদ দিতে কোনো ভিক্ষু কার্পণ্য করে না।

—১৯২৮—

যখন আমি ভিক্ষু হইনি বলে গৃহস্থের মতো বিবেচিত হতাম, তখন সেই পণ্ডিতবেশে থাকার সময়েও আমার শাস্ত্রব্যাখ্যার ভালো চাহিদা ছিল। দেশ দেখার সুবিধে থাকায় আমি অনেক জায়গায় চলে যেতাম। ব্যাখ্যা সংস্কৃতে দিতাম আর আমার শিষ্যদের মধ্যে কেউ একজন সেটা সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করে বলে যেত। সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মোপদেশ (বণ, ভণ) খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত দশটা বা এগারোটাতে শুরু হতো আর কখনো-কখনো সেটা সকাল অব্দি চলত। ব্যাখ্যা করার সময়ে আমি দেখতাম, একটু পরেই শ্রোতৃমণ্ডলীর অর্ধেক অংশ ঝিমোতে শুর করেছে। কিন্তু যারা জেগে থাকতো তাদের খাতিরে বক্তাকে অবশ্য তার ব্যাখ্যা চালিয়ে যেতে হতো। এই সব সভায় স্ত্রী-পুরুষেরা, বিশেষ করে স্ত্রীলোকেরা, সেজেগুজে আসত। ব্যাখ্যাদানের আগে অনেক জায়গায় আতশবাজী ছোঁড়া হতো। যদিও অনেক শ্রোতা ঘুমিয়ে পড়তো তাহলেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সিংহলী নরনারীরা ভাষণের কদর করে। আর সেজন্যে তাঁরা নিজেদের ধর্মের বিষয়ে অনেক কিছু জানে।

মাদ্রাজের মতো সিংহলেও পর্দার নামগন্ধ নেই। সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই সাদা লুঙ্গি আর অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদের মতো ব্লাউজ (চোলী) পরে। এর বেশি যদি তাদের কাছে কিছু থাকে তো একটি ছোটমতো রুমাল আর ছাতা। মাথা সবসময় অনাবৃত থাকে, চুল আঁচড়ে বাঁধা বেণীগুলো ফুল বা রত্নখচিত কাঁটা দিয়ে সাজায়। পরের যাত্রাগুলোতে আমার সামনেই দেখলাম শাড়ি পরার চল বাড়ছে। শাড়ি পরলে যে তাদের অধিকতর বিনীত মনে হয় এতে সন্দেহ নেই। বিদ্যালংকার বিহারের বাইরে রাস্তার অপর পারে একজন গৃহস্থের ঘর ছিল, তাতে তাঁর একটি তরুণী কন্যা থাকতো। বেড়াবার সময়ে বা ডাকঘবে যেতে হলে আমাকে ওপাশ দিয়ে যেতে হতো। এক-আধবার আমাদের চোখাচোখি হয়েছিল। তার পবে আমি দেখতাম, যখনি আমি ওদিক দিয়ে যাই অথবা সে ধর্মোপদেশ শুনতে কি পুজো করতে বিহারে আসে—তখন নিসংকোচে, হ্যাঁ, অবশ্যই অন্যদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে—আমার দিকে তাকাতো। আমার হৃদয়ও সেদিকে আকর্ষিত হয়েছিল, কেননা সে ফর্সা আর কিছুটা সুন্দরও ছিল। এও ঠিক যে কুমারী ছিল বলে তাকে বিয়ে করতে কোনো বাধা হতো না। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবলেই আমার লোম খাড়া হয়ে উঠতো, আমাব ডানা যেন কেটে পড়তে দেখা যেত। আর স্ত্রী সংসর্গের এছাড়া অন্য পরিণাম কি? আমি দৃঢ়তা অবলম্বন করলাম। তবে সেই সঙ্গে এই দৃঢ়তার সহায়ক হয়েছিল মূলত আমার স্বাভাবিক সংকোচ এবং ঐ মেয়েটির লজ্জাশীলতা। না হলে যদি ওর তরফ থেকে এ ব্যাপারে অগ্রগতি হতো, তাহলে আমার নিজেকে বাঁচানো মুশকিল হতো।

তিন বছর পরে আমি ঐ তরুণীটিকে দেখতে পেলাম—সে তখন এক ছেলের মা। তার সে-সৌন্দর্য জানি না কোথায় উড়ে গেছে, যার জন্য আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। যৌবন-সৌন্দর্যের অনিত্য ছটার প্রতি মনোযোগ নিজেকে সরিয়ে ফেলতে আমাকে খুব সাহায্য করেছিল।

আনন্দজী এই সময় আমার সঙ্গে থাকতেন, তাই সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে আরও একজন

সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য সুলভ ছিল। আমার তিব্বত যাবার ব্যাপারে তিনিও একমত ছিলেন। অন্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমি বই থেকে নিজে নিজেই তিব্বতী ভাষা শিখতে শুরু করে দিয়েছিলাম। ১৯২৮-এর শেষের দিকে কলম্বোতে ম্যাঙ্গালোর জেলার তরুণ ব্রাহ্মণ অনন্তরাম ভট্টের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি সংস্কৃতের ভালো পণ্ডিত ছিলেন। লংকার সবরকমের পরীক্ষা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল, তাই তিনি ম্যাট্রিকে বসবার ইচ্ছায় ওখানে চলে এসেছিলেন। আমি চলে গেলে ছাত্রদের সংস্কৃত পড়ার অসুবিধে হবে, তাই আমি চাইছিলাম কোনো একজন সংস্কৃতের পণ্ডিত যেন এখানে এসে পড়েন। নায়কপাদ বলেছিলেন ভারতবর্ষ থেকে কাউকে আনিয়ে দিতে, কিন্তু সে-সময় তেমন কোনো লোক নজরে পড়ছিল না। অনন্তরামজীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম তিনি স্বাবলম্বী হয়ে লেখাপড়া করতে চান, আর তখনো পর্যন্ত কোনো স্থায়ী চাকরি তাঁর জোটেনি। আমি তাঁকে বিদ্যালংকারে অধ্যাপনা করতে বললাম। তিনি তো এইরকম একটি কাজই চাইছিলেন। অনন্তরামজীর ম্যাট্রিক পাস করার ব্যাপারে আমি ভিন্নমত ছিলাম। আমি তাঁকে বলতাম, 'গবেষণা সম্পর্কিত বই, পত্র-পত্রিকা পড়ো। কিছু পয়সা জমিয়ে দু-বছরের জন্যে জার্মানি চলে যাও। সেখান থেকে পি.এইচ.ডি.হয়ে ফিরে এসো। কি দরকার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক হয়ে, তারপর বি এ ফেল-পাস করতে-করতে জীবনের আট-দশটা বছর বরবাদ করে?' কিন্তু আমি লংকা ছাড়ার আগে পর্যন্ত তাঁকে এই কথাটা বোঝাতে সমর্থ হইনি।

চলে যাবার আগে বিদ্যালয় আমাকে (৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮) 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধি প্রদান করে।

লংকা থেকে প্রস্থান

১ ডিসেম্বর (১৯২৮) আমি ভারতের উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রকৃতপক্ষে এটা ভারতের উদ্দেশে নয়, তিব্বতের উদ্দেশে রওনা হওয়া। লংকাতে আমি পালি ত্রিপিটক আর অন্যান্য অনেক বই জমিয়ে ফেলেছিলাম। সেগুলো রেলযোগে পাটনা পাঠিয়ে দিলাম। আমি যখন লংকায় এসেছিলাম, তখন পালি শুধু ছুঁয়ে দেখেছি মাত্র। সংস্কৃতটা আমি খুব ভালোভাবে পড়েছিলাম কিন্তু পুরাতত্ত্ব, পুরালিপি আর ইতিহাসের মৌলিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমার পড়াশোনা নেই-এর মতো ছিল। এখন আমার এইসব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। আমি উনিশ মাসে শুধু পালি ত্রিপিটকই পড়িনি। তা বাদে ভারত-লংকার পুরাতত্ত্বের রিপোর্ট সমূহ, ভারতবর্ষ আর বিদেশের ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণামুলক পত্র-পত্রিকাগুলোও নিয়মিত পড়েছিলাম। ভোট (তিব্বত) ভাষার বইগুলো থেকে একটু-আধটু পড়েছিলাম আর ভারতীয় জরিপ-বিভাগের নকশা দেখে এটাও স্থির করে

ফেলেছিলাম যে, নেপালের দিকের রাস্তা দিয়েই আমি তিব্বতের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারি। কিন্তু নেপালে তো শিবরাত্রির সময়েই যাওয়া যায়, তাই আমি এই তিনটে মাস ভারতের বৌদ্ধ ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখার কাজে লাগাব বলে স্থির করলাম।

বিদ্যালংকার বিহারের নায়ক শ্রীধর্মানন্দ মহাস্থবিরের কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছিলাম, দেখলাম তাঁর চোখদুটো ভেজা-ভেজা। মহাস্থবিরের স্বভাবটি বড়ই সরল আর মধুর। আমিও তাতে অনেকটা প্রভাবান্বিত ছিলাম। ভিক্ষু আনন্দ কৌসল্যায়নকে আমি পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছিলাম।

কলম্বো থেকে ট্রেনে চড়ে তলেমন্নার পৌঁছলাম আর সেখান থেকে জাহাজ ধরে সমুদ্রের ছোটো খাড়ি পার হয়ে ধনুষ্কোটি। বইগুলো যদি এমনিই ফেলে যেতাম, তাহলে কাস্টম-এর লোকেরা ঐ চার মণ বই দেখতে না জানি কত দেরি করতো, তাই সেগুলোকে আমার সামনেই দেখিয়ে পাটনা রওনা করিয়ে দিলাম। সে-সময় পণ্ডিত জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার বিহার বিদ্যাপীঠে অধ্যাপক ছিলেন। আমার বিশ্বাস ছিল যে তিনি ওগুলোকে সামলে নেবেন। এবার আমি ঝাড়া হাত-পা। সফরের সময়ে লোকে যতই কম জিনিস সঙ্গে নেবে, ততই ভালো।

রামেশ্বরমে ১, ২ দিন আর মাদুরাইতেও ওইরকমই থামলাম। মাদুরাইতে আমি এক উত্তর-ভারতীয় আর্যসমাজী উপদেশকের নাম জানতাম, তাই তাঁর কাছে চলে গেলাম। ওখানকার বিশাল মীনাক্ষী মন্দির দেখতে চাইতাম। ১৫ বছর আগেও এমনিই একবার অবশ্য ঐ মন্দিরটা দেখেছিলাম। কিন্তু তখন আমার কাছে ঐতিহাসিক দিব্যদৃষ্টি ছিল না। মন্দিরের বিশালতা এবং তার প্রস্তর-শিল্প আকর্ষণীয় নিশ্চয় ছিল কিন্তু সেইসব মূর্তি যা একসময় আমার ভালো বলে মনে হয়েছিল, সেগুলোকে এখন বিশ্রী মনে হলো। হ্যাঁ, মাদুরাই (দক্ষিণ-মথুরা)-তে আমার একটা ব্যাপার খুব নতুন ঠেকল। ওখানকার শাড়ি (রেশমী এবং সুতি) বোনার তাঁতীরা তামিল বলে না, বরঞ্চ অধিকাংশই উত্তর-ভারতীয় ভাষায় কথা বলে। চেহারার দিক দিয়েও তারা উত্তর-ভারতের গমেব মতো রঙওলা লোকেদের সঙ্গেই বেশি মেলে। মাদুরাই শহরে এদের সংখ্যা অর্ধেকের কম নয়। যদিও এরা নিজেদের সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়) থেকে আগত বলে, কিন্তু এদের ভাষা খানিকটা মাগধী খানিকটা বাংলার মাঝামাঝি বলে মনে হলো।

শ্রীরঙ্গমে ১, ২ থেকে পুনা পৌঁছলাম। অভিধর্মকোষের খণ্ডিত অংশগুলোকে ফরাসি অনুবাদ থেকে সম্পূর্ণ করে তার ওপরে আমি একটি সংস্কৃত টীকা লিখেছিলাম। তিব্বত যাবার জন্যে কিছু টাকার দরকার ছিল। ভেবেছিলাম এই বইটার জন্যে পুনার কোনো প্রকাশকের কাছ থেকে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু সংস্কৃত বইয়ের প্রকাশক লেখকদের টাকা দিতে কম পছন্দ করে।

পুনা থেকে আমি কার্লের গুহাবিহার দেখার জন্যে নামলাম। যদি আরো আগে আসতাম তাহলে তার চৈত্যশালা, আলাদা-আলাদা কুঠরী আর থামের ওপর খোদাই করা দাতাদের নামগুলো বুঝতে পারতাম না। কিন্তু এখন আমার কাছে তা খোলা বইয়ের মতো মনে হলো। কার্লে দেখে আমি আবার নাসিক গেলাম। ওখানকার গুহাগুলো দেখা শেষ

হলে ইলোরা যাবার জন্যে ঔরংগাবাদে নেমে পড়লাম। যখন স্টেশন থেকে বাইরে এলাম, তখন পেছনে পুলিশ লেগে গেল। নিজের নাম, গ্রাম তো আমি জানিয়ে দিলাম, কিন্তু যখন বাপ-ঠাকুর্দার নাম জানতে চাইল তখন বলতে অস্বীকার করলাম। আর কি, পুলিশ আমাকে পাকড়ে ওখানকার হাকিম তহশীলদারের কাছে নিয়ে চলল। বেশ খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে তারপর তহশীলদার সাহেবের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। আমি পুলিশের জোর-জবরদস্তির প্রতিবাদ করলাম আর কি জানি কি ভেবে তহশীলদার মৃদু হেসে বললেন, 'না, ভুল হয়েছে। তবে এখন মাদ্রাজের গভর্ণর ইলোরা দেখতে এসেছেন, তাই পুলিশকে বেশি সাবধান থাকতে হচ্ছে।'

পুনা থেকে আমার একজন মারাঠী ভদ্রলোকের নাম জানা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বাড়ি চলে গেলাম। যা কিছু অল্প-বিস্তর মোটঘাট ছিল, তাঁর কাছে রেখে ইলোরাগামী মোটর-লরি ধরলাম।

লরি থেকে যখন নামলাম, তখন একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোককেও নামতে দেখলাম। কিন্তু আমরা দুজনে যে-যার পথে চলে গেলাম। ইলোরা ভালো করে দেখতে হলে তা দিন কয়েকের কাজ। ওখানকার তিরিশটা বিশাল গুহা, যার মধ্যে অনেকগুলোকেই গুহা না বলে মহল বলা উচিত—ভারতীয় মূর্তিকলা এবং বাস্তুকলার অতি সুন্দর নমুনা। আমি প্রথমে কৈলাশ মন্দিরে ঢুকলাম। পাহাড় খুদে একটি চূড়াযুক্ত বিশাল মন্দির বের করে আনা হয়েছে আর তার দেওয়ালে হাজার হাজার সুন্দর মূর্তি রয়েছে। তার কোথাও-বা রামায়ণের দৃশ্য, আবার কোথাও অন্য পৌরাণিক দৃশ্য। এই অপূর্ব কলাকৃতির সামনে দিয়ে আমি নিশ্চয়ই হড়বড় করে পেরিয়ে যেতে পারতাম না। ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি, যিনি এক আমেরিকান ক্রিশ্চিয়ান মিশনের প্রধান মিঃ সুথর, তিনিও দেখছিলেন। তিনি আমাকে কি যেন জিজ্ঞেস করলেন, আর ব্যস মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমবা বন্ধু হয়ে গেলাম। অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত আমরা ঘুবে-ঘুরে গুহাগুলো দেখলাম। মিঃ সুথর অংকোটভাটের (কম্বোডিয়া) বিশাল মন্দির দেখে এসেছেন। বলছিলেন যে ইলোরার সামনে ওটা কিছু নয়। হিন্দু দেব-দেবীর সঙ্গে তো আমার পরিচয় ছিলই, বৌদ্ধ মূর্তিগুলোর মধ্যে মহাযানের মূর্তিগুলোব সঙ্গে এখন পরিচয় অল্প থাকলেও অন্যান্য বৌদ্ধমূর্তিগুলোকেও জানতাম।

ইলোরা গুহার পাশেই পুলিশ-চৌকি ছিল। আমবা তাদের বললাম একটু খাবার বেঁধে দিতে। সেপাইরা খুব খুশি হয়ে যদ্দূর মনে পড়ছে রুটির সঙ্গে ডিম সেদ্ধ করে দিয়েছিল। আমরা দুজনে কৈলাশেব ঝর্ণার পাশে বসে দুপুরেব জলযোগ সারলাম। সন্ধেতেও সেপাইরা খাবার তৈবি করে দিল আর শোবার জন্যে দুটো খাট বের করে দিল। ঔরংগাবাদে খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কিন্তু এখানকার সেপাইরা যথেষ্ট সৌজন্য দেখালো।

পরের দিন খুলদাবাদে ঔরংজেবের কবব আর দেবগিরিতে (দৌলতাবাদ) যাদবদের গিরি-দুর্গ এবং পরিত্যক্ত নগর দেখার জন্যে আমরা ঔরংগাবাদ চলে এলাম। মিঃ সুথরও অজন্তা দেখতে চাইছিলেন। তিনি ডাক-বাংলোতে উঠেছিলেন। আমাকেও তিনি তাঁর

সঙ্গেই থাকতে অনুরোধ করলেন। মোটঘাট নিয়ে আমিও ডাকবাংলোতে চলে এলাম।

পরদিন মোটর-লরি চড়ে ফরিদাবাদ রওনা দিলাম। শীতের দিন ছিল তাই গরমের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। ফরিদাবাদে ডাকবাংলোতে আমরা উঠলাম। সুথরও ভরপেট রুটি খেতে পারতেন তাই খাবার ব্যাপারে কোনো অসুবিধে ছিল না। ডাকবাংলোর সেপাই মুর্গ-মুসল্লম আর ডিম রান্না করেও এনে হাজির করল। ভারতবর্ষ থেকে লংকা যাবার আগেও আমার খাওয়া-দাওয়াতে ছুৎমার্গের খেয়াল ছিল না। তবে খাদ্য-অখাদ্যের বাছবিচার তখনও ছিল। লংকা আমার জন্যে ঈশ্বর বিশ্বাসের আর একটিমাত্র পা-ও যে ভেঙে খোঁড়া করে দিল, তাই-ই নয়, খাওয়ার ব্যাপারেও স্বাধীনতা দিয়ে দিল। আর সেই সঙ্গে মনুষ্যত্বকে সংকীর্ণ করে রাখার বেড়াগুলোও ভেঙে দিয়েছিল।

পরের দিন আমরা অজন্তা দেখতে গেলাম। যেসব চিত্র আর মূর্তি আমি ছবিতে দেখেছিলাম, এখন সেগুলো ছিল আমার সামনে। একা একা দেখলেও আমি অজন্তা দেখায় অতটাই সময় ব্যয় করতাম কিন্তু দুজনে থাকায় দেখার আনন্দটা অনেক বেশি হলো। বস্তুত, এই ধরনের যাত্রায় কখনো একা আসতে নেই। তবে হ্যাঁ, আমাদের উভয়েরই যদি এই ধরনের দৃশ্যের প্রতি সমপরিমাণ আগ্রহ না থাকতো, তাহলে হয়তো অতখানি আনন্দ হতো না।

অজন্তা দেখে যখন আমরা ডাকবাংলোয় ফিরে আসছিলাম, তখন আমাদের সামনে সামনে দুটি মানুষ যাচ্ছিল। একটি ছিলো তরুণ হাকিমজাদা আর অপরজন তার চাকর। দুজন একে অপরের সঙ্গে ১৫ পা দূরত্ব রেখে চলছিল। আমরা দুজন কথা বলতে বলতে আসছিলাম কিন্তু সুথরের নজর ওদিকে না পড়ে পারল না। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা দুজন একসঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ চলছে না কেন?'

আমি বললাম, 'এরা সামন্ত যুগের লোক। মালিক চাকরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কি করে পথ চলতে পারে? তা হলে যে মালিক-চাকর সমান হয়ে যাবে।'

সুথর নিশ্চয় কিছুটা আশ্চর্য হলেন। আমরা আবার নিজেদের কথাতে ফিরে গেলাম।

ফরিদাবাদ থেকে সামনের কোনো গ্রাম পর্যন্ত আমরা গরুর গাড়ি করলাম, তারপর আবার লরি করে জলগাঁও চলে এলাম।

সুথরেরও সাঁচীর স্তূপ দেখার ছিল কিন্তু রাস্তায় অন্য কোনো কাজ ছিল, না কি জন্যে যেন, সে ঐ ট্রেনে যেতে পারল না। আমি সাঁচীতে নামলাম, আর ঘুরে ঘুরে ওখানকার স্তূপ এবং সেগুলোর তোরণের ওপর উৎকীর্ণ একুশশো বছরের পুরনো মূর্তিগুলো দেখলাম।

যখন স্টেশনের দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন দেখি মিঃ সুথর আসছেন। তাঁকে দেখাবার জন্যে আমি আরেক দফা গেলাম। যদিও সাঁচীর পরে আমাদের মধ্যে আর দেখা হয়নি—সুথর আমেরিকা চলে গেলেন আর আমি পৃথিবীর কোথায়-কোথায় ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু বছর কয়েক ধরে চিঠিপত্রে আমাদের যোগাযোগ বজায় ছিল।

সাঁচীর পরে দ্বিতীয় বিরতিস্থল ছিল কোঞ্চ (জেলা জালৌন)। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পান্নালালজী, শ্যামলালজীর সঙ্গে এত আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল যে, আমি ওদিক দিয়ে যাব

অথচ কোণ্ঠ যাব না, এ হতেই পারতো না। যদিও আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল আর্যসমাজী সম্পর্কের সূত্রে, আর এখন আমি আর্যসমাজী ছিলাম না—আমার এক পা ছিল বৌদ্ধধর্মে এবং অন্যটা সাম্যবাদে। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বে কোনো ফারাক ছিল না। আবার আমি দু-চার দিনের জন্যে বুন্দেলখণ্ডের ভোজন এবং মধুর ভাষার আনন্দ নিলাম।

একাকী পথ চলাই ভবঘুরের পক্ষে ভালো, তাই আমি আবার ধূপনাথের দেওয়া পশমী কম্বলে তৈরি আলখাল্লা আর হাতে মাদ্রাজী পেতলের ঢাকনি দেওয়া কমণ্ডলু নিলাম। কানপুর থেকে ছোটো লাইন ধরে কনৌজ পৌঁছলাম। শহর পেরিয়ে কোনো এক বাগানে একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিলাম।

একদা কনৌজ ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় শহর ছিল। ত্রয়োদশ শতকে কনৌজের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে দিল্লি গড়ে উঠল আর তখন থেকে কনৌজ নিঃস্বই হতে লাগল। এখনও সেখানকার গলিগুলোতে আতরের সুগন্ধ ভেসে আসে, তবে আমি জানতাম যে ওসব আমার জন্যে নয়, অন্যদের জন্যে। শহরের আশেপাশে যত ঐতিহাসিক স্থানের খোঁজ পেলাম, আমি তন্ন-তন্ন করে দেখতে লাগলাম। এক জায়গায় দেখি বুদ্ধের একটি খণ্ডিত মূর্তি কোনো দেবীর নামে পুজো পাচ্ছে। যিনি পূজক, তিনি হয়তো মনে করছেন যে দেবতাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নেই।

গরিব চামারদের কাছ থেকে আমি কিছু পুরনো মুদ্রা পেলাম, কিন্তু সেগুলো মুসলমান আমলের টাকা ছিল। ট্রেনের দেরি ছিল, তাই আমি যেখান থেকে মোটর ছাড়ে সেইদিকে যাচ্ছিলাম। পথে কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। ঐ সময় আমার বয়েস পঁয়ত্রিশ বছর ছিল, কিন্তু দেখতে হয়তো ৫, ৭ বছর কম মনে হতো। তাহলেও ঐ বয়সে দাড়ি তো বেশ ভালই গজায়। আমার মুখে দিন দশবারোর না-কামানো লম্বা চুল ছিল, তাকে দাড়ি বলা যায় না। তা সত্ত্বেও মুসলমান ভদ্রলোকেরা কি জানি কেন 'আস্‌সলামলেক, আসুন শাহসাহেব!' বলে আমাকে বসার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। হতে পারে আমার কালো আলখাল্লা আমাকে শাহসাহেব-এর রূপ দিয়েছিল। আমার লরি ধরার তাড়া ছিল তাই ওঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলাম। পরে ফারুখাবাদ বা ফতেগড়ে পৌঁছে আমি লরি ছাড়লাম এবং ট্রেন ধরলাম। মোটা স্টেশনে রাত্তিরবেলা চারদিক খোলা সরাইখানায় ঘুমোতে হলো। তখন মনে হচ্ছিল শীতের পক্ষে আলখাল্লা যথেষ্ট নয়।

পরের দিন সংকিসা (সংকাস্য) গেলাম। সংকিসাও বৌদ্ধদের একটি পবিত্র স্থান। বৌদ্ধগ্রন্থগুলোতে আমি পড়েছিলাম, কিভাবে বুদ্ধের একবার তাঁর মা মায়াদেবীর কথা মনে পড়েছিল। তাঁর বয়েস যখন দিন সাতেকও হয়নি, তখন মায়াদেবী দেহত্যাগ করেছিলেন আর তুষিত দেবলোকে গিয়ে জন্মেছিলেন। আর্যসমাজই আমার জন্যে দেবতা আর দেবলোককে চুরমার করে দিয়েছিল, তাই বুদ্ধের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও এসব ছেলেমানুষী গল্প বিশ্বাস করতে আমি রাজি ছিলাম না। যাক্‌গে, গল্পটা ছিল যে, বুদ্ধদেব নিজের ধর্মামৃত পান করানোর জন্যে দেবলোকে মায়ের কাছে গেলেন আর বর্ষার তিন মাস উপদেশ দিতে সেখানেই কাটালেন। আবার মৃত্যুলোকে অবতরণ করার সময়ে তিনি এই সংকাস্যতেই এসে নামলেন। সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছেন তখন ডাইনে-বাঁয়ে ব্রহ্মা আর ইন্দ্র তাঁর

সেবকরূপে পাশে পাশে চলছিলেন। সম্ভবত বুদ্ধের সব কটা বর্ষাবাসের ঠিকানা ভিক্ষুরা জানতেন কিন্তু একবার তিনি কোনো অজ্ঞাতস্থানে বর্ষাবাস করেন, আর তাই ওই তুষিত ভবনের গল্পটা বানানো হয়।

বুদ্ধদেবের নির্বাণের সোয়া দুশো বছর পরে এই গল্প নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য ছিল আর তাই অশোক সংকাস্যতে নিজের পাষাণস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। সেই স্তম্ভটার হদিশ পাওয়া গেল না, কিন্তু কোনো সময় তার ওপরে যে-হাতিটা শোভা পেত সেটা এখনও সেখানে আছে।

সংকিসা থেকে আবার আমি স্টেশনে ফিরে এলাম। শিকোহাবাদ হয়ে ভরবাড়ী (এলাহাবাদ)-তে নামলাম।

এবার আমার কৌশাম্বী যাবার কথা ছিল। ভরবাড়ী থেকে প্রথমে আমি পভোসা যেতে চাইছিলাম, কেননা আমার ধারণা ছিল যে, যমুনা থেকে উত্তরে কোনো ছোট পাহাড় নেই। কিন্তু লংকাতে ত্রিপিটক পড়ার সময়ে এই পাহাড়ের খোঁজ পেলাম। প্রথমে তো আমি ভাবতাম এটা ভুল কিন্তু আনন্দজী দেখে গেছেন কাজেই বিশ্বাস করতেই হলো। ভরবাড়ী থেকে আমি এক্কা চলার রাস্তা পর্যন্ত এক্কা ভাড়া করলাম। যখন এক্কা ছেড়ে দিয়ে সরাডী (?) গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, তখন একজন অতি সাদামাটা মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো, সেলাম করলেন, হাত মেলালেন আর শাহজীকে তাঁর 'গরিবখানা'য় নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন। শাহজী যদি গ্রামের ভেতরে থাকতেন তাহলে হয়তো বা সম্মত হতেন কিন্তু তিনি তো গ্রামের বাইরে চলে এসেছেন আবার সঙ্গে পথ দেখাবার জন্যে মজুরি দিয়ে দুটো ছেলেকেও নিয়ে চলেছেন। যাক গে, ওখান থেকে ছুটি নিলাম। এগিয়ে চললাম। পভোসা যে কত দূরে সে তো জানতামই না, ছেলেদুটোর মধ্যে একটা ভো-কাট্টা হয়ে গেল, আর অন্যটা দোনামোনা করছে দেখে আমি তাকে ফিরে যেতে বললাম। যতক্ষণ দিনের আলো ছিল আর মানুষজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল, ততক্ষণ আমি রাস্তা জিজ্ঞেস করে করে এগোচ্ছিলাম। নিশ্চিত হচ্ছিলাম যে দিনে দিনে আর পভোসা পৌছনো যাবে না। পথে এক-আধ জায়গায় থাকার চেষ্টা করলাম, জায়গা মিলল না। নালা অব্দি পৌছতে-পৌছতে অন্ধকার নেমে এলো। টর্চ জ্বেলে কখনো-সখনো দেখে এটুকু বুঝছিলাম যে, রাস্তা ধরে চলেছি, কিন্তু এ পথ যাবে কোনখানে তার ঠিক কি? ভালোমতো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, আমি গ্রামে পৌছনোর ব্যাপারে নিরাশ হতে শুরু করেছিলাম। এই সময়ে দেখি পাশে একটা পুকুরের পাড়। সেখানে কোনো দেবীর ভাঙাচোরা মন্দির ছিল। আমি ভাবলাম, এ রাতটা এখানেই বিশ্রাম করা যাক। কিন্তু একটু পরেই লোকেদের গলার স্বর কানে ভেসে এলো। পাশেই কিছু গাড়োয়ান বিশ্রাম করছিল। সেখানে গেলে তারা খড় দিয়ে দিল—রাতে আমি ঘুমোলাম।

সকালে দেখি গ্রাম নেহাতই কাছে আর তার চেয়েও কাছে জৈন ধর্মশালা। যমুনাতে হাত-মুখ ধুলাম, সম্ভবত স্নানও করে নিলাম। ধর্মশালায় গিয়ে কিছু তীর্থযাত্রী জৈন নরনারীর দেখা পেলাম। তাঁরা খাবার খেতে অনুরোধ করলেন। সে তো বেশ কথা, আমি আর অস্বীকার করি কেন। তাঁদের সঙ্গেই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জৈন মন্দিরে

গেলাম। মন্দিরটি নতুন। তার আঙিনাতেও পাকা মেঝে রয়েছে। মেঝেতে যেখানে-সেখানে কিছু নীল হলুদ ছোট ছোট দাগ। জৈন গৃহস্থটি আমাকে বোঝালেন, একসময় এখানে জাফরানের বৃষ্টি হতো, এখন কলিযুগের প্রতাপে ঐ হলুদ-হলুদ জিনিস আকাশ থেকে পড়ে।

পাহাড়ে কিছু জৈনমূর্তি খোদাই করা ছিল। ২০, ২১ শো বছরের পুরনো কোনো শিলালিপি ছিল যা মাত্র ক-বছর আগে পাথর ভেঙে পড়ায় নষ্ট হয়ে গেছে। আশেপাশে আরো দুটো ছোট পাহাড় ছিল। আমি দুটোই ঘুরে দেখলাম। বুদ্ধের সময়ে এখানে একটি প্রাকৃতিক জলাশয় (দেবকটসোব্‌ভ) ছিল, কিন্তু এখন তার কোনো চিহ্ন নেই। খাওয়া আর বিশ্রাম শেষে আমি হেঁটেই কোসম-এর দিকে রওনা হলাম। জৈন গৃহস্থটির নৌকা করে যাওয়া ঠিক ছিল, তাঁরা আমাকে সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু আমি পায়ে হেঁটে যাওয়াই ভালো মনে করলাম।

বুদ্ধের সময়ে কৌশাম্বী ভারতের খুব বড় নগরী ছিল। এটা বৎসদেশের রাজা উদয়নের রাজধানী ছিল। উদয়নের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন আর প্রদ্যোৎ-কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গে তাঁর প্রেম হাজার বছর ধরে কবিদের শৃঙ্গার রসের প্রেরণা যুগিয়েছিল। কৌশাম্বী শুধুমাত্র রাজধানীই ছিল না, একটি বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রও ছিল। সেই সময় নদীগুলোই স্বাভাবিক ভাবে এবং খুব সস্তায় বাণিজ্য পথের কাজ করে দিত। কৌশাম্বীতে, যেখানে মথুরা হয়ে পশ্চিমের পণ্য আসতো, সেখানে পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত রাস্তা খোলা ছিল। সম্ভবত বর্ষার সময় সামুদ্রিক জাহাজও এখান পর্যন্ত আসতো। এখান থেকে একটা রাস্তা দক্ষিণাপথে (দক্ষিণ দেশ) গেছে—এটা সেই রাস্তা যেখান দিয়ে আজকাল মাণিকপুর, জব্বলপুর যাবার রেল লাইন যাচ্ছে। কিন্তু মগধ প্রাধান্য পাবার পরে, জানা যাচ্ছে, কৌশাম্বী আর রাজধানী হবার সৌভাগ্য ফিরে পায়নি। তাও মুসলমানদের প্রারম্ভিক যুগ পর্যন্ত ছোটোখাটো বাজার নিশ্চয় ছিল। আজ অবশ্য তা জনশূন্য। যদিও পুরনো বসতির চিহ্ন মাটির কেল্লার ঢিপির মতো উঁচু দেওয়াল অনেক দূর জায়গা জুড়ে দেখতে পাওয়া যায়, এখানে-ওখানে ছোটো ছোটো গ্রামও আছে কিন্তু সবই শ্রীহীন। কেল্লার ভেতরে এখন চাষ হয়, এখনো ওখান থেকে পুরনো মুদ্রা, মাটির সুন্দর সুন্দর পুরনো খেলনা (গুজরিয়া) পাওয়া যায়। এদিক-ওদিক কিছু ভাঙাচোরা মূর্তিও আছে। যেখানে এখনো অশোক-স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, আমি সেই জায়গায় গেলাম। একসময় পাশাপাশি দুটো অশোক-স্তম্ভ ছিল। তার একটাতে অশোকের শিলালিপি ছিল, পরে সমুদ্রগুপ্তের অভিলেখ খোদাই করা হয়েছিল। এখন সেই স্তম্ভটা এলাহাবাদের কেল্লার ভেতরে আছে। শিলালিপিহীন স্তম্ভটা দেখলাম, এখন এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না।

এবার অকিলসরাই-এর রাস্তা ধরলাম। আজও অন্ধকার হবার ভয় পাচ্ছিলাম। আমি আম-বাগান থেকে তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছি এমন সময় কানে এলো, 'শাহ্ সাহেব, অস্‌সলামালেকুম্।' আমি পাশে মুখ ঘুরিয়ে দেখি একটি লোক ছাগলের জন্যে পাতা পাড়ছে, আমিও 'ওয়ালেকুমস্‌সলাম্' করলাম। আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মনের মধ্যে ভাবনা এলো, এক সপ্তাহের মধ্যে তিন জায়গায় লোকেরা আমাকে শাহ সাহেব বলে

ঠাওরালো কেন। আমি তো এমন কিছু বুঝছিলাম না, তবে মনে হচ্ছে, নির্ঘাৎ আমার বেশবাসে তেমন কিছু ছিল।

অকিলসরাইতে বাজারের ভেতর একটা বাঁধানো কুয়ো ছিল আর পাশেই মন্দির। আমি মন্দিরের বারান্দায় ঠাঁই পাতলাম। আমার কাছে পয়সা ছিল কাজেই কারো দয়া-দাক্ষিণ্যের দরকার ছিল না। দুদিন ধরে হেঁটেই চলেছি। সেজন্যে ক্লান্তি তো হবেই—আমি শুয়ে ছিলাম। যখন ঠাকুরের আরতি হচ্ছিল তখন সম্ভবত উঠে বসেছিলাম তো নিশ্চয়, কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে আমার দেনা-পাওনার কি ছিল যে হাত জোড় করতে হবে? ভক্তদের খারাপ লাগল। যাকগে, রাতটা কাটানো দরকার ছিল, সেটা কোনোমতে কাটালাম।

পরের দিন লরিতে চড়ে মনোরী এলাম, ফের ট্রেনে করে এলাহাবাদ। সারনাথে গেলাম আর বেনারস তো গেলাম বিশেষ করে অভিধর্মকোষ প্রকাশ করতে আর যদি কিছু খাকা পাওয়া যায়, সেই ভাবনায়। এক প্রকাশন তো প্রথমে এটা জানতে চাইলো যে, আদৌ এই বই কোনো কাজের কিনা। যখন বুঝলো যে এটা গুরুত্বপূর্ণ বই, তখন ছাপার পরে দশ-পনেরোটা কপি আমাকে দেবে বললো। প্রকাশক বলছিলেন, 'আমি তো এইভাবেই বই ছাপি'। যাকগে, বিদ্যাপীঠে আচার্য নরেন্দ্রদেবের সঙ্গে কথা হলো। বিদ্যাপীঠ ঐ বইটা ছাপতে রাজি হলো আর আমিও কিছু টাকা পেলাম। সম্ভবত এই ব্যবস্থা করতে আমাকে দ্বিতীয় বার বেনারস আসতে হয়েছিল।

ছাপরা তো আমার নিজেব বাড়ির মতো, সেখানে যাওয়ার দরকার ছিল। পাটনাতে বইগুলো এসে গিয়েছিল। আমি পণ্ডিত জয়চন্দ্রজীকে নিয়ে জয়সওয়ালজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁব সঙ্গে আমাব প্রথমবার দেখা হয়েছিল ১৯২৫ সালে, বুদ্ধগয়া মন্দির অনুসন্ধান কমিটির তিনিও ছিলেন একজন মেম্বাব, আর আমিও। তাই কমিটির রিপোর্ট লেখার সময়ে আমাদেব একত্রিত হতে হতো। কিন্তু সম্ভবত তাঁব সেসব কথা মনেও ছিল না। জয়চন্দ্রজী আমার সম্পর্কে কিছু বলে রেখেছিলেন তাই এবার বৌদ্ধসাহিত্য বিষয়ে একটু বেশি কথাবার্তা হলো। বুদ্ধগয়া, কসয়া (কুশীনগর), লুম্মিনদেঈ আর সহেট-মহেট (জেতবন-শ্রাবস্তী) আবার ঘুরলাম। ১০ বছর আগে আমি একজন বুদ্ধভক্ত আর্যসমাজী হিসেবে এসব বৌদ্ধতীর্থে গিয়েছিলাম—এবার আমি একজন বৌদ্ধ রূপে গেলাম। সে-সময় আমাব ধারণা ছিল না যে, বৌদ্ধসাহিত্যে এই জায়গাগুলোব কতখানি গুরুত্ব রয়েছে, আর সেখানে এদের সম্বন্ধে কি লেখা আছে। এখন আমি ত্রিপিটকাচার্য ছিলাম। নানা বই থেকে এইসব জায়গা সম্পর্কে উপাদান একত্রিত করেছিলাম। পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টগুলো ভালো করে দেখেছিলাম। অবশ্যই এইবার এসব জায়গাগুলো দেখতে বেশি ভালো লাগছিল।

সহেট-মহেট থেকে বলরামপুর এসে আমি ট্রেন ধরলাম, মাঝরাস্তায় নৌকোয় গণ্ডক পার হয়ে আবার ট্রেনে নরকটিয়াগঞ্জ স্টেশন পৌঁছলাম। শুনলাম শিবরাত্রির মেলা বসতে এখনো কিছু দিন দেরি আছে। রক্সৌল কিংবা বীরগঞ্জে পৌঁছে থাকার জায়গার ব্যাপারে মনে পড়ল কাছেই শিকারপুরে বিপিন বাবুর (বিপিনবিহারী বর্মা) বাড়ি। আমরা অসহযোগের সময়ে কংগ্রেসের সহকর্মী ছিলাম, সুতরাং যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

বাড়ি গিয়ে শুনলাম, তিনি মোতিহারীতে আছেন। কিন্তু তাঁর বড়দা আর ছোটভাই বিভূতিবাবুও একই রকম অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিলেন। বড়ভাইয়ের সঙ্গে আমি রামপুরবা (পিপরিয়া)-র দুটো অশোকস্তম্ভ দেখে ভিখনাঠোড়ী পর্যন্ত গেলামও। ভিখনাঠোড়ী নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত, সেখান থেকেও একটা রাস্তা নেপাল গেছে। কিন্তু আমাকে শিবরাত্রির মেলা সোজা রাস্তা ধরে যেতে হতো। আমি ওখানকার থারুদের গ্রাম দেখলাম, তাদের ওপর একটা ছোটো প্রবন্ধও লিখেছিলাম। থারুদেব চোখে হালকা মঙ্গোলীয় ছাপ আছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, চিতবনিয়া থারুদের ভাষার সঙ্গে আশেপাশের ভাষার চেয়ে মাগধীর মিল বেশি। গঙ্গা পেরিয়ে এসে হিমালয়ের তরাইতে মাগধী কি করে এসে পৌছে গেল?

রক্সৌল পৌছে দেখলাম যে, এখন সেখান থেকে একটা ছোট রেল বীরগঞ্জ পর্যন্তই নয়—আরো আগে অমলেখগঞ্জ পর্যন্ত যায়। আবার সেখান থেকেও ভীমফেরী পর্যন্ত লরি চলে। আগে নেপালেব পথকর (আজ্ঞাপত্র)-এর ব্যাপারে কিছু ঝামেলা হতো, কিন্তু এখন তো শিবরাত্রির যাত্রীদের ওই স্টেশনেই নামিয়ে দেওয়া হয়। আরো দু-একজন বন্ধুর জন্যে আমাব অপেক্ষা করার কথা ছিল, কেননা তাঁবাও শিববাত্রিতে নেপাল যেতে চেয়েছিলেন। তাঁবা বীরগঞ্জে এলেন কিন্তু আবো এগোবার জন্যে নয়। আমি অন্ততপক্ষে তিনটি বছর তিব্বতে থাকার সংকল্প করেছিলাম, তাই আমাব দীর্ঘযাত্রাব জন্য তাঁদেব কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

অমলেখগঞ্জেব জন্য ট্রেন ধবলাম। সেখান থেকে মালবহনকাবী খোলা লবি পাওয়া গেল। ফের পায়ে হেঁটে সীসাগড়ী (চীসপানী) আব চন্দাগড়ীব পাহাড পাব হলাম এবং নেপালে পৌছে গেলাম। নেপালে থাপাথলীর বৈরাগী মঠে উঠলাম। পশুপতি আব গুহ্যেশ্বরীকে দর্শন কবলাম—তবে তাঁদেব দর্শন করতে তো আব আমি ওখানে যাইনি।

মহাবৌধা বৌদ্ধদেব একটি বড তীর্থ। প্রথমবাবেব যাত্রায় ওখানকাব চৈনিক লামাব সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। সেখানে গিয়ে জানলাম চৈনিক লামা মাবা গেছেন, এখন তাঁর দুই ছেলে আছে। তবে এটা দেখে খুব আনন্দ পেলাম যে, একজন খুবই প্রভাবশালী লামা—ডুকপা লামা, নিজেব ৩০, ৪০ জন শিষ্য-শিষ্যাব সঙ্গে এখন এইখানেই আছেন।

নেপালে অজ্ঞাতবাস

লাদাখে আমার অনেক পরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হেমিস লামা শুধু যে ওখানকার সবচেয়ে বড় মঠ-প্রধান ছিলেন তাই নয়, উপরন্তু তিনিও সেই ডুক্‌পা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতেন যেখান থেকে আমাদের এই ডুক্‌পা লামা এসেছেন। আমার কাছে

—১৯২৯—

হেমিসলামার দেওয়া একটা খুব ভালো পরিচয়পত্র আর দু-তিনটে চিঠি ছিল। যদিও আমি বই থেকে অনেক তিব্বতী শব্দ শিখে ফেলেছিলাম, তবু এখনো পর্যন্ত বলার অভ্যেস গড়ে ওঠেনি। যখন আমি ডুক্‌পা লামার শিষ্যদের সঙ্গে কথা চালাবার চেষ্টা করছিলাম, তখন লাছলের দুই যুবক—রিন্‌-ছেন্‌ আর তার সঙ্গী জুটে গেল। দুজনেই হিন্দি জানতেন। রিন্‌-ছেন্‌কে সঙ্গে নিয়ে আমি ডুক্‌পা লামার সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে লাদাখের চিঠিগুলো দেখালাম, আর বললাম, 'আমি সিংহলে থেকে ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেছি। তবে বৌদ্ধধর্মের সমস্ত বই তো সিংহলে পাওয়া যায় না, তাই সেগুলো পড়ার জন্যে তিব্বত যেতে চাইছি। ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করতে চাই, আপনি আমার এই পুণ্যকার্যে সহায়তা করুন।' ডুক্‌পা লামা খুব খুশি প্রকাশ করে বললেন, 'আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন—আমরা এখানে আরো কয়েকটা দিন আছি, তারপর আমরাই তিব্বতের দিকে যাব, তখন আমাদের সঙ্গে সহজেই যেতে পারেন।' আমার বড় আনন্দ হলো, ভাবলাম, এবার কেল্লা ফতে।

থাপাথলী থেকে নিজের জিনিস নিয়ে চলে আসা একটু ঝামেলার ব্যাপার ছিল, কেননা মোহান্তজী জিজ্ঞেস করে বসলে কি জবাব দিতাম যে, আমি কোথায় চলেছি। কিন্তু ওখান থেকে বেরোবারই ছিল। জিনিসপত্রও খুব বেশি ছিল না। একদিন খুব ভোরে আমি নিজের জিনিস নিয়ে ডুক্‌পা লামাব কাছে চলে এলাম। রিন্‌-ছেন্‌কে আমি বলে দিয়েছিলাম যে, শিবরাত্রির পর যদি নেপাল সরকার জেনে ফেলে তাহলে আমাকে সটান বীরগঞ্জ ফেরত পাঠিয়ে দেবে। তাই আমাকে খুব লুকিয়ে-চুরিয়ে থাকতে হবে।

মহাবৌধা একটি বিশাল স্তূপ। তার চারপাশে একতলা, দোতলা সব বাড়ি। বাড়িগুলোর নিচের তলা দোকানের জন্যে আর ওপরের কোঠা-ঘরগুলোতে তিব্বতী এবং অন্য বৌদ্ধযাত্রীরা থাকেন, বাড়িওলাও থাকেন। রিন্‌-ছেন্‌ আমাকে প্রথমে এক নেপালীর বাড়ির কোঠাঘরে রেখেছিলেন কিন্তু আমার ভয় হচ্ছিল যে, এখানে কেউ চিনে না ফেলে। আমি নিজের জন্যে ভোটিয়াদের একটা পুরনো চোগা (ছুপা) আর লম্বা জুতো কিনে ফেললাম। আমি রিন্‌-ছেন্‌কে যখন আমার ভয়ের কথা বললাম, তখন তিনি যেখানে লামার শিষ্য-শিষ্যারা থাকতেন সেই বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। যদিও আমি এখন ভোটিয়া কাপড়ে ছিলাম, দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিয়েছিলাম, আর নাওয়া-ধোওয়া ছেড়ে দিয়ে হাতে আর মুখে ময়লা জমাতে শুরু করে দিয়েছিলাম, তাও আমার ভয় করতো এই বুঝি কেউ চিনে ফেলল যে, এ সমতলের লোক। চামচিকের মতো দিনের বেলায় আমি ঘরের বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করতাম না। রাত্তিরবেলা ভোটিয়া বেশে স্তূপটি পরিক্রমা করে আসতাম। প্রায় একমাসের ওপর আমাকে এই ধরনের জীবন কাটাতে হয়েছিল।

ডুক্‌পা লামা গভীর সিদ্ধ, তিনি চব্বিশ ঘণ্টাই সমাধিস্থ থাকেন—তাঁর এ ধরনের খ্যাতি নেপাল-উপত্যকার সমস্ত বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল। হপ্তাখানেক ধরে আমিও এ-রকমই ভাবতাম। রাতে-দিনে যখনি দেখো আসনের ভঙ্গিতে বসে আছেন। কখনো তাঁর চোখ খোলা থাকতো, লোকের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতেন, আর কখনো-বা চোখ বন্ধ থাকতো।

কখনো দুপুরবেলা পূজা-ভাণ্ড আনিয়ে নিয়ে পুজো শুরু করে দিতেন, কখনো-বা মাঝরাত্তিরে। নেপালের বৌদ্ধ গৃহস্থরা প্রায়ই উপহার নিয়ে তাঁর কাছে আসতেন। বাঁচোয়া যে, আমাকে পাশের ঘরে রাখা হয়েছিল, যেখানে অন্য কেউ আসত না।

'বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি অতি পূজনীয় পুঁথি। ডুক্‌পা লামার কাছে ঐ পুরো পুঁথিটাই কাঠের ওপর উল্টো অক্ষরে খোদাই করা আছে। লামার শিষ্য-শিষ্যারা তাতে কালি মাখিয়ে হাতে তৈরি কাগজে সারাদিন ধরে ঐ বই ছাপত। লামা বইটি প্রসাদ রূপে বণ্টন করতেন। সারাদিন ধরে শিষ্য-শিষ্যারা স্তূপের কাছে গিয়ে ছাপার কাজ করতো আর ওদের ঘরে আমি একা-একা বসে থাকতাম। আমার কাছে ইংরেজির মাধ্যমে তিব্বতী শেখার বই ছিল, আমি সেটা পড়তাম।

কিছুদিন পরেই ডুক্‌পা লামার বোন, ভাগ্নী আর ৬, ৭ বছরের ভাগ্নে তিন-জিন-এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। কিন্তু এখন আমি খুব অল্প শব্দ বলতে-বুঝতে পারতাম। আমরা মাঝের তলায় থাকতাম। সবচেয়ে ওপরের তলায় মৃত চৈনিক লামার সুন্দরী মেয়ে থাকতো। সে ছিল অবিবাহিতা, আর তার পাণিপ্রার্থী ছিল অনেক। একদিন আমি নিজের ঘরে চুপচাপ বসেছিলাম, এমন সময় একটি নেপালী তরুণ ঘরে ঢুকে পড়ল আর পাশের আসনে এসে বসল। সে আমার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু কবে দিল। আমার খুব ভয় কবতে লাগল। ওকে যে কি উত্তর দিয়েছিলাম মনে নেই। আমি তো ভাবছিলাম, এবার বুঝি হাটে হাঁড়ি ভাঙল আর সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হলো। কিন্তু পরে বুঝলাম, ও সেই তরুণীটির সঙ্গে মিলনের অপেক্ষায ওখানে বসে আছে। বোধহয়, তরুণীটির কাছে তখন কোনো প্রেমিক ছিল। পরে দেখি তরুণটিও আমার সম্পর্কে জেনে গিয়েছিল। আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে যত চিন্তা করতাম, আমার ভোটিযা সঙ্গীদের তার শতাংশও চিন্তা ছিল না। নেপালে আসা ও থাকার ব্যাপারে ভোটিয়াদেব যেমন কোনো ঝক্কি পোযাতে হতো না, ওরা আমার সম্বন্ধেও সেরকম ভাবতো। ডুক্‌পা লামা আর তাঁর শিষ্যরা যে কতজনকে আমার সম্বন্ধে বলেছেন, কে জানে। একদিন তেতলার তরুণীটি আমার ঘরে এলো। সাবান তো দূরে থাক, জল দিয়েও হাত-মুখ না ধোবাব পণ আমি কবেছিলাম। তবু আমি দু-একটা সাবান নিজের কাছে বেখেছিলাম। তরুণীটি এসে সাবান হাতে তুলে নিয়ে, 'আমি এটা দেখব'—এই বলে চলে গেল। আমি যখন ওপরে সাবান ফেরত আনতে গেলাম, তখন সে অত্যন্ত নগ্ন ভাষায় আমাকে আকৃষ্ট কবতে চাইল। কিন্তু ওখানে আমার অন্য আকর্ষণ ছিল, যার জন্যে আমি নিজেকে বিপদে ফেলেছিলাম। আমি ওখান থেকে চুপি চুপি নিচে চলে এলাম। ওর দরবার খোলা ছিল, তাই পুরুষ মানুষের থোড়াই অভাব ছিল যে ও আমার পিছনে পড়ে থাকবে।

ডুক্‌পা লামার বোন আর নব তরুণী ভাগ্নীর মাথার চুল দু-আঙুল লম্বা ছিল। আমি ভাবতাম যে, এরাও বুঝি ভিক্ষুণী। কিন্তু পরে জানলাম যে, ডুগ-যুল (ভুটান)-এ এটাই সাধারণ রেওয়াজ যে মেয়েরা চুল কেটে বাখে। ওরা রান্না করে আমাকে খাওয়াতো, ছোটো বাচ্চা তিন-জিনকে খুব তাড়াতাড়ি আমার বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলাম। সেটা আমার খুব প্রয়োজন ছিল। কেননা আমি বুঝেছিলাম, বইয়ের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি ও

আমাকে ভোটিয়া-ভাষা শেখাতে পারবে। তখন অবশ্য ও আমার সারা দিনের বন্ধু হয়ে ওঠেনি, সে-সময় আরো পরে আসবে।

লামার শিষ্য-শিষ্যারা ছাপার কাজ শেষ করে সন্ধের সময়ে যখন ফিরে আসতো, তখন তারা দুটো ঘরে শুতো। ওখানে শোয়া-ঘুমোনোর ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষে কোনো ভেদ ছিল না। গর্ভসঞ্চার না হলে কেউ কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতো না। শিষ্যাদের মধ্যে কিছু তিব্বত এলাকার ছিল, কিছু নেপালের। যদিও দুটাই ভোটিয়া জাতি, তবু নেপালীরা দেখতে অতটা কুদর্শনা ছিল না। ওরা নিজেদের মধ্যে কি ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, একজনের সঙ্গে আরেক জনের সম্পর্ক কি, সেসব জানার তালে আমি থাকতাম না। সারাদিন আমি বই থেকে পড়া মুখস্ত করতাম, কখনো-কখনো তিন-জিন আর তার মা-বোনের সঙ্গে বাক্যালাপ করতাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত আটটা-নটার সময়ে যখন লোকে শুতে আসতো, প্রায়দিনই আমি ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমার প্রতিবেশি টশী-ল্হুন্-পো-এর পাশে যে থাকতো, সে ছিল মধ্য তিব্বতের, তাই আমি সুযোগ পেলেই তার সঙ্গে কথা বলে নিজের ভাষাটা ঠিক করতে চেষ্টা করতাম। ওখানে মাস খানেক থাকতে-থাকতে ভাষা বোঝার ব্যাপারে যে অত তাড়াতাড়ি আমি উন্নতি করেছিলাম, তাতে এই বার্তালাপ যথেষ্ট সহায়ক ছিল।

তিব্বতের লোক এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা বিশেষভাবে নিজের কাছে একটা কৌটোয় একটি দেবতার মূর্তি রাখে। দেবতার মূর্তি ধাতুরও হতে পারে, আবার কাঠ বা কাপড়ের ওপর আঁকা ছবিও হতে পারে। সাধারণত কৌটোর চেহারা খিলানযুক্ত দরজার মতো দেখতে হয়, যার এক পিঠে কাঁচ লাগানো থাকে। আমার প্রতিবেশিণী ভিক্ষুণীর কাছে আমি তার মূর্তিটা দেখতে চাইলাম। সেটা একটা 'যুগনদ্ধ' (য়ব্-য়ুম্) বজ্রসত্বের মূর্তি ছিল। রতিক্রিয়া-রত দেব-দেবীর মূর্তিকে যুগনদ্ধ বলে।

ফাল্গুন পেরিয়ে গেল। এখন চৈত্রের গরম শুরু হয়েছিল। আমি রোজ জিজ্ঞেস করতাম, এখান থেকে কবে রওনা হতে হবে। রোজই বলতেন এই কাল-পরশু, কিন্তু ওখান থেকে যাওয়ার নামটি পর্যন্ত করতেন না। অবশেষে একদিন জানলাম যে, রিন্‌পো-ছে (রত্ন) এবার কিন্দোল বিহার যাবেন। বড়ো বড়ো মোহান্তদের আর অবতারী মোহান্তদের তিব্বতে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে রিন্‌পো-ছে বলা হয়। এতে আমার ভয় হতো এই কারণে যে, লামা কোনো কোনো ভক্ত গৃহস্থের কাছে কাশীর পণ্ডিতের কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন, ফলে কিছু লোক আমার কাছেও আসতে শুরু করেছিল।

নেপালের বৌদ্ধ গৃহস্থদের মধ্যে ধর্মা সাহু ছিলেন একজন বড় ভক্ত এবং প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থ। তাঁকে কেউ আমার কথা বলে দিয়েছিল। তিনি সারাদিনই পূজা-পাঠ নিয়ে থাকতেন। বাড়ি থেকে বাইরে বেরোতেন না। তিনি একজনকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন আমি যেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে দু-একদিন থেকে আসি। লামা আর তাঁর শিষ্যমণ্ডলী কিন্দোল বিহারে গেলেন আর রিন্-ছেন্ আমাকে কাঠমাণ্ডুতে ধর্মা সাহুর বাড়ির দিকে নিয়ে চললেন। কাঠমাণ্ডুর মাঝখানে আসনটোলে ছিল তাঁর বাড়ি। আমরা সন্ধের দিকে যাত্রা করেছিলাম। আমার মুখে এক মাসের বেড়ে ওঠা দাড়ি, গায়ে তিব্বতীদের লাল চোগা আর পায়ে তিব্বতী জুতো ছিল। পথে চলার সময় যে-সব লোক আমার দিকে

তাকাচ্ছিল, তাদের প্রত্যেককে আমার সন্দেহ হচ্ছিল। মহাবৌধা থেকে ধর্মা সাহুর বাড়ি এক-দেড় মাইল ছিল। আর কিছু না, শুধু জুতোটা আমার পা কেটে দিয়েছিল।

ধর্মা সাহু তাঁর বাড়ির সবচেয়ে উঁচু চারতলায় আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর স্বভাব বড়ই মধুর আর সাদাসিধে ছিল। আমার সঙ্গে আলাপ করে তিনি খুব খুশি হলেন আর তিব্বত সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছু বলে দিলেন। লাসাতে তাঁর কোঠী (দোকান) কয়েকশো বছরের পুরনো ছিল। যখন তাঁর বাবা মারা যান আর কয়েক লাখ টাকার দেনা রেখে যান, তখন তাঁর খুবই অল্প বয়স। তিনি তিব্বতের ব্যবসাতে লেগে গেলেন। কিছু দিনের মধ্যেই শুধু যে দেনা শোধ করলেন তাই-ই নয়, উপরন্তু লক্ষাধিক টাকা উপায়ও করলেন। সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে তিনি নিজের বাড়িতেই থাকতেন। তিব্বত যাবার পরে আমি দেখেছিলাম যে, ওখানকার বড় বড লামারা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে ধর্মা সাহুর নামের উল্লেখ করেন, তিনি একদিন একটা বিশেষ ধরনের খাবার তৈরি করালেন আর বললেন যে, 'তিব্বতে আপনি এই ধরনের খাবার পাবেন।' সেটা ছিল হাঁসের ডিম আব আটার তৈরি নোনতা-সেমুই। নেপালীরা মুরগীব ডিম খায়না কিন্তু হাঁসের ডিমে তাদের আপত্তি নেই।

দু-একদিন পরে আমিও কিন্দোল বিহারে চলে গেলাম। কাঠমাণ্ডুর বাইরে মাইলখানেক দূবে স্বয়ম্ভূ মহাস্তূপের কাছে কিন্দোল বিহার। এই বিহারটি সম্ভবত পুরনো, কিন্তু বাড়িগুলো বেশির ভাগই ছিল নতুন। এখানেও লামার পাশের কুঠরীতে আমাকে ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখানে আমাকে দর্শকমণ্ডলীর সামনেই থাকতে হয়েছিল। আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আব সেটা বেড়ে গেল যখন শুনলাম লামার সঙ্গে দেখা করতে ভারতবর্ষের এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন। লামা তাঁকে আমার কথা বলেছেন আর তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে খুবই উৎসুক।

দসরতন সাহু ওখানে সবকিছুর ব্যবস্থা করতেন। আমি তাঁকে আমার অসুবিধের কথা জানিয়ে বললাম, 'এই ভিড় থেকে সরিয়ে আমাকে কোনো নির্জন জায়গায় নিয়ে চলো।' তিনি কিন্দোল থেকে একটু দূরে একটা বাগানওলা বাডিতে নিয়ে গেলেন। এই বাড়িটা একেবারে আলাদা ছিল আর অনেক দিন যাবৎ তাতে কেউ থাকতো না। এখন আমি এর কোঠাঘরে থাকতাম এবং দসরতন সাহু বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতেন। সকাল সন্ধেয় অন্ধকারের মধ্যেই শুধু শৌচাদির জন্যে বাইরে বেরোতাম, নাহলে দিবারাত্রির জন্য এ ছিল আমার স্বেচ্ছাকৃত বন্দী-নিঃসঙ্গতা।

যদিও আমার কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু নেপাল সরকার সে-ঝুঁকি নিতে তৈরি থাকবে কেন? অনেকদিন আগে যখন নেপাল অনেক বেশি স্বাধীন ছিল, তখন ইংরেজ গুপ্তচরদের গোপনীয়তা জেনে ফেলার আর ইংরেজদের অন্যায়ভাবে নেপাল অধিকার করার ভয় ছিল। সেই সময় থেকেই নিচের লোকেদের সম্পর্কে কড়াকড়ি শুরু হয়েছিল। এখন তো নেপালের প্রতিটি আঙুল ইংরেজের জানা। নেপাল তার মুঠোব মধ্যে। বন্ধ মুঠোর মধ্যে সে যত ইচ্ছে ঘোরাফেরা করুক না কেন। তাও নিচের লোকের প্রতি ওপরের লোক সেই কঠোর মনোযোগ বজায় রেখেছে। আমার ব্যাপারে জানাজানি

হলে, আমাকে নিশ্চিতভাবে বিফল মনোরথ হয়ে নিচে চলে যেতে হতো। দসরতন সাহু খুব ধর্মভক্ত ছিলেন, সেই সঙ্গে আমার অসুবিধের প্রতিও তার মনোযোগ ছিল। সে কাউকে আমার কাছে আসতে দিত না।

এই বাড়িতে থাকাও ১৫, ২০ দিন হয়ে গিয়েছিল, তবু লামা এখনো যাবার নামটি করছিলেন না। লামা যে সর্বজ্ঞ সে-বিশ্বাস আমার কোনোকালেই হয়নি কিন্তু হপ্তাখানেক তাঁর মদ খেয়ে বসে বসে ঘুমোনোটাকে আমি সমাধি বলে ভাবতাম। এখন আমি বুঝে ফেলেছিলাম যতদিন পুজো ইত্যাদি যথেষ্ট হবে, ততদিন লামা যাবার নামটি করবেন না। বাগমতীর একদিকে কাঠমাণ্ডু, আরেক দিকে ললিতপট্টন দুটোই বেশ বড় শহর, এখানে অনেক বৌদ্ধ আছেন। পুজো-উপহার দেওয়া তো সম্ভবত আষাঢ় পর্যন্তও শেষ হবে না। আমি শুনেছিলাম এখান থেকে লামা সীমান্ত এলাকার এল্‌মো গ্রামে যাবেন। আমি দসরতন সাহুকে বললাম, 'আমাকে এল্‌মো পৌঁছে দাও।' কাঠমাণ্ডু থেকে ৪, ৫ দিনেব রাস্তায় চলে গেলে বিপদ একটু কম। তিনি তা শুনে একমত হলেন।

আমার দেশের ঢঙে কাপড় পরে চলার কথা তো ভাবতেই পারতাম না। লম্বা শরীর আর মুখ ভোটিয়া কাপড়ে ঢেকে লুকিয়ে পড়াতে আমার বিশ্বাস খুব কম ছিল। তাই আমি নেপালী পাজামা ফতুয়া আর ঝুঁটিওলা কালো টুপি পরলাম। চোখ যাতে দেখা না যায় সেজন্যে কালো চশমাও নিলাম। একদিন সকালবেলা আমবা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। দসবতন সাহু কাপড়ের তৈরি একজোড়া নতুন বুট এনে দিয়েছিলেন। এক-দেড় মাইল চলতে না চলতেই সে-বুট পা কেটে খেতে লাগল। এখন চলা খুবই কঠিন হয়ে পড়ল কিন্তু চলা ছাড়া তো গত্যন্তরও ছিল না। আমরা সুন্দরী-জলের দিকে গেলাম, যেখান থেকে একটা পাইপ কাঠমাণ্ডুতে আসতো। এখানে আমি ফুল কয়লার আঁচে ইঁট পোড়াতে দেখলাম। বছর ছয়েক আগেও লোকে এই কয়লাকে প্রাকৃতিক খনিজ বলে ভাবতো। আমি যখন একটা টুকবো কুড়িয়ে আগুনে জ্বালিয়ে একজন রাজবংশী তরুণকে দেখিয়েছিলাম, তখন সে অবাক হয়ে গেয়েছিল। প্রকৃতি নেপালকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়েছে কিন্তু সেখানকার শাসন-ব্যবস্থা তাকে এমন বানিয়ে রেখেছে যে, সে ধরিত্রীর দেওয়া সম্পদের এক শতাংশও সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হবে কিনা, তাতে সন্দেহ আছে। কারখানা ব্যবসা বাড়াবার দিকে নেপালের প্রভুদের আদপেই নজর নেই, আর এটা নিঃসন্দেহে তাদের বিপদ ডেকে আনবে। তবে সব চাইতে বড় বিপদের ক্ষেত্র হলো ভারতবর্ষ। এজন্যে না যে, স্বাধীন ভারত নেপাল জয় করে তাকে নিজের মধ্যে টেনে নেবে। বরঞ্চ ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রভাব নেপালের ওপর পড়বেই, তাকে ঠেকানো যাবে না।

সুন্দরী-জলের পাশ দিয়ে আমরা পাহাড়ে চড়তে শুরু করলাম। এখন থেকে বরাবর পাহাড় পেরিয়েই চলতে হবে। জুতো তো পায়ে কেটে বসে যাচ্ছিলই, তার ওপরে এতদিন ধরে ঘবে বন্দী ছিলাম তাই পাগুলো হাঁটতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। আমি শুধুমাত্র মনোবলের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে চলেছিলাম, কিন্তু সে-বলও যে কোনো সময় জবাব দিতে পারতো। এই সময় একজন বেশ শক্ত-সমর্থ এবং পাহাড়ীদের পক্ষে বেশ দশাসই

চেহারার লোককে আসতে দেখা গেল। দসরতন আমার অসুবিধে বুঝতে পারছিলেন। তিনি সেই লোকটার সঙ্গে অসুস্থ সঙ্গীকে বয়ে নিয়ে যাবার মজুরি নিয়ে কথা বললেন। সম্ভবত লোকটা দ্বিগুণ মজুরি চাইছিল। আমি আমার সাথীকে কানে কানে বললাম, 'দর কষাকষি কোর না, যা চায় তাতেই রাজি হয়ে যাও।' লোকটিকে ভাড়া করা হলো। সেদিন তো ওকে পাওয়া গেয়েছিল বিকেলের দিকে, তাই খানিকটা দূর যেতেই সন্ধে হয়ে গেল আর আমরা একটা গ্রামে থেকে গেলাম।

যদিও আমরা পাহাড়ের পিঠ দিয়েই বেশিরভাগ চলেছিলাম, আর সেটা পাকদণ্ডী ধরে কিন্তু চড়াইগুলোতে আমি অপরের পিঠে চড়ে যাচ্ছিলাম বলে যাত্রাটা কষ্টদায়ক মনে হতো না। কাঠমাণ্ডু ছাড়ার চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে আমরা এল্‌মো গ্রামে পৌঁছলাম। পৃথিবীর সব জায়গাতেই, যেখানে হিমালয়ের মতো বড় পাহাড় আছে—সেখানে তার পার্বত্য উপত্যকাগুলোতে বিভিন্ন জাতি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে পারে। নেপালেও গোরখা, নেবার, থারু, তমংগ, গুরংগ, এল্‌মো, শরবা ইত্যাদি আরো কত জাতি আছে। মনে হয়, যেমন পাহাডের দেওয়াল জলের ধারাগুলোকে একে অপবের সঙ্গে মিলতে বাধা দেয়, তেমনি জাতিগুলোকেও মিশে গিয়ে একটি জাতি হয়ে উঠতে দেয় না। আমি গোরখা, নেবার, তমংগ ইত্যাদি জাতিদের বসতি পার হয়ে এখন ভোটিয়া ভাষাভাষী এল্‌মোদের গ্রামে পৌঁছলাম। নেপালে নেবারই বেশ বাণিজ্য-নিপুণ জাতি। তাবা বেশিরভাগ বৌদ্ধ। দেড়শো বছর আগে তারাই নেপালের শাসক ছিল। তারপর রাজা পৃথ্বীনারায়ণ সমগ্র নেপাল জয় করে গোরখা-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন। আজও নেপালের রাজসিংহাসনে পৃথ্বীনারায়ণের বংশধর বসে। কিন্তু একশো বছব আগে রাণা জংবাহাদুর পুরনো মন্ত্রী এবং অফিসারদের হত্যা করেন। জং বাহাদুর স্বয়ং সিংহাসনে বসতে চাইলেন না আর এখনো পর্যন্ত গদির মালিক পাঁচ সরকার পৃথ্বী নারায়ণের বংশধররাই হয়। কিন্তু তাঁকে জংবাহাদুরের বংশেব লোকেদের কাছে পেনসন প্রাপ্ত এক ধরনের বন্দী বলা যায়। রাজ্যের সমস্ত শক্তি এবং পুরো ধনসম্পদ, জংবাহাদুরের রাণা-বংশের হাতে চলে এলো। জং বাহাদুরের এই কাজে তাঁর ভাইরাও সাহায্য করেছিল, তাই তিনি প্রধান মন্ত্রীর (তিন সরকার) পদ স্বীকার করে সেটাকে শুধু নিজের পুত্র-পৌত্রের জন্যেই সুরক্ষিত রাখেন নি। জং বাহাদুর মারা যাবার পরে জ্যেষ্ঠতম অনুসারে ভাই-ভাইপোদের পালা এলো। অনবরত একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকলো, যে-ষড়যন্ত্রে জংবাহাদুরের নিজের পুত্র-পৌত্র উড়ে গেল। নেপালের এই শাসন-ব্যবস্থা প্রজাদের দরিদ্র বানানোতে আরো বেশি কাজ করেছে। কেননা সাধারণ লোকেদের শুধু যে নিজেদের উপায় করা টাকা থেকে দশ-পাঁচটা লোকের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তাই-ই নয়। উপরন্তু রাণা-বংশের ক্রমবর্ধমান কয়েকশো ছোটোবড়ো রাণা আর তাদের রাণীদের বিলাস-ব্যসনেরও ব্যবস্থা করতে হয়।

নেবারদের রাজ্য যখন গোরখা-বংশ ছিনিয়ে নিল, তখন সমস্ত শাসক-জাতির মতোই সুখী জীবন যাপনের জন্য বাণিজ্য ছাড়া তাদেরও গত্যন্তর রইল না। নেবাররা যে অধিকাংশই ব্যবসায়ী, এটাও তাঁর একটা কারণ। নেপালের পাহাড়ে, দূরে-দূরে, একান্ত

দুর্গম জায়গাতেও একটা না একটা নেবারের দোকান অবশ্যই থাকবে। এরা অধিকাংশই বৌদ্ধ, তাই সীমান্তবর্তী জাতিদের সঙ্গে মেলামেশায় কোনো সংকীর্ণতা অবলম্বন করে না। আমরাও পথে রাত্তিববেলা বেশির ভাগ নেবারদের বাড়িতেই বিশ্রাম করেছিলাম।

এল্‌মো গ্রাম খানিকটা দূরে, এখন থেকেই দেবদারু গাছগুলোর অনুপম সবুজের সৌন্দর্য দেখা যেতে লাগল। কাঠমাণ্ডুর গরম এখানে এখন ছিল না। তার ওপরে এই স্বর্গীয় সবুজের সুষমা আমাদের চোখে তার কোমল মধুর স্পর্শ বুলিয়ে আপ্লুত করে দিচ্ছিল। আমার খুব আনন্দ হলো। শুধু যে এই সুন্দর দৃশ্য দেখে তাই-ই নয়, রাজধানী থেকে এখন আমি অনেক দূরে চলে এসেছি, এই ভেবেও। দসরতন সাহু তাঁর এক পরিচিত বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গেলেন। এল্‌মোরা শুধু সুন্দর ভূ-খণ্ডেই থাকে না, তারা দেখতেও যথেষ্ট ভালো, বিশেষ করে স্ত্রীলোকেরা তো আরোই। যদিও তারা মোঙ্গল-ভোটিয়া জাতিভুক্ত, যার স্পষ্ট চিহ্ন তাদের চোখ আর গালে দেখা যায়। কিন্তু হিন্দুদেব রক্তের সংমিশ্রণটাও এমন উপযুক্ত মাত্রায় হয়েছে যে, ওদের মুখ অত ভারিও নয়, অত চ্যাপটাও নয়। চোখদুটোও অনেকখানিই খোলা থাকে, আর গোলাপী বঙেব ব্যাপারে কি বলবো? এল্‌মো যুবতীদের কাঠমাণ্ডুর অন্তঃপুরে যে খুবই চাহিদা হবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

আমরা যে-বাড়িতে গেলাম, তার গৃহপত্নীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁর সৌন্দর্যের ওপরে সন্ধে ঘনিয়ে আসতে তখনো ঢের দেরি ছিল। তাঁব বাড়িতে এক ছেলে আর ছেলের বৌ, তাই পরিবারটি খুব বড়ো ছিল না। আশেপাশে দেবদারুর জঙ্গল ছিল, ফলে কাঠের কোনো আকাল ছিল না, লোকেরা নিজেদের বাড়ি বানাবার সময়ে দরাজভাবে তা খরচ করেছে। এই গ্রামটি সমুদ্রতল থেকে ৯, ১০ হাজার ফিটের চেয়ে কম উঁচুতে হবে না। শীতকালে ক-মাস তাই চারদিকে বরফ আর বরফ থাকে কিন্তু আমি তো সেখানে মে কিংবা জুন মাসে পৌঁছেছিলাম, সুতরাং কোথা থেকে বরফ দেখব? অধিকাংশ বাড়ি ছিল দোতলা- -নেপালে সব জায়গায় যেমন মাথা ফাটানো নিচু নিচু ছাতওলা হয়, এগুলো সেরকম নয়। ছাতগুলোও কাঠের তক্তা দিয়ে ছাওয়া ছিল। ঘরের ভেতরেব দরজাতে আর অন্য জায়গায় কিছু কারুকার্যও ছিল, যাতে সুরুচি প্রকাশ পাচ্ছিল। আমাকে ওখানে ছেড়ে দসরতন সাহু ফিরে গেলো।

এখানে চাল হয় না কিন্তু এক-দুই দিনের পথের দূরত্বে সমতলে ধানখেত আছে। অবস্থাপন্ন লোকেরা ভাত খেতে পছন্দ করতো। আলু-মুলোর তরকারি দিয়ে ভাতের স্বাদ অপূর্ব লাগত। তরকারিতে তারা বেশি মশলা দিত না, তবে জংলী পেঁয়াজ (জিম্বু) ছিল একাই হাজার রকমের মশলার সমান। লোকেদের বাড়িঘরও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল, আর শরীরও। যদিও এটা জোর দিয়ে বলা যায় না যে, এরা দু-চার দিন পরে-পরেই স্নান করে।

দু-চারদিন পরে গ্রামের বৃদ্ধা ভিক্ষুণী কাঠমাণ্ডু থেকে ফিরে এলো। সেও ডুক্‌পা লামার শিষ্যা ছিল এবং কয়েক মাস ধরে তাঁর ওখানেই থাকছিল। তার আসল নাম কি ছিল তা তো বলতে পারি না, তবে আমরা তাকে অনীবুড্ডী বলে ডাকতাম। ভোটিয়াতে ভিক্ষুণীকে

বলে অনী। অনীবুড্ঢীর নিজের বাড়ি ছিল। হয়তো একসময় এই বাড়িতেই খুব খাওয়া-দাওয়া চলতো, যখন অনেক স্ত্রী-পুরুষ থাকত বাড়িটিতে। কিন্তু এখন অনীবুড্ঢী একাই থাকত। দোতলা বাড়ি, নিচে পশু বেঁধে রাখা হত কিংবা কাঠকুটো, ঘাস ইত্যাদি জিনিস থাকত। কিন্তু আমার মনে হয় না, অনীবুড্ঢীর নিচের ঘরে কোনো পশু থাকত বলে। ওপরের ঘরের কাঠগুলো পুরনো ছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল, বাড়িটা এখনো সম্পূর্ণ তৈরি করে উঠতে পারেনি, নির্মাণকারী-হাত তার আগেই চিরদিনের জন্য বিদায় হয়েছিল। অনীবুড্ঢীকে আমি সেজন্য কখনো কাঁদতে বা উদাস হতে দেখিনি। তার মুখ সবসময় প্রসন্ন থাকত। ধর্মের প্রতি অনুরাগ আর পুজোপাঠ অবশ্য তাকে তার শোক ভুলিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। অনীবুড্ঢী আসাতে আমি তার বাড়িতে চলে গেলাম। ছাতের ওপরেই রান্না করার জন্যে কাঠেব উনুন ছিল। অনীবুড্ঢীর হাতেও খাবারকে অমৃতে পরিণত করার শক্তি ছিল। সে আমাব কোনরকমের অসুবিধে হতে দিতে চাইত না। যদিও অনীবুড্ঢীর বয়েস পঞ্চাশ বা তার ওপরে, তবু একটি তরুণেব সঙ্গে একই বাড়িতে থাকলে হয়ত কারো সন্দেহ হত, তাই রাতের বেলায় সে অন্য একটি স্ত্রীলোককে শোবার জন্যে তার কাছে ডেকে নিত। আমার মনে হলো, এটা দুজনের পক্ষেই ভালো। মহাবৌধাতে থাকার সময় আমার ভোটিয়া বলার দিব্যি অভ্যেস হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কিন্দৌলের কাছে নির্জন বাড়িতে থাকার সময় আমি সেই অভ্যেস থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম। অনীবুড্ঢীর এখানেও আমার ভোটিয়া বলার তত সুযোগ পাওয়া যেত না। অনীবুড্ঢী সারাদিন ধরে নিজের অন্যান্য কাজে লেগে থাকত, আব এমনিতেও তার ভাষা তত ভালো ছিল না। যদিও গ্রামে ভোটিয়া বলার আরো কত লোক পাওয়া যেত, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করতে চাইতাম না। কেননা তাতে গোপনীয়তা ভঙ্গ হবার আশঙ্কা ছিল।

কিছুদিন পরেই কাঠমাণ্ডু থেকে ডুক্‌পা লামার বেশ কিছু লোক এল্‌মো চলে এলো আর তারা গ্রামের থেকে একটু নিচের দিকে একটা মস্ত বড় বুদ্ধমন্দিরে এসে উঠলো। গিয়ে দেখি, আমার বন্ধু তিন-জিনও সেখানে হাজির। ভাষাকে বলিষ্ঠ করার এতো ভালো সুযোগ কি হাতছাড়া করতে পারতাম? যদিও ওখানে থাকলে আমার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে অনিবার্য ছিল, তবু ডাণ্ডা-কমণ্ডলু নিয়ে আমি ওখানে পৌঁছেই গেলাম।

এখন খানিক-খানিক বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি প্রায় জঙ্গলে খুঁজতে যেতাম। স্ট্রবেরিগুলোতে মিষ্টি কম, টকই বেশি। তিন-জিন সেগুলো খেতে খুব পছন্দ করতো। আমি স্ট্রবেরি খুঁজে খুঁজে আনতাম আর সে আমার সঙ্গে গল্প করতো। সে শুধু তিব্বতী ভাষা বলতে পারতো আর সেটাও বাচ্চাদের সহজ সরল ভাষা। তিন-জিনকে গুরু বানিয়ে আমার খুব উপকার হয়েছিল।

ডুক্‌পা লামার শিষ্যশিষ্যারা এখানেও হাতে তৈরি কাগজে 'বজ্রচ্ছেদিকা' ছাপানোতে ব্যস্ত ছিল। উলটো অক্ষরে খোদাই করা পাটা মাটির ওপরে রাখা হত আর দুজন লোক বসে যেত। একজন কালির পোঁচড়া দিয়ে কাগজ পেতে রাখতো, আরেকজন কাপড় জড়ানো কাঠের রোলারটাকে তার ওপর দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে রগড়ে দিত। সেখানে সারা দিন ধরে আট-দশটা রোলার চলত। একটা মস্ত কড়াইতে সারাদিন ধরে উৎকৃষ্ট গম

—১৯২৯—

সেদ্ধ করা হত। রাঁধুনী বুড়ি ছিল ভুটানের। তাকে জিজ্ঞেস করায় বলল যে, আটার লেই অত পাতলা হয় না। তাই হাতে তৈরি মিহি কাগজ একটার সঙ্গে আরেকটা সাঁটলে মোটা হয়ে যায়, সেটা ভালো হয় না। এই অঞ্চলে হাতে তৈরি কাগজ প্রচুর হয়। আমি দেখলাম দু-মাস পরে ২০,২৫ জন স্ত্রী-পুরুষ ওই একটি বই একটানা ছেপে চলেছে। আমার কখনো-কখনো মনে হত, কোনদিনও কি এদের কাজ শেষ হবে?

মহাবৌধা আর কিন্দৌল্গে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ভালো খাবার পাওয়া যেত। কখনো-কখনো অল্পস্বল্প পয়সাকড়িও পাওয়া যেত। এল্‌মোর লোকেরাও ভক্ত ভালোই ছিল। তবে আর কাঁহাতক পয়সা খরচ করবে। উত্তর দিকে দু-তিন মাইল দূরে দেবদারুর ঘন জঙ্গলে একটি ছোট কুটিরের ওপর সাদা নিশান পতপত করে উড়ছিল। সেখানে একজন আরণ্যক লামা তপস্যা করছিল। গ্রামের অন্য প্রান্তে ওপরের দিকেও একটা মঠ ছিল, সেখানে এক লামা ভজন গেয়ে চলত। দূরে হওয়ার দরুন জঙ্গলের লামার কাছে খুব বেশি স্ত্রী-পুরুষ আসত না, তবে আরেকজন ভজনানন্দী লামার কাছে ডজন-ডজন মহিলা এসে ভজনে অংশগ্রহণ করত। সে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর-এর ব্রত বেশি করাত। এতে অর্ধোপবাসে থাকতে হয়, কয়েক হাজার মন্ত্রজপ করতে হয় আর তার পরে হাজার বার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত করতে হয়। আমার ধারণা, ঐ স্ত্রীলোকেরা তিরিশ দিন এই ব্রতটা পালন করতে পারত না, কেননা সকাল দশটা-এগারোটা থেকে রাত অব্দি পুজো-দণ্ডবত চলত, মাঝে শুধু খানিকটা বিশ্রাম পাওয়া যেত। আমি একদিন সেখানে গেলাম। এখন আমার কোনো দোভাষীর দরকার হত না। আমি যথেষ্ট তিব্বতী বলতে পারতাম। লামা খানিকটা লেখাপড়া জানতো আর স্বভাব তো তার বেশ ভালো ছিল। সে আমাকে ওখানেই খাবার খাওয়াল। আমি সেখানে আমার সেই কাঠমাণ্ডুর পরিচিত ভিক্ষুণীকেও দেখলাম। সে এখন ডুক্‌পা লামার মণ্ডলী থেকে এখানে চলে এসেছিল। এখানে সে ভালোই ছিল।

আমাদের এখানে তো কুড়ি দিন হলো এখন সকালে মণ্ডুয়া বা ভুট্টার আটার তৈরি শুকনো নোনতা হালুয়া পাওয়া যেত, আর রাত্রে ওই জিনিসেরই পাতলা লেই। চা-টাও নুনে পোড়া। কখনো কখনো আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যেত, কিন্তু আমি তো জেনে-বুঝেই এই ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। এক-আধ দিন ইচ্ছে হত যে, গ্রাম থেকে কিছু চাল, আলু, মুলো, পেঁয়াজ আর মাখন নিয়ে আমি কিন্তু আবার ভাবতাম, যতক্ষণ আমার অন্য সঙ্গীরা মণ্ডুয়া-ভুট্টা খাচ্ছে, ততক্ষণ নিজের খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করা ঠিক নয়। আমি জানতাম, ডুক্‌পা লামা এখানে থাকলে তাঁর জন্যে ছাপান্ন রকম ব্যঞ্জন তৈরি হত, আর তখন আমার খাবারও সেই রান্নঘার থেকেই আসত। তা সত্ত্বেও আমি এদের সঙ্গে খাওয়াই পছন্দ করলাম। এখানে দিন কাটানো কোনো সমস্যাই নয়, কারণ তিন-জিন আমার সঙ্গে ছিল, আর পাশের জঙ্গলে যেখানে-সেখানে ছিল লাল স্ট্রবেরিও।

অন্য ভিক্ষুটি সকালে অল্প-স্বল্প পূজাপাঠ করতেন আর রাতে দুই-আড়াই ঘণ্টা ধরে বড় অনুরাগের সঙ্গে বিভিন্নদেবতার স্তুতি কবতেন। সেই লম্বা স্তোত্রটা আমার মনে ছিল না, তাই তাঁর সঙ্গে সামিল হতে পারতাম না। ছাপবার সময়েও ভিক্ষুণীরা প্রায়ই খুব ভক্তিভবে কোনো একটা স্তোত্র গেযে যেত। আমি ভুলবশত দু-একজন লোকের হাত দেখে বসলাম,

এতো সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার। আমি ওদের সম্পর্কে খুব সামলে ভবিষ্যদ্বাণী করতাম। যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ নিশানা লাগছে আর বাকি শতকরা ১০ ভাগও হেঁয়ালি কথায় মিলিয়ে যাচ্ছে, সেখানে হাত দেখানোর চাহিদা বাড়বে না কেন। যতক্ষণ আমাদের মণ্ডলীর ভেতরের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের হাত দেখতে হতো, ততক্ষণ তো কোনো ব্যাপার ছিল না। আর ওরা হাত দেখানোতে ক্লান্ত হতো না, ভিক্ষুণীরা তো আরও বেশি।

গ্রামবাসীরা এই মন্দির কয়েকশো বছর আগে বানিয়েছিল, সঙ্গে খানিকটা খেতও ছিল। কিন্তু এখন সে-মন্দির শ্রীহীন ছিল, আর আমরা যদি না থাকতাম তো জনহীনই পড়ে থাকতো। এখানে পুজো-পাঠের বন্দোবস্তকারী পূজারী এল্‌মো নয়, অন্য একটি আধা-গোরখা পরিবার ছিল। ওই মন্দিরেরই ওপরের কোঠায় তারা থাকতো। ওই পরিবারেরও স্ত্রী-পুরুষেরা হাত দেখালো। এল্‌মো গিয়ে প্রথমদিকে যাদের বাড়ি ছিলাম, একদিন দেখি যে সে-বাড়ির বৌও হাত দেখাতে এসেছে। সে বাইশ-তেইশ বছরের খুব স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী আর তার স্বামী বয়সে ৪, ৫ বছরের ছোট এবং রোগা-পটকা তরুণ। সে বিশেষ করে এটাই জানতে এসেছিল যে, ওর হাতে কোনো পুত্র-কন্যা আছে কিনা। একজন ভিক্ষুণী আমাকে খুব অনুরোধ করে বলল, 'এর হাতটা একটু দেখে দিন।' এদিকে আমার ততদিনে হাত দেখায় বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। ভিক্ষুণী অনেক হাতে-পায়ে ধরে বলতে লাগল, 'শ্বশুর-শাশুড়ি একে বাঁজা ভেবে ছেলের আরেকটা বিয়ে দিতে চাইছে। আপনি অবশ্যই এর হাতটা দেখে দিন।' আমি হাত দেখে বলে দিলাম, 'পুত্র যোগ আছে। যদি পুত্র না হয়, তবে বুঝতে হবে, এতে এর নয় এর স্বামীর ত্রুটি।' মেয়েটি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তার সমস্যা থোড়াই এত সহজে সমাধান হওয়ার মতো ছিল?

আমি যখন কাঠমাণ্ডু থেকে এল্‌মো এসেছিলাম, তখন ডুক্‌পা লামা কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি নিশ্চয় এল্‌মো আসবেন আর আমাকে সঙ্গে করে তিব্বতে যাবেন। আমি এই আশাতে দু-মাসের ওপর তাঁর কাপড়ের প্রান্ত ধরে থেকে ছিলাম। মাঝে মাঝে কাঠমাণ্ডু থেকে যেসব লোক আসতেন তাঁবাও বলতেন যে, লামা শিগগিরী এখানে আসবেন। একদিন সন্ধের সময় লামার দুই চেলা এসে জানালেন, লামা কাঠমাণ্ডু থেকে সোজা গ্রেনম্‌ (কুত্তী)-এর দিকে রওনা হয়ে গেছেন। শুনে আমার বুক হিম হয়ে গেল। আমি যে-ডালে নিশ্চিন্তে বসেছিলাম সেটাই ভেঙে মাটিতে এসে পড়ল। এখন কি করা উচিত? খানিক পরে তাঁদের আমি আমার সিদ্ধান্তের কথা জানালাম যে, কালই আমি এখান থেকে ক্রেনম্‌-এর উদ্দেশে যাত্রা করবো। আমি না জানতাম রাস্তা, না ছিল কোনো সঙ্গী, তবু এরকম সিদ্ধান্ত নিতে দেখে তাঁদের আশ্চর্য হবারই কথা। ওই রাতেই আমি আর আমাব বন্ধুরা গ্রেনম্‌ পর্যন্ত যাবার জন্যে সঙ্গী খোঁজার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। সকালে আমি মন্দিরের পূজারীকে ধরলাম। সেটা ছিল নুন আনার মরশুম। তিব্বতের লবণাক্ত হ্রদগুলো থেকে নুন সংগ্রহ করে লোকে ইয়াকের (চমরী) পিঠে করে তা গ্রেনম্‌ নিয়ে যায়, আর নেপালের পাহাড়ী লোকেরা পিঠে করে চাল বা ভুট্টা বয়ে আনে গ্রেনমে—লবণের সঙ্গে বদলাবদলি করার জন্যে। পূজারী বলতে থাকে, 'নুন নিতে আমাকে তো যেতে হবে, তবে ফসল কাটতে বড়োজোর ১০,১৫ দিন বাকি, যদি এখন

সেদ্ধ করা হত। রাঁধুনী বুড়ি ছিল ভুটানের। তাকে জিজ্ঞেস করায় বলল যে, আটার লেই অত পাতলা হয় না। তাই হাতে তৈরি মিহি কাগজ একটার সঙ্গে আরেকটা সাঁটলে মোটা হয়ে যায়, সেটা ভালো হয় না। এই অঞ্চলে হাতে তৈরি কাগজ প্রচুর হয়। আমি দেখলাম দু-মাস পরে ২০,২৫ জন স্ত্রী-পুরুষ ওই একটি বই একটানা ছেপে চলেছে। আমার কখনো-কখনো মনে হত, কোনদিনও কি এদের কাজ শেষ হবে?

মহাবৌধা আর কিন্দৌলে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ভালো খাবার পাওয়া যেত। কখনো-কখনো অল্পস্বল্প পয়সাকড়িও পাওয়া যেত। এল্‌মোর লোকেরাও ভক্ত ভালোই ছিল। তবে আর কাঁহাতক পয়সা খরচ করবে। উত্তর দিকে দু-তিন মাইল দূরে দেবদারুর ঘন জঙ্গলে একটি ছোট কুটিরের ওপর সাদা নিশান পতপত করে উড়ছিল। সেখানে একজন আরণ্যক লামা তপস্যা করছিল। গ্রামের অন্য প্রান্তে ওপরের দিকেও একটা মঠ ছিল, সেখানে এক লামা ভজন গেয়ে চলত। দূরে হওয়ার দরুন জঙ্গলের লামার কাছে খুব বেশি স্ত্রী-পুরুষ আসত না, তবে আরেকজন ভজনানন্দী লামার কাছে ডজন-ডজন মহিলা এসে ভজনে অংশগ্রহণ করত। সে বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর-এর ব্রত বেশি করাত। এতে অর্ধোপবাসে থাকতে হয়, কয়েক হাজার মন্ত্রজপ করতে হয় আর তার পরে হাজার বার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত করতে হয়। আমার ধারণা, ঐ স্ত্রীলোকেরা তিরিশ দিন এই ব্রতটা পালন করতে পারত না, কেননা সকাল দশটা-এগারোটা থেকে রাত অব্দি পুজো-দণ্ডবত চলত, মাঝে শুধু খানিকটা বিশ্রাম পাওয়া যেত। আমি একদিন সেখানে গেলাম। এখন আমার কোনো দোভাষীর দরকার হত না। আমি যথেষ্ট তিব্বতী বলতে পারতাম। লামা খানিকটা লেখাপড়া জানতো আর স্বভাব তো তার বেশ ভালো ছিল। সে আমাকে ওখানেই খাবার খাওয়াল। আমি সেখানে আমার সেই কাঠমাণ্ডুর পরিচিত ভিক্ষুণীকেও দেখলাম। সে এখন ডুক্‌পা লামার মণ্ডলী থেকে এখানে চলে এসেছিল। এখানে সে ভালোই ছিল।

আমাদের এখানে তো কুড়ি দিন হলো এখন সকালে মণ্ডুয়া বা ভুট্টার আটার তৈরি শুকনো নোনতা হালুয়া পাওয়া যেত, আর রাত্রে ওই জিনিসেরই পাতলা লেই। চা-টাও নুনে পোড়া। কখনো কখনো আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যেত, কিন্তু আমি তো জেনে-বুঝেই এই ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। এক-আধ দিন ইচ্ছে হত যে, গ্রাম থেকে কিছু চাল, আলু, মুলো, পেঁয়াজ আর মাখন নিয়ে আমি কিন্তু আবার ভাবতাম, যতক্ষণ আমার অন্য সঙ্গীরা মণ্ডুয়া-ভুট্টা খাচ্ছে, ততক্ষণ নিজের খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করা ঠিক নয়। আমি জানতাম, ডুক্‌পা লামা এখানে থাকলে তাঁর জন্যে ছাপান্ন রকম ব্যঞ্জন তৈরি হত, আর তখন আমার খাবারও সেই রান্নঘার থেকেই আসত। তা সত্ত্বেও আমি এদের সঙ্গে খাওয়াই পছন্দ করলাম। এখানে দিন কাটানো কোনো সমস্যাই নয়, কারণ তিন-জিন আমার সঙ্গে ছিল, আর পাশের জঙ্গলে যেখানে-সেখানে ছিল লাল স্ট্রবেরিও।

অন্য ভিক্ষুটি সকালে অল্প-স্বল্প পূজাপাঠ করতেন আর রাতে দুই-আড়াই ঘণ্টা ধরে বড় অনুরাগের সঙ্গে বিভিন্নদেবতার স্তুতি করতেন। সেই লম্বা স্তোত্রটা আমার মনে ছিল না, তাই তাঁর সঙ্গে সামিল হতে পারতাম না। ছাপবার সময়েও ভিক্ষুণীরা প্রায়ই খুব ভক্তিভবে কোনো একটা স্তোত্র গেয়ে যেত। আমি ভুলবশত দু-একজন লোকের হাত দেখে বসলাম,

এতো সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার। আমি ওদের সম্পর্কে খুব সামলে ভবিষ্যদ্বাণী করতাম। যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ নিশানা লাগছে আর বাকি শতকরা ১০ ভাগও হেঁয়ালি কথায় মিলিয়ে যাচ্ছে, সেখানে হাত দেখানোর চাহিদা বাড়বে না কেন। যতক্ষণ আমাদের মণ্ডলীর ভেতরের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের হাত দেখতে হতো, ততক্ষণ তো কোনো ব্যাপার ছিল না। আর ওরা হাত দেখানোতে ক্লান্ত হতো না, ভিক্ষুণীরা তো আরও বেশি।

গ্রামবাসীরা এই মন্দির কয়েকশো বছর আগে বানিয়েছিল, সঙ্গে খানিকটা খেতও ছিল। কিন্তু এখন সে-মন্দির শ্রীহীন ছিল, আর আমরা যদি না থাকতাম তো জনহীনই পড়ে থাকতো। এখানে পুজো-পাঠের বন্দোবস্তকারী পূজারী এল্‌মো নয়, অন্য একটি আধা-গোরখা পরিবার ছিল। ওই মন্দিরেরই ওপরের কোঠায় তারা থাকতো। ওই পরিবারেরও স্ত্রী-পুরুষেরা হাত দেখালো। এল্‌মো গিয়ে প্রথমদিকে যাদের বাড়ি ছিলাম, একদিন দেখি যে সে-বাড়ির বৌও হাত দেখাতে এসেছে। সে বাইশ-তেইশ বছরের খুব স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী আর তার স্বামী বয়সে ৪, ৫ বছরের ছোট এবং রোগা-পটকা তরুণ। সে বিশেষ করে এটাই জানতে এসেছিল যে, ওর হাতে কোনো পুত্র-কন্যা আছে কিনা। একজন ভিক্ষুণী আমাকে খুব অনুরোধ করে বলল, 'এর হাতটা একটু দেখে দিন।' এদিকে আমার ততদিনে হাত দেখায় বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। ভিক্ষুণী অনেক হাতে-পায়ে ধরে বলতে লাগল, 'শ্বশুর-শাশুড়ি একে বাঁজা ভেবে ছেলের আরেকটা বিয়ে দিতে চাইছে। আপনি অবশ্যই এর হাতটা দেখে দিন।' আমি হাত দেখে বলে দিলাম, 'পুত্র যোগ আছে। যদি পুত্র না হয়, তবে বুঝতে হবে, এতে এর নয় এর স্বামীর ত্রুটি।' মেয়েটি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তার সমস্যা থোড়াই এত সহজে সমাধান হওয়ার মতো ছিল?

আমি যখন কাঠমাণ্ডু থেকে এল্‌মো এসেছিলাম, তখন ডুক্‌পা লামা কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি নিশ্চয় এল্‌মো আসবেন আর আমাকে সঙ্গে করে তিব্বতে যাবেন। আমি এই আশাতে দু-মাসের ওপর তাঁর কাপড়ের প্রান্ত ধরে থেকে ছিলাম। মাঝে মাঝে কাঠমাণ্ডু থেকে যেসব লোক আসতেন তাঁরাও বলতেন যে, লামা শিগগিরী এখানে আসবেন। একদিন সন্ধের সময় লামার দুই চেলা এসে জানালেন, লামা কাঠমাণ্ডু থেকে সোজা ঞেনম্ (কুত্তী)-এর দিকে রওনা হয়ে গেছেন। শুনে আমার বুক হিম হয়ে গেল। আমি যে-ডালে নিশ্চিন্তে বসেছিলাম সেটাই ভেঙে মাটিতে এসে পড়ল। এখন কি করা উচিত? খানিক পরে তাঁদের আমি আমার সিদ্ধান্তের কথা জানালাম যে, কালই আমি এখান থেকে ক্রেনম্-এর উদ্দেশে যাত্রা করবো। আমি না জানতাম রাস্তা, না ছিল কোনো সঙ্গী, তবু এরকম সিদ্ধান্ত নিতে দেখে তাঁদের আশ্চর্য হবারই কথা। ওই রাতেই আমি আর আমাব বন্ধুরা ঞেনম্ পর্যন্ত যাবার জন্যে সঙ্গী খোঁজার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। সকালে আমি মন্দিরের পূজারীকে ধরলাম। সেটা ছিল নুন আনার মরশুম। তিব্বতের লবণাক্ত হ্রদগুলো থেকে নুন সংগ্রহ করে লোকে ইয়াকের (চমরী) পিঠে করে তা ঞেনম্ নিয়ে যায়, আর নেপালের পাহাড়ী লোকেরা পিঠে করে চাল বা ভুট্টা বয়ে আনে ঞেনমে—লবণের সঙ্গে বদলাবদলি করার জন্যে। পূজারী বলতে থাকে, 'নুন নিতে আমাকে তো যেতে হবে, তবে ফসল কাটতে বড়োজোর ১০,১৫ দিন বাকি, যদি এখন

চলে যাই তো ফসল বরবাদ হয়ে যাবে।' আমি বোঝাবাব চেষ্টা করলাম, আমার বন্ধুরা বোঝালো, তার ওপর দ্বিগুণ মজুরি দিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। শেষমেশ ও রাজি হলো। ওইদিনই একপ্রহর বেলা হতেই আমরা দুজনে এল্‌মো থেকে রওনা দিলাম।

গ্রাম থেকে আমরা চাল আর অন্যান্য খাবার জিনিস কিনে নিয়েছিলাম। সঙ্গী মাখনের ব্যাপারে বললো 'রাস্তায় ওটা গোঠ (গোষ্ঠ) থেকে নিয়ে নেব।' ঐ ঋতুতে গ্রামের লোক তাদের পশু চরাতে দূর-দূর জঙ্গলে চলে যায়। সেখানে একটা ছোটমতো ঝুপড়ি বানিয়ে নেয়, যেটা তার ছোট ঘরের মতো হয়ে যায়। আমরা সেই ঝুপড়িতে গেলাম আর সেখান থেকে আধসের মাখন কিনলাম। বিনাপয়সায় ভরপেট ঘোল খেতে পাওয়া গেল, তারপর আবার লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলাম। আমার সঙ্গে যা-কিছু জিনিস ছিল, তা খুব বেশি ছিল না। তাও আবার অন্যের পিঠে ছিল। যারা এক-দেড় মণ বোঝা টানতে অভ্যস্ত, দশ-পনেরো সের তাদের কাছে আর কতটুকু? এল্‌মো থাকার সময়ে আমি খুব চলাফেরা করতাম, তাই পা মজবুত হয়ে গিয়েছিল। পাকদণ্ডী সোজাসুজি যাচ্ছিল, যার জন্যে পাহাড়ের চড়াইটাও সোজা পড়ছিল। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে আমরা কাঠমাণ্ডু থেকে ঞেনম্ যাবার রাস্তায় পৌঁছে গেলাম। লামার শিষ্যমণ্ডলী ওই দিক দিয়ে গেছেন কি না, সব জায়গাতেই তা জিজ্ঞেস করতে করতে যাচ্ছিলাম।

কাঠমাণ্ডু থেকে ঞেনম্ যাবার দুটো রাস্তা আছে। একটা নিচে-নিচে যায়, আর একটা পাহাড়ের ডাঁড়া[১] ধরে ওপর-ওপর। ওপরের রাস্তা বেশি ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, তাই আমাদের বিশ্বাস ছিল লামা নিচের গরম রাস্তা ধরবেন না। আমরাও ওপরের রাস্তা ধরেই চলছিলাম। সম্ভবত দ্বিতীয় দিনে আমরা লামার হদিশ পেলাম। আর একদিন গিয়ে আমরা তাঁকে ধরে ফেললাম। তিনি একটা গ্রামে উঠেছিলেন। সাধারণত পাহাড়ী লোকেদের শরীর বেশ হাল্কা হয়, কেননা তাদের পাহাড়ে অনেকবার করে ওঠা-নামা করতে হয়। সেজন্যে শরীরে চর্বি জমতে পায় না। কিন্তু ডুক্‌পা লামাকে তো নড়েও বসতে হয় না—উপরন্তু খুব করে মাংস, মাখন, দই আর ভাল ভাল খাবার। সুতরাং শরীর যদি আড়াই-তিন মণের হয়ে পড়ে তো আশ্চর্যের কি? পাহাড়ে পাহাড়ে পায়ে হেঁটে পথ চলা তাঁর সামর্থে ছিল না। যদিও তমংগ আর এদিকের অন্যজাতিগুলো বৌদ্ধধর্ম মেনে চলত, কিন্তু সেটা এমনই অবস্থায় পৌঁছেছিল যখন কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই বৌদ্ধধর্ম থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পৌঁছে যাওয়া যেত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে উত্তর-ভারতের বৌদ্ধধর্ম সম্ভবত এইরকম অবস্থাতে ছিল। বছরের পর বছর ওখানকার স্তূপগুলো মেরামত করা হতো না। বৌদ্ধ-মন্দির ভেঙে চুরে যাচ্ছিল, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের (লামাদের) প্রতিও তাঁদের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। যদি কখনো সখনো তাঁদের খাইয়ে দিত তাহলে সেটা এই ভেবে যে, ভূত-প্রেত তাড়ানোতে লামাদের বেশ প্রসিদ্ধি আছে। এই গ্রামেরও লামার কোনো অভ্যর্থনা হয়নি।

আমি যখন ডুক্‌পা লামার কাছে গেলাম, তিনি আগের মতোই হেসে দেখা করলেন। তাঁর একবারও মনে হলো না যে, আমাকে এলমোতে কোনো খবর না পাঠিয়ে তিব্বতের

---

[১] গভীর ও সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট বা পাহাড়ী রাস্তা (ফার্সি দর্‌র)—স.ম.

দিকে রওনা দেওয়াটা ঠিক হয়নি। তিব্বতে হামেশাই আমি এমন লোকেদের দেখা পেয়েছি যারা শিশুদের মতো নিজের দায়িত্বের কথা ভুলে যায়। যাহোক, এখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম আর তিনিও সেই রকমই স্নেহভরে আমাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। ডুক্‌পা লামার এই পাহাড়ে যাত্রা কলুর বড় পাথরকে ছোট-বড় পাহাড় ডিঙোনোর চেয়ে কিছু কম ছিল না। ওজনে তিনি আমার থেকে দেড়গুণ ছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমি সেদিন একটি ভীমকায় লোককে পেয়ে গেলাম। এখানে কোনো দেবতা লামাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। কখনো-কখনো কোনো শক্তপোক্ত লোক পাওয়া যেত। আর তাকে দুগুণ-তিনগুণ মজুরি দিয়ে কোনোমতে রাজি করালেও সে একদিনের বেশি টিকতো না। ওখানে ঘোড়াও পাওয়া যাচ্ছিল না, পাকদণ্ডীর পথে ঘোড়া পাওয়া মুশকিল ছিল। আমরা পিঁপড়ের মতো এগোচ্ছিলাম। তবে এখন তো আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম, তাই আর অত উতলা হবার দরকার ছিল না। এইভাবে চলতে চলতেই একদিন আমরা ভোটকোসীর তীরে এসে পৌঁছলাম আর তার পরে তাতপানীতে। শেষ পরীক্ষার মুহূর্ত মাথার ওপরে এসে পড়ল।

তাতপানীতে গরম জলের একটা ঝর্ণা আছে, সেইজন্যেই একে তাতপানী বলে। পরে আরো দু-বার আমাকে এই পথ দিয়ে যেতে হয়েছিল, আর তখন গরম জলে স্নানটা খুব উপভোগ করেছিলাম, কিন্তু এই প্রথমবারের যাত্রায় আমি ময়লা ধোওয়ার দুশ্চিন্তায় ছিলাম না। বরঞ্চ কয়েকমাস ধরে তাকে জমানোর চেষ্টায় ছিলাম। আমার সঙ্গীরা এখানে স্নান করেছিল কি না, মনে পড়ছে না। তাতপানীর কাছেই কাস্টম (চুঙ্গী, জকাত)-এর লোকেরা ওপর-ওপর আমাদের জিনিসপত্তর দেখলো, কিন্তু তার মধ্যে বেচা-কেনা করার কোনো জিনিস ছিল না। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে সামনে একটা মামুলি চড়াই পড়ল। আমরা নেপাল সীমান্তের ফৌজি-চৌকিতে এসে পৌঁছলাম। পাহারার সেপাই আমাদের সেখানেই থামিয়ে দিল, আর অন্য সেপাই গেল সুবেদার-সাহেবকে ডেকে আনতে। এদিক দিয়ে অনবরতই তিব্বতী লামারা যাতায়াত করেন, তাই বড় অফিসারের স্বয়ং এসে লোকদের দেখার প্রয়োজন হয় না। আমার শরীরে তো কেটে ফেললেও রক্ত ছিল না। বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করছিল। রিন্‌-ছেন্‌ আর তার সঙ্গীদের চেহারা-টেহারা আমাদের এখানকার লোকেদের মতোই ছিল কিন্তু আমার এটা ভাবারও মন ছিল না যে, যখন তাঁদের ধরবে তখনি আমাকেও ধরতে পারবে। আমিও নিজের নাম রেখেছিলাম ছেবঙ্‌ আর জন্মভূমির নাম খুন্নু (কনৌর রামপুর বুশহর)। কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে, মুখটা লুকোব কেমন করে। এই ধরনের যাত্রা আমার এটাই ছিল প্রথম, তাই ঘাবড়ে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। সকলের নাম লেখা হতে লাগল। আমিও লেখালাম খুন্নু ছেবঙ্‌। সবাই বলল যে আমরা কে-রোঙ-এর অবতারী লামার শিষ্য। লামাদের ভূত-প্রেত ঝাড়ার ক্ষমতায় সব পাহাড়ী লোকেরাই বিশ্বাস করে। তাই হাবিলদারের ওপরেও সে প্রভাব পড়ল। লেখা-লিখি শেষ হলে তিনি আমাদের সঙ্গে একজন লোক ঠিক করে দিলেন, যাতে পাশের গ্রামে লামার থাকার জন্যে ভালো জায়গা পাইয়ে দেয়। সেই গ্রামে হয়তো এমনিতেই ভালো জায়গা পাওয়া যেত, কারণ ওখানকার পনেরো আনা লোকই ছিল

তিব্বতী (ভোটিয়া)। সেইদিন রাতটা আমরা ঐ গ্রামেই থাকলাম। কোঠাবাড়িতে বেশ ভাল, লম্বা চওড়া ঘর আমরা পেয়েছিলাম। গরম এলাকা থেকে আমরা ওপরে চলে এসেছিলাম, তাই সকলের কপালের ভাঁজ দূর হয়ে গিয়েছিল।

নতুন গ্রাম এলো অথচ লামা লম্বা-চওড়া একটা পুজো শুরু করে দেবেন না—এ হতেই পারে না। ডুক্‌পালামার ইষ্টদেবতা এমন ছিলেন যে, মদ না হলে তাঁর কাজই হতো না। আর মদও যব বা ভুট্টার ছঙ (কাঁচা মদ) না, ভাটিতে চোলাই করা অরা (আরক) হতে হবে। শীতের সময় হলে সেটাকে মাখন দিয়ে ফোড়ন ছুঁয়ে দেওয়া হতো। সেদিনও দেবতার পুজোয় মদ দেওয়া হলো। এখন ডুক্‌পা লামার মণ্ডলীতে ভিক্ষুই ছিল, ভিক্ষুণী হয়তো-বা এক-আধজন ছিল। আমাদের মণ্ডলীও ৮, ১০-এর চেয়ে বেশি জনের ছিল না। প্রসাদ দেবার সময়ে আমার সামনেও মদ এলো। মদের প্রতি ঘৃণা তো আমি কোনদিনই ছাড়তে পারিনি, আর সেই সময় তো এমন অবসর আসেনি। আমি প্রসাদ নিতে অস্বীকার করতে পারতাম। কারণ ডুক্‌পা লামা জানতেন যে, আমি বজ্রযানী (তান্ত্রিক) নই, হীনযানী বৌদ্ধধর্ম মেনে চলি। যাহোক, আমার আহাম্মকী দেখে তিনি একটু হাসলেন, ব্যাপারটা সেখানেই মিটে গেল।

তিব্বতে সওয়া বছর

লাসার দিকে

সামনে মাত্র কয়েক মাইল পরে ভোটকোসী নদীর ওপরে একটা কাঠের সেতু পাওয়া গেল। সেটা পার হয়ে আমরা তিব্বতের সীমার ভেতরে চলে গেলাম। ইংরেজদের সীমানা তো আমি কুশল-ক্ষেম থেকে রক্সৌল যাবার সময়েই পেরিয়ে গিয়েছিলাম, এবার দ্বিতীয় সীমানাও চলে গেল। তিব্বতীদের সম্পর্কে আমি একটু বেশিই নিশ্চিত ছিলাম কারণ আমি জানতাম যে ওরা চার-পাঁচশো বছর আগের পৃথিবীতেই বাস করছে। মাথা থেকে হাজার মণের বোঝা নেমে গেল বলে মনে হলো। হয়তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেশ খানিকটা আগে থেকেই শুরু হয়েছিল কিন্তু এতক্ষণ অব্দি সেদিকে আমার চোখ প্রায় বন্ধ ছিল। এবার আমি দুচোখ ভরে পার্বত্য সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। ডুক্‌পা লামা এখনও ধীরে-ধীরেই চলছিলেন। কিন্তু আমি ১, ২ ফার্লং এগিয়ে কোনো চাটানের ওপর বসে পড়েছিলাম, আর তারপরে পাখিদের মধুর কলরব, কোসীর ঘর্ঘর ধ্বনি শুনছিলাম, এবং আপাদমস্তক সবুজ গাছপালায় ঢাকা পাহাড়গুলোকে দেখছিলাম।

—১৯২৯—

এবার যখন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম, এক মোঙ্গল ভিক্ষুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁকে আবার এখানে পাওয়া গেল। তিনি পূর্ব-মঙ্গোলিয়াতে থাকতেন তবে এখন বছর কয়েক হলো লাসার কাছে ডে-পুঙ্ বিহারে থাকছিলেন। যখন আমাদের বুদ্ধগয়াতে দেখা হয়েছিল তখন আমি তিব্বতী বলতে পারতাম না, কিন্তু এখন আমরা অবাধে কথা বলতে পারতাম। তাই পথচলা আমার পক্ষে আরো আনন্দজনক হয়ে উঠেছিল। সন্ধের সময়ে আমরা একটা গ্রাম (ডম) দেখতে পেলাম। সেই গ্রাম আর আমাদের মধ্যে একটা নালা ছিল। আমাদের এখানে থামতে বলা হলো। ডম-এর লোকরা এসে বাজনা-টাজনা বাজিয়ে এখানেই ডুক্‌পা লামাকে স্বাগত জানাতে চাইছিল। স্বাগত-অনুষ্ঠানে মাখনের চা-ও খেতে হতো। লাদাখে থাকতে আমি মাখন দেওয়া চা তো খেয়েছিলাম তবে সেটা বিশেষ পছন্দ করিনি। কিন্তু এখন তো আমি পুরোপুরি ভোটিয়া বনে যেতে চাইছিলাম, আর সেটা চা-ছাতু থেকে শুরু করে শুক্‌নো (কাঁচা) মাংস খাওয়া অব্দি পৌঁছলে তবেই সম্ভব ছিল। নাওয়া-ধোওয়ার সাধনা তো আমি চুকিয়ে দিয়েছিলাম।

চা-খাওয়া শেষ করে আমরা ডম-এর দিকে চললাম। নালা পার হবার জন্যে একটা শেকলের সেতু ছিল, পার হবার সময়ে যেটা বেজায় দুলতো। লামার থাকার জন্যে গ্রামের একটা ভালো ঘর ঠিক করা হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে মঙ্গোলীয় আর আমি পাশাপাশি আসন পেতে নিলাম। ওদিকে ডুক্‌পা লামার পুজো কিছুটা কম হয়ে গিয়েছিল। কেননা পুজোর অর্ঘ্য দেবার লোকের অভাব হয়েছিল। এখন আবার তিনি ভোটিয়া প্রদেশে চলে এসেছিলেন, তাই বেশ ফলাও করে বিধি-বিধান শুরু হবার কথা।

পরের দিন সকালেই রিন্-ছেন্ বলল যে এখন লামাজী তিন দিন ধরে অবলোকিতেশ্বরের ব্রত শুরু করবেন। আমার মনও খুব চাইছিল যে, এই ব্রতটাতে আমিও যদি ভাগ নিই তবে ওঁর আরোই কাছের মানুষ হয়ে যাব। যাহোক, দুদিন আধখানি করে উপোস আর একদিন পুরো উপোস তো আমার কাছে ভয়ের ব্যাপার ছিল না, তবে দিনভর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে চলা সোজা কাজ ছিল না, সেটা পুরোই ডন-বৈঠক, তাই দুপুরের পরে আমি সেটা ছেড়ে দিলাম।

এখান থেকে ঞেনম্ যাবার পথ তিনদিনের বেশি ছিল না, কিন্তু এখন প্রতি বসতিতেই লোকে লামার দর্শন আর পুজোর জন্যে উতলা হয়ে ছিল। আর যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রাম থেকে এক ডালি চাল বা রূপোর ছোটমতো সিকিও পাবার সম্ভাবনা ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত লামা সে-গ্রাম ছাড়তে রাজি ছিলেন না। আমার একটু রাগ তো হতোই, তবে আরামও এখন খুব ছিল। আমি পথে একটু এগিয়ে চলছিলাম, সম্ভবত মঙ্গোল ভিক্ষুও আমার সঙ্গে ছিলেন—এক জায়গায় একজন নতুন ঘর বানিয়েছে দেখলাম। আমরা সেই ঘরের মালিককে যখন বললাম যে, পেছনে পেছনে ডুক্‌পা-রিন্ আসছেন, সে ভারী খুশি হলো। লামা এসে পৌঁছলে সে পা ছুঁল, প্রণাম করল, অর্ঘ্য প্রদান করল আর ঘর পবিত্র করে দেবার জন্য বললো। তার ঘরে জলের ঝর্ণা বেরিয়ে এসেছিল, বেচারি ভয় পাচ্ছিল যে কোনো নাগদেবতা এসে না বসবাস শুরু করে। লামা মন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ দিলেন আর বললেন ঘরে জল বেরোনো ভালো লক্ষণ। পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয় তিব্বত যাত্রার শেষে

যখন আমি ঐ রাস্তা দিয়ে ফিরছিলাম, ততদিনে বাড়ির দেওয়ালটুকুই মাত্র খাড়া হয়েছিল, সত্যিসত্যিই ঐ ঘরে নাগদেবতা বাসস্থান বানিয়ে ছেড়েছিল।

সামনে চক্-সম্-এর গরম জলের কুণ্ডওলা গ্রামে বেশ কিছু দিনের জন্যে আস্তানা গাড়লাম। এখানেও লামাকে ভালো ঘরে রাখা হলো। রাতে আমরা পাতলা বাঁশের মশাল নিয়ে—যেরকম বাঁশ এদিকের পাহাড়ে খুব বেশি দেখা যায়—খানিকটা নিচে নেমে গরম জলের কুণ্ড পর্যন্ত পৌঁছলাম। আমারও এতদিনে সাহস হয়েছিল—আমি সাবান বের করলাম আর বেশ করে ঘষে-ঘষে স্নান করলাম। মনে হচ্ছিল, এতদিনে সব বালাই দূর হলো। আমার সহযাত্রীরা সবাই উলঙ্গ হয়েই স্নান করছিলেন। সে-সময় আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। তার কারণ, এর আগে আমি স্ত্রীলোকদের নগ্ন হয়ে স্নান করতে দেখিনি।

অবশেষে একদিন আমরা ঞেনম্ পৌঁছে গেলাম। তিব্বতীরা বলে ঞেনম্ কিন্তু নেপালীরা কুত্তী বলেই ডাকে। ঞেনম্ ভালো ব্যবসার জায়গা। নেপালীদের বহু বড় বড় দোকান আছে, আর বলতে গেলে পুরো ঞেনম্টাই দোকান-দানির গ্রাম। এখন নুনের মরশুম ছিল, পথে হাজার হাজার নেপালী, কেউ পিঠে করে শস্যাদি নিয়ে ঞেনম্-এর দিকে যাচ্ছিল, কেউ-বা ঞেনম্ থেকে নুন নিয়ে ফিরে আসছিল। ঞেনম্-এর বাইরে যত্রতত্র ভোটিয়াদের কালো তাঁবু আর কালো ইয়াক দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। নেপালী বণিকদের কাজ ছিল নুন আর শস্যাদি দুই-ই নিয়ে নেওয়া আর যার-যার দরকার তাদের দিয়ে দেওয়া। এছাড়া কাপড় আর অন্যান্য জিনিসও বিক্রি হচ্ছিল। লামার জন্যে একটা বড় বাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। নেবারদের মধ্যে আগে থেকেই অবতারী লামার প্রসিদ্ধি ছিল। ভোটিয়ারাও খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ মহাত্মার গুণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেল।পুজোর উপচারের সঙ্গে চাল, রূপোর টাকা, ডিম, মাখন, চা, সাদা রেশমের সরু চিট (খাতা) সারাদিন ধরে আসতে থাকতো। ডিম এতো জমা হলো যে খাওয়ার কেউ ছিল না। আমি মাখন-চিড়ে আর ডিম দেখে একটা নতুন খাবার বানাতে চাইলাম। খুব মাখন দিয়ে চিঁড়েটাকে ভেজে নিয়ে তাতে অনেকগুলো ডিম আর চিনি ঢেলে দিলাম। ভাল হালুয়ামতন তৈরি হলো। সাথীরা খেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁরা রাঁধিয়ের তারিফ করছিলেন আর আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, ঘি-চিনি পড়লে মাটিও অমৃত হতে পারে।

এই এলাকার ম্যাজিস্ট্রেট এই ঞেনমেই থাকে। এলাকার অফিসারদেরকে তিব্বতে বলে জো-ঙ্-পোন্ আর তার অধীন এলাকাকে বলা হয় জোঙ্। তিব্বতে ছোটোবড়ো মিলিয়ে ১০৮টি জোঙ্ আছে। তিব্বতের শাসক হলেন একজন অবিবাহিত মোহান্ত (দলাই লামা), তাই সরকারের সমস্ত বিভাগে, সেনা বাদে, ভিক্ষু অফিসারও থাকে। সব জায়গাতেই এক জোড়া করে অফিসার থাকে, প্রায় সর্বদাই যার মধ্যে একজন থাকে ভিক্ষু। লামার কাছে জোঙ্-পোন্-এর নিমন্ত্রণ এলো। আমাকেও যেতে বলেছিল, তবে আমি ওখানে যাওয়াটা পছন্দ করিনি। দু-তিন দিন ধরে.তো আমি নিশ্চিন্ত বসে আছি, দেখি লামা এখনো যাওয়ার নামটি করছেন না। হয়ত তিনি এখন কয়েক মাস এখানেই থাকবেন কিন্তু আমি এতদিন পর্যন্ত কি করে প্রতীক্ষা করতাম? জানা গেল যে, গ্রামের পাশেই যেখানে সেতুর ওপর দিয়ে নদী পেরোতে হয়, সেখানকার পাহারাদার কোনো বাইরের লোককে সামনে যেতে

দেবে না, যতক্ষণ না সে জোঙ্-এর হাতে লেখা রাস্তার ছাড়পত্র (লম্-য়িক) দেখায়। আমি লম্-য়িক্ পাবার জন্য এধার-সেধার চেষ্টা করালাম, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। জনাকয়েক নেপালী ব্যবসাদার লাসার দিকে যাচ্ছিল, তারা খুব সহজেই আরেকটা লোকের রাস্তার ছাড়পত্র নিতে পারতো, কিন্তু কেউ-ই বিপদের ঝুঁকি নিতে তৈরি ছিল না। একদিন এক নেপালী ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুজো করার জন্য লামার ডাক পড়ল। মাঝরাতের পর পুজো হচ্ছিল, মাঝে মাঝে লোকেদের (বিশেষত স্ত্রীলোকের) হাঁটুতে হাঁটুতে ঠকাঠক্ বাদ্যি বাজছিল, তাদের স্বরে এক অদ্ভুত রকমের করুণা শোনা যাচ্ছিল। যাহোক, আমার ওপরে এসব জিনিসের প্রভাব পড়তে পারত না। কারণ তাবৎ ভণ্ডামী আমি ভেতর থেকে দেখেছিলাম। নেপালী ব্যবসায়ীটির স্ত্রী ছিল ভোটিয়া। তার মাথাতেও অভিষেকের জল ঢালা হলো। নেপালীরা কয়েক বছরের জন্যে তিব্বতে যায়, কিন্তু নিজের সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে যায় না। ব্রাহ্মণ রাজগুরু কিছু টাকা নিয়ে পুরুষের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন কিন্তু তার স্ত্রীর করেন না। তাই প্রায় প্রত্যেক নেপালীকে তিব্বতে আলাদা স্ত্রী রাখতে হয়। নেপাল এবং ভুটান সরকারের আইন অনুসারে বাপের সম্পত্তিতে ভোটিয়া ছেলে এবং তার মায়ের কোনো অধিকার নেই। এটা একেবারে অন্যায়। কারণ আরেক রূপে এটা প্রকাশ্যে বেশ্যা-বৃত্তি। ঐ ব্যবসায়ীর ওখানে আমি দিনের বেলা গেলাম, তখন সেখানে লম্বা চুল-দাড়িওলা এক হিন্দু সাধুকে দেখলাম। আমি তো ভোটিয়া বেশে ছিলাম, আর কথাও বলছিলাম ভোটিয়াতে, সাধু আমাকে চিনতো কি করে? কে একজন আমাকে বলল যে তিনি তিব্বত যেতে চান, এখান অব্দি পৌঁছে গেছেন, এখন জোঙ্-পোন্ ধরে ফেলেছেন। আর ওপরে যেতে পারবেন না, নিচে ছেড়ে দিতে রাজি কিন্তু জামিন নেবার লোক নেই।

যখন আমি এইভাবে সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে পড়ছিলাম, তখন এই প্রসঙ্গে আমার সেই মোঙ্গল বন্ধুটিকে বললাম। তিনি বললেন, 'এতে আর মুশকিলের কি আছে? রাস্তার ছাড়পত্র আমি নিয়ে আসছি।' সত্যি সত্যিই দেখি খানিক পরে তিনি দুটো ছাড়পত্র নিয়ে চলে এলেন। তাতে ডে-পুঙ্ বিহারের দু-জন ভিক্ষুর নাম ছিল, যাঁরা বুদ্ধগয়া দর্শন শেষ করে তাদের বিহারে ফিরে আসছিলেন। এখন আমরা ছাতুর দেশে ঢুকছিলাম, আর পিঠে বোঝা নিয়ে পায়ে হেঁটেই চলতেও হচ্ছিল। ছাতু যে পেট ভরে খেতে পারব, এতে আমার সন্দেহ ছিল। তাই চিঁড়ে চিনি আরো কত জিনিস অল্প-অল্প জমা করেছিলাম। মঙ্গোলের পিঠে মণ খানেকের বেশি বোঝা ছিল আর আমার পিঠের জন্যেও ২০, ২৫ সের মাল হয়ে গিয়েছিল। লামা আমার জন্যে একটা ভালো চিঠি লিখে দিয়েছিলেন, পথে খাওয়া-দাওয়া করার জন্যে অনেক কিছু দিয়েছিলেন। দুপুরের পরে আমরা দুজন রওনা দিলাম। আমাদের দুজনেরই বেশবাস এমন ছিল, যে দেখলে ভিখিরি ছাড়া আর কিছু কেউ ভাবতেই পারতো না। আমার ছুপা (চোপা) ছেঁড়া তো ছিল না, কিন্তু অনেক জায়গাতেই তার লাল রং ফিকে হয়ে গিয়েছিল আর সে-কাপড়ও ছিল বস্তার মতো। পায়ের জুতোও ছিল সেইমতো। তবে হ্যাঁ, এখন আর সেটা কাটতো না। পিঠের ওপর দুটো বাঁকানো কাঠের মাঝখানে বোঝাটা বেঁধে দু-পাশটা বাইরে রেখে কাঁধের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের হাতে একটা করে লাঠি ছিল। চারদিকে নগ্ন পাহাড়, যার একদিকে,

—১৯২৯—

পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশংকর তার রূপোলী সৌন্দর্যকে নীল আকাশে প্রতিফলিত করেছিল। দুই ভিখিরী পুল পার হয়ে চড়াইতে উঠতে শুরু করলাম। যদি না এত তাড়াতাড়ি চড়াই এসে পড়ত তাহলে হতেই পারত যে আমি আরো বেশিক্ষণ ধরে গৌরীশংকরের সৌন্দর্য দুচোখ ভরে দেখতাম কিন্তু সেখানে একটু পরেই পুরো বিশ্ব সংসার কটু মনে হতে লাগল। আমার কাঁধ ভেঙে যেতে লাগল, ছাতি ফেটে যেতে লাগল, আর মঙ্গোল সাথীর হাসির কথাগুলো পর্যন্ত বিচ্ছিরি লাগতে থাকল। দেড়-দু মাইল যাবার পর তো আমি তাঁকে বার বার জিজ্ঞেস করতাম যে, সামনের বিরতিস্থল কোথায়। যদিও তখনো নিজের কাপুরুষতাকে বাইরে প্রকাশ করতে আমি তৈরি ছিলাম না। ১২, ১৩ হাজার ফিট উচ্চতায় এমনিতেই অক্সিজেনের অভাবে হাঁপ ধরে আর লোকে তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার ওপরে আমি আবার পিঠে বোঝা নিয়ে ছিলাম। মঙ্গোল ভিক্ষু আমার কাঁধের সমানও ছিলেন না, কিন্তু তিনি লাফিয়ে হাঁটছিলেন। সেদিন আমি প্রথমে আমার দাদুকে, তারপরে নিজেকে অনেক গালমন্দ করলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, ছেলেকে কখনো সুকুমার বানিয়ে তুলতে নেই, তাকে দিয়ে পুরো শারীরিক পরিশ্রম করাতে হয়। বোঝা বওয়া, মাটি কোপানো এইগুলো সব থেকে উৎকৃষ্ট শারীরিক ব্যায়াম। ভেতরে ভেতরে কাঁদতে কাঁদতে ৩, ৪ ঘন্টা হেঁটে, বসে আমরা একটা বড় মঠে পৌঁছেছিলাম। তিব্বতে ঢুকে এই প্রথম বেশ একটি খাসা মঠ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। দর্শন এমনিতেও করতাম, কিন্তু এখন তো সেই অজুহাতে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন ছিল। ওখানকার ভিক্ষুরা ভালো ছিলেন। আমরা দর্শন করতে গেছি আর এদিকে গরম-গরম চা তৈরি হয়ে চলে এসেছে। তিব্বতে একবার চা খেতে বসলে এক পেয়ালায় কি কাজ হয়? আমি চায়ে অতি ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগলাম এই ভেবে যে, আরো খানিকটা দেরি হয়ে যাক, তাহলে আর সামনে চলার প্রশ্ন উঠবে না। ডাম্-এ আমার একজন সুসংস্কৃত ভোটিয়া সজ্জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি গোরখা ভাষা আর একটু-একটু হিন্দিও বলতে পারতেন। আমাদের সঙ্গেই তিনি ঞেনম্ পর্যন্ত এসেছিলেন। এখন জানা গেল, তিনি পরের গ্রামটিতে আছেন। সেই গ্রামের একটা ছেলে তার বাড়ি ফিরছিল। মঙ্গোল ভিক্ষু বললেন, 'চলুন, আজ ঐ গাঁয়ে গিয়ে থাকব।' সেটা কত দূরে জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'এই তো দু-পা দূরে।' এখান থেকে উঠতে মন তো করছিল না, কিন্তু মঙ্গোল-ভিক্ষু লোভ দেখালেন, ঐ গাঁয়ে পৌঁছতে পারলে সেই সজ্জনের সহায়তায় কোনো মাল বইবার কুলি মিলে যাবে। উঠে পড়লাম।

এবার যে দু-পা ক্রমে বেড়েই চলল, সে একশো ক্রোশ না দুশো ক্রোশ পরে শেষ হবে তা বোঝাই যাচ্ছিল না। পাঁচ-ছবার 'আর কত দূরে' জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু সেই জবাব, 'আর দূরে নয়'। তারপর আমি জিজ্ঞেস করা বন্ধ করে দিলাম, আর ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসতে লাগলাম। দুজনের পেছনে দড়ির টানে ঘষটাতে ঘষটাতে আমি এমনভাবে যাচ্ছিলাম, যেন কসাই-এর পেছনে দড়ি-বাঁধা গরুটি। যখন আমরা সেই গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম ততক্ষণে রাত ন-টা দশটা বেজে গিয়েছিল। কুশোক্ (সজ্জন) যে ঘরে ছিলেন সেখানে পৌঁছে আমি দড়ির ফাঁস থেকে হাত বের করে নিলাম তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে

বিছানার ওপরে চিৎ হয়ে পড়ে রইলাম। মোঙ্গল নিশ্চয় সব কথা বলেছিল। কাঠের আগুনে লোহার আংটার ওপরে বসানো থুক-পা ফুটছিল—ছাতু বা চালের সঙ্গে মুলো, হাড়, আর যদি পাওয়া যায় অল্প মাংসও কয়েক ঘণ্টা ধরে আঁচে রাখলে যে পাতলা লেইয়ের মতো হয় সেটাকে বলে থুক্-পা। থুক্-পা তৈরি হলো, আমিও আমার কাঠের পেয়ালা (কটোরা) বের করলাম আর দু-চার পেয়ালা পান করলাম।

কুশোক্ যাচ্ছিলেন লপ্‌চীর বড় তীর্থে। একাদশ শতাব্দীতে আমাদের ৮৪ জন সিদ্ধপুরুষের পরম্পরাতে তিব্বতে একজন খুব বড় সিদ্ধপুরুষ জন্মেছিলেন। তাঁর নাম ছিল জে-চুন্-মিলা-রেপা। তাঁর অনেক সিদ্ধি খ্যাতি পেয়েছে। মিলা-রেপা শুধু যে সিদ্ধপুরুষ তাই নন, তিনি তিব্বতের সবচেয়ে বড় কবি। তিব্বতের শীতেও তিনি একটি সুতির কাপড় পরতেন, সেইজন্যে তাঁকে বলা হয় রেপা—সুতির কাপড় পরিহিত ব্যক্তি। মিলা-রেপা কয়েক বছর ধরে লপ্‌চীতে ছিলেন, তাই এখন ওটা খুব বড় তীর্থ বলে মানা হয়। ডুক্‌পা লামাও নিজের অন্তিম জীবন কাটাতে ওখানেই যাচ্ছিলেন। আমাদের কুশোক্‌ও লপ্‌চীর রাস্তায় ছিলেন। তিনি মোঙ্গলভিক্ষুকেও যাওয়ার জন্যে বললেন। তাঁর জিভে জল এসে গেল। যখন তিনি আমার মতামত জানতে চাইলেন, আমি প্রথমে আমার চলার অক্ষমতার কথা বললাম। কিন্তু কুশোক্ আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন এই বলে যে, মালপত্তর অন্য লোকে পিঠে নিয়ে যাবে। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমরা রাস্তা থেকে বে-রাস্তায় যাচ্ছি এবং একটার বদলে দুটো বড় বড় উঁচু জোত (ডাড়ে, লা) পার হতে হবে। লপ্‌চীর পরে যে বোঝা বইবার কোনো লোক পাওয়া যাবে, সে-আশাও ছিল না। কিন্তু এখন না বলার মানে নিজেকে শ্রদ্ধাহীন বলে প্রকাশ করা। তাই মৌন থেকে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

দ্বিতীয় দিন আমরা লপ্‌চীর দিকে চললাম। পিঠ খালি থাকায় চলতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। কেবল রাস্তার এক জায়গায় পাহাড়ের ওপর থেকে নিচের পাথুরে মাটি নদীর মতো নেমে গিয়েছিল—সেখানে আমার লোম খাড়া হয়ে উঠছিল। তিন বছর আগে লাদাখ থেকে ফেরার সময় আমাকে এইরকম একটা বড় নদী পেরোতে হয়েছিল। ভাবছিলাম, এই পথে না জানি এইরকম আরো কতগুলো ধারা পাওয়া যাবে। সবার পেছনে পড়ে গেছি দেখে লোকেরা আমাকে হাত ধরে পার করিয়ে দিতে চাইছিল কিন্তু আমি আমার আত্মাভিমান বিসর্জন দিতে রাজি ছিলাম না, তাই প্রাণটি হাতে করেই নিজে নিজে ওপারে চলে গেলাম।

যখন জোত আর মাইল চার-পাঁচ দূরে, তখন ঠিক হলো যে, এখানেই থামা যাক। কেননা এগোলে চা তৈরি করার শুকনো কাঠও পাওয়া যাবে না, শীতও বেশি পড়বে। এমন কি বরফও থাকতে পারে। কুশোক্-এর তাঁবু (ছোলদারী) টানানো হলো, লোকেরা এখান-সেখান থেকে ইয়াকের শুকনো গোবর জমা করল। আগুন জ্বালিয়ে হাপর চালানো তখনো শুরু হয়নি, এমন সময় আকাশ থেকে বড় বড় তুলোর পাঁজের মতো বরফ পড়তে শুরু করল। বোধহয় এই প্রথমবার আমি আকাশ থেকে বরফ পড়তে দেখেছিলাম। বরফ পড়ছে তো পড়ছেই—আমরা অতি কষ্টে চা বানাতে পেরেছিলাম। চায়ের চোঙার মধ্যে

সোডা, নুন, মাখন মিশিয়ে গুঁড়ো করার সুযোগ ছিল না। সব লোকের পেয়ালাতেই চায়ের ওপরে খানিক খানিক মাখন দিয়ে দেওয়া হলো। আমরা সেদিন চিড়ে খেলাম আর কয়েক পেয়ালা চা।

কুশোক্-এর কাছে লণ্ঠন ছিল, তিনি ধর্মচর্চা করার জন্যে বললেন। আমার কাছে সংস্কৃতে লেখা শান্তিদেবের 'বোধিচর্যা' ছিল। কুশোক্-এর শ্লোকগুলোর তিব্বতী অনুবাদ মুখস্থ ছিল। আমি সংস্কৃত শ্লোক পড়ে পড়ে তার কিছু ভাবার্থ ভাঙা-ভাঙা ভাষায় করে দিচ্ছিলাম, তারপরে তিনি তিব্বতী শ্লোকটা বলে চার-পাঁচজন শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্যে তার ব্যাখ্যাও করে দিচ্ছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের চর্চা চলতে লাগল, বরফ তেমনিই পড়ে চলছিল। যখন তাঁবুর ওপর বেশি-বরফ জমে যাচ্ছিল, তখন ঝট্‌কা মেরে সেটা ফেলে দেওয়া হচ্ছিল। এতদিন পর্যন্ত আমার শরীরে উকুন হয়নি। কিন্তু এখন তো ওই ছোট তাঁবুর ভেতরে পাঁচ-ছ জন লোক গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ে ছিল। রাতে মনে হতে লাগল, শরীরে যেন কয়েকশো পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। আমরা যখন খাবার-দাবার ভাগ করে নিয়েছি, তখন উকুনেরও তো ভাগ নেওয়াই উচিত?

সকালে উঠে দেখেছিলাম, চারপাশের জমি একহাত পুরু বরফে ঢেকে আছে। আমি বলার কিছু আগেই লোব্‌জঙ্-শেরব্ মোঙ্গল-ভিক্ষু এসে বললেন 'এখানেই যখন এত বরফ তখন আরো ওপরে চড়লে তো আরোই বেশি হবে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে পরামর্শটা কি?' তিনি বললেন, 'লপ্‌চী যাবার বাসনা ত্যাগ করা উচিত'। আমি দু-চারটে রসিকতা করলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত তো ছিলামই। লোব্‌জঙ্-শেরব্ কথার অর্থ হলো সুমতিপ্রাজ্ঞ। পাঠকদের মনে রাখার পক্ষে সুপ্রতিপ্রাজ্ঞ বা সুমতি বললে পাঠকদের নামটা বেশি মনে থাকবে। তাই এর পর থেকে মঙ্গোল-ভিক্ষুকে আমি এই নামে ডাকব।

সুমতি কুশোক্‌কে ফিরে যেতে বললো। তিনি তো নিজেই যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তাই ফিরতে যাবেন কেন। তবে আমাদের বিদায় দিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সেই গ্রামে ফিরে এলাম এবং এবার গোয়া (গ্রামের মুখিয়া)-র বাড়িতে এসে উঠলাম। রাতে জানতে পারলাম যে, কুশোক্ আর তাঁর লোকজনেরাও খিদে তেষ্টায় পথভ্রষ্ট হয়ে টো-টো করে ফিরে এসেছেন। বরফের জন্যে কোনো রাস্তা ঠাহর করতে পারেননি আর তাঁদের সঙ্গে কালো চশমাও ছিল না, তাই বরফ-কানা হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা দুজন আমাদের ভাগ্যের প্রশংসা করলাম।

সুমতি অনেক বছর থেকেই প্রতি শীতে বুদ্ধগয়ায় তীর্থ করতে আসতেন আর ফেরার পথে কাপড়ের তাগা এবং প্রসাদ দিয়ে-দিয়ে যজমানদের কাছ থেকে দক্ষিণা আদায় করে ফিরতেন। লেখাপড়ার সঙ্গে ওঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। বছরের ন-মাস তো যেতেই কেটে যেত। আর এ থেকে কিছু পয়সাও পেয়ে যেতেন, যা দিয়ে তিনি ডে-পুঙ্ বিহারে থেকে খাওয়া-দাওয়া করতেন। তারপর আবার নতুন যাত্রা শুরু করে দিতেন। তিনি গোয়ার কাছে কাকুতি-মিনতি করে পরের দিনের জন্য একজন লোক ঠিক করে নিলেন। মালপত্র তার পিঠে দিয়ে আমরা চলতে শুরু করলাম। আর পরের গ্রাম—যেটা মূল সড়কের ওপরেই ছিল—সেখানকার গোয়ার ঘরে এসে পৌঁছলাম। সে-ঘরে দুটিমাত্র

প্রাণী। একজন ২৫ বছরের যুবক আর এক বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের বুড়ি। আজ আমাদের এখানেই থাকার কথা ছিল। এক তো আমরা এরপর থেকে কোনো ভারী (ভারবাহক) নিতে চাইছিলাম। দ্বিতীয়ত, এই গ্রামে সুমতির কিছু যজমান ছিলেন, যাঁদের কাপড়ের তাগা আর প্রসাদ বিতরণ করতে হতো। তিব্বতের লোকেরা স্নান তো করে বছর দু-বছর বাদেই, কিন্তু পুরুষ-মহিলা দুজনেরই লম্বা লম্বা চুলে তেল দেওয়া আর আঁচড়ে বাঁধার প্রয়োজন হয় মাসে-দুমাসে। গৃহপত্নীর আজ শৃঙ্গারের দিন ছিল। এখানকার স্ত্রীলোকদের শৃঙ্গার আরো ঝামেলার ব্যাপার। চুল দু-ভাগ করে দুটো বিনুনি বানানো তারপর আবার বাঁশের ধনুকাকৃতি কাঠামোতে লাল কাপড় আর সামর্থ অনুযায়ী মোতি-মুঁগা-ফিরোজা লাগিয়ে ধনুকটাকে মাথার ওপর দুটো বিনুনির সাহায্যে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। গৃহপত্নীকে সাজিয়ে দিচ্ছিল যুবকটি। মাকে সাজাচ্ছে এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর সেজন্যেই আমি সুমতিকে শুধোই, 'এরা দুজন মা-ছেলে?' আমার গলা হয়তো কিছুটা উঁচু ছিল। সুমতি আমার হাত টিপে দেন। আব কানে কানে বলেন, 'চুপ. দুজন স্বামী-স্ত্রী।' আমি তো পড়ে ছিলাম যে, তিব্বতে বড়ভাই-এর বিয়ে হয় আর সেই বউ-ই পত্নী হয় সবার—কত বাচ্চা স্বামী তো বিয়েব পবও জন্মায়। কাবণ সহোদর ভাইদের একটিই বৌ হতে পারে। কিন্তু বই পড়ে থোড়াই কাজ চলে। বিশ্বাস হয় চোখে দেখলে।

সুমতি গ্রামে ঘুরে-টুরে এলেন। তারপর আমাকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য বললেন। তিব্বতের বড় বড় কুকুর বড়ই মারাত্মক। আমি বাইরে বেরুতে সাহস করতাম না। কিন্তু সুমতি তার ডাণ্ডা নিয়ে সারা গাঁ ঘুরে বেড়ান। আমি শুধোলাম, 'কোথায় যেতে হবে?' বললেন, 'এক বড়লোক গৃহিণীর সন্তান নেই। তার জন্য একটা তাবিজ লিখে দিতে হবে। যা মনে হয় লিখে দাও। যদি সে-তীর লেগে যায় তো প্রতি যাত্রায মাখন, মাংস, ছাতু আর কিছু পয়সার বাঁধা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

বন্ধুর জন্য এটুকু সহায়তা বড় কোনো ব্যাপার ছিল না। আমি ওঁর পিছনে পিছনে চললাম। ঘরে পৌঁছলাম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হতো। সিঁড়ির কাছেই একটা হিংস্র কুকুর লোহার শিকলে বাঁধা ছিল। সেটা হাউ-হাউ করতে লাগল। যাকগে, একজন স্ত্রীলোক এসে নিজের কাপড় দিয়ে কুকুরের মুখ ঢেকে বসে গেল। আমরা ওপরে উঠে গেলাম।

দেড় বিঘৎ উঁচু মোটা গদির আসন পাতা ছিল। সামনে ছিল চা রাখার হালকা চৌকি। আমরা দুজন বসে পড়লাম। গৃহপত্নী চা এনে পেয়ালায় ঢালতে শুরু করল। সুমতি কাগজপত্র চাইলেন। সে কাগজপত্র আনতে গেল, আমি জিগ্যেস করলাম, 'কার জন্যে তাবিজ লেখাচ্ছো?' তিনি বললেন. 'এই তো গৃহপত্নী।' আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'এই বাহান্ন বছরের বুড়িকে তুমি পুত্র দিতে যাচ্ছ?' সুমতি আস্তে বলাব জন্যে ইশারা করে বললেন, 'আমাদের কি আসে যায়। কিছু ছাতু-মাখন তো মিলবেই।' আমি তাবিজ লিখে দিলাম। পুত্র হয়েছিল কিনা সে-কথা সুমতি জানেন। সুমতি স্তোত্রের বই কুঁথিয়ে-কুঁথিয়ে পড়ে নিতেন। কিন্তু লিখতে পারতেন না।

সামনের যাত্রার জন্য গোয়া আমাদের লোক দিয়েছিল। এটা নেপাল থেকে তিব্বত

যাওয়ার মূল রাস্তা। ফরী-কালিম্পঙের রাস্তা যখন খোলেনি, তখন শুধু নেপালেরই নয়, ভারতেরও জিনিস এই রাস্তা দিয়ে তিব্বতে যেত। এটা কেবল বাণিজ্যিক পথ না, সৈনিকদেরও পথ ছিল। এইজন্য জায়গায় জায়গায় ফৌজি-চৌকি আর কেল্লা বানানো আছে, যেগুলোতে কখনো চীনা সৈন্যরা থাকত। এখন অনেক ফৌজি-ঘর ভেঙে গেছে। দুর্গের কোনো অংশে, যেখানে কৃষকরা নিজেদের বসতি বানিয়ে নিয়েছে, সেখানে ঘরগুলোতে কিছু লোকজন চোখে পড়ে। এই রকমই পরিত্যক্ত একটা চীনা কেল্লা ছিল। আমরা সেখানে চা খাবার জন্য থামলাম। তিব্বতে যাত্রীদের প্রচুর অসুবিধেও আছে, আবার কিছু আরামের ব্যাপারও আছে। ওখানে জাতপাত-ছুৎমার্গের প্রশ্নই নেই, আর কোনো মহিলাই পর্দানসীন নয়। অনেক নিম্নশ্রেণীর ভিখিরিদেব লোকে চুরির ভয়ে ঘরে ঢুকতে দেয় না, তা নইলে আপনি সোজা ঘরের ভিতর ঢুকে যেতে পারেন—সে আপনি সম্পূর্ণ যদি অপরিচিত হোন, তবুও ঘরের বউ বা শাশুড়িকে ঝোলা থেকে চা বের করে দিতে পারেন। সে আপনার জন্য ওটা তৈরি করে দেবে। মাখন আর সোডা-নুন দিয়ে দিন, সে চা-চোঙিতে কুটে ওটাকে দুধ দেওয়া চায়ের রঙে বানিয়ে মাটির হাতলওলা বাসনে (খোটী) রেখে আপনাকে দিয়ে দেবে। যদি বসার জায়গা উনুন থেকে দূরে হয় আর আপনার ভয় হয় যে, সব মাখনটা আপনার চায়ে হয়তো পড়বে না, তাহলে আপনি নিজে গিয়ে চোঙিতে চা ফেটিয়ে আনতে পারেন—চায়ের রঙ তৈরি হয়ে যাবার পর তাতে নুন-মাখন দেবার দরকার হয়।

পরিত্যক্ত চীনা দুর্গ থেকে যখন আমরা চলে যাচ্ছি, তখন একজন লোক রাস্তার ছাড়পত্র চাইতে এলো। আমরা সেই দুটো চিরকুট তাকে দিয়ে দিলাম। সম্ভবত সেই দিন আমরা থোঙ্‌লার আগের শেষ গ্রামে পৌঁছে পেলাম। এখানেও সুমতির জানা-শোনা লোকজন ছিল। আর ভিখারি হয়েও থাকার ভালো জায়গা গেলাম। পাঁচ বছর পর আমরা এই রাস্তা দিয়েই ফিরে ছিলাম—ভিখারি হয়ে নয়, এক ভদ্র যাত্রীর বেশে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলাম। কিন্তু সে-সময় কেউ আমাদের থাকার জায়গা দেয় নি। আমরা গাঁয়ের একজন সবচেয়ে গরিব মানুষের ঝুপড়িতে ছিলাম। মানুষের অনেক কিছুই নির্ভর করে তার সেই সময়কার মনোবৃত্তির ওপর। বিশেষ করে, সন্ধের সময় খুব কম লোক ছঙ্ খেয়ে চ্যাঠা-চৈতন্য ঠিক রাখতে পারে।

এবার আমাদের সব থেকে ভয়াবহ ডাঁড়া থোঙ্-লা পেরোবার ছিল। ডাঁড়াগুলো তিব্বতে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা। ষোল-সতের হাজার ফিট উঁচু হওয়ার জন্যে এর দুদিকে মাইলখানেক ধরে কোনো গ্রামগঞ্জ থাকে না। নদীর বাঁক আর পাহাড়ের কোণের কারণে অনেক দূর পর্যন্ত লোকজনকে নজর করা যায় না। ডাকাতদের পক্ষে এগুলোই সবচেয়ে ভালো জায়গা। তিব্বতে গ্রামে এসে যদি খুন হয়ে যায়, তাহলে তো খুনী সাজাও পেতে পারে। কিন্তু এই নির্জন জায়গায় মরে যাওয়া লোককে নিয়ে কেউ পরোয়া করে না। সরকার গোয়েন্দা-বিভাগ আর পুলিশের পিছনে ততটা খরচ করে না। আর সেখানে কোনো সাক্ষীও তো পাওয়া যায় না। ডাকাত আগে লোককে মেরে ফেলে। তারপর দেখে পয়সাকড়ি কিছু আছে কি না। হাতিয়ারের কোনো আইন না থাকায় লোক লাঠির মতো

পিস্তল-বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ডাকাত যদি প্রাণে না মারে তো তার নিজের জীবন বিপন্ন হয়। গ্রামে আমরা জানতে পারলাম যে, গতবছরই থোঙ্-লার কাছে খুন হয়েছে। খুনের জন্য হয়তো আমাদের ততটা ভয় ছিল না, কেননা আমরা তো ভিখিরি। আর কোথাও যদি সে-রকম চেহারার লোক দেখতাম, তাহলে টুপি খুলে জিভ বের করে 'কুচী-কুচী (দয়া-দয়া) এক পয়সা' বলে ভিক্ষা চাইতে শুরু করতাম। পাহাড়ের উঁচু চড়াই ছিল, পিঠে মালপত্র নিয়ে কি চলতে পারতাম? আর পরের বিশ্রাম-স্থল ১৬, ১৭ মাইলের আগে ছিল না। আমি সুমতিকে বললাম, 'লঙ্কোর পর্যন্ত দুটো ঘোড়া করে নাও। মালপত্রও চাপিয়ে দেব, আমরাও চড়ে যাব।'

দ্বিতীয় দিন আমরা ঘোড়ায় চড়ে ওপরের দিকে চললাম। ডাঁড়ের আগে একজায়গায় চা খেলাম। আর দুপুরে ডাঁড়ের ওপর গিয়ে পৌঁছলাম। আমরা সমুদ্রতল থেকে ১৭-১৮ হাজার ফিট উঁচুতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের দক্ষিণদিকে পুব থেকে পশ্চিমের দিকে হিমালয়ের হাজার হাজার শ্বেতশিখর চলে গিয়েছিল। টিলার দিক দেখা যাচ্ছে যে-পাহাড় তা একদম ন্যাড়া ছিল। না সেখানে বরফের শুভ্রতা ছিল, না কোনোরকম সবুজের চিহ্ন। উত্তরদিকে অনেক কম বরফওলা চূড়া দেখা যাচ্ছিল। সবচেয়ে উঁচু জায়গায় ছিল ডাঁড়ের দেবতার স্থান, যা পাথরের স্তূপ, জানোয়ারের শিং আর রঙ-বেরঙের কাপড়ের ঝাণ্ডা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এরপর আমাদেব বরাবর উৎরাইয়ে যাওয়ার ছিল। চড়াইয়ের কিছু দূর একটু কষ্টকর ছিল, কিন্তু উৎরাই মোটেই তা নয়। বোধ হয় আরো দু-একটা ঘোড়ায় চড়া সাথী আমাদের সঙ্গে চলছিলেন। আমার ঘোড়া একটু ঢিমে তালে চলছিল। আমি ভাবলাম চড়াইয়ের পরিশ্রমের জন্যই ও এরকম করছে। আমি ওকে মাবতে চাইছিলাম না। ধীরে ধীরে ও অনেক পিছিয়ে পড়ল। আর আমি ডনকুইক্সটের মতো নিজের ঘোড়ার ওপর দুলতে দুলতে যাচ্ছিলাম। বোঝা যাচ্ছিল না, ঘোড়া সামনে যাচ্ছে না পিছনে। যখন আমি তাড়া দিচ্ছিলাম তখন ও আরো মন্থর হয়ে যাচ্ছিল। এক জায়গায় রাস্তা দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আমি বাঁদিকের রাস্তা ধরে এক-দেড় মাইল চলে গেলাম। সামনে একটা ঘরে জিজ্ঞেস করে জানলাম, লঙ্কোরের রাস্তা ডানদিকেরটা ছিল। ফের ঘুরে গিয়ে তাকে ধরলাম। চারটা-পাঁচটা নাগাদ আমি গ্রাম থেকে মাইল খানেক যখন এলাম, তখন সুমতিকে অপেক্ষারত দেখলাম। মোঙ্গলদের মুখ এমনিতেই লাল হয়, আর এখন তো তিনি পুরো রেগে কাঁই হয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমি দু-ঝুড়ি ঘুঁটে পুড়িয়ে ফেললাম, তিন-তিনবার চা গরম করলাম।' আমি খুব নরম হয়ে বললাম, 'কিন্তু আমার দোষ নেই বন্ধু। দেখছো না আমি কেমন ঘোড়া পেয়েছি। আমি তো ধরে নিয়েছিলাম পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।' যাহোক, সুমতি যত তাড়াতাড়ি রেগে যেতেন, ঠাণ্ডাও হয়ে যেতেন তেমনি তাড়াতাড়ি। লঙ্কোরে তিনি একটা ভালো জায়গায় থাকলেন। ওখানেও তাঁর অনেক ভালো ভালো যজমান ছিলেন। প্রথমে চা-ছাতু খাওয়া হলো, রাতে গরমাগরম থুক্পা পাওয়া গেল।

এবার আমরা তিঙরীর বিশাল ময়দানে এসে পড়েছিলাম, যেটা পাহাড়ে ঘেরা একটা দ্বীপের মতো দেখাচ্ছিল। দূরে এই ময়দানের ভেতর ছোট একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

সেই পাহাড়টির নাম তিঙরী-সমাধি-গিরি। আশপাশের গ্রামেও সুমতির কত-কত যজমান ছিলেন। পাতলা পাতলা করে চেরা কাপড়ের তাগা শেষ হতো না। কারণ, বুদ্ধগয়া থেকে আনা কাপড় শেষ হয়ে গেলে যে-কোনো কাপড় দিয়েই বুদ্ধগয়ার তাগা বানিয়ে নিতেন। তিনি তাঁর যজমানের কাছে যেতে চাইছিলেন। আমি ভাবলাম, ইনি তো হপ্তাখানেক ওদিকেই লাগিয়ে দেবেন। আমি তাঁকে বললাম, 'যে-গ্রামে থাকতে হবে বড়জোর সেখানেই তাগা বিতরণ করো। অন্য গ্রামে আর যেও না। এরজন্য লাসা পৌঁছে আমি তোমাকে টাকা দিয়ে দেব।' সুমতি মেনে নিলেন।

পরের দিন আমরা ভারীর খোঁজ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। সকালেই বেরিয়ে পড়লে ভালো হতো। এখন দশটা-এগারোটার কড়া রোদে চলতে হচ্ছিল। তিব্বতের রোদও ভীষণ কড়া লাগছে, যদিও সামান্য মোটা কাপড় দিয়েও মাথা ঢেকে নিলে আর গরম লাগে না—আপনি দুটোর সময় সূর্যের দিকে মুখ করে হাঁটছেন, রোদে কপাল পুড়ে যাচ্ছে, আর পিছনের কাঁধ বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আমরা আবার পিঠে নিজের-নিজের জিনিস উঠিয়ে নিলাম, হাতে লাঠি ধরলাম, আর চলতে থাকলাম। যদিও সুমতির পরিচিত তিঙরীতেও ছিল, কিন্তু তিনি আরো একজন যজমানের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন। তাই লোক দেখার বাহানা করে শেকর বিহারের দিকে যাওয়ার জন্য বললেন। তিব্বতের জমি বড়বেশি ছোটবড় জায়গীরদারদের মধ্যে ভাগ করা আছে। এই জায়গীরের খুব বেশি অংশ মঠগুলোর (বিহারগুলোর) হাতে আছে। আপন আপন জায়গায় প্রত্যেক জায়গীরদার নিজের হাতে কিছুটা আবাদ করে নেয়। তার জন্যে বেগার খাটার মজুর পাওয়া যায়। সেখানে খেতের ব্যবস্থাপনা দেখাশোনার জন্য কোনো ভিক্ষুকে পাঠানো হয়, যিনি জায়গীরের লোকজনের কাছে রাজার চেয়ে কম নন।

শেকরের খেতের মুখিয়া ভিক্ষু (নমসে) খুব ভদ্র পুরুষ ছিলেন। তিনি খুব আন্তরিকভাবে দেখা করলেন। যদিও, সে-সময় আমার বেশভূষা এমন ছিল না যা তাঁর নজরে পড়তে পারতো। এখানে একটি খুব ভালো মন্দির ছিল, যেখানে কন্-জুর (বুদ্ধবচন-অনুবাদ)-এর হাতে লেখা ৯০৩টি পুঁথি রাখা ছিল, আমার আসনও সেখানেই হয়েছিল। সেগুলো বড় মোটা কাগজে সুন্দর অক্ষরে লেখা ছিল এবং এক-একটি পুঁথি বোধ হয় ১৫ সেরের কম হবে না। সুমতি ফের আশপাশে তার যজমানের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে শুধোলেন। এখন আমি বইয়ের মধ্যে ডুবে ছিলাম, তাই ওঁকে যেতে বলে দিলাম। পরের দিন তিনি গেলেন। আমি ভেবেছিলাম, ২, ৩ দিন লাগবে। কিন্তু সেদিনই দুপুরের পরে তিনি ফিরে এলেন। এখান থেকে তিঙরী গ্রাম খুব দূরে ছিল না। আমরা নিজের-নিজের বোঝা পিঠে ওঠালাম আর ভিক্ষু নম্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলাম।

তিঙরীর ভূতপূর্ব জোঙ্-পোন্ সুমতির পরিচিত ছিলেন। তিনি যখন জোঙ্পোনের বাড়ি যাওয়ার কথা বললেন, আমি তো খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমি অন্য কোথাও থাকার কথা বললাম। কিন্তু আমার সাথী বললেন, 'কোনো ক্ষতি হবে না। ও তোমাকে চিনতে পারবে না।'

বাইরের উঠোনে শেকলে বাঁধা কুকুর হাউ-হাউ করে স্বাগত জানাল। আমরা যেই ভেতরের উঠোনে পৌঁছলাম, অমনি গৃহস্বামী নিজে উঠে হেসে বললেন, 'ও হো সোগ্‌পো গেলোঙ্ (মোঙ্গল ভিক্ষু), আর এ যে দেখছি লদাপা (লদাখী)-ও।' তিনি নিজের হাতে আমাদের পিঠের বোঝা নামিয়ে মাটিতে রাখতে লাগলেন। সেই উঠোনেই আসন বিছিয়ে দেওয়া হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে শুকনো মাংস-ছাতু এবং চা আমাদের সামনে চলে এলো। এখনো শুকনো মাংস খাওয়ায় অভ্যস্ত হতে আমার অনেকদিন লেগেছিল। চা খেতে লাগলাম। এতদিন পর্যন্ত আমি নিজেকে খুনূপা (কনৌরবাসী) বলতাম, কিন্তু দু-তিন জায়গায় লোককে আমি লদাপা বলতে শোনায় এখন থেকে আমি নিজেকে লদাপা বলাই স্থির করেছিলাম। গৃহস্বামী সুমতিকে রাস্তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলেন। তাঁর চাম-কুশো (ভদ্রমহিলা)-ও সুমতির পরিচিত ছিলেন। দুজনেই আমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আমার ভয় চলে যাচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম তিনি এখনো জোঙ্-পোন্ আছেন। কিন্তু জোঙ্-পোনের পদ ছাড়া তাঁর অনেক দিন হয়ে গিয়েছিল। আর এখন তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ছিলেন লাসার বাসিন্দা, তবে বেশিরভাগ সময় তিঙরীতেই থাকতেন। এখানে তিনি একজন খুব বড় ধনীর মতো থাকতেন। কিন্তু বেশ কয়েক মাস পর আমি যখন তাঁকে লাসাতে দেখি তখন তিনি অত্যন্ত মামুলি পোশাকে ছিলেন।

সন্ধের সময় বর্তমান জোঙ্-পোন্ (ম্যাজিস্ট্রেট), এলেন এই বাড়িতে। সন্ধে পাঁচটা থেকেই তিব্বতে ছঙ পান করার সময় হয়ে যায়। তাকে রুপোর পেয়ালায় ছঙ দেওয়া হলো। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই দু-এক পেয়ালা পান করে চলে গেল। সূর্যাস্তের সময় গৃহস্বামী তাঁর বীণা (একতারা আর বীণার মাঝামাঝি বাজনা) তুলে নিলেন, আর পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে সুমতিকে বললেন, 'এখন তো আমি চললাম নৃত্যগোষ্ঠীতে। তোমাদের যা দরকার চাকরদের কাছে চেয়ে নিও।' বড়লোকদের বাড়িতে সন্ধের সময় পান আর নাচগান খুব চলে। ওখানে ধনীপুরুষ আর বড় বড় ঘরের মহিলারাও সকলের সামনে নাচতে লজ্জা করে না।

রাতের রান্নাঘরে আমাদের শোয়ার ব্যবস্থা হলো। তিব্বতে আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ খুব কম পাওয়া যায়। এজন্য ছাগলের নাদি আর ঘুঁটে জ্বালানির কাজ দেয়। রাস্তা চলতে গিয়েও আগুন জ্বালতে লোকের হাপরের দরকার হয়। রান্নাঘরের কথা আর কি বলি। যেহেতু সব ভাই-এর একটাই বউ হয় এবং মেয়ের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে কম নয়, তাই বহু মেয়েকে আজন্ম কুমারী থেকে যেতে হয়। বেশিরভাগ মেয়ে চুল কেটে সাধুনী হয়ে যায়। কেউ কেউ ভিক্ষুনীদের মঠে থাকতে চলে যায়, অনেকে বাবা-মার কাছে ঘরে থাকে। আবার কিছু গরিব ঘরের মেয়ে কোনো বড়লোকের ঘরে পরিচারিকার কাজ করে। এই ঘরে তিনজন পরিচারিকা ছিল। একটি দশ-বার বছরের বাচ্চা মেয়ে, একজন ষোড়শী, তৃতীয়জন সাধুনী রাঁধিয়ে। সাধুনীকে অনী বলে ডাকে, এটা আমি বলেছি। অনীর বয়স ৩০-৩৫ হবে। তার মুখ আর হাত একেবারে কয়লার মতো কালো ছিল। কালো মুখের মধ্যে লাল কিনারওলা সাদা-কালো চোখ ভয়ংকর মনে হতো। সত্যিই, আমাদের এখানকার কোনো ছেলে যদি তাকে রাতের বেলায় দেখতো, তাহলে ভয়ে তার নিশ্চয় জ্বর

এসে যেত। বছরের পর বছর ধরে সে যে শুধু স্নানই ছেড়ে দিয়েছিল, তাই না, তার ওপর হাতে কালি-ময়লা যা লাগতো তা-ই গায়ে ঘষে নিত। বোধ হয় মাখন-তেলও পালিশ করে নিত। তাই কালো মুখে একধরনের ঔজ্জ্বল্য ছিল। কখনো মনে হতো, ও এই নোংরা হাতেই রান্না করে। কিন্তু যখন কলসি থেকে থুক্‌পা বের করে-করে আমার পেয়ালায় ঢালতো, তখন সেটা পান করতে আমার ওয়াক উঠে আসতো না।

অনেক রাতে গৃহস্বামী তাঁর বাজনা কিন-কিন করে বাজিয়ে ফিরে এলেন, আর সামান্য মাতলামির সুরে সুমতিকে খাওয়া-দাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করে শুতে চলে গেলেন। আমরা অনেক রাতে থুক্‌পা খাওয়া শেষ করলাম। আমি শোয়ার জায়গা নিয়ে ভাবছিলাম। জানা গেল, এই রান্নাঘরেই শুতে হবে। যাকগে, এখন উনুন আর জ্বলবে না। তাই ধোঁয়ার ভয় নেই। দেওয়ালের সঙ্গে একটা বেদির মতো বানানো ছিল। আমি বিছানা পাতলাম। আমার বালিশে দুজনের মাথা একত্রে রাখার মতো করে সুমতি বিছানা পাতলেন। ষোড়শীর বিছানা তাঁর পায়ের কাছে। আমার পায়ের কাছে বাচ্চা মেয়েটি বিছানা পাতল। কালীমা-ও এককোণে তার বিছানা পাতল। যদিও এখন ছিল সেইরকম গরমের মাস, যখন ভারতের লোকেরা দিনরাত ঘেমে নেয়ে থাকে। কিন্তু তের হাজার ফুট উঁচুতে শীতের কি কোনো ঠিক-ঠিকানা থাকে? ওখানে তো পৌষ-মাঘের মতো ঠাণ্ডা ছিল তখন। তবে আমি এখন শীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলাম। তাই আমার ততটা ঠাণ্ডা লাগতো না। টিমটিম করছিল প্রদীপের আলো। সে-অবস্থাতেই সকলে নিজের নিজের জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলল। তবে হ্যাঁ, এটা নিশ্চিত যে, কাপড় খুলে তারা একেবারে দিগম্বরের রূপ ধারণ করে নি। তিব্বতে বৌদ্ধ স্ত্রী-পুরুষরা শোবার আগে কয়েকটা প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করে। আর নিজের বালিশের দিকে মুখ করে বুদ্ধ এবং গুরুকে প্রণাম করে। সুমতিও করল। ষোড়শীও, সম্ভবত বাকি দু-জনও করল। আমি প্রণাম করলাম না। যদিও সেটা উচিত হলো না। ডুক্‌পা লামার ওখানে নিজেকে সিংহলী ধর্মের বলে আমি পার পেয়ে যেতাম, কিন্তু এখানে কোনো অজুহাতই চলতো না। আসলে আমি স্বাভাবিক অভিনেতা নই, যার জন্য নিজের পার্ট পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারতাম না।

আমি তো ভেবেছিলাম, যেখানে এত অভ্যর্থনা হয়েছে সুমতি সেখান থেকে অত শিগগির যেতে চাইবেন না। কিন্তু ভোরবেলাতেই তিনি জানালেন, 'আমাদের যেতে হবে।' গৃহস্বামী আমাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য কিছু জিনিস দিলেন। আর আমরা চা খেয়ে তিঙ্‌রী রওনা হলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর মাঠ শেষ হলো, আমরা ডানদিকে পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। অধিকাংশ ভূমি সমতল ছিল। আগের দিনের মতো কাঁধ কেটে যাচ্ছিল না, তবে আমি স্বচ্ছন্দে হাঁটতেও পারছিলাম না। আমদানি আর খরচ মিলিয়ে আমার বোঝা একই ছিল। কয়েক মাইল চলার পর আমরা একটা গ্রামে পৌঁছলাম। এখন দুপুরবেলা। চা খাওয়ার জন্য একজনের ঘরে আমরা চলে গেলাম। চা হলো, ছাতু খেলাম, আর ঘরের মহিলাদের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তীর্থের গল্প। আমিও চাইছিলাম যে, সুমতি গল্পে খুব জমে থাকুন, কেননা, পরিশ্রান্তির জন্য এখন আমি আর চলতে চাইছিলাম না। সুমতি সত্যিসত্যিই গল্পে ফেঁসে গেলেন। তারপর যখন

তিনটে-চারটে বাজতে চলল তখন আবার চলার জন্য বললেন। কিন্তু তিব্বতের গ্রাম পাঁচ-সাত মাইলের কম ব্যবধানে নয়। আমি বিলম্বের কারণ দেখিয়ে সেখানেই আজ থেকে যাওয়ার জন্য বললাম, সুমতিও রাজি হলেন।

আমি ভেবেছিলাম, যে-বাড়িতে আমরা চা খেয়েছি ওখানেই এককোণে শোয়ার জায়গা পাওয়া যাবে। কিন্তু বুঝলাম সন্ধেবেলায় খেত আর ভেড়াছাগলের মধ্যে থেকে ঘরে আরো প্রভাবশালী লোক এসে গেছে। ফলে দিনের পরিচয় কোনো কাজে লাগল না। এবং আমাদের অন্য কোথাও যেতে বলা হলো।

ডম্‌বা ছোটমতন একটা গ্রাম। আমরা যখন যাওযার জন্য ইতস্তত করছি, তখন লোকটি গাঁয়ের ভিতরের ধর্মশালার কথা বলল। ধর্মশালা কি—ছোট ছোট দুটি মাত্র কুঠরী। তার একটাতে কেউ খড় ভরে রেখেছিল। অন্য ঘরটায় আমরা আমাদের বিছানা পাতলাম। সুমতি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। আমি বোঝাতে চেষ্টা করলে বললেন, 'তুমি জানো না, এই গাঁয়ে যত কুমারা (চোর এবং ডাকাত দুজনকেই কুমা বলা হয়) থাকে। ওরা এই জনাই আমাদের বাইরে পাঠিয়ে দিল, যাতে রাতে আমাদের মেরে যা কিছু আছে ছিনিয়ে নিতে পারে।' আমি বললাম, 'আমাদের কাছে আছেটা কি যে ছিনিয়ে নেবে?' (আমার কাছে দেড়শো-র বেশি টাকা কোথাও বেঁধে রাখা ছিল)। সুমতি জবাব দিলেন, 'আগে তো ওদের লম্বা তরোয়াল দিয়ে আমাদের দু-টুকরো করবে। তারপর ছাতু-টাতু যা থাকবে নিয়ে চম্পট দেবে। ওখানে খুন হয়ে গেলে কোনো সাক্ষী পাওয়া যায় না। এ-কারণেই আমাদের এখানে পাঠিয়েছে।' কোনোরকমেই তাঁকে শান্ত হতে না দেখে আমি বললাম, 'যাও, থাকাব জন্য কারো ঘর খুঁজে এসো।' তিনি এক গরিব বুড়ির সঙ্গে কথা পাকা করে এলেন। আমরা যখন নিজেদের মালপত্র নিয়ে বুড়ির বাড়ি চলে গেলাম, তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। তিঙ্‌রীতে চলার পর এখন আমি নির্ভীক হয়ে উঠেছিলাম, লাদাখী হওয়াতে নিজের ওপর পুরো আস্থা ছিল। বুড়ির ঘরের মধ্যিখানে ঘুঁটের আগুন জ্বেলে চা হচ্ছিল। তার পাশে বুড়ি এবং আরও দুজন লোক বসে ছিল। আমরাও গিয়ে আগুনের পাশে বসলাম। ওরা যাত্রা সম্বন্ধে সুমতিকে কিছু জিজ্ঞেস করল। ডম্‌বার সামনে চিবরীর অত্যন্ত পবিত্র পাহাড় ছিল, যাকে পরিক্রমা করলে ১০৮টি মন্দির পাওয়া যায় বলে কথিত। চিত্রকূটের কামতানাথের চেয়েও বেশি পবিত্র এই পাহাড়কে তিব্বতের শ্রদ্ধেয় ভক্তরা মান্য করে। এখন ছিল যাত্রার সময়। দূর-দূর থেকে যাত্রীরা পরিক্রমার জন্য এসেছিল। অনেক উগ্র ভক্ত তো নিজের শরীর দিযে মেপে পবিক্রমা করে। আমার মনে নেই, বুড়ির পাশে বসা দুই ঢাবা (সাধু) দণ্ডী দিয়ে-দিয়ে পরিক্রমা করছিল, নাকি সাধারণভাবে করছিল। ওরা চিবরীর কিছুটা মাহাত্ম্যর কথা বলল। আর এটাও বলল যে, এ-বছর যাত্রী এসেছে বেশি। সুমতি কথা বলতে শুরু করলেন, 'তবে তো আমাদেরও পরিক্রমার জন্য যেতে হয়।' লপ্‌চীর মতো ব্যাপারটা যাতে আর না গড়ায়, আমি তাই এক সাঙ্‌ (তিন-চার আনা) পয়সা ঢাবার সামনে রেখে হাত জোড় করে বললাম, 'আমাদের তরফ থেকেও আপনি চিবরীর ধামে প্রণাম করে দেবেন আর এই পয়সা ওখানে প্রণামী দিয়ে দেবেন। আমাদের দু-জনের শিগগির লাসা পৌঁছতে হবে। এজন্য এবার পরিক্রমা

করতে পারব না। পরের বার নিশ্চয় আসব।' সুমতির বোধ হয় এটা পছন্দ হয় নি, কিন্তু তিনি আর কথা বাড়ালেন না।

সকালে আবার পিঠে বোঝা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পরের গ্রাম ছিল মেমো। এটা ডম্‌বার থেকে বড় গ্রাম। এখানেও সুমতির তাঁর যজমানদের কাছে যাবার ছিল। প্রথমে এক গরিব লোকের ঘরে আমাকে আর জিনিসপত্র রেখে সুমতি দেখতে চলে গেলেন। তারপর ফিরে এসে সঙ্গে যাওয়ার জন্য বললেন।

একটা ছেলে আগে আগে যাচ্ছিল, তারপর সুমতি আর সবার পিছনে আমি। একটা ফটক পড়ল। ফটকের ভিতরে লম্বা শিকলে কুকুর বাঁধা ছিল। আমাদের দেখেই সে জোরে জোরে ডাকতে আরম্ভ করল আর শিকলে ঝটকা দিতে লাগল। একটু পরেই শিকল ছিঁড়ে গেল, কুকুরটা ঝাঁপিয়ে এলো আমাদের দিকে। আমি সকলের পিছনে ছিলাম, কিন্তু পলায়নে সকলের আগে। আমি পালিয়ে আবার সেই ঘরের ভেতরে চলে এলাম। সুমতি ডাণ্ডা নাচিয়ে পালিয়ে সিঁড়ির কাছে চলে গেলেন। ঘরের লোকেরা এসে বাঁচিয়ে দিল আমাদের। তারপর ওরা আমাদেরও নিয়ে গেল। সুমতি খুব ভর্ৎসনা করছিলেন, 'তুমি কুকুরকে এত ভয় পাও কেন? কুকুরের শরীর যত বড় হয়, ওর মনের জোর তত বড় নয়।' কিন্তু আমি কুকুরের মনের পরীক্ষা করার জন্য তৈরি ছিলাম না। আমার কাছে আমার মনের পরীক্ষাই যথেষ্ট।

কোঠাঘর তো নয়ই, থামের ওপর একটা লম্বা-চওড়া ছাদের নিচে হলঘরের মতো ছিল, তাতে প্রায় ডজনখানেক পরিবার বাস করত। প্রাচীন যুগে, যখন মানুষের ঘর আর জীবিকা সম্মিলিত ছিল তখন তারা বোধ হয় এরকম ঘরেই বাস করত। খাওয়া-পরা দেখে ঘরের বাসিন্দাদের কৃষক বলে মনে হচ্ছিল। সুমতি জানতেন যে, চায়ের থেকেও ঘোল আমার বেশি প্রিয়। আমি পেট ভরে ঘোল পান করলাম। সুমতি বুদ্ধগয়ার প্রসাদ বিতরণ করলেন। ঘরের লোকেরা আমাদের দশ সের ছাতু উপহার দিল। চলতে শুরু করলে সুমতি বললেন, 'এটা তোমার পিঠে নাও।' আমি তো এই বোঝা নিয়েই মরে যাচ্ছিলাম, আর তাতে এক সেরও বাড়াতে রাজি ছিলাম না। সুমতিরও বোঝা যথেষ্ট ছিল। ফলে ছাতু নিতে অস্বীকার করতে হলো। সুমতি নিশ্চয় ক্ষুব্ধ হলেন।

ওখান থেকে হেঁটে আমরা চকোর গাঁয়ে পৌঁছলাম। গাঁয়ের আগেই একটা চীনা সৈনিকদের চৌকির ধ্বংসাবশেষ পেলাম। তারপর একটা পাহাড়ের মাথায় কোনো পুরনো মহলের খাড়া দেওয়াল দেখা গেলেন। আকবর আর জাহাঙ্গীরের আমলে তিব্বতে প্রতি দুটি অথবা চারটি গ্রামে স্বতন্ত্র রাজা শাসন করতো। সে-সময় জায়গায়-জায়গায় এরকম রাজমহল পাহাড়ের ওপরে থাকতো। ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি মোঙ্গলরা এইসব ছোট-ছোট রাজাদের খতম করে সমস্ত তিব্বতটা জয় করে দলাই লামাকে উপহার দেয়। সেই থেকে তিব্বতে দলাই লামা উপাধিধারী মোহান্ত রাজাদের শাসন শুরু হয়। প্রথম শাসক ছিলেন পাঁচজন দলাই লামা আর এখন ত্রয়োদশ দলাই লামা রাজত্ব করছিলেন। দলাই লামার পদের উত্তরাধিকারী শিষ্য হয় না। মারা যাওয়ার পর তিনি কোথাও অবতার হয়ে জন্মান এবং জ্যোতিষী-ওঝা ইত্যাদিরা মিলে সেই অবতারকে খুঁজে বের করে।

তারপর সেই বাচ্চা দলাই লামা হয়ে গদিতে বসে।

চকোর গ্রামে আমরা অনেকটা বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছে গিয়েছিলাম। সুমতির যজমান ছিল এক গরিব গৃহস্থ। কোনো একসময় চকোর একটা ছোট রাজধানী ছিল। সে-সময় বসতি খুব বেশি ছিল। কিন্তু এখন সামান্য কয়েকটা ঘর রয়ে গিয়েছিল, যাদের দেখলেই বোঝা যায় গ্রামটি শ্রীহীন। এখনও ক্ষেতের উপযুক্ত অনেক জমি পড়ে ছিল, আর কত পুরনো চাষের জমি ছিল অনাবাদী। সব ভাইয়ের একটাই বিয়ে হওয়ার কারণে তিব্বতে জনসংখ্যা বাড়তে পারে না। ধরো আজ পাঁচ ভাইয়ের একজনই স্ত্রী। ধরো, তাদের তেরটি সন্তান হলো। তেরো জনের আবার একটিই স্ত্রী হবে। তৃতীয় প্রজন্মে হয়তো তাদের ঘরে একটিই ছেলে থাকবে। কোনো ঘরে যদি ছেলে নেই, মেয়ে থাকে, তাহলে ঘর-জামাই এনে বংশ বজায় রাখা হবে। এজন্য ঘরের সংখ্যা কম হবে আশা করা যায়। তিব্বতে একটি প্রজন্ম যত খেত আবাদ করে নিয়েছে এখন সেটাই কুড়ি প্রজন্মের পক্ষে যথেষ্ট। কারণ খেত ভাইদের মধ্যে ভাগ করতে হয় না। বর্তমান জনসংখ্যা যা আছে তাতে চকোরের কাছে অনেক দূর অব্দি পড়ে থাকা চাষযোগ্য জমি আবাদ করা সম্ভব নয়। কাছেই কোসীর একটি বড় ধারা বয়ে চলেছে, যার থেকে খাল কেটে যত খুশি জল আনা যায়। পাহাড়টি বৃক্ষ-বসতিহীন। এর ফলে তার মাটি থেকে সার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে সারের পূরণ গোবর আর ছাগলের নাদি দিয়ে হতে পারে।

সেদিন বৃষ্টি হতে লাগল। তাতে আমাদের এগিয়ে যাওয়াও থেমে গেল। কোনো একসময় তিব্বতের লোকেরা এবড়ো-খেবড়ো পাথর দিয়ে খুব সুন্দর দেয়াল বানাতো। চার-পাঁচশো বছরের পুরনো দেওয়াল এখনো যেখানে-সেখানে খাড়া রয়েছে দেখা যায়। কিন্তু এখন সেরকম গাঁথনি হয় না। এখন তো পাথরের জায়গায় মাটির দেয়ালই বেশি বানানো হয়, ছাদও মাটির হয়। কাঠের অভাব বলে তার ব্যবহারও যতটা সম্ভব কম করতে চায়। বৃষ্টি খুব কম হয়, তাই চার আঙুল পুরু মাটিই যথেষ্ট ধরা হয়। ছাতে যখন জল চুঁইয়ে পড়ে তখন তার ওপর মাটি ফেলে পা দিয়ে চেপে দেয়। সেদিন ওই ঘরটিতে জল চুঁইয়ে পড়ছিল, তাই আমাদের এদিক-ওদিক সরে বসতে হলো।

দশ সের ছাতু আমি ছেড়ে চলে এসেছি বলে সুমতি রেগে টং হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যজমানের স্ত্রীর কাছে আমার নামে কি-কি সব নালিশ করে যাচ্ছিলেন, আমি বেশি শুনতে চাইছিলাম না। আসলে, আমি দোষ তো করেইছিলাম।

দুটি কামরার মাঝখানে একটা চওড়া উঠোন ছিল, যার দরজার কাছে কুকুর বাঁধা ছিল শিকল দিয়ে। কাল আমি দেখে নিয়েছিলাম যে, কুকুরের শিকলকে ভরসা করা উচিত নয়। আজ আবার তাই হলো। কুকরটা আমাদের দেখে ঝটকা দিচ্ছিল, সুমতি আগে ছিলেন, আর আমি ছিলাম ওঁর দশ হাত পিছনে। শিকল ছিঁড়ল, সুমতি পিছন দিকে দৌড়ে এলেন আর আমাকে ধমকাতে লাগলেন, 'তুমি সঙ্গে সঙ্গে কেন থাকো না।' যাক গে, গৃহকর্ত্রী কুকুরটাকে ধরে রাখলেন আর আমরা ফটকের বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

এখান থেকে সক্যার দিকেও একটা রাস্তা গিয়েছিল কিন্তু আমরা শেকর-এর রাস্তা ধরে ছিলাম। কিছু দূর যেতে কোশীর প্রধান স্রোত পেলাম। জল ছিল জঙ্ঘা পর্যন্ত। হেঁটেই

পেরতে হতো। স্রোত খুব বেশি তীব্র ছিল না। কিন্তু জল তো বরফ গলে আসছে, সে যে কি ঠাণ্ডা তার কথা আর কি বলব? আমি আমার জুতো আর অন্য কাপড়টাও উঠিয়ে পিঠে নিয়ে নিলাম। সুমতি আরো বেঁটে। তাঁকে কোমর পর্যন্ত নগ্ন হয়ে চলতে হচ্ছিল। এসব জায়গায় তিব্বতী নর-নারীরা বেশ খোলামেলা। স্রোত খুব চওড়া ছিল। অর্ধেকটা যেতেই আমার তো জঙ্ঘা নেই মনে হচ্ছিল। যাক, কোনোরকমে নদী পার হলাম। তারপর কখনো হেঁটে, কখনো বসে, আমরা এগোতে লাগলাম। চার-পাঁচ মাইল যেতে যেতে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। পিঠে বোঝা নিয়ে আর একপা চলাও মুশকিলের মনে হচ্ছিল। এসময় লঙ্‌কোরের চার-পাঁচজন লোকের দেখা পেলাম। ওরাও শেকর যাচ্ছিল। সুমতি ওদের খুব করে অনুরোধ করলেন, আর আমাকে বললেন মজুরি দিতে। তখন একজন লোক আমার জিনিস উঠিয়ে নিল। আর পাহাড়ের যেখান-সেখান দিয়ে নামতে নামতে আমরা শেকর পৌঁছলাম। আমার এত দুর্বলতার মূল কারণ ছিল ছাতু খাওয়া, যা আমি আধপেটেও খেতে পারতাম না।

শেকরের পাশের টিলায় একটা বড় গুম্বা (মঠ) আছে, যেখানে কয়েকশো ভিক্ষু রয়েছে। আমরা উঠে তো ছিলাম পাহাড়ের নিচের গ্রামে, কিন্তু গুম্বাতে সুমতির পরিচিত ভিক্ষু ছিল, তাই আমিও ওঁর সঙ্গে সেখানে গেলাম। প্রধান অধিকর্তা খন্‌পো (পণ্ডিত) লাসার কোনো মঠের লোক ছিলেন। শিক্ষিত ও ভদ্র। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। তিনি খুব খুশি হলেন। আমরা চেষ্টা করছিলাম যদি কোনো লোক অথবা ঘোড়া ভাড়ায় পাওয়া যায়, তাহলে ভালো হয়। কিন্তু ওখান থেকে যাওয়ার কেউ ছিল না। টশী-ল্হুন্-পো-র দুজন সওদাগর ভিক্ষু মাল নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের একজন খন্‌পোর আত্মীয় ছিল। সম্ভবত তিনিই তাকে আমাদের বিষয়ে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সময়মতো তার সাথে যোগ দিতে পারিনি। লঙ্‌কোরের লোকজনের মধ্যে একজন তরুণ ঢাবা (ভিক্ষু) ছিল। সুমতি তাকে লাসা, সম্-য়ে ইত্যাদি তীর্থ দর্শনের প্রলোভন দেখালেন। আর সেই তরুণটি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

দুটো-তিনটে নাগাদ আমরা শেকর থেকে রওনা হলাম। খালি হাতে থাকায় চলতে হালকা লাগছিল। সুমতিরও বোঝা হালকা ছিল। তাঁর এক যজমান থাকে চার-পাঁচ মাইল আগে। আমরা দু-ঘণ্টা বেলা থাকতেই ওখানে পৌঁছে গেলাম। এটা কোনো সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি ছিল। বাড়িটিও বেশ বড় এবং কোঠাবাড়ি ছিল। চারকোণে ভালুকের মতো লম্বা লম্বা কালো কালো লোমওলা চারটে বড় বড় কুকুর বাঁধা ছিল। তাদের গলার দড়ি এত বড় ছিল যে, বাইরের দেয়ালের যে কোনো অংশ কোনো না কোনো কুকুরের নাগালের মধ্যে ছিল। পঞ্চম কুকুরটি খোলা ছিল। আমাদের তিনজনকে দেখেই সে আমাদের দিকে ছুটে এলো। কিন্তু তিনজন থাকায় আমার ভয় হয় নি। ঘরের চাকর এসে কুকুরটাকে তাড়াল আর আমরা ফটকের ভেতর ঢুকলাম। রাত্তিরবেলায় কুকুর ছেড়ে দিলে কার সাহস হবে সেই ঘরের সামনে ফটকের কাছে ঘেঁষে। বস্তি থেকে আলাদা হয়ে নিজের ঘর বানিয়ে থাকার হিম্মত সম্ভবত এই কুকুরের বলের ভরসাতেই হয়ে থাকবে। ডাকাতের ভয়ে তো এখানে বোধ হয় সব সময় তটস্থ থাকতে হয়। তবে এর জন্যে মালিকের কাছে বন্দুকও ছিল।

আমরা উঠোনের ভেতরে, ফটকের পাশের কুঠরীতে নিজেদের মালপত্র নামাতে লাগলাম। সেই সময় আমাদের সঙ্গে আসা ঢাবা আট বছরের বাচ্চার মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বলছিল, 'আমার একটাই মা আছে, সে কেঁদে কেঁদে মরে যাবে, আমাকে ফিরে যেতে দাও।' সুমতি ওকে বকাবকি করছিলেন আর ওদিকে তরুণটির হেঁচকি কমে আসছিল। আমি বললাম, 'যেতে দাও।' যাই হোক, তার যাবার ছুটি মিলল। গৃহস্বামী আমাদের ওপরের কোঠায় নিয়ে গেল। কথাবার্তা বলতে বোধহয় ঘন্টাখানেক কেটে গিয়েছিল। চা তৈরি হয়ে এলো আর সুমতি তার বোঝা থেকে ছাতু বের করতে চাইলেন, দেখলেন সাত সেরের থলি গায়েব। তিনি ঢাবাকে গালাগাল করতে লাগলেন যে, সে-ই ছাতু চুরি করে নিয়ে গেছে। চা ফেলে তিনি ডাণ্ডা বাগাতে থাকেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'যাচ্ছি কোথায়? ছাতু নিয়ে আসতে হবে।'

আমি তাঁকে না যাবার জন্য যতই ঠাণ্ডা মাথায় বোঝাচ্ছিলাম, আমার কথাগুলো ততই তাঁর ক্রোধাগ্নিতে ঘি-এর কাজ করছিল। শেষে গৃহস্বামী সাত-আট সের ছাতু এনে সামনে রেখে দিল। আর বলল, 'ওই ঢাবা শেকর পৌঁছে গেছে, ওখানে যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে।' সুমতির রাগ এজন্য বেশি হচ্ছিল যে, আমি মেমোতে দশ সের ছাতু ছেড়ে দিয়েছি, আর এখন এই ছাতুটাও চুপচাপ যেতে দিতে বলছি।

শেকর থেকে খন্‌পো রাস্তার কোনো গ্রামের গোয়া (মুখিয়া)-কে লোক দেওয়ার জন্য চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। যদিও গ্রামবাসীরা এরকম চিঠিকে খুব কম গ্রাহ্য করে। যতই হোক, এটা চলার রাস্তা। লোক আসছেই, যাচ্ছেই। ওরা যদি এমনি প্রতিটি ফরমায়েশ পালন করে চলে, তাহলে গ্রামবাসীদের নিজস্ব সব কাজ ছেড়ে দিতে হবে। তিব্বতে যাত্রীদের যাত্রার তখনই সুবিধা হয়, যখন পেশাদার ঘোড়া-খচ্চরওলাদের সঙ্গেই দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ভাড়া ঠিক হয়ে যায় অথবা বিনামূল্যে পাওয়ার জন্য সরকারি চিঠি থাকে। তৃতীয় রাস্তা এটাই হতে পারে যে, লোকের সময়ের পরোয়া থাকবে না এবং অপেক্ষার জন্য হপ্তা, দু-হপ্তা পড়ে থাকতে পারবে। আমার কাছে তিনটির কোনোটিরই সুবিধা ছিল না। চিঠি দেওয়া হয়েছিল যে-গ্রামে সেখানে বোধ হয় ঘরের ভেতরে বসারও জায়গা আমাদের মেলে নি। এবং আমরা অন্য কোনো ঘরে ছিলাম। আমাদের পরের গ্রামের কোনো লোকের নাম মনে আসাতে তার কাছে গিয়েছিলাম। ছোট একটা কুঠরীতে দুজন তরুণ-তরুণী থাকতো। দুজনে খুব পরিশ্রম করতো। তবে অবস্থা ভালো ছিল না। তরুণটি আগে সেপাই ছিল। ওর বড়ভাই এবং ঘরের বউও বর্তমান ছিল। তা সত্ত্বেও ওর অন্য কোনো তরুণীর সঙ্গে প্রেম হয়ে যায়। অবিবাহিতা তরুণীর সঙ্গে প্রেম হওয়া খুব খারাপ কিছু নয়। কিন্তু তরুণটি তাকে প্রেয়সী বানাতে চাইলো। তখন ঘরের বউ সেটা কি করে বরদাস্ত করে? সে তাকে ঘর থেকে বের করে দিল। ঘরের সম্পত্তি ভাগ হতেই পারে না। সে তাদের সম্মিলিত পত্নীর পায়ে মাথা রাখে নি। বড় পরিশ্রম করে দুজনে মিলে একটা ছোটমতো ঘর বানায়। জুতো তৈরি করত। কখনো কারো কাছে মজুরের কাছে করে দিত। ব্যাস, এইভাবেই চালিয়ে নিচ্ছিল। আমার জন্য ঘোড়া খুঁজে দিতে ও অনেক দূর-দূর অব্দি

চক্কর দিয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। খবর পেলাম যে, শেকর থেকে মাল নিয়ে কিছু গাধা ব্রহ্মপুত্রের দিকে যাচ্ছে। আমরা তাদের ভরসায় থাকলাম। গাধাওলারা দিন-চার সাঙে (দশ-বারো আনায়) আমাদের জিনিসপত্র ল্হ্হর্চে পর্যন্ত নিয়ে যেতে রাজি হলো। ওদের সঙ্গে একটা বড় কুকুর ছিল। আমি ছাতু খাওয়ার সময় ওকে খুব ছাতু খাওয়াতাম। আমি বুঝেছিলাম, ওর সাথে বন্ধুত্ব করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। গাধাওলারা খুব কম রাস্তা চলে। সেটাও রাতেই বেশি। সম্ভবত গাধাওলারা তিনজন ছিল। আর তিনজনই ব্যাপারী। তাদের মধ্যে একজন ছিল শেকরের খন্‌পোর ভাইপো। এইসব নিয়ে আমাদের সংখ্যা আটের কাছাকাছি ছিল। গাধার সংখ্যা ছিল অনেক। জিনিসপত্রের মধ্যে বেশিটাই ছিল চামড়ার থলিতে বাঁধা নেপালের চাল। একটি খুব বড় ডাঁড়া আমাদের পেরোতে হলো। সেখান থেকে ব্রহ্মপুত্র দেখা যাচ্ছিল কি না বলতে পারছি না। ক-দিন পরেই আমরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে গাধাওলাদের গ্রামে পৌঁছলাম। জিনিসপত্র গ্রামের বাইরে রাখা হলো। আমরা দুজন পাশেই এক বুড়ির ঝুপড়িতে চলে গেলাম। দু-এক দিন বোধহয় সেখানে জিরোলাম। আমি একবার থাকার জায়গা থেকে যেখানে জিনিসপত্র রাখা হয়েছিল সেখানে যাচ্ছিলাম। লোকও দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। কিন্তু সেই কুকুরটা আমাকে কামড়াতে ছুটে এলো, যাকে আমি রাস্তায় ছাতু খাইয়ে-খাইয়ে আসছিলাম। সুমতি আমার কাছে সব সময় লেকচার দিতেন, 'কুকুরের মন তত বড় হয় না, যত বড় শরীর।' আজ তিনি ছাতা নিয়ে যজমানের কাছে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে ছিলেন। বুড়ির ঘরের বাইরে বুক সমান উঁচু চারদিক ঘেরা পাঁচিল ছিল। চারদিক ঘেরা পাঁচিলের দরজা থেকে বড়জোর দশ-পাও এগোন নি, এমন সময় চার-পাঁচটা কুকুর তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আওয়াজ শুনেই আমি পাঁচিলের কাছে গিয়ে দেখি, সুমতির জীবন বিপন্ন। আমি পাথর তুলে কুকুরদের মারতে শুরু করি। এই সব হিংস্র তিব্বতী কুকুরদের বড় বোকামি এই যে, আপনি যদি পাথর ছোঁড়েন তো পাথর যতদূর গড়িয়ে যাবে, ওরাও তত দূর তার পিছু ধরে যাবে। যাক গে, সুমতি ভেতরে চলে এলেন। আমি শুধোলাম, 'কুকুরের মন ছোট হয়, না বড়?' বেচারি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

এবার আমাদের ব্রহ্মপুত্রের ডান তীর ধরে গিয়ে ল্হর্চে পৌঁছনোর ছিল। কিন্তু সেটা খুব দূরে ছিল না। খন্‌পোরে ভাইপো বলল যে, ল্হর্চেতে আমাদের জিনিস ব্রহ্মপুত্রের তীরে নামিয়ে দেয়া হবে। তারপর সেখানে চামড়ার নৌকা পাওয়া মাত্রই আমরা তাতে চড়ে টশী-ল্হুন্‌-পো পৌঁছে যাব। সুমতির পরামর্শ ছিল যে, আমরা ল্হর্চের গুম্বায় থাকি কিন্তু আমি গুম্বায় থাকার চেয়ে সওদাগরদের সঙ্গে নদীর তীরে থাকা বেশি পছন্দ করলাম। সুমতি নৌকোতে যেতেও চাইছিলেন না।

এবার, চামড়ার নৌকো কাল আসবে পরশু আসবে করে আমি নদীর তীরে সওদাগরদের মাল আগলাতে লাগলাম, আর সুমতি তাঁর যজমানদের কাছে ঘুরতে লাগলেন। এখন পর্যন্ত যত দূর আমি এসেছিলাম তার মধ্যে ঞেনম্, তিঙ্‌রী, শেকর-এর পর এটা ছিল চতুর্থ জোঙ্ (ম্যাজিস্ট্রেটের জায়গা)। এখানে খাওয়ার জন্য চা বানিয়ে নিতাম আর ছাতু আমাদের কাছে মজুতই ছিল। সওদাগরদের মধ্যে লাসার এক তরুণ

গৃহস্থ আর দুজন ঢাবা (ভিক্ষু) ছিল। সওদাগর ঢাবাদের মধ্যে মধুর স্বভাবওলা কদাচিত পাওয়া যায়। খাও-দাও ফুর্তি কর, তা সে যেভাবেই হোক—এটাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। তারা খুব ছঙ-মদ খায়, তবে এ জিনিসটা তিব্বতে এত সস্তা যে, ওটা খেয়ে কেউ দেউলিয়া হয়ে যায় না। আর মেয়ে তো প্রতিটি বিশ্রাম-স্থলে পাওয়া যায়। আমাদের দুজন ঢাবার মধ্যে খন্‌পোর ভাইপো ভালো ছিল কিন্তু অন্যজন তো একদম জানোয়ার। কোনো তরুণী ভাঁড় ভাঁড় ছঙ্‌ আনতো তার কাছে আর সে খুব পান করত। বড় ঢাবা তো প্রায়ই গ্রামে শুতে যেত। ওখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে কত সরল তা আমি এই ঘাটেই দেখেছিলাম। এক ষোড়শী নদীতে কাপড় ধুতে এসেছিল। আমাদের সঙ্গী ঢাবা গিয়ে দশ-পাঁচ মিনিট হাসি-ঠাট্টা করলো আর তারপর দেখি দুজনে তাঁবুর ভিতরে এসে প্রণয় পূর্ণ করছে—বর্ষার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে জিনিসপত্রের ওপর ওরা তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিল।

জোঙ্‌-পোন্‌-এর মহলে সম্ভবত কোনো বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। বিনা পারিশ্রমিকে স্ত্রী-পুরুষরা সেখানে পাথর বয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ওরা গানও করছিল। ওদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল যুবক আর সদ্য যুবতী। আমি দেখতাম হাসি-ঠাট্টা করতে করতে তাবা কাপড় কেড়ে নিয়ে মহিলাদের নগ্ন করে দিচ্ছিল। এটা ছিল গরমের সময়—যারা স্নান করতে চাইতো তাবা বছরের মধ্যে এই দিনগুলোতেই স্নান করতে পারতো। কত স্ত্রী-পুরুষ নগ্ন হয়ে স্নান কবতো। জল খুব ঠাণ্ডা ছিল তবু দেখতাম ওরা ঝাঁপ দিয়ে-দিয়ে দুশো গজ পর্যন্ত সাঁতরে চলে যাচ্ছে। মেয়েদের সামনে পুরুষের নগ্ন হয়ে মাথার চুল নিংড়ানো বা শরীর শুকোনো খুব মামুলি ব্যাপার ছিল। এসব কথা শুনে পাঠক ভাববেন যে, তিব্বতী লোকেরা বোধ হয় খুব কামুক। এ ব্যাপারে আমি এইটুকুই বলতে পারি যে, আমরা কামুকতার যে অর্থ বুঝি তার মধ্যে ওই ভারতীয়দের এক শতাংশও নেই। আসলে, ওখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক বেশ খোলামেলা আর সেটাকেও খাওয়া-দাওয়ার চেয়ে খুব সামান্যই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ল্‌হর্চে থেকে টশী-ল্‌হুন-পো অথবা শিগর্চে চামড়ার নৌকোয় কবে দু-দিনে পৌছনো যায়। নৌকো জলের স্রোতের সঙ্গে নিচে তো যেতে পারে কিন্তু ওপরে আসতে পারে না। এখানে ব্রহ্মপুত্রের চরে কিছু জংলী ঝোপঝাড় গজায়। এদের ছোট ছোট ডালগুলো কেটে দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা চৌকোমতো কাঠামো বানানো হয়, যা ভেজা চামড়া দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। এই হচ্ছে চামড়ার নৌকো। স্রোতের সঙ্গে গন্তব্যস্থলে পৌছে চামড়াটা খুলে নেওয়া হয়। আর তা শুকিয়ে গেলে গাধা অথবা নিজেরই পিঠে নিয়ে মাঝি আবার আগের জায়গায় পৌছে যায়। লাসার দিকে কোথাও কোথাও আমি নৌকো শুকিয়ে পিঠে করে লোককে ফিরতে দেখেছিলাম।

অপেক্ষা করতে করতে একযুগ কেটে গেল। শেষমেশ নৌকো এলো, কাঠ কাটা হতে লাগলো। পরের দিন যাওয়ার ছিল, তার একদিন আগে আমি একটা গোটা ভেড়ার শুকনো মাংস কিনেছিলাম। শুকনো মাংস রান্না করা থাকে না কিন্তু তিব্বতে সেটাকে রাঁধা ভেবেই খায়। আমি এখনো সে রকমটা বুঝতে তৈরি ছিলাম না। আমি ভাবলাম যে, দুদিন

এখন নৌকোয় যাওয়া হবে, কাজেই মাংসটা সেদ্ধ করে রেখে নেওয়া যাক। ছোট ছোট টুকরো করে সেগুলো সেদ্ধ করলাম। সেদ্ধ টুকরোগুলো থলিতে রাখলাম, বড় ঢাবা বসে বসে দেখছিল। মাংসের রস চার-পাঁচ পেয়ালা ছিল। আমি ওর পেয়ালাতেও ঢেলে দিলাম আর নিজেরটাতেও নিলাম। আমি বুঝিনি যে আমি কোনো বিপজ্জনক কাজ করছি। সে মাংসের রস খেতে প্রত্যাখ্যান করল। শুধু প্রত্যাখ্যানই করল না, ওর হাবেভাবে বুঝলাম যে, ওর খুব রাগ হয়ে গেছে। মাংসটা আমি এখনই খরচ করতে চাইছিলাম না, কারণ সেটা আমি পাথেয় হিসেবে রেখেছিলাম। আমি নিজেও তার থেকে একটুকরোও খাই নি, তাহলে ওর রেগে যাওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? কিন্তু দেশের শিষ্টাচারের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কের অবকাশ থাকে না। আর প্রত্যেক নব আগন্তুককেই শিষ্টাচার শেখার সময় কত ঠোক্কর খেতে হয়। যদিও এটাই ভাল, অন্যেরা যা করছে নব আগন্তুক স্রেফ তার নকল করে যাক। পরের দিন নৌকো বেঁধে তৈরি হয়ে গেল। জিনিসপত্র উঠতে লাগল। দেবতাদের লাল-হলুদ ঝাণ্ডাও এসে গেল নৌকোর জন্য, বড় ঢাবা হঠাৎ বলে দিল যে নৌকোয় জায়গা নেই। আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। আমি তো দু-সপ্তাহ ধরে ওখানে ওদের জিনিসপত্র পাহারা দিচ্ছিলাম, এই আশাতে যে, ওদের সঙ্গে শিগর্চে যাবো। ছোট ঢাবা ওর সামনে কিছু বলতে পারছিল না। দু-তিনবার বলার পর বুঝলাম যে, ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না। সুমতি এসেছিলেন আমাকে বিদায় দিতে, আমি তাঁকে সব কথা বললাম আর নিজের জিনিসপত্র উঠিয়ে গুম্বাতে (মঠে) চলে গেলাম।

দু-এক ঘণ্টা পরে ছোট ঢাবা আর লাসার সওদাগর দুজনে আমার কাছে এলো এবং যাওয়ার জন্যে বলতে লাগল। আমি বললাম, 'সুমতিকেও যদি সঙ্গে নিয়ে যাও তো যাব।' ওরা একা যাওয়ার জন্য খুব জোর করতে লাগল। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। ব্রহ্মপুত্রে নৌকোযাত্রার আনন্দ পাওয়া গেল না।

ল্হর্চে হচ্ছে লদাখ আর নেপাল দুই-এর বাণিজ্যিক পথের ওপরে খুব ভালো একটি বসতি। কিছু ছোট-ছোট দোকানও আছে, আর এখানে কিছু ভোটিয়া-মুসলমানও থাকে। সওদাগরেরা তো আসতেই থাকছে, কাজেই খচ্চর ঘোড়া বা গাঁধা পেতে অসুবিধা হতো না। তবে সেসব তাড়াতাড়ি পাওয়ার আশা আমাদের ছিল না। সুমতি খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলেন, শিগর্চে যাওয়ার জন্যে কিছু খচ্চর মজুত আছে। আমরা ঐ পর্যন্ত যেতে খচ্চর ভাড়া করলাম। খচ্চরওলারা কোনো সওদাগরের মাল নিয়ে যাচ্ছিল।

গাধাদের চেয়ে খচ্চররা জোরে চলে। তবে তিব্বতের সময় বড় অলস। লোকে যাত্রাপথেও আনন্দ-উৎসব করতে করতে যায়। খচ্চরওলারা ছিল তিনজন আর খচ্চর প্রায় তিরিশটা। যাক গে, এবার অন্যের পিঠে চড়ে যাওয়ার ছিল। এদিকের গ্রামে মুরগির ডিম প্রচুর পাওয়া যেত। গলা দিয়ে ছাতু নামানো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছিল তাই আমি একরকম ফলাহার ব্রতই নিয়েছিলাম। ২০, ৩০টা ডিম সেদ্ধ করে ছাতুর থলিতে রেখে নিতাম আর যখনই খিদে পেত, ওগুলো খেতাম। দিনে ২৫, ৩০টা ডিম মামুলি ব্যাপার ছিল। সুমতি এমনিতে তো খুব ভালো ছিলেন কিন্তু রেগে গেলে তিনি খুব গরমও হয়ে যেতেন, তখন আমি ঠাণ্ডা থেকেও কোনো লাভ হতো না। রাগ করার একটা বড় কারণ

ছিল এই, বিশ্রামস্থলে ঘোড়া থেকে নেমে যেই আমি একবার ঘরে পৌঁছতাম, আর নিচে নামা বা দরজার বাইরে যাবার নামটি পর্যন্ত করতাম না। অন্ধকারে তিব্বতীদের যে ভয় পেতাম তা নয়, তবে কুকুরদের মন ছোট হয়—একথা মানতাম না। কখনো জ্বালানি আনতে হতো, কখনো অন্য কোনো কাজ—এসবই সুমতিকে করতে হতো। আমি উনুন ধরাতে পারতাম। চা কিংবা থুক্‌পা গরম করতে পারতাম, কিন্তু সুমতি এটুকুতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কয়েকদিন চলার পর আমরা নরথঙ পৌঁছলাম। নরথঙ একাদশ শতাব্দীর একটি পুরনো মঠ। এটা সেই সময় তৈরি হয়েছিল, যখন ভারতে বৌদ্ধধর্ম জীবিত ছিল। কন্‌-জুর (বুদ্ধ-বচন অনুবাদ) তন্‌-জুর (শাস্ত্র-অনুবাদ)—এর ৩৩৮টি বড় বড় পুঁথি, যার মধ্যে দশ হাজারের মতো ভারতীয় গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ সুরক্ষিত আছে—তার ছাপাখানা এখানেই। কিন্তু খচ্চরওলাদের তো সোজা শিগর্চে যাওয়ার ছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে, পাহাড়ের পাদদেশে অনেক সোনার ছাতা লাগানো আর বড় বড় মহলওলা টশী-ল্‌হুন্‌-পোর সুন্দর মহাবিহার (গুম্বা)-এর সামনে দেখতে পেলাম সবাই সাদর প্রণাম করল। আমিও মাথা নিচু করলাম। টশী-ল্‌হুন্‌-পো গুম্বার গা ঘেঁষেই শিগর্চে নগর। তিব্বতে যেমন দলাই লামার পর সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি টশী লামা, তেমনি লাসার পর তিব্বতের সবচেয়ে বড় শহর শিগর্চে। কয়েক বছর হল টশী লামা, চীনে পালিয়ে গেছেন তাই শিগর্চের বৈভব কিছুটা কমে গেছে। তবু ওখানকার জোঙ্‌ খুব বড় জোঙ্‌ আর জোঙ্‌-পোন্‌ খুব বড় দরের অফিসার। সেই সঙ্গে টশী-ল্‌হুন্‌-পোর জায়গীরও খুব বড়। ফলে শিগর্চের বাজার ততটা নষ্ট হতে পারেনি। শিগর্চে আর টশী-ল্‌হুন্‌-পোর মাঝখানে মাটির চীনা-কেল্লা আছে, যাব অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। চীনা পল্টন আর অফিসাররা থাকাকালীন সম্ভবত শিগর্চে আরও শ্রীসম্পন্ন ছিল। শিগর্চে পৌঁছে আমরা আবার জিনিসপত্র নিজের পিঠে তুলে নিলাম আর সুমতির পরিচিত কোনো একজনের ঘরে রাত্তিরে থাকার জন্যে চলে গেলাম।

কাঠমাণ্ডু ছাড়ার পর বুঝতে পারছিলাম যে, আমি এখন আবার সভ্যজগতে এসে পড়েছি। এখানে নেপালীদের অনেক দোকান ছিল। যদিও আমি তিব্বতী পোশাকে ছিলাম, তবু ওদের উপস্থিতিতে নিজেকে একটু বেশি পরিচিতের মতো মনে হচ্ছিল। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাসা পৌঁছতে চাইছিলাম। কারণ ওখানে না পৌঁছে আমি নিজেকে প্রকাশ করতে পারছিলাম না। সুমতির কথা শুনতে শুনতেও এখন খুব বিরক্তি বোধ হচ্ছিল, তাই এবার আর তাঁর সঙ্গে যেতে চাইছিলাম না। পরের দিন খোঁজ করে ললিতপট্টনের এক সাহুর ভাই-এর নাম জানা গেল। সাহুর সঙ্গে আমি মহাবৌধাতে দু-একবার দেখা করেছিলাম। আর তিনি বলেছিলেন, 'আমার একভাই শিগর্চে থাকে।' রাস্তায় কোনো এক নেপালীকে জিজ্ঞেস করায় ঘর জানা গেল। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁর ওখানে থাকার জন্যে বললেন আর আমি নিজের জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর কাছে চলে গেলাম। শিগর্চের জোঙ্‌-পোন্‌-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি জোঙ্‌-পোন্‌-এর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার কথা বললেন। কিন্তু আমি এখন দেখা করতে চাইছিলাম না। আমি এখান থেকে আনন্দজীকে ভারতে পাঠিয়ে সিলোনে

প্রথম চিঠি লিখি। লাসা যাওয়ার জন্য বাহক খোঁজা হতে লাগল আর সেই খচ্চরওলাদেরই আবার পাওয়া গেল। সাহু-র সঙ্গে আমি একদিন টশী-ল্হুন্-পো গুম্বাতে দর্শন করতে গেলাম। পাঁচ-ছশো বছর ধরে যেখানে মন্দির সাজানো চলছে, সেখানকার মূর্তি আর সোনারুপোর বড় বড় প্রদীপের সংখ্যার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে? আমরা অনেকগুলো মন্দিরে গেলাম। খবর পেলাম, এখানে কনৌরেরও অনেক ভিক্ষু থাকে আর রঘুবরের সঙ্গে দেখা হলো। রঘুবর হিন্দি-উর্দু জানতেন। এখন তিন-চার বছর ধরে তিনি বৌদ্ধগ্রন্থ পড়ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে জানলাম যে, লাসার কাছে ডে-পুঙ্ মঠেও কনৌরের অনেক ভিক্ষু থাকে।

এখন ছিল জুলাই-এর শুরু। আমি আবার খচ্চরদের সঙ্গে রওনা হলাম। কিন্তু খচ্চরওলাদের কোনো তাড়া ছিল না। তিব্বতে ডাকের ব্যবস্থা আছে ভারত থেকে গ্যান্চী, লাসা আর গ্যান্চী থেকে শিগর্চে পর্যন্তই। বাকি চিঠিপত্র লোকের হাতে পাঠানো হয়। আমাদের খচ্চরওলারা ডাক-পিয়নেরও কাজ করতো। যেখানে চিঠি পৌঁছে দিত, সেখানে খচ্চরের জন্যে ঘাস-খড় আর লোকজনদের থাকারও ব্যবস্থা হয়ে যেত। প্রথম দিন তো ওরা কয়েক মাইল গিয়েই একজন বড়লোকের ঘরে থাকলো। শিগর্চে সাহু খচ্চরওলাদের খুব করে বলে দিয়েছিলেন আমাকে ভালোভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে, এসব কথার কোনো স্থায়ী প্রভাব ওদের ওপর থাকবে না। আমার বেশভূষা যদিও ভিখিরির মতো ছিল, কিন্তু মুখটা তো আমি ওরকম বানাতে পারতাম না৷ গৃহস্বামী এখানে আমার থাকার জন্যে ভালো জায়গা দিয়েছিলেন। সামনে এগিয়ে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো আর একজন ধনীর ঘরে। ওখানে তখন লীলা হচ্ছিল। আমার সঙ্গীরা লীলার পুরো আনন্দ না নিয়ে কি সামনে এগোতে পারতো? বড় আস্তাবলে খচ্চরদের বেঁধে দেওয়া হলো। আমরা রোজ লীলা দেখতে যেতাম। যিনি লীলা করতেন, তিনি ছিলেন নদীর ওপারের কোনো গুম্বার ভিক্ষু। গান-বাজনা-নাচ সবই ছিল। লীলার আয়োজনও করেছিলেন আমাদের সেই অতিথি-সেবক।

লীলা শেষ হলে আবার আমরা সামনের দিকে রওনা হলাম। শিগর্চে থেকে একটা রাস্তা সোজাসুজিও লাসা গেছে কিন্তু আমরা ঘুরে গ্যান্চীর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। ৭ জুলাই (১৯২৯) আমরা গ্যান্চী পৌঁছলাম। গ্যান্চীতে ইংরেজ সরকারের এক বাণিজ্যদূত (ট্রেড এজেন্ট) আর প্রায় ১০০ পল্টন থাকতো, কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার কিসের লেন-দেন? আমি জানতাম যে, ওখানে ধর্মা সাহুর দোকান আছে কিন্তু যতক্ষণ না লাসায় দলাই লামাকে আমার আসার খবর দিচ্ছি, ততক্ষণ কাউকেই আমি নির্জের ঠিকানা দিতে চাইছিলাম না।

পরের দিন আমরা দিকী-ঠোমো গ্রামে থাকলাম। ডেরা বাঁধা হলো বাইরে, খামারবাড়িতে। তবে একদিন আমিও আমার খচ্চরওলাদের সঙ্গে গৃহস্বামীর কাছে গেলাম। এটা খুব বড়লোকের বাড়ি ছিল, এখানের কালো কুকুরগুলো খুবই বড় বড় ছিল, ছোটো-খাটো গাধার সমান। ওদের হরিতাল-এর মতো হলুদ চোখ খুব ভয়ংকর মনে হচ্ছিল। আমি নিজেকে সম্ভবত লাদাখের ভিক্ষুই বলেছিলাম। চা খেয়ে আবার আস্তানায়

ফিরে এলাম। বর্ষার সময় ছিল, কিন্তু তিব্বতে না তেমন বৃষ্টি হয় আর না লোকে ভেজাকে ততটা গ্রাহ্য করে। ওখান থেকে এগিয়ে যেতে-যেতে, আমরা জারালা ডাঁড়ের আগেই থেমে গেলাম। বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আর স্রোতের আশপাশে এমনিতেই খোলা জায়গাতে সবুজ ঘাস ছিল। এরকম জায়গায় ডাকাতের খুব ভয় থাকে, তবে খচ্চরওলারা নিজেদের কম মনে করে না। ওদের কাছে বন্দুকও ছিল আর তলোয়ারও। জারালা খুব উঁচু কিন্তু ওঠা খুব কষ্টকর নয়। পরের দিন নগাচে পৌঁছলাম। সামনে বিশাল হ্রদ ছিল। হ্রদ আর গ্রামের মাঝে ছিল প্রচুর সবুজ সবুজ ঘাসে ভরা ময়দান। এখানে খচ্চরদের জন্যে ঘাস কেনার দরকার ছিল না। তবে হ্যাঁ, গাছের বাকল আর যবের দানা কিছু অবশ্যই দিতে হতো।

নগাচে খুব ঠাণ্ডা জায়গা। এর উচ্চতা ১৪, ১৫ হাজার ফিটের কম হবে না। আমাদের রাস্তা একটা দিন হ্রদের ধারে-ধারে ছিল। পরের দিন সবচেয়ে বড় ডাঁড়া খাম্বালা পার হলাম। এখন আমরা আবার ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে গেলাম। ছুওরীতে নৌকো করে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে, চলতে-চলতে ১৯ জুলাই অনেক মাইল দূর থেকে পোতলার সোনালি চূড়া আমাদের চোখে পড়লো। সে-সময় না জানি মনে কত কি-কি ভাবের উদয় হচ্ছিল। ভারতে আর সিলোনে থাকতে তিব্বত সম্বন্ধে যা কিছু পড়াশুনা করেছিলাম, তা থেকে আমি ভালো করে বুঝেছিলাম যে, পোতলাব দর্শন জগতের সবচেযে কঠিন জিনিসেব একটি, আর আজ সেই পোতলা আমি আমার সামনে দেখছিলাম। একটা বড নদীব পুল পার হয়ে দু-তিন ঘণ্টা চলার পর আমরা লাসায় পৌঁছনোব জন্যে পোতলার ফটকের ভেতর ঢুকলাম। সামনে বাঁ দিকে ছিল লাল রং কবা দলাই লামার বহুতল প্রাসাদ, পোতলা। এখন আমরা ছিলাম তিব্বতের রাজধানীতে। মন্ত্রী শাঠাব ওখানে খচ্চরওলাদেব জিনিস নামানোর ছিল। ওরা সোজা সেখানে গেল। আমি ভাবছিলাম যে, ধর্মা সাহুর দোকান ছু-শিঙ্-শা-তে পৌঁছোতে কারুর সাহায্য নিই। ঠিক সেই সময একজন নেপালী যুবককে মন্ত্রীর মহলের দিকে যেতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তো, সে বলল, 'দাঁড়ান, আমি ছু-শিঙ-শা জানি। দরবার হয়ে আসছি, তারপর আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।' ঘোড়ার পিঠে রাখার চামড়ার থলি (তাড়ু)-তে আমার জিনিসপত্র পড়েছিল। আমি সব গুটিয়ে-টুটিয়ে আবার বোঝা বেঁধে নিলাম। তারপব ধীরেন্দ্রবজ্র—এটাই সেই তরুণের নাম ছিল—আসতেই পিঠে জিনিস উঠিয়ে হাতে ডাণ্ডা আর মাথায় ভিক্ষুণীদের মতো হলুদ টুপি লাগিয়ে চলতে শুরু করলাম। এতদিন আমি হলুদ কানঢাকা টুপি লাগিয়ে আসছিলাম কিন্তু আমি জানতাম না যে, এখানে এরকম টুপি ভিক্ষুণীরা পরে।

লাসাতে

কাঠমাণ্ডু থেকে যাওয়ার সময় আমি ধর্মা সাহুর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে নিয়েছিলাম। আমার কাছে যত টাকা ছিল তার বেশ কিছুটা তো ঞেনম্-এ তিব্বতী মুদ্রায় বদল করে নিয়েছিলাম। কিন্তু একশো-র কিছু বেশি টাকা আমি আলাদা রেখেছিলাম। আমি লাসাতে এসেছি বেশ জমিয়ে তিব্বতী ভাষা আর বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন করার জন্যে। একশো টাকায়

সে-সময় তিব্বতী মুদ্রায় দেড়শো সাঙ্ পাওয়া যেত, যার মধ্যে স্রেফ খাওয়ার জন্যে লাগতো মাসে সাড়ে চার সাঙ্ (তিন টাকা), খুব সাদামাটাভাবে থাকলে। কিন্তু শীতের জন্যে পোশাক বানাতে হতো, যার জন্যে অন্তত পক্ষে ৪০ টাকা লাগতো। বাসন-কোসন আর অন্যান্য জিনিসেও ৫০ টাকা লেগে যেত। তারপর বই-পত্র দরকার হতো। সবদিক দেখলে আমার সামনে টাকার খুবই অসুবিধে ছিল। কিন্তু আমি কি আমার কাছের এই টাকার ভরসাতে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিলাম?

ধর্মা সাহুর ছেলে পূর্ণমান আর জ্ঞানমান দুজনেই ছিল যুবক। যদিও বাবার মতো তাদের ভাব-ভক্তির বয়স ছিল না, কিন্তু ওরা দুজনেই খুব সুশীল ছিল। ওরা খোলামনে আমাকে স্বাগত জানাল। ৫ মাস ধরে আমি খবরের কাগজ দেখিনি। ত্রিরত্নমান সাহু 'স্টেটসম্যান'-এর সাপ্তাহিক সংস্করণ আনাতেন। চিঠি দেওয়া আর একটু-আধটু কথা বলার পর আমি কয়েক মাসের কাগজ নিয়ে পড়লাম। এখন আমি সভ্য লোকদের মাঝে এসে গিয়েছিলাম, তাই ময়লা জমা করার দরকার ছিল না। পরের দিন (২০ জুলাই) আমি স্নান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। মাটির ছাতওলা ঘরে স্নানের ব্যবস্থা করা খুব মুশকিল। ওই ঘরে কাদির ভাইও থাকতেন। তাঁর মেয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিতে চলল আর আমি লাসার পশ্চিম দিকের খালে গিয়ে স্নান করলাম।

ধর্মা সাহু অনেক দিন থেকে নিজের ঘরেই থাকছিলেন। ছেলেরা ছোট-ছোট ছিল, দোকান দেখাশোনা করতো তার ভাগনে জগতমান। আমি যাওয়ার পরের দিন অনেক বছর পর ও এখন নেপাল ফিরে যাচ্ছিল। তাঁর খুব আফশোশ হলো, আমার সেবাযত্ন করতে পারলো না বলে। আমিও জানতাম যে, বড় বড় লোকের সঙ্গে ওর বেশ পরিচয় আছে, আর ও যদি আরও কিছুদিন থেকে যেত, তাহলে অবশ্যই আমার কাজে অনেক সাহায্য করতো। যাত্রার জন্য সমস্ত মঙ্গলানুষ্ঠান হলো, মঙ্গল-পাঠ হলো। ভাজা মাছ, সারসের সেদ্ধ ডিম যাত্রাতে মঙ্গল-ভোজন মনে করা হয়। তারপর সামান্য মদ্যপানও। বন্ধুবান্ধবেরা সাদা খাতা (রেশমী চিরকুট) ওর গলায় পরালো, আর জগতমান সাহু ওখান থেকে খুশি-খুশি বিদায় নিল।

এবার যেহেতু আমাকে প্রকাশ্যে থাকতে হতো, তাই দলাই লামার কাছে খবর পাঠিয়ে দেওয়াটা খুব দরকার ছিল। আমি পড়ে রেখেছিলাম, তিব্বতে কয়েকশো ভারতীয় পণ্ডিত গেছেন, তাঁরা হাজার-হাজার গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছেন আর হাজার-হাজার তরুণকে বৌদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ভাবলাম, আমিও তো পণ্ডিত, যদিও কয়েক শতাব্দী ধরে তিব্বত আর ভারতের ধর্মীয় সম্বন্ধ থাকেনি, আর ভারতীয়রা সেখানে গুরু হয়ে আসতো, আমি সেখানে শিষ্য হতে এসেছি। তবুও আমার মতো ভারতীয় বিদ্যার্থীর জন্য এখানে নিশ্চয় সুবিধে থাকবে। ২১ জুলাই আমি দলাই লামাকে অর্পণ করার জন্যে ১৫টি শ্লোক তৈরি করলাম। কিন্তু সংস্কৃতে পাঠিয়ে লাভ কি? তাই অনুবাদক খোঁজার দরকার হলো যা তেমন সহজ কাজ নয়, বুঝলাম।

ত্রিরত্নমান আর জ্ঞানমান দু-ভাই তো আমাকে সাহায্য করার জন্যে তৈরিই ছিল। কিন্তু ওরা এখনো লাসার সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত ছিল না। আমাকে সাহায্য করতে ওদের

চেয়েও বেশি তৎপর ছিল ধীরেন্দ্রবজ্র, যাকে ওখানে লোকে গুভালা বলতো, যা কিনা গুভা (গুরুভাজু, গুরুমহারাজ)-র সঙ্গে তিব্বতী ভাষায় লা (জী) জুড়ে হয়েছে। আমার যাত্রায় যত লোক দেখেছি তার মধ্যে বাছাই করা কয়েকটি রত্নের একটি হলো গুভালা। আমি যখন দলাই লামার কাছে খবর পৌঁছনোর জন্য কোনো গণ্যমান্য লোক খুঁজে বের করতে বললাম, তখন গুভালা ঠী-রিন্‌পো-ছে-এর নাম বলল। অর্থাৎ তিব্বতে বৌদ্ধদের চার প্রধান সম্প্রদায়—ঞিগমাপা, কর্‌যুদ্‌পা, সক্যপা এবং গেলুগ্‌পা—এর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী গেলুগ্‌পার মূল গদির অধিকর্তা। যদিও ঠী-রিন্‌পো-ছে গদি ছেড়ে দিয়েছিলেন তবু তাঁর সম্মান খুব বেশি ছিল। গুভালার সঙ্গে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তাঁর বয়স ছিল ৭০-এর বেশি। স্বভাব খুবই শান্ত আর কথাও খুব মধুর। তাঁকে আমি তিব্বতে আসার উদ্দেশ্য জানালাম। আর বললাম, 'আপনি দলাই লামাকে জানিয়ে দিন, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের অধ্যয়নে লেগে যাব।' তিনি পরামর্শ দিলেন, 'চুপচাপ নিজের কাজ করো।' আমি জানতাম, ১৯১১-র চীনের বিপ্লবের পরে দলাই লামাকে যারা সব থেকে বেশি সাহায্য করেছিল, তারা যদিও ইংরেজই ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে দেড়শো বছর ধরে চলে আসা সন্দেহ এখনো তিব্বতী লোকদের রক্তে রয়েছে এবং ইংরেজদের ওরা খুব শংকিত দৃষ্টিতে দেখে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ছিলাম ইংরেজ প্রজা। ওখানে কে আর জানতো যে, ইংরেজদের এড়িয়ে আসতে আমাকে কত কষ্ট করতে হয়েছে? আমার যেভাবেই হোক নিজের চিঠি দলাই লামার কাছে পাঠাবার ছিল। চুপচাপ থাকায় আমি হয়তো সফল হতাম, কিন্তু পরে আমার জন্য কে জানে কত লোককে ঝামেলা পোহাতে হতো। তাই এটা আমি পছন্দ করিনি। লাসায় ধনীর ছেলেদের ইংরেজি ও তিব্বতী পড়ানোর জন্যে দার্জিলিং-এর একজন ভোটিয়াভাষী ভদ্রলোক প্রাইভেট পাঠশালা খুলে রেখেছিলেন। প্রথমে তিনি তিব্বতীতে অনুবাদ করতে রাজি হলেন কিন্তু পরে ভয় পেয়ে গেলেন। ঙরী-ছাঙ্‌ দলাই লামার খুব বিশ্বাসী একজন দরবারী ছিলেন। তাঁর জন্যে আমার কাছে লাদাখের একটি চিঠি ছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি আজকাল লাসা থেকে ৫, ৭ মাইল দূরে ক্যেমোলিঙ্‌-এ নিজের উদ্যান-প্রাসাদে থাকেন। একজন নেপালী সাহুর তাঁর সঙ্গে খুব পরিচয় ছিল। সে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য বলেও ছিল। কিন্তু সেইদিন ছুতো করে চলে গেল। ত্রিরত্নমান সাহু ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন আর আমি একলাই ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলাম। রাস্তা ভুলে যাওয়ায় ২, ৩ মাইল ঘুরতে হলো, কিন্তু শেষমেশ ওখানে পৌঁছে গেলাম। তিনি খুব সস্নেহে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। জুতো খুলে যাওয়ার রেওয়াজ তিব্বতে নেই। গরমের সময়েও ঘরের মেঝে এত ঠাণ্ডা থাকে যে, লোকে জুতো পরেই ঘোরে। আসনেও বসে জুতো পরে। আমি নিজের জুতো নিচে খুলে এসেছিলাম। ঙরী-ছাঙ্‌ কোনো কাজে নিচে গিয়েছিলেন, তিনি আমার জুতোও তুলে নিয়ে এলেন। তাঁকে আমি সব কথা বললাম। তিনি আশ্বাস দিলেন, 'আমি আপনার পত্র অবশ্যই দলাই লামার কাছে পৌঁছে দেব। কিছু লোকের সাহায্য নিয়ে শ্লোকের ভোটিয়া অনুবাদ প্রস্তুত করলাম। আমি খুবই সুন্দর হস্তাক্ষরে সংস্কৃতে লিখলাম আর ৯ আগস্ট খুব ভোরেই গুভালার সঙ্গে দলাই লামার রাজোদ্যান নোর্বুলিঙ্‌কা (মণিউদ্যান)-তে গেলাম। অনুবাদসহ শ্লোকের পত্র আর

একটি রেশমী খাতা ঙরী লামার হাতে দিলাম। আমি তো ঐ দিন অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিলাম কিন্তু ঙরী লামা স্বয়ং ছু-শিঙ্-শা এসে বলে গেলেন, 'আমি দলাই লামাকে পত্র দিয়ে দিয়েছি। পণ্ডিত আপনার দোকানে থাকুন। সরকার যে কোনো দিন তাঁকে ডাকবেন।'

একদিক দিয়ে তো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে, আমার আর লুকিয়ে থাকার দরকার নেই। কিন্তু আমি চাইছিলাম ডে-পুঙ্ অথবা সে-রা-এর মধ্যে যে কোনো একটি মঠে থাকতে, যেখানে বিদ্বানদের সৎসঙ্গ পাওয়া যেত আর চব্বিশ ঘণ্টা তিব্বতী ভাষা বলার সুযোগ মিলতো। ছু-শিঙ্-শা-তে ত্রিরত্নমান সাহু, জ্ঞানমান সাহু, মাহিলা সাহু আর দু-তিন জন অন্য নেপালী কর্মচারী ছিল—সবাই হিন্দি বলতো। বাড়ির একটি কুঠরী ছিল কাদির ভাই-এর। সে-ও হিন্দি বলত। ফলে তিব্বতী ভাষা বলার ততটা সুযোগ ছিল না। কিন্তু কি করতাম?

ওখানে খাবার ছিল ছাতু, চা আর মাংস। দুটোর সময় চিঁড়ে আর শুকনো মাংস ভাজা, সন্ধেতে ভাত-ডাল আর মাংস। চায়ের পেয়ালার তো কোনো গোনা-গুনতি ছিল না। সে তো শোবার সময় পর্যন্ত চলতোই। কিন্তু আমি এটা পছন্দ করতাম না। আমি কয়েক বছর থাকার ইচ্ছা নিয়ে এসেছিলাম। তার ওপর এতগুলো দিন নিজের ভার ছু-শিঙ্-শা-র ওপর রাখা কি করে ঠিক হতো? পরে আমি খাওয়ার জন্য টাকা দিতে আগ্রহ দেখিয়েছিলাম, য়েটা সাহুরা আমার কথা ভেবে অনিচ্ছাপূর্বক নিয়েছিল।

ঙরী-ছাঙ্কে পত্র দিয়ে আমি ওই দিনই ডে-পুঙ্ মঠে চলে গেলাম। ডে-পুঙ্ হচ্ছে তিব্বতের সবচেয়ে বড় মঠ, যেখানে সাত হাজার ভিক্ষু থাকে। এটা একটা শহরের মতো। আমি ভেবেছিলাম যদি অনুমতি মেলে তো এখানে এসে কোনো কুঠরীতে থাকবো। অনেক ঘর দেখলাম, কিন্তু ওখানে জায়গা পাওয়া অত সহজ ছিল না। পুরো মঠটা অনেকগুলো ছাত্রাবাস (খম্‌জন্)-এ ভাগ করা আছে এবং প্রত্যেক খম্‌জন্ এক-একটি দেশের জন্যে নির্দিষ্ট। লাদাখবাসীরা থাকে পিতোক্-খম্‌জনে, কনৌরবাসীরা থাকে গুগে-খম্‌জনে। ভারতের তো কোনো খম্‌জন্ ওখানে ছিল না। নবাগত ছাত্র নিজের দেশের খম্‌জনে নিজের বিশেষ অধিকার অনুভব করতো। এই সব খম্‌জন্ বানাতে সেইসব দেশ আর্থিক সাহায্য দিয়েছে আর চালানোর জন্যও টাকা দান করেছে। সব খম্‌জনেরই কাছে ছোট-বড় জায়গীর আছে। বছরে ২০ সাঙ্ (১৪ টাকা), একজন লোকের জন্যে একটি ভাল ঘর পাওয়া যেত। ১০, ১২ টাকায় খাওয়ার ব্যাপারটাও হয়ে যেত। ৩, ৪ টাকা আরও খরচ দিলে রান্না করা খাবার পাওয়া যেত। বই বাদ দিলে বলা যায় ২০ টাকা মাসিক খরচে আমি বাকি কাজ চালিয়ে নিতে পারতাম। ৪, ৫ মাস তো আমার কাছের টাকা দিয়েই চলে যেত, তারপর কোনো না কোনো রাস্তা বেরিয়ে আসতো। কিন্তু এই খম্‌জনে নাম লেখানোটা সহজ ছিল না।

সুখরাম এবং আরও কিছু কনৌরবাসী অন্য ছাত্র কুঙ্গারবা মহলে থাকতো। জানা গেল যে, ওখানে নাম লেখানোর দরকার হয় না। এটা সেই মহল, যেখানে, দলাই লামা-শাসন আরম্ভ করেছিলেন যে পঞ্চম দলাই লামা তিনি শাসক হওয়ার আগে থাকতেন। এখনও ওটা দলাই লামার মহল। কিন্তু, বর্তমান দলাই লামা পোতলার মতো ভব্য প্রাসাদ পছন্দ

করেন না, নোর্বুলিঙ-এর (মণিদ্বীপ) উদ্যান-ভবনে থাকেন, তাহলে তিনি কুণ্ডগারবাতে কেন আসতে যাবেন? সম্‌লো-খম্‌জন্‌ রুশী এলাকার মঙ্গোল ছাত্রদের আবাস। গেশে থব্‌-দণ্ড্‌-শেরব্‌ ভারত হয়ে এসেছিলেন তাঁর জন্মস্থান সাইবেরিয়ায় বৈকাল হ্রদের কাছে বুর্‌য়ত প্রজাতন্ত্রে। এখন তিনি এখানেই ছিলেন। প্রথম রাতটা আমি তাঁর ওখানেই থাকলাম। সুমতিপ্রাজ্ঞও ডে-পুঙ্‌ পৌঁছে গিয়েছিলেন। ১০ আগস্ট তাঁর তরফ থেকে ভোজ ছিল এবং তিনি **মোঙ্গল** লোকদের একটা খুব প্রিয় খাবার মাংসের পরোটা, তৈরি করেছিলেন। মঙ্গোলিয়ার চারটি এলাকা আছে, যেখান থেকে ভিক্ষু-বিদ্যার্থী তিব্বতের মঠগুলোতে পড়তে আসতো—**বাহির-মোঙ্গলিয়া**(উরগা, আধুনিক উলন্‌বাটোর), ভিতর মঙ্গোলিয়া, বুর্‌য়ত (বৈকালের কাছে) এবং কলমুখ (ভল্‌গা নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত); কিন্তু রুশ-বিপ্লবের পর বুর্‌য়ত এবং কলমুখ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র হয়ে গেছে। (গত যুদ্ধে কলমুখ ভলগা তট ছেড়ে পূবদিকে চলে গেছে)। **বাহির-মোঙ্গলিয়াতেও** সাম্যবাদী শাসন কায়েম হয়ে গেছে। এখন একমাত্র **ভিতর-মোঙ্গলিয়াই** এরকম এলাকা ছিল, যেখান থেকে **মোঙ্গল** ভিক্ষু তিব্বতে পড়তে আসতো। সুমতি ভিক্ষু ছিলেন **ভিতর-মোঙ্গলিয়ার**। আগে যেখানে ডে-পুঙে হাজারের কাছাকাছি **মোঙ্গল** ভিক্ষু থাকতো, এখন তার সংখ্যা দু-তিনশো-র বেশি ছিল না। সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র থেকে তো নতুন ভিক্ষু এখন একরকম আসেই না। ত্রিশ-ত্রিশ বছর ধরে মঠের পুরনো বিদ্যা অধ্যয়ন করা ওদের কাছে বেকার। কিন্তু এখনো দেখা যায় সবচেয়ে মেধাবী আর পরিশ্রমী ছাত্র এবং পণ্ডিত হচ্ছে **মোঙ্গলই**।

আমি সুমতিকে যত বলেছিলাম, তার থেকে বেশি পয়সা দিয়ে দিলাম। তিনি খুব খুশি হলেন আর তাঁর কুঠরীতেই থাকার জন্য বলছিলেন। থাকবার তো ছিল ছু-শিঙ্‌-শাতেই, এখন লেখাপড়ার ব্যবস্থাটা ঠিক করার ছিল। নেপালী লোকদের মন্দিরগুলোতে (পালা) যে-কটা সংস্কৃত গ্রন্থ (নব ব্যাকরণ) ছিল, আমি সেগুলো আনালাম আর তিব্বতী অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে শুরু করলাম। আমার মনে হলো যে এই শব্দগুলোকে যদি আলাদা করে যাই তো একটা ভোটিয়া-সংস্কৃত-কোষ তৈরি হতে পারে। আমি সেজন্য ছোট-ছোট কাগজের টুকরোতে শব্দ লিখতে শুরু করলাম। ভিক্ষু আর তিব্বতী বিদ্বানদের সঙ্গে আলাপ এবং সৎসঙ্গের পরে আমার তিব্বতী পড়ার বেশির ভাগ কাজ হয়ে যাচ্ছিল সংস্কৃত আর ভোটিয়া-অনুবাদ গ্রন্থের দ্বারাই। শেষে আমি ১৬ হাজারের মতো শব্দ আমার কোষের জন্য জমা করে নিয়েছিলাম। ঠী-রিনপো-ছে মুরু বিহারকে বলে দিয়েছিলেন তন্‌-জুর-এর পুঁথিগুলো দেওয়ার জন্য। ওখান থেকে বই আমার নিবাসস্থলে চলে আসতো।

আমি যে কুঠরীতে থাকতাম, তাতে আরও অনেক লোকও থাকতো। তাই ত্রিরত্নমান সাহু অন্য একটি ঘর দিয়ে দিলেন। ভেতরের দিকে কিছু জিনিসপত্র রাখলাম তবে আমার জন্যে বাইরের বারান্দাটাই ছিল যথেষ্ট। শীত বাড়ছিল। আমি আমার পুরনো রদ্দি চোগা তো এক-দেড় হপ্তা পরেই কাউকে দিয়ে দিয়েছিলাম। আর ২৫, ৩০ টাকা দিয়ে উলের ভিক্ষু-বস্ত্র বানিয়ে নিয়েছিলাম। যখন শীত আরও বাড়লো তখন ২০ টাকায় একটা পোস্তিনের লম্বা চোগা কিনলাম। ওটা একটু পুরনো মতো ছিল, নিয়েছিলাম গুদড়ী বাজার থেকে। প্রথমে কেউ কেউ তো বলল বেশি দাম নিয়েছে। কিন্তু পরে একজন ওর ওপরের

লাল রেশমটার জন্যেই অর্ধেক দাম দিতে রাজি ছিল। যাক গে, এখন আমার শীতের ভয় থাকলো না। কিন্তু লেখার সময় হাত আর আঙুল কি ঢেকে রাখতে পারতাম? অক্টোবরের শেষ নাগাদ আঙুল ফাটতে শুরু করলো আর হাত থেকে রক্ত বেরোতে লাগল। শীতে ব্যাস এই একটাই কষ্ট ছিল। তবে ভেসলিন লাগিয়ে কাজ চলে যাচ্ছিল। একদিন আমি কলম দিয়ে লিখছি। দেখি কাগজে কালি আসছে না, ঝেড়ে নিয়ে লেখার চেষ্টা করলাম, তবু কালি বেরোল না। দেখলাম কালি বরফ হয়ে কলমের ডগায় জমে গেছে। তখন আমি ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করতে লাগলাম। তাতে কালি জমতো না।

যুদ্ধের মেঘ—আমার আসা এখন এক মাসও হয়নি, তিব্বতে লড়াই-এর মেঘ ঘনিয়ে এলো। সীমান্তে জুলুম, নেপালী প্রজাদের ওপর জুলুম ইত্যাদি অনেক রকমের অভিযোগ ছিল নেপাল সরকারের, তিব্বতী সরকারের বিরুদ্ধে। এদিকে আরো একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। শরবা গ্যল্‌পো একজন ব্যবসায়ী নেপালী প্রজা ছিল। সে ছিল একটু বেশি নির্ভীক। সে কখনো-কখনো তিব্বতী শাসক এবং দলাই লামার পর্যন্ত কড়া সমালোচনা করে বসতো। গত শতাব্দীর কয়েকটা লড়াইয়ে পরাজিত করে নেপাল সরকার ভুটান সরকারের কাছ থেকে অনেকগুলো বিষয়ে অধিকার নিয়েছিল। তার মধ্যে একটি ছিল, নেপালী প্রজার মোকদ্দমার ফয়সালা নেপালী প্রতিনিধিই করতে পারবে। এ ব্যাপারে তিব্বতী আদালতের কোনো অধিকার নেই। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো মোকদ্দমায় দুই প্রজাই থাকে, তাহলে দুজনের সংযুক্ত আদালত ফয়সালা করবে। শরবার ভুটান সরকারকে কিসের পরোয়া ছিল? ও তো ছিল নেপালী প্রজা। দলাই লামার কাছে শরবার সম্বন্ধে অভিযোগ পৌঁছে গিয়েছিল। কেউ বলে দিয়েছিল, শরবা নেপালী নয়, ভোটিয়া প্রজা। শরবা বহু বছর ধরে লাসায় থেকেছিল, ভুটান সরকারের কর্তব্য ছিল আগে তার সম্বন্ধে ভালো করে খোঁজ-খবর নেওয়া। কিন্তু যেখানে একজন লোকের হাতে শাসনের অসীম ক্ষমতা থাকে, সেখানে কর্তব্য আর আইন কে দেখে? দলাই লামা হুকুম দিলেন আর শরবাকে ধরে হাজতে ঢোকানো হলো। তাকে সাধারণ কয়েদীদের হাজতে রাখা হয় নি। তাহলে তার জীবন আরও নরক হয়ে যেত। সাধারণ কয়েদীদের হাজত হচ্ছে নোংরা অন্ধকার কুঠরী, যেখানে পোকামাকড় আর ছারপোকার কোনো গোনাগুনতি নেই। সেখানে যদি বছরখানেক থাকতে হয়, তাহলে খুব কম লোকই জ্যান্ত বেরিয়ে আসতে পারে। ১৪ আগস্ট শরবা সুযোগ পেয়ে নেপালী দূতাবাসে চলে এলো। নেপালী রাজদূত যখন আমার আসার খবর জানতে পারলো তখন দেখা করার জন্য আমাকে ডেকেছিল। আমি যখন রাজদূতের সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলাম, তখন দেখলাম একজন খুব লম্বা শক্তপোক্ত লোক সেখানে পায়চারী করছে—এই ছিল শরবা। দলাই লামার ক্রোধ আরো বেড়ে গিয়েছিল। এবং এই ঘটনার জন্য দায়ী শুধু কয়েকজন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে সাজা দিলেই প্রশমিত হতো না। শহরে নানা রকমের গুজব ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নেপালীরা হচ্ছে লাসার মারোয়াড়ী, এক-এক ঘরে লাখ টাকার সম্পত্তি আছে। সবাই ভয় পাচ্ছিল, যে ভুটান সরকার যদি জবরদস্তি করে এবং রাজদূত একটুও বিরোধিতা করে,

তাহলে শহরের গুণ্ডা-বদমাশরা নেপালীদের লুটে নেবে। ২৩ আগস্ট হইচই উঠলো যে, ভোটিয়া পল্টন শরবাকে ধরার জন্যে নেপালী দূতাবাস গেছে। লোকজন ধড়াধড় দোকান বন্ধ করে দিল। রাস্তার ওপর যারা অল্প-অল্প জিনিস বিক্রি করে তারা এবং ফেরিওলা মেয়ে-পুরুষরাও উধাও হয়ে গেল। যেখানে একটু আগেও লোক চলাচল করছিল, এখন সেখানে একদম নীরবতা ছেয়ে গিয়েছিল। সবাই নিজের-নিজের বন্দুক-পিস্তল বাগিয়ে বসে ছিল। পরে জানা গেল যে, সেপাইদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে। ২৭ আগস্ট বারোটার সময় আবার সেই রকম ধড়াধড় দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। এবার খবর মিথ্যে ছিল না। দলাই লামার সৈনিক শরবাকে ধরার জন্যে নেপালী দূতাবাসে ঢুকে গেছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দূতাবাসের ওপরে হামলা করা অভদ্রোচিত মনে করা হয়। কিন্তু যখন সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে ইংলন্ড এবং চীন এই রকম ব্যবহার করেছে, তখন পাঁচশো বছর পিছিয়ে থাকা তিব্বতী সরকার সম্বন্ধে আর বলার কি আছে? সকলের আশঙ্কা ছিল যে রাজদূত তার শেষ ক্ষমতা পর্যন্ত শরবাকে দিতে চাইবে না। দূতাবাসে খুব বেশি নেপালী সৈনিক ছিল না কিন্তু যারা ছিল তারা ভোটিয়া সৈনিকদের মতো নবশিক্ষিত বন্দুকবাজ ছিল না। দূতাবাস যদি চাইতো, তাহলে নেপালী প্রজাদের ভেতরেই এক-দেড় হাজারকে সশস্ত্র করতে পারতো। কিছুকাল, অন্তত কয়েকটা দিন তো তারা ভালোরকম মোকাবিলা করতে পারতো। একে হয়তো বাহাদুরী মনে করা হতো কিন্তু মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হতো না। কারণ তখন একজন শরবার জীবন না, পরন্তু হাজার-হাজার নেপালী মারা যেত। রাজদূত মৌখিক বিরোধিতা করলো। ভোটিয়া সৈনিকরা শরবাকে ধরে নিয়ে গেল। ওইদিনই শরবার ওপর দুশো বেত পড়ল। মাংস আর চামড়া কেটে গেল। লোকে বলছিল, শরবা একবারও টু শব্দ পর্যন্ত করে নি। ১৭ নভেম্বর শরবা মরে গেল।

লাসা কোনো আধুনিক শহর নয়, যদিও ওখানকার দোকানে আধুনিক জিনিসপত্রও বিক্রি হয়। শহরের হরতাল সম্বন্ধে আমরা মনে করি যে, ওটা আধুনিক বিশ্বের জিনিস। কিন্তু জানা গেল যে, নাগরিকদের হরতাল বা দোকান বন্ধ-রাখাটা পুরনো বিশ্বেও ছিলো। ২৯ আগস্ট শহর-কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ীদের ডেকে প্রথমে তো সান্ত্বনা দিল, তারপর বললো যে, দোকান বন্ধ করলে কড়া সাজা দেওয়া হবে। যাক গে, দোকান তো তখন থেকে বন্ধ হয়নি, কিন্তু নেপালীদের মধ্যে খুব অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। এবার পরিষ্কার বোঝা যেতে লাগল যে, তিব্বত আর নেপালে অবশ্যই যুদ্ধ বাধবে। সেনাদের জন্যে তাঁবু তৈরি হতে লাগলো। বাজারে যত জিন-কাপড় পাওয়া গেল সরকার সব কিনে নিল। সেপ্টেম্বরের শেষে চীনের এলাকা সীনিঙ থেকে কয়েকশো খচ্চর এলো বিক্রির জন্যে, সরকার সবগুলো কিনে নিল। নেপালীরাও একজন-দুজন করে লাসা ছেড়ে যেতে শুরু করলো। জ্ঞানমান সাহু তার বড় ভাই ত্রিরত্নমান সাহুকে ২০ আগস্টই ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। অক্টোবরের প্রথম হপ্তায় নেপালী ব্যবসায়ীদের কাছে নেপাল আর কলকাতা থেকে চিঠির পর চিঠি এবং তারের পর তার আসতে লাগল—সবকিছু বেচে-বুচে চলে এসো।' ৩ অক্টোবর সরকার লাসার নাগরিকদের লোকগণনা করাচ্ছিল। ৫ অক্টোবর জানা গেল যে,

দুই সরকারের মধ্যে তারে কথা চলছে। এটাও জানা গেল, নেপালী সৈন্যরা তিব্বতের সীমানার দিকে চলে গেছে। ৬ তারিখে জ্ঞানমান সাহুর কাছেও তার চলে এলো—সব ছেড়েছুড়ে চলে আসার জন্যে। কিন্তু সে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো না। হয়তো আরো অনেক নেপালীর মতো তারও বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধ হবে না। ৮ অক্টোবর জানা গেল নেপাল সরকার দুটো শর্ত রেখেছে—দোষী অফিসারদের শাস্তি দেওয়া হোক আর তিব্বত সরকার প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে নিক। তিব্বত সরকার এতে রাজি ছিল না। ৮ তারিখ খবর পাওয়া গেল, যে দলাই লামা ডে-পুঙ্, সে-রা, গন্-দন্—তিনটি মঠের প্রতিনিধিদের পরামের্শের জন্যে ডেকেছেন। মানুষ যুদ্ধের পক্ষে নয়। কিন্তু দলাই লামা, প্রধান সেনাপতি আর লামার প্রিয় দরবারী কুম্-ভেলা—তিনজনই যুদ্ধের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ৪ নভেম্বরে লাসার রাস্তা দিয়ে ভোটিয়া পলটন 'রাইট-লেফট' করে বেরিয়ে পড়ল। একেবারে শিবের বরযাত্রী। কেউ ৫৫ বছরের বুড়ো, কেউ ১২ বছরের ছোকরা। উর্দি-ফুর্দির কোনো বালাই নেই। তবে এতে লোকের মনে যুদ্ধের অশংকা আরও বেড়ে গেল। এখন ফৌজি তাঁবু তৈরি হয়ে গিয়েছিল। চা বানানোর জন্য বড়-বড় বাসনও কেনা হচ্ছিল। ১০ নভেম্বর জানা গেল যে, শরবাকে ধরার সমস্ত দায়টা পড়েছে দলাই লামা আর তাঁর ভাইপো লোঙ্ছেন (প্রধানমন্ত্রী)-এর ওপর। ইংলন্ড থেকে পড়াশুনো করে ফিরে আসার পর প্রধান সেনাপতিও যুদ্ধের পক্ষে রয়েছে। আমি একজন ভোটিয়া ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস কবলাম, 'আধুনিক সৈনিকের দৃষ্টিতে নেপালের পল্টনও লাঠিয়াল ফৌজ, কিন্তু ভোটিয়া ফৌজের চেয়ে তো তারা হাজার গুণ বেশি শিক্ষিত। সংখ্যাও ওদের বেশি, তাহলে ভুটান সরকার কোন ভরসায় টান-টান হয়ে আছে?' সে বললো, 'রাশিয়া মদত দিতে আসবে।' আমি বললাম, 'রাশিয়ার মদত দিতে আসা, মানে ইংলন্ডেরও তাতে ঝাঁপ দেওয়া—সেটা অসম্ভব। তার ওপর রাশিয়ার সঙ্গে তোমাদের তো তারেরও যোগাযোগ নেই। বেতারও নেই তোমাদের। ছ-মাস পরে যখন মস্কোয় খবর পৌঁছবে ততদিনে তো নেপালী পল্টন লাসা পৌঁছে যাবে।' তখন ও বললো, 'চীন আমাদের মদত করতে আসবে।' আমি ভাবলাম, এটা পুরো ভাগ্যের ব্যাপার। ১১ নভেম্বর নেপালে আসা চিঠিপত্র থেকে জানা গেল যে, কুত্তী আর কেরোঙ্-এর রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে, দনাদ্দন পল্টন যাচ্ছে। বাড়ির লোকজনেরা আপনজনদের তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্যে জোর দিচ্ছিল। ১৪ অথবা ১৫ তারিখে কোনো নেপালী সওদাগর তার কোনো আত্মীয়কে আসতে বলেছিল, যার জবাবে নেপাল থেকে তার এসেছিল—'আসা বিপজ্জনক' (unsafe to come)।

ভারত থেকে লাসা পর্যন্ত তার আছে, যার মধ্যে গ্যান্চী পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের, আর তারপর থেকে ভুটান সরকারের। সে-সময় তারের থাম পাল্টানোর জন্য ভারতীয় তার-বিভাগ মিস্টার রোজমেয়র নামে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোককে ধার দিয়েছিলো। তিনি তখন লাসায় ছিলেন। আমার সঙ্গে একদিন দেখা করতে এসেছিলেন। মনে হয়েছিল, সৌজন্য দেখাতে তিনি আসেননি, এসেছিলেন এটা জানতে যে, আমি কি করছি। আমার কাজ তো ছিলো একেবারে সাহিত্য-সংক্রান্ত। কিন্তু তিনি সরকারকে কি

লিখেছিলেন কে জানে। ১৭ নভেম্বর আবার রোজমেয়র এলেন। পরের দিন তাঁর ভারতে রওনা হওয়ার ছিল। তিনি বললেন, 'ইংরেজ সরকার তার দুই মিত্রর মধ্যে যুদ্ধ হতে দেয় কি করে?' কথাটা একদম সত্যি ছিলো। এই যুদ্ধের খবর আমি সিলোনে আনন্দজীর কাছেও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার নায়ক স্থবির এটা শুনে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, আর আনন্দজীকে জিজ্ঞেস করছিলেন ওখানে উড়োজাহাজ পৌঁছতে পারে কিনা। আমি জবাব লিখে দিয়েছিলাম, 'আজ অবধি তো তিব্বতের আকাশে কোনো উড়োজাহাজ ওড়েনি।' ২১-এ নেপাল থেকে তার এলো, 'নেপালের সংশ্লিষ্ট সবকিছু ভাল আছে। ভয় পেতে হবে না। আগের মতো কাজকর্ম করো।' পয়লা ডিসেম্বর জানা গেল যে, সন্ধি হওয়ার ব্যাপারে বেশ সন্দেহ আছে।

ওদিকে লামারা মাসখানেক ধরে পুরশ্চরণ করছিলেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র-শমসের খুব বৃদ্ধ ছিলেন। ২৫ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল। কিন্তু লাসাতে এই খবর পাওয়া গেল দু-দিন পরে। সব জায়গায় হইচই পড়ে গেল যে, তান্ত্রিক লামাদের পুরশ্চরণ সফল হয়েছে, সেই কারণেই নেপালের প্রধান মন্ত্রী মারা গেছেন। ২৮ ডিসেম্বর শুনলাম যে, নেপালের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নেই। নেপালে এখন চন্দ্রশমসেরের ছোট ভাই ভীমশমসের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, এখন লড়াই-এর কোনো সম্ভাবনা নেই। ১১ আর ১৩ ফেব্রুয়ারি জানা গেল, নেপালী সেনা সীমান্তে পৌঁছে গেছে। তিব্বতী অফিসাররা এখন বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিল। এই সময়েই চীন সরকারের দূতমণ্ডলী লাসায় পৌঁছল যার মধ্যে একজন মহিলাও এসেছিলেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি নৌ এবং স্থল, দু-পথেই সৈন্য বসানো হলো। এখন আর কোনো নেপালী বা আধানেপালী (ভোটিয়া স্ত্রীর গর্ভে নেপালী পুরুষের সন্তান) লাসা ছেড়ে বাইরে যেতে পারতো না। এখন যুদ্ধে আর কি সন্দেহ ছিল?

১৩ ফেব্রুয়ারি এটাও জানা গেল যে, নেপাল আর ভুটানের মধ্যে সন্ধি করানোর জন্য সর্দার বাহাদুর লেদন্‌লা আসছেন। লেদনলা দার্জিলিং-এর একজন ভোটিয়া-ভাষী ভদ্রলোক। তিনি মামুলি দারোগা থেকে উন্নতি করে করে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়েছিলেন। ইংরেজ সরকারের বড় শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভুটানের মানুষ, আর বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর খুব ভালবাসা ছিলো। ভোটিয়া পুলিশের নবসংগঠন আর শিক্ষণের জন্য তিনি কিছুদিন লাসাতেও থেকে গিয়েছিলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি শহরের ভেতর তোপ নিয়ে পল্টন ঘুরল। যুদ্ধের পারদ খুব উঁচু হয়ে গেল। চলে না যাওয়ার জন্য নেপালীরা এখন অনুতাপ করতে লাগল। ওই দিন এটাও জানা গেল যে, লেদন্‌লা লাসা থেকে দুদিনের পথ পর্যন্ত এসে ফিরে গেছেন। লাসায় এ-সময় চীনা দূতও এসে মজুত ছিলেন, এই জন্য ভোটিয়া লোকরা বেশি বল অনুভব করছিলো। ১৬ ফেব্রুয়ারি লেদন্‌লা লাসা পৌঁছে গেলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি জানা গেল, লেদন্‌লা দলাই লামার সঙ্গে একান্তে তিন ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা বলেছেন তারপর মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি জানা গেল, কুম্‌-ভেলা আর সেনাপতি সমঝোতার পক্ষে নন। ৭ মার্চ পর্যন্ত লেদন্‌লা তাঁর কাজে সফল হলেন না। ১১ মার্চ খবর পাওয়া গেল, লেদন্‌লা তাঁর চেষ্টায় সফল হয়েছেন এবং

সমঝোতার বিষয়টি নেপাল সরকারের কাছে স্বীকৃতির জন্য পাঠানো হয়ে গেছে। ১৬ মার্চ আবার খবর ছড়ালো, লেদন্‌লা হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। ১৮ তারিখে এখনো, যুদ্ধের আশংকা ছিল কিন্তু বিশ্বস্ত লোকরা মিটমাটের আশা করছিলেন। ২০ নভেম্বর আমি লেদন্‌লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। মনে হয়েছিলো, খুবই চতুর এবং মিষ্টভাষী। ২২ মার্চ মধ্যাহ্নে খবর এলো, সমঝোতা হয়ে গেছে। চারদিকে দেখা গেল শুধু খুশি আর খুশি। লেদন্‌লাই ছিলেন একমাত্র লোক, যিনি এই জট ছাড়াতে পারলেন। নইলে পাগল ভোটিয়া রাজনীতিকরা না-জানি কি করে বসতো। কিন্তু পরে, এটা দেখে আমার খুব আফশোস হলো যে, ইংরেজ সরকার লেদন্‌লার এই উদ্যোগের উপযুক্ত সম্মান দিল না। কোনো ইংরেজ যদি এতটা সাফল্য অর্জন করতো, তাহলে তাকে 'স্যার' কিংবা না জানি কি বানানো হতো।

এদিকে যখন এই সমস্ত ঝড় চলছিল, সেই সময় লাসায় থেকে আমাকে নিজের কাজে লেগে থাকতে হচ্ছিল। হয়তো ওপরের লেখা থেকে মনে হবে যে, আমি খুব যত্ন সহকারে এইসব খবরাখবর সংগ্রহ করতাম। ব্যাপারটা কিন্তু তা ছিল না। ভোটিয়া অথবা নেপালী যার সঙ্গেই দেখা হতো, কথাপ্রসঙ্গে যুদ্ধের কথা অবশ্যই উঠতো। আর আমি সেসব ডায়েরিতে নোট করে যেতাম। আলোচনার বিশ্লেষণে বুদ্ধিও খরচ হতো। আমি যুদ্ধ নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম না। এটা অবশ্যই ঠিক যে, যুদ্ধ শুরু হলে আমাকে ছু-শিঙ্-শা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হতো। যে নতুন ঘরে আমি চলে এসেছিলাম তার পাশেই কাদির ভাই-এর স্ত্রী খতীজা থাকতো। কাদির ভাই আধা তিব্বতী-আধা কাশ্মিরী ছিল, কিন্তু খতীজা ছিল খাঁটি তিব্বতী। আর শুধু তিব্বতী ভাষাই বলতে পারতো। সবাই জানতো আমি আমার কাজে ডুবে থাকি। তাই বেশি কথাবার্তা বলতে আসতো না।

৮ সেপ্টেম্বর ধীরেন্দ্র গুভালাকে তার মালিক বের করে দেয়। মালিকের দোকানটা ছিল লাসার নেপালীদের বড় বড় দোকানগুলোর মধ্যে একটা। বড় পাইকারী বিক্রেতারা সাধারণত রক্ষিতা রাখতো না, বিশেষ করে, খোলাখুলিভাবে রাখতো না। কিন্তু এই মালিক একজন আধাচীনা তরুণীকে বাড়িতে রেখে বিলাসব্যসনে এলোপাথাড়ি খরচ করতো। লোকে অবাক হতো যে, দোকানের আসল মালিক তার মামা এদিকে কেন নজর দেয় না। এই মালিক আর চাকরের ঝগড়ায় একটা লাভ হলো এই যে, ধীরেন্দ্রবজ্র ছু-শিঙ্-শা চলে এলো।

লাসায় পাঁচ-ছশো ঘর হচ্ছে আধা-কাশ্মিরী মুসলমানদের। এছাড়া কিছু চীনা মুসলমান আছে, কিন্তু দু-জনদের মধ্যে সেরকম ঘনিষ্ঠতা নেই। কাশ্মিরী মুসলমানরা লাসায় সর্বপ্রথম এসেছিল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি পঞ্চম দলাই লামার শাসনকালে। এখন তো ওদের সংখ্যা প্রচুর। আগে তারা তাদের মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দিত কিন্তু পরে দলাই লামা জমি দিয়ে দিলেন, সেখানে মসজিদ এবং কবরস্থান বানানো হলো। একদিন কাদির ভাই-এর ঘরে মৌলুদ শরীফের কথা পাঠ হলো। মৌলবী উর্দুতে বললেন, তারপর খাওয়া-দাওয়া হলো। কাদির ভাই একজন ভালো কারিগর দিয়ে ঘিওর বানিয়েছিল। পাড়াতে থাকলে আমার কাছেই-বা প্রসাদ আসবে না কেন?

সেপ্টেম্বরে এখন ফসল কাটা হচ্ছে। এ সময় লাসায় ঘুড়ি-খেলা হয়। সম্ভবত, নেপালীরা এই খেলা লাসাতে ছড়ায়। ঠাণ্ডা বাড়ছিল। ১৭ সেপ্টেম্বর দক্ষিণের পাহাড়ে সর্বপ্রথম বরফ পড়ল। যুদ্ধ এবং তারপর তিব্বত ও ইংরেজের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল, তাঁর একটি ফল হলো লাসা পর্যন্ত তার লাগানো হয়ে গেল। এতে আমারও লাভ ছিল, কেননা আমি সহজেই ভারত অথবা লংকায় তার পাঠাতে পারতাম। তারের দাম ধার্য করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে কিন্তু তখনকার ভোটিয়া টাকার মূল্য এখন এক-চতুর্থাংশ হয়ে গিয়েছিল, তবু ওই দামই ছিল। এই ঘনিষ্ঠতার দরুন দলাই লামা ৪, ৫টি ছেলেকে ইংলণ্ডে পড়তে পাঠিয়েছিলেন, যার মধ্যে একজন তো ফিরে এসে মারা গেল। একজন বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার হলো এবং জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করলো—যা সমস্ত ট্যাকশালে কাজে লাগে, লামার উদ্যানপ্রাসাদেও লাগানো আছে। শহরে এখনো বিদ্যুৎ আসে নি। এক তরুণ এখন ভুটানের প্রধান সেনাপতি ছিল। আর চতুর্থ জনকে একটি ছোট জোঙ্-এর অফিসার বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

লাসা থেকে দুই-তিন মাইল দূরে ডে-পুঙ আর সে-রার বড়-বড় বিহার আছে। ডে-পুঙ্-এ সাত হাজারেরও বেশি আর সে-রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি ভিক্ষু থাকে। এমনিতে তো এগুলো নালন্দার মতো বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এগুলোতে যে পাঁচ-সাত হাজার ভিক্ষু থাকে, তারা সকলেই পড়াশোনার জন্য এখানে থাকে না। সাধারণ পড়ুয়ার সংখ্যা সম্ভবত দু-আড়াই হাজার। প্রকৃত বিদ্যার্থী তো এক হাজারই হবে। বাদবাকি হচ্ছে বর্বর ঢাবা। তারা মঠের রান্নাবান্না থেকে শুরু করে জায়গীরের ব্যবস্থা এবং ব্যবসা পর্যন্ত করে। তুচ্ছ-তুচ্ছ কথায় ঝগড়া করে। অনেক সময় তো দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি হয়ে যায়। ওদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ মামুলি কুস্তি নয়। তলোয়ার তারা খুব ধারালো করে, যুদ্ধ-স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়, তারপর মদ খেয়ে নিজেব বন্ধুকে নিয়ে সেখানে পৌছোয়। তলোয়ার নিয়ে আখড়ায় লাফাতে থাকে, যেখানে একজনের মৃত্যু অবধারিত। অন্যজন তারপর ওখান থেকে কোনো দিকে চলে যায়। এই ঢাবাদের লোকে খুব ভয় পায়। মঠের বড় অফিসার ছাড়া তারা কারো কিছু মানে না। গেলুগ্পা সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের মদ না খাওয়াটা সুবিদিত আর মঠে তো ওটা একেবারেই ঢুকতে পারে না। তাই ছঙ্ খাওয়ার জন্য ওদের শহরে আসতে হয়। ওদের নেশা কখনো-কখনো বিপজ্জনক চেহারা নিয়ে নেয়। কখনো-কখনো তো মদ না খেয়েও এরকম পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে যায়। ৩০ সেপ্টেম্বর কাটা ঘুড়ির সুতো লুটতে গিয়ে একজন পুলিশের ঢাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায়। ঢাবা পাথর মেরে পুলিশকে ওখানেই শেষ করে দেয়।

ঠিক্সে হচ্ছে লাদাখের একটা ভালো বিহার। মঠে যখন কোনো প্রভাবশালী মোহান্ত মারা যায়, তখন তাঁর মৃত্যুতে এখানকার লোকেরা অবতারের কল্পনা করে নেয় আর শিষ্যের বদলে কোনো একটি ছেলেকে তার অবতারী মনে করে গদিতে বসায়। তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম যেখানে-যেখানে এসেছে, সব জায়গাতেই এরকম অবতারী লামার রীতি আছে। আজকাল তাদের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌছে গেছে। এই অবতারী লামাদেরই মান তিব্বতে সবচেয়ে বেশি। তবে বিদ্যোবুদ্ধিতে ভালো খুব কমই বেরিয়ে আসে। অবতারী

লামাদের একটা লাভ অবশ্যই থাকে—সাধারণত এরা বড় খানদানের ছেলে হয়, গরিব ঘরের হলেও নিজের শিক্ষাদীক্ষার কারণে সে বড় খানদানের ছেলের মতোই হয়ে যায়। তাদের সম্পূর্ণ মনোবৃত্তি রাজা আর সামন্তদের মতো হয়। বাচ্চা বয়স থেকেই তাদের প্রতি খুব ভদ্রতা ও ভালোবাসা দেখানো হয়, বড়-বড় লোকেরা মাত্র তিন বছরের বাচ্চার সামনে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য নিজের মাথা নামিয়ে দেয়। তাহলে তার মেজাজ কেন আসমানে উঠে যাবে না? পড়াশুনোর জন্য তার পরিশ্রম করার দরকার কি? উচ্চপদস্থ লোকেরা তার আশেপাশে থাকে, ফলে তার ভাষা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজের থেকেই পরিমার্জিত হয়ে যায়। ঠিক্‌সে তো লদাখে অবস্থিত, কিন্তু ওখানকার অবতারী লামা হয়েছিল লাসা থেকে নিয়ে চলে যাওয়া একটি ছেলে। যুবক হয়ে মঠের জীবন তার পছন্দ হলো না। সে প্রকাশ্যেই বিলাসী হয়ে উঠলো। শেষকালে মঠের ভিক্ষুদের বিরোধিতা করতে হলো, এবং সে চলে আসে লাসায়। এখন সে ছিল লাসার পশ্চিম থানার অফিসার। লোকটি সচেতন ছিল। আমার সঙ্গে মাঝেমাঝেই কথা হতো। এর বাবা ছিল একজন ভালো অফিসার। কিন্তু দুজনের মিল হতো না। আমি একবার ঠিক্‌সের ভূতপূর্ব অবতারী লামা, এই বড় সুন্দর তরুণটিকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কি এইসব অবতারী লামাদের বিশ্বাস করো?' সে বললো, 'আমি নিজেই অবতারী লামা। তবু এসব একেবারে ধাপ্পা মনে করি। দলাই লামা ছাড়া আমি কাউকেই অবতারী বলে মানি না। দলাই লামা হচ্ছেন রাজা। রাজাকে অবতারী বলে না মানলে প্রাণ বাঁচবে কি করে?'

২২ নভেম্বর ছিল সেই তিথি, যেদিন বুদ্ধ দেবলোকে মাকে উপদেশ দিয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল সংকাস্যতে, সেটা আমি আগেই বলেছি। দেবাবতরণের উৎসব লাসাতে খুব ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়। কিছুদিন আগে থেকেই ঘরদোর ঝাড়পোঁছ আর চুনকাম শুরু হয়ে যায়। নভেম্বর মাসে এখন ছিল শীতের দিন। শীতে পশুদের খাবারের সুবিধে থাকে না। তাই তারা দুর্বল হয়ে যায়। গায়ের মাংস তাদের কমতে শুরু করে। সুতরাং অক্টোবর আর নভেম্বরে পশুদের মেরে ৮ মাসের জন্য মাংস জমা করে নেওয়া হয়। ভেড়ার মাংস তো সাধারণত চামড়া ছাড়ানোর পর গোটাকে গোটাই টাঙিয়ে দেওয়া হয়, আর ধীরে ধীরে সেটা শুকিয়ে যায়। ইয়াক এবং অন্যান্য বড় জানোয়ারের মাংস টুকরো-টুকরো করে কেটে, দড়িতে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। কাদির ভাই একটা ইয়াক মারিয়েছিল আর আমারই ঘরের ভেতর তার মাংস শুকোনোর জন্য টাঙিয়েছিল। ইয়াক সাধারণত কালো রঙের হয় কিন্তু অনেকেরই লেজটা হয় সাদা। মরার পর একটুখানি লেজ কেটে নেওয়া হয়, যাতে তার সঙ্গে চুল লেগে থাকে। এই কাটা লেজকেই রুপো অথবা অন্য কোনো ধাতুর হাতলে জুড়ে দেওয়া হয় আর সেটা হয়ে যায় আমাদের পবিত্র চামর।

লাসা থেকে অনেক উত্তরে এখনো জংলী অবস্থায় ইয়াক দেখা যায়। তারা পোষা ইয়াক থেকে তিন-চার গুণ বড় হয়। পোষা ইয়াক ষাঁড়ের সমান হয়। ওরা ঠাণ্ডা জায়গার ষাঁড় কিন্তু আমাদের ভারতীয় ষাঁড়ের (গরুর) মতো না, তারা ইউরোপীয় ষাঁড়ের মতো ককুদহীন হয়। আমাদের গরু আর ইয়াক—দুই-এর মিলনে উৎপন্ন প্রজাতি সমানে চলতে

থাকে, ফলে দুজনের জাতি যে এক তাতে সন্দেহ নেই। তিব্বতে নেপালীরা ইয়াকের মাংস চিরদিনই খেয়ে আসছে। আর এখনও খায়। আমি প্রথম যাত্রায় তো ওটা খেতে পারি নি, কারণ আমার পুরো বিশ্বাস ছিল যে ওটা গরু আর পুরনো সংস্কার ওটাকে খাওয়ার ব্যাপারে আমার মনে বিরক্তি সৃষ্টি করছিল।

আমার কাছে টাকা খুব সামান্য ছিল, এটা আমি আগেই বলেছি। প্রথমে আমি চাইছিলাম যে, মাসে দু-তিনটে প্রবন্ধ কোনো সংবাদপত্রের জন্য লিখে যাই, তা থেকে বিশ-পঁচিশ টাকা চলে আসবে। কিন্তু এখন দু-এক বছর ধরে আমি হিন্দি পত্রিকায় লেখা দিতে শুরু করেছিলাম। ফলে পত্রিকা থেকে আর কতটুকু আশা করতে পারতাম? তবে হ্যাঁ, আমার বন্ধুদের আমি খবর দিয়েছিলাম আর লাসা পৌঁছনোর দেড়মাস পরই আচার্য নরেন্দ্রদেবজী বেনারস থেকে দেড়শো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হপ্তাখানেক পর আরও একশো চোদ্দ টাকা চার আনা তিনি পাঠালেন। ওদিকে আনন্দজীও স্থায়ী ব্যবস্থার চেষ্টা করছিলেন। এখন আট-দশমাস খাওয়া-পরার চিন্তা থেকে তো আমি মুক্ত ছিলাম। তবে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ প্রোগ্রাম তো তখনই তৈরি করা সম্ভব হতো, যখন খাওয়া-পরার স্থায়ী ব্যবস্থা করে নিতাম। আগে আমি ভেবেছিলাম, যে আমার সংস্কৃতের জ্ঞান লংকার মতোই তিব্বতে সাহায্য করবে। কিন্তু এখানে সংস্কৃতের কথা জিজ্ঞেস করার মতো কেউ ছিল না। মন্ত্র তিব্বতেও সংস্কৃতেই জপ করা হয় কিন্তু ভোটিয়া তারা সংস্কৃতের চেয়ে কম পবিত্র মনে কবে না। আর এমনিতেও বৌদ্ধ সাহিত্যের সম্বন্ধ যতদূর পর্যন্ত, তাতে দেখা যায় ভোটিয়ার সামনে সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত দবিদ্র। এটা ঠিক যে, তিব্বতী ভাষার দশ হাজার গ্রন্থের অনুবাদ সংস্কৃতেই করা হয়েছিল। কিন্তু এখন তো দু-আড়াইশোর বেশি গ্রন্থ সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। এর মধ্যেও বেশিব ভাগ হচ্ছে সেই সব গ্রন্থ যেগুলো আগের তিনটি যাত্রায় আমি তিব্বতেব পুবনো মঠগুলোতে পেয়েছিলাম।

জানুয়ারি (১৯৩০)-তে আনন্দজী আব আচার্য নরেন্দ্রদেবেব চিঠি এলো। তাঁরা আমার স্থায়ী ব্যবস্থা করছেন। আনন্দজী এটাও লিখেছিলেন, ‘এখান থেকে টাকা যাওয়ার পরে আপনাকে সমস্ত বই কিনে ওখান থেকে চলে আসতে হবে।’ নরেন্দ্রদেবজী কাশী বিদ্যাপীঠ থেকে ব্যবস্থা করিয়ে নিচ্ছিলেন আব সে-ব্যবস্থা হযে গেলে আমি তিব্বতে থেকেই পড়তে পারতাম। দু-জাযগাব মধ্যে আমি বিদ্যাপীঠেব ছাত্রবৃত্তিই পছন্দ কবতাম, কাবণ আমি তিব্বতে কয়েক বছর থেকে পড়তে চাইছিলাম। ২৩ ফেব্রুয়ারি আনন্দজীর তার এলো যে, দু-হাজাব টাকা লংকা থেকে পাঠিযে দেওযা হযেছে। নরেন্দ্রদেবজীর চিঠি তার চারদিন আগেই (১৯ ফেব্রুয়াবি) পেয়ে গিয়েছিলাম, তাতে পঞ্চাশ টাকা মাসিক আর বই-এর জন্য সাহায্যস্বরূপ দেড় হাজার টাকার কথা লেখা ছিল। কিন্তু তাতে তখনি আমার মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল আর সেটা পাওয়া যেত বৈশাখ থেকে। খুব অনুতাপের সঙ্গে আমাকে লংকার প্রস্তাবই স্বীকার করে নিতে হলো। নায়ক স্থবির এ ব্যাপারের মধ্যে ছিলেন আর তাঁকে আমি নিরাশ করতে পারতাম না।

এভাবে তিব্বতে অন্ততপক্ষে তিন বছব পর্যন্ত থাকার ইচ্ছা আমাব পূরণ হলো না। মোঙ্গল ভিক্ষুদের প্রতি আমি লাসাতে খুব বেশিই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কারণ ওদের

আমি খুব পরিশ্রমী আর মেধাবী দেখেছিলাম। আমার পথের সঙ্গী সুমতিপ্রাজ্ঞ তো এ ব্যাপারে একেবারে উলটো ধারণা তৈরি করেছিলেন। হতে পারে, গত বারো বছর থেকে আমার বেড়ে ওঠা সোভিয়েত প্রেমই এর কারণ। যদিও এখনো পর্যন্ত আমি মার্কস, এঙ্গেলস আর লেনিনের গ্রন্থের অনুবাদ পড়ার সুযোগ পাই নি, আর অন্য কোনো সাম্যবাদীর কোনো মৌলিক গ্রন্থও পড়িনি। তা সত্ত্বেও ছ-বছর আগে আমি 'বাইশবী সদী' লিখে ফেলেছিলাম। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, পৃথিবীর ভালোর জন্য সাম্যবাদ ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই। এখন আমি ধর্মের প্রতি লম্বা-লম্বা আস্থা রাখতাম না। কিন্তু এখনই ধর্মবিরোধী হয়ে যাই নি। বিশেষ করে, বুদ্ধের ধর্মের প্রতি আমার খুবই শ্রদ্ধা ছিল, বস্তুত তাঁর প্রভাবেই আমি নিরীশ্বরবাদী হয়ে উঠেছিলাম। সে-রা, ডে-পুঙ্-এর মঙ্গোল ছাত্ররা বেশির ভাগ ছিল সাম্যবাদী এলাকার। তারা বিপ্লবের আগে নিজেদের দেশ ছেড়েছিল। পরে তারা যে-খবর পেত তা থেকে বোঝা যেত যে, গুম্বা (মঠ) ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, ভিক্ষুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমার বেশি পরিচয় ছিল থব্-দঙ্-শেরব আর গেশে তন-দর-এর মতো মেধাবী বিদ্বানদের সঙ্গে। তাঁরা সোভিয়েতের বিরোধী ছিলেন না, বরঞ্চ নিজের মাতৃভূমির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ব্যবস্থার জন্য একটু গর্ব করতেন। গেশে তন্-দর পাঁচ বছর পর তিব্বতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় সারা তিব্বতে প্রথম হয়েছিলেন! লহা-রম্-পা (ডক্টর বা আচার্য) পদবী সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর মাত্র ষোলজন পেতেন, আর সেটা এমনই বিদ্বানদের দেওয়া হতো যাঁরা বিতর্ক আর কড়া মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করতেন। গেশে তন্-দর্ এখনো ল্হা-রম্-পা হননি, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি হয়ে চলেছিল। তিনি ছিলেন সে-রা-এর বিদ্যার্থী। ১২ অক্টোবর আমি তাঁর সঙ্গে সে-রা গিয়েছিলাম। (দুঃখের বিষয়, ১৯৪৭-এ এই মহান পণ্ডিতকে খন্পোর গুণ্ডা ঢাবারা শান্তির উপদেশ দেবার জন্য মেরে ফেলে।)

সে-রাও ধরে নেওয়া যায় একটা ছোট শহর। পাঁচ-ছ হাজার ভিক্ষু যেখানে থাকে, সেটা শহর ছাড়া আর কি হতে পারে? সে-রাতে চারটি ড-সঙ্ (কলেজ) আছে। আর প্রত্যেক ড-সঙ্-এর অধ্যক্ষকে খন্-পো (পণ্ডিত) বলা হয়। কিন্তু চারটার মধ্যে—গ্যে, ম্যে, ঙ গ্-পা এই তিনটে ড-সঙ্তে পড়া এবং পড়ানোর কাজ হতো। ঙ গ্-পা ড-সঙ্ সব থেকে ছোট আর সেখানে কোনো খম্-জন্ (ছাত্রাবাস) নেই। গ্যে-তে কুড়িটি খম্-জন্ আছে আর ম্যে-তে চোদ্দটি। প্রতিটি দেশের খম্-জন্ ভিন্ন-ভিন্ন—এটা আমি ডে-পুঙ্-এর প্রসঙ্গে বলে এসেছি। গুম্বাতে অনেক বড় বড় দেবালয় আছে আর পাঁচ শতাব্দী ধরে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলার কারণে এখানকার বহু দেবালয়ে প্রচুর সোনাদানা ভরা আছে। বিশ-ত্রিশ সের ওজনের সোনার প্রদীপে ঘিয়ের শিখা জ্বলে।

আমি ম্যে-র খন্-পোর কাছে গেলাম। তাঁকে আমার একদম কাঠখোট্টা, অশিক্ষিত লোক মনে হলো। খন্পো-র নিয়োগ যেহেতু দলাই লামা আর তাঁর খোসামুদে দরবারীদের হাতে থাকে, যাঁরা নিজেরাই পণ্ডিত নন, সেক্ষেত্রে আর ভাল লোকের নিয়োগ হবে কি করে? ১৯৩৩-এ দলাই লামা মারা যাওয়ার পর, পরবর্তী দলাই লামার নাবালকত্বের সময় জুড়ে রে-ডিঙ্ লামা রিজেন্ট (স্থলাভিষিক্ত রাজা) হয়েছিলেন। সে-সময় রে-ডিঙ্ লামা

আঠারো বছরের তরুণ ছিলেন এবং সে-রাতে পড়তেন। গেশে তন্-দর্ আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁকে আমার খুবই সৌম্য তরুণ মনে হলো। খুব বড় একটি মঠের অবতারী লামা হওয়ার দরুন তাঁর পড়াশুনো তত ভালো ছিল না, এটাই স্বাভাবিক।

নভেম্বর-ডিসেম্বর আসতে আসতেই শীত খুব বেড়ে গিয়েছিল। তাপমাত্রা প্রায়ই শূন্য ডিগ্রির নিচে থাকতো। ঘড়া বা ঘটির জল রাত্রে জমে যেত। সন্ধে হওয়ার আগেই গামলাার ফুল ঘরের ভিতর তুলে রাখতে হতো, যাতে সেগুলো শুকিয়ে না যায়। দলাই লামা, টশী লামার মতো বড় বড় লামা, গন্-দন্, সে-রা, ডে-পুঙ্-এর আর টশী-ল্হুন্-পো-এর মতো বড় বড় বিহার যে গেলুক্-পা সম্প্রদায়ের অনুগামী, তাঁর প্রতিষ্ঠাতা চোঙঙ্-খ-পা-এর মৃত্যু হয়েছিল, ভোটিয়া দশম মাসের দশমী তিথিতে (পৌষবদী দশমী), যেটা এবার পড়েছিল ২৫ নভেম্বর। ঐ রাতে লাসা আর সে-রা, ডে-পুঙ্ ইত্যাদি বিহারে খুব ধমুধামের সঙ্গে দীপাবলী পালন করা হয়েছিল। লাসা একটা খুব চওড়া উপত্যকায় অবস্থিত, যেখানে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে-দূবে পাহাড় রয়েছে। এই পাহাড়গুলোতে যেখানে-সেখানে কয়েকশো ছোট-ছোট বিহার আছে। সেই রাতে সব জায়গাতেই প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। কৃষ্ণপক্ষের দশমীর অন্ধকার রাতে এই দীপমালিকা দেখতে খুবই সুন্দর লাগতো। এই আলোর উৎসব দেখার জন্য লাসার রাস্তায় ভিড় লেগে ছিল। মন্ত্রীরাও তাদের পরিচাবকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তবে সাড়ে সাতটার পরেই মেয়েদের বাস্তায় ঘোরা বিপজ্জনক ছিল।

১৯ জানুয়ারি খবর ছড়ালো, সপ্তম দলাই লামার সমাধিতে চুরি হয়ে গেছে আর চুরি করেছে যে পূজারী-অফিসাব সে ধরা পড়েছে। দলাই লামাদের শব পোড়ানো হয় না। তাদের দু-তিন মাস নুনের গাদায় ঢুকিয়ে রাখা হয়। নুন শরীরের সমস্ত রস শুষে নেয় এবং পচন থেকেও রক্ষা করে। তাঁরপর মশলার প্রলেপ দিয়ে চোখ ইত্যাদি লাগিয়ে লাশকে পদ্মাসনে বসা মূর্তি বানিয়ে দেয়—পদ্মাসন তো প্রাণ চলে যেতেই বানিয়ে দেয়। লোকে এই নুনকে প্রসাদ মনে করে ব্যবহার করে। চার বছর পবে আবার আমি যখন লাসা এসেছিলাম তখন সদ্য মারা যাওয়া ত্রয়োদশ দলাই লামার এই লবণ-প্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছিল। মূঢ়-বিশ্বাস সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করবেন না। আমাদের সভ্য বলে কথিত ভারতীয়রাও তো ধর্মের নামে গুরুদের থুতু আর স্নান করা জল গ্রহণ করে নিজেকে পুণ্যবান মনে কবে। বিবেকানন্দর প্রশংসকরা এতদূর পর্যন্ত লিখে দিয়েছে, যে তিনি একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসের কফ (থুতু, সিকনি)-ভর্তি পাত্র (পিকদানী) তুলে গুরুশ্রদ্ধায় পান করে নিয়েছিলেন! তাহলে তিব্বতেব কিছু সবল-সাধাসিধে ভক্ত যদি তাদের অবতারী লামার মূত্র-পুরীষকে চরণামৃত বানিয়ে নেয়, তাতে খুব আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

দলাই লামার মৃত শব একটি বড় স্তূপে রাখা হয়, আর সেই সঙ্গে লামার নানারকম প্রিয় বস্তু—হীবা, মোতি, রত্ন বসানো পেয়ালা, হাতে লেখা বই আরও না-জানি কি কি সব দিয়ে দেওয়া হয়। স্তূপের বাইরেটাও অনেক মূল্যবান জিনিস দিয়ে সাজানো হয়। পঞ্চম দলাই লামাই ছিলেন প্রথম শাসক, তাকে নিয়ে পরের সব দলাই লামার সমাধিতেই বড় স্তূপ বানানো হয়েছে। তাঁর পুজো আব পাহারার জন্য একজন ভিক্ষু-অফিসার আর তাঁর

বেশ কিছু সহায়ক থাকে। উক্ত অফিসার বেশ কয়েক মাস ধরে সপ্তম দলাই লামার সমাধির মোতি, ফিরোজা ইত্যাদি বিক্রি করতে শুরু করেছিল। যখন বদলি হওয়ার সময় কাছে এলো তখন সে ওখান থেকে পালিয়ে গেল। একবছর বা তাঁরও বেশি সময় কন্-ছী লম্-মর (এক সুন্দরী)-এর সঙ্গে সে খুব ফুর্তি করে থাকতো। কেউ সন্দেহ করেনি যে, তার কাছে এত টাকা আসে কোত্থেকে। সে বেশির ভাগ জিনিস নেপালী সওদাগরদের হাতে বেচে ছিল আর তারা বেশির ভাগ হীরা-জহরত ততদিনে তিব্বত থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। যাক্ গে, চুরি তো করল কিন্তু তার বুদ্ধি তেমন ছিল না। দক্ষিণে (ভারত) পালানোর বদলে সে পালালো উত্তর দিকে। কোনো পাহাড়ে দু-তিন দিন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকলো। তাঁরপর খিদে পেলে বস্তিতে খাবার নিতে এলো আর ধরে ফেলা হলো। সে এবং তার কন্-ছী লম্-মর, দুজনেই ধরা পড়ে পোতলার জেলে গেল। আর তখন তাদেরকে খুব মারধোর করা হলো। লোকটি সবার নাম বলে দেয়। যারা-যারা মাল কিনেছিল—সব ধরা পড়তে লাগল। নেপালী প্রজার দায়িত্ব নিল নেপালী রাজদূত। আমার সামনে থাকতেন মোতীরতন—তিনি-ও একটা গোটা দিন-রাত দুজনকে নিজেব ঘরে লুকিয়ে, একটা বড় বাক্সে বন্ধ করে রেখেছিলেন। সব ধরা পড়ল।

২৪ জানুয়ারির খবরেব কাগজ থেকে জানা গেল যে, শ্রীমজহরুল্ হক-এর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নামের সঙ্গে 'মৌলানা' যুক্ত করতে আমার সংকোচ হয়, কারণ তিনি যত মহান ছিলেন তাঁর পক্ষে এই উপনাম একেবারেই তুচ্ছ। অত সাদাসিধে, সাচ্চা, নির্ভীক, নিরপেক্ষ আর ত্যাগী মানুষ পৃথিবীতে খুব দুর্লভ। আমি তাঁকে কাছ থেকে দেখেছিলাম। একবার তিনি আমাকে তাঁর 'আশিয়ানা'[১]-তে থাকবার জন্য খুব কবে বলেছিলেন। কিন্তু উড্ডীন পাখির কাছে নীড়ও হচ্ছে খাঁচা। হক সাহেবেব প্রতি আমার অটুট শ্রদ্ধা ছিল। কখনো বেশ কিছুদিন তাঁর সঙ্গে থাকাব ইচ্ছা আমার কোনোদিনই পূরণ হয়নি। তাঁব মৃত্যুর খবর শুনে আমাব খুবই আফশোশ হলো। সেদিন আমাব ডায়েরিতে আমি লিখলাম যে, ছাপরায় তাঁর স্মৃতিতে একটি হক কলেজ খোলা হোক। ১৯৩০-এ ছাপরায় কলেজের ভাবনা অনেক দূরে ছিল। পরে কলেজ তো খুলল তবে হক কলেজ নয়, রাজেন্দ্র কলেজ। রাজেন্দ্রবাবুও বিহারের এক অদ্বিতীয় রত্ন, তাই তাঁর নামে কলেজ খুলে লোকে ভালোই করেছে, তবে আমি আশংকা করছি যে, মানুষ ধীরে-ধীরে এই অদ্বিতীয় দেশভক্তকে ভুলে না যায়। ছাপরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে নিজের হাতে নিয়ে হক সাহেব ওখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার চেহারা পাল্টে দিয়েছিলেন। ছাপরাবাসীদেব সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, গ্রামে শিক্ষা প্রসারের জন্য সবার আগে সবচেয়ে বড় কাজ করেছিলেন হক সাহেব।

শো-গঙ্ জেনারেল-এর পরিবার তিব্বতে সব থেকে ধনী পরিবারগুলোর একটিই শুধু নয়, উপরন্তু খুব সম্মানীয়ও। তিব্বতে ধনীদের আটটি শ্রেণী আছে, যার মধ্যে প্রথমের চারটি শ্রেণী তাদেব চুল অলংকার দিয়ে মাথার চাঁদিতে বেঁধে রাখে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্তরাও তাদের চুল ওপরে বাঁধে তবে তাতে অলংকার থাকে না। সপ্তম এবং অষ্টম

---

[১] 'আশিয়ানা' শব্দেব অর্থ 'নীড়'।—স. ম.

শ্রেণীর ধনীরা বিনুনি বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে রাখে, সেই সঙ্গে অলংকারও লাগায়। প্রথম তিন শ্রেণীর ধনীদের স্ত্রীদেরকে ল্হাচম্-কুশো বলা হয়। আর বাকিদের বলা হয় চামকুশো। শো-গঙ্ জেনারেল প্রথম শ্রেণীর ধনী। তিব্বতে স্ত্রীলোকদের অধিকার কতখানি তার ভালো উদাহরণ শো-গঙ্ জেনারেল-এর জীবনী। জেনারেল বলতে এটা ভাববেন না যে পুরনো সৈন্যবিজ্ঞানেরও তিনি খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। বড় ঘরের হওয়ায় তিনি জেনারেল হয়ে গিয়েছিলেন। জেনারেল সাহেব দার্জিলিং (দোর্জেলিঙ্) থেকে যাওয়া একটি তরুণীকে তাঁর হৃদয় দিয়ে ফেলেছিলেন। আমি তাঁর প্রেয়সীকে দেখিনি, তবে ল্হাচম্‌কে অনেকবাব দেখেছি। আমার মনে হতো না সেই তরুণী ল্হাচম্-এর থেকে বেশি সুন্দরী হবে। ঘরে তাঁর কোনো ভাইও ছিল না, যার জন্য নিজের আলাদা স্ত্রী রাখার লোভ হবে। ল্হাচম্ যখন এরকম রং-ঢং দেখলো তখন স্বামীকে মহল থেকে বের করে দিল। বেচারা জেনারেল ভাড়া করা একটা ছোট ঘরে থাকতেন। ল্হাচম্ ছাতু-মাখন যা পাঠিয়ে দিত, তাতেই তিনি চালিয়ে নিতেন। যদি কখনো জামাকাপড় বানানোর দরকার হতো, তাহলে আগেই খোঁজ নিতেন যে, ল্হাচম্ মহলের জানলায় বসে আছে কিনা। আর তারপর নিজের ছেঁড়া পুরনো জামা পরে খুব ধীরে-ধীরে সামনের রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যেতেন। ল্হাচম্ সত্যি সত্যিই খুব দয়ালু স্ত্রী ছিল এবং সে তাঁর কাছে কাপড়-চোপড় পাঠিয়ে দিত। শো-গঙ্ দেপোন (দেপোন-সেনাপতি)-এর এই ঘটনা সর্বসাধারণের কাছে এতই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল যে, কোনো অজ্ঞাত কবি গান বেঁধে ফেলেছিলেন আর অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেরা সেই গান অলিতে-গলিতে গেয়ে বেড়াতো। অনেক দিন পর্যন্ত সেই গান লোকের প্রিয় গান হয়ে ছিল। শো-গঙ্-এর চাকর আমাকেও দু-একবার এসে বলেছিল, 'জেনারেল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' আমি ভেবেছিলাম, কোনো জ্যোতিষ-টোতিষের কথা শুধোবে, তাই যাই নি।

৬ ফেব্রুয়ারি লাসায় প্রথম হিমবৃষ্টি হলো, তবে সেটা বেশ হাল্কা মতন। পরে একদিন ষোল আঙুল মোটা বরফ পড়ল কিন্তু দুপুর নাগাদ গলে গেল। লাসা শহরের ঠিক মাঝখানে হচ্ছে তিব্বতের সবচেয়ে পুরনো বুদ্ধমন্দির জোখঙ। এটা সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে তৈরি হয়েছিল। আমি অনেকবার তা দর্শন করতে গিয়েছিলাম। সেটা শুধু একটা পবিত্র স্থানই নয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মূর্তিকলার এক সুন্দর সংগ্রহালয়ও। জোখঙ-এর দরজার বাইরে একটি শুকিয়ে যাওয়া পুরনো গাছ আছে। বলা হয়, ওটা সেই সময়ের গাছ যখন মন্দির তৈরি হয়েছিল।

পয়লা মার্চ (মাঘ সুদী-পরবা) ছিল তিব্বতী নববর্ষের প্রথম দিন। নববর্ষের প্রথম দিন থেকে একমাস লাসার শাসনভার দলাই লামা ছেড়ে দেন এবং সে-জায়গায় ডে-পুঙ্ বিহারের নির্বাচিত ভিক্ষুরা শাসন চালায়। আমি বলেছি যে, প্রথম মোহান্তরাজ পঞ্চম দলাই লামা ডে-পুঙ্-এর একজন মোহান্ত (খন্-পো) ছিলেন। সম্ভবত সেই স্মৃতিতেই এই রাজত্ব ডে-পুঙ্ বিহারের পক্ষ থেকে হয়ে আসছে। পঞ্চম দলাই লামা ছিলেন বৌদ্ধভিক্ষু এবং বড় পণ্ডিত। হতে পারে তিনি ব্যক্তির জায়গায় ভিক্ষু সংঘের পক্ষ থেকে একমাস রাজত্ব চালানোর প্রথা চালু করে সংঘের রাজত্বের ভালোত্ব দেখাতে চেয়েছিলেন। এরকম

—১৯৩০—

যদি ভেবেছিলেন, তাহলে ফল হয়েছে একেবারে উল্টো। রাজত্ব করার জন্য ভিক্ষুরা নিজের-নিজের ভোটের জন্য প্রচুর ঘুষ দেয়। জরিমানা আর অন্য প্রকারে একমাসে অনেক আমদানীও করে। তার ওপর এই শাসকদের বাছার জন্য কয়েকজন গোনাগুণতি খোসামুদে দরবারীর হাত থাকে। এটা অবশ্যই ঠিক যে, একমাসের জন্য লাসার ছড়িয়ে পড়া শরীর খুব রোগা হয়ে যায়।

২ মার্চ নতুন শাসক ঘোড়ায় চড়ে ডে-পুঙ্ থেকে লাসায় পৌছোন। দুটোব সময় চৌরাস্তায় তাঁর রাজত্বের ঘোষণা করা হলো। জোখঙ-ই হচ্ছে তাঁর কাছারী এবং বেতমারা ইত্যাদির জায়গা। জানা যায় যে, শাসক বাছাই করার সময় তাঁর শারীরিক গঠন এবং উচ্চতার দিকেও খেয়াল রাখা হয়। শাসক আর অনুশাসক দুজনই বেশ লম্বা-চওড়া ছিলেন। উপরন্তু জ্যাকেটের ভেতরে, কাঁধের ওপর মোটা কাপড়ের থাক রেখে তাঁদের আরও বিশালকায় মল্ল বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সামনে-পিছনে খুব মোটা তাগড়া ভিক্ষুরা আরদালীর ডিউটি দিচ্ছিল। আরদালীদের হাতে ছোট ডাণ্ডা বা তলোয়ার ছিল না, ছিল পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের একটা চার হাত লম্বা এবং আরেকটা তার থেকে একটু কম মোটা ও দু-হাত লম্বা ডাণ্ডা বা গাছের ডাল। এ সব জিনিস দর্শকদের মনে ভয় সঞ্চার করার জন্য ছিল। শাসক, অনুশাসকরা রাস্তায় চললে তাঁদের অনুচরেরা জোরে চিৎকার করে বলছিল, 'ফা-ক্যু-ক্যে! পী ক্যে মা শমো!' (হটো রে, টুপি খোলো রে)। তাদের বলার দরকার ছিল না। লোক আগে থেকেই রাস্তা ছেড়ে পালাচ্ছিল। কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে অনেক আগে থেকে টুপি খুলে রাখছিল। এমনিতে লাসার রাস্তা পরিষ্কার করার ব্যাপারে কেউই পরোয়া করতো না। মিউনিসিপ্যালিটিরও কোনো ব্যবস্থা নেই। এই মাসভর রাজত্বের কথা আর বলার নয়, লোকে দিনে দুবার করে নিজের সামনের রাস্তা ঝাঁট দিত। শুধু তাই নয়, সাদা মাটি দিয়ে উঠোনে আলপনা দিত। একমাস ধরে ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা যেত না। ডে-পুঙ্, সে-রা, গন্দন্ এবং অন্যান্য মঠ থেকে বিশ-পঁচিশ হাজার ভিক্ষু লাসা শহরে এসে জমা হয়ে যেত। তাদের জন্য জলও তো পর্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু প্রতিটি কুয়ো থেকে এক চতুর্থাংশ জল বের করে জোখঙ-এর রন্ধনশালায় পাঠাতে হতো। জল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে পারে সেজন্য শহর থেকে পশ্চিমদিকে, বয়ে যাওয়া খালের জল লাসার সমস্ত গর্তে ভরে দেওয়া হতো। এসব গর্ত ১১ মাস পর্যন্ত পায়খানা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। আশপাশের নোংরা-আবর্জনা ফেলা হতো এখানেই। মরা কুকুর বেড়ালের এগুলোই হলো শ্মশান। জল ভরে দেওয়াতে কেমন ঘ্যাঁট তৈরি হতো সে তো আপনারা নিজেরাই অনুমান করতে পারছেন। বাঁচোয়া একটাই যে, লাসা ১১-১২ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত, ঠাণ্ডা জায়গা, তার ওপর এটা পৌষ-মাঘ মাস—তা নইলে প্রতি বছরই কলেরা শুরু হয়ে যেত। লোকেও ঠাণ্ডা জল খাওয়ার পরিবর্তে সেটাকে গরম চা হিসেবে পান করে। নেপালী ছাড়া অন্য দোকানদারদের 'নতুন সরকার'কে পয়সা দিয়ে লাইসেন্স-এর কাগজ নিতে হয়। মারপিট অথবা অন্য কোনো মোকদ্দমা কাছারীতে এলে বিচারপতি জেল অথবা বেতমারার সাজা দেন কম, চান বড় বড় জরিমানা করতে—লাভও তো তাতেই। মাসভর জোখঙ-এ খুব পুজো হয়। ভিক্ষুরা তিনবার করে দর্শন করতে যায়। মুখে

কাপড় বাঁধা বহু পরিবেশনকারী হাতলওয়ালা বাসনে চা নিয়ে তৈরি থাকে।

৬ মার্চ শোভাযাত্রার সঙ্গে দলাই লামার শহরে অবতীর্ণ হওয়ার কথা ছিল। জানা গেল, দুজন মোঙ্গল ভক্ত এজন্য লামাকে ভালোরকম উপহার দিয়েছে। আমি একবার পোতলায় দলাই লামাকে দেখেছিলাম, লীলা দেখতে গিয়ে। সেদিন দেখলাম তাঁর শোভাযাত্রা। সকাল সাতটার আগে থেকে লোক দেখার জন্য নিজের-নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এরপর আর কেউ রাস্তাও পারাপার করতে পারতো না। প্রথমে মন্ত্রীদের পরিচারকবৃন্দ যাচ্ছিল—লাল ঝালর দেওয়া চাটুর মতো গোল টুপি পরে। তারপরে ছিলেন গৃহস্থ-রাজমন্ত্রী, তারপর ভিক্ষু-অফিসার, তারপর গৃহস্থ-অফিসার, তারপর নাগরিকের পোশাকে প্রধান সেনাপতি, তারপর ছারোঙ ভূত-পূর্ব মন্ত্রী সৈনিকের বেশে। তারপর দুজন জেনারেল, তারপর সেনাপতির পোশাকে লেদন-লা। এরপর যাচ্ছিল চারদিকে রেশমী পর্দায় ঢাকা দলাই লামার পালকি, পেছনের অনুচরদের মধ্যে অনেকেই ছিল মোঙ্গল পোশাকে। কিছু চীনা আর কিছু নেপালী পোশাকেও ছিল।

এক সপ্তাহ রাজত্ব হয়ে গেল, লাসার জনসংখ্যাও দ্বিগুণের বেশি হয়ে গেছে আর এদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে একটু-আধটুও অসুখ-বিসুখ হবে না তা কি করে হয়? রাস্তার ওপরে তো নোংরা থাকতো না কিন্তু বাড়ির পেছনের দিকের অপরিচ্ছন্নতা কিভাবে আটকানো যাবে—যখন কি না নোংরা করছে ওই ভিক্ষুরাই, যারা এক মাসের জন্য রাজা বনে গেছে। স্বাস্থ্য-সাফাই বিভাগের জায়গাটা ওখানে লামা-পূজারীরা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিল। আর রাস্তার ওপর জায়গায়-জায়গায় মন্ত্র-জপ করতে দেখা যাচ্ছিল। ৯ মার্চ রাত্রে ৩ আঙুল বরফ পড়ল। ১০-এর সকালে তো ছাদ, উঠোন, রাস্তা, ভূমি আর পাশের পাহাড়ে—সমস্ত যেন সাদা কার্পাসে ঢাকা আছে মনে হচ্ছিল। লোকে সকাল থেকেই ববফ ঝেড়ে গলিতে ফেলতে লাগল। ছাদের বরফও নিচে ফেলতে থাকলো, নইলে রোদে গলে যাওয়ার পর মাটির ছাদ ফুঁড়ে সেটা নিচে চুঁইয়ে পড়বে। দুপুর নাগাদ সব বরফ গলে গেল।

অমাবস্যায় খুব বড় করে উৎসব পালন করা হয়। আজ পরিভ্রমণ-পথের (লাসার মূল রাস্তা বস্তুত জোখঙ-এর পরিভ্রমণ-পথ) সব জায়গাতে খুঁটি পোঁতা এবং সাজানো চলছিল। আর পর্দা আড়াল করে লোকেরা রকম-রকমের মূর্তি বানানোর কাছে লেগে ছিল। রাজমন্ত্রী আর সামন্ত তথা ভিন্ন-ভিন্ন বিহারের মধ্যে বাজি-ধরা চলছিল। সন্ধের সময় পর্দা খুলে দেওয়া হলো। রঙ-বেরঙের পাতা দিয়ে সাজানো কয়েকশো রকমের সুন্দর-সুন্দর মূর্তি সেখানে সাজানো ছিল এবং ঘিয়ের প্রদীপে চারপাশ ঝলমল-ঝলমল করছিল। প্রথমে সেপাইরা রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল। তারপর দর্শকদের ভিড় ফেটে পড়লো। বিশিষ্ট লোকেরা নিজের-নিজের প্রদর্শনীর কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। সে-বছর রামোছে বিহারের ভিক্ষুদের স্তূপ এবং মূর্তিগুলোর সাজানো সব থেকে সুন্দর বলে গণ্য হলো। লোকে খড়ের মশাল নিয়ে যাচ্ছিল। ভিড় জমে গেলে মোটা ডাণ্ডাওলারা মেরে সরিয়ে দিচ্ছিল লোকেদের। দু-একজন স্ত্রীলোক ছিল তাদের নিরাপত্তা ছিল না, ঢাবা তাদের ধরে গলির দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। রাত বারোটা পর্যন্ত খুব ভিড় ছিল। নাচ-গান

তো সারা রাত এবং পরের দিন পর্যন্ত ছিল। পরের দিন ১৫ মার্চ ছিল চৈতবদী পড়বা। আজ থেকেই আসলে নতুন বছর শুরু হলো। লোকে একে অন্যের সঙ্গে দেখা হলে মঙ্গল গাথা পড়ছিল। প্রথম মাসের ২৪-তম তিথি পর্যন্ত ভিক্ষুরাজ্য থাকে। একমাস পর ফের ১২ দিনের জন্য ওরা রাজত্ব করতে পায়। ২৩ তারিখে বেশ বড় শোভাযাত্রা বেরোল। পুরনো যুগেব পোশাকে সৈনিক, বর্মধারী সওয়ার, ধনুক এবং খড়্গ নিয়ে পদাতিক হাজারে হাজারে চলছিল। কত-কত লোক মাথায় পালক সাজিয়ে পুরনো বন্দুক নিয়ে যাচ্ছিল। কথিত আছে, আজকের দিনই মোঙ্গল সর্দার তিব্বত জয় করে তা দলাই লামাকে উপঢৌকন দিয়েছিল। ২৪ তারিখ খুব সকালে ছিল মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের রথযাত্রা। সামনে যাচ্ছিল সঙ্খ-ঝাঁঝা করতাল নিয়ে হলুদ টুপি এবং উত্তরাসঙ্গ ধারণ করা ভিক্ষুরা। তারপর চামড়ার বাদ্য বাজিয়ে কঞ্চুকধারী পুরুষেরা। তাদের পিছনে ছিল রথারূঢ় মৈত্রেয়র প্রতিমা, যার পিছনে দুটো হাতি চলছিল। তিব্বতেব মতো ঠাণ্ডা জায়গায় হাতির টিকে থাকা খুব মুশকিল। তার চেয়েও মুশকিল ভারত থেকে তাদের আনা। তবে এই হাতিগুলোকে বাচ্চা অবস্থাতেই পাহাড় পের করে নিয়ে যাওয়া হয়। শীতের সময় চেষ্টা করা হয় তাদের ঘর গরম রাখার। আজই ভিক্ষুদের শাসন শেষ হলো এবং দলাই লামা আবার নিজের হাতে রাজত্ব নিলেন। ২৫ মার্চ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হিমবর্ষণ হতে থাকলো এবং মাটির ওপর ১৬ আঙুল বরফ জমে গেল। বরফের জন্য ঠাণ্ডাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সেদিন ঘোড়দৌড় এবং তীর নিক্ষেপের খেলা হলো। ২৮ মার্চ মনে হচ্ছিল শীত[১] শেষ হয়ে গেছে। এখন পোস্তিন পরে চলাফেরা করা দুষ্কর ছিল।

সম্-য়ে-এর দিকে যাত্রা—আনন্দজীর তার পেয়েই এটা আমি স্থির করে নিয়েছিলাম যে, এখন আমাকে লংকা ফিরে যেতেই হবে। সেজন্য সব রকমের বই কিনতে লাগলাম। কয়েকটা ভালো ভালো ছবিও কিনলাম। ৩০ মার্চ জানা গেল, সৈন্য সরানো হয়েছে, এখন রাস্তা খুলে গেছে। আমি মোঙ্গল ভিক্ষু ধর্মকীর্তিকে (ছোইডক) বললাম। তিনি আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিব্বতের সবচেয়ে পুরনো বুদ্ধমন্দির তো আমি দেখে নিয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে পুরনো মঠ (সম্-য়ে)-এর দর্শন করাটাও খুব জরুরি ছিল। ৫ এপ্রিলের দুপুরে আমরা লাসামুখী নদী দিয়ে চামড়ার নৌকায় করে রওনা হলাম। ৪টা থেকে হাওয়া খুব তীব্র হয়ে উঠল। রাতে নদীর পাশের মন্‌ডো গ্রামে থাকলাম। আমাদের নৌকায় একজন ৫০ বছরের বুড়ি এবং তাঁর ২৪, ২৫ বছরের স্বামীও যাচ্ছিল। আমি এখানে জিজ্ঞেস করায় ভুল করে ফেলেছিলাম। কিন্তু ধর্মকীর্তি শুধরে দিলেন। তরুণটি ছিল ওঝা। তার ওপর দেবতা ভর করতো।

দেখা যাচ্ছিল—ঋতু সম্পূর্ণ বদলে গেছে। গাছে মুকুলের মতো পাতা বেরিয়েছে। আরও একটা রাত আমাদের রাস্তায় থাকতে হলো। ৭ তারিখ সকালে আমরা ব্রহ্মপুত্রতে পৌঁছে গেলাম। এখন আমরা ল্হোখা-প্রদেশে ছিলাম। চাঙ-প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা ধনুককে

---

[১] হিন্দিতে ভুলবশত 'গর্মী' ছাপা হয়েছে।—স. ম.

—১৯৩০—

অলংকার বানিয়ে মাথায় পরে। উই (মধ্য)-প্রদেশের অর্থাৎ লাসার মহিলারা একটা বড় ত্রিকোণাকার শিরোভূষণ ধারণ করে। ল্হোখাতে অর্ধেকটা উল্টোনো কানঢাকা টুপি তাদের শিরোভূষণ।

দুপুরে আমরা কনেনুম্বা নামে ৬, ৭ পরিবারের ছোটমতো গ্রামে পৌঁছলাম। তিব্বতের নদীতে মাছ প্রচুর হয়। তিব্বতীরা মাছ আর পাখির মাংস খাওয়া খারাপ মনে করে। কিন্তু এই গ্রামে তো মনে হচ্ছিল, মাছের ব্যবসা আছে। দেড়-দু সেরের মাছ শুকোনো হচ্ছিল। আমরাও সেদ্ধ করিয়ে দুটো মাছ আনালাম। কিন্তু সেগুলোতে সব জায়গায় মোটা কাঁটা ছাড়াও চুলের মতো সরু সরু কাঁটা প্রচুর ছিল। খাওয়া কঠিন ছিল আর স্বাদও কিছু ছিল না। আমরা ভেবেছিলাম, একটু সময় বিশ্রাম করে চলে যাবো, কিন্তু বুড়ির স্বামীর ওপর দেবতা ভর করতে শুরু করলো। সে-দিনটা দেবতার ভর থাকল আর ৮ এপ্রিলও দুপুর অব্দি ভূতের খেলা চলল। আমাদের মাঝি আর গ্রামবাসীদের কাছে সে দলাই লামার চেয়ে কম ছিল না। শস্যাদি, গরম কাপড় আর কি-কি সব জিনিস সে উপহার পেল। আমাদের ভাগ্য ভালো যে, আমাদের নৌকো সামনে এগোল। সেদিন সাতটার সময় আমরা ব্রহ্মপুত্রের কিনারে 'সো-নম্-ফুন-সম' নামক শিলার কাছে পৌঁছলাম। সেখানে ছোট-বড় তিনটে চাটান আছে, যার মধ্যে দুটোকে মাতা-পিতা আর একটাকে পুত্র বলা হয়। ৮টার সময় আমরা 'ডক্-ছেন-ফুর-বু' শিলার কাছে রাতের বিশ্রামের জন্য নেমে পড়লাম। এই পাথরটা ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে আর ১০০ হাত উঁচু ত্রিকোণের আকাবে। বলা হয়, যখন সম্-য়ে বিহার তৈরি হয়েছিল তখন চিত্রপট টাঙানোর জন্য এই শিলা ভারত থেকে আনা হয়েছিল। যাবা এনেছিল তারা ভুল করে এখানে রেখেছিল, আর সেই থেকে সেটা এখানেই আছে।

পরের দিন মধ্যাহ্নে আমরা জম্-লিঙ ঘাটে নামলাম। ব্রহ্মপুত্র থেকে ডাইনে কিছুদূর গিয়ে সেখানে একটা বড় স্তূপ আছে, যা নেপালের মহাবৌধার সঙ্গে খুব মেলে। সেখান থেকে ওপারে গিয়ে আমরা নৌকোওলাদের গ্রামে পৌঁছে গেলাম। গ্রামে লোক দেখতে পেলাম না, তাই সামান্য যা-কিছু জিনিসপত্র ছিল তা সঙ্গে নিয়ে, পায়ে হেঁটেই সম্-য়ের দিকে চলতে লাগলাম। এখান থেকে সম্-য়ে চার মাইলের বেশি ছিলনা। কিছুদূর গিয়ে পাথর কেটে বানানো পুরনো স্তূপ পাওয়া গেল। শেষমেশ আমরা সম্-য়ে পৌঁছে গেলাম। অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দার আচার্য শান্ত রক্ষিত সম্-য়ে তৈরি করিয়েছিলেন উড়ন্তপুরী বিহারের অনুরূপ করে। এগারো-বারো শতাব্দী পর্যন্ত তিব্বতের বিহার (মঠ) সমতল ভূমির ওপর বানানো হতো, পরে তো দুর্গম পর্বত-স্কন্ধকেই লোকে বিহারের জন্য সবচেয়ে অনুকূল স্থান মনে করে। সম্-য়ে সমতল ভূমির ওপর তৈরি। চারদিকে সীমানা প্রাচীর যার ভেতর চারকোণে চারটা পাকা ইটের ছত্রধারী চারখানা স্তূপ। মাঝখানে প্রধান দেবালয়। বিহারেরমুখ্য দরজা পূর্বদিকে। আমরা পশ্চিমের দরজা দিয়ে ঢুকেছি। প্রথমেই সিকিমের বিদ্বান ভিক্ষু 'উর্গেন্ কুশো'-র সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর সঙ্গে কুশল-বিনিময় হলো, আবার দেখা করার কথা বলে আমরা আগে থেকে স্থির করা জায়গায় চলে গেলাম।

সে দিন তো আমরা কোথাও যাওয়া-আসা করলাম না। পরের দিন দর্শনের জন্য বেরোলাম। প্রথমে প্রধান মন্দিরে গেলাম। এটা কাঠের তৈরি তিনতলা বাড়ি ছিল। মাঝে কোনো সময় সম্-য়ে আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, তাই এটাই সেই মন্দির হতে পারে না। মন্দিরে প্রধান মূর্তি হচ্ছে বুদ্ধের। বিহারের নির্মাতা আর ভারতের মহান দার্শনিক আচার্য শান্ত রক্ষিত, তাঁর শিষ্য ভোটিয়াভিক্ষু বৈরোচন আর আচার্যের গৃহস্থ-শিষ্য সম্রাট 'ঠি-স্রোঙ'-এরও মূর্তি আছে। আচার্য ৭০-বছরের বেশি বয়সে তিব্বতে গিয়েছিলেন আর তাঁর দেহাবসান হয়েছিল এই সম্-য়েতেই। আচার্যের মূর্তির মুখে একটি দাঁত দেখা যাচ্ছে অবশিষ্ট আছে। আমি সব থেকে প্রভাবিত হলাম তখন, যখন নিজের চোখের কাঁচের ভেতর আচার্য শান্ত রক্ষিতের কপাল দেখলাম। সেই কপাল, যার ভেতর থেকে 'তত্ত্ব' সংগ্রহ'-র মতো মহান দার্শনিক গ্রন্থ বেরিয়েছিল। আমি কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে সেদিকে তকিয়ে থাকলাম। আচার্যের দেহাবসান হওয়ার পর তাঁর শরীর পূর্বদিকের টিলার ওপর একটি স্তূপে রাখা হয়েছিল। কয়েক বছর আগে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে সেই স্তূপ ভেঙে পড়ে এবং আচার্যের হাড়গোড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়। সেগুলোই এনে লোকে এখানে রেখে দিয়েছে।

প্রধান মন্দির ছাড়া বারোটা আরো মন্দির তথা নিবাস আছে। এই মন্দিরগুলোকে লিঙ্-দ্বীপ বলে। গ্য-গর-লিঙ্ (ভারতদ্বীপ) হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে থেকে বহু ভারতীয় পণ্ডিত ভোটিয়া সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে সম্-য়েতে সংস্কৃত পুস্তকের কি বিশাল সংগ্রহ ছিল, সেটা এই থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয় পণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান তা দেখে বলেছিলেন, 'এখানে এমন অনেক বই আছে, যা বিক্রমশিলাতেও পাওয়া যায় না।' আজ ওখানে কোনো সংস্কৃতের বইয়ের কথা কানে এলো না। দীপংকর শ্রীজ্ঞানের দেহাবসানের কিছু দিন বাদে সম্-য়েতে আগুন লাগে। তারপর রা-লো-চ্ বা (দ্বাদশ শতাব্দী) সেটা নতুন করে তৈরি করান। হতে পারে সেই আগুনেই অনেক বই পুড়ে গিয়েছিল। এটাও হতে পারে যে, কিছু বই এখনো স্তূপ আর মূর্তির ভেতরে সুরক্ষিত আছে।

আমরা দুজন উর্‌গেন্ কুশোর কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি ভোটিয়ার পণ্ডিত তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে চান্দ্র ব্যাকরণের সমস্ত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তবে সংস্কৃত-ভাষার জ্ঞান একটুও ছিল না। আমি আরও দু-চার দিন থাকতে চাইছিলাম, কিন্তু তিব্বতী সরকার রুপোর মুদ্রা তুলে দিয়ে স্রেফ তামার মুদ্রা রেখেছিল, যার দাম খুব পড়ে গিয়েছিল। কত তামার মুদ্রা সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাবো?

তার ওপর এখানে অনেক চিত্রপট আর হাতে লেখা ভোটিয়া পুস্তক আমি পাচ্ছিলাম। আমি ২৫টা চিত্রপট আর একটা পুরনো হাতে লেখা ভোটিয়া পুস্তক 'পদ্ম-ক-থঙ্' কিনে নিয়েছিলাম। এখন আর বেশি পয়সা ছিল না। ছু-শিঙ্-শা-এর কাছ থেকে আমি তাঁর এক ভোটিয়া বন্ধুর নামে পয়সার জন্য চিঠি এনেছিলাম কিন্তু তিনি এ-সময় এখানে ছিলেন না। উর্‌গেন্ কুশোর কৃপায় দুটো ঘোড়া ভাড়ায় নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ার পর কিছুদূরে চিঠিওলা ভদ্রলোকের দেখা পেলাম। তার ঘর ছিল সামনে

'হুঙ্গো-চঙ্-গঙ' গ্রামে। গ্রামের কিছুটা আগেই আমরা একটা ছোটমতো বাড়ি দেখলাম। এটা হলো সেই জায়গা যেখানে তিব্বতের অশোক, সম্রাট 'ঠি স্রোঙ্' জন্মেছিলেন।

যদিও আমরা দুটোমাত্র লোক ছিলাম, ঘোড়ায় চড়ে, আর পোশাক-আশাকও ভাল ছিল তাই যে দেখত ভাবতে পারত এরা পয়সাওলা লোক। রাস্তাও ছিল সুনসান আর সামনের ডাঁড়া তো আরও ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক। তবে এখন আমাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেশি ছিল। ধর্মকীর্তিও, ভিক্ষুদের বেশে থাকলেও নিজের পূর্বজ চেঙ্গিস খাঁ-এর এক মোঙ্গল সৈনিকের মত গাট্টাগোট্টা ছিলেন। তার ওপর আমাদের কাছে ছিল গুলিভরা পিস্তল।

১২ তারিখে সূর্যোদয়ের আগেই দুজন ঘোড়সওয়ার গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এদিককার পাহাড়ে ছোট ছোট কিছু জংলী গাছও দেখা যাচ্ছে। লাসার চাইতে সম্-য়ে আর তার আশেপাশের জায়গা বেশি গরম। ব্রহ্মপুত্রের জন্য উপত্যকাও খুব চওড়া। এখানে শুধু বিউলি আর সবেদা নয়, আখরোটের গাছও হয়। তিব্বতী লোকদের আগ্রহ নেই, নইলে এখানে আপেল, আঙুরেরও ভালো বাগান করা যেত। এবার আমরা ডাঁড়ের দিকে যাচ্ছিলাম। ওপরে ঠাণ্ডা ছিল বেশি। এক আধ জায়গায় কিছু বরফ দেখা যাচ্ছিল। চড়াই ততটা কঠিন ছিল না কিন্তু উৎরাই ছিল বেশ কঠিন। উৎরাই-এ আমরা ঘোড়া থেকে নেমে গেলাম। রাস্তায় দেখলাম একটা ঘোড়া মরতে বসেছে আর তার মালকিন বসে কাঁদছে। উৎরাই-এ অনেকটা পথ শুধু বরফের ওপরেই চলতে হলো। রাস্তায় এক জায়গায় আমরা চা খেলাম আর সাতটার সময় লাসামুখী নদীর (উই-ছু) বাঁ তীরে অবস্থিত 'দে-ছেন্-জোঙ্' গ্রামে পৌঁছলাম।

গন্-দন্-এ যাত্রা—গে-লুগ্-পা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা চোঙ-খা-পা যে বিহার স্থাপিত করেছিলেন, যেখানে এখনো তিব্বতের সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত অনন্ত নিদ্রায় লীন হয়ে আছেন. দলাই লামার বৈভব বেড়ে যাওয়ার পরও তাঁর গে-লুগ্-পা সম্প্রদায়ের গদী যেখানে আর ভিক্ষু-সংখ্যায় যেটা তিব্বতের তৃতীয় বিহার—সেই গন্‌দন্ (স্থাপিত ১৪০৫) দর্শন করা আমার কাছে খুব জরুরি ছিল। এখান থেকে সেটা খুব দূরও নয়। চেষ্টা করেও মাত্র একটাই ঘোড়া পাওয়া গেল। ধর্মকীর্তিকে হেঁটে যেতে হলো। ১৩ তারিখে কয়েক ঘণ্টা সফরের পর পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত গন্-দন্‌বিহারে পৌঁছে গেলাম। পাহাড়ের পাদদেশ থেকেই চড়াই ছিল খাড়া, ওপরে জলও নেই। জল সবাইকে নিচে থেকে বয়ে আনতে হয়। এইসব বিহারের প্রতিষ্ঠারা কি জানি কি ঘোরে থাকত, লোকের কষ্টের কথা খেয়ালই রাখত না। অজন্তা, কার্লে, কনেরী—এরকম যে কোনো বৌদ্ধ বিহার দেখুন, দেখবেন বিহারের নির্মাতারা সবার আগে জলের দিকে নজর দিয়েছে। কনেরী-তে কোনো ঝর্ণা বা জলাশয় নেই কিন্তু ঘরের নিচে পাহাড় কেটে বড় বড় চৌবাচ্চা খোঁড়া আছে আর বর্ষার জল জমিয়ে রাখার জন্য নালা বানানো আছে, যাতে সারা বছর জল শেষ না হয়ে যায়। বম্বের কাছে কনেরী গুহাতে আজ ছ-সাত বছর হলো ভিক্ষুরা আর নেই কিন্তু দু-পা অন্তর নির্মল ঠাণ্ডা জলের এই চৌবাচ্চাগুলো থেকে

তৃষ্ণা মিটিয়ে যাত্রীরা আজও নির্মাতাদের বুদ্ধির প্রশংসা করে। চোঙ-খা-পা সমঝদার হয়েও এরকম ভুল কেন করলেন কে জানে। গন্‌-দনে আগে অনেক মোঙ্গল ভিক্ষু থাকত কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা খুব কম।

যে স্তূপে চোঙ-খা-পার (১৩৫৭-১৪১৯) দেহ রয়েছে তার ওপর কোনো মোঙ্গল রাজার দেওয়া তাঁবু খাটানো আছে। যে ঘরে চোঙ-খা-পা থাকতেন সেটাও সুরক্ষিত আছে। ৫০০ বছর আগে তিনি নিজের হাতে যে-সব বই লিখেছিলেন সেগুলোও একটা সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা আছে। সোনা-রুপোর অর্ঘ্য সম্বন্ধে তো কিছু বলারই দরকার নেই। নিচে রয়েছে ১০৮টি থামওলা উপোসথাগার (সংঘশালা)। ওখানেই চোঙ-খা-পার সিংহাসন, তখন পুজো হচ্ছিল। রঙিন আটার চিত্রবিচিত্র মণ্ডল (কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো আল্পনা) বানানো হয়েছিল। একদিকে ছিল যজ্ঞবেদী, কোনো মূর্তিশিল্পী বর্তমান (ত্রয়োদশ) দলাই লামার বড় মূর্তি বানিয়ে রেখেছিল। ভেতরে যেতে হলে জুতো পরে যাওয়া নিষেধ—তিব্বতে সম্ভবত এরকম এই একটাই জায়গা, গন্‌দনে একটি ড-সঙ্‌ (কলেজ) আছে যেখানে তিনজন খন-পো আর তিন হাজার ভিক্ষু থাকে। খন্‌-পোদের কাজ হচ্ছে প্রধানত ব্যবস্থাপনার দেখাশোনা করা, পড়ানোর কাজ করে গ্যের-গ্যেন। আমরা মোঙ্গলদের খম্‌জন্‌-এ উঠলাম। মোঙ্গল-বিজেতা-গুশ্রী খাঁ—যিনি ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে সারা তিব্বত জয় করে দলাই লামাকে প্রদান করেছিলেন—তাঁর বংশধর ছিলেন ওখানকার গ্যে-র গ্যেন।

পরের দিন ঘণ্টাখানেক বেলা বাড়ার পর আমরা প্রস্থান করলাম। আমরা লাসা যাওয়ার ছিলাম চারজন, বাকি দুজনের মধ্যে একজন মোঙ্গল আর অন্যজন ছিল খম্‌-মো (খম্‌-প্রদেশের স্ত্রী)। দে-ছেন্‌-জোঙ্‌ থেকে লাসা আমাদের চামড়ার নৌকায় করে যাওয়ার ছিল। আমরা সোজা মাঝির ঘরে চলে গেলাম। খুব গরিবের ঘর তবু সেখানে পাঁচ-সাতটা মাটির সুন্দর মূর্তি আর তিন-চারটে চিত্রপট টাঙানো ছিল। আমরা ৪ সাঁগ (প্রায় ২ টাকা)-তে নৌকা ঠিক করলাম। ১৫ এপ্রিল একটু বেলা বাড়তেই নৌকা নিচের দিকে চলল। নদীর দুদিকেই সামান্য দূরে-দূরে অনেক গ্রাম ছিল। দুপুরে আমরা লাসা পৌছলাম। শীত এখন পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছিল।

লাসাতে—যে সময় লাসাতে রুপোর মুদ্রা (টংকা) চলত সে সময় ভারতীয় টাকায় তিন টংকা হতো। ভুটান সরকারের রূপোর টংকা গুটিয়ে নিয়ে শুধু তামার মুদ্রা রেখেছিল আর এখন দাম পড়তে পড়তে টাকাতে সাড়ে ১৫ টংকা হয়ে গিয়েছিল। রুপো আসায় মুদ্রার দাম কিভাবে বেড়ে যায় সেটা এই থেকে বোঝা যায় যে, যে-সময় টাকার দর আট টংকা ছিল সে-সময় ভুটানের রাজার মৃত্যুতে পুজোর জন্য একলাখ টাকা লাসা এলো। তার পরই টাকায় ৭ টংকা হয়ে গেল। আমি যে-সময় লাসা পৌছলাম সে-সময় টাকায় ৯ টংকা ছিল। রাস্তা বন্ধ হওয়ায় ১২ টংকা হয়ে থেমে থাকলো। সমঝোতার খবর আসার পরে ১৩$^{১}/_{৩}$ টংকা হয়ে গেল আর আজ সেটা সাড়ে ১৫ টংকা ছিল। ব্যবসায়ী লোকেরা টাকা ভাঙাতে চাইছিল, কিন্তু তা পাচ্ছিল না।

ব্যবসায়ীরা কান্নাকাটি করছিল। আমার নেপালী বন্ধু জিজ্ঞেস করছিল, 'ভোটিয়া মুদ্রা এখন আরও কত নিচে নামবে?' আমি বললাম, 'শোগাঙ-এর তামার দাম অব্দি।' শোগাঙ, আমাদের পয়সার প্রায় সমান-সমান এবং ১$^{১}/_{২}$ শোগাঙ এক টংকার সমান।

এবার আমার ভারতের জন্য রওনা হওয়াব ছিল। পুস্তক, চিত্রপট আর অন্যান্য জিনিসপত্র বেঁধে ১৭-১৮ টা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে কালিম্পং পাঠিয়ে দিলাম। ১৮ এপ্রিল আমি আবার জোখঙ্ দর্শন করতে গেলাম। কয়েকশো বছরের পুরনো হওয়ায় মূর্তির ওপরের প্লাস্টার কিছুটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবু ভালো যে আজকাল লোকে মেরামতের চেষ্টা করছে না। জোয়ং-এর প্রধান বুদ্ধমূর্তির সামনে কয়েক ডজন সোনা-রুপোর প্রদীপ অবিরাম জ্বলতে থাকে। সোনার প্রদীপের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছিল ৪০০ তোলার (পাঁচ সেরের), এক নেপালী উপাসক অর্ঘ্য দিয়েছিল, পরের বছর ভুটানের রাজা ৭০০ তোলা সোনার প্রদীপ অর্ঘ্য দিয়েছিল এটাই সবচেয়ে বড় প্রদীপ। এখানকার এই সোনা-রুপোর প্রদীপ আর মণিমুক্তা দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, মহম্মদ গজনীর আর মুহম্মদ বিন বক্তিয়ার কেন মন্দিরের প্রতি এত আকৃষ্ট হতেন। মহম্মদ আর বক্তিয়ার-এর জন্যই কেন কাঁদব? লাসার ভেতর ১৮, ১৯ বছর আগে তং-গ্যে-লিঙ্-এর একটা খুব বড় বিহার ছিল। ১৯০৭-এর কাছাকাছি সময়ে যখন দলাই লামা আর চীনাদের বিবাদ হয়েছিল এবং দলাই লামাকে পালিয়ে ইংরেজদের আশ্রয়ে দার্জিলিং আসতে হয়েছিল, তখন চীনারা সরাসরি তিব্বত শাসন করতে লাগল। তং-গ্যে-লিঙ্-এর লামার এটাই অপরাধ ছিল যে, চীনারা তাঁকে খুব সম্মান করত। ১৯১১-র পর যখন দলাই লামা আবার শাসন ভার নিজের হাতে নিতে সফল হলেন তখন তং-গ্যে-লিঙ্ মঠকে তিনি কামান দিয়ে উড়িয়ে দিলেন আর লামাকে কুয়োয় ডুবিয়ে মারলেন। লামার সঙ্গে যা করলেন। কিন্তু মঠ তো বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্বের দেবালয়ে ভরা, তার ওপর কামান চালানোটা কি মহম্মদের হামলার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল?

প্রস্থান—লংকার তিন হাজার টাকাব মধ্যে প্রায় দু-হাজার টাকার আমি জিনিসপত্র কিনে নিয়েছিলাম। কন্-জুর পেয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তন্-জুর পাওয়া যায়নি তাই সেটা ছাপানোর জন্য আমার নর-থঙে যাওয়া দরকার ছিল। ধর্মকীর্তিও আমার সঙ্গে লংকা যেতে তৈরি ছিলেন। আমরা ভাড়া করা খচ্চরের ওপর ভবসা করতে পারছিলাম না। কেন না জায়গায়-জায়গায় ওদের বদলাতে হয় আর পেতেও খুব ঝামেলা হয়। এর থেকে বাঁচার জন্য আমরা দুটো খচ্চর কিনে নিলাম যাতে প্রায় আড়াইশো টাকা লাগল। রাস্তার জন্য দুটো পিস্তলও নিয়ে নিলাম। ২৪ এপ্রিল সকাল সাড়ে সাতটার সময় আমরা

---

[১] বুদ্ধ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বচনা ও গ্রন্থাবলীকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে ভাগে বুদ্ধ-বাণীব অনুবাদ সংরক্ষিত, তা *কন-জুর* এবং যে ভাগে আছে তাঁর দর্শন বা শাস্ত্রেব অনুবাদ তা হল *তন্-জুর।* বিস্তারিত বিবরণের জন্য পাঠক দেখতে পারেন লেখকের *যাত্রাকে পন্নে* গ্রন্থের ৫৫ নম্বব পৃষ্ঠা।—স ম

দু-জন লাসা ছাড়লাম।

দুপুরের পর নে-থঙ্ গ্রামে পৌঁছলাম। এর কাছেই সেই ঐতিহাসিক তারামন্দির 'ডোল-মা-ল্হ্-খঙ্', ভারতীয় পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১৭ বছর ধরে তিব্বতে ধর্মপ্রচার করার পর ১০৫২-তে যেখানে দেহ রেখেছিলেন। থাকার জায়গা থেকে মন্দির দু-মাইল দূরে। আমরা দুজন ওখানে গেলাম। লালচন্দনের খসখসে থাম-ই বলে দেয় যে, মন্দিরের বয়স ৯০০ বছরের কম হবে না। এখানে ২১ রকমের তারার মূর্তি আছে। একদিকে একটা বড় মতন পিঞ্জর রয়েছে যার মধ্যে দীপঙ্করের ভিক্ষাপাত্র, খত্তর দণ্ড আর তামার ধর্ম-করক রাখা রয়েছে। ভেতরে সামান্য শস্য আর ভক্তদের ছুঁড়ে দেওয়া রুপোর মুদ্রা পড়ে আছে। সরকারী মোহর লাগানো ছিল তাই আমরা খুলিয়ে দেখতে পারলাম না।

২৫ এপ্রিল (১৯৩০) আমরা আবার সামনের দিকে রওনা হলাম। এখন খেত বোনা হচ্ছে। নিচে ছুশোর্-এ তো অঙ্কুরও বেরিয়ে এসেছিল। রাতে আমরা ছুশোর-এ থাকলাম। গৃহকর্ত্রী আমাদের সুখ-সুবিধের দিকে খুব নজর রেখেছিল। সে ছিল কোনো চীনার স্ত্রীর, স্বামী অনেক দিন হলো বাইরে চলে গেছে ফেরে নি। সে বলল যে, ভারতের কোথাও দেখা হলে তাকে পাঠানোর চেষ্টা করতে।

২৬ তারিখে আমরা নৌকায় ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে গেলাম। গ্যান্চীগামী আরও তিনজন যাত্রী এসে গেল। এখন আমরা পুরো পাঁচজন ছিলাম। আগের বার যতটা রাস্তা আমরা দুদিনে তিনদিনে অতিক্রম করেছিলাম, এখন সেটা এক-একদিনে পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের মাদি খচ্চরগুলোও ছিল মজবুত। সেই দিনই খম্বালা পার হয়ে আমরা রাতে লুঙ্ গ্রামে থামলাম। ২৭ তারিখ খুব সকালে আবার রওনা হলাম। খুব জোর হাওয়া বইছিল। ঠাণ্ডাও ছিল খুব বেশি। রাস্তায় জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মহাসরোবরে তা নয়। মহাসরোবরের কিনারে কিনারে গিয়ে সাড়ে তিনটের সময় নগাচে পৌঁছলাম। পরের দিন জবালা অভিমুখে রওনা হলাম। আগের বার আমাদের খচ্চরওলারা যেখানে ডেরা করেছিল সেখানে এখন অনেক বরফ ছিল। পথে আমাদের বেশ ভাল ভাল ঘরে থাকার জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল। এ-ব্যাপারে স্রেফ আমাদের দুজনের খচ্চর আর পোশাকের প্রতাপ নয় বরং আমাদের তিন সঙ্গীর পরিচয়ও সহায়ক ছিল। লাসা থেকে বেরিয়ে ষষ্ঠ দিনে দুপুরে আমরা গ্যান্চী পৌঁছলাম। এবার আমি চোরের মতো গ্যান্চী যাচ্ছিলাম না যে, গ্যান্চীর ইংরেজ দুর্গে যেতে ভয় পাব। ইংরেজরা এটাকে দুর্গ বলত না কিন্তু তিব্বতী এবং অন্য লোকেরা এটাকে দুর্গ বলে। তিব্বতী হাতিয়ারের পক্ষে এটা খুব মজবুত। বলা হয়, পাথরের দেওয়ালের ভেতর ইস্পাতের মোটা মোটা চাদর লাগানো আছে। মেশিনগান আর ছোট ছোট কামানও আছে। প্রায় একশো জন শিক্ষিত জাঠ সেপাই আর ততজনই ভূতপূর্ব গোরখা সেপাই খেতের কাজ করে থাকছে। বেতারেরও ব্যবস্থা আছে। সে-সময় ওখানে ট্রেড-এজেন্ট, সহায়ক-ট্রেড-এজেন্ট, আর ডাক্তার—এই তিনজন ইংরেজ অফিসার ছিলেন। দুর্গের ভেতরেই ডাকঘর আর তারঘর আছে। ডাকমুন্সী আর তারবাবু আমার নামের সঙ্গে

—১৯৩০—

ভালো করে পরিচিত ছিলেন, কেন না আমার চিঠিপত্র তাঁদের হাত হয়েই লাসা যেত। গ্যান্‌চীতে পল্টনের কাঁচামালের ঠিকাদার ছিল এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক, যার দুজন গোমস্তা ওখানে থাকত। ভোটিয়ারা মারোয়াড়ীদের কাইয়াঁ বলে। মারোয়াড়ী ভাষার 'কাইয়াঁ' (কেঁ্যা) শব্দকে নিয়েই ওরা এই নাম দিয়েছিল।

পয়লা মে সূর্যোদয় হতেই আমরা শিগর্চে-র রাস্তা ধরলাম। মেঘ ঘনিয়ে এলো, বরফ পড়তে লাগল। তারপর কুয়াশা চারদিক অন্ধকার করে দিল। আমরা রাস্তা ভুলে গেলাম কিন্তু নদীর বাঁয়ে বাঁয়ে আমাদের যাবার ছিল। আর আমাদের বাঁ দিকের পাহাড়কে আমরা ডিঙিয়ে যেতে পারতাম না, তাই ভরসা ছিল যে রাস্তা থেকে খুব দূরে সরে যাব না। সামনে একটা বড় গ্রামের বড় বাড়িতে আমরা চা খাওয়ার জন্য থামলাম। সঙ্গে ডিমও পাওয়া গেল। রাস্তায় একদিন থেকে পরদিন দুপুরে শিগর্চে পৌঁছে গেলাম। আমরা লাসা থেকে টাকা-পয়সা আমাদের সঙ্গে বয়ে আনিনি। তবে একজন খম্‌বা (খমদেশীয়) সওদাগরের নামে ছু-শিঙ্-শা-র দেয়া চিঠি ছিল। কিছুটা ইতস্তত করে সে টাকা দিতে রাজি হলো। টশী-ল্‌হুন্-পোতেও একশো টাকার বই কিনলাম। ৪০০ টাকার কালি কাগজ কিনে তন্-জুর ছাপানোর জন্য নর-থঙ্ পৌঁছলাম। ৮ এপ্রিল নর-থঙ্ বিহারে গেলাম। এটা একাদশ শতাব্দীর পুরনো বিহার, ২০০ ভিক্ষু থাকে। যদিও সংস্কৃত পুস্তক এখানে নেই। ভারত থেকে আনা মূর্তির দিকে সে-যাত্রায় আমার নজর যায়নি। কিন্তু পরে আমি সেখানে অনেকগুলো ভারতীয় চিত্রপট দেখে ছিলাম। বুদ্ধগয়া মন্দিরের পাথরের নমুনাও ওখানে রাখা আছে। যা এগার-বারো শতাব্দীতে কেউ গয়া থেকে বানিয়ে এনেছিল। আমাদের অতিথি-সেবক মণিরত্নের শ্যালক ভিক্ষু ধোলা আমাদের কাজে সাহায্য করল। ধোলা ছিল খচরা-নেপালী। নেপালী বাবা এবং ভোটিয়া মা-এর সন্তানকে খচরা বলা হয়। লোকে এতে খারাপ মনে করে না। ওরা সম্ভবত খচরা শব্দের অর্থ জানে না অথবা তিব্বতে খচ্চরকে খারাপ মনে করা হয় না। সে-সময় ভারতে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ চলছিল। সে-খবর হিমালয়ের অপর পারেও পৌঁছে গিয়েছিল। একজন তিব্বতী ভিক্ষু খুব গাম্ভীর্য নিয়ে বলছিল, গান্ধীজী লোবোন্ রিন্-পো-ছে (সিদ্ধ পদ্ম-সম্ভব)-এর অবতার। তিব্বতে লোবোন্-রিন্-পো-ছে বুদ্ধের চেয়েও বেশি সিদ্ধ আর পূজ্য মনে করা হয়।

তন্-জুর-এর জন্য ১৪০০ সাঙ $\frac{\text{১৪০০} \times \text{২০}}{\text{৩}} \times \text{১৭}$ টাকা লাগল।

কন্-জুর-তন্-জুর দুটোর জন্য
২১-২২ শো টাকা খরচ হল।

১৬ এপ্রিল যখন আমি শিগর্চেই ছিলাম, তখন শলু বিহারের রিসুর লামা 'বজ্র ডাকতন্ত্র'-এর তালপাতার পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন। আমি লাসায় 'অষ্টসাহস্রিক-প্রজ্ঞাপারমিতা'র মতো মুদ্রিত দু-একটা গ্রন্থের খণ্ডিত তালপত্র দেখেছিলাম। কিন্তু এগুলো দুর্লভ পুস্তক ছিল লিপিও একাদশ শতাব্দীর আগেকার বলে মনে হচ্ছিল না।

এখন আমার সমস্ত পুস্তক এবং এখান থেকে কেনা চিত্রপটগুলো কালিম্পং-এ পাঠাবার ছিল। ফরী পর্যন্ত গাধাও পাওয়া গিয়েছিল। পুস্তকগুলোকে বাঁচানোর জন্য জরুরি ছিল—প্রথমে কাপড়ে ও পরে চামড়া দিয়ে জড়িয়ে সেগুলো পাঠানো। আমি শিগর্চের কসাইকে ইয়াকের চামড়ার জন্য টাকা দিলাম। সে ইয়াকের জায়গায় গরুর চামড়া পাঠালো। আমি তাকে ডেকে যখন অভিযোগ করলাম, তখন সে চেঁচাতে লাগল। এমনিতে রাগটা আমার খুব কম, কিন্তু কখনো-কখনো এমন হয়, যখন আমি নিজের ওপর সংযম হারিয়ে ফেলি। ১৭ মে-তে তখন এরকমই হয়েছিল। আমি খুব রেগে গেলাম এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলাম—মারিনি, এটা সত্যি।

যদিও লাসাতে যুদ্ধের জ্বর নেমে গিয়েছিল, কিন্তু শিগর্চে সেইগরম কমে যায় নি। নেপালীদের যাতায়াতের পথ খোলা ছিল না। এখনও গ্রামের যুবকদের সৈন্য বিভাগে নাম লেখা আর হাতে পয়সা গুঁজে দেওয়া হচ্ছিল। লাসা থেকে সিনিঙ (কন্‌সু) উত্তরে দু মাসের পথ। সেখান থেকে আসা এক লামা জানালো, ওধারে লালের (বলশেভিকের) রাজত্ব, ডাকাতের এখন উপদ্রব নেই। লালেরা লামাদের বিরোধিতা করে না, পক্ষপাতিত্বও নয়। তিব্বতে শতকরা যতজন লোক বলশেভিকদের নামের সঙ্গে পরিচিত, ঐ সময় হিন্দুস্থানেও অত লোক পরিচিত ছিল না। তার কারণ, যেখানকার ধর্মীয় নেতৃত্ব তিব্বতী লামারা করতেন, বলশেভিক ব্যবস্থা সেই দেশগুলোতে পৌছে গিয়েছিল কিন্তু এরা সিনিঙের লাল রুশী বলশেভিক নয়। এরা ছিল চীনা বলশেভিক।

২০ মে নয়টি গাধার উপর এখান থেকে কেনা বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র চাপিয়ে ফরীর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলাম। তার পরের দিন সকালেই আমরা দুজন শলু বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হই। গ্যানচীর রাস্তা ধরে এক-দেড় মাইল এগোলে শলু পড়ে। তিন ঘণ্টার পর আমরা ওখানে পৌছলাম। এটাও এগারো-বারো শতাব্দীর পুরানো বিহার, সমতল ভূমির উপর তৈরি। দেখলাম, বিহারের চারিদিকে মাটির কাঁচা দেওয়াল। আমি রিসুর লামার কাছে গেলাম। ইনি আমার তিব্বতের সেই সব বন্ধুদের একজন, যাঁরা সবসময় আমার কাজে সাহায্য করেছেন। উনি থাকতে বললেন কিন্তু আমি বিহার দেখে চলে যেতে চাইছিলাম। প্রথমবারের এই তিব্বত-যাত্রায় আমি সর্বপ্রথম সংস্কৃত বই খুঁজতে খুব উৎসাহ দেখাতাম, কিন্তু বেশ কয়েকবারের চেষ্টা অসফল হওয়ায় আমার দৃঢ় ধারণা হল যে, ভারত থেকে এখানে আনা সংস্কৃত বইগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা মূর্তি বা স্তূপের ভেতরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, যার জন্য সেগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কথায় কথায় রিসুর লামা 'বজ্রডাকতন্ত্রের' তাল পুঁথি দিয়ে আমার ভুল ধারণায় ঘা দিলেন। তবে আমি কি জানতাম যে মাত্র দু মাইল দূরে এই শলু মঠের শাখা বিহারে তিনখণ্ডেরও বেশি অমূল্য তালপুঁথি রাখা আছে। লামাও আমাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। যদি তিনি বলতেন, তবে আমি ওখানে পাঁচ-সাত দিনের জন্য থেকে যেতাম। আমি বিহারটি ঘুরে দেখলাম। ওখানে কত ভারতীয় মূর্তি ছিল, দেওয়ালগুলোতে সুন্দর ছবি ছিল। আমি জানতাম, ভারতীয় বইয়ের ভোটিয়া অনুবাদগুলোকে কন্-জুর ও তন্-জুর এই দুটো বৃহৎ সংগ্রহে শ্রেণীভুক্ত

করেছিলেন যে মহাবিদ্বান বু-তোন, তিনি এই শলু বিহারের ছিলেন। ঐ কন্-জুর তন্-জুরও ওখানে দেখলাম, যাকে ভিত্তি করে সপ্তদশ শতাব্দীতে মি-বঙ নারথঙের ছাপাখানার কাঠের ব্লকগুলো খোদাই করেছিলেন, আর এই ব্লকের উপর ছাপা প্রথম কন্-জুর তন্-জুরও এই বিহারে মজুত রয়েছে। আমি চলে আসবার সময় রিসুর লামা দুটি ছবি উপহার দিলেন। আমরা বারোটার সময় শলু থেকে রওনা দিলাম। রাত্রিটা রাস্তায় কাটিয়ে পরের দিন গ্যানচী পৌছে গেলাম, বলা যায়, শিগর্চে থেকে গ্যানচী পৌছাতে দেড় দিন লাগল। গ্যানচীতে আমার অল্প বয়সী খচ্চরীটা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমার তো ভয় করতে লাগল।

২৩ মে দুপুরের পর আমি ভারতের উদ্দেশে রওনা হলাম। গ্যানচী থেকে কালিংপঙ-এর রাস্তা ভালো। কত বছর ধরে এটা ইংরেজদের হাতে ছিল। এখনও গ্যানচীর ডাকখানা ও তারঘর ভারতীয় তার-বিভাগের অধীনে আছে। একটু দূরে দূরে এখানে ডাক-বাংলো তৈরি হয়েছে, টেলিফোন আর তারও আছে। যদি সরকারী অনুমতি পাওয়া যায় তবে গ্যানচী পর্যন্ত লোকে অনায়াসে যেতে পারে। আমার ডাক-বাংলোর প্রয়োজন ছিল না, আর না আমার কাছে অনুমতি ছিল, না ছিল খরচ করার জন্য অতগুলো টাকাও। এই রাস্তাতেও যেখানে সেখানে পাথরের বেশ ভালো পরিত্যক্ত ঘর পাওয়া গেছল। লোকে বলে আঠারো শতকে দালাই লামার বিরুদ্ধে আন্দোলন থামানোর জন্য যখন মোঙ্গল সৈন্যরা দ্বিতীয়বার তিব্বতে এসেছিল তখন তারা এই সমস্ত ঘর জনশূন্য করে দেয়। প্রথম দিন আমরা অল্প পথ চললাম, খচ্চরীকেও বিশ্রাম দিতে চাইছিলাম। তৃতীয় দিন (২৫ মে) বিশাল দীঘির পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাতে দোজিঙ্ গ্রামে এসে থামলাম। উচ্চতা খুব বেশি হওয়ায় এখানে চাষ-আবাদ কম হয়, লোকেরা ছাগল-ভেড়া বেশি পোষে। এই ঘরে প্রথম একটি লোকের দুটি বউ দেখেছিলাম। কিন্তু তারা দুজনে সহোদরা বোন। ওদের বাবার কোনো ছেলে ছিল না, তাই পুরুষটি দুই বোনকে বিয়ে করে ঘর-জামাই হয়েছিল।

পরের দিন (২৬ মে) একটু এগিয়ে যাবার পর দীঘি শেষ হয়ে গেল। আমাদের সামনে বিশাল প্রান্তর, আর মাথার ওপর বরফে ঢাকা হিমালয়ের চূড়া। অতিরিক্ত শীত। রাস্তায় ছোটমত একটা ঘর পেলাম, যেখানে আমরা চা খেলাম। নির্জন স্থান দিয়ে যেতে যেতে একটা ডাঁড়া পার হলাম। বস্তুত এটা ডাঁড়া ছিল না, জল-বিভাজক হওয়ার জন্যেই আমরা ডাঁড়া বলি। সাড়ে তিনটের সময় আমরা ফবী পৌছে গেলাম। ফরী খুব ঠাণ্ডা জায়গা। এখানকার যব-গমের গাছগুলো বড় তো হয়, কিন্তু দানা আসার আগেই শীত এসে যায়, আর ওগুলো পাকতে পারে না। কালিম্পং আর লাসার দুদিক থেকে রোজ কয়েক'শ খচ্চর এখানে আসে। গম-যবের ডাঁটিগুলো দানার দরে বিক্রি করে এখানকার লোকেদের যথেষ্ট লাভ হয়। এখানে ভুটান সরকারের জোঙ আর ইংরেজদের ডাক ও তারঘরও আছে। ১৯০৪ সালের আগে এখানকার জোঙের প্রাসাদ বিশাল ছিল। কিন্তু ইংরেজরা এসে ওটা কামান দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এখানকার বাড়িটা ছোট। এখান থেকে আরো দক্ষিণে পাহাড় পেরিয়ে এক বেলাতেই ভুটানে পৌছানো যায়। একটা ঘরের মধ্যেই খাবার জিনিসের বাজার বসে। এখানে এসে ভোটিয়ারা চাল-চিঁড়ে বিক্রি করে।

এখান থেকে আমি খচ্চর ভাড়া পেয়ে যেতাম। আমার নিজের খচ্চরটার দাম ২৭০ টাকা পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু লোকে বলল যে, কালিম্পঙ-এ আরো বেশি দাম পাওয়া যাবে—-যদিও পরে দেখলাম একথা ভুল।

২৮ মে ফরী থেকে আমি সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। এখন আমি নিচের দিকে যাচ্ছিলাম। কয়েক মাইল যাবার পর শুরু হল ছোট ছোট গাছ। তারপর যত এগিয়ে যাই অজস্র দেবদারু গাছ আসতে থাকে। এটা ডোমো (ছুম্বী) এলাকা। ইংরেজদের লড়াই-এর পর ডোমোরা এই জায়গা দখল করে এবং বহু বছর রাজত্ব চালায়। ফরী থেকে তিন ঘণ্টা যাওয়ার পর ন্যাড়া পাহাড়টা শেষ হলো। এখন তো গ্রামে ঘরের ছাত পর্যন্ত কাঠের—-মনে হলো আমি যেন আবার এল্‌মোতে চলে এলাম। এখানকার মহিলারা এল্‌মোর মহিলাদের মতোই সুন্দরী কিন্তু একথা পুরুষদের সম্পর্কে বলা যায় না। ডোমোর লোকেরা বেশিরভাগ খচ্চর বোঝাই করার কাজ করে। এদের স্ত্রীরা বাইরে বেরলে ভোটিয়া কাপড় পরে, না হলে কনৌরীয়দের মতো উলের শাড়ি ওদের পোশাক। ৩১ তারিখে দশটার সময় আমি স্যা-সীমা পৌঁছাই। আগে এখানে ইংরেজদের মস্ত বড় পল্টন থাকত, কিন্তু এখন ৪০-৫০ জন সেপাই থাকে। ডাকবাংলো, তারঘর ছাড়াও বেশ একটা খাসা বাজারও আছে। ঘরগুলো অধিকাংশ টিন দিয়ে ছাওয়া। একবছর ধরে গাছপালার সবুজাভা দেখবার জন্য চোখ দুটো ব্যাকুল হয়েছিল, এখন পাহাড়ের যে দিকে দেখি সবুজ আর সবুজ। প্রত্যেক গ্রামে খচ্চর চরানোর জন্য এক টাকা করে দিতে হয়। আমি ১৬ টাকা দিয়ে খচ্চর ভাড়া করেছিলাম। ধর্মকীর্তি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। দুটো খচ্চর এই কারণে খালি নিয়ে যাচ্ছিল যাতে কালিম্পং পর্যন্ত গিয়ে ওরা যথেষ্ট তাগড়া হয়ে যায়। দুটো খচ্চরের জন্য প্রত্যেক গ্রামে দু টাকা করে চরানোর জন্য দিতে হচ্ছিল। ঐ দিন রাতটা আমরা গ্যু-থঙে রয়ে গেলাম। চারিদিকে বড় বড় দেবদারুর জঙ্গল। অনেকগুলো প্রাইভেট সরাইখানা ছিল। আমাদের জন্য একটা ভালো ঘর পাওয়া গেল। বাড়িটার দেওয়াল, ছাত সব দেবদারু কাঠের। সরাইখানার বৃদ্ধাটি আমাদের চেহারা দেখে মনে করল ভদ্রলোক বটে, যাবার সময় ছঙ্‌রিন্ (বখশিশ) দেবে। আমরা বসবার একটু পরেই দুজন স্ত্রী-পুরুষ এল। বৃদ্ধা ওদের জন্য পানীয় তৈরি করল। অল্পক্ষণ পরেই মহিলাটি গা মোচড়াতে লাগল। পুরুষটি বার বার হাত জোড় করছিল, ধর্মকীর্তি জানালেন, মহিলাটির উপর দেবতা আসছে আর পুরুষটি তাকে আসতে না দেবার ভঙ্গি করছে। মহিলাটি উঠে দাঁড়াল, দেবতার পোশাক পরে. ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে বৃদ্ধার ঘরে চলে গেল। ওব সামনে প্রদীপ আর ধূপ জ্বালিয়ে দেওয়া হল। আর পাতলা কাঠ দিয়ে বাজনায় তাল ঠুকে দেবতা অবিরাম ছড়া কেটে কেটে কথা বলতে লাগল। সমস্ত খচ্চরওলা ও পথচারীরা দেববাহনীর সামনে পয়সা রেখে রেখে নিজের সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, গদ্যে নয়, সমস্ত উত্তর হচ্ছিল পদ্যে। ফরী থেকে আমাদের সঙ্গে ধর্মসাহুর ভাগ্নে কান্‌ছা আসছিল। আমি মজা করে ওকে বললাম, 'কিছু পয়সা রেখে তুমিও দেববাহনীকে জিজ্ঞাসা কর যে আমার ছেলে নেপালে অসুস্থ হয়ে আছে, তার কি হবে?' কান্‌ছা জিজ্ঞাসা করল। দেববাহনী বলল, 'কিছু দেবতা নারাজ হয়ে আছে, তবে বড় রকমের অনিষ্ট কিছু হবে না।' কান্‌ছার বিয়েই

হয় নি। কিন্তু যাঁরা ওখানে দেববাহনীকে জিজ্ঞাসা করে সন্তুষ্ট হচ্ছিল, তারা এই মিথ্যেকে থোড়াই মানতো।

পয়লা জুন আমরা আবার এগিয়ে গেলাম। কালও আমাদের দু-আড়াই ঘন্টা চড়াইয়ে উঠে আসতে হয়েছিল। কিন্তু সে-চড়াই তত কঠিন ছিল না। আজ এই জেল পলা (ডাঁড়ে)-র চড়াই বেশ কঠিন। বৃষ্টিও প্রচুর হয়েছিল। বরফ খুব কম ছিল। দুপুরে আমরা ডাঁড়ের সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে গেলাম। এটাই হল সিকিম আর তিব্বতের সীমান্ত। এখন উৎরাই। দু-তিন মাইল চলবার পর কুপুক এসে গেল। এখানে ঠিক-ঠিক চা-রুটির দোকান ছিল, মনে হল আমরা পনেরো শতাব্দী থেকে বিশ শতাব্দীতে চলে এলাম।

২ জুন একটু উপরে চড়ে আমরা তুকোলা পার হলাম। এখন হিমালয়ের উৎরাই শুরু হল। নামা যতটা কঠিন, এদিক দিয়ে তিব্বতের দিকে যাওয়াও ততটা কঠিন হবে। কয়েক মাইল তো আমরা দেবদারু বনের মধ্য দিয়েই চলছিলাম। ফদম্ চেঙ্ গ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে দেবদারু পিছনে পড়ে থাকল। এখানকার ঘরগুলোতে বাঁশের ছাত। বেশ গরম লাগছিল। চা-রুটি সব জায়গায় তৈরি ছিল, সঙ্গে ছিল মাছির ভন্‌ভনানি। রাতটা আমরা এই গ্রামে থাকলাম। রোলিঙ্-ছুগঙ্ পর্যন্ত কেবলই উৎরাই ছিল। এখানে ছাপরার একটি দোকান ছিল। কিন্তু আমি নিজেকে প্রকাশ করি নি। নদী পার হবার পর আবার কিছুটা কঠিন চড়াই পেলাম। ওখানে মহুয়া গাছের মত বড় বড় চাঁপা গাছের জঙ্গল ছিল, আর নিচে ছিল ফুলের মেলা। এখন গোর্খাদের গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। কমলালেবুর গাছ আর ভুট্টার খেত ছিল। দুপুরের পর ডুম্‌পেফঙ্-তে পৌঁছে আমরা ওখানে থেকে গেলাম। এখান থেকে সিকিম রাজ্য ৪ মাইল, তারপর ইংরেজদের এলাকা। এখন কালিম্পং পৌঁছাতে আমাদের আরো ১৬ মাইল যেতে হবে। ৪ জুন আমরা আবার চলতে লাগলাম আর একটা-দুটো বসতি পেরিয়ে আলগরহা পৌঁছে গেলাম। এখানে ছাপরার অনেকগুলো দোকান ছিল, জিজ্ঞাসা করায় শীতলপুর বরেজার এক ব্রাহ্মণ দেবতার সঙ্গে দেখা হল। পরসাতে তাঁর শ্বশুরবাড়ি, তাই আমাকে না খাইয়ে কি করে আর যেতে দেন? মালপো বানানো ছিল, তাই খাওয়ালেন। দু ঘন্টা বিশ্রামের পর আবার চলতে শুরু করলাম এবং সন্ধে নাগাদ কালিম্পং পৌঁছে গেলাম। ভাজু রত্ন সাহুকে দিয়েই আমার সমস্ত জিনিস নিচে রেলগাড়ির কাছে পৌঁছনোর ছিল, আমার আসার খবর তাঁর আগে থাকতেই জানা ছিল।

যদিও কালিম্পং চার হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু একটি ঠাণ্ডা জায়গা বলে ধরা হয়, কিন্তু দেড় বছর হিমালয়ে থাকার পর এখানে আমার বেশ গরম লাগছিল। আর ধর্মকীর্তি বেচারা সাইবেরিয়ার বাসিন্দা, তিনি তো এত গরম জীবনে কখনো দেখেন নি। আমি ভেবে দেখলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লঙ্কায় পৌঁছতে পারলে মঙ্গল, নয়ত ও আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বে। আমরা একদিনই কালিম্পং থাকলাম। খচ্চরীগুলোকে বেচে-বুচে দেওয়ার কাজটাও ভাজু রত্ন সাহুর দায়িত্বে ছেড়ে দিলাম আর ৬ জুন তিনটের সময় মোটরে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। এক তো পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে অনেক লোকের এমনিতেই মোটরে যেতে যেতে রাস্তায় বমি হয়, ধর্মকীর্তি তো গরমের চোটেও কাবু ছিলেন, উপরন্তু এই প্রথম মোটরে চড়লেন। সন্ধে নাগাদ আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছলাম,

ওখানে পৌঁছতেই তিনি খুব কাহিল হয়ে পড়লেন। তিনি ফিরে যাবার জন্য বললেন। আমি খরচ দিয়ে ঐ মোটরে ওকে কালিম্পং পাঠিয়ে দিলাম। রাত্রে কলকাতার গাড়ি পেলাম আর ৭ জুন আমি সেখানে গেলাম। বড়বাজারে সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি পড়তে দেখলাম। আমার সত্যাগ্রহে যোগ দিতে বড্ড ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আমি তিব্বত থেকে সংগ্রহ করা যে গ্রন্থরাশি একুশটা খচ্চর বোঝাই করে এনেছিলাম, যতক্ষণ না সেগুলো সিলোন পৌঁছে দিতে পারছি ততক্ষণ আমি নিজের ইচ্ছেকে চেপে রাখাই ভালো মনে করলাম।

১০ তারিখে পাটনা পৌঁছে গেলাম। সদাকত আশ্রমে বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কেন্দ্র ছিল, ব্রজকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম সরকারের এত দমনের পরেও দেশভক্তরা কি ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১১ জুন জানতে পারলাম, বীহপুরে রাজেন্দ্রবাবুর ওপর পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। ১২ তারিখে সারনাথ গেলাম। ওখানে জানতে পারলাম যে, ছাপরার পুলিশ আমার খোঁজে এখানেও বেশ কয়েকবার হয়রান হতে এসেছিল। বেনারসে ডাঃ ভগবান দাসের সঙ্গে দেখা হল। তিনি থিয়োজফির একজন পুরনো ভক্ত। থিয়োজফির নেতারা তিব্বতের নামে কয়েকশো রকমের মিথ্যে বিশ্বাস ছড়িয়েছে। ওদের লাল সিং, কুথুমী প্রভৃতি কত মহাত্মা তিব্বতে রয়েছেন। ডাঃ ভগবান দাস তাঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি তাঁর শ্রদ্ধায় আঘাত করতে চাইছিলাম না, শুধু এইটুকু বললাম যে, ওখানকার লোকেরা এই সব মহাত্মাদের সম্পর্কে কিছু জানে না। ১৫ তারিখে আমি আবার কলকাতা চলে এলাম। সিন্ধিয়া কোম্পানির জাহাজ কলকাতা থেকে কলম্বো যায়, আমি ওদেরকে আমার বহুমূল্য সংগ্রহের ব্যাপারে জানালাম, আর সেগুলো দায়িত্ব নিয়ে কলম্বো পৌঁছে দেওয়ার জন্য বললাম। ১৬ তারিখে মাদ্রাজ মেল ধরলাম, ২০ জুন লংকায় বিদ্যালঙ্কার বিহারে পৌঁছে গেলাম।

লংকায় দ্বিতীয়বার, ১৯৩০

লাসায় থাকার সময়েই লাহোর-কংগ্রেস এবং লবণ-সত্যাগ্রহের খবর পেয়েছিলাম। তিব্বতে সংগৃহীত বই আর ছবি সুরক্ষিত জায়গায় পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত আমার সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ার ব্যগ্রতাকে দাবিয়ে রাখতে হয়েছিল। জুনেই আমার ভিক্ষু-উপসম্পদা নেওয়া স্থির হয়েছিল, এই জন্য বেশিদিন ভারতবর্ষে থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখার সময় ছিল না।

কলকাতা থেকে ফিরে লংকা (২০ জুন) যাবার পর ভিক্ষু আনন্দজী ছাড়া যাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে সবচেয়ে বেশি আনন্দ হল তিনি হলেন নায়কপাদ। তিব্বতের উদ্দেশে আমাকে

বিদায় দেওয়ার মুহূর্তে তাঁর চোখ যে কিরকম জলে ভরে গিয়েছিল, সেটা আমার এখনো মনে আছে।

লংকায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তিনটি নিকায় (সম্প্রদায়) আছে—রামণ্য, অমরপুর, শ্যাম। শ্যাম নিকায় সবচেয়ে প্রাচীন, সংখ্যা ও প্রভাবে সবচেয়ে বড়। সিংহলে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ শাসনকাল পর্যন্ত ভিক্ষুসঙ্ঘ আস্তে আস্তে উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মধ্য লংকার স্বাধীন রাজা কীর্তি শ্রীরাজসিংহ শ্যাম থেকে ভিক্ষুসঙ্ঘকে ডেকে শরণাঙ্কর সঙ্ঘরাজ ইত্যাদিকে উপসম্পদা করে পুনরায় ভিক্ষুসঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন। এই কাজ সেই সময়কার রাজধানী কাণ্ডীতে সম্পন্ন হয়েছিল। সেই থেকে কাণ্ডীতেই শ্যাম সম্প্রদায়ের কেন্দ্র মলবত্তবিহার আছে। শ্যাম নিকায়-এর ভিক্ষুদের উপসম্পদা বছরে একবারই এক নির্দিষ্ট মাসে হয়ে থাকে। উপসম্পদার মাস শেষ হয়ে যাচ্ছিল, আর শুধুমাত্র আমার জন্য এখন সমাপ্তিকে আটকে রাখা হয়েছিল।

উপসম্পদার জন্য কাণ্ডী যাবার আগে বিদ্যালংকার বিহারে নায়কপাদের উপাধ্যায়ত্বে আমার প্রব্রজ্যা (২২ জুন) হয়। লংকায় আমি রামোদার স্বামী নামে প্রসিদ্ধ ছিলাম। আর লংকা ছাড়ার আগেই নিজের গোত্রটা জুড়ে নিজেকে রামোদার সাংকৃত্যায়ন বানিয়ে ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, এই নামটা থেকে যাবে, কারণ ইতিমধ্যে সাহিত্য জগতে আমি এই নামে আত্মপ্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু প্রব্রজ্যা সংস্কার শুরু হবার কয়েক মিনিট আগেই নতুন নামকরণের জন্য নায়কপাদ আদেশ দিলেন। সময় থাকলে বোঝানোর চেষ্টা করতাম, কিন্তু এখন কিছু করতে গেলে আজ্ঞা ভঙ্গ করা হত। বোধহয় আরো দু-একটা নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু আমি রামোদারের 'রা'-এর সঙ্গে মিল দেখে রাহুল নামের প্রস্তাব করি এবং সেটা গৃহীত হয়। এইভাবেই রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামে আমি প্রব্রজিত (শ্রামণের) হই।

২ জুন কাণ্ডীতে আমার উপসম্পদা হয়। উপসম্পদার ব্যাপারটি খুবই ভাবগ্রাহী। কারণ এই নয় যে এটি আড়াই হাজার বছর আগেকার ভাষা ও স্বরে হয়ে থাকে, বরং এর মধ্য দিয়ে ঐ সময়কার বৈশালী ও কপিলাবস্তুর প্রজাতান্ত্রিক সঙ্ঘের কার্যাবলীর একটা ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। একটা বড় ঘরের একটা মুখ্য স্থানে কিন্তু সমান আসনে সঙ্ঘের অধ্যক্ষ বসেন। ওনার দুপাশে ভিক্ষুরা নিজেদের উপসম্পদার বৎসরের ক্রমানুযায়ী সারিবদ্ধ ভাবে বসেন। দুজন অভিজ্ঞ ভিক্ষু সমস্ত সঙ্ঘকে "সুণাতু মন্তে সঙ্ঘো" (শুনুন, মাননীয় সঙ্ঘ) বলে সম্বোধিত করে প্রার্থীকে (উপসম্পদার-অক্ষ) নিয়ে আসেন, সঙ্ঘ প্রার্থীটির শুধুমাত্র বিদ্যার পরীক্ষাই নেয় না, সেই সঙ্গে তার সেইসব শারীরিক-মানসিক ব্যাধিগুলোও যাচাই করে নেয়। যেগুলোর জন্য একজন মানুষকে সঙ্ঘে নেওয়া যায় না। এই উপসম্পদার আগেই আমি ত্রিপিটক পড়েছিলাম। বুদ্ধের সময়ের ভারতকে মানস চোখে দেখবার চেষ্টা করেছিলাম। সেই সময় গণতন্ত্র এবং তার অনুকরণে ভিক্ষু-উপসম্পদার বিষয়ে অনেক কিছু জেনে নিয়েছিলাম। ভারতের বাইরে তিব্বতের মত বৌদ্ধ-দেশে সওয়া বছর থেকেও ছিলাম। এইজন্য উপসম্পদার যাবতীয় কাজকর্ম আমার ওপর খুব প্রভাব ফেলল।

সামনেই বর্ষাকাল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সমস্ত সংগঠন সঙ্ঘবাদের ভিত্তিতে রয়েছে বৈশালীর গণতন্ত্রের দৃঢ়তা, তার স্বাধীনতাপ্রিয়তা ইত্যাদি দেখা এবং সেইসঙ্গে নিজের শাক্য গণতন্ত্রে অংশ নেওয়া—এ সবেরই খুব প্রভাব বুদ্ধের উপর ছিল। এই কারণে সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম—সঙ্ঘবদ্ধ স্বাধ্যায়, সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিবাদ-মীমাংসা ইত্যাদি বিষয়ে উনি খুব গুরুত্ব দিতেন। ভিক্ষুদের নিয়মের মধ্যে মাসে দুবার—অমাবস্যা আর পূর্ণিমাতে—সমস্ত ভিক্ষুকে সঙ্ঘসন্নিপাত (সম্মেলন) আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাঝের পঁচিশ শতাব্দীতে এতটা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয় যে, এ সবের মাহাত্ম্য মানুষের দৃষ্টি থেকে সরে যাচ্ছিল। এবং এখন সঙ্ঘসন্নিপাত বা উপোসথ স্রেফ বর্ষাকালের দু-তিনটে মাসে হয়। উপসম্পদার মতো প্রথম উপোসথের ভিক্ষু সন্নিপাতও আমার মনে হয়েছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। ঐদিন (৯ জুলাই আষাঢ়-পূর্ণিমা) পাশের এক বিহার (মঠ)-এর নতুন বানানো উপোসথাগারে প্রথম উপোসথ করে তার প্রতিষ্ঠাও করার ছিল, এজন্য আমাকে ওখানে যেতে হয়েছিল। দুপুরের খাওয়া শেষ হল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সবাই নিজের অন্তর্বাস কোমর বন্ধনীর সঙ্গে ঠিক ভাবে বাঁধল। তারপর ডান কাঁধটা উন্মুক্ত রেখে উত্তরীয়ের দুটি কোণ একসঙ্গে করে তার উপর বেঁধে, কোমর বন্ধনী (এক বিঘত চওড়া ও কয়েক হাত লম্বা কাপড়) দিয়ে ভালো করে বাঁধল। কয়েকজন ভিক্ষু আগে থেকেই ঐ ঘরে গিয়ে আসন বিছিয়ে রেখেছিলেন। পা ধুয়ে, হাতে তালপাতার পাখা নিয়ে প্রত্যেক ভিক্ষু তাদের উপসম্পদার বয়সানুক্রমে উপোসথাগারে প্রবেশ করতে লাগলেন। সবাই প্রবেশ করার পর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। সামনের প্রথম খালি আসনটিতে পাখা রেখে তাকে ধর্মাসন হিসেবে রাখা হয়। ধর্মাসনকে তিনবার প্রণাম করে উপস্থিত সঙ্ঘ সবচেয়ে আগে নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে—এমন হতে পারে তাঁর হয়ত কালকেই উপসম্পদা হয়েছে—ধর্মাসনে বসিয়ে (সভাপতি করে) আজকের অনুষ্ঠান চালানোর জন্য নির্বাচন করা হয়। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হয়, যেন ঘরে বুদ্ধমূর্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর উদ্দেশে প্রণাম না করে, শুধুমাত্র ধর্মাসনের উদ্দেশে প্রণাম জানাতে হয়। উপোসথের সম্পূর্ণ প্রতিমোক্ষসূত্র (ভিক্ষুনিয়ম) পুনরাবৃত্তি করা দরকার। কিন্তু আজকাল ওর আরম্ভের সামান্য অংশ মাত্র পুনরাবৃত্তি করা হয়। অপরাধ-স্বীকারের কোনো প্রভাব ভবিষ্যৎ জীবনের উপর থাকে না তাই এই অনুষ্ঠান যান্ত্রিক মনে হয়।

এমনিতেও সিংহলের গৃহস্থ ও ভিক্ষুগণ আমাকে স্বামীর সম্মান করতো, ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগ দেবার পর আমার সে সম্মান অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল। লংকায় জনশিক্ষার বিস্তারের কারণে সিংহলী ও ইংরেজী খবরের কাগজ লোকে খুব পড়ে। সেজন্য তিব্বত-যাত্রা নিয়ে লেখার পর উপসম্পদা সম্পর্কিত লেখা ও ছবিতে ওখানকার জনসাধারণের কাছে আমার যথেষ্ট খ্যাতি হয়ে গিয়েছিল। ধর্মোপদেশের জন্য বহু নিমন্ত্রণ সমানেই আসতে থাকত—আনন্দজীও ধর্মোপদেশ দেবার ব্যাপারে বেশ খ্যাতি অর্জন করে নিয়েছিলেন। আমার এখন সময়ও ছিল, তাই প্রত্যেক মাসে একটা-দুটো বক্তৃতা দিয়ে আসতাম। বিহারে থাকাকালীন আমি অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দিতে বুদ্ধের একটি জীবনী লেখবার কাজে হাত দিয়েছিলাম। নিজস্ব ভাষায় স্বতন্ত্র একটি জীবনী লেখার চেয়ে আমি

চেয়েছিলাম ত্রিপিটকের মত করে সেই ভাষায় লিখতে, যাতে লোকে ত্রিপিটকের সময়ের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয় জেনে লাভবান হয়ে বুদ্ধের জীবনী পড়ে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। আমি পড়তে পড়তে যে নোট করেছিলাম, তার থেকে লেখার বিষয় পাওয়া খুব সহজ হয়ে গেল, আর এইভাবে দ্রুতগতিতে 'বুদ্ধচর্যা'[১] লেখবার কাজ শুরু করলাম।

তিব্বত থেকে আমি পণ্ডিত অনন্তরাম ভট্টকে বরাবর চিঠি লিখতাম এবং তাঁকে জার্মানি যাবার জন্য উৎসাহিত করতাম। উনি লণ্ডন মেট্রিক পরীক্ষায় অসফল হয়েছিলেন, তাই আবার এত সময় নষ্ট করার বদলে আমার জার্মানি যাওয়ার সম্মতিকে পছন্দ করলেন। ওনার মামার (যিনি আবার শ্বশুরও ছিলেন) কাছে কিছু ধনসম্পত্তি ছিল। কিন্তু তার থেকে কিছু পাওয়া কঠিন ছিল। আমি জার্মানিতে প্রফেসর রুডাল্ফ ওটোকে ওনার সম্পর্কে লিখে দিয়েছিলাম, তিনি টুবিন্‌গেনের এক অধ্যাপককে লিখেছিলেন। ফিজ্ মকুব তথা কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা তো হয়ে গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে জাহাজ ভাড়া ছাড়াও চার-পাঁচশো টাকার প্রয়োজন ছিল। উনি অত টাকাও জোগাড় করতে পারবেন বলে আমার মনে হয়নি। সেই সময় অনাগরিক ধর্মপাল আমার জন্য দেড়শো টাকা পাঠিয়েছিলেন। অযথা টাকা জমিয়ে রাখা আমার খারাপ লাগে, আর এদিকে ভট্টর কাজে লাগার চেয়ে সেই টাকার আর কি ব্যবহার হতে পারে। যাইহোক, একরকম ধাক্কা দিয়েই আমি ভট্টকে কোনোমতে জার্মানি রওনা করালাম, ১৯৩০ থেকে এখন পর্যন্ত (১৯৪০) সে ওখানে আছে।

লংকাতে জ্যোতিষের মত ভূত-প্রেত, জাদুমন্ত্রের উপর সাধারণ মানুষের অশিক্ষাজনিত খুব বিশ্বাস আছে। এই কাজ ভিক্ষু নিয়মবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষুরা পয়সার লোভে এসবের প্রচারে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ঈশ্বরবাদের বিরোধিতা করলে ওরা খুশি হয়, কিন্তু ভূতবাদের বিরুদ্ধ-কথা পছন্দ করে না। বিদ্যালংকারে থাকতে আমি ভূতবাদ, মন্ত্রবাদ, জ্যোতিষবাদের খুব বিরোধিতা করতাম, এইজন্য এখানকার ভিক্ষুরা সেটা মেনে নিতেন এবং অনেকে এ সম্পর্কে অবিশ্বাসী হতে শুরু করেছিলেন। তিব্বত থেকে ফিরে আসবার পর ওখানকার ভূত ও তান্ত্রিকদের নিয়ে একদিন মজা করে বলছিলাম। তরুণ ভিক্ষুরা হাসছিলেন। কিন্তু সেই সময় আমার গুরুভাই প্রজ্ঞাকীর্তির বাবা ওখানে এসে পড়েন, ওনার খুব খারাপ লেগেছিল। বেচারা বড় শ্রদ্ধাশীল মানুষ ছিলেন। সঙ্ঘের উত্তরাধিকারী (সম্বন্ধী) হওয়া তথা বৌদ্ধধর্মের সেবার জন্য তিনি তাঁর একমাত্র ছেলেকে ভিক্ষু করে দিয়েছিলেন। লংকাতে এরকম গৃহস্থ পাওয়া খুব সহজ, যারা একমাত্র ছেলেকে ভিক্ষু করে দিয়ে জামাই বা দত্তক পুত্রকে দিয়ে বংশ রক্ষা করা পছন্দ করে নিয়েছে। আমার অন্য গুরুভাই আচার্য প্রজ্ঞালোকও এইরকমই পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন।

ভারতে সত্যাগ্রহ চলছিল। মহাত্মা গান্ধীর চিঠি 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র কত-কত টাইপ করা কপি লংকাতেও পৌঁছে যেত, আর ভাবতীয়রা খুব উৎসাহের সঙ্গে তা আমার কাছে

---

[১] বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থ, ১৯৩০ সালে লিখিত, মহাবোধিসভা কর্তৃক প্রকাশিত।—স.ম.

পৌঁছে দিত। এই সময় আন্দোলনের বাইরে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য মনে হচ্ছিল। আনন্দজীরও ছিল সেই অবস্থা। কিন্তু এখন তিব্বত থেকে আনা সব বই, চিত্রপট ইত্যাদি কলকাতা থেকে কলম্বোর পথে ছিল। ওইগুলো সুরক্ষিত রাখাটাও জরুরি ছিল। আমি আনন্দজীকে তাঁর দায়িত্ব দিয়ে ভারতে আসতে চাইছিলাম। কিন্তু তাঁরও বলার ছুতো ছিল—বই-এর ব্যাপারে ওনার কিছু জানা ছিল না। নায়কপাদের কাছে থেকে ভারত যাবার অনুমতি পাওয়া সম্ভব ছিল না, সেই কারণে একদিন উনি লুকিয়ে কলম্বো থেকে তলেমন্নারের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। নায়কপাদের খুব দুঃখ হল, যখন তিনি তাঁর চলে যাবার কথা ও তাঁর ভেতরকার গোপন ইচ্ছার কথা শুনলেন। উনি পুরনো ধরনের ভিক্ষু ছিলেন। ওনার কাছে রাজনীতি ততখানিই ত্যাজ্য ছিল, যতখানি ত্যাজ্য ছিল ঘর-সংসারের সম্বন্ধ।

শেষ পর্যন্ত সিন্ধিয়া নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজে করে তিব্বতের জিনিসও পৌঁছে গেল। কোম্পানির কলম্বোর প্রতিনিধি শ্রীনানাবতী বিনে পয়সায় আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। জিনিসগুলো কয়েক মাস ধরে চামড়াতে শিকল বাঁধা অবস্থায় বন্ধ ছিল। তিব্বতের অক্ষাংশ, উচ্চতা ও শীতের মধ্যে বন্ধ হয়ে এখন ভূমধ্য রেখার পাশে লংকার গরমে তা খোলা হল। ভীষণ দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। আমার থাকবার বড় ঘরটা আমি বই রাখবার জন্য খালি করে দিলাম। ন্যাপথলিনের গুলির ভালোমতো ব্যবস্থা করলাম, তবেও ওই দুর্গন্ধের সামনে ন্যাপথলিন কি করবে?

তিব্বতী জিনিসগুলো সামলে রাখা হল। চিত্র-প্রদর্শনীও কলম্বোতে হয়েছিল। খবরের কাগজে ছবি-টবি ছেপেছিল। আমার বিহার আবাসিকদের কাছে এটা খুশির ব্যাপার ছিল, বিশেষ করে নায়কপাদের কাছে। এবার আমি ভারত যাওয়া স্থির করলাম, তবে আনন্দজীর মত আমি না জানিয়ে যেতে চাইছিলাম না। একদিন সন্ধেবেলা, যখন অন্য ভিক্ষুরা সন্ধ্যা-প্রণাম সেরে চলে গেল, আমি নায়কপাদের কাছে বসে পড়লাম আর অন্যান্য কথার পর আমি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুললাম। এমনিতেও নায়কপাদ এই বিষয়ে কখনো কখনো জানতে চাইতেন। তারপর খুব সাবধানে আন্দোলনে অংশগ্রহণের আবশ্যকতা আছে বলে, আমি যাবার জন্য অনুমতি চাইলাম। আমি ভেবেছিলাম উত্তর 'হ্যাঁ', 'না' অথবা বোঝানোর মত কিছু হবে। কিন্তু আমি একটা চিৎকার শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বিহারের কোণায় কোণায় সেটার প্রতিধ্বনি হচ্ছিল। ব্যাপারটা এমন হল, তখন ধারে কাছে কেউ ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে আসবার পর দ্বিতীয়বার অমনটা হয়নি।

নায়কপাদ স্নেহপ্রবণ ছিলেন। আর আমার উপর ওনার ভালবাসা খুব বেশি ছিল। খবরের কাগজে উনি পড়তেন, ভারতে মানুষের উপর কি-রকম লাঠি পড়ছে, কি ভাবে লোকে জেলে যাচ্ছে, এই সব কথা আমার সঙ্গেও হত। সেই সব কথা মনে করে ঐ সময় ওনার মন বিচলিত হয়ে উঠেছিল। আমি কিছুদিন পর্যন্ত আর ঐ সব নিয়ে আলোচনা করি নি।

এদিকে 'বুদ্ধচর্যা' লেখাও শেষ (৭ অক্টোবর থেকে ১৪ ডিসেম্বর) হয়ে গিয়েছিল। এই

কারণে আর অন্য কোনো কাজে মন লাগছিল না। আনন্দজীর খবর পেলাম যে উনি দারভাঙ্গাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং কিছুদিন ওনাকে জেলে রাখবার পর ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। আমি আস্তে আস্তে নায়কপাদকে বোঝাতে শুরু করলাম। আর বললাম যে বৌদ্ধভিক্ষুদের নিজের আচরণের মধ্যে দিয়ে দেখানো উচিত যে তাঁরা অন্যের জন্য কতটা কষ্ট সহ্য করতে পারে। শেষে নায়কপাদ অনুমতি দিয়ে দিলেন। ১৫ ডিসেম্বর আমি ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম।

সত্যাগ্রহের জন্য ভারতে, ১৯৩০-৩১

ঐ সময় 'অভিধর্মকোষ'(আমার টীকা সমেত) কাশী বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে ছাপা হচ্ছিল। প্রুফের গণ্ডগোলের জন্য ছাপতে অসুবিধে হচ্ছিল। এই কারণে একমাসের মধ্যে প্রথমে ওটা আমার মিটিয়ে ফেলবার প্রয়োজন ছিল। তাই আমি প্রথমে পাটনা, ছাপরা শুধুমাত্র আন্দোলনের অবস্থা জানবার জন্য গেলাম। ডিসেম্বর মাসটা এবং জানুয়ারির কিছুদিন (২১ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি) কাশী বিদ্যাপীঠে কাটিয়েছিলাম। দেখলাম, প্রেসের লোকেরাও প্রুফ দিতে গড়িমসি করছে। সে কারণে ওটার তাড়াতাড়ি প্রকাশের আশা ছেড়ে দিয়ে আমি (২৫ জানুয়ারি থেকে) ছাপরা চলে গেলাম। ছাপরাকেই আমার কর্মক্ষেত্র করার ছিল।

ঐসময় সরকারের দমনচক্র খুব জোর চলছিল। জেলখানা এত সত্যাগ্রহীতে ভরা ছিল যে ওখানে আরো লোক ঢোকানো সরকারের কাছে উদ্বেগের ব্যাপার মনে হচ্ছিল। এইজন্যে সরকার বড় বড় জরিমানা আর ঠেঙানোর ব্যবস্থা করে রেখেছিল। একমা গেলাম, দেখলাম অনেক কর্মকর্তা জেলে চলে গিয়েছে, বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে আশ্রমের জন্য কেউ বাড়ি দিচ্ছিল না। স্বয়ংসেবকরা স্টেশন থেকে পশ্চিমে রেলের রাস্তার দক্ষিণে একটা কুয়োর পাশে অড়হর আর আখে ঢাকা জমির উপর নিজেদের আশ্রম বানিয়েছিল। একটা ঝাণ্ডা কেড়ে নিয়ে যাবার পর আর একটা ঝাণ্ডা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। বরেজার লোকেরা সত্যাগ্রহে খুব বাহাদুরী দেখিয়েছিল। যার ফলস্বরূপ ওখানে গোর্খা পল্টন এনে রাখা হয়েছিল। দেশী সিপাইদের মধ্যে মানুষের প্রতি সহানুভূতি জাগবার ভয় ছিল এই জন্য গোর্খা নামানো হয়েছিল। তাতেও বরেজার মানুষেরা ভয় পায়নি। আমাদের চোখে গিরীশের ছোটভাই পণ্ডিতকে ছোটবেলায় বোকা-বোকা লাগত, কিন্তু আজ ও ওখানকার স্বয়ংসেবকদের নেতা হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের পশ্চিম-উত্তরের পোড়ো জমিতে ওরা রাষ্ট্রীয় ঝাণ্ডা লাগিয়ে ছিল। গোর্খারা সরিয়ে দিচ্ছিল। আমি আবার ঝাণ্ডাটা উড়তে দেখেছিলাম। পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলাম—পণ্ডিত, কি করে ঝাণ্ডাটা

পোঁতা থাকে? উত্তর পেলাম,—'আমরা অড়হর খেতের মধ্য দিয়ে চুপিচুপি গিয়ে ঝাণ্ডা পুঁতে রেখে আসি। বার বার নামিয়ে নামিয়ে সিপাইদের এত বিরক্তি এসে গেছে যে এখন আর সব সময় নামানোর জন্য আসে না।' আমি (২৮ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) একবার পুরো জেলাটা ঘুরে দেখলাম। একবছর ধরে দমন করা সত্ত্বেও আন্দোলন চালু রাখবার জন্য ধন-জনের অভাব ছিল না। জেলার বড় বড় জমিদার ও ধনীরা সরকারের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সভা-সমিতির মাধ্যমে জনতাকে ভয় দেখাতে ও ধমকাতে শুরু করেছিল। গান্ধীজীর উপদেশ ছিল যে সত্যাগ্রহীরা তাদের কোনো কাজ যেন লুকিয়ে না করে, অথচ এক বছর ধরে রাষ্ট্রকর্মীদের বেশি করে বোঝানো হয়েছিল যে গুপ্তসংগঠন ছাড়া কাজ চালানো সম্ভব নয়। সে সময় ছাপরা জেলায় আন্দোলনের নেতা ছিলেন গুহ্যবাবু (যতীন্দ্রনাথ সুর) এবং জগন্নাথ মিশ্র। বাইরে থেকে স্বয়ংসেবকদের সাহায্য করা, তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, জেলে যাওয়ার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ। জেলে যাবার পর তো নিশ্চিন্ত হয়ে পড়াশোনা করে, খেলে, খেয়ে সময় কাটানো যেত। আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য বেনারস থেকে ছাপরায় এসে থাকতে শুরু করায়, গুহ্যবাবু আর জগন্নাথ পালিত চাইছিলেন আমি ওঁদের কাজ সামলাই আর ওঁদেরকে বিশ্রাম নেবার জন্য জেলে যেতে দিই। কয়েকমাস ধরে যে পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তা নিয়ে ওঁরা কাজ করেছিলেন, তা দেখে ওঁদের দাবি আমার যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। আমি জানতাম যে, ছাপরা পুলিশ আমাকে ভালভাবেই চেনে আর বাইরে থেকে কোনো কাজ করতে না দেখলেও ওরা আমার ব্যবস্থা না করে থাকবে না। আমিও বাইরে আছি দেখিয়ে কাজ করব ঠিক করে ফেললাম। গুহ্যবাবু ও জগন্নাথবাবু ঐদিন গাঁজার দোকানে ধর্না দিতে গিয়েছিলেন। ওখান থেকে ধরে ওদেরকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ছাপরায় একটা বড় মিছিল বের হল। আমি মিছিল থেকে আলাদা হয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটছিলাম। আমার পুরনো পরিচিত দারোগা নন্দী আমাকে দেখতে পেয়ে প্রণাম করল। আমি দেখে খুশি হলাম যে এই পুলিশ অফিসারদের মধ্যে একজন সৎ অফিসারও আছে। শহরের থানার দারোগা ইত্যাদিও ভালো লোক ছিল।

ধর্না, মিছিল ইত্যাদি সমানে চলছিল, রাজেন্দ্রবাবুর বড় ভাই মহেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে আমার আগে থেকে পরিচয় ছিল। আমি তাঁর মনকে অল্পবিস্তর আগে থেকেই জানতাম, কিন্তু বিহার ব্যাঙ্ক—যার ছাপরা শাখার ম্যানেজার ছিলেন উনি—তাঁর নিজের ঘরে নিজের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কথা মনে করে আজও তাঁর হৃদয়ের মহত্ত্ব, দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। উনি বলেছিলেন—'বাবু' (রাজেন্দ্রপ্রসাদ) জেলে আছে, তাতে আমার কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না—সে আমি জানি। তবুও ঘর-সংসারের কথা ভেবে আমি জেলে যাচ্ছি না। কিন্তু আমি একটা কাজ করতে পারি, তা হল আন্দোলন চালু রাখবার জন্য টাকার ব্যবস্থা করা। টাকার যখন প্রয়োজন হবে আমায় বলতে যেন সঙ্কোচ না করে।··· টাকা-পয়সার সমস্যাই সেই সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল।

৩১ জানুয়ারি আমি শুনলাম যে নারায়ণবাবুর গ্রামে পুলিশ অত্যাচার চালিয়েছে। গোর্খা সেপাইরা লোকের ঘরে ঢুকে ঢুকে মারধোর করেছে। আমি উকিলবাবু জানকীচরণ

শাহীকে ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে যেতে বললাম। আমরা ১০ ফেব্রুয়ারি ছাপরা থেকে রওনা হয়ে সিধবলিয়া স্টেশনে নামলাম। এই প্রথম মসরখ থেকে থাবে পর্যন্ত কোনো রেললাইনে যাওয়ার আমি সুযোগ পেয়েছিলাম। এই লাইন এক কিংবা দেড় বৎসর হল চালু হয়েছিল। এখনও গাড়ি চললে খুব ধুলো উড়ছিল। জালালপুরে বাবু লালচন্দ রায়ের বাড়িতে জানকীবাবু ক্যামেরায় নতুন প্লেট ভরেন। গোরয়া কোঠীতে গোর্খা সেপাই বসেছিল। আর আমাদের কাজে সে বাধা হওয়ার ভয় ছিল। এই জন্য আমরা চুপিচুপি পায়ে হেঁটে ওখানে পৌছাই। নারায়ণবাবুর বাড়িতে গোর্খারা চেয়ার, পালঙ্ক, চৌকি এসব ভেঙে ফেলেছিল। গ্রামের এক গরিবের ঘরে দেখলাম দরজা-চৌকাঠ সব উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আনাজ রাখার পাত্রকে ভেঙে আনাজগুলো মাটিতে মিশিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাঁসা-তামার বাসন-কলসি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আরো কত ঘরের এইরকম অবস্থা হয়েছিল। লোকের পিঠে মার পড়ার কথা তো আলাদা। পুলিশ সমস্ত গ্রামে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল। সরকার লোকেদের বিচার করে শাস্তি দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। জেল আর ক্যাম্প ভরে যাবার পর জেলের শাস্তিতে লোকে যত কম ঘাবড়াতো, ততোই সরকার ও তার কর্মচারীরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যেত। এই জন্যে সরকার এই বর্বরতাতে নেমে পড়েছিল। কিন্তু সমর্থ হয়েছিল কি মানুষকে ভীত করে তুলতে? না—জোঁকের দাওয়াই চুন বুঝতে পেরে, আন্দোলনের বাইরে থাকা লোকরাও এখন তাতে যোগ দিচ্ছিল। সরকারের খয়ের খাঁদের সংখ্যা শূন্য হয়ে আসছিল। এত অত্যাচারের পর মহিলাদের পর্যন্ত এত ধৈর্য দেখে আমি খুশি হয়েছিলাম। নারায়ণবাবুর স্ত্রীকে সবাই সান্ত্বনা দিচ্ছিল। কিন্তু উনি প্রথম থেকেই খুব শক্ত ছিলেন। বলছিলেন, 'আমি ভয় পাচ্ছি না। আমি বাচ্চাদের নিয়ে জেলে যেতে, প্রস্তুত আছি।' বস্তুত তাঁর সবচেয়ে ছোট মেয়ে নিজের মেজবোনের সঙ্গে মিছিলে অংশ নিচ্ছিল আর ছাপরার ধর্নাতে সামিল হয়েছিল। কয়েক'শ বছরের ঘৃণ্য পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে বিহারের এই কুলনারীদের মধ্যে বিরাট একটা সামাজিক বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

আমরা ফটো তুললাম। রাতে কয়েক ঘণ্টা গ্রামে ঘুরে লোকজনদের বোঝালাম আর ফিরে এসে রাতটা জালালপুরে বিশ্রাম নিলাম। সকালে ছাপরা পৌছলাম। রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র বেশির ভাগই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই অত্যাচারের খবর ছাপানোর মত কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। আমি প্রয়াগের 'ভবিষ্য'তে ছবিগুলো প্রকাশ করলাম। কিন্তু সরকারের কি নিজের কর্মচারীদের এই নোংরা কার্যকলাপে লজ্জা হয়েছিল? বোম্বাইয়ে মহিলাদের উপরে পর্যন্ত লাঠির বর্ষা পড়তে তো বিদেশী সাংবাদিকরাও স্বচক্ষে দেখেছিল। আমেরিকার ও অন্যান্য দেশের খবরের কাগজে এ সম্পর্কে লেখা ছাপে কিন্তু তার কোনো প্রভাব কি ব্রিটিশ সরকারের উপর পড়েছিল? ওরা কি নিজেদের কৌশল বদলেছিল? মজদুর মন্ত্রীসভার ভারতে নিযুক্ত বিদেশমন্ত্রী মিঃ বেজবুড বেন যখন এর সমর্থন করল, তখন বিদেশের সহানুভূতি আর দেশের নৈতিক শক্তির জোরে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া যে অসম্ভব, সেটা বোঝা গেল। আশা শুধুমাত্র সেই শক্তির উপর হচ্ছিল, যা এই সব আততায়ীর কাজকর্ম দেখে মানুষের মনে ঘৃণা আর স্বার্থত্যাগের রূপ নিয়ে

প্রকাশ পাচ্ছিল। ইংরেজ শুধুমাত্র তাদের চারিদিকের প্রতিদ্বন্দ্বী আর ভবিষ্যতের বিপদের কথা মনে রেখে জনতার এই সর্বব্যাপী ক্রোধকে ভয় পাচ্ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শাসনের লাগাম যাদের হাতে তাদেরকে নিজের দলে নিয়ে ইংরেজ এখানকার মানুষের চোখে ধুলো দিতে পারবে বলে মনে করছিল।

এই সময় পর্যন্ত বিহারের অনেক রাষ্ট্রকর্মী গান্ধীবাদে হতাশ হয়ে গিয়েছিল। আর তাঁরা সমাজবাদের পথে মানুষকে প্রস্তুত করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল। গান্ধী-আরউইন সমঝোতার পর আমি বিহার স্যোসালিস্ট পার্টির স্থাপনা (১৩ জুলাই) করেছিলাম, আমাকে ওখানকার সচিব বানানো হল। যখন থেকে আমি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে অংশ নিয়েছি তখন থেকে এমন একটা মুহূর্ত গেছে বলে মনে হয় না যখন সরকারের সঙ্গে শোষকদেরও আমার ঘৃণা ও সমালোচনার বিষয় না করে ছেড়ে দিয়েছি। এখন সেই আদর্শ প্রচারের অনুকূল সময় দেখে খুব আনন্দ হল, এই ছবি আমি 'বাইশবী সদী'-তে এঁকে ছিলাম।

আমি অনেকদিন কাজ করতে পারছিলাম না। এরই মধ্যে ৫ মার্চ (১৯৩১) গান্ধী-আরউইন সমঝোতার কথা খবরের কাগজে পড়লাম। জেলের রাজনৈতিক কয়েদীরা ছাড়া পেতে শুরু করেছিল। ১০ মার্চ ছাপরা জেল থেকে ছাড়া পাওয়া কয়েদীদের স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় আমি অন্য সাথীদের সঙ্গে জেলে পৌঁছে গেলাম। অপেক্ষা করতে করতে প্রায় বারোটা বাজতে চলল। ভিক্ষু হওয়ায় তখন আমি দুপুরের পর খেতাম না। আমার অতিথি-সৎকারক বাবু গুণরাজ সিংহের বাড়িতে খাবার খেতে যেতে দেরি হয়ে যেত। আমি জুমরাতী মিঞাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল—খাবার তৈরি আছে। ওর ঘর জেলের কাছেই ছিল। বাইরে বৈঠকখানায় চৌকিতে বসে গেলাম আর জুমরাতী মিঞা খাবার এনে সামনে রাখল। ছুৎ-বিচার তো আমি কবেই ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু ছাপরায় এই প্রথম আমার মুসলমানের বাড়িতে নিঃসঙ্কোচে খাবার সুযোগ হয়েছিল। এর ফলে জনতার মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে বলে আমার সঙ্গী ভয় দেখাচ্ছিল। কিন্তু আমি বলতাম—'আপনারা বলতে পারেন যে এখন আর ও রামউদারবাবা নয়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন। হিন্দু নয়, বৌদ্ধ।' রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিপ্লবের অনিবার্য আবশ্যকতা আমি অনেক আগে থেকেই বুঝতে পারছিলাম। মুসাফির বিদ্যালয়ের সময় থেকেই ছোঁয়াছুঁয়ি আর জাত-পাতের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতর সমালোচনা করতে একটুও ইতস্তত করতাম না। জুমরাতী মিঞার ঘরে খাবার আমি প্রকাশ্যে খেয়েছিলাম আর সবার সামনে তার আলোচনাও করছিলাম, আমার এমন কোনো ঘটনা মনে পড়ে না, যাতে আমি কারো তিরস্কারের পাত্র হয়েছিলাম। বস্তুত যাদের জন্য আমি কাজ করি তারা তো আমাকে আমার সর্বজনীন সেবা দিয়ে ওজন করে। বিরোধী সরকারের তোষামোদকারীদের আমার পরোয়া করবার কি আছে?

এবার (২৯-৩১ মার্চ) কংগ্রেস করাচিতে হলো। আমিও কয়েকজন সাথীর সঙ্গে (২৩ মার্চে) করাচি রওনা হলাম, রাস্তায় যখন আমার সঙ্গীরা লুচি-তরকারির খোঁজ করত, আমি তখন রুটি-মাংস নিতাম। যুক্তপ্রদেশ বিহারে এখন পর্যন্ত স্টেশনে রুটি-গরুর মাংস

ফেরি করত মুসলমানরাই। ছাব্বিশে করাচি পৌঁছাই। ওখানে আনন্দজীকেও পেলাম। আমরা একই জায়গায় ছিলাম। কংগ্রেসে যোগ দিতে আসা সমস্ত প্রতিনিধি আর জনতার মধ্যে ভগৎ সিংহ ও তাঁর সঙ্গীদের ফাঁসীর ব্যাপারে এক ভয়ানক উত্তেজনা ছিল। গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে অনেক লোক ভেবেছিল, ইংরেজ সরকারের মনের পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই রকম সরকারের কি আর মন থাকে? গান্ধীজী ক্রিশ্চিয়ান ভাইসরয় আরউইনের কাছে ভগৎসিংহের প্রাণ ভিক্ষা চাইবার জন্যই থেকে গেলেন। কিন্তু দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা লাজপত রায়কে যে ইংরেজ পুলিশ অফিসার প্রহার করেছিল তাকে তার এই কাজের মজা বুঝিয়ে দিতে চাওয়া ভগৎসিংহকে কিভাবে ক্ষমা করা যেত?

কংগ্রেসের অবসরে যেসব নতুন জিনিস আমার চোখে পড়ল, তার মধ্যে একটা ছিল কাস্তে-হাতুড়িওলাদের সভা। ওদের কয়েকজন কর্তা-ব্যক্তির সঙ্গে আমি দেখাও করেছিলাম, কিন্তু ওদের উদ্দেশ্যের গভীরতা আমার তখন জানা ছিল না, তাই ঘনিষ্ঠতা করি নি। সন্ত্রাসবাদীদের বীরত্ব ও আত্মদানের বড় প্রশংসাকারী হওয়া সত্ত্বেও আমি ওদের দলে কেন সামিল হতে পারি নি, এ ব্যাপারে আগেই বলেছি। কাস্তে-হাতুড়িওলাদের জন্য আমি তো সেই পরশপাথরটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। কংগ্রেসের সময় রাষ্ট্রভাষা-সম্মেলন হয়েছিল। আমি রোমান লিপিকে মেনে নেবার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলাম, কিন্তু বিতর্কের ভয়ে কাকা কালেলকর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে বললেন।

করাচিতেই সিংহলের বৌদ্ধ-ভিক্ষু স্থবির-জিনবংশকে দেখলাম। যাঁর সঙ্গে পরে জাপানে দেখা করবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি স্বমতে দৃঢ় ছিলেন। কিছু ছাপানো প্যামফ্লেট নিয়ে লোকজনের মধ্যে বিলিয়ে আর তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করছিলেন। প্রফেসর ধর্মানন্দ কৌশাম্বির আত্মকথা আমি গুজরাটীতে পড়েছিলাম, আর আনন্দজীর কাছে তাঁর সম্পর্কে শুনেওছিলাম। কিন্তু তাঁর তুষার শুভ্র কেশ ও কোঁকড়ানো দাড়িতে ঢাকা ফর্সা মুখ আর তা থেকে বিচ্ছুরিত শান্তি, গাম্ভীর্য এবং সারল্যকে দেখবার সুযোগ এখানেই প্রথম পেলাম। আমি করাচি শহর ও তাঁর বন্দর দেখতে গিয়েছিলাম কিন্তু তার বিশেষ কোনো কথা মনে পড়ছে না। এখন (১৯৩১ খৃঃ) পর্যন্ত করাচি বিমান-বন্দর তৈরি হয়নি।

আনন্দজীর করাচি থেকে জাহাজে করে বোম্বাই ও তারপর সিংহল যাওয়ার ছিল, আর আমার বিহারে ফিরে আসার ছিল। সেটা বোম্বাই হয়েও করতে পারতাম কিন্তু আমি ইতিমধ্যে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের একজন ছাত্র হয়ে পড়েছিলাম। সেজন্যে মহেন-জো-দারো ও হরপ্পা দেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না। সাতজন সঙ্গীকে নিয়ে আমি হায়দ্রাবাদে নামলাম (১ এপ্রিল)। এখন খুব গরম পড়তে শুরু করেছিল। আর ঐ সময় হায়দ্রাবাদে বাড়িগুলোর ছাতের উপর দরজা ছাড়া ঘরের মত জায়গায় পাখার প্রয়োজনীয়তা বলবার পর বুঝতে পারলাম যে এটা বাড়ির মধ্যে হাওয়া টেনে নিয়ে আসে।

হায়দ্রাবাদ থেকে ট্রেনে করে কোটরী হয়ে সিন্ধুর দক্ষিণ কিনারা ধরে মহেন-জো-দারো পৌছলাম। ডেরাগাজীখাঁ আর জামপুরী যাবার সময় আমার সিন্ধুর কাছাড় দেখা হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে স্টেশন (ডীকরী) থেকে বলিষ্ঠ ঘোড়াযুক্ত টাঙ্গা চড়ে যাবার সময় যখন কাছাড় এল তখন আমার কিছু নতুন বলে মনে হল না। স্টেশনে সব টাঙ্গার ঘোড়াগুলোকে আমি দেখলাম একই রকম বলিষ্ঠ। আমার হঠাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত সৈন্ধব অশ্বকে মনে পড়ে গেল। কিন্তু এখন আমি পালি সাহিত্যও পড়ে ফেলেছিলাম আর জানতাম যে, আজ যাকে সিন্ধুপ্রান্ত বলে সেটা আগে সৌবীর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রোরুক (বর্তমান রোরী) ছিল এর প্রধান নগর। সৈন্ধব (সেন্ধা) লবণ আর সৈন্ধব অশ্বের সম্মিলিত প্রাচীন জন্মভূমি সিন্ধুদেশ হল পিণ্ডাদাদন খাঁ ইত্যাদির নুনের পাহাড়ী অঞ্চল তথা তার আশপাশের জেলা। নদীর সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর নিচের দিকে বয়ে যাওয়ার উদাহরণ আরো দেখা যায়। বুদ্ধের সময় পৈঠন (প্রতিষ্ঠান) এবং ঔরঙ্গাবাদের পাশে অন্ধক (আন্ধ্রক) প্রান্ত এখন গোদাবরীর নিচের দিকে চলে গিয়েছে।

দিনের বেলায় দশটার সময় আমি মহেন-জো-দারো পৌছলাম, তখন খুব গরম ছিল, আর ঠাণ্ডা জলই সবচেয়ে প্রিয় বস্তু মনে হচ্ছিল। ঐ রোদ্দুরের মধ্যে আমি এখানকার ধ্বংসাবশেষ দেখতে শুরু করলাম। মহেন-জো-দারো সম্পর্কে আমি যথেষ্ট পড়াশুনা করেছিলাম। ওখান থেকে বেরিয়ে আসা জিনিসপত্র তথা ধ্বংসাবশেষের অনেক ফটো দেখেছিলাম। কিন্তু এখন সেই সব আসল জিনিস চোখের সামনে ছিল। আজকালকার বিলিতি ইঁটের আকারে পোড়া ইঁট পৃথিবী যে গোল—সে কথা প্রমাণ করছিল। শহরের রাস্তা,জলের নালি, পাঁচ হাজার বছর আগেকার পুরনো সিন্ধুবাসীদের নাগরিক জীবনের উৎকর্ষের কথা বলছিল। ওদের ইঁটের ঘর, ইঁটের কুয়ো, ওদের স্নানাগার সবই এই কথার সাক্ষী ছিল যে, তাম্রযুগেও ওখানকার লোকজনেরা খুব সমৃদ্ধ উন্নত জীবনযাপন করতো।

মহেন-জো-দারো থেকে সন্ধে নাগাদ আমি সক্খর পৌছে গেলাম, সিন্ধু নদের তীর থেকে একটু ভেতরে উদাসী সাধুদের মঠ সাধুবেলা ভারী সুন্দর জায়গা। কোনো এক সময় সিন্ধের গৃহস্থদের সাধু সেবা ও সাধুদের মনোরম স্থানের প্রসিদ্ধি আমাকে ওখানে যাবার জন্য আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু এখন আমার কাছে তার জন্য অত সময় ছিল না। তাই সাধুবেলায় এক-আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করেই সন্তুষ্ট রইলাম। তখন মোহান্ত হরনাম দাস ওখানে ছিলেন আর তাঁর ব্যবহারে বুঝলাম যে উনি মানুষকে মনোরঞ্জন করতে খুবই পটু। ওখানে আমি শীতলপুরের (ছাপরা) মোহান্ত ঈশ্বরদাসের এক শিষ্যকে দেখলাম, যে ঘুরতে ঘুরতে এখান পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। দু-পয়সা দিয়ে এক বোতল লেমনেড খেয়ে আমি বুঝলাম যে সিন্ধীরা শুধু ভারতেই নয়, তার বাইরে মধ্য এশিয়া, লঙ্কা, সিঙ্গাপুর, চীন, জাপান, মিশর, ইতালি ইত্যাদি পর্যন্ত কেন সফল ব্যবসায়ীদের মত নিজেদের কারবার চালায়।

সিন্ধুর পায়াবিহীন পুল থেকে পায়ে হেঁটেই আমি রোরী এলাম আর ওখান থেকে (৩ এপ্রিল) অন্য সঙ্গীরা সামাসট্টা হয়ে বিহারের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু আমি

লাহোরের লাইনে মন্টগোমারী জালারী থেকে হরপ্পা রোড স্টেশন ফিরে এলাম, রাতটা ওখানে থেকে সকালে স্টেশন থেকে হরপ্পা পৌঁছলাম আর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের খননের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ওখানে মহেন-জো-দারোর মত শহরের একটা অংশ চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু ইঁটগুলো সেই মান ও ওজনের। পাথরের মসৃণ বালাগুলো দেখে এদের ব্যবহারের বিষয়ে আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছিল। বড় বড় মটকাতে মরা মানুষের হাড় রেখে সমাধি দেওয়া হত, একথা পড়েছিলাম। ভেঙে পড়া ছাতের লম্বা-পাতলা ইঁটের তৈরি বাড়িগুলো থেকে ঐ সময় কত এইরকম মটকা খুঁড়ে বাইরে বের করে আনা হচ্ছিল, পাশের মিউজিয়ামেও কিছুক্ষণ কাটালাম। আর আমাকে পুরাতত্ত্বের ছাত্র মনে করে স্থানীয় অধিকর্তা খুব ভালো করে সব দেখালেন। সেই সময় আমার স্মৃতিতে সিন্ধু-উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতার এই চিহ্নগুলোর প্রথম আবিষ্কারক শ্রীরাখালদাস ব্যানার্জীর সঙ্গে, তিব্বত যাবার আগে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আলোচনা হয়েছিল, তা মনে পড়ছিল। আমার উৎসাহে উনি খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখে ৪৬-৪৭ বছর বয়সে নিজের কাজ ও জীবন শেষ হবার কথা শুনে আমি বড় আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমি লংকাতে থাকতে প্রফেসর রুডাল্ফ অটো আর প্রফেসর লুডর-এর মতো বৃদ্ধ জার্মান বিদ্বানদেব তারুণ্যের সঙ্গে কাজ করতে দেখেছিলাম, এই কারণেও রাখালবাবুর হতাশা আমার ভালো লাগে নি। কিন্তু তখন আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে তাঁর জীবনের শেষ সময় অত কাছে এসে গিয়েছে।

হরপ্পা দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেল, সেই রোদ্দুরে স্টেশন ফিরবার কোন তাড়া ছিল না, কিন্তু খিদের চোটে পেটে মোচড় দিচ্ছিল। ঐ সময় একজন শিখ ভদ্রলোকের দেখা পেলাম। উনি বললেন—এখানে তো দোকান নেই কিন্তু পাশের গুরুদ্বারে সদাবর্ত-লঙ্গর চলছে, ওখানে ডাল-রুটি পাওয়া যাবে। তাঁর সঙ্গে আমি ওখানে গেলাম। গুরুদ্বারের পাশে একটা পুকুর কাটানো হচ্ছিল আর শ্রদ্ধাশীল গৃহস্থ—স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাটি সরানোব কাজে হাত দিয়েছিল। রুটি খুব ভালো ছিল আর গোটা অড়হরের ডালটাও। কিন্তু লাখো মাছির ভন্‌ভনানি ভালো লাগছিল না, খাওয়া আর কিছু সময় বিশ্রামের পর ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি স্টেশন রওনা হলাম। আমার বহু জায়গায় যাত্রা এবং প্রচুর বই ও কাগজ পড়ার দৌলতে কথা বলা ও শোনার মতো এত বিষয় ছিল যে কখন স্টেশন পৌঁছে গেলাম তা টের পাইনি। হরপ্পা স্টেশন থেকে মণ্টগোমারি দূরে ছিল না, আর ওখানে মোটর-বাস যাচ্ছিল। আমি মণ্টগোমারি ও শাহীবাল জাতের সুন্দর দুগ্ধবতী গরুদের রাস্তাতেই দেখে নিয়েছিলাম, সেইজন্য মণ্টগোমারি শহর দেখতে যাবার ইচ্ছে হয় নি। সন্ধের সময় স্টেশনে বসে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষদের কথাবার্তা শোনবার সময় 'করসাঁ' (করিষ্যামি—করবো) 'জাসাঁ' (যাস্যামি—যাবো) ইত্যাদি শব্দ কানে আসাতে আমার মনে হলো, সংস্কৃত ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি এটাই ভারতের কথ্য ভাষা।

লাহোরের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য ওখানে আমি ৫-১০ এপ্রিল পর্যন্ত থেকে গেলাম, তারপর ছাপরার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম।

—১৯৩১—

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর আন্দোলন একটা সাধারণ চেহারা নিল। আর গান্ধীজীর গোল টেবিল কনফারেন্সে যাবার কথা চলতে লাগল। গরমকালটা আমার ছাপরায় থাকবার কথা ছিল। অনেকদিন পরে—১৯২২ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত—এখন আবার উত্তর ভারতের গরম আর লু'র মুখে পড়লাম। এই কারণে কিছুটা অসহ্য মনে হচ্ছিল। আমার তো দিনের বেলা দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত ঘামে শরীর চিট-চিট করত, আর মন ব্যাকুল হয়ে থাকত। ঐ সময় কোনো কাজ করা মুশকিল ছিল।

তবুও আমি সারন জেলার 'রাজনীতিক সংঘর্ষকে ইতিহাস' লিখে যাচ্ছিলাম। ২৪ জুনের মধ্যে ছাপরা মফস্বল, মসরখ, পরসা, বড় হরিয়া, কটয়া, গোপালগঞ্জ থানার বর্ণনা লিখে ফেলেছিলাম। পরে আরো বাড়ানো হয়েছিল, কিন্তু পরে ঐ বইটা যার কাছে ছিল সে হারিয়ে ফেলে। আমি 'অভিধর্মকোষের' সঙ্গে সঙ্গে 'বুদ্ধচর্যা' ছাপানোর চেষ্টায় ছিলাম। হিন্দি সাহিত্যের জগতে আমি নেহাতই একজন অপরিচিত লোক ছিলাম, তাই 'বুদ্ধচর্যার' মত পুঁথি ছাপানোর জন্য প্রকাশক পাওয়া সহজ ছিল না। আমার বন্ধু ধূপনাথ দেড়শো টাকা ওটা ছাপানোর জন্য দেয়, যদিও এটা মোট খরচের দশভাগের একভাগ, তবুও 'পরে কোনো একটা ব্যবস্থা ঠিকই হবে' এই ভরসায় আমি কাশী বিদ্যাপীঠে বর্ষাকালটা থাকাকালীন তারা প্রিন্টিং প্রেসে বইটা ছাপানোর জন্য দিয়ে দেবো ঠিক করলাম। ৮ আগস্ট আমি বেনারস চলে এলাম। আচার্য নরেন্দ্রদেবজীর সঙ্গে পরিচয় ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতে যাবার আগে হয়েছিল, আর এখন সেই পরিচয় বন্ধুত্বের রূপ নিয়েছিল। থাকতাম পণ্ডিত রুদ্রদেবের কাছে, আর খাওয়া হতো আচার্য নরেন্দ্রদেবের ওখানে। খুব তাড়াতাড়ি 'বুদ্ধচর্যা'র প্রুফ সংশোধন ও ছাপানোর কাজ আরম্ভ হল। হিন্দিতে এটা আমার প্রথম বই ছিল, উপরন্তু 'অভিধর্মকোষ' এখনও ছাপা না হওয়াতে যে কোনো ভাষাতেই এটাই ছিল আমার প্রথম বই, এই কারণে এটাকে প্রকাশিত দেখবার বড় লোভ ছিল। কিন্তু যত টাকা আমার কাছে ছিল তা দিয়ে ও কাজ করা সম্ভব ছিল না, একথা আমি জানতাম। নরেন্দ্রদেবজী বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্তকে সুপারিশ করলেন। উনি বইটা যাচাই করবার জন্য বাবু ভগবানদাসজীকেও দেখিয়ে নেবার জন্য বলেন। বই-এর বিবরণ আর এক-আধ পাতা শুনে বাবু ভগবানদাস রায় দিলেন যে, আমি যেন শব্দানুবাদ না করে এটা স্বতন্ত্র গ্রন্থে পরিণত করি। এর জন্য উনি পুরাণের উদাহরণ দিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টি আর সততা এখনও আমার যথেষ্ট ছিল, তাই তাঁর কথায় আমার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে? আমি 'বুদ্ধচর্যা'-র মধ্য দিয়ে বুদ্ধ ও বুদ্ধযুগে ভারতের ইতিহাসের সামগ্রিক মৌলিক রূপ রাখতে চেয়েছিলাম। বাবু ভগবানদাসের কথা মেনে নিলে ওই বইটিকে আগুনে ফেলে দেওয়াটাই পছন্দ করা হত। যাই হোক, পাঁচ-সাত ফর্মা ছাপা হওয়ার পর বাবু শিবপ্রসাদজী বইটি নিজের পক্ষ থেকে ছাপাতে রাজি হলেন, আমি বইটার সব জায়গায় খ্রীস্টাব্দকে ব্যবহার করেছিলাম। সৌর-তিথি আর বিক্রম সংবতকে মেনে নিয়ে আমি অনেক বছর পর্যন্ত দেশপ্রেম আগেই দেখিয়েছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছিলাম সারা পৃথিবীতে প্রচলিত মাস-সনের জায়গায় বিক্রম-সংবত আর সৌর তিথি প্রচার করার ইচ্ছাটা জাতীয়তা বিরোধী। তবুও বইয়ের প্রকাশকের ইচ্ছাকে

গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করে তিনি রাজি না হলে বইয়ের প্রকাশনা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। বাবু শিবপ্রসাদের কথা মেনে নেবার পর ধূপনাথজীরও চিঠিও এলো যে, উনি বইটা ছাপানোর জন্য যে-টাকার প্রয়োজন তা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এখন তো এ ব্যাপারে সব কিছু ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

ওই বর্ষাবাসের সময় একদিন (৪ সেপ্টেম্বর) যাগেশের সঙ্গে দেখা হল। ওর বাবার চিকিৎসার জন্য ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয়ে থাকছিল। কাশ্মীর পর এই প্রথম দেখা হল। দেখলাম, ওর সেই তারুণ্যে ভরা লাল মুখ আর নেই। ঘরের জঞ্জাল ওর স্বাস্থ্যের উপর ছাপ ফেলেছিল। আমার নিজের জীবনযাত্রাতে আমি সন্তুষ্ট হলাম।

বিদ্যাপীঠে একদিন বেশ মজা হল, পণ্ডিত রুদ্রদেবজীকে আমি নিমন্ত্রণ খাওয়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করেছিলাম। আমি ছাড়া নরেন্দ্রদেবজী আর বাবু শিবপ্রসাদজীর মত লোকও যখন তাতে যোগ দিলেন, তখন পণ্ডিত রুদ্রদেবজীর রাজি না হয়ে উপায় ছিল? পণ্ডিত রুদ্রদেবজী গুরুকুল বৃন্দাবনের স্নাতক এবং বৈদিক সাহিত্যে বিদ্বান ছিলেন, তাই আমি প্রস্তাব করলাম যে, ভোজে সোম আর মধুপর্কের[১] ব্যবস্থা অবশ্যই হওয়া দরকার। কিন্তু আসল সোম অর্থাৎ ভাঙ আমরা কেউই খেতে পারতাম না, আর মাংসাশী তো আমি একাই ছিলাম। এই জন্য ঠিক হল 'নামাসো মধুপর্কো ভবতি' এই ভগবতী স্মৃতি পালন করবার জন্য গুচ্ছিয়ার তরকারি বানানো হবে—যার স্বাদ অনেকটা মাংসের মত আর সোমের জায়গায় ঋভুর দ্রাক্ষাসব আনা হবে। দ্রাক্ষাসব তো পাওয়া গেল না, কিন্তু মধুপর্কের সঙ্গে রসগোল্লা, অমৃতি এবং অন্যান্য সুস্বাদু ভালো খাবারের—চর্ব্য-চোষ্য-পেয়র ভোজ হল। দশ-পনেরো জন বিশিষ্ট অতিথি এতে যোগ দিয়েছিলেন। খাবার পর নিমন্ত্রণদাতার প্রশংসা করে বক্তৃতাও হল। ঐ বক্তৃতায় একথাও বলা হল যে, কিভাবে পাঁচজন দিয়ে শুরু করে অতিথির সংখ্যা পনেরো পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত তো কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আমি সূচির আলাদা-আলাদা সংস্করণে আসা নামগুলো প্রকাশ করে দিলাম। মূল সূচিতে বাবু শিবপ্রসাদজীর নাম ছিল না। উনি হঠাৎ বলে উঠলেন—তবে কি আমরা পিছন থেকে জোর করে ঢোকানোর দলে? পণ্ডিত রুদ্রদেবজী আরো ক্ষেপে ছিলেন, যে ওনাকে বোকা বানিয়ে জোর করে নিমন্ত্রণ খাওয়াতে বাধ্য করা হয়েছে। তার উপর রসিকতার ছলে হলেও বক্তৃতায়, বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্তকে গৌণ অতিথিদের একজন বলে দেওয়া হল। উনি রেগে গেলেন, আর সবচেয়ে বেশি আমার উপর। কিন্তু যে মজা করতে চায়, তাঁকে এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এই সময় বিদ্যাপীঠে মোরাদাবাদের পণ্ডিত জ্বালাদত্ত শর্মার সঙ্গে দেখা হল, তাঁর নাম 'সরস্বতীর' সেই সব লেখকদের মধ্যে দেখেছিলাম যাঁদের লেখা 'সরস্বতী'র সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় পড়তে পেরেছিলাম। তিনি আমার লংকা সম্পর্কিত লেখা 'সরস্বতী'তে দেখেছিলেন। সে-লেখা কাঁচা হাতের নয়, প্রৌঢ়ের কলম থেকে বেরিয়েছিল। নিজের

[১] দই, ঘি, মধু, জল ও চিনির মিশ্রণ।—স·ম·

কলমের উপর দশ-বারো বছর সংযম রাখাতে আমার কোনো আফশোশ ছিল না—এই কারণে নিজে-নিজেই আমার মত লেখকের সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া তাঁর খুব আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হয়েছিল। পণ্ডিত জ্বালাদত্তর সঙ্গে কথাবার্তায় সেটা বুঝতে পারলাম। তিনি আমার লেখার প্রশংসা করতে গিয়ে বলছিলেন, 'আমি তো সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করলাম, এই নতুন বিভূতি কোথা থেকে বেরিয়ে এল?' কোনো সহৃদয় ব্যক্তির মুখ থেকে সংযত ভাষায় প্রশংসা শুনলে কার আর খারাপ লাগে? ওই বছর পণ্ডিত পদ্মসিংহ শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি তখন আমার 'বাইসবী সদী' পড়ছিলেন। ততদিনে 'বাইসবী সদী'র প্রথম সংস্করণ পাটনা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কি? আমার লেখনীর সঙ্গে তিনিও পরিচিত ছিলেন, এতেও আমার কম আনন্দ হল না। তবু এসব কথা এমন সময় হচ্ছিল যখন আমার নিজের লেখনীর উপর ভরসা করবার জন্য বাইরের উৎসাহের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

বর্ষা শেষ হতে হতে 'বুদ্ধচর্যা' আর 'অভিধর্মশেষের' ছাপানোর কাজও শেষ হয়ে এল। প্রেসকে তাগিদ দেওয়ার জন্য আমাকে প্রায়ই তারা প্রিন্টিং প্রেসে যেতে হত। একদিন ওখানেই অযোধ্যা সিংহ উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর 'চোখে চৌপদে' ওখানে ছাপা হচ্ছিল। একদিন জাতীয়তা এবং হিন্দুসভা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। আমিও তাতে যোগ দিলাম। সে-সময় উপাধ্যায়জী এটা জানতেন না যে আমি তাঁর জন্মভূমি নিজামাবাদের তহসীলী স্কুলের ছাত্র আর তাঁর শিষ্য পণ্ডিত সীতারাম শ্রোত্রিয় আমার শিক্ষক ছিলেন। আমি তাঁকে হিন্দুসভার পক্ষে উত্তেজিত হয়ে সমর্থন করতে দেখে এক-আধটা আক্রমণাত্মক মন্তব্য করলাম। উপাধ্যায়জীর এক বৌদ্ধভিক্ষুর এইভাবে হিন্দুত্বের উপর আক্রমণ করাটা খুব খারাপ লেগেছিল। আমি ভেতরে ভেতরে মজা পাচ্ছিলাম, যখন তিনি বললেন, 'তোমরা কবে আমাদের হলে? এই কারণে তো তোমাদের ভারত থেকে বের করতে হয়েছিল।'

সারনাথের নতুন বৌদ্ধ বিহার তৈরির কাজ শেষ হয়ে আসছিল। অনাগরিক ধর্মপাল সারনাথে ছিলেন। কখনো কখনো আমিও ওখানে যেতাম। অনাগরিক সুন্দর কথা বলতেন। একবার বলছিলেন, 'আমি মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তুমি এখানে বেনারসে কেন চলে এলে? এখানে সারনাথ তো বুদ্ধের এলাকা'। রাগে বেচারা গজ-গজ করতে লাগল—'আমায় কিচ্ছু বোলো না, আমি তো দিব্যি তিব্বতের কৈলাসে বড় ঠাণ্ডা জায়গায় থাকতাম। এই মহিলা—পার্বতী—যত গণ্ডগোলের মূলে। ওর এই আগুন বেরিয়ে আসা গরম জায়গাই পছন্দ। এ জেদ করল।' 'কিন্তু মহিলাদের তো বশে রাখতে হয়।' 'এটাই তো আমার দুর্বলতা'।

অনাগরিক ঐ সময় বারো মাস রোগগ্রস্ত ছিলেন। পায়ের কমজোরির জন্য চলাফেরা করতে পারতেন না। বলতেন—'যখনই একলা থাকি, প্রায়ই দেবতাদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর চালিয়ে যাই। মহাদেব ভালো লোক। কিন্তু মহিলাদের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ নেই'। আমাকে বলতে গিয়ে একটা ব্যাপারে উনি খুব দুঃখ প্রকাশ করছিলেন—'আমি জীবনের বেশির ভাগটা ভারতে বৌদ্ধধর্ম পুনঃস্থাপনের জন্য ব্যয় করেছি, বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, কিন্তু এখনও

কাজের লোকের খুব প্রয়োজন আছে। আপনারা কাজ সামলে রাখুন, আমি তো মরে এই বেনারসেই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেব। আমাকে পড়াশুনো শেষ করতে দিন, তারপর তো আমি কাজের জন্য আসছিই।'

১১-১৩ নভেম্বর (১৯৩১) সারনাথের নতুন বিহার (মূলগন্ধকুটী বিহার)-এর উদ্‌ঘাটন মহোৎসব ছিল। মন্দিরের পাথরের তৈরি ভব্য চূড়া আর পূজার ঘর খুব সুন্দর করে বানানো হয়েছিল। কিন্তু সামনের ছোট ছোট চূড়াগুলোর লংকার যুদ্ধ-স্মারকের মত আকৃতিতে আমার খটকা লাগত। কিন্তু এখন তো সেগুলো বানানো হয়ে গিয়েছিল। ভিতরে স্থাপন করবার জন্য যে প্রতিমা তৈরি হচ্ছিল তাও এত গোদা ছিল যে আমি বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। বেচারা অনাগরিক স্বদেশীদের কথা ভেবে জয়পুরের কারিগর দিয়ে একজন আধুনিক শিল্পীর তত্ত্বাবধানে ওটা বানিয়েছিলেন। সারনাথ মিউজিয়ামের প্রসিদ্ধ গুপ্তকালীন মূর্তির নকল করতে চেয়েছিলেন। সেটা যদি কোনো ইউরোপীয় শিল্পীর উপর ভার দেওয়া হত তবে সহজেই যান্ত্রিক-কৌশলে সাফল্যের সঙ্গে তা তৈরি করে দিতে পারত। উৎসবের সময়ে বই ছাপানোর কাজ থেকে আমি ফুরসৎ পেয়ে গিয়েছিলাম। কংগ্রেস থেকে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজ—চরকা-খদ্দর, অচ্ছুৎ প্রথা নিবারণ, হিন্দু-মুসলিম একতা তথা গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার নির্দেশ দিয়ে গান্ধীজী গোল-টেবিল কনফারেন্সে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কংগ্রেসের তৎকালীন প্রোগ্রামে আমার কোনো রুচি ছিল না, যার জন্য আমি লংকা যাবার তালে ছিলাম।

উৎসবে লংকা থেকে অনেক ভিক্ষু এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমার উপাধ্যায় শ্রীধর্মানন্দ নায়ক মহাস্থবিরও ছিলেন। উৎসবে আমিও অংশ নিয়েছিলাম। সমস্ত বৌদ্ধদেশের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। দর্শকদের উপর বৌদ্ধধর্মের জাতীয়তাবাদের ছাপ না পড়ে থাকতে পারে নি। উৎসবে সম্মিলিত হবার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্যও এসেছিলেন। তাঁর নাম আগেই শুনেছিলাম, কিন্তু দেখার এই প্রথম সুযোগ হল। তিনিও আমার প্রবন্ধ 'ভারতমে বৌদ্ধধর্মকা উত্থান ঔর পতন' পড়েছিলেন। তাই আমি তাঁর কাছে অপরিচিত ছিলাম না। তাঁব সারল্য, সদাহাস্যময় মুখ, মধুরভাষিতা নব-আগন্তুককে আকর্ষণ না করে থাকে না। আর আমি তো তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্যের কিছু পরিচয় রাখতাম। তিনি বললেন—'আমি আপনার ঐ লেখাটা পড়েছি, আর লেখককে দেখার জন্য উৎসুক ছিলাম।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'হিন্দিতে?'—ওটা 'গঙ্গা'র মত অল্প প্রসিদ্ধ পত্রিকাতে বেরিয়েছিল। উত্তর পেলাম—'হ্যাঁ, আমি চিহ্ন দিয়ে রেখেছি'। জ্ঞানীর কাছ থেকে প্রশংসা যে নিজের লেখা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় তাতে সন্দেহ নেই।

উৎসবের পর নায়কপাদ আর আনন্দজী—তাঁরাও লংকা থেকে চলে এসেছিলেন—তাঁদের মত হল যে, আমিও লংকাতে চলে যাই। তিব্বত থেকে আনা সমস্ত সাহিত্য সামগ্রী পোকা-মাকড় থেকে বাঁচানোর জন্যই নয়, ওগুলোকে কাজেও লাগাতে হত। লংকার একটা দল—যাতে পনেরো-ষোল জন ভিক্ষু আর পঞ্চাশ জন গৃহস্থ

ছিল—১৪ নভেম্বর সারনাথ থেকে জেতবন (বলরামপুর) রওনা হয়। ওখান থেকে নৌতনবা হয়ে লুম্বিনী যায়, তারপর বাসরা। ত্রিপিটককে যে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছে, সে জানে যে বুদ্ধের জীবনে জেতবনের কতটা মাহাত্ম্য রয়েছে। নিজের প্রচারক-জীবনের অর্ধেক বর্ষাবাস তিনি এখানেই করেন। জেতবনের গন্ধকুটীর ধ্বংসস্তূপের সামনে ভিক্ষু, গৃহস্থরা দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন নায়কপাদ কিছু উপদেশ দেন। তিনি জেতবনের প্রশংসাতে সংযুক্ত নিকারের গাথা 'ইন্দ জেতবন' বলতে শুরু করতেই তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায়। এরপর আর বলা অসম্ভব, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বেরিয়ে আসে। চিন্তা করুন সেই ব্যক্তির মানসিক অবস্থাকে, যিনি জেতবনকে শ্রাবস্তীর রাজকুমার জেত-এর রাজোদ্যান রূপে শুধু পড়েনই নি, মনে মনে দর্শনও করেছেন, যিনি অনাথপিণ্ডদ -কে মোহর বিছিয়ে তাঁকে কিনে নিতে দেখেছেন, যিনি বুদ্ধকে তাঁর প্রধান শিষ্যদের সঙ্গে ওখানে বর্ষাকাল কাটাতে দেখেছেন, আর যিনি বুদ্ধের নির্বাণের বছরে আনন্দকে এই গন্ধকুটীতে আসন, জলের হাঁড়ি সমস্ত জিনিস ঝেড়ে পরিষ্কার করে বুদ্ধের জীবিত অবস্থায় যেমন ছিল তেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গে রাখতে দেখেছেন। গত শতাব্দীগুলোতে যেখানে নিজের শ্রদ্ধার ফুল দেবার জন্য মোগ্গলিপুত্র তিস্স-এর মত অনেক সংঘজ্যেষ্ঠ, অশোকের মত অনেক মুকুটধারী এসেছেন আর আজ যাকে একটা নির্জনভূমি থেকে জীর্ণ-শীর্ণ ইটের ভাঙাচোরা দেওয়ালের চেহারায় খুঁড়ে বের করা হয়েছে।

কসয়া (১৯ নভেম্বর) থেকে আমরা ছাপরা-পাটনা হয়ে নালন্দা (২২ নভেম্বর) রাজগীর গেলাম, আর তারপর কলকাতা (২৪ নভেম্বর) থেকে লংকার উদ্দেশে যাত্রা।

লংকায় তৃতীয়বার, ১৯৩১-৩২

২৮ নভেম্বর আমি বিদ্যালংকার পৌঁছে গেলাম, এইবারে আমি বিহারে একজন চীনা পণ্ডিতকে দেখলাম। বাঙ্-মো-লম্ (এই ছিল তাঁর নাম) সাংহাই থেকে প্রকাশিত একটি বৌদ্ধ ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তাঁর পালি সংস্কৃত পড়বার প্রবল ইচ্ছা হয়, আর সেই ইচ্ছা মেটানোর জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন। এই সময়টাতে আমি সুবিধা নেবার সুযোগ পেলাম। দু-একবার চীনা অক্ষর শেখার প্রয়াস করেছিলাম, কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারিনি। তবে চীনা অক্ষর শিখে পণ্ডিত হওয়ার চেয়ে আমি বেশি পছন্দ করতাম—অক্ষর শেখার সঙ্গে সঙ্গে কোনো সংস্কৃত বই-এর পুনরানুবাদ হয়ে চলুক। 'অভিধর্মকোষ'কে আমি পুসিন্-এর ফ্রেঞ্চ-অনুবাদের সাহায্যে সম্পূর্ণ করেছিলাম, প্রথমে আমি ওটারই চীনা অনুবাদটা নিলাম, পরে হ্বেন্-চাঙ্ অনুবাদিত 'বিজ্ঞপ্তি মাত্রতাসিদ্ধ' আর 'দীর্ঘনিকায়'-এর কিছু সূত্র নিয়েছিলাম। বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্তের কৃপায় কাশী বিদ্যাপীঠ

আমাকে চীনা ত্রিপিটকের এক কপি আনানোর জন্য পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছিল। এখন আমার ইচ্ছা ছিল, চীনা লিপি ভালো করে পড়ি, কিন্তু আগেকার অনেক কাজের ব্যস্ততা শ্রীবাঙের সঙ্গে শেখা অক্ষরগুলোও ভুলিয়ে দিয়েছিল। শ্রীবাঙ্ খুবই কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনের উপর—বিশেষ করে যোগাচার দর্শনের উপর তাঁর অপার শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু তাঁর মেজাজ সহজেই গরম হয়ে যেত। একটুতেই ভুল হয়ে যেত তাঁর, আর দ্রুত ফেটে পড়তেন। একটু পরেই যখন ভুল বুঝতে পারতেন তখন আবার এসে ছেলেমানুষের মত অস্থির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। বিহারের তরুণ ভিক্ষুরা তাঁর খিট্‌খিটে স্বভাবকে নিজেদের মনোরঞ্জনের বিষয় করতে চাইত। তাতে উনি খুব দুঃখ পেতেন। চীনেতে এঁটো-কাঁটার বিচার নেই। বাঙ্ মহাশয় প্রায়ই নিজের শুকনো চামড়াকে থুতু দিয়ে ঘষে ঘষে নরম করে নিতেন। আমি এরকমটা তিব্বতে অনেক দেখেছি। এজন্যে এটাকে ভালো অভ্যাস নয় জেনেও আমি ওদিকে অত খেয়াল করতাম না। কিন্তু অন্য ভিক্ষুরা এই স্বভাবকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। বাঙ্ মহাশয় কতবার উলঙ্গ হয়ে স্নান করতেন, যদিও কুয়োর পাশে একটু দেওয়ালের ঘেরা ছিল, কিন্তু সেখানে কোনো দরজা ছিল না। ফলে লোকেদের নজরে পড়ে যেত। এটাও টিপ্পনীর বিষয় ছিল। বস্তুত, বাঙ্ মহাশয় এই সরল পদ্ধতিটা স্বীকার করেন নি যে, নতুন দেশে নিজের রীতিকে মেনে গুটিয়ে থাকার চেয়ে ভালো ওখানকার লোকজনের ব্যবহার দেখে দেখে অনুকরণ করা। বাঙ মহাশয়ের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি ছাড়াও যে অধিক পক্ষপাতিত্ব আমার তৈরি হয়ে গিয়েছিল তার একটা কারণ এটাও যে আমরা দুজনই ছিলাম সরল। পণ্ডিত চীনা ভিক্ষু বো-দম্ (বোধিধর্ম)-কে তিব্বতে যাবাব আগে রাজগীরের সোন-ভাণ্ডার গুহাতে অর্ধোন্মাদ অবস্থায় দেখেছিলাম, পবে তাঁর সঙ্গে খুব সম্পর্ক হয়েছিল। আর যখন তিনি নেপাল গেলেন, তখন ওখানকার বৌদ্ধদের বিষয়ে একটা বিস্তৃত চিঠি লিখেছিলেন। শ্রীবো-দম জীবন-মরণ সম্পর্কে নিস্পৃহ ছিলেন, কিন্তু আমি যখন তাঁর মৃত্যুর খবর পেলাম তখন চীনা পর্যটকদের গ্রন্থতে বর্ণিত, ভারতের গরম আর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে মৃত পুরনো চীনা ভিক্ষুদের শোকপূর্ণ স্মৃতি জেগে উঠল। আমার থেকে থেকে নিজের বন্ধুর জন্য সেই আশঙ্কা হত। বিশেষ করে তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য দেখে। শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই যথার্থ হল, আমি যখন লংকাতে ছিলাম না তখন বাঙ্ যক্ষ্মার শিকার হন। তাঁকে জাফনার সমুদ্রতটবর্তী স্যানিটোরিয়ামে পাঠানো হয়েছিল। একবার ভালো হয়ে বিহারে ফিরেও এসেছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই আবার অসুখটা ফিরে আসে। মাসের পর মাস ভুগে-ভুগে মৃত্যু বাঙের পছন্দ ছিল না, তাই একদিন সমুদ্রে ওনার লাশ ভাসতে দেখা গেল। সেটা ছিল এক বন্ধুর স্নেহের অবসান!

আনন্দজীর লেখাপড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার নিজের একা একা ঘুরতে ভালো লাগে না, কিন্তু অনাকে একা বেড়াতে দেখলে আনন্দ হয়। আনন্দজী যখন এইরকম যাত্রার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন আমি তার সহর্ষ অনুমোদন করি। তিনি শ্যাম দেশে যাবার জন্য পাসপোর্ট চাইলেন, লংকার পুলিশের কাছে আমাদের সম্পর্কে ভারতীয় পুলিশের দেওয়া কিছু খবর ছিল। পুলিশ অফিসার অনুসন্ধান করার সময় তাঁর সেই বন্ধুর

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে ভারতীয় পুলিশের চোখে বিপজ্জনক ছিল। তবুও তাঁর রেকর্ড অতটা খারাপ ছিল না। পাসপোর্ট পাওয়া গেল।

এরই মধ্যে মহাবোধি সভার মারফৎ লন্ডনে প্রচারের জন্য পাঠানো ভিক্ষুদের ফিরে আসার খবর এল। সভার ট্রাস্টী নতুন প্রচারক পাঠাতে চাইছিলেন। ট্রাস্টের প্রধান শ্রী এন· ডি· এস· সিল্‌ভা আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই নায়কপাদের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। তাঁদের নজর আনন্দজীর উপর পড়ল। আনন্দজী একা লন্ডন যেতে প্রস্তুত ছিলেন না, ঐ জন্য আমাকেও যাবার জন্য বলা হল। আমার মাত্র কয়েক মাসের জন্য যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আর তাও সেই সময় এই কারণে যে একবার বাইরে যাবার পাসপোর্টটা তো পাওয়া যাবে। ততদিন শ্রী (পরে স্যার) ডি· বি· জয়তিলক সিলোন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন। আমি শুধুমাত্র ইংল্যান্ডে থাকার জন্য পাসপোর্টের দরখাস্ত করেছিলাম, ভেবেছিলাম এতে কম ঝামেলা হবে। আনন্দজী নিজের পাসপোর্টে ইংল্যান্ডের নামটা বাড়ানোর জন্য পাঠান। পুলিশের কাছে আমার নামে ভারত থেকে অনেক অভিযোগ এসে পৌঁছেছিল। শেষমেশ দু-বার জেলাখানার হাওয়াও তো খেয়েছিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই সরকারের তরফ থেকে আমার কাছে জবাব এল—আপনি ভারত সরকারের কাছ থেকে পাসপোর্ট চান, আমরা তার অনুমতি ছাড়া পাসপোর্ট দিতে অক্ষম। আনন্দজীর উত্তর এল—অসাবধানতার কারণে পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছিল, আমরা তা ফেরৎ নিয়ে নিচ্ছি, আপনি ভারত সরকারের কাছ থেকে পাসপোর্ট চান। আমাদের তো হতাশা আর আফশোশ হয়েছিলই, কিন্তু আমাদের থেকেও বেশি উদ্বেগ হল মহাবোধি সভার ট্রাস্টিদের, কেননা লন্ডনে পাঠানোর জন্য ইংরিজি জানা কোনো যোগ্য ভিক্ষু তাঁরা পাচ্ছিলেন না।

স্যার ডি· বি· জয়তিলকেরও চিন্তা হল, আর উনি আমাদের পাসপোর্টের ব্যাপারটা নিজের হাতে নিলেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীর কথা না শোনা লংকার পুলিশ ও সেক্রেটারির পক্ষেও মুশকিল ছিল। শেষমেশ সত্যি না হলেও দেখানোর জন্যও মন্ত্রীদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, এইভাবে স্যার জয়তিলকের চেষ্টায় আমাদের শুধুমাত্র ইংল্যান্ডের নয় পুরো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পাসপোর্ট দিয়ে দেওয়া হল। যখন থেকে পাসপোর্টের জন্য রাওয়ালপিণ্ডিতে দরখাস্ত (১৯২৩) করেছিলাম তখন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে ব্রিটিশ সরকার পুরো ভারতবর্ষটা ভারতীয়দের জন্য জেলখানা বানিয়ে দিয়েছে। পাসপোর্ট পেয়ে যাওয়াতে সেইরকম আনন্দ হল, যেন যাবজ্জীবন কারাবন্দী জেল থেকে বাইরে যাবার অনুমতি পেল।

কাশী বিদ্যাপীঠে থাকবার সময়ই 'গঙ্গা' (সুলতানগঞ্জ)-র সম্পাদকমণ্ডলীর ইচ্ছে হয়েছিল যে আমি যেন তাদের পুরাতত্ত্ব সংখ্যার (বিশেষ সংখ্যা) সম্পাদক হই। আমি তাতে সম্মত হয়ে বিষয়সূচীও তৈরি করে দিয়েছিলাম, আর লংকায় এসে তার জন্য কয়েকটা লেখাও লিখি, যেগুলোর মধ্যে 'চৌরাসী সিদ্ধ' আর 'মহাযান কী উৎপত্তি আউর বিকাশ' ফরাসিতে অনূদিত হয়ে 'জার্নাল-এশিয়াটিক'-এও ছাপা হয়।

ইউরোপ যাত্রা, ১৯৩২-৩৩

আনন্দজী ও আমি ৫ জুলাই তিনটের সময় কলম্বো বন্দরে পৌঁছাই। আমাদের বিদায় জানাবার জন্য সঙ্ঘের অনেক ভিক্ষু এসেছিলেন। 'দার্তঞেনাঁ' (D' Artagnen) জাহাজ তীরের থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে ছিল, কারণ কলম্বোর বন্দর তীর পর্যন্ত তেমন গভীর নয়। ফটোগ্রাফার ফটো তুলতে চাইছিল, কিন্তু এখন আনন্দজীর এতে বিশেষ আপত্তি ছিল। নৌকা জাহাজের কাছে পৌঁছাল, আমরা ফ্রেঞ্চ জাহাজের ফরাসি নাবিকদের পাশ দিয়ে গেলাম।

ইউরোপে লোকে কোট-বুট পরে যায়। আর আমার গায়ে ছিল আড়াই হাজার বছর আগেকার ভিক্ষুদের পোশাক-চীবর। ওরা দেখে খুব জোরে হেসে আমাদের স্বাগত জানাল। এখনো আলো জ্বলে নি, তাই ভেতর অন্ধকার ছিল। ৩০০ নম্বর কেবিনে আমাদের বার্থ ছিল। রাত দশটা পর্যন্ত আগেকার বন্ধুরা দেখা করতে আসছিল। এগারটার সময় জাহাজ ছাড়ল, আর আমরা শুয়ে পড়লাম। ভোরবেলাতেই শুয়ে শুয়ে আমার মনে হচ্ছিল খুব জোরে জোরে দুলছি। সমুদ্র খুব উত্তাল ছিল। প্রবল হাওয়া বইছিল। সকালে উঠে পায়খানা গেলাম। ওটা খুব নোংরা ছিল। মুখ ধোবার সময় বমির মত হল। আনন্দজী সমুদ্র-পীড়ায় খুব অসুস্থ ছিলেন। সারাদিনে তিনবার বমি হয়েছিল। আর উনি খাবার নাম করলেন না। আমি আটটার সময় পাউরুটি-মাখনের সঙ্গে চা খেয়ে নিলাম। এগারোটায় খাবার সময় ছিল। সেই সময় ভাত, মাংস, পাউরুটি, মাখন আর আম খেতে দেওয়া হল। আমি খেলাম বটে, তবে আজ আমাবও খাবার ইচ্ছে কম ছিল। সমুদ্র-পীড়ার জন্য অনেকগুলো লেবু আর আদা সঙ্গে নিযে নিয়েছিলাম। দিনের বেলা কয়েকবার তা খাচ্ছিলাম। আমাদেব কেবিন আব বিছানা খুব পরিষ্কার ছিল। আমাদের বার্থ দুটো ছিল ওপর-নিচে। কেবিনে হাত ধোবার জন্য আরো একটা জলের কল ছিল। যার পাশেই কাঁচের সুরাই-তে খাবার জল আর একটা গ্লাস রাখা ছিল। আমাদের সহযাত্রীরা বেশির ভাগ ইউরোপীয়ান ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ফরাসি ভাষী। আমি তো একদিনেই সামুদ্রিক অসুখে যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার অত কষ্ট ছিল না। কিন্তু আনন্দজীর অবস্থা খারাপ ছিল। তৃতীয় দিন থেকে তো আমি সহযাত্রীদের সঙ্গে পরিচয়ও বাড়াতে লাগলাম। লক্ষ্ণৌ-এর তরুণ এ· কে· দাশগুপ্তকেই একমাত্র ভারতীয় পেলাম, মুকদন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রফেসব ল্যুর সঙ্গেও পরিচয় হল। এক আমেরিকান প্রফেসর ফিলিপাইন্স থেকে দেশে ফেরৎ যাচ্ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে উনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

একজন যবদ্বীপের বতাবু (বাটাভিয়া) নিবাসী মুসলমানও এই জাহাজে আরব যাচ্ছিলেন। তৃতীয় দিন আনন্দজী একটু খেলেন, কিন্তু তাঁর দুশ্চিন্তা কম হল না, তিনি ওপরে খোলা ডেকে শুতেন। কেবিনে পাখা ছিল, আমি তো নিজের জায়গাতেই শুতাম।

৭ জুলাই সন্ধের সময় ঝড় আরো তীব্র মনে হল। ৬ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত টানা ৬ দিন আরব সমুদ্র এই রকমই ক্ষুব্ধ ছিল।

৮ তারিখে ঝড় আরো বাড়ল। ল্যু, দাশগুপ্ত আর আনন্দ সবাই খুব অসুস্থ ছিল। আনন্দজীর বমি হয়েই চলছিল। ল্যুও কিছু খাননি। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলাম। তাতেও কোনো অসুবিধে ছিল না। খাবারে মাংস, মাছ, ভাত, পাঁউরুটি, মাখন, সেদ্ধ করা তরকারি সবই আমার পক্ষে ভালো জিনিস ছিল। যারা পান করে তারা এক বোতল করে মদ পেত, জাহাজ ভাড়ার মধ্যে খাওয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমুদ্রের রোষ যদিও আরো বেড়েই চলল এবং আমার সঙ্গীরাও চিন্তিত হয়ে থাকল, কিন্তু আমি দ্বিতীয় দিন থেকে প্রকৃতিস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। ছেলেরা খুব মেতে থাকত। ওরা খুব দৌড়াদৌড়ি করত, যেখানে বড়দেব হাত দিয়ে দেওয়াল ধরে ধরে চলতে হত।

১২ জুলাই সমুদ্র শান্ত হল। ৮-৯টার সময় আফ্রিকা তট আমাদের চোখে পড়তে লাগল। গাছ পালাশূন্য পাহাড় নজরে আসছিল। আমরা শুমালী ল্যাণ্ডের তীর ধরে চলছিলাম। শুমালী জেলেদের নৌকাও যখন-তখন যেখানে-সেখানে দেখা যাচ্ছিল। আমাদের জাহাজ নাযিকা পদ্মিনীর মত কখনো হংস গতিতে আবার কখনো গজগতিতে চলছিল। এখন সবাই খুশি ছিল। গরম অবশ্যই একটু বেড়ে গিয়েছিল। সহযাত্রীদের কাছ থেকে কাছের বই যা পেতাম, তা কখনো নিজের কেবিনে আবার কখনো ডেকের চেয়ারে শুয়ে আমি পড়তাম। স্নানের ঘর অতটা ভালো ছিল না। স্নানের জন্য নোনা ও মিষ্টি জল মজুত ছিল। আমাকে কেউ আগে বলে দেয়নি, আমি নিজেই নাকাল হয়ে দেখলাম যে নোনা জলে সাবান লাগানোব পর মনে হচ্ছিল আপনি পাথর ঘষছেন। মিষ্টি জলে গা ভিজিয়ে সাবান লাগিয়ে নোনা জল দিয়ে স্নান করতে হয়। স্নান করতে খুব ভালো লাগত। রেডিওর খবর টাইপ করে টাঙিয়ে দেওয়া হত। তা থেকে আমরা মোটামোটা খবরগুলো জানতে পারতাম। আমি আমাব ভাঙা-ভাঙা ফরাসিভাষাও কাজে লাগাতাম, ১৪ তারিখে আমরা জিবুতী পৌঁছাই। এটা ফ্রান্সের অধীন, আমরাও তীরে উঠতে চাইছিলাম কিন্তু কোনো ছোট নৌকা পাওযা গেল না। তাই জাহাজ থেকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। লোকে সমুদ্রে পয়সা ছুঁড়ছিল। শুমালী ছেলেরা ডুব দিয়ে তা নিচে পৌঁছানোর আগেই বের করে আনছিল। জিবুতীতে অনেক গুজরাটী ব্যবসায়ীও থাকে। কমলালেবু বিক্রেতারা হিন্দিও বলে। আমাদের জাহাজ রাত চারটেতেই এসেছিল। ৪ ঘণ্টা বাদে তা আবার সামনে চলতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পরেই আমরা লোহিত সাগর দিয়ে চলতে লাগলাম। আমাদের জাহাজ আফ্রিকা তটের কাছ দিয়ে চলছিল, কিন্তু ডানদিকে এশিয়া (আরব) তটও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। গরমের কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। পাখার নিচেও ঘাম হচ্ছিল। রাত্রিবেলা ডানদিকে কোনো ছোট টিলাতে আলোকস্তম্ভ থেকে মিট্‌ মিট্‌ করে আলো দেখা যাচ্ছিল।

১৫ জুলাইতে তো মনে হচ্ছিল, আমরা সমুদ্রে নয়,কোনো শান্ত সরোবর দিয়ে চলেছি।

দুপুরের পর ঐ ফ্রেঞ্চ কোম্পানি—মেসাজরী মরীতীম-এর অন্য জাহাজ উল্টো দিক দিয়ে আসছিল। দুই জাহাজ ভেঁপু বাজিয়ে একে অন্যকে স্বাগত জানাল। আনন্দজীর শরীর

এমনিতে ভালো ছিল, কিন্তু খাওয়ার বড় অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি আমার মত সর্বভুক ছিলেন না। বেচারা বহুদিন যাবৎ নিরামিষাশী, আর নিজের শরীর দিয়ে ঐ ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিলেন। তাও রুটি, মাখন, সেদ্ধ সবজি আর আলুভাজা যতখুশি ততটাই পাওয়া যেত। ফল আর চাও মজুত ছিল। ১৬ তারিখে মনে হল স্নান ঘরের খবর নেবার কেউ নেই। ওটা খুব নোংরা আর জলও খুব কম ছিল। ১৭ তারিখে অনেক ছোট ছোট স্টিমার যাতায়াত করতে দেখা গেল। পাশের ন্যাড়া পাহাড়গুলো দেখে তিব্বতের কথা মনে পড়ছিল, কিন্তু তিব্বতের ঠাণ্ডা এখানে কোথায়? তাও ভূমধ্যরেখা থেকে আমরা যথেষ্ট উত্তরে হয়ে গিয়েছিলাম, এই কারণে গরম কিছুটা কম ছিল। সন্ধের সময় ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ ডেকের উপর জমায়েত হত। ফোনোগ্রাফ বাজত আর ওরা খুব নাচত। ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষদের খুব কাছ থেকে আর তাও চব্বিশ ঘণ্টা আগে থাকতে এখানেই দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। কাল পর্যন্ত একে অন্যের সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, আজ খুব হেসে-খেলে থাকছিল। স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন ছিল না। তবু আমি ডায়েরিতে লিখেছিলাম, 'ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের ব্যাপারে খুব খোলামেলা হয়। এমনটা অন্যত্র দেখা যায় না। তবু তার কারণ এই নয় যে তারা অন্যদের তুলনায় বেশি কামুক। কামুকতা তো সর্বত্র একই রকম হয়।' (ইউরোপ-জনা ইত্থিপুরিসং-রাগ-বিসয়ে বহু পাকটা—ন তথা অজুথ্য দিস্‌সতি। তথাপি অস্মপেক্ষ বহুকামুকা তিন বত্তুং সক্কা। কামুকভাবো তু সব্বত্থ সমানো'ব।)

বিলেতি কাগুজে পাউন্ডকে সমান মূল্যের সোনার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হল। দেখছিলাম ওর দাম দিন-দিন পড়ে যাচ্ছিল। ১০ জুলাই যেখানে এক পাউন্ডে ৯৬ ফ্রাঙ্ক (ফরাসি মুদ্রা) পাওয়া যাচ্ছিল, সেখানে ৮ দিন পরে ১৮ জুলাই সেটা ৯০·৫০ হয়ে গিয়েছিল। ১৮ তারিখ তিনটের সময় ভোর না হতেই আমাদের জাহাজ সুয়েজ পৌঁছাল। ৫ ঘণ্টা সেটা ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। ইউরোপীয়ান আবাস বন্দরের কাছেই ছিল। কিন্তু শহরটা একটু দূরে ছিল, কোথাও কোথাও কিছু খেতও দেখা যাচ্ছিল। খেজুর আর তালের ঝাড়ও এখানে সেখানে ছিল, কিন্তু বেশির ভাগ জমিই ফাঁকা ছিল। আমাকে পাঁচ ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা কবতে হল। জাহাজে ফল আর অন্যান্য জিনিস বিক্রেতা সাধারণ মানুষের মধ্যে কয়েকজন সিন্ধীও ছিল। ওরা ফরাসি, ইংরিজি, আরবি তিনটে ভাষাতেই ফড়ফড় করে কথা বলছিল।

এখন আমরা সুয়েজ খাল দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাঁ দিক দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছিল। খাল এতটা চওড়া ছিল না যে দুটো জাহাজ পাশাপাশি চলতে পারে। এই জন্য একটু দূরে দূরে চওড়া পুকুরের মত বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের বাঁ দিক দিয়ে রেলের রাস্তাও চলছিল, ১২ ঘণ্টা পর আমরা রাত ৮টার সময় পোর্টসঈদ পৌঁছলাম। ১৩ ফ্রাঙ্ক দিয়ে আমরা নৌকা করে তীরে নামলাম, আর শহর দেখতে গেলাম। পথপ্রদর্শক তো বেনারসের পাণ্ডাদের মত পিছনে লেগেছিল, আর ভাষা থেকে মনে হচ্ছিল দুনিয়ার কোনো ভাষাকেই বোধহয় ওরা ছাড়েনি। শহর তেমনই ছিল, যেমন আজকাল শহর হয়ে থাকে। পোর্টসঈদে সিন্ধী ব্যবসায়ীদের তিনটে দোকান ছিল। ওখানে জানলাম যে কাহিরা,

ইস্মাইলিয়া, স্বেরসকন্দরিয়া প্রভৃতি মিশরের অন্যান্য শহরেও ভারতীয়দের দোকান আছে। হিন্দুরা তো দোকানদারী করে, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা বিশেষ করে পাঞ্জাবিরা জ্যোতিষী আর হাত দেখার প্রচণ্ড ব্যবসা করে। ৫০ থেকে বেশি ভারতীয় জ্যোতিষী তো শুধুমাত্র পোর্টসঈদে আছে। আমরা বালুরামজীর দোকানে গেলাম। ভারতীয় যাত্রীরা পোর্টসঈদ হয়ে রোজই যাচ্ছে আসছে, কিন্তু পোর্টসঈদ হলুদ কাপড় পরা ভিক্ষুদের খুব কমই দেখে থাকবে। যেখানে ২২০০ বছর আগে মিশরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিহার ছিল না। সিকন্দরিয়া প্রভৃতি জায়গায় তাঁদের বিহার ছিল। আর এখানকার ভিক্ষুদের আমরা সিংহল আর ভারত পর্যন্ত যেতে দেখি।

রাত ১১টার সময় আমরা ফিরলাম। আমাদের সহযাত্রীরা নিজের নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। স্ত্রী-পুরুষদের নগ্ন বীভৎস ফটো ওখানে খুব বিক্রি হচ্ছিল। তিনটে মহাদ্বীপের মধ্যে পোর্টসঈদে দেহপসারিণীদের হাট আছে। এক ভদ্রলোককে তো পথপ্রদর্শক ঘোরাতে ঘোরাতে ওখান পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল।

রাতেই আমাদের জাহাজ চলতে শুরু করল। এখন আমরা ভূমধ্যসাগর দিয়ে যাচ্ছিলাম। সমুদ্র একটু একটু দুলছিল। পোর্টসঈদ থেকে অনেক নতুন যাত্রী জাহাজে উঠেছিলেন, তাদের মধ্যে কিছু ইহুদীও ছিলেন। আমাদের দিকে প্রতিটি নতুন আগন্তুকের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া জরুরি ছিল। আমরাও উৎসুক ছিলাম, কারণ এখন আমরা ইউরোপের সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছিলাম। চতুর্দশ সাল পর্যন্ত ইউরোপকে বর্বর মনে করা হত। এক ইটালিয়ান বিদ্বান নিজের দেশবাসীদেরকে এই নিয়ে ধমক দিচ্ছিলেন যে, তারা কেন আরবদের সর্বগুণসাগর ও দেবতাতুল্য মনে করে। কিন্তু আজ ৬০০ বছর পর পাশা উল্টে গেছে। ২২০০ বছর আগেও অশোকের সময় বৌদ্ধ ভিক্ষু মকদুনিয়া এবং অন্যান্যরা ইউরোপীয় সভ্য দেশে ধর্ম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন। আমরা দুজনও ঐ কাজের জন্য ইউরোপ যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাদের অতটা আত্মবিশ্বাস ছিল না। আমাদের পূর্বজদের কাছে অন্য দেশগুলোকে দেবার জন্য উচ্চ ভাবনা ছিল—শুধু ধর্ম-দর্শনেরই নয়, কলা, বিজ্ঞানেরও।

২০ জুলাই সাড়ে দশটার সময় ক্রেত দ্বীপ, দেখা যেতে লাগল। ভারত আর মিশরের মত ক্রেত দ্বীপেও মানব সভ্যতা সব থেকে প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল। এখন এটা শুক্‌নো পাহাড়ের দ্বীপ যুনানের অধীন, তাও ভূমধ্যসাগরে ওটা সৈনিক মাহাত্ম্যের দ্বীপও বটে।

বলেছি লোহিত সাগরে গরমের চোটে আমি ঘেমে একসা হয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন আবহাওয়া খুব ভাল ছিল। ২১ তারিখ ভোর ৫টার সময় আমরা প্রথম ইউরোপের ভূখণ্ড দেখলাম। ডান দিকে ইতালীর ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। যার উপর সব জায়গায় গ্রাম গড়ে উঠেছে দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ের গায়েও বাগান লাগালাগি হয়েছিল, দূর থেকে মসীনা শহরকে সারিবদ্ধভাবে তৈরি বাচ্চাদের ছোট ছোট খেলার ঘরের মত মনে হচ্ছিল, তার সোজা সোজা রাস্তাগুলো মনে হচ্ছিল সরু রেখার মতো। বাঁ দিকের একটা পাহাড় দেখিয়ে আমার এক সহযাত্রী বলল, এটাই সিসিলির এট্‌না আগ্নেয়গিরি। মাত্র ক-বছর আগে এটা জেগেছিল এবং নিজের মুখ দিয়ে ধোঁয়া আর অঙ্গার বের করছিল। সিসিলি

দ্বীপের গ্রাম আর শহরও ইতালির মতনই মনে হচ্ছে। এক জায়গায়, যেখান থেকে আমাদের জাহাজ পার হল, দ্বীপ আর মহাদ্বীপ একে অন্যের খুব কাছে এসে গিয়েছিল। রাত ৮টা নাগাদ আমরা হঠাৎ ইউরোপ মহাদ্বীপের মাটি দেখতে থাকলাম। ৫টা থেকে জোরে হাওয়া বইতে শুরু করে, তাতে ঠাণ্ডা বেড়ে গেল, ৮টার কাছাকাছি সময়ে সূর্য ডুবে গিয়েছিল। এখন কেবিনে পাখা চালানোর দরকার ছিল না।

২২ তারিখেও আমরা ইউরোপ দেখতে দেখতে এগোচ্ছিলাম। সারদীনিয়া আর কারসীকা দ্বীপ আমার বাঁ দিকে দেখা যাচ্ছিল। নেপোলিয়ান এই কারসীকাতে জন্মেছিলেন। গ্রীক যুবকটি বলল—আমি নেপোলিয়নকে পছন্দ করি না, কারণ ও যুদ্ধপ্রেমী ছিল। ফিলিস্তিন থেকে এক ইহুদী ভদ্রলোকও ইউরোপ যাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, ওখানে দু-লাখ ইহুদী আছে। এছাড়া সবাই আরবের, যাদের মধ্যে বেশির ভাগ হল মুসলমান, কিছু খ্রীস্টান আর একদল তৃতীয় একটা ধর্মের মতাবলম্বীও আছে, যারা শূয়োরের মাংস ও মদ খায় না এবং তিনটে ধর্মকে সমান জ্ঞান করে। ঐদিন (২২ জুলাই) রাতে জাহাজের স্টুয়ার্ড আমাদের পাসপোর্ট নিয়ে নেন। পরের দিন আমাদের মার্সাই (মারসেল) পৌছনোর ছিল। আমরা স্থলভূমির রাস্তা দিয়ে ফ্রান্স পার হতে চাইছিলাম। বাক্স-প্যাটরা সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা অর্থহীন, তাই জাহাজেই সেগুলোকে লন্ডন যাবার জন্য ছেড়ে দিলাম।

ফ্রান্সে—দুপুরের আগেই আমরা মার্সাই-এর বন্দরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। দুপুরের খাওযাটা জাহাজেই সেরে নিয়ে তীরে গেলাম। তীরে প্রথম থেকেই নারী-পুরুষের ভিড় লেগেছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকের হাতে রুমাল নড়ছিল। আমাদের জাহাজে তাঁদের অনেকের আত্মীয়রা আসছিলেন। ইউরোপের মাটিকে দেখে প্রথম ঔৎসুক্য তো শান্ত হয়ে গেল, কিন্তু এখন সেই মাটিতে পা রাখলাম। যখন আমাদের পা তীরের দিকে এগোচ্ছিল, আমাদের মনে না-জানি কত রকমের ভাব জেগে উঠছিল। টমাস কুকেব লোকেরা মালপত্রের জিম্মা নিয়ে নিয়েছিল।

প্যারিসেব রেল এখন ৮ ঘণ্টা পর ছাড়ার ছিল, এই সময়টা আমাদের সদ্ব্যবহার করবার ছিল। টমাস কুকের অফিসে গিয়ে ফ্রান্সে খরচ করবার জন্য আমরা সোওয়া এগারোশো ফ্রাঙ্ক ভাঙালাম। ঐ সময় এক টাকায় প্রায় সাতটা ফ্রাঙ্ক পাওয়া যেত। কুড়ি-কুড়ি ফ্রাঙ্ক দিয়ে আমরা শহর দেখানোর মোটরে চড়লাম, একটা বড় গীর্জা প্রথমে দেখতে গেলাম। ওখানে অনেক সুন্দর মূর্তি আর শিল্পসম্মত সজ্জা ছিল। পথে দুর্গ পাওয়া গেল, তারপর জন-উদ্যান দেখলাম। আর পাহাড়ের ধারে পৌঁছে বৈদ্যুতিক সিঁড়ি দিয়ে নোত্রদম নামের বিখ্যাত গীর্জাটা দেখতে গেলাম। উপর থেকে পুরো নগর দেখা যাচ্ছিল, ওখানে শিশু যীশুকে নিয়ে মেরীর মূর্তি ছিল। এই দেবী সারা ফ্রান্সে এবং সম্ভবত ইউরোপেও খুব জাগ্রত বলে মানা হয়। কয়েক'শ বছর ধরে ইনি নিজের অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি জায়গার ভক্তদের রক্ষা করেছেন। দূরে সমুদ্রে কোনো জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল। আরোহীরা ত্রাহি-ত্রাহি করে মার্সাই-এর দেবীকে ডাকে আর তিনি তাদের রক্ষা

করেন। এই রকম কৃতজ্ঞ মানুষেরা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মন্দিরে অনেক রকমের লেখা লিখে রেখেছে। মা না জানি কত কোটি অন্ধকে চোখ দিয়েছেন, কত পঙ্গুকে পা দিয়েছেন, তার প্রমাণস্বরূপ পঙ্গু, খোঁড়াদের নানারকম ছবি মন্দিরে টাঙানো আছে। মায়ের ক্ষমতার প্রমাণপত্র বড়লোকেরা দিয়েছে, যার মধ্যে ইংল্যান্ডের রাজমাতাও আছেন। কে বলে খ্রীস্টানদের মধ্যে কামাক্ষ্যা মা, বিন্ধ্যবাসিনী ভবানী আর মহাকালীর অভাব আছে। আমার অবশ্যই এর জন্য দুঃখ হল যে, আমার এখন আর সেই হিন্দু-হৃদয় নেই যে এই কাহিনীগুলো বিশ্বাস করব।

উপর থেকে নেমে আমরা নিচে এলাম। তারপর সমুদ্রের তীরে উঁচু-নিচু পাহাড়ী জমির উপর ৮ লাখ মানুষের বসতি মার্সাই শহর দেখলাম, ঘোড়দৌড়, ময়দান, জাদুঘর, হাজারো রকমের গোলাপের বাগান, আরো কত জিনিস দেখে টমাসকুকের কাছে গেলাম। ৩৭৫ ফ্রাঙ্ক দিয়ে লন্ডন পর্যন্ত টিকিট কাটলাম। আমরা একটা রেস্তোরাঁতে চা খেতে গেলাম। মিষ্টার ল্যু পেচ্ছাপ করতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে বলতে লাগলেন—'অবাক কাণ্ড, এরা পেচ্ছাপের জন্যও পয়সা নেয়।' তিন ফ্রাঙ্ক (৭ আনা) তাঁকে মূত্র-শুল্ক দিতে হয়েছিল।

৮টার সময় আমাদের ট্রেন রওনা হয়, আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলাম কিন্তু এখানকার তৃতীয় শ্রেণী ভারতবর্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমান। যদি কোনো কিছু খারাপ থাকে তো, তা হল এখানকার পায়খানা অত পরিষ্কার নয়। ৯টার পর অন্ধকার হতে লাগল। আমি ফ্রান্সের গ্রাম দেখছিলাম। ঘর ছোট ছোট কিন্তু দেখতে খুব পরিষ্কার ছিল। জমি সব পাহাড়ী। জেতুন আর অন্যান্য গাছের বাগান ছিল যেখানে-সেখানে। ঘাসের ডাঁই খুব কায়দা করে সারি সারি রাখা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত আমরা গৌরাঙ্গকে প্রভু রূপে পূব দেশে দেখেছিলাম, আর তিনি লক্ষ লক্ষ সমুদ্রে একটি ফোঁটার মত ছিলেন। এখন এখানে আমরা নিজেদেরকে লক্ষ লক্ষ সমুদ্রে একটি ফোঁটার মত মনে করছি। আমাদের কামরাতে দুজন স্ত্রীলোকও ছিলেন। একে তো এমনিতেই আমাদের রঙ কিছুটা কৌতূহল জাগাতো, কিন্তু তাঁরা দেখছিলেন দুটি মুণ্ডিত মস্তকের হলুদ কাপড়ে ঢাকা চেহারা। ওদের দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারছিলাম ওরা আশ্চর্য হয়ে গেছে। এদিকের স্টেশনগুলোতে সব জায়গায় খাবার-টাবার পাওয়া যায় না, আমরা দেখছিলাম যাত্রীরা নিজেদের সঙ্গে বোতলে করে জলও নিয়েছিল।

রাত ৯টায় সূর্যাস্ত হয়েছিল। ২৪ জুলাই আমি পাঁচটা বাজার আগেই সূর্যকে উঠতে দেখেছি। ৮ ঘন্টার রাত আর ১৬ ঘন্টার দিন, আর এখন জুলাই মাস। নয়টার সময় আমাদের গাড়ি গর্-দ-লিয়ো নামে প্যারিসের স্টেশনে পৌছায়। মানিকলালজী লংকাতেই নিজের ভাই-এর ঠিকানা দিয়েছিলেন আর আমি মার্সাই থেকে তাঁকে তারও করে দিয়েছিলাম। স্টেশনে অম্বালালজী উপস্থিত ছিলেন। গাড়ি করে তিনি আমাদের একটা হোটেলে নিয়ে গেলেন। ওখানে দুটো ঘর আমাদের জন্য ঠিক করে রেখেছিলেন। ইউরোপে যাত্রীদের গায়ে দেবার ও বিছানার—এই দুটো জিনিসের প্রয়োজন হয় না। এই সব জিনিস হোটেল থেকেই পাওয়া যায়। আমাদের ঘরের মধ্যে খাট, চেয়ার, বড় আয়না দেওয়া একটা আলমারী, দুটো বিদ্যুতের আলো ছিল, পাশেই পায়খানা ও স্নানের ঘর

ছিল। তাতে ঠাণ্ডা আর গরম জলের কল লাগানো ছিল। অম্বালাল আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা করে ৪টের সময় আসবেন বলে চলে গেলেন। আমরা স্নান-খাওয়া করে বিশ্রাম করলাম।

৪টের সময় অম্বালালজী আমাদের শহর দেখাতে নিয়ে যান। আমাদের কাছে প্যারিস শহর ছিল মজার ব্যাপার আর অন্যদের কাছে আমরা ছিলাম মজার ব্যাপার। এর মধ্য দিয়ে এ কথার সত্যতা প্রমাণ হচ্ছিল যে 'যেমন দেশ তেমন বেশ'। রাস্তায় শ্রী সি· এ·নাইডুকেও সঙ্গে নিলেন। প্যারিসে থাকেন লুন্দুয়রী নামের আমেরিকান মহিলার ঠিকানা আমি জানতাম, তিনি বৌদ্ধধর্মে খুব অনুরাগী ছিলেন। নাইডু আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি ওখানে ছিলেন না। প্যারিস শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে সেইন নদী বয়ে যাচ্ছে। সেইন পেরিয়ে আমরা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাস দেখলাম, পাশেই একটা খুব বড় বাগান ছিল, কত পুরুষ-মহিলা ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর কতজন চেয়ারে বসেছিল। এশিয়ার তুলনায় অবশ্যই এখানকার মানুষ অনেক স্বাধীন। তারপর আমরা আইফেল টাওয়ারে উঠলাম। এর লোহার কাঠামোটা কুতুব মিনারের চেয়েও তিনগুণ উঁচু। উপর থেকে পুরো প্যারিস শহরটা দেখা যায়। ঐদিনই প্রতিনিধি (প্রজাতন্ত্র) ভবন, নেপোলিয়নের সমাধি আর পুরনো রাজমহল দেখলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমরা সেই জায়গায় নেমে পড়লাম, যেখানে মিশর থেকে আনা বিশাল পাথরের স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ফ্রান্সের ৮টি নগরের প্রতীকস্বরূপ ৮টি মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। পাশের বিশাল উদ্যানে গেলাম, এখানেও কত সুন্দর সব মূর্তি রয়েছে। আমবা এক জায়গায় চেয়ারে বসে বাগানের শোভা দেখছিলাম। কত নগরবাসীও নিজেদের চিত্তবিনোদন করছিল। রাতে ৯টার সময় ফিরে আমরা নিজের হোটেলে এলাম। এখন আরো দুদিন (২৫, ২৬ জুলাই) আমাদের প্যারিসে থাকবার ছিল। আমরা এখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গেও দেখা করতে চাইছিলাম। জানতে পারলাম যে প্রফেসর মেলবেন লেবী এবং অপর একজন প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদ গ্রীষ্মের ছুটিতে শহরের বাইরে গিয়েছেন। ফোন করে জানলাম যে ডক্টর পেলিয়ো (পেইয়ো) বাড়িতেই আছেন। সাড়ে তিনটের সময় আমরা তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। ডক্টর পেলিয়ো চীনা ভাষার বিরাট পণ্ডিত। মধ্য এশিয়ার অনুসন্ধান করতে স্টাইনের মত ইনিও বহু কাজ করেছেন। আমি তাঁকে আমার সম্পাদিত 'অভিধর্মকোষে'র একটা কপি উপহার দিলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা কথা বলতে থাকলাম। তিনি বললেন যে, শীতের সময় সমস্ত পণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন, ঐ সময় নিশ্চয়ই আসবেন। নিচে নামবার পর অম্বালালজী ট্যাক্সি দেখতে গেলেন, আর আমরা দুজন এক বৃদ্ধার পাশে বসে পড়লাম। চুপচাপ বসে থাকবার চেয়ে কিছু কথা বলা ভালো, এই জন্য আমি নিজের ফরাসি জ্ঞানের পরিচয় দিতে শুরু করলাম, কিন্তু এক-আধ মিনিটের মধ্যে গাড়ি আটকে গেল। আমি বৃদ্ধাকে তাঁর ছেলে-পিলের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বৃদ্ধা জবাব দিল—'জ স্বি-তু সেল্।' (আমি একেবারে নিঃসঙ্গ, কুমারী)। অন্য শব্দের অর্থ তো আমি বুঝতে পারলাম, কিন্তু শেষ শব্দটার অর্থ আমার জানা ছিল না, তাই কিছু বুঝতে পারলাম না। বস্তুত, ভাষা শেখবার ভালো উপায় বই নয়, কথাবার্তা বলা, বই পড়ুয়াদের মনোযোগ বেশি থাকে অক্ষরের দিকে, শব্দের উচ্চারণের দিকে নয়।

আজকে আমরা সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল অট্টালিকাগুলো দেখলাম। এর নাট্যশালাতে যে সব বিদ্বানেরা গত কয়েক শতাব্দী থেকে অধ্যাপনা করেছেন তাঁদের ছবি টাঙানো ছিল। এখানে পণ্ডিচেরীর দুজন তরুণ ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল। তারপর পুস্তক বিক্রেতাদের দোকানের দিকে গেলাম। আমার কিছু বই নেওয়ার ছিল, কিন্তু ওখানে জানলাম যে, প্যারিসের প্রকাশক এবং বিক্রেতারা শুধুমাত্র নিজের নিজের বিষয়ের বই রাখে। আমার যে সব বই-এর দরকার ছিল সেগুলো ছিল সাহিত্য সম্পর্কিত। লারুস-এর কাছ থেকে আমার নিজের বইগুলো পেলাম। পাশেই হেরমান কোম্পানির দোকান ছিল। যদিও সেটা বিজ্ঞানের বই-এর প্রকাশক, কিন্তু কোম্পানির মালিক মেশিয়ো ফ্রেমান ভারতে দেড় বৎসর থেকে এসেছেন এবং ভারতীয়দের খুব ভালোবাসেন। তিনি অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। অনেক ভারতীয় বন্ধুর কথা তাঁর মনে পড়ছিল। তাঁর কাছ থেকেই আমি ডক্টর বদ্রীনাথ প্রসাদের প্রতিভার প্রশংসা শুনেছিলাম। তিনি বলছিলেন যে, ডক্টর প্রসাদের অধ্যাপক তাঁর গণিতের জ্ঞানের খুব প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য খুব আশা রাখেন। তিনি ডক্টর প্রসাদের নিবন্ধের একটা কপি আমাকে দেন। ডক্টর বদ্রীনাথ নিজের নিবন্ধ নিজের বড় ভাই বৈজনাথ প্রসাদকে উৎসর্গ করেছিলেন। ফ্রেমান বলেছিলেন তিনি এলাহাবাদের লোক। আমি তখন জানতাম না যে ডক্টর বদ্রীনাথ আমার নিজের তহসীল মহম্মদাবাদ (আজমগড়)-এর সুপরিচিত বাবু বৈজনাথপ্রসাদের ছোট ভাই। তখন কি জানতাম যে, পরে ডক্টর বদ্রীনাথ প্রসাদ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হবেন। আটটার সময় আমরা হোটেলে ফিরলাম, আমি হোটেল পরিচালিকাকে কোনো সমাজবাদী পত্রিকা আনিয়ে দেবার জন্য বললাম। সে 'লা পপুলার'-এর এক কপি আনিয়ে দেয়। আমি এও দেখলাম যে, ওখানকার পত্রিকা আমাদের এখানকার ইংরিজি পত্রিকার চেয়ে কম পৃষ্ঠার হয়ে থাকে।

পরের দিন (২৬ জুলাই) বারটার পর আমরা আবার ঘোরার জন্য বের হলাম। আজকেও মোশিয়ো ফ্রেমানের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হচ্ছিল। শহর দেখবার জন্য আমরা ট্যাক্সি করেছিলাম, কিন্তু কিছুদূর ভূগর্ভ রেলেও গেছি। এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন উপলব্ধি। ওপরে প্যারিস শহর, আর কয়েকশ হাত নিচে সুড়ঙ্গের জাল বিছানো রয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের রেলগাড়ি সব দৌড়াচ্ছে, ১·১৫ ফ্রাঙ্ক দিয়ে দেবার পর আপনি শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের যে কোনো জায়গায় নেমে যেতে পারেন।

সন্ধের সময় ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি হয়েছিল।

ইউরোপে থাকবার জায়গাকে হোটেল বলে, খাবার জায়গা বা রেস্তোরাঁ আলাদা জিনিস। আমাদের হোটেলের পাশে একটা রেস্তোরাঁ ছিল, সেখান থেকে আমাদের জন্য খাবার চলে আসত। ভিক্ষু-নিয়ম অনুসারে আমরা দুপুরের পর খেতে পারি না। এতে কিছু সাশ্রয়ও হত। ২৭ জুলাই আমরা কাছেই এক মিশরীয় রেস্তোরাঁতে খেতে গেলাম। আনন্দজী তো ফলাহারী ছিলেন, সেজন্য তিনি মাংস ছুঁলেন না। কিন্তু খাবার দাম হিসেব করতে গিয়ে আমার যদি তিন টাকা খরচ হয়েছিল তো তাঁর হয়েছিল সাড়ে তিনটাকা (২৫ ফ্রাঙ্ক)। এজন্য বলতে পারেন যে ইউরোপে নিরামিষ খাবারের চেয়ে আমিষ সস্তা। ঐদিন

আমরা অম্বালাল ভাই-এর জহুরী পার্টনার (ভাগীদার) ইহুদী শেঠের বাড়িও গিয়েছিলাম। শেঠ শহরের বাইরে তাঁর বাগানে আমায় নিমন্ত্রণ জানালো, কিন্তু আমাদের তো ঐদিনই প্যারিস ছাড়ার ছিল।

৩টে বেজে ১০ মিনিটের সময় আমরা ট্রেনে প্যারিস ছাড়লাম। তারপর রাস্তায় গ্রামের দৃশ্য ছিল। মাটি উঁচু-নিচু ছিল, এই সময় গমের খেত কাটা হচ্ছিল। অনেক চাষী নিজের খেতের যন্ত্র দিয়ে কাটছিল, অনেকে কাস্তে দিয়ে। চাষীদের ঘোড়াগুলো বড় বড় ছিল। গরুগুলোও ভালো ছিল। গ্রামের লোকেদের ঘড়ি বাঁধার প্রয়োজন ছিল না, কারণ প্রত্যেক গ্রামে গীর্জা ছিল আর প্রত্যেক গীর্জায় ঘড়ি লাগান ছিল। ৭টার সময় আমরা বোলোয়ঁ জংশনে পৌছাই। কুলিকে ৫ ফ্রাঙ্ক দিলাম। আমরা অন্য একটা গাড়ি পেলাম, যেটা একটু দূর গিয়েই সামনের বন্দরে পৌছে দিল।

সরকারি অফিসাররা আমাদের পাসপোর্ট দেখল। লোকেরা একজনের পর আরেকজন সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। এখন আমরা ইংলিশ চ্যানেলের জাহাজে যাত্রী হয়ে গেছিলাম।

ইংল্যান্ড আর ইউরোপে

সমুদ্র আজ খুব তরঙ্গায়িত ছিল। আমরা দুজন প্রথম শ্রেণীর ঘরে বসেছিলাম। এদিক-ওদিক দেখলাম কিন্তু ওখানে কোনো পাত্র দেখতে পেলাম না। আমি ঘাবড়ে গেলাম যদি কোথাও বমি হতে থাকে, তাহলে? আমার নিজের জন্য নয়, আনন্দজীর জন্য ভয় ছিল, তিনি সামুদ্রিক সংঘর্ষে নিজেকে খুব বাহাদুর প্রমাণ করেছিলেন, আমি দুনিয়ার ছেষট্টি কোটি দেবতাকে স্মরণ করছিলাম, যাতে কোনও ভাবে এই জলরাশি পেরিয়ে ওপারে নামতে পারি। রাস্তা তো দেড় ঘণ্টারই ছিল। যাই হোক্ দেবতারা প্রার্থনা শুনেছিলেন, আমরা ওপারে পৌছে গেলাম। এক ইংরেজ কুলি মাল-পত্র তোলার জন্য এল। আমাদের কাছে যা কিছু মালপত্র ছিল ওর দায়িত্বে দিলাম। পাসপোর্ট দেখালাম আর লন্ডন যাবার রেলে বসে পড়লাম।

লন্ডনে—১০টা বেজে ৫০ মিনিটে আমাদের গাড়ি ভিক্টোরিয়া স্টেশন পৌছাল। মহাবোধি সভার প্রতিনিধি দয়া হেওয়াবিতারণে প্রভৃতি স্টেশনে পৌছে গিয়েছিলেন। রাত ছিল, কিন্তু বিদ্যুতের আলোতে লন্ডনের রাস্তা ঝলমল করছিল। আমরা মোটরে মহাবোধি সভা-ভবনে গেলাম। রাতে পা ছড়িয়ে খুব ঘুম দিলাম।

অনাগরিক ধর্মপাল যখন নবযুবক ছিলেন, তখন থেকেই লংকাতে বসে বসে বিদেশে

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের স্বপ্ন দেখতেন। যৌবনেই তিনি ভারতে চলে এসেছিলেন, আর তাঁর প্রায় সারা জীবন এখানেই কাটে। তিনি এই কাজের জন্য মহাবোধি সভা গঠন করেছিলেন। কলম্বো, কলকাতা, সারনাথ ইত্যাদি জায়গায় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে ইংরেজদের কাছেও বুদ্ধের বাণী পৌঁছান যাক। লন্ডনে রিজেন্ট পার্কের পাশে এক লাখের বেশি দিয়ে তিনি এই চারতলা বাড়ি কিনেছিলেন আর এখন এটাই ছিল বিলেতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র। আমি আগেই লিখেছিলাম যে প্রচারক হয়ে এসেছিলেন ভিক্ষু আনন্দ, আর আমি একজন বন্ধু হয়ে তাঁকে সঙ্গ দেবার জন্য এসেছিলাম।

আমাদের থাকবার জায়গা ছিল দোতলার একটা বড় ঘরে। এই বাড়িটার প্রায় সব ঘরই ছিল বড় বড়। সব থেকে নিচে, মানে মাটির নিচে রান্নাঘর আর কিছু ছোট ছোট কুঠরী ছিল। তার উপরে অর্থাৎ একতলায় মন্দির, বক্তৃতার ঘর, গ্রন্থাগার, আর অফিসের ঘর ছিল। তার উপরের তলায় আমাদের ঘর, আর কিছু অন্য ঘরও ছিল, যাতে ভারতীয় তথা সিংহলি বিদ্যার্থীরা থাকত। এইভাবে সব থেকে ওপরের তলার ঘরেও ছাত্ররা থাকত। এটা আমার কাছে অবশ্যই খটকা লেগেছিল যে, বৌদ্ধধর্মকে যদি ইংল্যান্ডবাসীদের ধর্ম হতে হয়, তবে তাকে ইংল্যান্ডের পরিবেশে রাখা উচিত, কিন্তু এখানে ধর্ম প্রচারের জন্য যে ভিক্ষু এসেছিলেন, তিনি নিজের সঙ্গে লংকার পরিবেশ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর রাঁধুনী লংকাবাসী, খাওয়া লংকার মত এবং সঙ্গে থাকার ছাত্ররাও সব লংকারই, এই অবস্থায় তিনি কিভাবে ইংল্যান্ডবাসীদের সঙ্গে মিশতে পারতেন? যাইহোক, আমি ধর্ম-প্রচারের দৃষ্টিতে তো সেখানে যাইনি, তবে মহাবোধি সভার পরিচালক আমাকে এই ব্যাপারে কিছু মতামত জিজ্ঞাসা করছিলেন।

পরের দিন (২৮ জুলাই) ইংল্যান্ডের কিছু বড় পত্রিকার সাংবাদিক আমার কাছে আসেন। তাঁরা উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তার জবাব দিয়ে দিলাম। এটাই ছিল ইংরেজি পত্রিকা সম্পর্কে আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। ভারতীয় পত্র-পত্রিকার সত্যি-মিথ্যে দেখে কিছুটা শঙ্কিত হয়েছিলাম। কিন্তু পরে যা অভিজ্ঞতা হল, তাতে জানা গেল যে কালোকে সাদা আর সাদাকে কালো করবার যত ক্ষমতা ইংল্যান্ডের পত্রিকাগুলোর আছে, ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের পত্রিকার এখনও অনেক দিন লাগবে। মজদুর পার্টির পত্রিকা 'ডেইলী হেরাল্ড'—যা সেই সময় ইংল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি ছাপা হওয়া পত্রিকাগুলোর একটি ছিল, তার প্রতিনিধি এসে আমাদেরকে কিছু প্রশ্ন করল। আমরা সহজ-সরল কথায় উত্তর দিলাম যে, আমরা ইংল্যান্ডবাসীদের সামনে বুদ্ধের শিক্ষা হাজির করতে চাই। ওরা ছাপিয়ে দিল যে এই দুই বৌদ্ধ ভিক্ষু সমস্ত ইংল্যান্ডকে বৌদ্ধ বানানোর কথা ভাবছে। 'ডেইলী মেলের' সাংবাদিক আসে, সে আমাকে তিব্বত যাত্রার দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করে। আমি সাধারণভাবে জানিয়ে দিলাম। সে লিখে দিল, এই ভিক্ষু দুনিয়ার বড় বড় গভীর দুর্গম জঙ্গলে বহুবছর কাটিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো জন্তু ওর ক্ষতি করতে পারেনি। একদিন ভিক্ষু তিব্বতের একটা গভীর জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিল (ন্যাড়া পাহাড়ের দেশ তিব্বতে গভীর জঙ্গল একেবারেই নেই) ঐ সময় ৬-৭ জন ডাকাত এসে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে, তারা তরোয়াল চালাতে যাচ্ছিল, এমন সময় জঙ্গল থেকে

বাঘ বেরিয়ে আসে, সে গর্জন করে ওঠে। ডাকাতরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। সম্পাদকীয় বিভাগের পাঠানো টাইপ করা কপি আমার কাছে দেখার জন্য আসে। আমি মিথ্যে কথাগুলো কেটে দিই, কিন্তু পরের দিন দেখি আমার কেটে দেওয়া পাতাগুলো যেমনটা তেমনই ছাপা হয়েছে। আখেরে এর উদ্দেশ্য কি হতে পারে? বুদ্ধিমানদের মনে এই কথা ঢুকিয়ে দেওয়া যে এ কত বড় মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ লোক, আর নির্বোধদের মনে এই কথা ঢুকিয়ে দেওয়া যে এই লোকটি দিব্যশক্তিসম্পন্ন এবং যে আন্দোলনকারী যুবক ধনীদের নির্মূল করবার জন্য বলে বেড়ায় যে ধর্ম, দিব্যশক্তি এ সব কথা মিথ্যে, সে মিথ্যেবাদী।

বিলেতে কোটিপতি ছাড়া অন্য কেউ খবরের কাগজ বের করতে পারে না। ওদের কাজ হল চিনি মাখানো বিষের বড়ি লোককে খাওয়ানো। ল্যু মহাশয় তো আরো বাজেভাবে ফেঁসে গেলেন। তিনি এখন ইউরোপে ছিলেন, কয়েক দিন পরে লন্ডনে আসবার কথা ছিল। এক সাংবাদিক আমাকে খুব করে মিনতি করেছিল, ল্যু এলে আমাকেই প্রথম খবরটা দেবেন যাতে আমি প্রথমে খবরের কাগজে দিতে পারি। মিঃ ল্যু এলেন। আমি সাংবাদিকদের খবর দিয়ে দিলাম। সে-সময় মাঞ্চুরিয়াতে এক-জোড়া স্ত্রী-পুরুষ হারিয়ে গিয়েছিল। খবরের কাগজে খুব হৈ-চৈ ফেলে দেওয়ার মত খবর ছাপছিল। শ্রী ল্যু ফিরে আসবার পর চীনের বিষয়ে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। শ্রী ল্যু এক ঘণ্টা বসে খুব বোঝানোর চেষ্টা করেন—জাপান যদিও মাঞ্চুরিয়াকে অধিকার করে নিয়েছে, কিন্তু চীনা দেশ-প্রেমিকরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণের বাজী লাগিয়ে রেখেছে। যেখানে ওরা সরাসরি লড়াই করতে পারছে না সেখানে ওরা গেরিলা (ছাপামার) বাহিনীর রূপ নিয়েছে। যেসমস্ত লোকেদেরকে ইংরিজি কাগজে ডাকাত বলছে, তারা বস্তুত দেশভক্ত গেরিলা। তারা ঘন পাহাড়ে থাকে, আর সুযোগ পেলেই জাপানী সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই দুজন ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষকে গেরিলারা কেন ধরে নিয়ে গেছে, এর জবাব মহাশয় ল্যু কিভাবে দিয়েছিলেন তা আমার মনে আছে। হয়তো তিনি বলে থাকবেন যে ওরা জাপানীদের মদত করতে শুরু করেছিল। মাঞ্চুরিয়াকে অধিকার করার কাজে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা অপ্রত্যক্ষভাবে জাপানকে সাহায্য করেই ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যাই হোক, পরের দিন শ্রমিক শ্রেণীর খবরের কাগজ 'ডেইলী হেরাল্ড' (ঐ সময় শ্রমিক শ্রেণীর রেম্জে মেক্ডোনাল্ড ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন) আমি পড়েছিলাম। আর অল্প নয়, প্রায় এক কলাম—চীনের এক বড় ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মিঃ ল্যু আমাদের সংবাদদাতাকে মাঞ্চুরিয়ার এই ডাকাতদের সম্পর্কে বলেছেন যে ওরা যেমন-তেমন ডাকাত নয়, ওদের মধ্যে অদ্ভুত শক্তি আছে, ওদের কাছে এমন সব জড়িবুটি আছে যা কাটা যাওয়া মাথা শরীরের উপর রেখে ঐ বুটি লাগালে জুড়ে যায়। ওরা দূর-দূরান্তের কথা নিজেদের অলৌকিক শক্তি দিয়ে জানতে পারে ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি 'টাইমস্', 'ডেইলী হেরাল্ড 'ডেইলী ওয়ার্কার' এবং আরো কোনো একটা খবরের কাগজ রোজ পড়ে যেতাম। খবরের কাগজের প্রত্যেকটা কলাম তো তখনই পড়া সম্ভব হত, যখন সারাদিন ধরে বসে শুধু খবরের কাগজই পড়তাম। কিছুদিন পর্যন্ত পড়তে থাকার পর কোন কলামগুলো

পড়া উচিত আমার জানা হয়ে গিয়েছিল।

কম্যুনিস্ট পার্টির পত্রিকা আমি অবশ্যই পুরোটা পড়তাম, কারণ ঐ একটা কাগজই সততার সঙ্গে চলছিল। সমস্ত কাগজ ওকে বয়কট করেছিল। বিলেতে যে দোকানগুলোতে খাবার-দাবার জিনিস বিক্রি হয়, খবরের কাগজও সেখান থেকেই আসে। পুঁজিপতিদের খবরের কাগজগুলো (শ্রমিক শ্রেণীর 'ডেইলি হেরাল্ড'এরও অর্ধেকের বেশি অংশ এক কোটিপতির) একভাবে ঠিক করে নিয়েছিল যে, কেউ যদি 'ডেইলী ওয়ার্কার' বেচে, তাকে আমরা আমাদের খবরের কাগজ দেবো না। 'ডেইলী ওয়ার্কারের' প্রত্যেক মাসে কয়েক হাজার টাকা ঘাটতি পড়ত। যেটা ইংল্যান্ডের গরিব লোকেরা চাঁদা দিয়ে পূরণ করত। আমার চলে আসবার কয়েক বছর পর পুঁজিপতি খবরের কাগজগুলোর ষড়যন্ত্র ভেস্তে যায়। বড় পুঁজিপতিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছোট ছোট বিক্রেতাদের সংঘর্ষ করতে হয়েছিল, যে-খবর ছাপাতে 'ডেইলী ওয়ার্কার' ছাড়া অন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। তখনই ছোটখাটো বিক্রেতারা 'ডেইলী ওয়ার্কার'-এর মহত্ত্ব বুঝেছিল। তিন বছর পরে যখন আমি 'ডেইলী ওয়ার্কার' দেখলাম তখন সেটা খুব অলংকৃত হয়ে বড় আকারে বের হচ্ছিল, তার কয়েক লাখ গ্রাহক হয়ে গিয়েছিল। আমি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলাম না। কিন্তু লেনিন, স্তালিনের পার্টি ছেড়ে আমি অন্য কারোর নীতি বা কর্ম-পদ্ধতি পছন্দ করতাম না। আমার যে কোথায় স্থান সেটা বোধ হয় 'বাইশবী সদী' লেখা এবং তারও ছ-বছর আগে রুশ বিপ্লবের প্রতি অগাধ প্রেম আর সহানুভূতিই স্থির করে দিয়েছিল। 'ডেইলী ওয়ার্কার' থেকে আমি যতটা ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে জানতে পারতাম অতটা কোনো পত্রিকা থেকে জানা সম্ভব ছিল না। সেটা রাশিয়ারও টাট্‌কা-টাট্‌কা খবর দিত, আর আমি তার জন্য সবচেয়ে বেশি পিপাসার্ত ছিলাম।

যাই হোক, পরের দিন সন্ধেবেলায় মহাশয় ল্যু খুব উত্তেজিত গলায় বললেন—'আপনি কি আমার বক্তব্য 'ডেইলী হেরাল্ড'-এ পড়েছেন?' আমি বললাম, 'না, কিরকম ছেপেছে?'

মিঃ ল্যু জানালেন যে 'ওটা ছাপা হয়ে গেছে আর খুব যাচ্ছেতাই রকম ছাপা হয়েছে।' আমি খবরের কাগজটা খুঁজে আনলাম। সত্যি সত্যিই তাতে সমস্ত গালমন্দ ছাপিয়েছিল। রাগের চোটে মিঃ ল্যুর কান লাল হয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন যে, আমি এর প্রতিবাদ করব। আমি বললাম—'কেউ ছাপবে তো?' এটা তো নিশ্চিতই ছিল যে ওখানে কেউ সেটা ছাপতো না। এই সমস্ত কাণ্ড ইংল্যান্ডের কোটিপতিদের খবরের কাগজগুলো সম্পর্কে আমাকে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল।

স্কুল, বই-পত্র, খবরের কাগজকে জ্ঞান প্রচারের উপায় বলে ধরা হয়। কিন্তু বিলেতে এদের সবচেয়ে বড় কাজ হল অজ্ঞানতা প্রচার করা। ঘোড়-দৌড়, কুকুরের দৌড়, লটারি ইত্যাদি পঁচিশ রকমের আইনসম্মত জুয়া ওখানে খেলা হয়। কালকে বেকার হয়ে যাওয়ার চিন্তাতে মজুররা পেটের খাবার কেটে এই জুয়াতে নিজেদের পয়সা খরচ করে। বিলেতের খবরের কাগজের কলামের পর কলাম এই বিষয়ের জন্য ছাড়া থাকে। এখন

এমন কি হাত দেখা (সামুদ্রিক), প্রভৃতির জন্যও বিলেতি কাগজ উদারতা দেখাচ্ছে। এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, বিলেতি শ্রমিকরা নিজেকে ভাগ্যের হাতের কাঠের পুতুল মনে করুক আর অপদার্থ কোটিপতিদের দপ্তর উল্টে দিতে প্রস্তুত না হোক। পরের দিন কাগজের প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন তরুণীও ছিল, সে বলল, 'আমি মতিহারীতে জন্মেছি, আর আমার বাবা এখনও সেখানে আছে।'

আমাদের থাকবার জায়গার কাছেই রিজেন্ট-পার্ক নামে বিরাট বাগান ছিল। তার মধ্যে চিড়িয়াখানাও আছে। রাত্তিরে প্রায়ই বাঘের গর্জন আমরা শুনতে পেতাম। কাছেই কোথাও দিয়ে রেল যেত। ট্রেন যাবার সময় মাটি দুলে উঠত আর পুরো বাড়িটা গুম্‌গুম্ করে কেঁপে উঠত। চার মাসে এই কাঁপুনি এত অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে ১৯৩৪-এ যখন ভূমিকম্প হয়েছিল, তখন ঐ সময় এলাহাবাদে বাড়ি কেঁপে ওঠাকে আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐ রকমই কিছু ভেবেছিলাম। আকাশ মেঘে ছেয়ে থাকা তো, মনে হত, লন্ডনের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের ওখানে পৌঁছানোর পর কিছুদিন পর্যন্ত এরকমই ছিল।

৩০ জুলাই আমরা মোটরে করে বেড়াতে বের হলাম। বলাই বাহুল্য, লন্ডনের লোকেরা পীতবস্ত্রধারী আমাদেরকে ততটাই অবাক হয়ে দেখতো যতটা দেখতো প্যারিসের লোকেরা।

রিজেন্ট-পার্ক দেখলাম। ঐ বিশাল উদ্যানে দিনের বেলাতেও কত লোক ঘাসে ঘুমিয়ে থাকত। আমি জিজ্ঞাসা করলে এক বন্ধু জানালো যে এবা হল গৃহহীন, এদের না আছে কোনো কাজ, না খাওয়ার ঠিকানা। রাত্রে পার্ক বন্ধ হয়ে যায়। তাই দিনে-দিনেই ঘুমিয়ে নিচ্ছে। রাতটা এদের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটাতে হয়। আমি ভাবতে লাগলাম—পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ অর্থ নিঙড়ে বিলেতে আসে, শেষ পর্যন্ত তা কোথায় যায় এবং কার কাছে যায়?

বাকিংহাম প্রাসাদ, হাইড পার্ক, কেনসিঙ্টন মিউজিয়াম, পার্লামেন্ট ভবন, ওয়েস্ট মিনিস্টাব এবে, কাউন্টি কাউন্সিল, সেন্ট জেমস প্রাসাদ প্রভৃতি জায়গা আমরা ৩০ জুলাই দেখলাম। হাইড পার্কে কত জায়গায় বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছিল। আর কত জায়গায় লোকে চিত্তবিনোদন করছিল।

মহাবোধি সভাতে প্রত্যেক রবিবার অধিবেশন হত। কখনো কখনো আমিও বলেছি। কিন্তু বক্তৃতা দেবার কাজটা বেশি ছিল, আনন্দজীর। লন্ডনের দিনচর্যা প্রায় একই রকম ছিল : রাত বারোটার পর শুয়ে পড়া. ৭টার সময় ওঠা, ৮টা পর্যন্ত স্নান ও জল-খাবারের ছুটি। সাড়ে নটা পর্যন্ত খবরের কাগজ পড়া, ১০টা পর্যন্ত ডায়েরি, চিঠি লেখা, সাড়ে ১১টা পর্যন্ত পড়াশুনা করা। তারপর খাওয়া, তারপর পড়াশুনো। মাঝখানে যদি কেউ এসে পড়ে তবে তার সঙ্গে কথা বলা, আটটার সময় হাঁটতে যাওয়া, নটার সময় রাতে স্নান করা, আবার রাত বারোটা পর্যন্ত পড়া।

দু-একবার আমরা তরুণ-খ্রীস্ট সভার ভারতীয় ছাত্রাবাসেও গেলাম। সেখানে বেশ কিছু এরকম ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলো, যঁরা পরে আই·সি·এস, ব্যারিস্টার হয়ে ভারতে'

ফিরলো। আরও কত ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতো, যাদের মধ্যে দেশভক্তি ও বিপ্লবের আগুন জ্বলতে দেখা যেত। কিন্তু ভারতে আসার কয়েক বছর পরই তাদেরকে নিস্তেজ দেখা গেল। হয়তো এই ক-বছরে তারা বেশি বোদ্ধা হয়ে গিয়েছিল। আর তারা এটাকে নিজেদের দর্শন বানিয়ে নিয়েছিল যে, টাকা রোজগার কর আর ফূর্তি কর—শহরের দুশ্চিন্তায় কাজীর রোগা হওয়ার দরকার নেই।[১]

দু-একটি খবরের কাগজে আমার দিব্যশক্তির যে খবর বেরিয়েছিল, তার একটি ফল এই হলো যে, ইংল্যান্ডে যেখান-সেখান থেকে যন্ত্র অথবা তাবিজের জন্য আমার কাছে চিঠি এল। সাহেবরা তাগা-তাবিজে বিশ্বাস করে আমার এ-ধারণা তো অনেক আগেই চলে গিয়েছিল। ১৯২৩-এ আমাদের জেলখানার সুপারিনটেন্ডেন্ট এক ইংরেজ ক্যাপ্টেন আই·এম·এস· সেইসময় বন্দী এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে খুব উৎসাহের সঙ্গে তাবিজ চেয়ে নিয়েছিলেন। ৪ আগস্টে এক মহিলা কথা বলতে এল। সে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখতো। স্বপ্নের অদ্ভুত শক্তির প্রতি বিশ্বাস আদিম মানুষদের থেকেই চলে আসছে। আখেবে আমি এখানে এমন ধর্মের প্রচারক হয়ে গিয়েছিলাম, যা ধ্যান-যোগ-সমাধি অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপারকে বিশ্বাস করে, তাহলে আমার কাছে লোকেরা এই ব্যাপারে সাহায্য নিতে কেন আসবে না? এটা স্বপ্নের বিষয়ে কথাবার্তা ছিল, তা না হলে গূঢ় আধ্যাত্মিক সমস্যাব সমাধানের কাজেব দায়িত্ব ছিল আনন্দজীর। জ্যোতিষ, ভূত-প্রেম, তন্তর-মন্তর, তাগা-তাবিজের প্রতি আমার বিশ্বাস আর্যসমাজ চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দিয়েছিল। সীলোন আসাতে বেচারা ঈশ্বরও হাল ছেড়ে দিল। তিব্বত যাওয়ার পর যোগ, ঋদ্ধি-সিদ্ধি আর দিব্যশক্তির ওপর থেকেও আমার বিশ্বাস চলে গেল। তার সমস্ত শক্তি ত্রাটক এবং মেসমেরিজম্-এর কিছু বুজরুকি আর আত্ম-সম্মোহনেব পরিণাম। বস্তুত, এখন আমার এবং ভৌতিকবাদের মধ্যে এইটুকুই তফাৎ রয়ে গিয়েছিল যে, মরণের পরেও আমি জীবনপ্রবাহের অক্ষুণ্ণতায় বিশ্বাস করতাম। বৌদ্ধদের অত্যন্ত প্রিয় সিদ্ধান্ত নির্বাণকে আমি তো আগের থেকেই প্রদীপের মতো নিভে গিয়ে জীবনপ্রবাহের চিরকালের জন্য সমাপ্তি ছাড়া আর কিছু মনে করতাম না। উক্ত মহিলার কখনো কখনো বসে বসেই জ্ঞান হারিয়ে যেত, এটা কোনো মনোবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞের কাজ ছিল। কিন্তু মহিলাটি প্রাচ্যের 'তত্ত্বজ্ঞান'-এর প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়েছিল। সে আমার কাছ থেকে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ শোনার জন্য আসেনি। আমি বললাম, 'যে স্বপ্নগুলো দেখছো সেগুলো লিখে যাও। কয়েকদিনের স্বপ্নের লেখা জমা হয়ে গেলে আমি কিছু পরামর্শ দেব।' সম্ভবত আমার কথাতে তার উৎসাহ বাড়েনি এবং সে পরামর্শ নিতে আর আসেনি।

এখানে আমি থিয়োজফির ওপরে অনেক বই পড়তে পেয়েছিলাম। সিনেট-এর বই 'মহাত্মাদের চিঠি' পড়ে রেগে আগুন হয়ে গেলাম। দিনের আলোয় মিথ্যা এবং বৌদ্ধিক ডাকাতি দেখে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। তিব্বতে সেই সব মহাত্মাদের কেউ জানতো না,

---

[১] *এটি একটি উর্দু লোক-কথা (কাজীজী দুবলে শহরকে অন্দেশে)।*—স·ম·

যাঁদের চিঠি এখানে এক ভদ্রলোক ছেপেছিলেন। মজার ব্যাপার, এই মহাত্মাদের অনেকের বাসস্থান শীগর্চে ইত্যাদি জানানো হয়েছিল। শীগর্চে সম্ভবত সজ্ঞাত তিব্বতের অজ্ঞাত স্থান হওয়াতে বাইরের লোকের চোখে ধুলো দেবার পক্ষে ভালো নাম ছিল। কিন্তু আমি জানতাম, ভারতের হাজারটা মফস্বল শহরের মতো সেটাও একটা মফস্বল শহর। হ্যাঁ, কিছুটা বেশি পিছিয়ে থাকা। থিয়োজফিকে তো আমি ধোঁকাবাজদের একটা দল বলে মনে করতে লাগলাম, যে ধর্মের নামে, পশ্চিমী প্রভাবের নামে মানুষকে উল্লু বানাচ্ছে।

ছটার সময় আমরা হেম্‌পস্টেড-হীথ্‌-এর দিকে বেড়াতে গেলাম। জায়গাটা একটা স্বাভাবিক জঙ্গলের মতো মনে হচ্ছিল। আমাদের থাকার জায়গা থেকে এই জায়গাটা খুব দূরে ছিল না। লন্ডনটাই হচ্ছে বেশির ভাগ অসমতল ভূমির ওপর গড়ে ওঠা, আর এই জায়গাটা তো আরো বেশি উঁচু-নিচু মনে হচ্ছিল। এখান থেকে নগরের শোভা ভালো করে দেখা যেত। সেইদিনই আমরা আর্যভবন দেখতে গেলাম। লন্ডন আসার আগেই খবরের কাগজে পড়েছিলাম যে, ভারতের কয়েকজন কোটিপতি শেঠ লন্ডনে একটা হিন্দুমন্দির বানাচ্ছে। আর্যভবন সেই মন্দির। এখন বস্তুত, মন্দির বানানোর জন্য একটা বাড়ি কেনা হয়েছিল, আর হয়তো ঠাকুরকে তার ভেতরে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। 'হয়তো' এই জন্যে বলছি যে, বহু সপ্তাহ ধরে আর্যভবন শূন্য ছিল আর তার দরজায় তালা লাগানো ছিল। যদি ঠাকুর তার ভেতরেই বন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে বেচারার কী গতি হবে। শুনেছিলাম, আগে এখানে ঠাকুরও ছিল, পূজারীও ছিল। এটা বুঝতে পারিনি যে আরতি করার সময় শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজানোর লোক জমা হয়ে যেত কিনা। যদি সাধারণ জল আর মাছির মাথার মতো পরিমাণ চিনিকে চরণামৃত আর প্রসাদ বলে বিতরণ করা হতো, তাহলে নিশ্চয় প্রসাদ চাওয়ার জন্য ছেলেপুলে এবং ভক্ত পাওয়া যেত না। হ্যাঁ, যদি ঠাকুর লন্ডনে গিয়ে 'যেমন দেশ তেমন বেশ' গ্রহণ করতো, আর সেই অনুসাবে চরণামৃত ও প্রসাদ বিতরণ করা হতো, তাহলে বেশি লাভ হতো। কিন্তু আমাদের কোটিপতি শেঠ সাট্টাখেলায় তার বুদ্ধি দিয়ে ব্রহ্মাকে মাৎ করলেও আরো অনেক ব্যাপারে তারা অতটা ভাগ্যশালী নয়।

যাবার সময় আমরা দেখলাম যে দরজার পাশে কালি লাগানো ছিল। আমি আনন্দজীকে বললাম যে ভগবানও যদি লন্ডনে আসেন তবে ব্যবসায়ীদের পক্ষে কলকাতা আর কাশীর পুরোহিতদের আনানো অসম্ভব হবে না কারণ ওদের শুদ্ধতার মান তো সেই পুরনোই রয়ে গেছে। এখন কত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট আর উকিল ব্যারিস্টার ভক্তির চোটে গদগদ হয়ে গলে যেতে শুরু করেছে। এই সমস্ত লোকেদের লন্ডনে ঠাকুরজীর পূজারী বানিয়ে পাঠানো উচিত।

লন্ডন—আর লন্ডন বলতে যেটা তা হল ইংল্যান্ড। এই লন্ডনকে নিজের নিজের ধর্মে টানবার জন্য কত ধর্মপ্রচারক বল প্রয়োগ করছে। বৌদ্ধধর্মও এ ব্যাপারে কিছুটা তৎপরতা দেখাচ্ছিল, কিন্তু সেই তৎপরতা যে কত হাল্কা ছিল তা এর থেকে বোঝা যায় যে চীন-জাপানের মতো বিশাল বৌদ্ধ দেশও নয়, শ্যামদেশের মতো স্বাধীন রাষ্ট্রও নয়,

বর্মাও নয়, সিংহল—বরং বলা উচিত সিংহলের এক ব্যক্তি লন্ডনে বৌদ্ধধর্মের পতাকা পুঁততে চেয়েছেন। এতে করে বোঝা যাচ্ছিল যে বৌদ্ধরা এই ব্যাপারে গভীর ভাবে উৎসাহী নয়। রোমান ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টান্টরা খ্রীস্টধর্মকে তো, যাই হোক, ইংল্যান্ডকে নিজের বাবার জমিদারী মনে করে, কেননা সেটা ওখানে হাজার-পাঁচশো বছর আগে পৌঁছে গিয়েছিল, ইসলামও নিজেদের মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। প্রথমে দেড় ইটের, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ওটা দেড় লাখ ইটের হবে। ইহুদীরা তো ধর্মকে নিজের রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করে। আর ওদের কত-কত মন্দির আছে। বাকি ছিল হিন্দুধর্ম, এখন তাও ওখানে পৌঁছে গিয়েছে। তবে সম্ভবত, হিন্দু শেঠরা নিজেদের মন্দিরগুলোকে ভারতবর্ষ থেকে আসা-যাওয়া করা শেঠদের ধর্মশালা করাতে চাইছে। ব্যারিস্টার শ্রীচম্পত রায়ও কয়েক বছর ধরে জৈনধর্ম প্রচার করবার জন্য ওখানে গিয়ে পড়েছিলেন, বুড়ো বয়সে তিনি একরকম কাশীবাস করছিলেন। তাঁকে আমার সবচেয়ে খাঁটি আর সিধেসাদা ধর্মপ্রচারক বলে মনে হতো। কিন্তু তাঁর পক্ষে অসুবিধেও ছিল সবচেয়ে বেশি। যে দেশে মাংস নেহাৎই সাধারণ খাদ্য, সেখানে নিরামিষ আহারের উপর সর্বাধিক জোর দেয় যে জৈনধর্ম তার অসুবিধে ছাড়া আর কি হতে পারত। বৌদ্ধরাও অহিংসাকে মানে কিন্তু মাংসকে বর্জন করে না, বরং কিছু ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে তাদের শতকরা একশজনই আমিষাশী। শ্রীচম্পত রায়জী নিজের কাঁদুনী গাইছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে জৈন-ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া কেমন হয়?' উনি বললেন যে এই দেশে নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করা খুব কঠিন। ডিমকেও তো এরা নিরামিষের মধ্যে ধরে নেয়। আমি চেয়েছিলাম, এমন একটা ছাত্রাবাস চালু করা হোক, যেখানে শুদ্ধ সাত্ত্বিক নিরামিষ খাবার পাওয়া যাবে। আমি প্রথমে কিছু জৈন ছাত্রদের দিয়েই শুরু করবার জন্য ওদের মধ্যে থেকে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলি। একজন বলল—আমরা আপনার ছাত্রাবাসে আসতে তো পারতাম, কিন্তু আপনি তো ডিমও খেতে দেবেন না? চম্পত রায়জী হাসতে হাসতে তাঁর কথা শেষ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'যখন তোমারই এই অবস্থা, তখন নিরামিষ ছাত্রাবাস খোলার চেষ্টা করা বৃথা।' ঐ সময় আরো একজন মহাযোগী ও কবি লন্ডনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পদ্ধতি সফল হবার যোগ্য ছিল বেশি, কারণ তিনি যোগ-সমাধি, কৈলাস-মানস সরোবর, সিদ্ধ ও দেবতাদের দর্শনের কথা বেশি বলতেন। যদি এর সঙ্গে ঘোড়-দৌড়ে জিতবে যে ঘোড়া তার নম্বরও বলে দিতেন তবে তো আরো পোয়া বারো হত। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন শিক্ষিতা চিরকুমারী। এটাও সাফল্যের এক চাবিকাঠি ছিল। মুশকিলটা ছিল, হিন্দুধর্ম হল গোলামের ধর্ম। অন্য ধর্ম এটা দাবি করতে পারে যে, যে কয়েকটা দেশ তাদের মানে তারা স্বাধীন দেশ।

লন্ডনে আমি সবসময় মেঘের ঘোরাফেরা দেখতাম। তাতে এটা পরিষ্কার বুঝে যেতে থাকলাম যে কেন লন্ডনবাসীরা সূর্য দেখলে এত আনন্দ করে। লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ম শুধুমাত্র প্রাচীন মূর্তি আর শিল্প-সামগ্রীর ভালো সংগ্রহের জন্যই বিখ্যাত নয়, বরঞ্চ ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে একটা। আর সব দোষের সঙ্গে বই-এর

পোকা হওয়াটাও আমার একটা দুর্গুণ। আমি ওখানে পড়ার জন্য যেতে চাইতাম। ওখানে পড়ুয়াদের জন্য খুব ভালো ব্যবস্থা আছে। সাধারণ পাঠকদের জন্য বসবার বিশেষ জায়গা আছে, আর বিশেষভাবে মনোযোগী ছাত্রদের জন্য আরো ভালো আলাদা ঘর আছে। ডঃ বরনেট ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানের একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আমায় সাহায্য করেন এবং আমার সাধারণের বসবার জায়গা আর ছাত্রদের বসবার জায়গা দুটোতেই বসে পড়বার জন্য অনুমতিপত্র জুটে যায়। ৮ আগস্ট এবং তারপরে অনেকবার আমি বৃটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে যেতাম। যদিও নিজের আর অন্যান্য অসুবিধের জন্য আমি যতটা চাইতাম ওর থেকে ততটা লাভ তুলে নিতে পারতাম না। প্যারিসেও পাতাল রেলে আমি চড়েছিলাম, আর এখানে তো আরো বেশি তার সাহায্য নিতে হত। পাতাল রেলের স্টেশন জমি থেকে কয়েক'শ হাত নিচে হয়, তাড়াতাড়ি ওঠা-নামার জন্য সেখানে বিদ্যুতের সিঁড়ি থাকে। পুরানো জগত থেকে নতুন জগতে আসতে কত যে মাথা চুলকাতে হয়, তা এই সিঁড়িতে ওঠা-নামা করার সময় আমি বুঝতে পারছিলাম। সিঁড়ি বিদ্যুতের জোরে নিজেই সরে যায়। কিন্তু সরে যাওয়া সিঁড়ি আর থেমে থাকা ভূমির একটা সন্ধিস্থল ছিল, যেখানে স্থির থেকে চলতে থাকা সিঁড়িতে পা রাখতে হতো। সিঁড়ি অবিবাম সবে সরে যাচ্ছে, যদি আপনি ডান পাটা রেখে একটুও ভাবতে থাকেন তাহলে বাঁ-পাটা নিজের জায়গায় থেকে যায় আর সিঁড়ি ডান পাটাকে টেনে নিয়ে যায়। এই কারণে এক মুহূর্ত দেরি না করে দ্বিতীয় পাটাও সিঁড়ির উপর রেখে দেওয়া জরুরি। এরপর আরেক অসুবিধে হল, স্থির থেকে চলমান ক্ষেত্রে যাবার পরই আপনাকে আপনার নিজের শরীরের পুরো ভারটা নতুন করে সামলাতে হয়। না সামলালে পড়ে যাবার ভয় আছে, আর শত শত চোখ আপনার পতনের মজা দেখবে, চোট লাগবে সে আলাদা। সিঁড়ির পাশ দিয়ে হাত রাখবার জন্য রেলিং আছে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম রেলিংটা অচল। কিন্তু পরে দেখলাম রেলিংও চলছে। গ্রামের লোকেদের পক্ষে শহরটাই যথেষ্ট হয়রানির কারণ। তার ওপর এশিয়ার শহরের থেকে প্যারিস আর লন্ডনের তফাৎ তো আরো বেশি। আর তাতে এই বিদ্যুতের সিঁড়ি তো বাজীমাৎ করে দিয়েছে। আমার এই সিঁড়িতে উঠানামা করাটা খুব ভয়ের মনে হতো আর তার জন্য আমি খুব মাথা ঘামাতে বাধ্য ছিলাম। আমি ভাবতাম পৃথিবীটাও এইরকমই চলমান একটা সিঁড়ি। আমাদেব একটা পা-কে সে ধরে জোর করে টেনে নিয়ে চলছে কিন্তু অন্যটা আমরা স্থির জমির ওপরে ধরে রাখতে চাইছি। ভারতবর্ষ এই অসুখের সবচেয়ে বড় শিকার। বহু পরিস্থিতি একটা পা-কে জোর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে নিজের ধর্মীয়, সামাজিক সমস্ত বিষয়ে অতীতকে আঁকড়ে থাকতে চাইছে। আমাদের লোকেরা সায়েন্স পড়ে, ভূগোল পড়ে, জ্যোতিষ পড়ে, আবার গ্রহণে স্নান করে দান-পুণ্য করে, চন্দ্র-সূর্যকে মুক্তি লাভ করায়। আর পুরনো ভ্রান্ত জ্যোতিষের ভবিষ্যত বাণীর উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখে, হিমালয়ের দিকে স্বর্গে যাবার সময় পাণ্ডবদের সশরীরে মরে যাওয়ার কথাতে বিশ্বাস করে। চুটিয়া পৈতা, ধুতি, ছুৎমার্গ সবকিছুকে নিয়ে এই বিদ্যুতের সিঁড়ির ভাবসাগরকে পার হতে চায়!

২৪ অগাস্ট আমি মিউজিয়ামে পড়তে গিয়েছিলাম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য কারো আসবার কথা ছিল। আমি তার অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা আগে আমার পরিচিত হয়ে ওঠা শ্রীআনন্দ রায় চিন্নপ্পা এলেন। তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।' আনন্দ রায় গত যুদ্ধে আগে ইরাক, মিশর এই সব দেশ হয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছেছিলেন। এখন তিনি লন্ডনেই থাকতেন। তাঁর পাঁচ মেয়ে আর এক ছেলে ছিল। স্ত্রী ইংরেজ মহিলা ছিলেন আর আনন্দ রায়ের গায়ের রঙ কয়লার থেকেও বেশি কালো ছিল। তিনি রেশমী পাগড়ী বাঁধাকে ধর্মসম্মত মনে করতেন। তিনি একদিন আমাকে বলছিলেন, 'আমাদের কখনো টুপী পরা উচিত নয়, তাহলে ইংরেজরা নিগার (হাবশী) বলে, আমি সবসময় পাগড়ী বাঁধি।' আনন্দ রায়জী আমাকে নিকটবর্তী পাতাল রেলের স্টেশন দিয়ে নিয়ে আসেন। তারপর আমরা গ্লৌসেসটর রোডে আমাদের থাকবার জায়গাটা খুঁজতে লাগলাম। একটু ভুল পথে চলে গিয়েছিলাম। আনন্দ রায় এক মহিলাকে রাস্তা জিজ্ঞাসা করেন। সে ছোটগাড়িতে বাচ্চাকে বসিয়ে টহল দিচ্ছিল। মহিলা উত্তর দেয়। আনন্দ রায় হঠাৎ বলে ওঠেন, 'তুমি অমুক এলাকার না?' সে 'হ্যাঁ' বলে। আনন্দ রায় তাড়াতাড়ি এই কথা বলতে বলতে চায়ের নিমন্ত্রণ করে বসেন, 'আমার স্ত্রীও ঐ এলাকার।' আনন্দ রায় আমাকে বলছিলেন,'আমি কথা শুনে বুঝতে পারি কোন লোক ইংল্যান্ডের কোন অংশে থাকে। কথায় তো তফাৎ থাকেই, যে ইংরিজি আমরা বই-এ পড়ি, তা আর কতজন বলে?' ৯ আগস্টের কথা, এক শ্যামবর্ণ লম্বা-চওড়া পুরুষ নিজের দুই ইংরেজ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে আসে। সে বৌদ্ধ গৃহস্থের মতো হাত জোড় করে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে। তার মুখে খুশির ঝিলিক ছিল। সে বলল,'সতের-আঠারো বছর আগে যুদ্ধের সময় যখন আমি চোদ্দ-পনের বছরের ছিলাম তখন লংকা থেকে পালিয়ে এখানে চলে আসি। এখানেই বিয়ে করি আর তখন থেকে এখানেই আছি। আমার কতবার নিজেব ভগবান (বুদ্ধ) আর নিজের ভিক্ষুদের কথা মনে আসত, আমি সম্প্রতি একটা খবরের কাগজে দেখলাম যে লন্ডনে আমাদের বিহার আছে, আর আমাদের ভিক্ষুও সেখানে থাকেন। ৩-৪ ঘণ্টা ধরে খোঁজার পর আমি এই জায়গা পেলাম।' যুবক এইজন্য খুব সন্তুষ্ট ছিল যে এখন থেকে সেও উপোসথ রাখতে পারবে। বুদ্ধের পূজা করতে পারবে, ভিক্ষুর কাছ থেকে 'ত্রিশরণ' আর 'পঞ্চশীল' নিতে পারবে। আনন্দজী ঐ যুবককে নিয়ে নিচে মন্দিরে গেলেন। সেখানে সে অশ্রু-গদ্‌গদ্ হয়ে পূজা-পাঠ করে। পরেও সে তার বউ আর ছেলেদের সঙ্গে বিহারে আসত।

যে সময় আমরা যুবকটির সঙ্গে কথা বলছিলাম, তার একটু আগেই হামীরপুরের ভাই অজীজ এসে আমাদের পাশে বসেছিল। অজীজেরও ১৭-১৮ বছর এখানে থাকা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অজীজ এক আলাদা ধরনেরই মানুষ ছিল। লঙ্কার যুবকটি এই সময়ও, যখন কিনা ইংল্যান্ডের বিশ লাখ লোক বেকার হয়ে না খেয়ে মরছিল, সপ্তাহে ৪৫-৫০ টাকা রোজগার করত। ও একটা সমুরের (খুব দামী চর্মবস্ত্র) কারখানাতে কারিগর ছিল। অজীজ কখনো কোনো চাকরী করবার চেষ্টা করেছিল কিনা এতে সন্দেহ আছে, সারা

ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ওর পায়ের নিচে ছিল। শুধু ঘুরে বেড়ানোই ছিল ওর কাজ। শহরে গ্রামে সর্বত্র কিভাবে খরচ জুটত—এটা জিজ্ঞাসা করবেন না। ও একেবারে বাজে লোক ছিল। আর সত্যি বলতে কি, আমার অজীজের প্রতি ঈর্ষা হতো। খিদে তো পায়ই, আর ইংল্যান্ডের ঠাণ্ডার জন্য বেশি কাপড়েরও দরকার হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'খাবার জোগাড় কিভাবে কর? এখানে তো ভিক্ষে করা বে-আইনী।' অজীজ বলল, 'আমি বিনীত হয়ে হাত পাতা ভিখারী হতে পারি না, যদিও সেরকম ভিখারীও আছে এখানে। আমি মজদুরদের বা নিম্ন মধ্যবিত্তদের মহল্লায় চলে যাই। কোনো ঘরের সামনে গিয়ে কড়া নাড়ি, কোনো মহিলা দরজা খুলতে এলে বড় গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাকে বলি—'দয়া করে এক পেয়ালা চা বানাবার জল দেবেন?' চায়ের জল দেওয়ার মানে হল সঙ্গে চিনি আর অল্প দুধও দেওয়া, সেই সঙ্গে একটুকরো রুটিও। যদি ঘরে থাকত তো 'না' খুব কমই শুনতে হতো।' আমি জিজ্ঞেস করলাম—'বড়লোকের বাড়িতে কেন যাও না?'

'বড়লোকেরা বেশি কঠোর-হৃদয় হয়, কুকুর ছেড়ে দেয়, না হলে টেলিফোন করে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেয়।'

অজীজ গ্রামের লোকেদের বেশি পছন্দ করত। ওদেরকে ওর বেশি সহৃদয় মনে হতো। সিংহল-যুবকটি ইংরিজি বলতে বলতে শিখেছিল। এবং সেটা কেতাবী ইংরিজি নয়, নিজের মহল্লার মজুরদের ভাষা সে বলত। তাকে নিয়ে আনন্দ যখন নিচে গেলেন,তখন অজীজ নাক সিঁটকে বলল—'কেমন লোক, ১৮ বছর হয়ে গেল এখনও ভালো করে ইংরিজি বলতে পারে না! কোনো রাত্রি-পাঠশালাতে যদি ভর্তি হয়ে যেতো, ইংরিজি ঠিক হয়ে যেতো।'

ভারত ও সিংহলের অনেকে ছাত্রদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতে থাকত। আমি জানতাম এরাই ভারতবর্ষে গণ্যমান্য হতে চলেছে—এদের মধ্যে কেউ জজ-কালেক্টর হবে, কেউ ব্যারিস্টার, আবার কেউ-বা ডাক্তার-প্রফেসর। এদের মধ্যে ডাক্তার মোতিচন্দ, ডাঃ শ্রীনিসাবাচার, ডাঃ অধিকারম্-এর মতো কত যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রকেই আমার যেন ফাল্‌তু মনে হতো। হয়তো এদের মধ্যে আমার সাম্যবাদী ভাব কাজ করতো। হয়তো,এদের মধ্যে দাদুর চার বিঘে চাষের জমি নিয়ে জীবন কাটানোর তিক্ততাও ছিল, আর সবচেয়ে বড় কথা এও হতে পারে, যে আমার কাছে সবসময় সাহসপূর্ণ জীবনই আকর্ষণীয় হয়ে থেকেছে আর এরকম জীবন লন্ডনে গিয়ে পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে পাওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু ওদের মধ্যে অনেক তো ছেলেবেলা থেকেই চাকর-বাকরের হাতের পান-ফুলের মতো জন্ম নিয়েছিল আর বড় হয়েছিল। অন্য ধরনের যুবকদের মধ্যে ছিল রামচন্দ্র ইস্‌সর ও হংসরাজ। রামচন্দ্র রাওয়ালপিণ্ডির বাসিন্দা ছিল। পালিয়ে গিয়ে করাচীতে জাহাজের খালাসীদের দলে ভর্তি হয়ে পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে কয়েকবার পরিক্রমা করতে থাকে। সে জানতে পারে যে কোনো জাহাজ কোম্পানি ভারতবর্ষ থেকে ভর্তি হওয়া কর্মচারীদেরকে যদি ২০ টাকা মাইনে দেয় তবে যে বিলেত থেকে ভর্তি হয়েছে তাকে দেয় সপ্তাহে ২৫ টাকা। ও

ইংল্যান্ডে পৌঁছে চাকরি ছেড়ে দেয় তারপর অন্য জাহাজে ভর্তি হয়ে যায়। এখন ও ইংরেজদের মতো বেতন পেত। অনেকদিন জাহাজে চাকরি করে, পরে লন্ডনের এক হোটেলে রন্ধন-বিশারদ হয়ে যায়। মাইনে আরো বেশি ছিল। কয়েক'শ পাউন্ড জমা করে, তারপর নিজের একটা ছোটমতো দোকান খুলে নেয়। দোকান ভালো চলছিল। কিন্তু এর মধ্যে ১৯২৯-তে বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় লাখপতিরাও দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল, রামচন্দ্রের ব্যাপারে আর কি বলার আছে। আজকাল ও বেকার-ফান্ড থেকে কিছু পয়সা পেয়ে যেতো, কোনো হাটে একটা সিন্দুক রেখেছিল, সেখানেও কিছু বিক্রি করে আসত। ৪-৫ বছরের ছেলে ছিল, বউ টাইপ আর শর্ট হ্যান্ডের কাজ জানত, মেয়েদের সাজানোর কাজও সে শিখেছিল। কিন্তু মন্দার জন্য এখন কাজ পাওয়া কঠিন ছিল। তবুও অন্যদের তুলনায় রামচন্দ্র ভালো অবস্থায় ছিল।

রামচন্দ্র পাঁচ কি সাত ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল, কিন্তু তার বন্ধু হংসরাজ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ছিল। বর্মা, চীন, আমেরিকা কোথায় কোথায় টো-টো করতে করতে লন্ডন পৌঁছেছিল। তার বাড়ির লোকেরা ধনী ছিল। কিন্তু সে নিজের পায়ে দাঁড়ানো পছন্দ করত। রামচন্দ্রের মতো সেও এখানে বিয়ে করেছিল আর ওর এক মেয়ে ছিল। হংসরাজের দোকান মন্দাতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সামনেই তার বাড়ি থেকে তাব আসে, আর তাকে ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হয়। আমাদের বলিয়ার সৌরেন রায় হল আর একজন যুবক। পল্টনের সৈন্য হয়ে গত যুদ্ধে গিয়েছিল তারপর লন্ডনেই থেকে যায়। বিলেতে টাকা চারগুণ পাঁচগুণ মনে হয়, ভারতীয়রা হাত খরচ করেও কিছু বাঁচাতেই পারে। সোবরণ রায় এক হাজার বা তার বেশি পাউন্ড (১৪ হাজারের বেশি টাকা) জমিয়ে নিয়েছিল। লোকে পরামর্শ দিচ্ছিল যে ১৪-১৫ হাজার টাকা হয়ে গেছে, ভারতবর্ষের পক্ষে অনেক, চলে যাও। কিন্তু সোবরণ রায় এটাকে যথেষ্ট মনে করছিল না। লন্ডনের থেকে ভাষা তো ও শিখে নিয়েছিল। কিন্তু পড়া-লেখার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে নি। ও এখন একটা রেস্তোরাঁ (ভোজনশালা) খুলতে চাইছিল। কোনো বাড়িওয়ালার কাছ থেকে ভাড়াতে বাড়ি নেয়, অগ্রিম টাকা দিতে হয়, দলিলে ৫-৬ বছরের জায়গায় ১ বছর লিখে দেওয়া হয়েছিল। বেচারির অর্ধেকেব বেশি টাকা এইভাবে কমে গিয়েছিল, আর পরে রেস্তোরাঁটাও চলেনি।

বেরেলীর বাসিন্দা আরেক ভারতীয় পণ্ডিত হরিপ্রসাদ শাস্ত্রীকে পেয়েছিলাম। সম্ভবত যুদ্ধেরও আগে তিনি ভারতবর্ষ থেকে বাইরে গিয়েছিলেন। কোনোসময় আমি 'সরস্বতী'তে একটা লেখা পড়েছিলাম, যেখানে তিনি জাপানে গিয়ে যে ধর্ম নিয়ে সোরগোল শুরু করে দিয়েছিলেন, তার বর্ণনা ছিল। বোধ হয় সেইসময় আমিও জগতে বৈদিক ধর্মের সোরগোলের স্বপ্ন দেখছিলাম। ঐ লেখা আর নাম আমার মনে ছিল। একদিন শাস্ত্রীজীকে আমি পেয়ে গেলাম। আলাপ হল, প্রণাম জানালাম। তিনি তাঁব বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫ টার সময় আমরা দুজন শাস্ত্রীজীর বাড়িতে গেলাম। তাঁর স্ত্রী হলেন জাপানি মহিলা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই স্বভাব খুব মধুর। তাঁদের কোনো সন্তান নেই, লন্ডনের জীবন অত্যন্ত সংঘর্ষময় জীবন, শাস্ত্রীজী কিছুটা পড়িয়ে, কিছুটা

বক্তৃতা দিয়ে আর তাঁর স্ত্রী নাচ শিখিয়ে দিন চালাতেন। বেরেলীর কথা তাঁর এখনো মনে হয়। কিন্তু কখনো দেখতে পারবেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

আমি প্রথম প্রথম প্রায়ই বাগানে—যা ঘরের পিছনে ছিল—সন্ধের সময় বেড়াতাম। পড়শীর কুমারী মেয়েদের আমার পোশাক দেখে কৌতূহল হতো আর তারা কেউ কাপড় জড়িয়ে আমার নকল করত। যখন আমি ভারতবর্ষে ছিলাম, সেই সময় 'গঙ্গা' পত্রিকার (সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর) সম্পাদক পণ্ডিত রামসুন্দর ত্রিবেদী পুরাতত্ত্ব সংখ্যার সম্পাদক হওয়ার জন্য আমাকে বলেছিলেন। আমি রাজি হয়েছিলাম, আর লংকাতে থাকবার সময় তার জন্য কয়েকটা লেখা লিখে দিয়েছিলাম। লন্ডনে তিনি অন্যান্য লেখাগুলোও সম্পাদনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে তার জন্যও সময় দিতে হত। তিব্বত থেকে আনা ছবির মধ্যে ৩৪-৩৫টা খুব ভালো ছবি আমি নিজের সঙ্গে করে লন্ডনে নিয়ে গিয়েছিলাম। এখানে এবং প্যারিসেও তার প্রদর্শনী হয়েছিল। ছবিগুলো যে এত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু এখানে আসবার পর সেগুলোর মূল্য আমি জানতে পারলাম। কয়েক বছর ধরে নালন্দার পুনরুদ্ধারের পাগলামি আমার মাথায় ছিল। লঙ্কাতে থাকতে আমি এটাও ভাবছিলাম যে, যদি সমস্ত ছবি ৩০-৩৫ হাজারে বিক্রি হয়ে যায় তবে সেই টাকায় নালন্দায় জমি কিনে নেওয়া যায়। এখানে আসবার পর যখন ছবিগুলোর গুরুত্ব আমি টের পেলাম, তখন বিক্রি করার চিন্তা ছেড়ে দিলাম। কোন জায়গায় এগুলোকে সুরক্ষিত করে রাখা যেতে পারে, এই ব্যাপারে চিন্তা করতেই আমার মনে হল যে, পাটনা মিউজিয়ামই এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হবে। ২৮ অক্টোবর আমি মিউজিয়ামের সভাপতি জয়সওয়ালজীকে চিঠি লিখলাম—'আমি আমার তিব্বতী চিত্রপটগুলো মিউজিয়ামে দেবার জন্য তৈরি। কিন্তু নালন্দাতে যদি কোনো সুরক্ষিত স্থান তৈরি হয়ে যায় তবে সেগুলো সেখানে চলে যাবে।' ২২ নভেম্বর জয়সওয়ালজীর তার আমি প্যারিসে পেলাম, 'তিব্বতী চিত্রগুলোর ব্যাপারে আপনার ২৮ অক্টোবরে লেখা চিঠির শর্ত ধন্যবাদের সঙ্গে স্বীকৃত। টমাস কুককে লিখে দিচ্ছি যে তিনি যেন চিত্রগুলোর দায়িত্ব নেন। জয়সওয়াল, সভাপতি, পাটনা মিউজিয়াম।' (Thankfully accepted terms in your letter twentyeight Oct. for Tibetian paintings. Instructing Thomas Cook to take charge. Jayaswal. President. Patna Museum)। সব নিয়ে দেড়শোর মতো চিত্রপট ছিল, যা আমি পাটনা মিউজিয়ামকে দিয়ে দিলাম, তার মূল্য এক লাখের কম হবে না। নালন্দার স্বপ্নের জন্য আমি এক আমেরিকান মিউজিয়ামের হাতে বিক্রি করবার জন্য একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলাম, আর যদি আমি লন্ডনে না যেতাম তবে সেগুলোর মহত্ত্ব এত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারতাম না, আর হয়তো ভুল করে বসতাম।

আমাদের পাড়াটা ছিল মধ্যবিত্ত লোকদের পাড়া। খুব ধনী ও শৌখিন লোকরা লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ড পাড়াতে থাকে আর ইস্ট এন্ড পাড়াটি গরিবদের জন্য। ৩০ আগস্ট আমরা ইস্ট এন্ড দেখতে গেলাম। সেখানে দেখলাম আমাদের সাহেবরা নিজের জাত-ভাইদের জন্য কেমন নরক সৃষ্টি করে রেখেছে—খাঁচার মতো ছোট-ছোট ঘর, ছেঁড়া-ময়লা কাপড়

আর ক্ষুধার্ত-দুর্বল নরকঙ্কাল চারদিকে চোখে পড়ে। এখানে এক মধ্যবিত্ত মহিলা কুমারী লিস্টার,'কিংসলে হল' নামের নিজস্ব সংস্থাটি গরিবদের সেবার জন্য খুলেছিলেন। ধনীরা পৃথিবীতে এই নরক সৃষ্টি করেছে, যেখানে নরকের আগুন দাউ দাউ করে কোটি কোটি নর-নারীদের দগ্ধ করছে। যখন কোনো কোনো ধনী সন্তান বা তাদের আত্মীয়-স্বজনের হৃদয় বিগলিত হয়, তখন গাছের পাতায় জল দিয়ে 'কিংসলে হলে'র মত সংস্থা খুলে যত নষ্টের গোড়া ধনী-নির্ধনের ভেদাভেদকে মেটানোর চেষ্টা করে। কুমারী লিস্টার সেই সময় সেখানে ছিলেন না। গান্ধীজী যখন রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে (১৯৩১) আসেন, তখন তিনি এখানে থেকেছিলেন। নিজের সাধ্য মতো এই সংস্থা গরিবদের সেবা করে। একটি গ্রন্থাগার আছে, ছেলেদের খেলারও কিছু ব্যবস্থা আছে। কিছু শিশুদের দুধও দেওয়া হয়।

মিসেস রীজ ডেভিডস পালি ভাষায় প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ও তাঁর স্বর্গীয় স্বামী পালি সাহিত্যের অনুসন্ধান ও প্রকাশনার বিষয়ে বহু কাজ করেছিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁর প্রিয় পুত্র মারা যায়। কিছুকাল পরে তাঁর স্বামীও মারা যান। বেচারি বৃদ্ধা এই শোক সহ্য করতে পারেননি। তিনি প্রেতবিদ্যাওলাদের কাছে যেতে থাকেন। ছেলে মারা যাওয়াতে ছেলের প্রেমে অন্ধ তো ছিলেনই, পুত্রশোকে তিনি বিশ্বাস করতে থাকেন যে তাঁর ছেলে প্রেতলোকে জীবিত আছে। তাঁর পালি ভাষার জ্ঞান অপ্রত্যক্ষ ভাবে অন্যদিকে প্রয়োগ হতে থাকে। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন যদি প্রেতলোক থাকে—যেখানে তাঁর ছেলে রয়েছে, তাহলে দেবলোকও নিশ্চয়ই আছে। আর যদি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এইগুলো থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কোনো অজর অমর আত্মা আছে যা এই শরীর ছেড়ে অন্য লোকে যায়। তখন তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, ভগবান বুদ্ধ আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন। এইভাবে বুদ্ধের উপদেশের নতুন কাল্পনিক উল্টোপাল্টা অর্থ করতে লাগলেন। আশ্চর্য এই যে, পুত্রশোকে বিকৃত তাঁর মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসা এই কথাগুলোকে লোকে অত্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। আর এক বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ-এর বিষয়ে একই কথা শুনলাম। তাঁরও ছেলে যুদ্ধে মারা যায় ও মৃত ছেলের সাথে কথা বলার জন্যই তিনি প্রেতবিদ্যা- বিশারদ (বিলিতি ওঝা)-এর শরণাপন্ন হন। তখন তিনি নানা রকম আজেবাজে লিখতে লাগলেন। বহু নির্বোধ ব্যক্তি এই সব অর্ধ-বিক্ষিপ্ত মানুষের প্রলাপকেও জ্ঞান ভেবে বসলেন। আমি মিসেস রীজ ডেভিডস-এর মতামতের বিরুদ্ধে একটি পরিহাসপূর্ণ লেখা লিখি, যেটি একটি বৌদ্ধ মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়।

যখন আমরা লন্ডনে ছিলাম তখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার তৃতীয় বছর চলছিল। ৩০ লক্ষাধিক মানুষ বেকার। বিলেতে বেকারির অবস্থা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি অসহ্য। লন্ডনে যদি আপনি কোনো শৌচাগারে যান তো এক পেনি (আনা) দিলে তবে দরজা খুলবে। এক পেয়ালা চা আর এক টুকরো রুটির জন্য বারো আনা দরকার। প্রতিটি জিনিস দুর্মূল্য, একটি চাদর ধুতে এক শিলিং (১০ আনার ওপর)। রুমাল ধুতে ৩ পেনি (৩ আনার ওপর)। রুমাল ধুতে দেওয়ার চেয়ে নতুন কেনাই ভালো ছিল। জিনিসপত্রের দাম এত বেশি যে অতিথি বা বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়ন করা সহজ ছিল না। একদিনের সাদামাটা খাবার খেতে ৩ টাকা শেষ হয়ে যেতো। এই পুরো ব্যবস্থার জন্য দায়ী সেই

পুঁজিবাদ, যা ইংল্যান্ডে ৯০ শতাংশ মানুষের জীবনকে আগামী দিনের জন্য অনিশ্চিত ও সারা জীবনের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে দিয়েছে। তাই ট্রামে মা ও মেয়ের নিজেদের আলাদা টিকিট কাটা আশ্চর্য কিছু ছিল না।

২৭ জুলাই থেকে ১৩ নভেম্বর সাড়ে তিন মাস আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম। এর প্রায় সবটা সময় আমি লন্ডনেই কাটাই। উইম্বলডন লণ্ডন থেকে ১১ মাইলের বেশি দূরে, কিন্তু সেটাও প্রায় শহরেরই মতো। ৬ সেপ্টেম্বর আমরা সেখানে গেলাম। এক বৃদ্ধ ইংরেজ দম্পতির আমন্ত্রণে আমরা ১৬ সেপ্টেম্বর ৫ মাইল দূরে ডালবিচ গ্রামে গেলাম। গত শতাব্দীতে যে উদার চিন্তাধারার বন্যা বয়েছিল তাতে ফ্রান্সের চিন্তাবিদ কোঁতে বহু দর্শন, ধর্ম ও বিজ্ঞান এর খিচুড়ি করে এক নতুন চিন্তাধারা চালাতে চেয়েছিলেন। মনে হয় কিছুদিন পর্যন্ত শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্তদের ওপর তাঁর এই চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছিল, এই বৃদ্ধ দম্পত্তি সেই চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন।

ধর্মের পক্ষপাতী অনেক মানুষ বেশ ভয় পাচ্ছেন যে কিছুকাল পরে ধর্ম জিনিসটি লুপ্ত না হয়ে যায়। তাই তাঁরা সর্বধর্ম যুক্ত করে ধর্মবিরোধীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইছিলেন। ধর্ম বিলোপ হওয়া ধনীদের জন্য বিপজ্জনক। রোমের পোপ যখন তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ধর্মের অঙ্গ বলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিরোধী সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে থাকেন। যদিও ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি প্রাচ্য খ্রীস্টান-চার্চ এর সাথে হাত মেলাতে রাজি ছিলেন কেননা, লাল ফৌজের জয় ধনীদের চামচে এবং নিজেও এক বড় ধনী এই মোহান্তরাজের হৃদয়ে কাঁটার মত বিঁধছিল। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে সাধারণ মানুষই সর্বধর্ম-সমন্বয়ের চেষ্টা করছিলেন। আমি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলাম। তবু অন্যান্য ধর্মের চিন্তাধারার বিরোধী ছিলাম না কিন্তু অবশ্যই বুঝতে পারতাম যে ঈশ্বরবাদী ধর্ম জনহিত ও বিশ্বপ্রগতির বিরোধী। তখনও এটা বুঝতে দেরি ছিল যে অন্য ধর্মের মতোই সাধারণ বৌদ্ধধর্মও প্রগতি বিরোধী। লন্ডনে ছোট-খাটো ধার্মিক নেতারা মিলে এক সর্বধর্ম মিত্রমণ্ডলীর (ফেলোশিপ অব ফেইথ) স্থাপনা করতে যাচ্ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া এটি পূর্ণ কি করে হতো? তাই ওঁরা আমাদের এখানেও আমন্ত্রণ জানালেন। আনন্দজী গেলেন, তবে ততক্ষণে বহু উদ্দেশ্য ও নিয়ম তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যাতে প্রথমেই ছিল একই ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ছড়িয়ে দেওয়া। আনন্দজী দেখে বললেন যে, এই নিয়ম থাকলে তো বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা এই সংগঠনে থাকতে পারবে না, কারণ বৌদ্ধরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। সেখানে এক মৌলবী সাহেব বসেছিলেন—আশ্চর্য হয়ে বললেন—'য়া আল্লাহ! এ আবার কি রকম ধর্ম যেখানে খোদার স্থান নেই।' যাই হোক, বৌদ্ধদের এখানে রাখতেই হবে তাই ঈশ্বরের কথা বাদ দেওয়া হল।

২২ সেপ্টেম্বর ঠাণ্ডা এত বেড়ে গিয়েছিল যে ঘর গরম করার জন্য উনুন জ্বালতে হচ্ছিল। এখন মেঘ আরো বেশি জমতে লাগল। সকালে মুখ ধোয়ার সময় দেখতাম গলা থেকে কালো কফ্ বেরুচ্ছে। লন্ডনের হাওয়ায় এত ধোঁয়া, যে এটা হওয়া স্বাভাবিক।

২৭ সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গ হওয়ার খবরে লণ্ডনের ভারতীয়রা উৎফুল্ল হল।

ম্যাকডোনাল্ড-এর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে গান্ধীজীকে এই উপবাস করতে হয়েছিল। অস্পৃশ্যদের ওপর হিন্দুরা হাজার হাজার বছর ধরে অত্যাচার করে আসছে এবং তাদের মানুষ থেকে পশুর স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। তাই অস্পৃশ্যদের সজাগ থাকার প্রয়োজন কে অস্বীকার করতে পারে? গান্ধীজীর পথে অস্পৃশ্যদের সমস্যার সমাধান হতো না, সেটাও নিশ্চিত ছিল। তাহলে অস্পৃশ্য নেতারা অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতে চাইলে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। ইংরেজ শাসকবর্গ এক পৃথক নির্বাচনের নীতিকে মুসলমানদের পর অস্পৃশ্যদের জন্য স্বীকৃতি দিয়েছিল। যার স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল ভারতের শক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করা। গান্ধীজী এইজন্য হরতাল করেছিলেন। যেদিন লণ্ডনের কাগজে আমরণ উপবাসের খবর বেরুলো সেদিন হৈ-চৈ পড়ে গেল। এক চীনা ছাত্র আমার কাছে এলেন এবং প্রশ্ন করলেন যে এই অস্পৃশ্যতাটা কি? আমি অনেকক্ষণ ধরে ওঁকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলাম, তবু তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে একজন সুস্থ নীরোগ মানুষকে ছুঁলে বা তার হাতের খাবার খেলে কি এমন অন্যায় হতে পারে। এর থেকে এটা তো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের দেশে নাক উঁচু পণ্ডিতেরা যা ব্রহ্মার বিধান মনে করেন, অন্য দেশের লোক সেটাকেই এত বড় নির্বুদ্ধিতা বলে ভাবে যে বিশ্বাসই করতে চায় না।

গান্ধীজীর জন-জাগরণের কাজের আমি খুব প্রশংসা করতাম। কিন্তু তাঁর সেকেলে পন্থাকে আমার অসহ্য লাগতো। ২৯ সেপ্টেম্বর আমি ডায়েরিতে লিখেছি যে দেশে ফিরে আমি গান্ধীর সেকেলে পন্থার সমালোচনা করে একটি বই লিখব।

কেনসিংটন মিউজিয়ামে আমি আগেও গিয়েছিলাম, সেখানকার অধ্যক্ষ মিস্টার কেম্‌বেল্‌-এর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, তিনি আমাদের এখানেও এসেছেন। ৫ তারিখে বিশেষ করে আমরা সেখানে ভগবান বুদ্ধের প্রধান দুই শিষ্যের—সারিপুত্ত ও মোদ্‌গল্যায়নের অস্থির দর্শন করতে গিয়েছিলাম। ২২০০ বছর আগে এই দুজন মহাপুরুষের অল্পস্বল্প হাড় কৌটোয় ভরে সাঁচী ও সোনারীর স্তূপে রাখা হয়েছিল। এখন (১৯৪৭) এগুলো ভারতে আনা হল। মিস্টার কেম্‌বেল্‌ আমাদের এই কৌটোগুলো দেখালেন, এগুলোর ওপর দুই শতাব্দী খ্রীস্টপূর্বের লিপিতে এই দুজন মহাপুরুষের নাম লেখা ছিল। খুলে ভেতরে ছোট ছোট হাড়ের টুকরো দেখা গেল। বুদ্ধের সবচেয়ে মেধাবী এই দুই শিষ্যের শরীরের অবশেষ এখন পৃথিবীতে এইটুকুই রয়ে গেছে। আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেগুলো দেখলাম।

মি· কেম্‌বেল যাদুঘরে আরও অনেক জিনিস আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখালেন। তিনি আমাদের নিজের অফিসে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভারত সরকারের কোনো ইংরেজ অফিসার তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন। ভদ্রতার খাতিরে তিনি আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু যতটা সংকোচের সঙ্গে তাঁর হাত ও জিভ নড়লো সেটা দেখে বোঝা গেল যে সেই ব্যক্তি আমাদের মত ভারতীয় গোলামকে হাত মেলানো বা খোলামেলা কথা বলার যোগ্য মনে করে না। ভারতে কর্মরত ইংরেজদের প্রায় এই ধরনের মনোভাব দেখা যায়। আর যারা এটা করতে পারত না তাদের পদোন্নতিও হত না। এর দৃষ্টান্ত ছিলেন

মি· শাট্‌লওয়ার্থ। তিনি আই·সি·এস· হয়ে ভারতে এসেছিলেন—জীবনভর জেলা আধিকারিক থেকেই পেনশন নিয়ে বিলেতে ফিরে গেলেন। ওই সময় তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ১২ নভেম্বর তাঁর সাথে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। তাঁর সহৃদয়তা দেখে আমার মনে হল যে তিনি কোনো খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারক। তিনি নিজের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর স্ত্রী চা করে খাওয়ালেন। বাড়ির যাবতীয় কাজ তিনি নিজের হাতে করতেন। যাই হোক ইংল্যান্ডে ফিরে তো গভর্নরদের ট্রামে চড়তে হয়। কিন্তু শাট্‌লওয়ার্থ দম্পতি ইংরেজ শাসকদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন তাঁদের স্বভাবের জন্য।

৭ অক্টোবর আমরা লন্ডন টাওয়ার দেখতে গেলাম। একে তো মা মনসা তার ওপরে ধুনোর গন্ধ[১] প্রবাদের অবস্থা। আমাদের পোশাক বেশ আকর্ষক ছিল। আর আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন লংকার করোলিস মহাশয়, যিনি তাঁর লম্বা চুল খোঁপার মত বেঁধে ছিলেন। এটা সেই স্থান যেখানে কয়েক শতাব্দী ধরে রাজারা নিজেদের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বন্দী করে রাখত। বহু হতভাগ্য রানীদের মস্তক ছেদ করা হয়েছিল এখানেই। যে সব কুড়ুল দিয়ে মাথা কাটা হয়েছিল সেগুলোও এখানে সুরক্ষিত আছে। পুরনো অস্ত্রশস্ত্রের ভাল সংগ্রহ আছে এখানে। সেগুলো শতাব্দী অনুসারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কোহিনুরখচিত রাজমুকুট ও আরও অনেক হীরেও এখানে আছে। আমরা ঘুরে ঘুরে সব জিনিস দেখলাম।

অনাগরিক ধর্মপাল্-এর কয়েকটি চিঠি আমি পেলাম। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল আমি তাঁর কার্যভার গ্রহণ করি। কিন্তু নিজের মধ্যে ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা খুঁজে পেতাম না। ভারতে ফেরার পরেও অনাগরিক কিছু আলোচনা করেছিলেন কিন্তু আমি তখন নিজেকে বিদ্যা ও অম্বেষণের ক্ষেত্রেই লাগিয়ে দিয়েছিলাম। মহাবোধি সভার লোকদের ইচ্ছে ছিল আমি ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা যাই। কোনো এক সময় আমার ধর্মপ্রচারক হওয়ার তীব্র ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখন অবস্থা একদম বদলে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক কাঁচা সুতোর মতই ছিল। তবে ভগবান বুদ্ধের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কিছু কম হয়নি। আমি তাঁকে ভারতের সবচেয়ে বড় বিচারক বলে মনে করি আর আমি বিশ্বাস করি যে যখন পৃথিবীতে ধর্মের নামগন্ধও থাকবে না তখনও মানুষ বুদ্ধের নাম সসম্মানে মনে রাখবে। আমার তাঁর উপদেশ পড়ার পর মনে হয়েছিল যে তিনিও পৃথিবীকে সাম্যবাদী করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যদিও সেটা অনেক সময় আগেকার কথা ছিল।

লন্ডনে আমার অনেকটা সময় সাম্যবাদী সাহিত্য, বিশেষ করে রুশদেশ বিষয়ক পত্র-পত্রিকা ও বই নিয়েই কাটত। 'ডেলি ওয়ার্কার' তো আমি প্রতিদিন পড়তাম। এটা সাধারণ দোকানগুলোতে পাওয়া যেত না, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হত। এছাড়া বহু সোভিয়েত সচিত্র মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা ও বইপত্র আমি জমা করে পড়তাম। হ্যাঁ, কোনো ইংরেজ কমিউনিস্টের সঙ্গে আমার সরাসরি সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ হয়নি।

---

[১] গ্রন্থে ব্যবহৃত লোক-কথাটি *—এক তো করৈলা, দূসরে নীম চঢ়া* (এক করোলা তেতো, তার ওপরে নিম)।—স·ম·

হয়ত তারা আমার পোশাক দেখে ভড়কে গিয়ে থাকবে। আর আমিও সোভিয়েত যাওয়ার তালে ছিলাম তাই গুপ্তচরদের চক্ষুশূল হতে চাইছিলাম না।

২৬ অক্টোবর আমরা দুজনে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। পথে কৃষকদের ঘর ও খেতগুলো দেখলাম। তখন শীত আসন্ন তাই গাছের পাতা হলুদ হয়ে গিয়েছিল বা পড়ে গিয়েছিল। খেতে কোনো কাজ হচ্ছিল না। গ্রামের ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। শুধু এক জায়গাতে ঘোড়া লাঙল টানছে দেখলাম। কেম্‌ব্রিজের এক ডজনের বেশি কলেজ ও তাদের ছাত্রাবাসগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সেই সময় আমার তিব্বতের সে-রা ও ডে-পুঙ্‌ বিহারের কথা মনে পড়ছিল। কেম্‌ব্রিজও একসময় খ্রীস্টান ভিক্ষুদের বিহার ছিল। তাঁরাই এটাকে বিদ্যাপীঠ তৈরি করেছিলেন। আমাদের এখানেও নালন্দা ও বিক্রমশীলার মতো বিশাল বিদ্যাপীঠ ছিল যাদের সেই সময় বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ছিল। আশ্চর্যের কথা—যে সময়ে নালন্দা ও বিক্রমশীলাকে ধ্বংস করা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ই অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ স্থাপিত হচ্ছিল।

১০ নভেম্বর আমরা অক্সফোর্ড গেলাম। সেখানকার কলেজগুলো দেখার সময় আমার নালন্দার কথা মনে হচ্ছিল। অত্যন্ত ভক্তিভাব নিয়ে আমি ৯ তারিখে হাইগেট-এর কবরস্থানে গেলাম।

১৯৩০-৩১-এ আমি মার্ক্স-এর কয়েকটা বই পড়লাম, যদিও এখনও মার্ক্স-এর বস্তুবাদ পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পারছিলাম না, বিশেষ করে এই শরীরের সঙ্গে জীবনের শেষ হয়ে যাওয়া আমি এখন মানতে পারছিলাম না। কিন্তু মার্ক্স-এর অন্যান্য কথা আমি বিশ্বাস করতাম। বারো বছর পরে ডাক্তার শ্রীনিবাসাচার আমায় সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—আপনি সে সময়ও বলতেন বুদ্ধ ও মার্ক্স এঁরা দুজনেই আজকের পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পারেন। আমি পড়েছিলাম যে মার্ক্স লন্ডনে দেহত্যাগ করেছিলেন এবং এই হাইগেটের কবরখানায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। আমার আশেপাশে যারা থাকত, তারা এ বিষয়ে তাদের পূর্ণ অজ্ঞতার কথা বলত। যাই হোক, আমরা খুঁজতে খুঁজতে সেই কবরখানায় পৌঁছে গেলাম। বাইরে এক মহিলা ফুল বিক্রি করছিল, আমরা তার থেকে ফুল নিলাম। চৌকিদারকে মার্ক্সের সমাধির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, সে বলল, 'আমি জানিনা।' আমি অবাক হলাম, যে-শ্রেণীর দাসত্ব দূর করার জন্য মার্ক্স এত কাজ করেছেন, সেই শ্রেণীর একজন মানুষ এই কবরখানার চৌকিদার হয়েও মার্ক্সের কবর কোথায় জানেনা। আমার ধারণা বারো বছর পরে আজকে আর সে অবস্থা হবে না, কেননা আজ ১৯৪৪-এ মার্ক্সের সেনা—লাল ফৌজ-এর বীরত্বের সংবাদ ওখানকার লোকেরা প্রতিদিন খবরেব কাগজে পড়ে। সেখানে হাজার হাজার কবর ছিল। এক একটি নাম পড়ে খোঁজ করা একদিনের কর্ম নয়। তখুনি একটি লোক কবরগুলির পাশ দিয়ে গেটের দিকে এল। সে বলল, 'চলুন,আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।' সেটি একটি অতি সাধারণ কবর, যার ওপর ঘাস গজিয়েছিল। এখানেই পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষদের ত্রাণকর্তা আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম আর দারিদ্র্য সহ্য করে স্ত্রী জেনি ও নাতির সঙ্গে নীরবে ঘুমোচ্ছেন। আমি একান্ত ভক্তিভরে ফুলগুলি সেখানে রাখলাম। মাথার দিকে পাথরে মার্ক্সের নামও খোদাই করা

ছিল, আর কেউ ছোট একটি লাল ঝাণ্ডা রেখে দিয়েছিল। সেই দিনই আমি ওয়েস্ট-মিনিস্টার অ্যাবে দেখতে গেলাম। এখানে গরিবদের রক্ত-চোষকদের সমাধি আছে। কয়েক ডজন রাজা-রানী ও তাদের সভাসদদের সমাধি, যেগুলোকে সাজানো ও তৈরির জন্য জলের মত টাকা বইয়ে দেওয়া হয়েছে।

আবার ফ্রান্সে—১৪ নভেম্বর আমি আনন্দজী ও অন্যান্য বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এগারোটা নাগাদ ট্রেন ধরার সময় মেঘ করেছিল। এবারে ডোভার-ক্যালের পথ ধরলাম। লন্ডন থেকে ডোভার ট্রেনে এলাম, তারপর জাহাজে চড়লাম। সমুদ্র স্থির ছিল। এখন আমি একদম একা ছিলাম।

ক্যালেতে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে উঠলাম ও ছটার সময় প্যারিসের গার-দে-নার স্টেশনে পৌছলাম। মিস লুন্জবেরী স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। প্যারিসে তিব্বতী চিত্রপটের প্রদর্শনী হওয়ার কথা ছিল তাই আমি সেগুলো সঙ্গে এনেছিলাম। কাস্টম-এর লোকেরা সেগুলো দেখতে দেরি করবে তাই মিস লুন্জবেরী সেগুলো অন্য লোকের হাতে দিয়ে আমায় একটি হোটেলে পৌছে দিলেন। চিত্রপটের সংখ্যা জিজ্ঞেস করাতে আমি আন্দাজে একটা বেশি বলে ফেললাম। চিত্রপটগুলো তো চলে গেল কিন্তু ফ্রান্স থেকে বেরোবার সময় সংখ্যায় একটি চিত্রপট কম হয়ে গেল। যার দাম নির্ধারণ করে আমার বন্ধুদের সরকারি মাশুল দিতে হল। হোটেলের ঘর খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। একধারে পাঁচ আঙুলের মত চ্যাপ্টা গরম জলের পাইপগুলো সারিবদ্ধভাবে পেঁচিয়ে ছিল, যার জন্য বাড়িটিতে একবিন্দুও ঠাণ্ডা ছিল না।

পরের দিন (১৫ নভেম্বর) অপরাহ্নে আমরা মুজী-গ্বীতে গেলাম। এটি প্যারিসের একটি ভাল সংগ্রহালয়, বিশেষ করে এশীয় শিল্পকলার এখানে ভাল সংগ্রহ আছে। পুরনো দলাইলামার আটটি চিত্রপটেরও এখানে ভাল সংগ্রহ ছিল, কিন্তু তাও আমার সংগ্রহের কাছে কিছুই না। গান্ধার মূর্তিরও সংগ্রহ এখানে খুব ভাল, বিশেষ করে হাড্ডা (আফগানিস্তান)-এর খননে পাওয়া চুনের মূর্তিগুলোর অনুপম। রাত্রে বুদ্ধপ্রেমীদের সভাতে আমাকে বলতেও হল।

১৬ নভেম্বর আচার্য সেল্‌বেন্ লেবীর বাড়ি গেলাম। তাঁর বয়স ছিল সত্তর বছর। ভারতীয় সংস্কৃতির তিনি ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান। সমস্ত চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থার অনেক আগেই ভারতীয় বিদ্বানরা নিজেকে বুড়ো মনে করে কাজ ছেড়ে দিতেন। ১৯২৯-এ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন প্রফেসর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তখন তিনি ৫০ বছরেরও হননি, অথচ বলছিলেন, 'আমাদের যা কিছু করার ছিল তা করেছি, এবার তোমরা করবে।' আর এখানে আমি আচার্য লেবীকে দেখছিলাম এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি দশ-বারো ঘণ্টা অনুসন্ধানের কাজ করতেন এবং তার জন্য পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যেতে প্রস্তুত ছিলেন। আমি আমার সম্পাদিত 'অভিধর্মকোষ' তাঁকে উপহার দিলাম। তাঁর ঘরে চারদিকে বই আর বই চোখে পড়ত, যার মধ্যে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলো ছাড়াও চীন, পালি, সংস্কৃত, তিব্বতী বই-এর সংখ্যা

বেশি ছিল। একটি ভাঙা কালো পাথরের মূর্তি দেখিয়ে আচার্য বললেন,'এটা আমি নালন্দায় পেয়েছিলাম।'

আমরা চার ঘণ্টা ধরে কথা বলতে থাকলাম। জ্ঞানের সেই অগাধ সমুদ্রে ডুব দিয়ে আমার তৃপ্ত হওয়া কি সম্ভব ছিল? তিনি তিব্বতীরাজ বংশাবলীর কিছু সমস্যার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। মধ্যএশিয়ায় পাওয়া তিব্বতী হস্তলিখিত কাগজে এক অপরিচিত রাজকুমারের নাম পাওয়া গেছিল। আমার কাছে আমার নোটবই ছিল, সেটা দেখাতে সেই নামের পরিচয়ও পাওয়া গেল। আচার্য খুব খুশি হলেন। তিনি সম্প্রতি গিলগিটে পাওয়া হস্তলিপির উল্লেখ করে বললেন, 'আপনি সেখানে অবশ্যই যান এবং সেইসব বই-এর বিষয়ে লিখুন।' আমি 'গঙ্গা'র পুরাতত্ত্ব সংখ্যার জন্য 'মহাযানের উৎপত্তি' ও 'চুরাশী সিদ্ধ'-এর ওপর দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, সেগুলোর ইংরিজি অনুবাদ আমার কাছে ছিল। তিনি লেখাগুলো খুব পছন্দ করলেন এবং 'জুর্নাল্ আসিয়াতিক'-তে ছাপার জন্য নিয়ে নিলেন। পরে সেগুলো ছাপাও হয়েছিল। সেখানেই বহু ভাষার পণ্ডিত গোয়াবাসী বারগঞ্জা মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হল, যিনি আমাকে হোটেলে পৌছতে এলেন। তিনি ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ওপর বই লিখছিলেন। এবং 'ভরত নাট্যশাস্ত্রে' নৃত্যবিষয়ক অধ্যায়গুলি অনুবাদ করার জন্য আমার সাহায্য চাইলেন। আমি আনন্দের সঙ্গে রাজি হলাম। তিনি পশ্চিমী নৃত্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি জানালেন যে ভরত যতগুলি মুদ্রার পরিচয় দিয়েছিলেন তত ইউরোপীয় নৃত্যশাস্ত্রে নেই। এটা জেনে বেশ গর্ব বোধ করলাম।

আমি হোটেলে থাকতাম কিন্তু খেতে যেতাম মিস্ লুন্জবেরীর বাড়িতে। যেখানে ভাত, সুপ, মাছ, রুটি, মাখন, তরকারি, বহুরকম ফল ইত্যাদি ছিল। সেখানেই আমি প্রথম তাজা আঁজীর খেলাম—সেটি মিষ্টি ছিল না তবে নতুনত্ব ছিল স্বাদে। সেদিন বারগঞ্জা মহাশয় আমাকে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (Bibliothic Nationale) দেখাতে নিয়ে গেলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মতো এটিও বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগারের একটি। এখানে পড়ার ব্যবস্থা আরো ভাল ছিল। তিনটের সময় আমরা সোরবোন্ বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। প্রোফেসার লেবী, প্রোফেসার ফ্রুশে ও অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় হল। অনেকক্ষণ ধরে শাস্ত্র চর্চ্চাও হল। মিস সিলভার বৌদ্ধদর্শনের ছাত্রী—তিনি অনেক বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করলেন। আমাদের গম্ভীর আলোচনা শুনে সর্দার উমরাও সিংহ ঠাট্টা করে বললেন,'আমাদের মতো বুড়োদের আর কি এই মেয়েরা পাত্তা দেয়।' আমি বললাম,'দাড়ি থাকলে তো আরও বেশি বুড়ো মনে হয়।'

আমি সোভিয়েত যাওয়ার জন্য খুব উৎসুক ছিলাম। ইউরোপের আরও অনেক দেশের নাম আমি লন্ডনে থাকতেই বিদেশ বিভাগে আমার পাসপোর্ট পাঠিয়ে লিখিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাতে সোভিয়েতের নাম ছিল না। এর জন্য আমি প্যারিসে ব্রিটিশ কাউন্সেলের কাছে গেলাম। ভেবেছিলাম বেশ অসুবিধে হবে, কিন্তু হল না। কৌন্সেল চীনে থাকাকালীন একটি বুদ্ধমূর্তি পেয়েছিলেন, সেটির বিষয়ে কিছু জানতে চাইলেন। আমি বললাম এবং তিনিও আমার পাসপোর্টে পোল্যান্ড ও সোভিয়েত দেশের নাম লিখে

দিলেন। যদিও এখন একেবারেই নিশ্চিত ছিলাম যে আমি সোভিয়েত যেতে পারব, তবু রুশ ভাষা শিখতে আরম্ভ করলাম। পোল্যান্ডের এক 'কাউন্‌টেস্‌' আমায় অতি যত্ন সহকারে পড়াচ্ছিলেন, তিনি রাশিয়ার বলশেভিকদের দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। কিন্তু তিনি থোড়াই জানতেন যে পীতবস্ত্রে বলশেভিকদের এক দারুণ ভক্ত বসে আছে তাঁর সামনে। সোভিয়েত দূতাবাসে গেলে জানতে পারলাম যে ভিসা পেতে বেশ দেরি হবে। তাঁরা সোভিয়েত যাত্রা-এজেন্সি—ইন্‌তুরিস্ত—এর কাছে পাঠালেন। ইন্‌তুরিস্ত-এর লোকেরা জানালো যে ভিসা পেতে সাত দিন লাগবে এবং খরচ হবে ছত্রিশ পাউন্ড।

একটু নিরাশ হলাম ঠিকই, তবু একবারে আশাহত হলাম না, কারণ লন্ডনে থাকতে এক তরুণ বন্ধু বলেছিলেন যে জার্মানি থেকে সস্তায় এবং সহজে সোভিয়েতে যাওয়া যায়।

আমি একদিন ফ্রেমান্‌-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর দোকান বন্ধ ছিল তাই আমি সোরবোন্‌-এর কাছে ঘুরছিলাম। এক মিশরীয় ছাত্র গলাল (জলাল)-কে পাওয়া গেল। সে আমাকে তার থাকার জায়গাতে নিয়ে গেল। হিসেব করে সে জানাল, যে আমার খরচ মাসে ছশ ফ্রাঙ্ক (প্রায় ৭৫ টাকা) পড়ছে। লন্ডনে তো এর দ্বিগুণেও কাজ চলে না।

একদিন (২৯ নভেম্বর) মাদাম লা-ফব্‌নত আমাকে প্যারিসের উপনগরীতে ঘোরালেন। আড়াইটের সময় আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। মাদাম লা-ফব্‌ন্ত নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। বাইরে এক বিশাল উদ্যান ছিল, সেটিকে দেবদারু বনের মতো করে রাখা হয়েছিল। তিনটের সময়ই পশ্চিম আকাশে সূর্যের আলো রক্তের মতো লাল মনে হচ্ছিল। কম্‌পি গ্রাম হয়ে ভার্সাই-এর মহাপ্রাসাদে গেলাম। আগে এটি ফ্রান্সের ওয়াজিদ আলি শাহ্‌-এর মহল ছিল, কিন্তু এখন সৈনিক সংগ্রহালয়। সেখান থেকে আমরা ফিরে গেলাম। সেই দিনই মিস্টার নাইডু মাদাম কুরির গবেষণাগার দেখালেন। সেখানে এক রুশি তরুণও গবেষণার কাজ করছিল। তার সঙ্গে সোভিয়েতের বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হল। নাইডু সোভিয়েত সম্পর্কে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন।

জার্মানিতে—সোয়া নটায় আমি প্যারিস থেকে জার্মানির উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রথম বিরতি ছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট। ওখানে ঠাকুর ইন্দ্রবাহাদুর সিংহকে আগেই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার কামরায় আমি একাই ছিলাম। পুরো যাত্রাটা রাত্রেই হয়েছিল, তাই আশেপাশে কিছু দেখতে পাইনি। ফ্রান্স-জার্মানির সীমা পার করার সময় রাস্তাতে আধিকারিকরা পাসপোর্ট দেখে নিয়েছিল। ৩০ নভেম্বর সকাল আটটাতে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল, আমি সকালের সেই আলোয় দেখলাম—চারদিকে পাহাড়, যেদিকে-সেদিকে গ্রাম। গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে। এক জায়গায় ঘোড়ায় টানা লাঙল চলছিল। মারবুর্গের কাছে আমি বলদে টানা লাঙলও দেখলাম, আর জিজ্ঞাসা করাতে আচার্য ওটো জানালেন যে তাঁর ছোটবেলায় বেশিরভাগ লাঙল বলদই টানত। জানা যাচ্ছে ইউরোপে ধীরে ধীরে লোকে বলদের জায়গায় ঘোড়া জুততে শুরু করে, আর এখন তো সোভিয়েতের মতো দেশে লাঙল, বলদ বা ঘোড়া তিনের কিছুই নেই, সেই জায়গায়

ট্রাক্টর এসে গেছে। এখন আমরা ভারতবাসীরাই লাঙলের যুগেই রয়েছি। দশটায় আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছলাম। স্টেশনে ঠাকুর ইন্দ্রবাহাদুর সিংহ ও জাপানি পণ্ডিত ড: কিতায়ামা এসে পৌঁছেছিলেন। আমার পোশাকই আমার পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ড: কিতায়ামা এখানে এবং মারবুর্গে—দুটি বিশ্ববিদ্যালয়েই বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপনা করতেন। আমরা সবাই ঠাকুর সাহেবের বাড়িতে এলাম। ঠাকুর ইন্দ্রবাহাদুর কাশী বিদ্যাপীঠের শাস্ত্রী ছিলেন, তিনি সেখানে পি· এইচ· ডি-র প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেখানে ডাঃ সুধীন্দ্র বোসের ভাইপো ইঞ্জিনিয়ার বোস এবং দিল্লী নিবাসী ড: দেবীলালের সঙ্গেও দেখা করলাম। ড: দেবীলাল ও বোস এখন ছাত্র ছিলেন না, তাঁরা ভারত থেকে চা আনিয়ে বিক্রি করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। ড: কিতায়ামা জানালেন যে ড: ওটো বাইরে চলে যাবেন, তাই আপনি আগে মারবুর্গ চলুন। ড: ওটো ছিলেন জার্মানির নামকরা সংস্কৃতজ্ঞদের একজন। তিনি বিদ্বানও ছিলেন, আবার খ্রীস্টভক্তও। কিন্তু বড় উদার মনোভাবের ছিলেন। যখন আমি প্রথমবার শ্রীলংকা যাই তখন কয়েক মাস পরেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমরা একজন আরেকজনের খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম এবং পরে নিয়মিত চিঠিপত্রের দেওয়া-নেওয়াও ছিল। তিনি আমাকে মারবুর্গে আসার জন্য খুব করে বলছিলেন আর তাই ড: কিতায়ামাকে পাঠিয়েছিলেন।

সকালে আমার চা-জলখাবার ইন্দ্রবাহাদুরজীর বাড়িতেই হল, দুপুরে আমরা একটি রেস্তোরাঁতে খেতে গেলাম। প্রথমে গোমাংস এল, নাম জানতে পেরেই আমি সেটা খেলাম না। ইউরোপে ভারতীয় ছাত্ররা এসব ব্যাপারে পরোয়া করত না। আমিও যদি বেশিদিন থাকতাম তাহলে হয়তো পরোয়া করতাম না।

খাওয়ার পর কয়েকটি জিনিস সঙ্গে করে কিতায়ামার সঙ্গে স্টেশনে পৌঁছলাম। চার মার্ক দিয়ে মারবুর্গের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট নিলাম। যদিও এখনো বরফ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু সবুজ কোথাও ছিল না। কৃষকরা মাঠে চাষ করছিল। এখানকার কৃষক-মেয়েরা লম্বা চুল তেমনই রেখেছিল। প্যারিস ও লন্ডনের মত তারা কেটে ফেলেনি। পাহাড়গুলো গাছে ঢাকা ছিল। চারটের সময় আমরা মারবুর্গ পৌঁছলাম। ট্রামে উঠে হোটেলে গেলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমি ড: ওটোর বাড়িতে গেলাম। তাঁর বাড়ি পাহাড়ের ওপর একটু উঁচুতে ছিল। পাঁচ ঘণ্টা ধরে আমাদের শাস্ত্রচর্চা চলল। কখনো পালি এবং বৌদ্ধধর্ম, কখনো মহাযান, কখনো রামানুজের বিশিষ্ট দ্বৈত বেদান্ত আর কখনো আর্যদের অশ্বপালন, এই সব আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল।

২ ডিসেম্বর আমার মারবুর্গেই থাকার কথা ছিল। সকালে রুটি, মাখন, কফি খাওয়া হল। হোটেলে স্নানের ব্যবস্থা ছিল না। দুপুরে খাওয়ার জন্য আমরা ড: ওটোর বাড়ি গেলাম। মাংস, আলুসিদ্ধ, কপি ও আরও অন্যান্য কয়েক রকমের জিনিস ছিল। সেখান থেকে ফিরে হোটেলে একটু বিশ্রাম করলাম। বেলা তিনটের পর কিতায়ামা আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেন। ড: ওটোর শীতের ছুটিতে ইতালি রওনা হওয়ার কথা ছিল, তাই আজ চার-পাঁচশো শিষ্য-শিষ্যারা তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য জড়ো হয়েছিল। ড: ওটো আজ মহাত্মা গান্ধীর বিষয়ে বক্তৃতা করলেন। আমিও পীতবস্ত্র পরে সেখানে বসে

ছিলাম। শ্রোতাদের কৌতূহল ছিল, তিনি আমার বিষয়েও কিছু বললেন। চা-পানের পর তিনি তাঁর ধার্মিক সংগ্রহালয় দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে বৌদ্ধ, হিন্দু, ইহুদী, খ্রীস্টান ও ইসলাম পাঁচটি ধর্মের পূজা-সামগ্রী, বই, পুজোর পাত্র, মূর্তি, ও চিত্রপট—ঠিকঠাকভাবে সাজিয়ে রাখা ছিল। আমি তিব্বত থেকে আনা যে বই ও চিত্রপট শ্রীলংকা থেকে তাঁকে পাঠিয়েছিলাম সেগুলোও সেখানে রাখা ছিল।

প্যারিস থেকে তিব্বতী চিত্রপটগুলো এখানে আসার কথা ছিল, ড: ওটো সেগুলোর প্রদর্শনীর জন্য খুব উৎসুক ছিলেন—প্যারিসেও সেই চিত্রগুলোর প্রদর্শনী মুজিস্থিতে হয়েছিল, এবং দর্শকেরা তার বেশ প্রশংসা করেছিল, কিন্তু চিত্রপটগুলো এখনও মারবুর্গে পৌঁছোয়নি। ৩ তারিখে ড: ওটোর সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা হল। আজই তাঁর ইতালি যাওয়ার কথা। আর আমিও সোভিয়েত যাওয়ার আশায় বার্লিন পৌঁছনোর তাড়াতে ছিলাম।

পৌনে পাঁচটার গাড়ি ধরে পৌনে দু ঘণ্টায় ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছলাম। স্টেশন থেকে মোটরে করে ইন্দ্রবাহাদুরজীর বাড়ি পৌঁছলাম। আজ ভারতীয় মিত্র মণ্ডলীর বৈঠক ছিল। আমাকেও সেখানে কিছু বলতে হল। ১১ তারিখ পর্যন্ত এখানেই থাকার ছিল। ৪ তারিখ রাতে আমরা দুজন শহর দেখতে বেরুলাম। পীতবস্ত্র না দেখানোর জন্য আমি ইন্দ্রবাহাদুরজীর ওভারকোট পরে নিয়েছিলাম। আসলে সেটি ওভারকোট নয়, বাড়ির ভেতরে পরার কোট ছিল। সেটি পরে বাইরে বেরুনো দেশাচার বিরোধী। তবু আমরা রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। আর রবিবার, রাস্তায় বেশ ভিড় ছিল। গাছে এতো বৈদ্যুতিক আলো লাগানো ছিল যে মনে হচ্ছিল আলোর ঝাড়। এদিক-ওদিকে কিছু যুবতীরা দাঁড়িয়েছিল। ইন্দ্রবাহাদুরজী তাদের দেখিয়ে বললেন,'এরা বেশ্যা।' প্রতি দশ পা দূরে দূরে চার-পাঁচজন বেশ্যা দাঁড়িয়ে আছে। এটা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আরও আট-দশবার বলার পর আমি বললাম, 'থাক, আমাকে আর বোকা বানিওনা।' তারপর আর কি?—আমরা একটি গলির রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি ইশারা করে দিলেন, মহিলারা আমার হাত ধরে ফেলল। আমার জার্মান ভাষার যে পুঁজি ছিল তাতে 'নাইন' (না) শুধু এইটুকুই মুখ থেকে বেরোচ্ছিল। আমি ইন্দ্রবাহাদুরজীর কাছে জোড়হাত করে তবে রেহাই পেলাম।

৫ তারিখে আনন্দজীর চিঠি এল। তিনি লিখেছেন যে মহাবোধি সভার লোকেদের খুবই ইচ্ছে যে আমি গিয়ে লন্ডনে থাকি ও পরে আমেরিকা যাই। কিন্তু ইউরোপের পুঁজিবাদী জীবন আমার ভীষণ রুক্ষ বলে মনে হতো। আমি ভাবলাম যা দেখার ছিল দেখে নিয়েছি—আমেরিকায়ও এই মানুষ,এই জিনিসই আছে,কাজেই শুধু শুধু সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। ছোটবেলা থেকেই তো আমি অত্যন্ত ভ্রমণপ্রেমী, তবে এই যাত্রায় অনাসক্তি কেন? কারণ, এটি সাহসের যাত্রা নয়, আরামপ্রদ যাত্রা ছিল। রেল, মোটর, জাহাজে চড়া, বড়-বড় বাড়িতে থাকা, কোথাও বড়লোকদের বিলাসিতা দেখে বিরক্ত হওয়া কিংবা কোথাও গরিবদের দুঃখ দেখে কষ্ট পাওয়া। আমি লিখে দিলাম যে আমি এবার দেশেই ফিরব। হ্যাঁ, রুশ যাওয়ার ইচ্ছে তো আগের মতোই প্রচণ্ড ছিল, ফ্রাঙ্কফুর্টে থাকাকালীন আরও দশ পাউন্ড এসে গেল। তাই যাওয়ার ভাড়ার ব্যাপারে খানিকটা

নিশ্চিন্ততা দেখা দিচ্ছিল।

ড: ওটো এক সুইস মহিলার (Olga Frobe Keptyr) আঁকা কিছু রঙিন জ্যামিতিক ছবি দেখালেন। তিনি বললেন এই মহিলা স্বপ্ন সমাধিতে এইসব ছবি দেখেন ও পরে সেগুলি কাগজে আঁকেন। আমার মতামত জানতে চাইলে বললাম যে এর মধ্যে কিছু ছবির তিব্বতী মণ্ডলচক্রের সঙ্গে মিল আছে। তিনি আরও বললেন যে সেই মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। ৬ তারিখে সুইস মহিলার তারবার্তা পেলাম, তিনি পরের দিন আসছেন। যাই হোক, এখন তো আমার এখানে থাকারই কথা। দ্বিতীয় দিন (৭ ডিসেম্বর) চারটের সময় তিনি এলেন। অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হল। যোগ ব্যায়ামে তাঁর খুবই আস্থা ছিল এবং কিছু কিছু তিনি প্রতিদিন করতেন। তিনি অনেক করে বললেন যে, আমি যেন তাঁর বাড়িতে যাই। যোগীদের ভণ্ডামির সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। আমার স্বভাব এত যুক্তিপ্রবণ যে আমি আত্মসম্মোহন (Self Hypnotization) করতে পারি না, কিন্তু অন্যদের সমাধিস্থ করা কোনো কঠিন ছিল না। কিন্তু আমি হৃদয়হীন নাটক বার বার করতে প্রস্তুত নই। বিদ্যা সম্পর্কিত অনুসন্ধানই আমার প্রিয়। মহিলাটি এই রংগুলো ধ্যানে দেখেছিলেন। আমি লাদাখে সম্মোহন দ্বারা বুদ্ধগয়ার মন্দির ও আরও কত শহর অন্যদের দেখিয়েছিলাম এবং জানতাম যে প্রতিটি দেখা এবং শোনা ঘটনার ছাপ চিত্রের একাগ্রতার কারণে ভৌতিক রূপে দেখা দেয়। তিব্বতের সিদ্ধ পুরুষদেরও আমি দেখেছিলাম। আমি মহিলার ছবিগুলোর যে ব্যাখ্যা করলাম তাতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন।

পরের দিন আমি বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম, সব জিনিসে সৌষ্ঠব ছিল। সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্য ভাষা শেখার ব্যবস্থা ছিল। শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ (ছাপরা) এখানেই পড়াশুনো করছিলেন, কিন্তু তিনি বেড়াতে ভালবাসতেন এবং এই সময়ে তিনি নরওয়ে-সুইডেন বেড়াতে গিয়েছিলেন।

রবিবার মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা শহরের পুরনো দিকগুলো দেখতে গেলাম। সেই বাড়িটিও যেখানে মহাকবি গ্যায়টে জন্মেছিলেন। পুরনো ফ্রাঙ্কফুর্টের গলিগুলো বেনারসের গলির মতো আঁকাবাঁকা ও সরু ছিল, কিন্তু অতটা নোংরা ছিল না। তারপর আমরা রাইন্ নদীর ধারে দেবদারু গাছের গা ঘেঁসে ঘুরে বেড়ালাম। আজ বেশ শীত ছিল।

বিকেলে মারবুর্গ বিদ্যালয়ের প্রোফেসার ফ্রিক্ এলেন দেখা কবতে। তিনি ধর্মের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি জানালেন যে পৃথিবীতে এমন সব বিপজ্জনক ধ্যানধারণা ছড়াচ্ছে যে এখন থেকে সাবধান না হলে একদিন ধর্ম লুপ্ত হয়ে যাবে। এখন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় নয়, সমস্ত ধর্ম মিলে এই নতুন বিপদের মোকাবিলা করা উচিত। তিনি এও বললেন যে আমাদের ছাত্র বিনিময় করা উচিত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র বিনিময় করুক তা আমি পছন্দ করতাম, কিন্তু ধর্মের তরী ডুবে যাচ্ছে বলে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে প্রস্তুত ছিলামনা, তবু শিষ্টাচারের জন্য আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকলাম। তিনি আমাকে একদিনের জন্য মারবুর্গ আসতে বললেন কিন্তু আমি 'কালই বার্লিন চলে যাচ্ছি' বলে ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

মানুষ নিজের জীবনযাত্রায় কত সহৃদয় নারী-পুরুষের সংস্পর্শে আসে, তাদের কাছ

থেকে কত সাহায্য ও সহানুভূতি পায়। এইসব উপকারের প্রতিদান দেওয়া মানুষের সাধ্যের বাইরে। আমি বুঝি না কেন মানুষকে এত স্বার্থপর ভাবা হয়। আমি এটাও স্বীকার করি যে, স্বার্থের পিছনে অন্ধ হয়ে যাওয়া মানুষও পাওয়া যায়, কিন্তু যদি সবাই স্বার্থপর হত তাহলে কারুর জীবনে কোনোরকম মাধুর্য থাকত না। আমিতো নিজের জীবনযাত্রার কথা যখন চিন্তা করি তখন আমার সামনে সহস্রাধিক স্নেহপূর্ণ মুখ ভেসে ওঠে। আমি মনে মনে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, তাদের উপকারের ঋণ শোধ করা অসম্ভব। মানুষের মধ্যে যে স্বার্থপরতা আসে সেটা তার স্বাভাবিক প্রকৃতি বলে আমি মনে করি না। তার জন্য নিরানব্বই ভাগ দায়ী আজকের সমাজের গঠন। যদি এই স্বার্থান্ধতাপূর্ণ সমাজের গঠন না থাকে তাহলে মানুষ সত্যিসত্যিই উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে।

১২ ডিসেম্বর, এখনও প্যারিস থেকে চিত্রপটগুলো আসেনি, রাত পৌনে এগারোটার গাড়িতে বার্লিনের জন্য রওনা হলাম। ভাড়া ছিল ২৪ মার্ক (প্রায় ১৮ টাকা)। বার্লিন এখান থেকে ৬০০ কিলোমিটার (৪০০ মাইল)-এর চেয়ে বেশি ছিল। গাড়িতে ভিড় ছিল না, আমি শুয়ে-শুয়েই চলে গেলাম। জ্যোৎস্না রাতে উঁচু-নীচু জমি ও পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। কোনো কোনো জায়গায় চাষ করা জমি ছিল কিন্তু এখনও বরফ ছিল না।

১৩ ডিসেম্বর ৭টায় অনটেনহল্ট স্টেশনে পৌঁছলাম। কুমারী ওয়ার্থা ডাল্‌কে এক তরুণের সঙ্গে স্টেশনে ছিলেন। আমার বার্লিনে নয়, ফ্রোনোর বুদ্ধ-ভবনে থাকার কথা ছিল। স্টেশন থেকে মোটরে করে বৈদ্যুতিক ট্রেনের স্টেশনে গেলাম, সেখান থেকে ফ্রোনো স্টেশনে নামলাম। ফ্রোনো বার্লিনের উপনগরী। জার্মানির চিকিৎসক ও প্রসিদ্ধ বিদ্বান ডাঃ পল ডালকে একটি ছোট পাহাড়ের ওপর এই বৌদ্ধ বিহারটি তৈরি করিয়েছিলেন। পাহাড়টির বেশির ভাগ মাটিতে ঢাকা, তার ওপর দেবদারু গাছ। এরই মধ্যে আলাদা আলাদা বাসস্থান, বুদ্ধ মন্দির, সমাধি ভবন, ইত্যাদি বেশ কয়েকটি ভবন বানানো ছিল। ডাঃ ডালকে এই বাড়ির জন্য একটি ট্রাস্ট করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। এখন এগুলি তাঁর তিন বোন, ছোট পুত্রবধূ ও ভাইপোর সম্পত্তি ছিল। বোনেরা, বিশেষ করে ওয়ার্থা, চাইতেন যে তাঁর ভাই-এর কীর্তি বৌদ্ধ ধার্মিক কেন্দ্র রূপে থাকুক। পথে আমরা মজদুরদের ছোট ছোট ঘর দেখলাম, তার ওপরে লাল ঝাণ্ডা উড়ছিল। বাড়িতে ডালকে পরিবার আমায় অভ্যর্থনা জানালো। সেখানে শ্রী জুন্‌জী সাকাকিবার-এর সঙ্গে আমার দেখা হল। সাকাকিবারা জাপানের সিন্‌সু সম্প্রদায়ের তরুণ পুরোহিত, এখানে পড়াশুনা করার জন্য এসেছিলেন। আমি স্নানাহারের পর বিশ্রাম নিলাম। সন্ধে ৭টায় পঞ্চাশজন বুদ্ধভক্তদের সভা হল। ড: ব্রুনো বক্তৃতা দিলেন, আমিও। সেখানে লাহোরের এক মৌলবী সাহেবও এসেছিলেন, যিনি ইসলাম ধর্মের প্রচার করছিলেন।

যেখানে হলুদ বস্ত্র দেখে মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, যে জায়গার ভাষাও জানা নেই এবং বার্লিনের মতো শহর, যেখানে যেতে পথে অনেক স্টেশন বদলাতে হয়, সেখানে একা যাত্রা করাতে অবশ্যই অসুবিধে টের পাওয়া যায়। ১৪ তারিখ আমি মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ফ্রোনো স্টেশন থেকে উঠে বার্লিন গেলাম। ইউনিভার্সিটির তরুণ ছাত্র,

ওস্টের-এর সঙ্গে স্টেশনেই দেখা হল। গাড়ি বদল করে তাঁর সঙ্গে শার্লোটন্‌বর্গ স্টেশনে পৌঁছলাম। আমি আজ বার্লিন এসেছিলাম, বস্তুত, সোভিয়েত যাওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা করতে। সরোজিনী নাইডুর ছেলে বাবা নাইডু, ভগ্নিপতি নাম্বিয়ার ও আরও অনেক ভারতীয় কম্যুনিস্ট বার্লিনে থাকেন, এটা আমি শুনেছিলাম। নাম্বিয়ার ইত্যাদি ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম কিন্তু তিনি বাড়িতে ছিলেন না। টেলিফোনে কথা হল। তিনি একটি রেস্তোরাঁতে দেখা করতে বললেন। আমি সেখানে চলে গেলাম। বহু মানুষ সেখানে খাচ্ছিলেন, আমি এক কোণায় গিয়ে বসলাম, তবু সকলের নজর ছিল আমার পোশাকের দিকে। মনে হচ্ছিল, শরীরে যেন এতগুলো ছুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আড়াই ঘণ্টা পরে নাম্বিয়ার খবর পাঠালেন, আজ আমার সঙ্গে দেখা করার সময় হবে না। আমি জানতাম, বিদেশেও ভারতীয় কম্যুনিস্টদের পেছনে ব্রিটিশ সরকার চর লাগিয়ে রাখত যারা সবসময় তাদের পিছনে-পিছন ঘুরত। তাঁর আমাকে ইংরেজ চর বলে সন্দেহ করাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যদিকটাও মনে রাখতে হবে যে, হতে পারে যে লোকটি দেখা করতে চায় সে সৎ, আমাদের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, আমাদেরই মতো তাকেও গুপ্তচরদের (ইংরেজ) থেকে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। তাছাড়া তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমরা সময় দিয়েছি, সে আশ্চর্য রকমভাবে, চিড়িয়াখানার জন্তুর মতো লোকের ভীড়ে বসে রইল। আড়াই-আড়াইটা ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করতে থাকল, এমন লোকের সঙ্গে দুমিনিট কথা না বলে আমার আসার ফুরসৎ নেই জানিয়ে খবর পাঠিয়ে দেওয়াটা কি ভদ্রজনোচিত বলা যেতে পারে? আমি কোনো নাম্বিয়ারকে পরোয়া করি না, কিন্তু সোভিয়েত-দেশ দেখার জন্য উতলা হয়েছিলাম। কেউ বলেছিল যে, নাম্বিয়ারের মদতে সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। অপার ক্ষোভের সঙ্গে আমি সেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলাম। যত্রতত্র খোঁজাখুঁজির পর আমি লক্ষ্ণৌ নিবাসী আমার বন্ধু রামচন্দ্র সিংহের সঙ্গে দেখা করলাম। রামচন্দ্র সিংহ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অত্যন্ত কৃতি ছাত্র ছিলেন। এম· এস· সি· করার পর তিনি বার্লিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনস্টাইনের অধীনে গবেষণা করছিলেন। তাঁর জীবনও খুব দুঃখের ছিল। ডি·এস·সি শেষ করতে আর কিছু মাস মাত্র বাকি ছিল। হিটলার জার্মানির শাসন হাতে নিয়ে ইহুদীদের ওপর জুলুমের পাহাড় ভাঙতে শুরু করেছিল। আইনস্টাইনকে জার্মানি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। রামচন্দ্রর গবেষণায় বাধা পড়ল। বিজ্ঞানের পথ ছেড়ে তিনি কখনো কোনো কোম্পানির এজেন্সি নিলেন, কখনো ওকালতি শুরু করতে চাইলেন, কখনো অন্য কোনো ভাবে জীবিকা উপার্জনের রাস্তা ধরলেন। রামচন্দ্র জার্মান ফ্যাসিবাদের শিকার হলেন, সেই সঙ্গে আমাদের আজকের সমাজ ব্যবস্থারও। যদি সে নিজের বিষয় নিয়ে লেগে থাকত, তাহলে তার সায়েন্সের জ্ঞান বাড়াতে ও দেশের সমৃদ্ধি বাড়াতে যে-মস্তিষ্ক অত্যন্ত সহায়ক হত, সেই মস্তিষ্ক একদিকে নিজের সমস্ত মহত্বাকাঙ্ক্ষাগুলোকে ধুলোয় মিশতে দেখল, অন্যদিকে নুন-তেল যোগানোর জন্য তাকে এমন সব কাজ করতে হল, যার জন্য সে নিজেকে কখনো তৈরি করেনি। তাহলে যদি বীণার তার ছিঁড়ে যায় তাতে আশ্চর্যের কি আছে। বস্তুত, এই সব প্রতিভাকে ব্যর্থ করার যে চেষ্টা বর্তমান সমাজব্যবস্থা করছে, তা

দেখে মন উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে থাকে, ইচ্ছে হয় এই সমাজকে ধূলিসাৎ করে দিই। রামচন্দ্রর মতো এরকম মেধাবী ছাত্র তার বিশ্ববন্দিত গুরুর চলে যাওয়ার কারণে একদিকে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়, খরচ-খরচার অসুবিধে ছাড়াও নিজের কাজ সে সম্পূর্ণ করতে পারে না। অন্যদিকে গর্দভের ছেলে গর্দভ শুধুমাত্র সোনা, রূপোর বলে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজে জলের মতো টাকা খরচ করে নিজেদের ও অন্যদের সময় নষ্ট করছে।

রামচন্দ্রের স্ত্রী কমলাও দু বছর ধরে বার্লিনেই ছিল। তার বাপের বাড়ি পাটনায়। তিনি শুধু হিন্দি পড়েছিলেন। রামচন্দ্র তাকে জার্মানি ডেকে নিলেন। আর এখন তিনি জার্মান ভাষা বলতে ও পড়তে পারেন। বেচারি ইংরিজি জানত না। স্বামী-স্ত্রী বেশ আনন্দে ছিল এবং খুব কম খরচে জীবনযাপন করত। রামচন্দ্রজী বললেন যে ১৫০ মার্কে লেনিনগ্রাদ যাত্রা হতে পারে—যাওয়া আসা দুটোই। আমার কাছে ২৫০ মার্কের মতো ছিল, তাই অর্থের ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। তিনি বললেন যে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে-টরে যা ব্যবস্থা করা যায়, আমি করবো। রামচন্দ্র নিজে সোভিয়েত যাননি, কেননা সোভিয়েত চলে গেলে পরে ভারতে আসতে সরকার বাধা দিত। কিন্তু কমলা ওখান হয়ে এসেছিল। রামচন্দ্রজীও সোভিয়েতের বিষয়ে অনেক পড়েছিলেন ও শুনেছিলেন, আর তাঁর খুব পক্ষপাতিত্বও ছিল। আমি আমার নিজের লেখা বই 'বাইশবী সদী' তাঁকে দিলাম। সেই সময় রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা খুব সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়ে আসছিস। তিনি বইটি পড়ে বললেন, 'কি করে আপনি এসব ব্যাপার কল্পনা করলেন, যার ওপর সোভিয়েতের যোজনা আজ সক্রিয়।' আমার পক্ষে এটা কল্পনা করা কিছু কঠিন ছিল না। যদিও বইটি আমি ১৯২৩-২৪-এ শেষ করেছি, সময়ের অভাব ছিল তা নাহলে 'বাইশবী সদী'কে ১৯১৮ বা ১৯২২-এ শেষ করে ফেলতাম। আখেরে আপনি যখন এই সিদ্ধান্তগুলো মেনে নিচ্ছেন যে সারাটা দেশ একটি পরিবার, দেশের সমস্ত সম্পত্তির ওপর সেই বিশাল পরিবারের অধিকার, বিজ্ঞানের নতুন নতুন অনুসন্ধানগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োগ করার জন্য সেই পরিবার অস্থির হয়ে রয়েছে, তাহলে মানুষ মার্ক্স এবং মার্ক্সবাদীদের না পড়ে থাকলেও, সে তেমনিভাবেই গ্রাম, নগর, খেত-খামার, বাগান, বিদ্যালয়, নাট্যশালা ইত্যাদির কল্পনা করবে।

রাতে ফ্রোনোতে ফেরার সময় কয়েক জায়গায় ট্রেন পাল্টানোর ছিল। রামচন্দ্রজী আমাকে শেষবার পাল্টানো স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন এবং আমি মাঝরাতে বুদ্ধভবনে ফিরে এলাম।

সে-সময় একদিকে নাম্বিয়ারের ব্যবহারে যেমন বিষণ্ণ ছিলাম, অন্য দিকে রামচন্দ্রের সৌহার্দ্যে হৃদয় ছিল স্নেহসিক্ত।

১৬ ডিসেম্বর আমি ও সাকাকিওয়ারা দুজন একসঙ্গে বার্লিন গেলাম। রামচন্দ্রজী জানালেন যে ২৮ জানুয়ারির আগে লেনিনগ্রাদ যাওয়ার ব্যবস্থা হবেনা এবং এটাও বললেন যে আমি এক সপ্তাহ আগে এলে সহজেই যেতে পারতাম।

লন্ডনে সিংহলের এক তরুণ আমাকে এক জার্মান কম্যুনিস্টের ঠিকানা দিয়েছিল। আমি তাকে একটি পোস্টকার্ড লিখে দিলাম। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে দেখলাম এক হৃষ্ট-পুষ্ট

লোক খালি মাথা, সাধারণ শ্রমিকের মত চামড়ার কোট পরে দুহাতে পনের পনের সেরের ব্যাগ ঝুলিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে নিজের পরিচয় দিল। আর চেহারা-টেহারা দেখে সাধারণ শ্রমিক ছাড়া তাকে অন্য কিছু বলা যায় না। কিন্তু তিনি পি.এইচ ডি (দর্শন-আচার্য) ছিলেন। কথাবার্তা, ব্যবহার তো আরো মধুর ছিল। আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথা বললাম। সোভিয়েত যাত্রার ব্যবস্থা করতে পারলেন না বলে তাঁর খুব দুঃখ ছিল। কিছুদিন পরে (২২ ডিসেম্বর) আমি রামচন্দ্রজীর সঙ্গে জিমান কোম্পানির বিশাল কারখানা দেখে ভোরবেলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেই সময় পিছন থেকে কেউ ডাকল। আমি দেখলাম সেই চামড়ার কোট পরিহিত বিশাল মূর্তি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি হাত মেলালেন। আমি ভাবতে লাগলাম, ইনিও কম্যুনিস্ট এবং নাম্‌বিয়ারের মত লোকও কম্যুনিস্ট। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, কমলা যখন তাঁকে আমার বিষয়ে কিছু বলেছিলেন তখন দেখা করার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু আমি আর সেখানে যাইনি।

বেশির ভাগ সময় আমি বুদ্ধভবনে থাকতাম। কখনো সাকাকিওয়ারার সঙ্গে কথাবার্তা হতো কখনো ওয়ার্থার সঙ্গে। বার্মার উত্তমভিক্ষু বুদ্ধভবনটিকে কিনতে চাইছিলেন। ডালকে পরিবারও সেটা বিক্রি করতে রাজি ছিল। ইউরোপীয় ধরনের বাড়ি হলে বোধ হয় অন্য ক্রেতাও সহজে পাওয়া যেত। কিন্তু সেখানে কোনো বাড়িটি চৈনিক ঢঙের ছিল, কোনোটি বর্মী ঢঙের আবার কোনোটি ভারতীয় ঢঙের তো কোনোটা লংকার মত। ভিক্ষু উত্তম নিজে এই কাজের জন্য জার্মানি আসতে চাইছিলেন কিন্তু সরকার তাঁকে আসার জন্য পাসপোর্ট দিচ্ছিল না। ডালকে আজ কাল করতে-করতে বাড়ির ট্রাস্ট তৈবি করে উঠতে পারেনি। ভিক্ষু উত্তম আজ কাল করতে-করতে সেটা কিনতে পারেননি।

জার্মানির শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বুদ্ধ-অনুরাগী মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। সংস্কৃত ও পালি ভাষার বড় বড় বিদ্বান জার্মানিতে জন্মেছিলেন। তাঁরা সহস্রাধিক বই সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন। তাঁরা জেনেছিলেন যে পৃথিবীতে এমন এক মানুষও জন্মেছিলেন যাঁর জীবনে যীশুর চেয়েও বেশি প্রেম, মাধুর্য ও সরলতা ছিল, যাঁর প্রতিভা কত-কত ব্যাপারে আড়াই হাজার বছর পরে আজও একেবারে তাজা আছে। এমন এক ব্যক্তির প্রতি নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিতদের আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। যদি তাঁরা বেশি ধনী হতেন তাহলে তাঁদের এমন এক ধর্মের প্রয়োজন হত যার দ্বারা সাধারণ মানুষের চোখে বেশি ধুলো দেওয়া যেত। আর এরকম ধর্ম সেটাই হতে পারে যাকে শত শত বছর অবলম্বন করে জনতা হাজার-হাজার পরম্পরা আর মিথ্যা বিশ্বাসের জালে নিজের চারপাশ ঘিরে রেখেছে। যদি তারা সম্পত্তিহীন শ্রমিক শ্রেণীর হত, তাহলে ধ্যান ও নির্বাণের মদের নেশায় না ডুবে কোন ভাল কাজ হাতে নিতো যাতে জগতে মানুষের জীবন আরও সুখের হতে পারতো।

ডাঃ ডালকের মতো আরও অনেক জার্মান শিক্ষিত মানুষ ছিলেন, যাঁরা বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সিলোন-এর দোডন্দুর-এর দ্বীপটিকে জার্মান ভিক্ষুরা এক বৌদ্ধ বিহারে পরিণত করেছিলেন। এবং সেখানকার স্থবির জ্ঞানাতিলোক নিজের মাতৃভাষা জার্মানে বৌদ্ধধর্মের ওপর বহু ভাল ভাল বই লিখেছিলেন। ডালকের কলম তো আরো

জোরদার ছিল এবং তিনি আধ ডজনেরও বেশি খুবই ভাল বই লিখেছিলেন। জার্মানির শহরগুলোর সমস্ত জায়গাতে বুদ্ধের ভক্ত পাওয়া যেত। তাঁদের মধ্যে প্রোফেসার আর ডাক্তারও যথেষ্ট ছিল। ডাক্তার স্টাইন্‌কে তো ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক, কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্মকে ভালভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং নিজের মুখে তার খুব প্রচারও করেছিলেন। দু-তিনবার তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। ডাঃ ডালকে জার্মানির উত্তরের সমুদ্রতটেও একটি ছোটমতো বুদ্ধভবন স্থাপন করেছিলেন। এখন শীতকালের মাঝামাঝি। খুব ঠাণ্ডা পড়ছিল। কিন্তু আমাদের কাছে ফ্লানেলের চীবর ছিল তাই ঠাণ্ডার জন্য কোনো চিন্তা ছিল না।

রামচন্দ্রজী জীমানের কারখানাটা দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদ্যুৎ সম্পর্কিত যন্ত্র তৈরির এটা ছিল পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম কারখানা। ২২ ডিসেম্বর রামচন্দ্রজী আমাকে নিয়ে সেখানে গেলেন। কারখানা কি বলব, যেন একটি গোটা শহর। দু বছর আগে এখানে এক লাখ কুড়ি হাজার কাজ করার লোক ছিল। বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য চল্লিশ হাজার লোককে জবাব দিয়ে দিতে হল। কারখানার ম্যানেজার আমাদেরকে তাঁর গাড়ি এবং একজন পথপ্রদর্শক দিয়েছিলেন। আমরা ঘুরে ঘুরে কারখানার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আর শ্রমিকদের ঘরগুলো দেখতে থাকলাম। রাতে রামচন্দ্রজীর বাড়িতে থাকলাম। তাঁর বাড়িওলি ছিল এক জার্মান জেনারেলের কন্যা। পশ্চিমী দেশগুলোতে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া অতটা সহজ নয়, তাই বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া কুমারী খুব দেখা যায়। কয়েক বছর আগে যখন জার্মান পয়সা মার্ক-এর মাটির দাম হয়ে গিয়েছিল, সেই সময় বাপের জমানো পয়সা ব্যাঙ্কে থাকতে থাকতে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তখন মহাধনী জেনেরাল কন্যার জীবিকার কোনো অবলম্বন থাকেনি। সে চার পাঁচটা ঘর বাড়িওলার থেকে ভাড়াতে নিয়েছিল আর এখন সেই ঘরগুলোকে ভাড়ায় দিয়ে এবং ভাড়াটেদের চা-জলের ব্যবস্থা করে নিজের জীবিকা উপার্জন করে নিচ্ছিল। তিন দিন পর বড়দিন, খ্রীস্টানদের সবচেয়ে বড় পরব, তাই ঘরে-ঘরে তারই প্রস্তুতি চলছিল। গৃহকর্ত্রী যে ঘরে আমার শোয়ার ব্যবস্থা করেছিল, সেই ঘরে যীশুর জন্মের প্রদর্শনী দেখানোর জন্য ভেড়া এবং মা-বাপ মরিয়ম তথা জোসফ (য়ুসুফ)-এর ছোট-ছোট মূর্তি বানিয়ে রাখা ছিল।

দ্বিতীয় দিন ২৩ ডিসেম্বর আমরা বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও অনেক সংগ্রহালয় (মিউজিয়াম) দেখতে গেলাম। জার্মানিতে বিদ্যার প্রতি খুব ভালোবাসা আছে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতে জার্মানদের প্রচুর অবদান আছে। প্রাচ্যের ভাষা ও সংস্কৃতির অধ্যয়নেও তারা সর্বদা এগিয়ে রয়েছে। তাদের সংগ্রহালয়গুলোতে জিনিসপত্রকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে, লন্ডন ও প্যারিসের মতো সূচিপত্রকে ক্রমানুসারে রাখা হয়নি, তবে যে ক্রমানুসারে রাখলে দর্শকদের সে-ব্যাপারে বেশি বেশি জ্ঞান হতে পারে, সেইভাবে রাখা হয়েছে। মধ্য এশিয়ার ভিত্তিচিত্রগুলোকে, তার বাতাবরণকে দেখাবার জন্য, মন্দির খাড়া করে দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টমাস কুক চিত্রপটের দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন, তাই আমি তাঁর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

—১৯৩২—

জার্মানিতে আট বৎসরের পড়াশুনা অনিবার্য, তারপর চার বৎসর হাইস্কুলে পড়াটা নিজের ইচ্ছা ও শক্তির ওপর নির্ভর করে। ১৩ বৎসর পর হাইস্কুলের পরীক্ষা শেষ করে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, আর সেখানে তিন বৎসরের মধ্যে পি· এইচ· ডি· উপাধিপ্রাপ্ত হয়।

আজ (২৪ ডিসেম্বর) বড়দিনের প্রথম রাত্রি। আমাদের এখানেও ডালকে পরিবার দেবদারুর ডাল পুঁতেছিল, তাতে অনেক আলো জ্বলছিল। লোকে বন্ধু, প্রিয়জন ও শিশুদের উপহার দিচ্ছিলেন। ধর্ম গ্রহণের আগেও জার্মানিতে এরকম উৎসব পালন করা হত, যার উপলক্ষ ছিল সূর্যের উত্তরায়ণের আরম্ভ।

২৪-এই লন্ডন থেকে তার এল যে মারসেই থেকে 'ফেলীরুসল' ফ্রেঞ্চ জাহাজে যাত্রা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২৫ ডিসেম্বর আজ বড়দিন। ৭টার সময় আমি ফ্রোনো ছাড়লাম। ৬২ মার্কে (১টাকা সমান ১ মার্ক) বার্লিন থেকে মারসেই শহরের টিকিট পেলাম। পথে যেতে পাহাড়ের ওপরে এবং নিচেও এখন বরফ দেখা যাচ্ছিল। চারটের সময় বিকেলে আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছালাম। ইন্দ্রবাহাদুরের বাড়িতে পৌঁছবার পর জানতে পারলাম তিনি ছুটিতে বাইরে চলে গেছেন। ড: লালও বাড়িতে ছিলেন না। ভাষার সমস্যাও মাথায় ছিল। এদিক-ওদিক খুব ঘোরাঘুরি করলাম, শেষে ১২ মার্ক (১২ টাকা) দিয়ে তিনদিনের জন্যে একটি ঘর ভাড়া নিলাম। পরের দিন ২৬ ডিসেম্বর ইন্দ্রবাহাদুর এলেন। ফ্রাঙ্কফুর্টে এখন কোনো নতুন জিনিস তো দেখার ছিল না, কিন্তু তবুও শহরে ঘুরতে থাকলাম। হিটলারের নাৎসিদের জোর আগের চেয়ে কিছুটা কমে আসছে। এটাই সবাই বলছিল। বার্লিনে আমি স্টেশনের বাইরে নাৎসীদের দেখলাম পথচারীদের কাছ থেকে চাঁদা চাইছে। বোঝা যাচ্ছিল, যদি খুব শীঘ্রই কিছু আর না হয় তাহলে সোস্যালিস্টরা যে রকম ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, সেই অবস্থা এদেরও হবে। কিন্তু এই কথা এখন জার্মানির জায়গীরদারদের বোঝানোর ছিল। পুঁজিপতিরা তো তাদের অর্থভাণ্ডার খুলে দিয়েছিল, কারণ কম্যুনিস্টদের প্রভাব বাড়তে দেখে ওরা খুব ভীত ছিল। জার্মান জায়গীরদার জার্মান সেনাদের সর্বেসর্বা হয়ে রয়েছে, আজও সেই জায়গীরদারদের লোক হিন্ডনবর্গ জার্মান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ছিল। এখন জায়গীরদারদের নজর ছিল রাজবংশের ওপর। যদিও রাজবংশের জায়গীর এখনো সুরক্ষিত ছিল, কিন্তু তার রাজপ্রাসাদ ছিল সরকারের হাতে। প্রাক্তন কাইজ্যার হল্যান্ডে দিন কাটাচ্ছিল। জার্মানি ছাড়ার একমাস বাদেই হিন্ডনবর্গ নিজের শ্রেণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভালো করে চিন্তা করে হিটলারের শাসনের লাগাম থামায় এবং সে পৃথিবীকে বিগত মহাযুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী পথে নামাবার প্রস্তুতি করতে থাকে।

২৮ ডিসেম্বর পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমি ট্রেন ধরলাম। ইন্দ্রবাহাদুরজীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ছ-টার সময় এক জায়গায় গাড়ি বদল হল, কিন্তু আমার বগিটি সোজা মারসেইয়ের ছিল। পরের দিন (২৯ ডিসেম্বর) মারসেই পৌঁছাই। মোটরগাড়িতে ব্রিস্টল হোটেলে গেলাম। ৪৩ ফ্রাঙ্ক (৬ টাকা) দিয়ে একটি ঘর পাওয়া গেল। জাহাজ কোম্পানি মেসাজিরি মারিতিম-এর অফিসে গেলাম। ওখানে লন্ডন থেকে আমার জন্যে আসন সুরক্ষিত রাখার খবর আসেনি। টমাস কুক্-এর ওখানে যাওয়ার পর লন্ডনের তার

পেলাম, তাতে লেখা ছিল যে রেজিস্ট্রি চিঠিতে কাল টিকিট পাঠান হয়েছে। পরের দিনই 'ফেরীস্‌সল' মারসেই থেকে ছাড়ার কথা ছিল। যদি টিকিট না পৌঁছাত তাহলে না জানি কতদিন অপেক্ষা করতে হতো।

ইউরোপ থেকে প্রস্থান—পরের দিন ৩০ ডিসেম্বর টমাস কুক্-এর কাছে গেলাম। টিকিট এসে গিয়েছিল। দিন-রাত থাকার ঘর ও খাওয়া নিয়ে ১৬ টাকার ওপর খরচ হল। ইউরোপে সব জিনিসেরই দাম বেশি। জিনিসপত্তর উঠিয়ে দিয়ে জাহাজে পৌঁছলাম। কেবিন ভালো ছিল, তাতে চারটে বার্থ (শয্যা) ছিল, কিন্তু মানুষ দুজনই ছিলাম। অন্য সহযাত্রী মিস্টার য়ুঅন্ চীনের য়ুন্নান প্রান্তের নিবাসী ছিলেন, আমেরিকা থেকে অধ্যয়ন শেষ করে ফিরছিলেন। আমাদের জাহাজ বিকেল চারটের সময় রওনা হল। এই জাহাজে অন্য কোনো ভারতীয় ছিল না, য়ুঅন্ মহাশয় ইংরিজি বলছিলেন। কিন্তু তিনি কথা খুব কম বলছিলেন। এবার পড়ার জন্য বইও সঙ্গে ছিল না। পরের দিন (৩১ ডিসেম্বর) ১৯৩২-এর শেষ দিন ছিল। রাতে সমুদ্র বেশি তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। কিন্তু এখন আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এই সময় আমি স্থির করলাম যে সাধারণ হিন্দি ভাষাভাষীদের জন্য সাম্যবাদের ওপর কিছু বই লেখা উচিত, যা আমি দুবছর পরে লিখেছিলাম।

নববর্ষের (১৯৩৩) প্রথম দিন ছিল। আজকে লোকে খুব উৎসব পালন করছিল। মাঝরাতের পরেও চলছিল নাচগান। পোলাণ্ডের লোকেদের বেশি প্রাণোচ্ছল মনে হচ্ছিল। সমুদ্রও জোর ফুঁসছিল। য়ুঅন্ মহাশয়ের শরীর অত্যন্ত খারাপ ছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও সমুদ্র খুব চঞ্চল থাকল। য়ুঅন্ মহাশয়ের কথা বলার ক্ষমতা ছিল কোথায়? আমাদের জাহাজে পোলাণ্ডের ৩০ জন স্ত্রী-পুরুষ পোর্টসঈদ পর্যন্ত যাচ্ছিল। তারা ইহুদী তীর্থগুলোতে ভ্রমণ করছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করলাম, কিন্তু ভাষার খুব অসুবিধে হচ্ছিল।

চার জানুয়ারির সকাল সাতটাতেই আমরা পোর্টসঈদ পৌঁছাই। সেখানে দেখার কোনো জিনিস ছিল না, তাই আমি জাহাজেই পড়ে রইলাম। জাহাজে একজন ধর্মপ্রচারক বাইবেল বিক্রি করছিল। তার কাছে ১৪টা ভাষার বাইবেল ছিল। আমি ৪০ ফ্রাঙ্ক (৭ টাকা) দিয়ে প্রত্যেকটির এক কপি করে কিনলাম। লিথুআনিয়ান ভাষার বাইবেল তার কাছে ছিল না। আমি তার দাম দিয়ে দিলাম, পরে সে আমার কাছে বই পাঠিয়েও দিয়েছিল।

দুপুরের পর ১টার সময় জাহাজ সুয়েজ খালে ঢুকল। এখন, ৪ জানুয়ারিতে, ঠাণ্ডা কম মনে হচ্ছিল। আমরা লোহিত সাগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। সন্ধে পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকা দু-দেশের পাহাড় এপাশে-ওপাশে দেখা যাচ্ছিল। বেশির ভাগ যাত্রী পোর্টসঈদে নেমে গিয়েছিল, এখন জাহাজে যাত্রী ছিল খুব কম। তৃতীয় শ্রেণীতে তাদের সংখ্যা দু-ডজনের বেশি ছিল না। ফাঁকা সময়টা আমি কোনো কাজে লাগাতে চাইছিলাম। এই ৫ তারিখে লোহিত সাগরের ওপর 'ডীহবাবা' কাহিনীটি লিখে ফেলেছিলাম। কথাবার্তা বলার জন্য অনামী এক দম্পতি এসেছিলেন, যাঁরা ৫ বছর থেকে ফ্রান্সে আইন পড়ছিলেন। যেমন যেমন আমরা পূর্বদিকে এগোচ্ছিলাম, তেমনি তেমনি ঘড়ির কাঁটাগুলোকে বাড়িয়ে

যেতে হচ্ছিল। এবার গরম লাগছিল। যেখানে মারসেই থেকে পোর্টসঈদ পর্যন্ত আমাদের কেবিনকে গরম রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এখন সেখানে হাওয়া ঢোকার জন্য কুম্মী চলছিল। ৮ জানুয়ারি বেতারের খবরে জানালো যে, রাজেন্দ্রবাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন। সেইদিনই সন্ধেবেলা আমার জ্বর আসে। আমি নির্জলা অনশন করে গেলাম আর চতুর্থ দিনে ১১ তারিখে ৭২ ঘণ্টা পরে নুনের সঙ্গে জল খেলাম। জিবূতীকে নেমে দেখার ছিল, জাহাজ ৭টা থেকে ১২টা পর্যন্ত (৯ জানুয়ারি) সেখানে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু জ্বরের দরুন পাড়েও যেতে পারিনি। ৯ তারিখ থেকেই জাহাজ ভারত মহাসাগব দিয়ে চলছিল। সমুদ্র এক-দুদিন চঞ্চল ছিল, পরে ঠিক হয়ে যায়।

চীনা যুবকটিকে বিচিত্র স্বভাবের মনে হচ্ছিল। পোর্টসঈদ থেকে সে কতকগুলো নোংরা নোংরা জিনিস কিনেছিল, আর আমার অসুখেব সময়ও কেবিনে এমন গণ্ডগোল করছিল যে ওখানে থাকা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। আমি কখনও কিছু বলিনি। ১২ জানুয়ারি ১০২ ঘণ্টা উপবাস করার পর কমলার রস পান করি। জাহাজের স্টুয়ার্ট খুব ভালো ছিল। বার বার আমায় খাবার কথা জিজ্ঞেস করত। ১৩ পর্যন্ত দু-তিন দিন সমুদ্র চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এখন যদিও জ্বর ছিল না, খাবারও খাচ্ছিলাম, কিন্তু মুখে কোনো স্বাদ ছিল না।

লংকায়—১৬ জানুয়ারি সকাল ৯টায় জাহাজ কলম্বো পৌছল। মিঃ এন· ডি· এস· সিল্‌ভা, মানিকলাল ভাই আরও কয়েকজন ভদ্রলোক বন্দরে এসেছিলেন। মিঃ সিলভার বাড়িতে স্নান খাওয়া করলাম। তাঁর পুত্র বিভল তাঁর গাড়িতে আমাকে বিদ্যালঙ্কার বিহার নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে এক জায়গায় তিনি গাড়ি বাঁ দিকে সরাচ্ছিলেন, আমি তাঁব হাত থামাতে যাচ্ছিলাম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষকে তার ডানদিক দিয়ে যেতে হয়। আমি ফ্রান্স, জার্মানিতে এই সবে এটা দেখে এসেছিলাম, তাই বাধা দিতে যাচ্ছিলাম। আমার খেয়াল ছিল না যে এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে চলে এসেছি। এই ধরনের ভুল আরও একটা করেছিলাম। ৩০ জানুয়ারি ভারতে ফেরার জন্যে কলম্বো স্টেশন গেলাম, সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলা-বিশ্রামাগারের চেয়ারে খুব নিশ্চিন্তে বসে পড়লাম। একজন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাকে জানালেন যে, এটা মহিলাদের জায়গা, তখন আমার খেয়াল হল, আমি এখন ইউরোপে নেই।

বেশ কয়েকমাস পরে চারদিকে সবুজে ঢাকা মাটিকে দেখলাম। বিদ্যালংকারের লোকেরা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে দেখা করলেন। অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের সঙ্গে যাত্রা সম্পর্কে কথাবার্তা হতে থাকল। নায়ক মহাস্থবির এই সময় অনাগরিক ধর্মপালকে ভিক্ষু বানানোর জন্য লঙ্কার আর সব ভিক্ষুদের সঙ্গে ভারতে গিয়েছিলেন। আমার শরীর এখনো ভালো ছিল না। পেটের গোলমাল ছিলই। ঠাণ্ডা জায়গা থেকে গরম জায়গাতে এলে প্রায় এরকম হয়।

এখনও, ১৮ জানুয়ারিতে, নালন্দার ক্ষেপ আমার মাথা থেকে সরেনি, আমি সেইদিন নিজের ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'এবার নালন্দা গিয়ে একটু জমি কেনার ব্যবস্থা করতে

হবে। যদি ওখানে জায়গা না পাওয়া যায় তবে মোহনপুরেই খানিকটা জমি নিয়ে নেব। আর সেখানেই ঝুপড়ি বানানো হবে। কিন্তু এখন টাকারও কোনো ব্যবস্থা তো হয়নি। দু-তিন হাজার টাকার দরকার তো হবে। যখনই মঠের ভরণ-পোষণের চিন্তা আসে তখনই মনটা ইতস্তত করে। স্বাধীনতা থাকবে না। ধনীদের কাছে হাত পাততে হবে।'

এইসব দুশ্চিন্তার জন্য পরে নালন্দার পরিকল্পনা মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম। আমি ইউরোপ যাবার সময় অধীর ব্যানার্জী ও বাং-মো-লম্‌কে এখানে রেখে গিয়েছিলাম। অধীর তাঁর ইংরিজি পড়ায় ব্যস্ত ছিলেন। বাঙ্‌-মো-লম্‌-এর একবার যক্ষ্মা হয়েছিল, আবার সে সেনিটোরিয়ামে গিয়েছিল। আমি কি জানতাম যে বন্ধুর সঙ্গে আর দেখা হবে না? এবার আমি আমার কার্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে পরিবর্তিত করতে যাচ্ছিলাম। তিব্বত থেকে আনা বই ও চিত্রপটগুলোকে ভারতবর্ষে পাঠাবার ছিল। যাক তার জন্য সিদ্ধিয়া কোম্পানি তৈরি ছিল, আমার অনেক জিনিস লন্ডন থেকে এসে পৌঁছয়নি। নায়ক মহাস্থবিরও ভারতবর্ষ থেকে ফেরেননি। সেইজন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। 'গঙ্গা'-র পুরাতত্ত্ব সংখ্যার সম্পাদনারও দায়িত্ব ছিল। ৯০ খানার মত লেখাও দেখার জন্যে আমার কাছে এসে গিয়েছিল। ২৩ জানুয়ারি 'গঙ্গা'-র লোকেরা রাস্তা খরচের জন্য ৫০ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। এগারোটার সময় নায়ক মহাস্থবিরও এসে পৌঁছলেন।

২৬ জানুয়ারি বীরহলে-এর বিহারে গিয়েছিলাম। সকালে আর দুপুরে—দুবেলাই মাছ খুব ঝাল দিয়ে রান্না হয়েছিল, ঝাল খেতে লংকাবাসী মাদ্রাজীদের তুলনায় কম যায় না। সেখানে বেজওয়াদার এক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা হল। সিংহলে যত ইংরিজি পড়ার চল, ততই জ্যোতিষশাস্ত্রেরও। মানুষ যত খরচ বাড়ায় আজকালকার সমাজে তাব চিন্তাও বাড়তে থাকে, তখন সে জ্যোতিষী, হাত দেখাব লোক ও মন্ত্র-তন্ত্র বিশারদদের হাতের পুতুল হয়ে যায়। অন্ধ্রের এই জ্যোতিষী রোজ তিন-চার টাকা রোজগার করে নিতেন কিন্তু এইটুকুতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি চাইতেন যে চালা ভেঙে একসঙ্গে লাখ-দুলাখ টাকা পড়ুক; তাই তিনি নিজের শিক্ষাকে ঘোড়দৌড়ে লাগিয়ে খালি পেটেও নিজের আনন্দে থাকতেন। তিনি তর্ক করতে লাগলেন, 'মাছ-মাংস খাওয়া অধর্ম নয়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন?' তিনি বললেন, 'ব্রাহ্মণের দৃষ্টিকোণ থেকে।' আমি বললাম, 'বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম (দীর্ঘতমা) এঁদের রক্ত আপনার শরীরে এক ফোঁটাও আছে বলে আপনি মানেন কিনা?' তিনি 'হ্যাঁ' বললেন। তখন আমি বললাম, 'তাহলে বাদ দাও ভাই, গোত্রের কথা মুখে এনো না। আমাদের এই বড় বড় ঋষিরা আস্ত আস্ত গরু খেয়ে ফেলতেন, ঢেকুর পর্যন্ত তুলতেন না, আর তুমি যাচ্ছ মাছ মাংস বর্জন করাতে! তাছাড়া তোমরা দক্ষিণের ব্রাহ্মণেরা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের জন্মভূমি থেকে শত শত যোজন দূরে চলে এসেছো, তোমরা আর কি জানো যে কাশী ও মিথিলার ব্রাহ্মণেরা মাছ-মাংসকে কত ভালোবাসে।' বিহারের ভিক্ষুকেরা আমার উত্তরে খুব সন্তুষ্ট হয়, কারণ জ্যোতিষী তাদেরকে অস্থির করে তুলেছিল।

৩০ জানুয়ারি সন্ধের গাড়িতে আমার ভারত ফেরার কথা। নায়ক মহাস্থবির দুপুর বেলায় কোনোস্থানে ধর্মোপদেশ দিতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

আমি ডায়েরিতে লিখলাম—'বিদায়বেলায় 'তাঁর' চোখে জল ছিল। তাঁর বড় ভালোবাসা আছে, কে জানে হয়তো এটাই শেষ দেখা।' সত্যিসত্যিই শ্রীধর্মানন্দ নায়ক মহাস্থবিরের হৃদয় বড় কোমল ছিল, আর আমার প্রতি তো তাঁর অপার স্নেহ ছিল।

ভারতের শীতে, ১৯৩৩

যদিও আমার প্রবন্ধ 'গঙ্গা'র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলোর নির্বাচন ও সম্পাদনার কাজ দূর থেকে সম্ভব নয়, অথচ 'গঙ্গা'র লোকদের চিঠির পর চিঠি আসছিল, সেইজন্য লংকায় বেশিদিন থাকার অবকাশ ছিল না। এছাড়াও এবার স্থায়ীভাবে আমার ভারতে ফেরার কথা, সেইজন্য তিব্বত থেকে আনা বই ও জিনিসপত্তর নিয়ে যাবার ছিল। আমি জিনিসপত্তর প্যাক করালাম, সিন্ধিয়া কোম্পানি বিনা ভাড়ায় তা কলকাতা পাঠাবার দায়িত্ব নিল। আমি কেবল ওই কটা দিনের জন্যই ওখানে রইলাম।

৩০ জানুয়ারি (১৯৩৩) ভারতের উদ্দেশে রওনা হলাম। এবার মাদ্রাজে মিউজিয়াম দেখা ও দক্ষিণ হিন্দি প্রচার সভার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার ছিল, সেইজন্য মাদ্রাজে দু-তিন দিনের জন্য রয়ে গেলাম। পুরাতত্ত্ব এখন আমার নিজস্ব বিষয় ছিল, তাতে আকর্ষণ বোধ করছিলাম—আকর্ষণ বোধ করতেই তো আমি তার বিশাল সাহিত্যের অবগাহনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি মাদ্রাজ মিউজিয়ামের অমরাবতী, গোলী, নাগার্জুনীকোণ্ডা থেকে প্রাপ্ত প্রস্তরশিল্পকে খুব উৎসাহের সঙ্গে দেখলাম। একদিন ত্রিপলীকেন-এর উত্তরার্ধীমঠে গেলাম, হরিপ্রপন্নাচার্য ও তিরুমিশীর সম্বন্ধে জানার জন্য। মঠের স্থাপিকা বৃদ্ধা সাধুনী অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর সে আমার স্বরও চিনতে পারেনি। বুঝলাম হরিপ্রপন্ন স্বামী আর নেই, মঠের কাজ দেবরাজ করছে। পুরনো সহপাঠী ও বন্ধু ভক্তি (ভেঙ্কটাচার্য)-কে দেখার তীব্র ইচ্ছা হল কিন্তু 'গঙ্গা'র চাপে সম্ভব ছিল না। এবার প্রবল ইচ্ছা ছিল নাগার্জুনীকোণ্ডার খননকার্য দেখার। পণ্ডিত হরিহর শর্মা আর ব্রজনন্দনবাবু গুন্টুর, অমরাবতীর জন্য পত্র ও তার দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষে দিন গোনার পর সে ইচ্ছাকেও দাবিয়ে দিতে হল।

মাদ্রাজ থেকে (২ ফেব্রুয়ারি) রওনা হলে গাড়িতে এক অন্ধ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-এর সাথে দেখা হয়। তাঁর এক পায়ে বেড়ী ছিল। কথা বলতে আরম্ভ করলে জানতে পারলাম তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, ভারতীয় নৃত্যকলা বিশারদ এবং শ্রেষ্ঠ নর্তকও। মাত্র ক-মাস আগে আমি ভরত নাট্যশাস্ত্রের নৃত্য সম্বন্ধীয় অধ্যায়ের অনুবাদ করার কাজে প্যারিসে শ্রীবর্গাজাকে সাহায্য করেছিলাম। এইজন্য নৃত্যের গতি ও আসন-এর অনেক কিছু স্মৃতিতে ছিল। সেই বিষয়ে আমার খানিকটা দখল দেখে, তিনি আমার সঙ্গে সাগ্রহে

কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন।

কলকাতায় দু-একদিন থাকার পর ৬ ফেব্রুয়ারি আমি সুলতানগঞ্জ পৌছই। ধূপনাথ ও দেবনারায়ণ বাবু ওখানেই ছিলেন, আর তাঁরা থাকাতে সুলতানগঞ্জ আমার বাড়ির মতো মনে হচ্ছিল। এখন পর্যন্ত যখনই আমি এখানে এসেছি তখনই নিরামিষ খেতাম, কিন্তু এদ্দিনে ইউরোপ যাত্রার সম্বন্ধে আমার বহু লেখা 'গঙ্গা'-তে ছাপা হয়ে গিয়েছিল, যাতে আনন্দজীর নিরামিষ আহারকে ঠাট্টা করে আমি আমার মাংস খাওয়ার বর্ণনা দিয়েছিলাম। ধূপনাথ, দেবনারায়ণবাবু এবং সেখানে বসবাসকারী তাঁদের পরিবার মাংসাহারী ছিলেন, সেজন্য আমার নিরামিষ খাওয়ার দরকার হয়নি।

'পুরাতত্ত্ব সংখ্যা'য় অনেক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, যেগুলো ছাপা হয়নি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখাগুলো বাছাই করলাম এবং পুরাতত্ত্ব ছাড়াও যাবতীয় বিজ্ঞানকে জানার জন্য বিকাশবাদ জানা প্রয়োজন, তাই সেখানে থাকাকালীন 'ভারতে মানব বিকাশ' এর ওপর একটা প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। বিক্রমশীলার খোঁজে একদিনের জন্যে কহলগাঁও ও পথরঘট্টা যাই, কিন্তু বিক্রমশীলার জন্য সেটা সঠিক স্থান ছিল না। প্রাকৃতিক আনুকূল্য সুলতানগঞ্জেরই পক্ষে, এটা ড: সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণও স্বীকার করেছিলেন কিন্তু বিক্রমশীলার মত বিহারের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এখানে নেই।

'গঙ্গা'-র মালিক কুমার কৃষ্ণানন্দের দরবারে এক-আধবারই গিয়েছি। আমার প্রতি কুমারসাহেবের ব্যবহার খুবই নম্রতাপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাঁর পার্শ্বচরদের প্রতি এত ঘৃণা ছিল যে সেখানে যেতে অসহ্য লাগত। শকুনের মতো তারা সবাই তাঁকে ছিঁড়ে খাবার জন্য প্রস্তুত থাকতো। স্ত্রী-পুরুষ ও দু-তিনটি বাচ্চার জন্য দশ-বারো হাজার টাকা মাসিক খরচ কিছু কম নয়, কিন্তু এই খোশামোদকারীদের তখনি লাভ হতো, যখন তিনি প্রতি মাসে বিশ হাজার খরচ করতেন। খরচের রাস্তা খুঁজে খুঁজে বার করা হচ্ছিল। কুমারের নিজের ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা ছিল না। ধূপনাথ একবার চাকরি ছেড়ে সাধু হবার জন্য তৈরি হয়েছিলেন। কিন্তু পরে এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে পারেননি আর এতে আমারও কিছুটা হাত ছিল। তিনি কুমার সাহেবের খাজাঞ্চি হয়েছিলেন, শুধু চাকরি করার জন্য নয়, তাই ওই কুৎসিত আবহাওয়ায় তিনি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কুমার সাহেবকে বোঝাতে চাইতেন, কিন্তু 'বত্রিশপাটী দাঁতের মাঝে জিভ বেচারি'[১] কি করবে?

সুলতানগঞ্জ থেকে আমি শ্রীকাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালকে চিঠি লিখেছিলাম। তাঁর উত্তর এত সহৃদয়তাপূর্ণ ছিল যা আমি কখনো আশাও করিনি। আমি তাঁর বিশাল প্রাসাদ ও সাহেবি কেতা দেখেছিলাম। তিনি আমার ভারত প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে স্নেহপূর্ণ নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন, এবং তাতে উল্লেখ করেছিলেন যে, 'এবার আমিও সংসারে বিরক্ত হয়ে গেছি, আমার ইচ্ছা বৌদ্ধ ভিক্ষু হবার।' আমি নিজে ভিক্ষু ছিলাম, আনন্দজীও আমার সম্মতিতে ভিক্ষু হয়েছিলেন, তাহলেও বিশেষ বিশেষ আদর্শবাদীদেরই আমি সংসারের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবার উপদেশ দিতে চাইতাম। যাক, একথা জেনে খুশি হলাম যে

---

[১] *গ্রন্থে ব্যবহৃত লোক-কথাটি—'জিমি দশানমে জীভ বেচারী'।*—স·ম·

ভারতেও আমার জন্য কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি আছেন।

৯ মার্চ পাটনা জংশনে নামার সময় দেখলাম জয়সওয়ালজী প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছেন। আমার ভিক্ষুবস্ত্র পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। আর তাঁর মুখ আমি সেই ১৯২৫ এবং ১৯২৯-এ দেখেছিলাম। খুব স্নেহের সঙ্গে তিনি তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। স্নেহের আরম্ভ বেশ বেগের সঙ্গে হয়েছিল, আর এরকম বিরাট আরম্ভ পরে ব্যর্থতায় পরিণত হয়, কিন্তু এখানে যে স্নেহের সূত্রপাত হল তা দিন-দিন বেড়েই চলল, এবং ৯ মার্চ (১৯৩৩) থেকে ৫ আগস্ট (১৯৩৭) পর্যন্ত যখন আমি আমার কাঁধে তাঁর মরদেহ তুললাম, তিনি ছিলেন আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর আমি ছিলাম তাঁর স্নেহভাজন অনুজ। প্রতিবছর শীতে আমি সমতলে থাকতাম আর তার অধিকাংশ সময় তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে কাটাতাম। আজও যখন আমার ওই বন্ধুর কথা মনে পড়ে তখনই হৃদয় যেন শূন্য হয়ে আসে, চোখে জল আসতে থাকে।

জয়সওয়ালজী সেই সময় বড়ছেলের জন্য চিন্তিত ছিলেন। চেতসিংহের বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল। নিজের জাতের এত সংকুচিত ক্ষেত্রে যোগ্যা কন্যা পাওয়া সহজ নয়। চেতসিংহের মতো সংস্কৃত রুচিসম্পন্ন তরুণ সাধারণ যুবতীকে কি করে পছন্দ করবে। তিনি যখন বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যান তখন সেখানে এক ইংরেজ যুবতীর সঙ্গে তাঁর ভালবাসা হয় আর সেই ঘনিষ্ঠতা পতি-পত্নীরূপে পরিণত হয়। ভারতে আসার সময় নিজের সেই স্ত্রীকেও তিনি নিয়ে আসেন, কিন্তু পিতা, এই দম্পতিকে আশ্রয় দিয়ে আগের পুত্রবধূর সঙ্গে অন্যায় করতে রাজি ছিলেন না। চেতসিংহ খুব অসুবিধেয় পড়লেন, কিন্তু তিনি এতটা নীচ হৃদয়ের ছিলেন না যে নিজের প্রেমিকা ইংরেজ তরুণীকে আশ্রয়হীন ছেড়ে দেবেন। চেষ্টা করতে লাগলেন কোনো স্বতন্ত্র জীবিকা খোঁজার, কিন্তু একজন নতুন ব্যারিস্টারকে প্রথমে তো কয়েক বছর নিরাশাপূর্ণ স্থিতিতে থাকতে বাধ্য হতে হয়। কয়েক মাস পর্যন্ত এদিক-ওদিক করার পর চেতসিংহের মনে হল নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে সেই তরুণীকে বিলেতে রেখে আসাই উচিত। চেতসিংহকে আমার অত্যন্ত সহৃদয় ও সংস্কৃত যুবক মনে হয়েছিল, আর তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। সেই সঙ্গে তাঁর বাবার চিন্তা ভাবনাও সহানুভূতির যোগ্য ছিল। আমি ভাবতাম, জয়সওয়ালের মতো দেশ দেখা পুরুষ ছেলের বিয়ের ব্যাপারে এমন ভুল করলেন কেন? শুনেছি বিলেতে থাকার সময় তিনি নিজে এক মহিলার প্রেমে পড়েন। কারো কারো বক্তব্য ওই মহিলা শ্রীলংকা পর্যন্ত এসেও ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী চিন্তাভাবনাও সময় ও সমাজের চাপে আলগা হয়ে যায়। সেই কারণেই জয়সওয়ালজীর রাজনৈতিক বিপ্লবী চিন্তাভাবনা চাপা পড়ে গিয়েছিল। আর পরিবারের স্নেহ এবং বন্ধুবান্ধবের মনের কথা ভেবে তাঁর সামাজিক বিপ্লবী ভাবনাও লুপ্ত হয়ে গেল। যখন তিনি শুনলেন যে, চেত সেই তরুণীকে ইংল্যান্ডে রেখে এসেছে তখন তিনি খুব খুশি হলেন এবং মনে হল তার বুকের ওপর থেকে যেন একটা বিরাট ভার নেমে গেল।

আমার সাম্যবাদী ভাবনাকে বার বার উজ্জীবিত করতে জয়সওয়ালের মতো ব্যক্তিদের জীবনসংঘর্ষ অত্যন্ত সহায়ক হয়। এখানে ভারতীয় ইতিহাসের অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন এক

ব্যক্তি ছিলেন, যিনি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন, যিনি পসার জমানো ব্যারিস্টারি করে যেটুকু সময় বাঁচত তাতে প্রয়োজনীয় নিদ্রা ও বিশ্রামকে জলাঞ্জলি দিয়ে, প্রগাঢ় ঐতিহাসিক চিন্তা নিয়ে থাকতেন, নতুন নতুন তত্ত্ব বার করতেন। কিন্তু সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাঁকে বাধ্য করেছিল নিজের অমূল্য জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় কোনো ধনীর ইনকাম ট্যাক্সকে কম করানোর জন্যে বড় বড় আইনসঙ্গত যুক্তি তৈরিতে ব্যয় করতে, কারণ তাঁকে সংসারও চালাতে হতো, নিজের পুত্র-কন্যাকে উচ্চ শিক্ষা দিতে হতো, যাতে পিতার কর্তব্য থেকে তাঁকে চ্যুত বলে না মনে হয়। আমি ভাবতাম জয়সওয়ালের জীবনকে এরকম বেকার কাজে কাটানোর জন্য কে বাধ্য করছে? তখনো পর্যন্ত আমি সোভিয়েতের বিদ্বানদের নিশ্চিন্ত জীবনকে দেখিনি, তবুও 'বাইশবী সদী' আমার মাথা থেকে জন্মলাভ করেছিল, আমি বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থাকে এই সবের জন্য দায়ী করতাম।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতে জয়সওয়ালজীর প্রকৃতির সঙ্গে আমি পরিচিত হয়ে গেলাম। না কোনো কৃত্রিম রূপে নিজেকে রাখার তাঁর দরকার ছিল, না আমার নিজেকে যথার্থের বেশি দেখানোর প্রয়োজন ছিল। তাঁর ছেলে নাবাযণ, দীপ, ছোট মেয়ে জ্ঞানশীলা (ববুনী) আমার লেখাপড়ার পরের সময়ে আমাব ভালোবাসা ও মনোরঞ্জনের সামগ্রী ছিল। গিলগিট-এর কাছে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থগুলো পাওয়ার কথা আমি অনেক আগেই শুনেছিলাম। প্যারিসে আচার্য সেলবেন লেবি তার আলোচনা করেছিলেন আর এখানেও তাঁর চিঠি এসেছিল যে, আমি যেন ওই গ্রন্থগুলো দেখি। আমিও তার জন্য উৎসুক ছিলাম, জয়সওয়ালজীও আমার সঙ্গে একমত ছিলেন। আমি ঠিক করলাম এবারে গরমে গিলগিট যাব। জয়সওয়ালজী একটি ক্যামেরা এবং কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে দিলেন।

২৯ এপ্রিল সারনাথ থেকে দেবপ্রিয়-এর তাব পেলাম যে শ্রীধর্মপাল দেহ বেখেছেন। পরের দিন সারনাথ পৌছলাম। চল্লিশ বছর ধরে নিরলস পরিশ্রম করে আজ এই মহাপুরুষ অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত। আগে তাঁর শরীর লংকায় নিয়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু তৃতীয়দিনে নিয়ে যাওয়ার অবস্থাতে ছিল না, সেইজন্য এই বীর লংকাপুত্রকে ঋষিপতন মৃগদাবের (সারনাথ) পবিত্র ভূমিতেই দাহ করা হয়।

দ্বিতীয় লাদাখ যাত্রা, ১৯৩৩

সারনাথে অনাগরিক ধর্মপালের শবের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রয়াগে পণ্ডিত জয়চন্দ বিদ্যালংকারের সঙ্গে দেখা করে আমি লাহোর রওনা হলাম। এবারের যাত্রা জম্মুর রাস্তা ধরে করার ছিল, একই রাস্তায় দুবার না যাওয়া আমার স্বভাব হয়ে গেছে। ১৫ মে জম্মু

পৌঁছে ওখানে বিজ্ঞানের প্রফেসর মানিকচন্দের বাসায় থাকি। আমি এটা জেনে খুব খুশি হলাম যে, আমার লাদাখের সহায়ক শ্রীরামরখামল ইঞ্জিনিয়ার এখানে আছেন। আমি যখন তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গেলাম সেইসময় তিনি ছিলেন না কিন্তু ফিরে যেই তিনি খবর পান আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এখন তিনি ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার। সাত বছর কেটে যাওয়ার ছাপ তাঁর মুখে ছিল, কিন্তু এখনও তিনি একই রকম ভাবে সাহায্য করার জন্য উৎসুক ছিলেন, যেমন ছিলেন লাদাখ যাত্রায়।

১৭ মে জম্মু থেকে গাড়ি করে শ্রীনগরের জন্য রওনা হলাম। এই রাস্তা আমার গতবারের যাত্রার পরে তৈরি হয়েছে। পথের অনেক জায়গায় খাবারের দোকান ছিল। ঝীবর (ধীবর)-রা খুব সস্তায় সুস্বাদু রুটি ও মাংস বিক্রি করতো। পথের দুপাশের পাহাড় ও গ্রাম খুব সুন্দর ছিল কিন্তু আমার চোখের তৃপ্তি ততক্ষণ পর্যন্ত হল না, যতক্ষণ না দেবদারুর পাহাড়ে পৌঁছলাম। বহুদিনের পরিচিত ডাক্তার কুলভূষণের সঙ্গে আমার বরাবর পত্রালাপ ছিল, কাজেই তিনি আমাকে ভুলে যাননি। শ্রীনগরে তাঁর ওখানেই থাকার ঠিক হয়েছিল। ডাঃ কুলভূষণ বিলেতে শিক্ষিত ডাক্তার ও শ্রীনগর মিউনিসিপ্যালিটির হেলথ্ অফিসার ছিলেন। বিলেত থেকে ফেরার পর তাঁর সংস্কৃত পড়ার ইচ্ছা জাগে। তার জন্যে তিনি নিয়ম করে কয়েক ঘণ্টা সময় দিতে শুরু করেন। তাঁর 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' পড়া আমার পছন্দ ছিল না। এইজন্য নয় যে 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' পাঠ্য হিসাবে ফালতু জিনিস, বরঞ্চ এইজন্য যে ওই সূত্র মুখস্থ করার সময় ডাক্তারবাবুর ছিল না। সেই জায়গায় যদি তাঁকে সাহিত্য সম্পর্কিত বই পড়ানো হতো এবং প্রয়োগাত্মক ব্যাকরণের জ্ঞান দেওয়া হয়, তাহলে বেশি লাভজনক হতো। তাঁর সংস্কৃত বলার খুব সখ ছিল। এখন ডাঃ কুলভূষণ শহরের বাইরে নিজের বাড়িতে থাকতেন, সেখানেই আমার জন্যে একখানা ঘর রিজার্ভ ছিল। ডাক্তার সাহেব কট্টর আর্যসমাজী ছিলেন। ছয়বছর আগেও আমার ভাষণে বুদ্ধের প্রশংসা পেয়ে তিনি বলেছিলেন, আপনি বৌদ্ধ না হয়ে যান এবং তাই সত্য হয়। এই সময় আমি আর্যসমাজী থাকিনি দেখে তাঁর আফশোশ হতো।

এইবার আমার মুখ্য আকাঙ্ক্ষা ছিল গিলগিট যাওয়া। আমাব বন্ধু শ্রীশ্যামবাহাদুর ব্যারিস্টার কাশ্মীর সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রী চৌধুরী বজাহত হুসেন (I.C.S)-কে আমার পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছিলেন। আমি এটাও জেনেছিলাম যে, গিলগিট থেকে পাওয়া হস্তলিখিত গ্রন্থগুলোর এক ভাগ এখানে আছে। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা কবতে আমি তাঁর অফিসে গেলাম। তিনি খুব খুশি হয়ে দেখা করলেন, আর বললেন 'আমার দ্বারা যা কিছু করা সম্ভব আপনাকে সাহায্য করার জন্য তা আমি করতে প্রস্তুত।' তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে তাঁর বন্ধু অন্য এক অফিসারের সঙ্গে 'আমার অঞ্চলের' (স্বপ্রান্তীয়) লোক বলে পরিচয় করালেন। কিন্তু আমি খুব নিরাশ হয়ে পড়লাম, যখন হস্তরেখা বিষয়ক অফিসার আমাকে এই শর্তে তা দেখতে দিতে রাজি হলেন যে, আমি যেন লেখালেখি না করি। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, বইটি সরকার নিজে প্রকাশ করতে চাইছে, তাই সে চায় না অন্য কোনো বিদ্বান তাতে হস্তক্ষেপ করুক। সেই মহত্ত্বপূর্ণ হস্তলেখা বস্তাতে এমনভাবে বেঁধে রাখা হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন কোনো ব্যবসায়িক বস্তু। ভূর্জপত্রের ওপরে

লেখা বারো-তেরশো বছরের পুরনো সেই হস্তলেখাগুলোর দুর্গতি হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে অনেক টুকরো ঝরে পড়ছিল—পুরনো ভূর্জপত্র খুব সামান্য চাপেই ভেঙে যায়। সরকারি গ্রন্থমালার অধ্যক্ষ শ্রীমধুসূদন কৌলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে বেশ ভালো লাগল। তিনিও আমার মতো এই গ্রন্থগুলোর রক্ষা ও সম্পাদনার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তিনি তাদের একটা বিস্তৃত সূচিও তৈরি করেছিলেন কিন্তু রাজ্যের সর্বজ্ঞানী পদস্থ অফিসার কাজটি নিজের নামে প্রকাশ করে যশ অর্জন করতে চাইছিলেন। আমার নৈরাশ্যের সীমা থাকল না যখন আমি সেখানকার মিউজিয়ামটির দুরবস্থা দেখলাম। মহারাজা সেটাকে ফালতু মনে করতেন। একবার তো নিলাম করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু সকলে যখন বোঝাল যে এতে ভীষণ বদনাম হবে, তখন ইচ্ছা ছেড়ে দেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো ভোগ-বিলাস সামগ্রীরও বড় বড় আবিষ্কার ধনীরা করেছে। যার জন্য লাখ কেন, কোটি টাকাও কোনো ব্যাপার নয়। আর এই বিলাসী মহারাজা তো একরাত্রের জন্য প্যারিসের এক অপ্সরাকে কুড়ি লক্ষ টাকার চেক কেটে দিয়ে জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছিলেন।

মিউজিয়াম যে অবস্থায় ছিল তার চেয়ে বেশি ভালো হতো যদি কোনো অনুমোদিত সংস্থার হাতে নীলাম করে দেওয়া হতো। তা দু-একজন চৌকিদারেব দায়িত্বে রেখে দেওয়া হয়েছিল, যাদের কাছ থেকে সামান্য টাকা দিয়ে ইতিহাস এবং কলার অমূল্য সামগ্রী কিনতে পারা যেতো এবং কেনা হতোও। বোধ হয, ইউরোপের অধম থেকে আরো অধম কোনো ধনীও এমন বর্বরতা করতে পারত না।

গিলগিটের হস্তলেখার ব্যাপারে অন্য এক মন্ত্রী শ্রী বি· এম· মেহেতার সঙ্গেও দেখা করলাম। তিনি জয়সওয়ালজীর বন্ধু ছিলেন। তিনিও আমার উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এমন একটা যন্ত্রের অংশ ছিলেন, যাতে তিনি নিজে তাঁর অক্ষমতা টের পাচ্ছিলেন। কিছুদিন পরে শ্রী এন· সি· মেহেতা (I.C.S) শ্রীনগর আসেন আর আমার আসার খবর শুনে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। শিল্পকলার ভালোমন্দের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান ছিল, এই হিসেবেই আমি তাঁকে জানতাম। তাঁর ফোন পেয়ে দেখা করতে গেলাম।

শ্রীনগরে থাকাকালীন বেশির ভাগ সময় আমি ওখানকার প্রাচীন স্থান দর্শন করা, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করা এবং লেখাপড়া নিয়েই কাটালাম। রোজ সকালে নদীর ধারে তিন-চার মাইল বেড়াতে যেতাম, প্রায় দিনই ডাঃ কুলভূষণও তাতে যোগ দিতেন। কয়েকবার শঙ্করাচার্যের পাহাড়ে চড়লাম, যদিও গতবারের মতো পাহাড়ে চড়ার অভ্যাসের জন্য প্রতিদিন চড়তাম না। মার্তণ্ড ও অন্য ধ্বংসাবশেষ এবার আমি বেশি আগ্রহের সঙ্গে দেখলাম, কারণ এখন আমি পুরাতন পাষাণের নির্বাক ভাষা বুঝতে পারতাম। কাশ্মিরী পণ্ডিতদের মধ্যে কয়েকজনের রুচি বৌদ্ধধর্মের দিকে ছিল, আর তাঁদের কয়েকটি নিমন্ত্রণও আমাকে রক্ষা করতে হয়। কিছুদিন পরে জার্মান বৌদ্ধ ব্রহ্মচারী গোবিন্দও এলেন, তারপর তো 'খুব জমে উঠবে যখন দুই পাগল বসবে একসঙ্গে'[১]—এই প্রবচন

[১] *গ্রন্থে ব্যবহৃত হিন্দি প্রবচনটি, 'খুব নিভেগী জব মিল বৈঠেঙ্গে দিবানে দো'।*—স ম·

বাস্তব হয়ে উঠতে লাগল।

গিলগিট ও লাদাখ যাওয়ার জন্য ইংরেজ জয়েন্ট কমিশনার-এর কাছ থেকে পারমিট (আজ্ঞাপত্র) নেওয়ার প্রয়োজন হতো। আমি গিলগিট-এর পারমিট চাইলাম। উনি বললেন—'দুঃখিত, ওখানে যাবার আজ্ঞাপত্র আমি দিতে পারি না।' নিজেরই ঘরে আমরা ভারতবাসী আখেরে পরের মতো ছিলাম। তাহলে আবার বুকে সূঁচ বেঁধার জন্য অভিযোগ করে লাভ? গিলগিটে ইউরোপের অন্য লোকেরা—ফ্রেঞ্চ অথবা হাঙ্গেরিয়ান যেতে পারে কিন্তু ভারতীয়দের ওদিকে যাবার অনুমতি নেই। সোভিয়েত তাজিকিস্তান-এর সীমা গিলগিট থেকে বেশি দূর নয়। সেইজন্য ব্রিটিশ সরকার গিলগিটে তাদের একটা বিমানবন্দর ও মিলিটারি ছাউনি তৈরি করার মতলবে ছিল। সেইসময় লোকে বলত, ইংরেজ গিলগিটকে রাজ্য থেকে নিয়ে নিতে চায়। গিলগিট যাত্রা থেকে হতাশ হয়ে আমি লাদাখ যাওয়া স্থির করলাম। ব্রহ্মচারী গোবিন্দও সঙ্গে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পাশপোর্ট দেখে ব্রিটিশ জয়েন্ট কমিশনার পারমিট দিতে রাজি হন।

জোজিলাপারের ঘোড়াওলারা এবার শ্রীনগর পৌছতে লাগল। দ্রাস বা কর্গিল যেতে যাত্রী ও মালপত্রের জন্য টাট্টু ভাড়া করলাম ও ৬ জুন শ্রীনগর থেকে রওনা হলাম। ঘোড়াওলারা ঘাস দেখলে রাতে থাকতে চাইতো, আমরাও সহযোগিতা করতাম। আমি তো ফটোগ্রাফিতে একেবারে অজ্ঞ ছিলাম, লাহোরে তো ফটো তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। কিন্তু এখানে দু-চারটে ছবিতে কিছুটা আশা জেগেছিল। ব্রহ্মচারী গোবিন্দ ছবিই যে ভালো তুলতেন তাই না, ভালো ছবিও আঁকতে পারতেন। আমরা প্রথম রাতটা গ্রাম থেকে কিছু দূরে নদীর ধারে আশ্রয় নিলাম। সকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিল কিন্তু এইসময় পশমিনাবের চাদরের কদর বুঝতে পারি—পাতলা চাদর কম্বলের মতো গরম।

আমাদের খাবার ঘোড়াওলারা তৈরি করতো, আর কোকো ছাড়া আমাদের খাবাব হতো ষোল আনাই ভারতীয়। ব্রহ্মচারী গোবিন্দের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেতাম। তিনি শিল্পী, দার্শনিকই ছিলেন না, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার অনেক জায়গাও ঘুরেছিলেন। তাঁর স্বভাব কোমল, কথা বলার ভঙ্গি আকর্ষণীয় এবং জীবনযাপন ছিল সাধাসিধে। খিটখিটে ভাব মোটেই ছিল না তাঁর স্বভাবে। সাম্যবাদের প্রতি তাঁরও সহানুভূতি ছিল। যদিও সে বিষয়ে তিনি ততটা দূরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না, যতটা ছিলাম আমি। গত মহাযুদ্ধে নিজে সৈনিক থেকে যুদ্ধের ভয়াবহতা নিজের চোখে দেখেছিলেন। তিনি বেশ অনুভব করতেন যে বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থার পবিবর্তন খুব প্রয়োজন। তিনি এক আদর্শবাদী মানুষ, যদিও ওই আদর্শবাদে একজন ধর্মানুরাগী ও শিল্পীর মন থাকাতে শান্তি কামনা ও করুণার সংমিশ্রণ ছিল খুব বেশি।

জোজিলা (জোত) পেরিয়ে ঘোড়াওলারা আমাদের রাস্তার বাঁ দিকে কালীসিন্ধেব ধাবে তাদেব গ্রাম হোলিয়াল-এ (১১ জুন) নিযে গেল। দবদ ভাষায প্রত্যেক নদীকে সিন্ধ বা সিন্দ বলা হয়। এখনও, ধরুন, এই শব্দের বৈদিক অর্থ ওখানে প্রচলিত আছে। গ্রামে গোটা তিবিশের মত ঘব আছে। তারা খুবই দরিদ্রের জীবনযাপন কবে। বনস্পতিহীন নগ্ন পাহাড, তাব উচ্চতা কম, বৃষ্টি আর সেচের অসুবিধেব জন্যে চাষাবাস বা বাগানের অনুকূল

নয়। ঘোড়ার পিঠে মাল তোলাই এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা। আমার বন্ধু একদিন একজনকে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'যখন খাবার দাবারের এই অবস্থা, প্রকৃতি যখন তোমাদের প্রতি এতটা নিষ্ঠুর, তখন এত ছেলেপুলের জন্ম দিচ্ছ কেন?'—আমায় বলা হয়েছিল গত ৫০ বছরে ওই গ্রামে তিনগুণ ঘর বেড়ে গেছে। উত্তর পেলাম, যিনি জন্ম দিয়েছেন, অর্থাৎ ভগবান, তিনিই সব সামলাবেন। ব্রহ্মচারী গোবিন্দ বললেন, 'হ্যাঁ, যদিও ঈশ্বব নেই তবে ক্ষুধা ও মহামারী তাঁকেই সামলাতে হবে।' আমরা এখানে বহুবিবাহের উপযোগিতার কথা জানতে পারলাম। যদি তিব্বতীদের মতো এখানের লোকরাও সব ভাইদেব জন্য একটি স্ত্রী আনতো, তাহলে পঞ্চাশ কেন, পাঁচশো বছর পবেও অতগুলোই ঘর থাকতো। কিন্তু এরা তো ঈশ্বরের ভরসায় বাচ্চার পর বাচ্চা জন্ম দিয়ে যাচ্ছে।

'সিন্ধ'-এর ধারে ধারে আমরা এগিয়ে চলেছি। দ্রাস থেকে কিছুটা যাওয়ার পর রাস্তায় আমরা সেই খণ্ডিত মূর্তি ও শিলালেখগুলো পেলাম। শিলালেখগুলো সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর লিপিতে লেখা ছিল। পুরোটা পড়াব সময় ছিল না, আমি ছবি তুললাম। কিন্তু এখন ততটা অভিজ্ঞতা না থাকায় তাতে সফল হতে পারলাম না।

কর্গিলে আমরা দুদিন (১৫-১৬ জুন) ছিলাম। যদিও জোজিলার আগে একটি লোক পারমিট দেখার জন্য দৌড়ে এল। কিন্তু সেটা বোধ হয় ব্রহ্মচারী গোবিন্দর ইউরোপীয় রঙের জন্য। এমনিতে কর্গিল পর্যন্ত পারমিটের দরকার হতো না। গতবার যাত্রার সময় থেকে নিশ্চয় কিছু উদারতা দেখিয়েছিল। কর্গিলে তহসীলদার পারমিট দেখল। ওখানে আমাদের দু-তিন দিন থাকার ছিল। এখানেই জানলাম যে গুরী লামা, যিনি লাসাতে দালাই লামার সঙ্গে দেখা করে আমার থাকার ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছিলেন, তিনি লাদাখ হয়ে এখন জান্স্কর-এ রয়েছেন। এখন পথ ঘুরে জান্স্কর গেলে ঘোড়া পাওয়ার অসুবিধে হতো, তাই আমরা সেদিকে যাওয়ার চিন্তা ছেড়ে দিলাম।

মুল্‌বেক-এও আমরা দুদিন (১৮-১৯ জুন) থাকলাম। গোবিন্দজী সেখানকার নানারঙের পর্বতগুলোর ছবি আঁকতে চাইছিলেন। তিনি তো নিজেব কাজে ব্যস্ত রইলেন। আর আমি সেখানকার মানুষের সামাজিক আর্থিক অবস্থাকে অধ্যয়ন করতে লাগলাম। প্রকৃতি এখানেও নিষ্ঠুর, কিন্তু সন্তান নিয়ন্ত্রণে বহুপতি বিবাহ খুব সহায়ক। তাই মানুষকে অতটা অসুবিধের মুখোমুখি হতে হয় না। এখানে একটি স্কুল আছে, যেখানে উর্দুতে পড়ানো হয়। চাকরির প্রতি লোকের আকর্ষণ নেই। তবে কেন এই তিব্বতী-ভাষাভাষী মানুষেরা এই কঠিন ভাষা এবং তার চেয়েও কঠিন লিপিকে পড়ার কাজে মন দেবে? তিব্বতী ভাষা পড়ার ঠিকঠাক কোনো ব্যবস্থা নেই তবুও বহু লোক সাক্ষর। যদি কাশ্মীর সরকার এদেরকে নিজেদের ভাষায় শিক্ষা দিতো তাহলে এরা খুব আগ্রহেব সঙ্গে লেখাপড়া করতো। কিন্তু সরকাব সবাইকে সাক্ষর করাকে থোড়াই নিজের কর্তব্য বলে মনে করে। মুল্‌বেক-এ পর্বতের গায়ে খোদাই করা মৈত্রেয়-র একটা সুন্দর মূর্তি আছে, যেটা জানিয়ে দেয় যে, কোনো কালে এখানে ভারতীয় মূর্তিকলার শিল্পীর অভাব ছিল না।

মুল্‌বেক ও তার পরের গ্রামগুলোতে প্রভাব বিস্তারের জন্য ইস্‌লাম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সংঘর্ষ চলেছিল। কর্গিল থেকে মুল্‌বেক পর্যন্ত গ্রামগুলোর এই সেদিন,

মুসলমান হওয়ার ঘটনা লোকের স্মরণে আছে। মুল্‌বেক পৌঁছবার আগে আমরা এখানকার খুব সুন্দর সুন্দর কিছু বাড়িওলা একটি গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেই সময়ে এক ভদ্রলোক এসে আমাদেরকে চা খেয়ে যাওয়ার জন্য বললেন। তাঁর বৈঠকখানায় ইয়ারকন্দের সুন্দর কার্পেট বিছানো ছিল। বাড়িটি বেশ সাজানোও ছিল। জানা গেল, তিনি একজন বড় ব্যাপারী। ইসলামী দেশ দুনিয়া ঘুরে দেখার পর ইনিও স্ত্রীলোকদের পর্দার আড়ালে বাখাই কর্তব্য মনে করেছিলেন।

মুলবেক-এর পরে লামায়ুরু-র আগে পর্যন্ত মুসলিম-বৌদ্ধ মিশ্রিত কিছু গ্রাম ছিল। জনবসতি ছিল দূরে-দূরে। সেই নগ্নপাহাড়, সেই শুকনো জমি, কিন্তু ফলন শুরু হওয়াতে অনেক সবুজ খেত দেখে চোখের ক্লান্তি দূর হয়ে যেতো।

১৭ জুন মুল্‌বেক-এর আগে শারগোল-এ আমবা গ্রাম প্রধানের বাড়িতে উঠেছিলাম। সে নিজে কট্টর মুসলমান ছিল, বিয়ে করে বা রক্ষিতা রেখে যেমন করেই হোক অন্যদের মুসলমান বানানো খুব পুণ্য (সবাব)-এর কাজ বলে মনে করতো। কিন্তু তার মায়ের ওপব এসবের প্রভাব পড়েনি। বুড়ি যখন জানতে পারল যে দুজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এসেছেন, তখন সে ছাতে এসে তিব্বতী কায়দায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'আমার ছেলে খুব অত্যাচার করে। আমাকে পুজো করতে দেয় না—লামাদের আপ্যায়ন পর্যন্ত করতে দেয় না। আমি তো শ্মশানের ঘাটে বসে আছি তবু একটু পুণ্য করতে দেয় না। নিজে তো নরকে যাবেই, নিজের বুড়ি মাকেও সেখানে ধাকলানি দিয়ে পাঠাতে চায়।' গ্রাম থেকে কিছু দূরে একটি গুম্বা (বৌদ্ধবিহার) ছিল। পাহাড়ে স্বাভাবিক গুহার মধ্যে এটি এমনভাবে খোদাই করে তৈরি করা হয়েছিল যে বাইরের দেওয়াল পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, ঠিক মনে হতো যেন পাহাড়ের গায়ে আটকে আছে। কিন্তু পথে সিম্‌সা খর্বু ও অন্যান্য জায়গাতে পবিত্যক্ত গুম্বাগুলোর দাঁড়িয়ে থাকা দেওয়াল আমরা দেখেছিলাম আর পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে হারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কমছে তাতে এই গুম্বাটিরও একই অবস্থা হবে।

আমরা জানতে পারলাম যে এখান থেকে কিছুটা দূরে একটি প্রাকৃতিক গুহা আছে, যেখানে পুরনো দেওয়ালচিত্র ও মাটির মূর্তি পাওয়া যায়। এমনিতে গ্রামপ্রধান (নম্বরদার[১]) আমাদেব সাহায্য করতো না কিন্তু তহসীলদারের চিঠি ছিল, তাই আমাদের জন্য টাট্টু ঘোড়া ভাড়া করে দিল। আমরা গুহাব খোঁজে পুবদিকে এগোলাম। পথটা চালু ছিল না, তাই অনেক জায়গা বিপজ্জনক ছিল, তবুও আমরা যখন একবার এগোতে আরম্ভ করেছি তখন আর ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। গুহাটি বেশ বড় ছিল এবং তাতে অনেক দেওয়ালচিত্রও ছিল কিন্তু সেগুলো বেশি পুরনো ছিল না।

গ্রামে ফিরে আমরা আবার রাস্তা ধরে মুল্‌বেক হয়ে লামায়ুরু পৌঁছলাম। গোবিন্দজী গুম্বার একটি ছবি আঁকলেন। আমি লামাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। কিন্তু সবাই অশিক্ষিত ও অসভ্য ছিল। বস্তুত লাদাখে—বিশেষ করে মুল্‌বেক প্রদেশে এই অযোগ্য

[১] গ্রামেব জমিদার, যিনি খাজনা আদায়ের জন্য তাঁব অংশীদাবদেব সাহায্য করেন।—স·ম·।

সাধুদের জন্যই বৌদ্ধরা লোপ পেতে চলেছে। সব জায়গায় গুম্বার অধিকারে খেত আছে, খাওয়া— ছঙ্গ (মদ) পান করা, ব্যস এটুকুতেই এরা নিজেদের কর্তব্যের ইতি মনে করে। প্রতিটি ধর্মের মূল্য এই দিয়ে বিচার করা যায় যে, সেই ধর্ম অনুরাগীদের মধ্যে কতখানি নৈতিক বল তৈরি করতে পেরেছে। সেইভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে লাদাখের মানুষ মুসলমান হয়ে নিজেদের বহু ভাল গুণ হারিয়ে ফেলেছে। লাদাখের বৌদ্ধরা স্বভাবত মিথ্যা বলতে, চুরি করতে জানে না। কর্গিলের কাশ্মিরী তহসীলদার বলছিলেন যে এর জন্য ওদের মাঝে মাঝে মূল্য দিতে হয়। তিনি নিজের বা অন্য কারুর অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন—তাঁর এক লাদাখ-এর বৌদ্ধ ভৃত্য ঘরে ঝাঁট দেওয়ার সময় একটি আধুলি দেখতে পায়। চুরির ভয়ে সেটা না ছুঁয়ে আধুলিটার চারপাশ ঘিরে কার্পেটটিকে কেটে ফেলে, আর ঝেড়ে আবার তাকে সেরকমই রেখে দেয়। হতে পারে আজকালকার দিনে সৎ ব্যক্তি জীবন যুদ্ধে সফল হতে পারে না, কিন্তু তাতে সততার নৈতিক মূল্য কমে যায় না।

খল্‌-চে-তে এক বৌদ্ধ গ্রামীণ অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি রাতে সেই গ্রামে থাকতে অনুরোধ করলেন। তাঁর বাড়ি (নুরলা) রাস্তা থেকে বেশি দূর নয়, তাই আমরা রাজি হয়ে গেলাম। অধ্যাপকের বাড়ি বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তাঁর বাগানে খুবানি, আপেল ও আঙুরের গাছ ছিল এবং বাড়িটিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। মা-বাবা ছেলের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ তিনি খুব মদ খেতেন ও স্ত্রীর প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী এতই সুন্দরী যে আমি ভাবতে পারিনি তিনি তার প্রতি কেন অনাসক্ত ছিলেন। লাদাখে বেশি মদ খাওয়াটা সাধারণ ব্যাপার। যদিও যবের সস্তা ছঙ্গ খেয়ে কেউ কাঙাল হয় না, তবু কাজের অবহেলা তো হয়ই। এবং এই অধ্যাপকেব চাকরি এই জন্য বজায় ছিল যে লাদাখে অধ্যাপকদের অভাব ছিল।

পথে আমরা রিজোঙ্‌-গুনপা (গুম্বা) গেলাম। এটি লাদাখের প্রধান গুন্‌পাগুলোর একটি। এখানের আগেকার লামা লাদাখের সবচেয়ে সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত লামা ছিলেন এবং গতবারের যাত্রাতে তাঁব সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। এখন তিনি মারা গেছেন, তাঁর জায়গায় একটি তিন-চার বছরের বাচ্চাকে অবতার মনে করে লামা করা হয়েছিল। গুন্‌পার ভিক্ষুরা চা খেতে অনুরোধ করলেন। শিশু লামার জন্যও আসন ও চায়ের চৌকি পাতা হল। আমরা দর্শন ইত্যাদি শেষ করে চা খেলাম। ব্রহ্মচারী গোবিন্দ পিছল খাড়া পাহাড়ের গায়ে ঝুলে নিজের রোলিফ্লেক্স ক্যামেরায় কিছু ছবি তুললেন।

সস্‌পোলা (২৩ জুন) একটি বড় গ্রাম। বছরে দশ মাস দূর পর্যন্ত ছড়ানো ক্ষেতের শ্যামলিমা—মাঝে মাঝে খুবানি, আপেল, সফেদা ও বিরির সবুজ গাছের বাগান তার সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দেয়। মিস্টার শাট্‌লওয়ার্থ যখন শুনলেন যে আমি লাদাখের দিকে যাচ্ছি তখন তিনি এক চিঠিতে লাদাখ-জান্‌স্কর-লাহুলের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানগুলোর বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি আল্‌চি-এর মন্দিরের বিষয়েও জানিয়েছিলেন। নীমু থেকে একটু পিছনে গিয়ে নদী পেরিয়ে আমরা আল্‌চি পৌঁছলাম। আল্‌চি-তেও অনেক খেত আছে। কিন্তু লোচওয়া-র মন্দিরের আশেপাশে

বেশির ভাগই গরিব ঘর। এই মন্দিরটি বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে এর মধ্যে একাদশ শতাব্দীর উত্তর ভারতীয় চিত্রকলার মহান সংগ্রহ রয়েছে। পূজারী এলেন, আমরা ভিতরে গেলাম। একটু অন্ধকার ছিল কিন্তু সেই সম্পত্তি দেখে আমাদের চক্ষুস্থির। নয়'শ বছর পরে আজও সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে আঁকা এই ছবিগুলো সজীব মনে হয়। সব ছবিই সুন্দর কিন্তু অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির ওপরে ছোট-ছোট চিত্রাঙ্কনগুলোর তো কথাই আলাদা। গোবিন্দজী নিজে শিল্পী, তিনি তো এই শিল্পকলার ভাণ্ডাব দেখে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইলেন। অজন্তার অর্ধলুপ্ত ছবিগুলো দেখে ঠিক তৃপ্তি হয় না। আর এখানে রয়েছে পূর্ণ চিত্র, তাও এমন সময়ের যখন এর কিছু নমুনা শুধু হাতে লেখা বইতেই পাওয়া যায়। যথেষ্ট আলো ছিল না। তাই ছবির সফলতার ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস ছিল না। তবু কিছু ছবি তোলা হল।

আগেও আমরা বিহারের শোচনীয় অবস্থা দেখেছিলাম, কিন্তু এবার বাইরে বেরিযে রত্নকোষের রক্ষক বাড়িটিকে বিশেষ করে লক্ষ্য করতে আরম্ভ করলাম। সেটিতে মেরামতির কোনো চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। লাদাখে বৃষ্টি খুব কম হয়। কিন্তু কয়েক শতাব্দীব বর্ষার কোনো প্রভাব না পড়া সম্ভব ছিল না। বাইরে দ্বারের থামগুলো হেলে গিয়েছিল, মোটা দেওয়ালে মাটি কেটে কেটে ফুটো হয়ে গিয়েছিল আর পরিষ্কার মনে হলো যে এই অবহেলায় এই মন্দির আর কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তারপব মনে হল—আশেপাশে গরিব ও অনভিজ্ঞ মানুষের বাস—কিন্তু কাশ্মীর রাজ্যের সরকার কি করছে? দুঃখের বিষয়, সভ্যতার অনুকরণকারী এই জন্তুদের পোষণ ও উন্নত করার প্রচুর মূল্য আমাদের সমাজকে দিতেই হবে। তিব্বতের মহান বিদ্বান লো-চ-ওয়া রিন্-ছেন্-জঙ্-পো (মৃত্যু ঃ ১০৫২) যেমন শতাধিক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করে সুরক্ষিত রেখেছেন তেমনি তৎকালীন ভারতীয় চিত্রকলার সুন্দর নমুনাও তিনি এই মন্দিরে সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আমাদের চোখের সামনে সেগুলো লুপ্ত হতে চলেছে। ভবিষ্যতেব ভারতীয়রা নিশ্চয় এই কর্তব্যবিমুখ মূর্খদের ক্ষমা করবে না, কিন্তু তাতে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তি তো ফিরে পাওয়া যাবে না। লাদাখ থেকে ফিরে আমি ইংরিজি-হিন্দি কাগজগুলোতে আমার বক্তব্য জানিয়েছিলাম, রাজমন্ত্রী এবং স্মরণীয় অফিসারদের তো তখনই আবেদন করেছি। কিন্তু যেভাবে আমার আবেদনে সাড়া পেলাম তাতে আশাহত হতে হল।

সস্‌পোলা ফিরে আমরা লে (লেহ)-র দিকে রওনা হলাম। ২৫ তারিখ লে পৌছলাম। লালা শিবরাম মারা গিয়েছিলেন তবে তাঁর ভাইপো লালা কুন্দনলালও সমান উৎসাহী ছিলেন। আমরা হেমিস্ লাব্‌রাঙ্-এ উঠলাম। রাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার প্রস্তুতি করছিলাম হঠাৎ সারা শরীর জ্বলতে লাগল। উঠে টর্চ জ্বালিয়ে দেখি বিছানায় হাজার হাজার ছারপোকা কিলবিল করছিল। আর কয়েকশো বছরের পুরনো দেওয়াল তো তাদের বিরাট দলবলের চলনে লালচে হয়ে গেছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিছানা তুলে বাইরে ছাতে নিয়ে এলাম। হেমিস্-এর বার্ষিক মেলা তখন আসব-আসব, তাই কিছুদিন পর ১ জুলাই আমরা হেমিস্-এর উদ্দেশে রওনা হলাম।

হেমিস্ লামা সেই সময়ে তিব্বত গিয়েছিলেন, ফলে সেখানে আমাদের পরিচিত কেউ ছিল না। হেমিস্ বেশ ধনী মঠ, লাদাখের খেতের একটা বিরাট অংশ তার সম্পত্তি, কিন্তু তার দেখাশোনার জন্য যারা ছিল তারা অকর্মণ্য। ছাগ্-জোদ (ম্যানেজার) তো একটা জন্তু ছিল, তার কোনো আক্কেল ছিল না। আমাদের বিষয়ে সে জানতো যে সেখানকার উচ্চপদস্থ কর্মীরাও আমাদের সম্মান করে, হেমিস্ লামা আমার পুরনো বন্ধু এবং তাঁর সঙ্গে আমার বরাবর পত্রবিনিময় রয়েছে, তা সত্ত্বেও বাংলোতে ঘর খালি থাকার পরও সে আমাদের বাইরে রাখতে চাইল। যাক্‌গে, অন্য লোকেরা বোঝালো, তখন আমরা একটা ঘর পেলাম। আমি এই মেলা আর 'ভূতনৃত্য' দ্বিতীয়বার দেখছি। তবুও আমি এবারে একটু বেশি বুঝতে পারছিলাম, কারণ এখন আমি তিব্বত ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। আসলে এটি ভূতনৃত্য (ডেভিল ডান্স) নয়, ধার্মিক নাটক। এতে বুদ্ধ, তিব্বতের প্রাচীন সম্রাট সাংচান-গ্যাম্বো, লাং-দর মা আর ক্রুর দেবতাদের অভিনয় হত। ক্রুর দেবতাদের ভয়ংকর চেহারা দেখে ইউরোপীয় পর্যটকবা এর নাম ভূতনৃত্য দিয়ে দিল। গোবিন্দজী এই নাচের অনেকগুলো ছবি তুললেন।

গতবারের যাত্রাতে আমি নাট্যস্থলের পাশের বারান্দায় পাথরে খোদাই করা চুরাশি সিদ্ধির ছবি দেখেছিলাম। কিন্তু তখন আমি অষ্টশতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দি সাহিত্যের বিষয়ে চুরাশি সিদ্ধির মাহাত্ম্যকে অত বুঝতাম না, এবারে আমি এটি ভাল করে দেখলাম ও ব্রহ্মচারী গোবিন্দকেও দেখালাম। গোবিন্দজী এই ছবিগুলোর কপি করবেন বলে থেকে গেলেন। পরে লে-তে ফিরে এসে তিনি জানালেন, পাথরে উৎকীর্ণ রেখাচিত্রগুলো বাইরের রঙে আঁকা ছবিগুলো থেকে বেশি সুন্দর।

৩ জুলাই লে ফিরে এলাম। লে-তে হেমিস্ লামাব নতুন বাড়িতে আমার থাকাব ব্যবস্থা হয়েছিল, এটা বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আলো-বাতাস প্রচুর এবং ছারপোকার অত্যাচাব থেকে মুক্ত ছিল। আমার লে আসার পর এক রাত খুব বৃষ্টি হল। লোকে বলছিল এমন বৃষ্টি বুড়োমানুষেরাও দেখেনি। লাদাখে মাটির দেওয়াল ও মাটির ছাত দেওয়া ঘর বছরে এক-আধ ইঞ্চি বৃষ্টির ধকল সহ্য করতে পারার মতো করে তৈরি করা হয়। বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ বর্ষার একটি বিশেষ পরিণাম পর্যন্তই চিন্তা করতে পারে। কিন্তু এতখানি বৃষ্টি তাদের ধারণার বাইরে। ফল এই হল যে পরের দিন লে-র কয়েক কুড়ি ঘর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। তার মধ্যে হেমিস্-লাব্‌রাঙ্ও ছিল যেখানে আমরা আগে দু-চারদিন থেকেছিলাম।

লাদাখে আমার আর বেড়াবার ইচ্ছে ছিল না, কারণ হাতে কিছু কাজও ছিল। আমি গত বছর 'ধম্মপদ'-এর হিন্দি-সংস্কৃত অনুবাদ করেছিলাম। এইবার পুরো মজ্ঝিমণিকায় অনুবাদ করার ছিল। ডাঃ কুলভূষণের ইচ্ছায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস-এর অপর একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁর পত্রিকা 'শ্রী'-এর জন্য শ্রীনগরেই দিয়ে এসেছিলাম। এখন সেটা হিন্দিতে সূত্র নির্দেশসহ লেখার ছিল। তিন মাসের পক্ষে এই কাজগুলো যথেষ্ট। কিন্তু লাদাখের বৌদ্ধদের শিক্ষার জন্য, বিশেষ করে প্রাথমিক পাঠশালার জন্য তিব্বতী ভাষার

পাঠ্যপুস্তক ও ব্যাকরণ বই-এর খুব প্রয়োজন ছিল। নোনোছের্তেন্-ফুন্-ছোগ্ এক উৎসাহী তরুণ ছিলেন, তাঁরও আগ্রহ দেখে আমাকে ব্যাকরণ ও চারটি বই লেখার কাজ হাতে নিতে হল। কাজের মধ্যে থাকারও আনন্দ আছে। তাই দিন-রাত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সেই তিন মাস আমার পক্ষে খুশির দিন ছিল।

লাদাখে পাদরী জোসেফ গের্গেন্-এর সঙ্গে আলাপ করে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেলাম। গোর্গেন্ খুব বৃদ্ধ ছিলেন, কিন্তু শারীরিক ও মানসিকভাবে কর্মঠ ছিলেন। যদিও তিনি কন্-জুর্ ও তন্-জুর রূপে ভারতীয় বাঙ্‌ময়-এর বিস্তৃত অনুবাদ পড়ার সুযোগ পাননি বা তার দর্শনের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু শুদ্ধ তিব্বতী সাহিত্য, ভাষা আর ইতিহাসের অত্যন্ত গভীর জ্ঞান ছিল তাঁর। নিজের তিব্বতী জাতীয়তার গর্ব তাঁর ছিল, তাই এইসব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন। ডাঃ ফ্রাঙ্ক লে-তে থাকাকালীন তাঁর গবেষণায় গের্গেন্ অনেক সাহায্য করেছিলেন। এই জার্মান বিদ্বানের সান্নিধ্যে গের্গেনের অনুসন্ধানী দৃষ্টি খানিকটা বৈজ্ঞানিক হয়ে গিয়েছিল, আমাদের দুজনের সম্পর্ক বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে গেল, কারণ আমিও তাঁর মতো তিব্বত জাতির ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার বস্তু বলে মনে করতাম। কতবার তিনি আমার এখানে আসতেন এবং আমিও কতবার তাঁর বাড়ি যেতাম। বস্তুত এই ঘরটাও যেখানে আমি ছিলাম, গের্গেন্ই তৈরি করিয়েছিলেন, যেটা পরে হেমিস্ লামা কিনে নেন। তাঁর নতুন বাড়িটি ছিল পূর্বদিকে কিছুটা দূরে মাঠের মধ্যে, আর তাতে আগের থেকে বেশি আলো-বাতাস ছিল।

লে-তে অনেক পাঞ্জাবি দোকানদার আছে, তাদের নেমন্তন্ন বরাবর লেগেই থাকত। কিন্তু আমি যত কাজ আমার মাথায় নিয়ে রেখেছিলাম, সেগুলো শেষ করার জন্য খুব কিপ্টের মতো সময় খরচ করতে হত, আর স্রেফ রোববারই নেমন্তন্নে যেতাম। গোটা কলাই ও হনুমান কড়াই-এর ডাল খুব সুস্বাদু কিন্তু সমুদ্রতট থেকে ১৩,৫০০ ফুট ওপরে তা রান্না করতে আট-দশ ঘণ্টা সময়ের দরকার। এটা কখনোই হয়নি যে, আমার অতিথিসেবক আমাকে পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ খাবারের চেয়ে নিম্নস্তরের খাবার খাইয়েছেন। রোজকার রান্না করে দিতেন মাস্টারের স্ত্রী। যে-মাস্টার ওই ঘরেই থাকতেন এবং যিনি মিড্‌ল স্কুলে তিব্বতী ভাষার দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। দুপুরের পর আমি শুধু চা খেতাম তাই তাঁদের ওপর খুব চাপ পড়তো না। মাস্টার নম্-গ্যল্ অত্যন্ত সিধেসাদা মানুষ ছিলেন, আমি চাইছিলাম তিব্বতী সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ রুচি হোক, কিন্তু এখন তাঁর পক্ষে সে-সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। আমার চোখে যন্ত্রণা হচ্ছিল, আমি হাসপাতাল থেকে আই-লোশন্ (নেত্ররস) নিয়ে এলাম। সন্ধেবেলা মাস্টারকে বললাম যে চোখে ওষুধ দিয়ে দিন। মাস্টার বললেন, 'আজ নয় কাল'। আমি আবার বললাম, আবার সেই জবাব। তৃতীয়বারও পুনরাবৃত্তি করাতে কোনো ফল হল না। আমি বুঝতে পারছিলাম না, তিনি কেন কাল-কাল করছেন। আমি বললাম, 'না, ওষুধ দেওয়া খুব দরকার, আজকেই দিতে হবে।' তারপরের দৃশ্য!—মাস্টার ধীরে ধীরে এসে আমার জায়গার পাশে বসে পড়লেন, আর ওপরের দিকে মুখ করে, চোখের পাশে আঙুল রেখে বললেন,'আচ্ছা, তাহলে দিয়ে দিন।' আমার হাসি তো আর থামছিল না, কিছুক্ষণ পর্যন্ত কথা বলাই

মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমি বললাম, 'আমার চোখে ব্যথা, এতে ওষুধ দেওয়া দরকার।' তিনি বললেন, 'আমি তো ভাবছিলাম আমার চোখে ওষুধ দেওয়া হবে, তাই কাল-কাল বলছিলাম।' মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী তাঁর থেকে বেশি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং বাড়ির কাজকর্ম তিনিই সামলাতেন।

একদিন বিকেলে হেমিস্-এর ম্যানেজার (ছগ্-জোদ্) এল। রাতে তার এখানেই থাকার ছিল। সে বলে পাঠাল আজ সে এঘরে থাকবে আমি যেন অন্য ঘরে চলে যাই। ছড়ানো বইপত্রের ডাঁই অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ ছিল না, তারপর এটা তো পুরোপুরি অপমান। আমি বলে দিলাম—ছগ্-জোদ্ সাহেবই দয়া করে অন্য ঘরে চলে যান। সে কি সব বিড়বিড় করতে লাগল। যখন এই ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষরা জানতে পারলেন তখন তাঁরা তাঁকে ডেকে খুব করে বকলেন। সে ছিল একেবারে বোকা। তারপরও ভয়ে সে অজুহাত দেখাল—'আমি তখন মদের নেশায় ছিলাম।' কিন্তু এটা তো তার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল।

হেমিস্ থেকে ফিরে গোবিন্দজী লে-তে এলেন। তিনি তাঁর পেন্সিলের আঁকা রেখাচিত্রগুলো দেখালেন আর মূল ছবিগুলোর খুব প্রশংসা করলেন। 'মন্-পঙ্-গোঙ্' যাওয়ার না আমার ইচ্ছে ছিল, না তার জন্যে সময়। কিন্তু তার সৌন্দর্য, তার নীলার মত জলের প্রশংসা করে আমি তাঁকে সেখানে যেতে পরামর্শ দিলাম। তিনি ঘোড়া ভাড়া করে সেদিকে গেলেন এবং আমার প্রশংসা বাস্তব থেকে কম বলে জানালেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমি বলে দিয়েছিলাম যেন যথেষ্ট জিনিস নিয়ে যান। তিনি এক জায়গার মাখনের বিষয়ে বলছিলেন—আমি এক টাকার মাখন কিনলাম। সামনে এলে জিজ্ঞাসা করলাম—দামটা মাখনের না উলের জন্য।

মন্-পঙ্-গোঙ্ থেকে ফিরে গোবিন্দজীর সমতলে রওনা হওয়ার কথা ছিল, কেননা শান্তিনিকেতনেব পড়া আরম্ভ হতে যাচ্ছিল, যেখানে তিনি অধ্যাপক ছিলেন। আমার জার্মানি ছেড়ে আসার দু-মাস পরেই হিটলার শাসন ক্ষমতায় এসে গিয়েছিল। গোবিন্দজীর জার্মানির সম্পত্তি থেকে কিছু টাকা ভারতে আসতো। নাৎসি সরকার টাকা বাইরে যেতে বন্ধ করে দিল। গোবিন্দজী ও তাঁর বৃদ্ধা ধর্মমাতা বিদেশে এক ভীষণ পবিস্থিতিতে পড়লেন। তিনি কলকাতায় জার্মান কন্সল-জেনেরালকে একটা বড়ো চিঠি লিখলেন— 'জার্মানির জন্য আমরা যত সাংস্কৃতিক কাজ করি তার জন্য জার্মান শাসকদের আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল, অথচ উল্টে তারা আমাদের শাস্তি দিতে চাইছে।' এই টানাপোড়েন চলল কয়েক বছর। পরে যখন ভারতে থাকা নাৎসিরা এই সম্পর্ককে অসহ্য করে তুলল তখন যুদ্ধের অনেক আগেই জার্মান নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করে তিনি ভারতীয় নাগরিক হয়ে গেলেন। গোবিন্দজী একা ফিরে যাওয়ায় আমাদের দুজনেরই আফশোশ হল। আমাদের দুজনের যাত্রা পরস্পরের খুব ভালোবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে হয়েছিল, নানা সাংস্কৃতিক সামাজিক বিষয়ে মধুর আলোচনা হতে থাকতো।

লে মাত্র একশ বছর আগে স্বাধীন লাদাখ রাজার রাজধানী ছিল। আজও রাজার

বিশাল রাজপ্রাসাদ একটা পাহাড়ী টিলার ওপরে রয়েছে, এবং সেটি পুরানো রাজবংশের অধিকারে, তবু তার আর সে শ্রী নেই। জম্মুর সৈন্যরা এই রাজ্য দখল করার সময় যথেষ্ট বর্বরতা করেছিল। রাজপ্রাসাদে হাতে তৈরি পুরু কালো, ও মসৃণ কাগজের ওপর সোনালি অক্ষরে লেখা গাদাগাদা কন্-জুর-এর পাতা আমি দেখেছিলাম। এবার ভাবছিলাম যদি ওগুলো আবর্জনার ডাঁই করে পচার জন্য রাখা থাকে তাহলে মালিকদের বলে নিয়ে যাব। কিন্তু এবারে দেখে মনে হল পাতাগুলোকে ক্রমান্বয়ে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি হারানো পাতাগুলোর বিষয়ে খোঁজ করলাম, তখন জানা গেল যে জম্মুর সেনাপতি বহু ধর্মীয় বই-এর পাতা স্থানীয় কেল্লাগুলোর ছাত পেটানোর কাজে লাগিয়েছিল। আমি এই ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য একদিন কেল্লায় গেলাম। ছাত কাঁচাই ছিল, একটুখানি জায়গা খুঁড়ে দেখলাম সত্যিই ভিতরে স্বর্ণাক্ষরে লেখা কালো পাতার টুকরো রয়েছে। এই হল হিন্দুদের ধার্মিক সহিষ্ণুতার উদাহরণ!!

রাজপ্রাসাদ ও সেখানকার গুন্‌পার গ্রন্থাগার এবং মূর্তিগুলোর বিষয়ে আমি সন্ধান করলাম, সব জায়গাতেই পুরনো জিনিসপত্র ছিল। লেহপ্রাসাদ-এর কাছে হেমিস্-এর অধীনে একটি মন্দির আছে, সেখানে অষ্টম-নবম শতাব্দীর রূপোর তৈরি অম্লানচক্ষুওলা একটি বুদ্ধমূর্তি দেখলাম। খোঁজ করলে এখনও লাদাখে বহু পুরনো জিনিস পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সেটা একজন মানুষের কাজ নয়।

গতবার যখন আমি লাদাখে এসেছিলাম তখন চীনের তুর্কিস্তান যাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু তখন আমার কাছে পাসপোর্ট ছিল না। এবারও ইচ্ছে হল এবং পাসপোর্টও ছিল কিন্তু অন্যান্য কাজ শেষ করার প্রতি আকর্ষণ এত ছিল যে এবারেও সেই ইচ্ছেটা আর পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। তুর্কিস্তানের ব্যাপারী আর হজযাত্রীরা গরমের সময় লাদাখে প্রায়ই আসেন। এইবারে তুর্কিস্তানে গৃহযুদ্ধ চলছিল, যার জন্য ভারতীয় ব্যাপারীরা—যাদের অনেকেরই দোকান লে-তেও আছে—খুব চিন্তিত ছিল। যে ভারতীয়রা সেখানে গিয়েছিল, তাদের অনেকের মালপত্র লুট করা হয়েছিল এবং কিছু মারাও গিয়েছিল। চীনের অফিসারদের বের করতে তো তুর্কীরা সফল হয়েছিল কিন্তু পরে এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির দ্বন্দ্ব বেধে গেল। তুর্কিস্তান এক সময়ে আর্য ভাষা-ভাষীদের প্রদেশ ছিল। চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে কুচা নিবাসীরা ভারতীয় লিপি ও সংস্কৃত সম্বলিত ভাষা ব্যবহার করতো। তাদের কিছু গ্রন্থ গোবির বালির ভেতর থেকে পাওয়া গেছে। পরে তুর্কিস্তান বিভিন্ন আক্রমণকারী জাতির আখড়া হয়ে গেল। হূণ, উইগুর, তুর্ক, মঙ্গোল এবং সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতীরাও তাকে আক্রমণ করল। এই সব জাতির বহু মানুষ সেখানে বসবাসও করতে লাগল। তুর্কীদের সংখ্যা ও প্রভাব বেশি হওয়াতে দেশবাসীদের ওপরও তাদেরই ভাষার প্রভাব পড়ল। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে যখন আরবদের অধিকার হল তখন তুর্কীরা মুসলমান হয়ে গেল। এর পরেও মূল জাতিগুলোর ভেতরে বিভেদ কিছুটা থেকেই গেল। সাম্প্রতিক বিদ্রোহে এই ভেদাভেদটাই প্রবল হয়ে উঠল। আর এক জাতির প্রধান চাইল না যে অন্য জাতির

প্রধান দেশের সর্বেসর্বা হয়ে যাক। ফল এই হল যে আবার তাদের জাতীয় স্বাধীনতা হারাতে হল। এখনও এই সংঘর্ষ অনেক জায়গায় চলছিল। আমি লে থেকে ফেরার আগেই একটা বিরাট দল ইয়ারকন্দ (চীনা তুর্কিস্তান বা সিঙ্-ক্যাঙ্) থেকে এল। ভাল-ভাল ঘোড়া মাসের পর মাস হেঁটে এসে রোগাটে হাড়গিলে হয়ে গিয়েছিল।

এখানেই বরোদা থেকে তার পেলাম—আপনি ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে হিন্দি বিভাগের সভাপতিত্ব স্বীকার করুন। এই কনফারেন্সে জয়সওয়ালজীর সভাপতিত্ব করার কথা ছিল এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে বরোদা যেতেই হত। তাই এটা স্বীকার করার বিশেষ কোনো অসুবিধে ছিল না। আমি স্বীকৃতি পাঠিয়ে দিলাম।

ফেরার সময় আমি লাহুল-কুলুর পথ বেছে নিলাম। জুন-জুলাই মাসে হোশিয়ারপুরের ঘোড়াওলারা এসে গিয়েছিল। খরচের টাকা কমে গিয়েছিল কিন্তু নেপালের সাহু ধর্ম্মমানজীর এক শাখা এখানেও খুলে গিয়েছিল, মাহিলা সাহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাই আমার টাকা পেতে অসুবিধে হল না।

লাদাখ থেকে প্রস্থান—লে-তে এবারে আমি ৪ জুলাই থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক নাগাড়ে রইলাম। কাজও অনেক হলো। 'মজ্ঝিমণিকায়'-এর হিন্দি অনুবাদ 'তিব্বত মে বৌদ্ধধর্ম,' ভোটিয়া বইগুলো এবং আরও কিছু যাত্রার পথে লিখে ফেললাম।

১৭ সেপ্টেম্বর আমার লে ছাড়ার কথা ছিল। কানুনগো, তহসীলদার, উজির সাহেব সকলের কাছে বিদায় নিলাম। জোসেফ গের্গেনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সবচেয়ে বেশি আফশোশ হল। লাদাখে তিনিই এমন এক মানুষ যার নিজের ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে খুব গর্ব আছে এবং তিনি নিজের পুরো জীবনটা এর অধ্যয়নের পিছনে লাগিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি বেশ বৃদ্ধ, পাকা আমের মতো যেকোনো সময় বৃন্ত থেকে খসে পড়তে পারেন। গের্গেনের সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা সন্দেহ। দুপুরের পরে আমি নিজের ঘোড়ায় চড়লাম। আজ বেশি দূর যাওয়ার ছিল না, মাত্র আট মাইল দূরে ঠিকসে গুম্বা-তে থাকার কথা ছিল। তিনটেয় শে-এর মহলে পৌঁছলাম। শে-তে রাজধানী বানানোর আগে লাদাখের রাজবংশ এই জায়গায় থাকত। সিন্ধুর ধারা এখান থেকে কাছেই। এখনও এখানে এক প্রাসাদ ও গুম্বা রয়েছে। ১০০ বছর আগে যখন লাদাখ স্বাধীন ছিল তখন রানীরা সন্তান জন্ম দেওয়ার আগে এখানেই আসতেন। বহু প্রজন্ম পর্যন্ত লাদাখের রাজারা এখানেই জন্ম নিতেন। সেই বংশের উত্তরাধিকারী এখনও রয়েছে। লে-র রাজপ্রাসাদের মতো শে-র প্রাসাদও তাঁরই হাতে, কিন্তু বেচারির এত আয় নেই যে প্রাসাদগুলো মেরামত করাতে পারে। গুম্বাতে বুদ্ধের এক বিশাল মূর্তি আছে। হস্তলিখিত কন্-জুর ও তন্-জুর-এর অনেক পাতা স্তূপ করা ছিল। ৭ বছর আগে এই স্তূপ আরও বড় ছিল, মনে হয় লোকেরা এইগুলো প্রসাদ বলে নিয়ে যায়। গ্রামের পাশে একটি বিহার আছে। সেখানে কিছু মাটির পুরনো মূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলো লতা দিয়ে তৈরি। কোনো সময় এগুলো ঞারুমা-র পুরনো মঠে থাকত। ঠিকসে মাত্র দুমাইল ছিল। পাঁচটার সময় আমরা সেখানে যাওয়ার জন্য রওনা হলাম। ঠিকসে গুম্বা লাদাখের

প্রধান ছটি গুম্বার একটি। এখানকার অবতার লামার ওপর দিয়ে কি কি ঘটেছিল সে-প্রসঙ্গে আমি আগে বলেছি। যতদিন এই অবতার লামা জীবিত রয়েছে ততদিন অন্য লামা (মোহান্ত) কি করে হবে? হ্যাঁ, এ মারা যাওয়ার পর লোকেরা আবার নতুন লামার খোঁজে বেরুবে। এই গুম্বাটি তত পুরনো নয় তবে কিছু জিনিস অন্য পুরনো বিহার থেকেও এখানে এনে রাখা হয়েছে। প্রধান মন্দিরে একটি কাঠের খুব সুন্দর প্রভা-মণ্ডল আছে, এটাও কোনো পুরনো বিহার থেকে এসেছে। সম্ভবত এটাও ঞরমা-র বিহার থেকে আনা হয়েছিল, যা দশম-একাদশ শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল। লাদাখে গত ষাট-সত্তর বছরে বহু ঘর মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এটা দেখে আমি খুব খুশি হলাম যে, খঙসর পরিবার মুসলমান হওয়ার পর তাদের বাড়ির দুটি সুন্দর মূর্তি সিন্ধুতে না ভাসিয়ে দিয়ে এই গুম্বাতে ফেলে দিয়েছিল। আজকাল মঠের কর্তৃপক্ষদের নিজেদের মধ্যে বেশ ঝগড়া চলছে।

দ্বিতীয় দিন (১৮ সেপ্টেম্বর) আমি আবার রওনা হলাম। দুমাইল দূরে ঞরমা বিহারের ধ্বংসাবশেষ আছে। এটা বহু পুরানো বিহার ছিল। এখানে অনেকগুলো বড় বড় দেবালয় ছিল, যেগুলোর মোটা-মোটা মাটির দেওয়াল এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু স্তূপের ভেতরে এখনও পুরনো চিত্রের চিহ্ন আছে। কিন্তু রাখালরা পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে সেগুলিকে বিকৃত করে দিয়েছে। স্তূপে কাঁচামাটির ওপর নাগরী অক্ষর ছাপা বেশ কিছু মোহর পাওয়া গেছে আমি তার থেকে চার-পাঁচটি জড়ো করলাম। চিত্রগুলো নিঃসন্দেহে ভাল ছিল। একটি চিত্রের নিচের দিকটি থেকে গিয়েছিল এবং তার ওপর লেখা ছিল 'দিপঙ্করায়নমো'। আমি ছুরি দিয়ে প্লাস্টার কেটে সেটিকে বার করলাম, আর উলের মধ্যে বাক্সবন্দী করে পাটনা মিউজিয়ামের জন্য নিয়ে নিলাম। আমার তো বিশ্বাস ছিল না যে সেটা ঠিকমতো পাটনা পৌঁছবে কিন্তু সেটা ঠিকঠাক পৌঁছে গেছে দেখে খুব খুশি হলাম। এখন আশেপাশে দুচার ঘর মাত্র বৌদ্ধ রয়ে গেছে, তারাও কিছু বছর পরে মুসলমান হয়ে যাবে। এর জন্য আফশোশ করার কি আছে? আখেরে মানুষ পুরনো ধর্মে কোনো সামাজিক ত্রুটি দেখার পরই নতুন ধর্ম অবলম্বন করে। রণবীরপুর হয়ে আমি হেমিস্ গুম্বার সামনে কাঠের পুলের ওপরে পৌঁছলাম, আর সেটা দিয়ে সিন্ধু পার হলাম। ওপরের দিকে যেতে যেতে সওয়া চারটের সময় মর-চেলঙ্ গ্রামে পৌঁছলাম। আজ ১৪ মাইল এলাম কিন্তু ঘোড়ায় চড়েছিলাম বলে কিছু মনে হল না। এই গ্রামটি সাড়ে এগারো হাজার' ফুট উঁচুতে। রাতে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হল। এখানেই আমাদের হোশিয়ারপুরের ঘোড়াওয়ালাদের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।

পরের দিন (১৯ সেপ্টেম্বর) ১৬ মাইল গিয়ে মীরু গ্রামে থাকার ছিল। ঘোড়া-খচ্চরওয়ালারা খেয়ে-দেয়ে দশ-এগারোটার সময় যায়। হিন্দু বলে ওদের খাওয়া-দাওয়ায় বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়। উপশী গ্রাম পর্যন্ত আমরা সিন্ধু নদীর ধার দিয়ে গেলাম। তারপর নদীর কিনার ধরলাম। কোথাও বসতি চোখে পড়ল না। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড় চোখে পড়ল। সারাদিন মেঘলা ছিল এবং গাঁয়ে পৌঁছতেই বৃষ্টি হতে লাগল। মীরু বহু পুরনো গ্রাম। একটা বিখ্যাত প্রবচন

আছে—'ম্‌খর্‌-লস্‌ স্ঙ্‌ ব খ-ল-র্চে। য়ুল্‌-লস্‌ স্ঙ্‌-ব মি-রু-র্চে।' (প্রাসাদের মধ্যে পুরনো খলচে আর গ্রামের মধ্যে পুরনো মীরু)। একসময় এটি বড় গ্রাম ছিল, দূর পর্যন্ত দেখা যায় ধ্বংসাবশেষ আর ধ্বংসাবশেষ। সব ভাইদের একটা স্ত্রী হওয়ার জন্য তিব্বতের অন্যান্য জায়গার মতো লাদাখেরও জনসংখ্যা কমতে কমতে যাচ্ছিল। আর এখন গ্রামগুলো বাড়ার অবস্থায় আসবে বলে আশা করা যায় না। গ্রাম পেরিয়ে একটা চাটান পাথর সামনের দিকে বেরিয়ে ছিল, তার নিচে আমাদের থাকার জায়গা হল। ওরগেন্‌ (রামদয়াল) এই গাঁয়ে থাকতেন। তিনি বুশহরের লোক ছিলেন তবে এখন এখানে ঘর-জামাই হয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে হেমিসে দেখা হয়েছিল, এখানেও হল। তাঁর বাড়িতে গেলাম। বাড়ি তো নয় যেন পাথরের স্তূপ। গম ভাজা আর পাঁচটি ডিম নিয়ে বিকেলে তিনি আমার কাছে এলেন। তিনি খুব করে বলতেন যে আমি যেন তাঁর জন্য 'যন্ত্র' লিখে দিই। আমি কত করে বোঝাতাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে চাইতেন না। তারপর তিনি দুটো 'যন্ত্র' লিখিয়ে নিয়েছিলেন। একটিতো সন্তান হওয়ার জন্য, অন্যটি গৃহিণীর গরম মেজাজ ঠাণ্ডা করার জন্য। আমি ব্রাহ্মী ভাষায় লিখে দিলাম। 'মন্ত্র কিছু নেই'। গরম মেজাজ ঠাণ্ডা হবে—এমন তো আশা ছিল না, তবে যদি সন্তান হয়ে যায় তাহলে সেটা ভারতের লামার মন্ত্রেরই প্রভাব বলে মনে করা হবে। পরের দিন (২০ সেপ্টেম্বর) খাওয়া দাওয়া করতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। পথে দু-একটি ঘর পাওয়া গেল তারপর বড় গ্রাম গ্য এল। গ্য গ্রামটির একাদশ শতাব্দীতে অস্তিত্ব ছিল। এখানকারই ভিক্ষু চোণ্ডসেঙ্‌গে বিক্রমশীলায় পড়তে গিয়েছিলেন এবং দীপঙ্করের সঙ্গে তিব্বতে ফিরেছিলেন। এখানেই আশেপাশে পুরনো স্তূপ আর বিহারগুলোর বহু ধ্বংসাবশেষ আছে। তিন মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর লাদাখের শেষ গ্রামটি পেলাম। এটার পর এবার লাহুলেরই ঘর দেখা যাচ্ছিল। এখন ফসল কাটা হয়ে গিয়েছিল। আমরা উপরের দিকে যত এগোচ্ছিলাম উপত্যকাও তত চওড়া হয়ে যাচ্ছিল। খালে ঘাস বেরিয়ে ছিল। সোয়া সাতটায় আমরা ১৬ মাইল গিয়ে থাকার জায়গাতে পৌঁছলাম।

পরের দিন (২১ সেপ্টেম্বর) ফের ১১ টার সময় রওনা হলাম। আজ পরবর্তী বিরতির স্থানটি ছিল ২২ মাইল পর এবং সাড়ে ১৭ হাজার ফুট উঁচু। তুগ্‌নলুঙ্‌-লা-এর জোত পার হওয়ার ছিল। চড়াই খুব কঠিন ছিল না, কিন্তু খুব শ্বাস নিতে হচ্ছিল। আমাদের সঙ্গীরা বলছিলেন, এখানে গন্ধক প্রচুর আছে, তাই দমবন্ধ হয়ে আসছে। তিনি কি আর জানেন যে সমুদ্র তল থেকে সাড়ে সতেরো হাজার ফিট উঁচু আসমানে চলছেন, আর এখানে বাতাস হালকা এবং অক্সিজেনের মাত্রা খুব কম। কয়েকটি খচ্চরকে অনেক কষ্টে ডাঁড়া পার করানো হয়েছিল। অপরদিকে নিচে নামার পর দেব্‌রিঙ্‌-এর বিশাল মাঠ পেলাম। এই মাঠ ১৫ হাজার ফিটের চেয়ে বেশি উঁচুতে রয়েছে। ঠাণ্ডার সময় ভেড়াওলারা এখানেই থাকে। এই সময় ওখানে প্রচুর ঘাস ছিল। ক্যাঙ্‌ (জংলী গাধা)-এর দল স্থানে স্থানে চরে বেড়াচ্ছিল। অন্ধকার হতে হতে আমবা রোগ্‌চিনে থাকার জায়গাতে পৌঁছলাম। গ্রামটি তাঁবুওলা পশুপালকদের। পাশে একটি ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এখানেও একসময় কোনো গ্রাম ছিল। আমরা একটি পুরনো

দেয়ালের কাছে ছিলাম। চমরি গাইয়ের বাছুর খুব লাফালাফি করছিল।

খাবার জিনিসের মধ্যে আমরা আটা, চা, চিনি, আপেল, সেদ্ধ ডিম আর মাংস সঙ্গে এনেছিলাম। ছ-দিনের দিন (২২ সেপ্টেম্বর) মাংস খাবার মতো থাকল না। বোঝা যাচ্ছিল যে দেবরিঙ্ ও আশেপাশের উপত্যকাগুলোর জল বাইরে যেতে পারে না। এখানে জল আছেও খুব কম। আজ আমরা ১৮ মাইল পথ চলে নদীর ধারে এলাম। সন্ধের দিকে ঠাণ্ডা যথেষ্ট ছিল। পাহাড় বেশির ভাগ মাটির মনে হচ্ছিল, এখানে খচ্চরদের চরার মতো ঘাসও ছিল না। কিন্তু লোকে সঙ্গে করে ঘাস নিয়ে এসেছিল। রাত নটার সময় রুন্শু-র একজন লোক ওখানেই থাকার জন্যে এল। বেচারি অনুনয়-বিনয় করতেই লাগল। লোকেরা হাজার একটা গালি দিল আর ধমকে তাড়িয়ে দিল। আমার খুব খারাপ লাগল কিন্তু ওখানে কাকেই বা বলব। আজ লা-চ-লুঙ্-এর ১৬ হাজার ৬০০ ফিট উঁচু জোত পার হওয়ার ছিল, আমার সঙ্গীরা সকাল সাতটাতেই রওনা দিল। তিন মাইল চলার পর চড়াই শুরু হল, কিন্তু আসল জোত ৮ মাইল পরে পেলাম। যদিও এই জোত তগ্-লুঙ্-এর চেয়ে উঁচু ছিল না, তবে মানুষ ও জানোয়ারগুলোর বড় কষ্ট হল। আমার ঘোড়া লে-র পোলোর ঘোড়া ছিল, ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। তিব্বতী নামগুলোর অর্থ তো আমার সাথী জানত না, তাই সে একটা জোতকে বলে দিল লোংলাচা আর অন্যটাকে বড়া-লাচা বলছিল। লাচা মানে হলো এলাচ। আমরা জোত পার হয়ে উৎরাইয়ে এলাম। সকলে খুশির নিঃশ্বাস ফেলল। এইরকম জোতে যদি কোনো ঘোড়া বা খচ্চর চলতে না পারে, তাহলে তাকে ওখানেই ছেড়ে দিতে হয়। কারণ ঘাস পাতা তো কোথাও নেই, ওখানে থাকা মানেই আরো দু-চারটেকে মেরে ফেলা। লোঙ্-লাচা কোনো পশুর বলি নেয়নি, এজন্য ওদের খুশি হওয়াই উচিত। হারিয়ে যাওয়া গাধা বা খচ্চরদের ফলাহার করার জন্য পাহাড়ে নেকড়ে প্রচুর আছে। এবার আমরা চর্ব নদীর ধারে চলে এলাম। সামনে কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা বিরতি দিলাম। আজ ৭ মাইলের বেশি পথ চলা গেল না। এই জায়গাটাও ১৩ হাজার ৪০০ ফিট উঁচু, কিন্তু আমাদের গরম লাগছিল, কারণ আমরা খুব ঠাণ্ডা জায়গা থেকে আসছিলাম। নদীর ধারে প্রচুর ঘাস ছিল। খচ্চরওয়ালারা পশুগুলোকে সেখানে চরাবার জন্যে নিয়ে গেল। রাতে কোনো জন্তু যাতে ঘোড়াকে আক্রমণ না করে তাই ৩ জন লোকও আটা-চা নিয়ে ওখানে শুতে গেল। এখনও আমরা কাশ্মীর রাজ্যে ছিলাম। পরের দিন (২৪ সেপ্টেম্বর) সোয়া এগারটার সময় আমরা যাত্রা শুরু করি। আমাদের বাঁদিকে একটি নদী পড়ল, এটাই লাদাখ (কাশ্মীর) ও কুলুর সীমা। কিছুদূর যাওয়ার পর সামনের একটি পাহাড় থেকে জলের অজস্র প্রায় পঞ্চাশটি ধারা নির্গত হচ্ছে দেখা গেল। আমার সঙ্গীরা এই পাহাড়টিকে টুটুপানি বলছিল।

আমি তো আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলাম যে, ব্রাহ্মণেরা এই স্থানটিতে কোনো বড় তীর্থস্থান কেন করেননি? জলের এত সুন্দর দৃশ্য খুব কম দেখা যায়। একে অনায়াসে সহস্র ধারাতীর্থ বলা যেতে পারে। আর দশ-বিশটা শ্লোক দিয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণও করা যেতে পারে।

বোধহয়, পয়সাওলা ভক্তদের অতদূর আসার ক্ষমতা হবে না। পরের জোত কতটা বিপজ্জনক, সেটা পরে জানাবো। পরের জোত কি ভয়ঙ্কর তা পরে বলছি। শিখদেরও হিমালয়ের তীর্থের খুব প্রয়োজন আছে, তারাই বা কেন তাদের কোনো গুরুর নামে সহস্রধারা তীর্থকে কাজে লাগাচ্ছে না।

সামনে লিঙ্‌রী-র বড় মাঠ এল। এখানে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি সরাইখানা আছে। নদীর ধারে ঘাসও খুব। যেখানে সেখানে কিছু পুরনো স্তূপ ছিল। আমরা মাঠের শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা ঝর্ণা ছিল। আকাশে চারপাশ থেকে ঘিরে এসেছিল মেঘ। এখানেই চারটের সময় আমাদের লোকেরা থাকার জায়গা করল। এখন ফোলকণ্ডাডা-র জোত এখান থেকে ছিল ১২ মাইল। এখানে থাকার আরও একটা কারণ ছিল—কিছুটা দূরেই বুনো ছোলা আর গম খুব হয়েছিল। বুনো শুনে আশ্চর্য হবার প্রয়োজন নেই, কেননা আগে সমস্ত আনাজ জঙ্গলেই উৎপন্ন হত, মানুষ তাদের খেতে বুনতে শুরু করে এবং বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের থেকে আরো ভালো বীজ তৈরি করে। গমের দানা তো আমি পাইনি কিন্তু ছোলার দানা—যা সাধারণ ছোলার দানার চেয়েও ছোট ছিল, আমি পাটনা মিউজিয়ামের জন্যে নিয়ে নিলাম।

রাতেই বরফপড়া শুরু হয়ে গেল। আজ ২৫ সেপ্টেম্বর দুপুর পর্যন্ত বরফ আর বৃষ্টি পড়তে থাকল। দুপুরের দিকে আকাশ পরিষ্কার হল, কিন্তু লোকেরা এখনও যাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করছিল। বুনো গম ও ছোলা খাইয়ে খচ্চরগুলোকে মোটাসোটা করার কথা ভাবছিল। আমি বললাম, 'চারদিন পর্যন্ত এই রকমই আবহাওয়া থাকবে। যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে চল।' ওদের ছোলা-গমের লোভ ছিল, আর আমার ছিল তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়ার। যাই হোক, সেদিনের ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হল, চতুর্থদিন যাওয়ার পরই আকাশ থেকে মেঘ কাটল। সেদিন তারা একপাও নড়ল না। এই এলাকায় বুনো গম আর ছোলাই নয়, উপরন্তু ভেড়া-ছাগলও থাকে। জীববিজ্ঞানী ও কৃষিবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের পক্ষে এটা ভালো জায়গা। এই আনাজগুলোর ঘাসের গুণ পশুপালক খুব বোঝে। গরমের দিনে তারা পেরিয়ে যেতে যেতে হাজার হাজার ভেড়াকে চরানোর জন্য এদিকে নিয়ে আসে।

লাহুলে—পরের দিনও (২৬ সেপ্টেম্বর) মেঘ কাটেনি। লোকেরা ঘাবড়াতে লাগল, আর সাড়ে এগারোটার সময় ওখান থেকে রওনা হল। ৫ মাইল পর কেলু (কেনলুঙ্গ)-এর সরাইখানা ছিল। এখানে আমিও বুনো ছোলা হয়েছে দেখলাম। রাস্তা দারুণ খারাপ, বিশেষ করে অজস্র ছোট বড় পাথর এবড়ো-খেবড়ো হয়ে পড়ে থাকার কারণে। ডাঁড়া থেকে দু-তিন মাইল আগে ইউনন্-ছো হ্রদ দেখা গেল। এর বিস্তৃতি এক মাইল থেকে বেশি নয়, আর এই সময় জলও খুব কম ছিল। ১০৪-তম মাইলের পাথর থেকে আমরা বরফের ওপর দিয়ে চলতে লাগলাম, আর ১০২-তম পাথর পর্যন্ত সেটা বরাবর সেরকমই ছড়িয়ে ছিল, তারপরে কিছু কম হল। ১০৩—১০৪-তম মাইলের পাথরের মধ্যে বড়লাচা জোত এল। ওখানে খুব বরফ পড়ছিল। কয়েকজন ঘোড়ায়, কয়েকজন

হেঁটে আমরা একসারিতে চলছিলাম। খচ্চরদের গলার ঘণ্টার আওয়াজে মনে হচ্ছিল যেন বরযাত্রীর দল চলেছে আর ওপর থেকে খই ছড়ানো হচ্ছে। আমরা চারটের সময় ওখানে পৌঁছলাম। মনে হচ্ছিল যেন বরফের চাষ করা হয়েছে। দু-মাইল নিচে নামার পর সূরজদল হ্রদ পেলাম। আকারে ছোট হলেও খুব গভীর। আমরা একটুখানি এগোতেই লোকেরা অত্যন্ত সন্ত্রস্তের মত দৌড়তে লাগল। এটা খুব বিপজ্জনক জায়গা। পাশের পাহাড় থেকে সবসময় ছোটবড় পাথর পড়তে থাকে। আমি যদি ফা-হিয়েন বা হিউ-য়েন সাঙ-এর সময়ে যাত্রা করতাম, তাহলে লিখতাম—এই পাহাড়ের ওপরে এক বিরাট দৈত্য থাকে, সে সব সময় পাথর বর্ষাতে থাকে, আর কত মানুষ ও বেচারি পশু যে প্রাণে মারা যায়। আমার সামনেও দু-চারটে ছোট ছোট পাথর পড়ল। আগেকার পড়া পাথরগুলোও সেখানে ছিল। আমার ঘোড়াওলা সুক্‌খু বলছিল যে, গতবছর পাথরের ধাক্কায় তাদের চায়ের গাঁট পড়ে গিয়েছিল আর পেছনে আসা খচ্চরীটার তো পা ভেঙে গিয়েছিল। এক নাগাড়ে বরফ পড়ছিল। এই পাহাড় থেকে ক্রমাগত পাথর পড়ার কারণ হল—মাটির নামগন্ধ নেই, লাখ লাখ বছরের পাথর ভেঙে অসংখ্য ছোটবড় পাথর জমে রয়েছে। বরফ গলাতে সেগুলো সরে সরে একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা লাগে আর নিচে পড়তে থাকে।

উৎরাই কষ্টদায়ক ছিল না, কোথাও কোথাও পা পিছলে যাচ্ছিল। আমি আমার ঘোড়াকে এগিয়ে দিলাম। ৯৮-৯৭-তম মাইলের পাথরের মাঝখানে জীজীঙ্‌রড়-এর সরাইখানা পেলাম। লোকেরা পরসের (দো-সম্)-তে আজ থাকার জন্য বলেছিল। আমি সেখানের সরাইখানাতে পৌঁছলাম। সরাইখানাটি ভীষণ নোংরা ছিল। একফুট নাদি-গোবরে ভরা। একঘণ্টা অপেক্ষা করলাম, তাদের ডাকবাংলোর পাশের সরাইখানাতে থাকার কথা ছিল, আমিও সেখানে চলে গেলাম। শ্রাবণ মাসে এখানে খুব বড় মেলা হয়, যাতে জাঁস্‌কর, লাদাখ, তিব্বত, স্পিতি, লাহুলের হাজার হাজার লোক আসে, উল, নুন, ভেড়া, ছাগল তথা সমতলের জিনিসের কেনা-বেচা চলে।

পরের দিন ২৭ সেপ্টেম্বর সাড়ে নটার সময়ই ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম। ৯৩ থেকে ৯৭ মাইল পর্যন্ত উৎরাইয়ের পথ ছিল আর কোথাও কোথাও সেটা ছিল খুব কঠিন। পাহাড়ের ওপর এই স্থানে বাঁশ-এর মতো ঘাস ছিল। নদীর ওপারে ভূর্জপত্রের গাছ দেখা যাচ্ছিল। এখন আমরা ভাগা নদীর ধার দিয়ে চলেছি। ৯১ মাইলের কাছে প্রথম দেবদারু দেখতে পেলাম। লাদাখের বৃক্ষ-বনস্পতিশূন্য নগ্ন পাহাড় সাড়ে তিন মাস ধরে দেখে দেখে সবুজের জন্য চোখ তৃষিত হয়ে উঠেছিল। ৮৬ মাইলের পর প্রথম ঘর দেখতে পেলাম। এই ঘরও লাদাখীদের মতই। এই এলাকাকে দারচা বলে। সমস্ত লাহুল প্রদেশের জনসংখ্যা ১০, ১২ হাজারের বেশি নয়, কিন্তু এখানে আধ ডজন ভাষা বলা হয়ে থাকে, আর পোশাকেও একজনের সঙ্গে অন্যজনের তফাৎ আছে। দারচার মহিলারা লাদাখী মহিলাদের মতই ফিরোজাখচিত নাগফণিওলা আভূষণ ও কানে উলের হাতিকান পরে। হ্যাঁ, তার সঙ্গে সঙ্গে নাকে দু-আনা মতো নাকছাবিও পরে। যা বলে দেয় যে আমরা ভারতের কাছে পৌঁছে যাচ্ছি। সামনে তিন নদীর সম্মিলিত ধারার দেখা পেলাম। আমরা

তার ডানদিক দিয়ে চলতে লাগলাম। এখন অনেক দেবদারু গাছ দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার নিচে অনেক দূর পর্যন্ত ছোট বড় পাথর পড়েছিল। সত্যি দেখে মনে হচ্ছিল হাজার বছর ধরে শত শত দৈত্যেরা মিলে যেন পাথর ভেঙে এখানে ফেলেছে। পরে ঠাকুর খুশহালচন্দ এই জায়গাটির ইতিহাস বললেন। এখানে একশো আট ঘরের খুব ভালো একটি গ্রাম ছিল। একদিন এখানকার লোকেরা নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল। সবাই বসে পড়ল, সেই সময় তিব্বতের দিক থেকে এক বুড়ো এল। পংক্তিতে সে যেখানেই বসতে চাইছিল, লোকে 'সরে যাও', 'সরে যাও' বলে উঠছিল। তখন একটি ছেলে তার নিজের জায়গা বুড়োকে ছেড়ে দেয়। লোকগুলো খাবার খেল, মদ পান করল আর নাচতে লাগল সেই সময় পাথরের বৃষ্টি হতে থাকে। বুড়ো ততক্ষণে উধাও। সমস্ত গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। ছেলেটিকে হাওয়া উড়িয়ে নদীর ওপারে নিয়ে যায়, আর তার সন্তানেরা এখনও ওখানে লুমপাচন গ্রামে বসবাস করে। সেখানে এক ভয়ংকর ভূত থাকে। ঠাকুর খুশহালচন্দ বলছিলেন যে দিনের বেলাতেও নাকি ওদিক দিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। আমি তো ভাবছিলাম একা এসে বড় ভুল করেছি। ঠাকুর খুশহালচন্দ এও জানালেন যে দু-তিন বছর আগে হেমিসের লামা নাকি মন্ত্রদ্বারা তাঁকে আটক বশীভূত করে রেখেছেন, তখন আমি খুব নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু একথা মনে হয় সত্যি যে ওখানে আগে কোনো গ্রাম ছিল। ১৯৩৭ সালে যখন আমি দ্বিতীয়বার লাহুল যাই তখন রাস্তার ধারে পাথর সরিয়ে দেখি সেখানে কালি দিয়ে ভূর্জপত্রের ওপর লেখা কিছু মন্ত্র। হতে পারে কখনও কোনোদিন এই পাথর সরানোর জন্য খুব পরিশ্রম করা হবে আর তখন ওই ধ্বস্ত গ্রাম থেকে ঐতিহাসিক জিনিস পাওয়া যাবে। সামনে পাহাড়ের ওপর দেবদারু ক্রমশ বাড়তেই লাগল, দু-তিনটে গ্রাম পেরিয়ে আমরা কোলঙ পৌঁছলাম। এটা কুলু থেকে ৭৯ মাইল দূবে। তখন আড়াইটে বাজে, আমরা গ্যমুর্-এর ঠাকুর মঙ্গলচন্দের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। মিঃ শাটলওয়ার্থ তাঁর লম্বা চিঠিতে লাহুল-স্পিতি আর জাঁস্‌কর-এর পুরনো মূর্তি ও গুম্বাগুলোর বিষয়ে লিখেছিলেন আর এটাও বলেছিলেন যে ঠাকুর মঙ্গলচন্দের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবেন, তিনি আপনাকে বহু পুরনো জিনিসের সন্ধান দেবেন। আমি ঠাকুর সাহেবের বাড়ি গেলাম। ভেতরে অন্ধকার ছিল, আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠাকুর-গিন্নি তখন মজুরদের খাওয়াচ্ছিলেন। খুশহালচন্দর কুলু হাইস্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়তেন, তিনিও সেখানে চুপচাপ বসেছিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি আমার কাছে এলেন। আমি ঠাকুর মঙ্গলচন্দেরর কথা জিজ্ঞেস করলাম ও শাটলওয়ার্থের চিঠি দেখালাম। তিনি আমাকে সবার উপরের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটি পরিষ্কার, খুব হাওয়া ছিল। ঠাকুর খুশহালচন্দ জানালেন যে, ঠাকুর সাহেব কোলঙ গেছেন, আজই ফিরে আসবেন। রাতে শোয়ার জন্য খাট এল। খুশহালচন্দের স্ত্রী ও একজন চাকরানী আমার বিছানা করে দিচ্ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসিমস্করা করছিল। তারা শুদ্ধ তিব্বতী ভাষা বলছিল, আমার বুঝতে তো কোনো অসুবিধে ছিল না, কিন্তু আমি চুপচাপ শুনছিলাম। আমি সেই সময় অনুমান করতে পারিনি যে এদের মধ্যে সেই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ তরুণীই খুশহালচন্দের স্ত্রী। খুশহালচন্দকে সে তিন আঙুলে তুলে নিতে পারে। এ রকম অমিল ,

—১৯৩৩—

বিয়ে কেন? লাহুলে কোলঙ, খঙ্সর্ ও গুণদলগততে ঠাকুরদের তিনটে পরিবার আছে। তাঁরা কোনো সময় নিজের নিজের এলাকার সামন্ত রাজা ছিলেন। তাঁদের বিয়ে-সাদি তাঁদেরই মতো উচ্চবংশে হত। এখনও এই তিন পরিবারের মধ্যেই বিয়ে হয়, তাই ছেলে-মেয়েদের জুটি ক'রে দেওয়াটা তাদের হাতে নেই। অনেক রাতে ঠাকুর মঙ্গলচন্দ এলেন। তিনি এসে আমার সুবিধে অসুবিধের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন।

পরের দিন (২৮ সেপ্টেম্বর) ঠাকুর মঙ্গলচন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হতে থাকলো। তিনি জানালেন যে, কোলঙ্-এ তিব্বতসম্রাট স্রোঙ্-চন-এর বংশের কোনো সামন্ত শাসন করতো। ঐ সময়ে একটি মেয়ে সিংহাসনে ছিল। নিচের পাহাড় থেকে নীলা রাণা নামে এক রাজকুমার আসে। সে মেয়েটিকে বিয়ে করে। নীলা রাণা খুব অত্যাচার করতো। লোকেরা তার ওপরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। একদিন সে শিকার করে। শিকারটি খাদে পড়ে যায়। কেউ নামতে রাজি ছিল না। নীলা রাণা নিজেই নামে, কিন্তু দড়ির সাহায্য ছাড়া সে ওপরে উঠতে পারছিল না। তার চাকর-বাকরেরা নীলাকে ওখানেই ছেড়ে চলে আসে। কোলঙ্ ঠাকুরবংশ ঐ মেয়েটিরই সন্তান—মায়ের দিক থেকে তিব্বতী এবং বাবার দিক থেকে পাহাড়ী রাজপুত। আমি খবর পেয়েছি, পাশের গুহাতে একটি খুব সুন্দর চিত্রপট আছে। গুহাটি ঠাকুর সাহেবের বাড়ি থেকে আধ মাইল চড়াইতে ছিল। তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। চিত্রপটটি রেশমের তৈরি এবং ভারী সুন্দর।

খাওয়া এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, দুটোর সময় আমি আমার ঘোড়ায় চড়ে কোলঙ্-এর উদ্দেশে রওনা হলাম। দশ মাইলের পথ, তবে আমার কোনো তাড়া ছিল না। তিনঘন্টা চলার পর কোলঙ্ (১০১০০ ফিট) পৌঁছলাম। ঘোড়াওলা গতকালই এখানে পৌঁছে গিয়েছিল। কোলঙ্ লাহুলের শাসনকেন্দ্র। লহ্-য়ুল্ (দেবভূমি) থেকে অপভ্রংশ হয়ে লাহুল কথার উৎপত্তি। কিন্তু এখানের লোকেরা নিজের প্রদেশকে হ্-শ বা গর্‌জা বলে। লোকজন তিব্বতী বৌদ্ধধর্মকে মানে এবং সাধারণত দুটো করে নাম রাখে। যেমন ঠাকুর মঙ্গলচন্দের তিব্বতী নাম টশী-দাবা আর তাঁর ছেলে খুশহালচন্দের নাম কল্‌জঙ্-দাবা। যখন পাঞ্জাবে শিখদের রাজত্ব ছিল, তখন লাহুল মহারাজ রণজিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু যখনই ইংরেজরা কুলু পর্যন্ত পৌঁছয় তখনই লাহুলের ঠাকুরেরা ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার কারে তাদের উপঢৌকন পাঠায়। ইংরেজরা লাহুলে কখনই অস্ত্র আইন প্রয়োগ করেনি। আজও সেখানে বন্দুকের জন্য লাইসেন্স লাগে না। সম্ভবত ভারতবর্ষে কুর্গ এবং লাহুল দুটো জায়গাই আছে, যেখানে অস্ত্র আইন চালু নেই। কোলঙ্-এ তহসীলদারের ভাই ডা: পৃথ্বীচন্দের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি ঠাকুর মঙ্গলচন্দের বড় ভাই-এর ছেলে। শুরু থেকেই লাহুলের তহসীলদারি কোলঙ্-এর ঠাকুর পরিবারের হাতে চলে আসে। পৃথ্বীচন্দ এফ· এস· সি-তে ফেল করেছিল। এখন তিনি সেনাবাহিনীতে অফিসার হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন।

পরদিন (২৯ সেপ্টে ..) ঠাকুর পৃথ্বীচন্দের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে গুঙরঙ গেলাম।

লাদাখ (স্তোক্)-এর রানী এই বংশের। এখানকার গুম্বাতে সহস্রবাহু অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি আছে। সেই সময় ওখানে সে-রা গুম্বার একজন প্রতারক ঢাবা অবস্থান করছিলেন। গুম্বার দেয়ালগুলোতে ছবি আঁকা রয়েছে আর লতাপাতার সঙ্গে আছে কিছু মূর্তি, যার কয়েকটা ভাঙা। এই মূর্তিগুলো বেশ পুরনো।

ভীষণ উৎরাই ধরে নেমে আমরা ভাগা-র তীরে এলাম এবং পুল পেরিয়ে জো-লিঙ্ গেলাম। এখানে এক মন্দিরে বুদ্ধ ও অন্য দেবতাদের কাষ্ঠমূর্তি আছে। মন্দিরটিকে মেরামত করার চিন্তা কারুর নেই। বর্ষার জলে মূর্তিগুলোর ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। আমরা কোলঙ্ ফিরে এলাম। অনেকদিন ধরে এখানে মোরাবিয়ন মিশনের কাজ হচ্ছে। লোকজনকে খ্রীস্টান করার কাজে ওরা খুব কম সফলতা পেয়েছে। পাদ্রী অশ্‌বো খুব ভদ্রলোক। তিনি চান কোলঙ্‌বাসীরা সুশিক্ষিত হোক্ এবং সুখে থাকুক।

দুটোর সময় আমরা সামনের দিকে রওনা দিলাম। কাছের পুলটি ভেঙে গিয়েছিল, সেজন্য কঠিন চড়াই-উৎরাই-এর পর নিচের পুল দিয়ে আমাদের ভাগা পার হতে হলো। পরের গ্রামটি ছিল ফারদঙ্। এখানে বস্ত্র বুননকারী বুশহরিদের অনেক ঘর ছিল। পাহাড়ে খোদাই করা কিছু মূর্তিও ছিল। বাঁদিকে এক উঁচু পাহাড়ের ওপর গনধোলার গুম্বা, একে গুরুঘন্টালও বলা হয় এবং বলা হয় যে, এর সঙ্গে সিদ্ধবজ্রঘণ্টাপার সম্পর্ক আছে। এখানেই, নিচে, চন্দ্রা এবং ভাগা দুটো নদীর মিলন হচ্ছে, তারপর তারা চন্দ্রভাগা হয়ে চম্বা রাজ্যের দিকে যাচ্ছে। এখন আমাদের রাস্তা ছিল চন্দ্রার দক্ষিণতট দিয়ে। সামনে ৫৮ মাইলের মাথায় এসে আমরা গুন্দলায় পৌছলাম। গুন্দলার ঠাকুর ফতেহচন্দের সঙ্গে পৃথ্বীচন্দের বোনের বিয়ে হয় আবার ফতেহচন্দের বোনের সঙ্গে বিয়ে হয় খুশহালচন্দের। এখানকার ঠাকুরদের বাড়িগুলো বিচিত্র ধরনের। বেশির ভাগই কাঠের আর ছ-টি তলায় ভাগ করা—দূর থেকে দেখলে একটা বড় আলমারির মতো মনে হয়। যদিও এই সময় ঠাকুর ফতেহচন্দ কুলুর মেলায় গিয়েছিলেন, কিন্তু পৃথ্বীচন্দ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কোনো কষ্ট হয়নি। ত্রুমবা (ফাফড়)-এর আটার চীলা, মাখন আর টক দই-এর চাটনি খেতে খুব ভালো লাগল। তিনতলায় মন্দির। মূর্তিগুলোর মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুরেরও মূর্তি আছে, তাঁর পোশাক মোগল আমলের পাগড়ি আর চৌবন্দী। তিব্বতী ভাষাতে 'কর্মশতক'-এর একটি পুরনো খণ্ডিত হস্তলিখন দেখলাম। এখানে একটা স্থিতিস্থাপক খাঁড়া রাখা আছে। বলা হয় যে এটি তিব্বতে পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমে ভাঙা ছিল, পরে জুড়ে যায়। একটি মার্বেল পাথরের জৈনমূর্তিও আছে, যাকে বুদ্ধ বলে পুজো করা হয়। আরো কিছু তিব্বতী ভাষায় হাতে লেখা পুঁথিও আছে।

ঠাকুর পৃথ্বীচন্দের এখান থেকেই ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, আর আমার খোক্‌সর যাওয়ার ছিল। কিন্তু এর মধ্যে আরও কিছু পুরনো মূর্তির খোঁজ পেলাম, তাই ওখানেও যাবার ছিল। পরদিন (৩০ সেপ্টেম্বর) সাড়ে আটটার সময় রওনা দিলাম। পঞ্চান্ন মাইলের মাথায় সুক্‌খু ও তার সঙ্গী দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা ঘোড়াকে খেতে দিল। তারপর আমি সীসু গ্রামের দিকে এগোলাম। গ্রামটি রাস্তা থেকে সরে পাহাড়ের ওপরে ছিল। হয়তো কোনো এক সময় লাহুলের সব পাহাড় দেবদারু গাছে ঢাকা ছিল। কিন্তু

কয়েকশো বছর ধরে লোকেরা নির্মমভাবে গাছ কেটেছে। ফলে জঙ্গল এখন সামান্যই অবশিষ্ট। যখন থেকে কূটের ব্যবসা লাভজনক হয়ে উঠলো, তখন থেকে কূট চাষের জন্য আরো নতুন ক্ষেত করতে লোকজনের মধ্যে হিড়িক পড়ে গেল। কূট একটি অতি সুগন্ধী শিকড়। সে-সময় ৫ টাকা বট্টী (১০ বট্টী = ৩০ ছটাক) বিক্রি হতো। আগে কূট কেবল জাঁস্করের জঙ্গলে পাওয়া যেত। লাহুলের লোকেরা সেখানে কূট চুরি করতে যেত। পরে তারা এখানে লাগিয়ে দেখে এবং এখন তো পদ্ধতিগতভাবেই কূটের চাষ করে। কূট এখন আর শুধু কাশ্মীরীদের একচেটিয়া হয়ে নেই। সীসুর মূর্তিগুলো আমার অতো পুরনো বলে মনে হয়নি। ওখান থেকে আরও দুটো গ্রাম পেরিয়ে যাবার পর এক কবিরাজকে ঘাস কাটতে দেখলাম, যার কাছে কিছু মূর্তি আছে বলে শুনেছিলাম। পিতলের 'ললিতাসনা' মূর্তিটি সত্যিই সুন্দর। কথিত আছে, ওটা বেনারস থেকে উড়ে এসেছে। আরেকটি ছোট মূর্তি—মুকুটধারী ধর্মচক্র প্রবর্তন-মুদ্রাসন বুদ্ধের। এর পিঠে সংস্কৃতে কিছু লেখা আছে। অক্ষরগুলো দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়কার বলে মনে হয়। কবিরাজ আমাকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিতে এলো। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে, নেমে, চন্দ্রার পারে আসতে হয়। রাস্তার কষ্টের কথা কি বলবো? সূর্যাস্তের সময় খোক্সর পৌঁছলাম। আমাদের সঙ্গী আগে থেকেই ডাকবাংলোর পাশে আস্তানা করে ছিলেন।

কুলুতে—কুলু তখনও ৫৩ মাইল। পরদিন (১ অক্টোবর) আমি সকাল সাতটাতেই বেরিয়ে পড়লাম। ঘোড়াওলা এখন হুঁকো টানতে ব্যস্ত ছিল। কিছুদূর পর্যন্ত তো সাধারণ চড়াই ছিল, পরের তিন মাইল দারুণ চড়াই এলো। সামনে রটঙ্‌-জোতের প্রায় সমতল মাঠ পাওয়া গেল। উচ্চতম স্থান থেকে একটু এগোলেই ছিল ব্যাসকুণ্ড। ব্যাসনদীর শুরু এখান থেকেই। ব্রাহ্মণেরা এ-জায়গাটাকে ছোটখাটো তীর্থস্থান বানিয়েছে। আর একে ব্যাসমুনির স্থান বলে। ওরা জানেনা যে, ব্যাসনদীর নাম 'বিপাশ্'[১]। কুণ্ডর পাশেই এক ভগ্নমূর্তি রয়েছে। সামনে কেবল একটা জায়গায় সামান্য বরফ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানটা পিছলও ছিল। উৎরাইতে ঘোড়ায় চড়া আরোহী এবং পশু উভয়ের পক্ষেই কষ্টকর ব্যাপার। আমি লাগাম ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম লাগাম ছেড়ে দিই, ঘোড়াকে এমনি-এমনিই নিয়ে যাবো। কিন্তু সে নিচের দিকে যেতে লাগল। যাহোক, দৌড়ে গিয়ে কোনোভাবে ওকে ধরেছি। অনেকটা দূর যাবার পর আবার উৎরাই এলো। লোকজনেরা বলে দিয়েছিল যে, ওখানে সাপের আস্তানা, শত শত সাপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, লোকেরা সাপগুলোকে মিষ্টান্ন অর্পণ করে আর নাগদেবতাকে হাতজোড় করে। আমিও নাগদেবতাকে দর্শন করতে চাইছিলাম, কিন্তু তখন তাঁর দেখা নেই। নিচে একটা

---

[১] পুত্রশোকে বশিষ্ঠ নিজের শরীর পাশবদ্ধ করে এই নদীগর্ভে নিমগ্ন হয়েছিলেন এবং নদী তাঁকে *বিপাশ্* (পাশমুক্ত) করেছিল। সেই থেকে পাঞ্জাবস্থ *(Beas)* নদীকে বলা হয় *বিপাশ্* বা *বিপাশা*।—স·ম·

পুল দেখা গেল। এখন ভালো জায়গা এসে পড়েছিল, তাই ঘোড়ায় চড়লাম। তার গতি বাড়িয়ে দিলাম। কয়েকবার ব্যাস নদী পারাপার করতে হলো। রালার ডাকবাংলো থেকেই রাস্তা ভাল পাওয়া গিয়েছিল। রাস্তাতেই এক জায়গায় লাদাখের আপেল আর পরোটা খেয়ে নিই। দুটোয় মানালি পৌঁছে গেলাম। এটা খুব সুন্দর একটা বাজার। পাঞ্জাবী দোকানদারেরা বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করেন। পাশে একটি সুন্দর দেবদারু বীথি। গাছগুলো বনবিভাগের লাগানো। আপেলের বাগানও এখান থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। মোটর কুলু যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কুলু এখান থেকে ২৩ মাইল। তার মানে আজ আমি ৩০ মাইল ঘোড়ায় এসেছি। মনে প্রশ্ন ছিল, আমি কি সুক্‌খুর জন্য এখানে অপেক্ষা করব না এগিয়ে যাব? দোকানদার মীরুর সঙ্গে সুক্‌খুর চেনা-শোনা ছিল। আমি ঘোড়ার খাবারের জন্য চার আনা দিয়ে দিলাম আর বলে দিলাম যে, এটা সুক্‌খুকে দিয়ে দেবে। সোয়া দু-টাকা দিয়ে মোটরে বসলাম। কুলু পর্যন্ত রাস্তা যথেষ্ট চওড়া নয়। তাই একটা সময়ে একদিক থেকেই লরি আসে এবং মানালি তথা কুলু দু-দিকেরই মোটরগুলো দেয়ালঘেরা বাজারে এসে ঢোকে। এখানে দু-দিকেই সবুজ গাছে ছাওয়া পাহাড়। রাস্তার পাশে বাগানে লাল লাল আপেল ঝুলছিল। সন্ধেয় আমি কুলু পৌঁছে গেলাম। লালা থেব্বড়মলের ছেলে রুলিয়ারাম লাদাখেই তাঁর ঠিকানা বলে দিয়েছিলেন, তাই আমি তাঁর বাড়িতে পৌঁছেছিলাম। লালা থেব্বড়মলকে দেখে মনে হচ্ছিল অত্যন্ত গরিব একজন, কিন্তু তিনি যথেষ্ট টাকা কামিয়েছেন। কুলুতে তাঁর পাঁচ-ছটি দোকান আছে। এক ছেলে লাদাখের বড় ব্যবসায়ী, অন্যটি ইয়ারকন্দ (চীনা-তুর্কিস্তান)-এ কাজ করে। লালা থেব্বড়মল নিছক ব্যবসায়ীই নন, তাঁর বাড়িটির ইঞ্জিনিয়ারও তিনি নিজেই। তবে মানুষ সাবধানী না হলে দিনের ভেতরে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো অঙ্গ ভেঙে পড়বে।

এখন কুলুতে দশেরার মেলা চলছিল। আমিও পরের দিন (২ অক্টোবর) মেলা দেখতে গেলাম। সবরকমের জিনিস বিক্রি তো হচ্ছিলই, কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো পাহাড়ের ৩৬৫টি দেবতার একত্রিত হওয়া। সংখ্যাটি আমি অবশ্য সঠিক বুঝতে পারছিলাম না, তবে দেবতারা এসেছিলেন খুব সাজগোজ করে। ছোট-ছোট পালকি ছিল, যার মধ্যে কাপড় জড়িয়ে সব দেবতা রাখা ছিল। সম্ভবত কাপড় ও রুপোর পাত্রের উপর বেঢপ সব ছবি আঁকা ছিল। নিজের নিজের দেবতাকে লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রেখেছিল। নারী-পুরুষ সব মদ্যপান করে খুব উৎফুল্ল ছিল, জায়গায়-জায়গায় নাচ হচ্ছিল। মহিলাদের প্রত্যেকের নাকেই দু-আনা পরিমাণ গোল লবঙ্গ অবশ্যই ছিল। কেউ কেউ তো আবার নাকে তিনটি ছিদ্র করিয়েছিল। তিব্বতের নারীরা এখনও এটা বোঝেনি যে, ঘ্রাণ নেওয়া ছাড়া নাকের আরো কোনো ব্যবহার থাকতে পারে। অন্য একটি গয়না ছিল টিকলি। পোশাক—পায়জামা, জামা ও মাথায় রুমাল। কেউ কেউ জামার ওপর জ্যাকেটও পরেছিল। এখানকার নারী-পুরুষ উভয়েরই ধূমপানের শখ আছে। কুলুতে একজন রাজাও থাকে কিন্তু এখন সে কেবল জায়গীরদারই ছিল। তার প্রাসাদ আছে সুলতানপুরে। টালপুর বা সুলতানপুরের চাইতে অখাড়া বাজারে বড় বড় দোকান বেশি আছে। পরদিন (৩ অক্টোবর) রাবণকে জ্বালানো হলো। দেবতাদের পাঁচটি

মাছ, মুর্গি, ভেড়া, মোষ, এবং শুয়োর—এই পাঁচটি প্রাণী বলি দেওয়া হলো। কুলু কেবল আপেলের জন্যই প্রসিদ্ধ নয়, সেই সঙ্গে এখানে পাহাড়ের ওপর একটা বড় বাজার আছে। তিব্বতী উল এখানে আসে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চীনা-তুর্কিস্তানের চরস বয়ে বয়ে নিয়ে আসছিল। এখান থেকেই এগুলো ভারতবর্ষের সর্বত্র চালান যায়।

৪ অক্টোবর মেলার দিকে গেলাম, শুনলাম, ঘোড়াওলা গতকালই পৌঁছে গেছে। জিনিস অনেক ছিল, সবগুলো নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা অসুবিধের ব্যাপার হবে ভেবে ওখান থেকেই রেলের এজেন্সিকে দিয়ে পাটনার জন্য বুক করে দিলাম। লালা থেব্বড়মল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কৃপণ ছিলেন না। তাঁর ওখানে মাংস রান্না হতো আর কুলুর ধীবররা (কাহার) ব্যাস নদীর মাছ রান্না করে বিক্রি করতো। খুব সুস্বাদু।

৫ অক্টোবর সকালে উঠেই হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেলাম। মোটর সাড়ে ছ'টায় এসে মেলার মাঠে প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছিল। আবার আটটার সময় ডাক নিয়ে ওখান থেকে রওনা হলো। পথে ভেড়ার পাল পাওয়া যাচ্ছিল এবং ওদের সরাতে সময় লাগছিল। এখন আমার গরম লাগছিল। এগারোটায় বাজারে পৌঁছলাম, এখানেই দু'পুরের খাবার খেলাম। বারোটায় আবার গাড়ি চলতে শুরু করে। একটু পরেই ব্যাস-এর পুল পার হতে হলো। পুলরক্ষী এক পয়সা মাশুল নিল। কিছুটা দূর যাবার পর আমাদের পাহাড়ের ওপর উঠতে হলো। এক জায়গায় আরো ছ-আনা স্থানীয় কর দিতে হল। চারটায় আমরা যোগেন্দ্রনগর পৌঁছই। আর্যসমাজেই আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারত, কারণ সনাতন ধর্মমন্দিরের লোকেরা সম্ভবত আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ধরনে সন্তুষ্ট হতো না।

৬ অক্টোবর নয়টায় আমাদের গাড়ি রওনা দিল। বৈজনাথ মন্দির আসতেই খুব গরম লাগতে লাগল। আমি ভেবেছিলাম অক্টোবরে গরম শেষ হয়ে যাবে। গাড়িতে ভিড় ছিল না। 'জ্বালামুখী-রোড' স্টেশন পেরিয়ে এলাম, দেবীকে দর্শন করতে পারলাম না, তাই দুঃখ রয়ে গেল। এক ভদ্রলোক জ্ঞানযোগ, কর্মযোগের বিষয়ে কথা বলছিলেন। পরে তিনি যখন জানলেন যে আমি নাস্তিক, তখন একটু আশ্চর্য হলেন। 'বিকেল পাঁচটায় পাঠানকোট পৌঁছলাম। ছোট লাইনের এখানেই শেষ। বড় লাইনের গাড়ি ছয়টায় ছাড়লো। অমৃতসরে গাড়ি পাল্টানোর দরকার হলো না। সাড়ে দশটায় লাহোর পৌঁছলাম।

লাহোরে (৭-১১ অক্টোবর ১৯৩৩)—লাহোরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক পুরনো। কিন্তু মানুষ যখন পুরনো সম্পর্কের জায়গাগুলোতে অনেক বছর বাদে যায়, তখন বহু পরিচিত মুখ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে শুনে, মনে একটা সূক্ষ্ম ধড়ফড়ানি টের পায়। আনন্দের কথা যে, আমার এক পুরনো বন্ধু পণ্ডিত সন্তরাম এখানে রয়েছিলেন। ডঃ লক্ষ্মণস্বরূপ.তো কাল স্টেশনে আমাকে আনতে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ওখান থেকে আগেই চলে এসেছিলাম। তিনি কি আর ছাড়বার পাত্র ছিলেন, তাই তাঁর বাড়িতেই যেতে হয়েছিল। লাহোরে আমার একটা জরুরি কাজ করার ছিল। সেটা হলো,

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতী ভাষাকেও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত করানো। ডঃ বুলনর সে-সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান এবং বলেন যে, কাশ্মীর সরকারের শিক্ষাবিভাগ যদি সুপারিশ করে তবে আমার কাজ সহজ হয়ে যাবে। কাশ্মীরের শিক্ষাবিভাগের কাছ থেকে সুপারিশ পাওয়ার কোনো আশাই ছিল না এবং বিষয়টি যেমন ছিল তেমনই পড়ে রইলো।

যদিও অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবুও আমার ভীষণ গরম লাগছিল। ডঃ লক্ষ্মণস্বরূপ নিজের জীবন 'নিরুক্ত'[1]'র জন্য উৎসর্গ করেছেন। যখন আমি সর্বপ্রথম লাহোরে যাই, তখন তাঁকে তরুণ দেখেছিলাম। কিন্তু এখন তিনি শরীর এবং মন দুদিকেই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বোধহয় তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন বলে মনে করছেন। প্রফেসর শিল্‌ভা লেভির চিঠি নিয়ে কুমারী লাজবন্তী রামকৃষ্ণা কাশ্মীর গিয়েছিলেন, কিন্তু ততদিনে আমি লাদাখ চলে গেছি। ওখানে ডাকযোগে তাঁর চিঠি পাই। আমি লাহোরে এসে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। তাঁর চিঠির উত্তরে ডঃ সাহেব অতি নম্রভাবে লিখে দিয়েছিলেন যে, আমি তাঁর এখানেই উঠেছি এবং যদি ইচ্ছে হয় (If She Cares) তাহলে অমুক সময় দেখা করতে পারেন। 'ইচ্ছে হয়'-এর জন্য তিনি যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তার অর্থ দাঁড়ায় 'যদি গরজ থাকে'। এতে লাজবন্তীজী খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং আমাকেও ডাঃ সাহেবকে খুব কৈফিয়ত দিতে হয়। অভিধান খুলেও আমরা দেখতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তাঁর ছিল 'মেয়েলি জেদ'! লাজবন্তীজী মিষ্টি-মিষ্টি চা খাওয়ালেন। আমার ওপর তাঁর কোনো ক্ষোভ ছিল না, কিন্তু জানিনা ডঃ সাহেবকে তিনি ক্ষমা করেছেন কিনা। ডঃ সাহেব হোমিওপ্যাথির শিশিও রাখতেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'স্বেচ্ছায় তো আর ডাক্তার হইনি, আমাকে জোর করে ডাক্তার বানানো হয়েছে। পাহাড়ে যেতাম, লোকে ডাক্তার শুনে ওষুধ নিতে আসতো। এ ডাক্তার না অন্য ডাক্তার-এ নিয়ে কে মাথা ঘামায়? আমি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনিয়ে নিয়েছিলাম। আর যেই আসতো তাকেই ওষুধ দিয়ে দিতাম। সবাই ভালো করেই জানতো যে, হোমিওপ্যাথির বড়ি ক্ষতি করে না।'—'আর ভগবানের কৃপায় উপকারও হয়', আমি হাসতে হাসতে বলি।

লাহোরে কিছু বক্তৃতাও দিতে হলো। লাহোর আর এখন সেই ১৮ বছর আগের লাহোর ছিল না। যদিও উচ্ছেদের সময় যেখানে পৌঁছেছিল এখনও সেই জায়গায় সে পৌঁছয়নি। কিন্তু এখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইউরোপের আধখানি জেনেই ইউরোপে পৌঁছে গেছেন। মহিলারা প্যারিসের অপ্সরাদের লজ্জা দিচ্ছিল। লাহোরের জনসংখ্যাও খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। শিক্ষাই মানুষকে গ্রামের দিক থেকে শহরের দিকে ঠেলে দেয়। আর এখানে তো হিন্দুরা শহরে যেতে এক প্রকার বাধ্য হচ্ছিল। সে-সময় তারা লাহোরকে অলকাপুরী করে তুলছিল, কিন্তু তখন তারা কি আর জানতো, 'সব ঠাঠ পড়া রহ জায়েগা, যব লাদ্ চলেগা বনজারা।'[2]

---

[1] যাস্ককৃত নিঘণ্টুভাষ্যগ্রন্থ অথবা বেদাঙ্গবিশেষ।—স·ম·

—১৯৩৩—

১১ অক্টোবর আমার দুই বন্ধু পণ্ডিত সন্তরামজী এবং ভূমানন্দজীসহ স্বামী সত্যানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে অমৃতধারা গেলাম। তিনি আর্যসমাজের খুব বিখ্যাত প্রবীণ সন্ন্যাসী ছিলেন। জৈন সাধু থেকে তিনি আর্য-সমাজী হয়েছিলেন। তাঁর মধুর বক্তৃতা প্রসিদ্ধ ছিল। আমি 'মুশাফির বিদ্যালয়'-এর আমলে আগ্রায় তাঁকে দর্শন করেছিলাম। লাহোরে যখন আমি সর্বপ্রথম আসি, তখন তিনি আমায় সাহায্য করেছিলেন। সে-সময় আমার আর্যসমাজের প্রচারক হওয়ার ঝোঁক চেপেছিল। এখন আমি নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলাম। ঈশ্বরের প্রভাব আমি ২৪ ঘণ্টাই দেখতে পেতাম, আর ওদিকে স্বামী সত্যানন্দজী ভগবান দর্শন করে ফেলেছিলেন। অদ্ভুত বিরোধী-সমন্বয় ছিল। তাঁরও স্বভাব মধুর ছিল এবং আমিও কথা বলতে গিয়ে উত্তেজিত হতাম না। আমি আলোচনার সময় আমার নাস্তিকতা সম্বন্ধে স্পষ্ট করে বলছিলাম। তিনি চোখ বন্ধ করে কথা বলছিলেন, ঈশ্বর দর্শনের কথাও বলে যাচ্ছিলেন।

১১ অক্টোবর আমি লাহোব থেকে পুবদিকে চললাম।

শীতের সময়

এবার লাদাখে থাকাকালীন আমি 'মজ্‌ঝিমনিকায়' পালি থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করেছিলাম। ডিসেম্বরের মধ্যে ওটা ছাপানো দরকার ছিল, তাই প্রয়াগে থাকাও আবশ্যক ছিল। কেননা ওখানেই লা-জার্নাল প্রেসে বইটি দেবার কথা ছিল। কিন্তু তার মধ্যে এখানে-সেখানে বন্ধুদের ইচ্ছা পূরণ করাটাও ছিল জরুরি।

বেনারস-সারনাথ— আমাদের গাড়ি লাহোর থেকে ফৈজাবাদ হয়ে সোজা বেনারস পৌঁছয়। এখানকার বন্ধুরা সব বাইরে চলে গিয়েছিল। ১৩ অক্টোবর ভাই-সাহেব মৌলবী মহেশপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য নগবা গেলাম। তিনি এখন বড় পরিবারের কর্তা ছিলেন কিন্তু আর্যসমাজের ভাবনা এখনও তাঁর মনের মধ্যে কাজ করতো। ১৪ তারিখ সারনাথ গেলাম। অনাগরিক ধর্মপালের মৃত্যুর পর এখনও মহাবোধি সভার খরচের অধিকার সেক্রেটারি পান নি। তাই 'মজ্‌ঝিমনিকায়'-এর অনুবাদটি ছাপাবার ব্যাপারে নিশ্চয়তা ছিল না। বিসেসরগঞ্জে পুরনো বন্ধু বৈদ্যরাজ মুরারীলালজীর সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর বৈদ্য হওয়ার পিছনে আমারও কিছুটা হাত ছিল। আমিই তাঁকে আর্যসমাজের উপদেশ ছেড়ে বৈদ্য হতে বলি। কিন্তু তাঁর বৈদ্যগিরি তেমন চলছিল না। আর হ্যাঁ, বেদান্ত অসুখ এখনও তাঁর পিছন ছাড়ছিল না।

পাটনা—১৪ তারিখেই আমি পাটনা পৌঁছে গেলাম। রাত তিনটেয় আর কাজের

---

[২] এই লোক-কথাটির আক্ষরিক অর্থ, 'সব ঠাট-বাট এখানেই পড়ে থাকবে, যখন তুলে নিয়ে যাবে যাযাবার'।—স ম

লোকদের কে কষ্ট দেয়? আমি জয়সওয়ালজীর বাড়ির বারান্দায় চেয়ারেই শুয়ে রইলাম। সকালে জয়সওয়ালজী আমাকে দেখলেন এবং দুজনে গঙ্গায় স্নান করতে গেলাম। গঙ্গায় স্নান করতে তিনি খুব পছন্দ করতেন আর বলতেন যে এতে কখনো সর্দি হয় না। গঙ্গাজল এখনও কর্দমাক্ত ছিল, সেজন্য স্নানে আমার আনন্দ হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, এ বছর অত্যধিক বর্ষণের জন্য লাদাখেই কেবল ঘরবাড়ি পড়ে যায়নি, এখানেও তো ভাল ভাল বাড়িতে জল চুঁইতে শুরু করেছিল।

'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' দেখার সময় তার কিছু অধ্যায় ঐতিহাসিক মূল্যের মনে হলো। আমি জয়সওয়ালজীর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলি। তিনি এবারের গ্রীষ্মে ওটাতে লেগে পড়লেন এবং এ-সম্বন্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ লেখাও লিখলেন। আমি যখন তাঁর পাণ্ডুলিপিটি পড়লাম, তখন মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'জয়সওয়ালজী জাদুকর।' কোথা থেকে যে এতো কথা বার করে নেন, সত্যই, তাঁর প্রতিভা অদ্বিতীয়। দুঃখ এখানেই যে, জীবনের বহুমূল্য সময়কে তিনি তাঁর যোগ্য কাজে লাগাতে পারেননি।

ছাপরায় আমার রাজনৈতিক সহকর্মী এখনও যখন-তখন দেখা করতো এবং কখনো-কখনো কর্মক্ষেত্রে আসার জন্য জোরও দিত। কিন্তু মনে হচ্ছে সত্যিকার রাজনীতির জন্য আমাকে গড়া হয়নি। ১৬ অক্টোবর আমার দিনলিপিতে লিখেওছিলাম—(১) 'অত্যন্ত আদর্শবাদ, পুরনো বন্ধুদের বিবাদে অনুশোচনার প্রাবল্য; (২) ইতিহাস-সন্ধানের আরো তীব্র রুচি'···। আমার রাজনৈতিক সহকর্মীরা যখন-যেমন তখন-তেমন হয়ে যেত—কখনো জাত-পাতের সাহায্যে কাজ হাসিল করতে চাইতো, আবার কখনো নিজের স্বার্থচিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়তো। আমি এ ব্যাপারে কতবার একলা হয়ে যেতাম। তাছাড়া লেখাপড়ার আকর্ষণ তো ছিলই। তবুও বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়মাবলীতে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না এবং সে-কারণেই কখনো-কখনো আমি নিজেকে বশে রাখতে পারতাম না। সে-সময় ছাপরায় কোনো এক নির্বাচনের ধুম চলছিল।

ভাগলপুর—ভাগলপুরে বিহার প্রাদেশিক হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন ছিল, যার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন জয়সওয়ালজী। ২০ অক্টোবর জয়সওয়ালজীর সঙ্গে ভাগলপুরে রওনা দিয়েছিলাম। ওই দিনই শ্রীবলদেব চৌবে (বর্তমান স্বামী সত্যানন্দ)-র চিঠি পেলাম। তিনি ফাইনাল পরীক্ষার তিন মাস আগে বি· এ· পড়া ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। তখন আমি তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি নিরস্ত হননি। এখন তিনি লোকসেবক সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন। আমি পরিবারের কথা বিবেচনা কর এরকমটা না করতে বলি, কিন্তু তিনি মানতে রাজি ছিলেন না। যাহোক্, ব্যক্তি বা পরিবার, যে-কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো না কোনো পথ বের করেই নেয়। আমি তো চৌবেজীদের পারিবারিক জীবনযাত্রার সমস্ত কৃতিত্ব ভগ্নী মহাদেবীজীকেই দেব। তিনি শিক্ষকতা করে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা সামলান। চৌবেজী তো গোড়া থেকেই গৃহবিমুখ ছিলেন। ভবঘুরে হওয়া সত্ত্বেও গৃহবিমুখতার চিন্তা আমার মনে কেন এলো,

এ-প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু আমার চিন্তা চৌবেজীর জন্য ছিল না।

ভাগলপুরে আমরা শ্রীদেবীপ্রসাদ ঢনঢনিয়ার ওখানে উঠলাম, ধরতে পারেন জয়সওয়ালজীর জন্যই, তা না হলে আমার ওখানে ওঠার দরকার ছিল না। ঢনঢনিয়াজীর বাড়ি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল, ঘরগুলোও বেশ সুসজ্জিত। অনেক শিল্পসম্বন্ধীয় বস্তুও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। আমি মন্তব্য লিখেছিলাম—'যাঁদের পরিশ্রমের বিনিময়ে এইসব বস্তু প্রস্তুত হয়, তাঁদের অবস্থা কেমন?' পরদিন (২১ অক্টোবর) আমি সুলতানগঞ্জ গেলাম। কেল্লাতে এক-আধটি মূর্তি নতুন দেখতে পেয়েছিলাম। নৌকা করে আমরা গঙ্গাতে অজগৈবীনাথ দেখতে গেলাম। যে পাথরটি নিয়ে এই দ্বীপ তাতে অনেক মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। জয়সওয়ালজীও একমত যে এগুলো গুপ্তযুগের। গুপ্তযুগ অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের কাল, তাহলে এই শিলাকে বিক্রমাদিত্যে-শিলা বলা যেতে পারে। তবুও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না যে, সুলতানগঞ্জে বিক্রমশিলা আছে। কারণ বিক্রমশিলার মতো মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখা যাচ্ছিল না।

সোয়া একটার সময় সাহিত্য সম্মেলন শুরু হলো। বনৈলীর কুমার রামানন্দ সিংকে প্রধান অতিথি করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর আসার সময় ছিল না। জয়সওয়ালজী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দিলেন। বিকেলে গৃহস্বামীর ভাইপো আমাদেরকে তাঁর সুন্দর বাগান দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে ৮০ বিঘা জমির ওপর একটা বাগান ছিল। একটা বড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাটির ঢিপির মতো সিমেন্টের কুটির ছিল। গৃহস্বামীর খুব ইচ্ছে ছিল আমি যেকোনো সময় এখানে এসে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করি। কিন্তু আমার পায়ে যে চাকা লাগানো!

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের সভায় প্রচলিত ধারার বদলে আদালতে রোমান লিপি প্রবর্তনের স্বপক্ষে বলতে চাইছিলাম। চারদিক থেকে প্রবল আপত্তি উঠল এবং বলা হলো যে, যেহেতু আমি সদস্য নই, কাজেই আমার বলার অধিকার নেই। কিন্তু জয়সওয়ালজীর কথাতে লোকেরা আমার কথা শুনতে রাজি হলো। সে-সময় সরকার ইংরেজের প্ররোচনায় উর্দু লিপিকেও বিহারের আদালতে ঢোকাতে চাইছিল। আমি বললাম যে, যদি রোমান লিপি গ্রহণ করা হয় তবে উর্দু থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, না হলে সবাইকে উর্দুও পড়তে হবে। আদালতের বাইরে আমাদের সব কাজকর্ম হিন্দি লিপিতে হওয়া উচিত।

ভাগলপুর যাওয়ার সুযোগে আরও একটা কাজ হলো। আমি আমার ভ্রমণ এবং ভ্রমণসম্বন্ধীয় লেখা লিখতে গিয়ে টের পেয়েছিলাম যে, ভবঘুরের কাছে ছবি তোলার ক্যামেরা থাকা খুবই দরকার। আমি লাদাখে একটা ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা তেমন ভালো মনে হয়নি। লাহোরে এক দোকানে রোলি ফ্লেক্স দেখেছিলাম। সেটা পুরনো মডেলের ছিল বলে ১৭০্ টাকায় পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু সে-সময় তো ঐ টাকাটাও আমার পক্ষে অনেকটাই ছিল। সুলতানগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'গঙ্গা'তে আমি বিনা পারিশ্রমিকে অনেক লেখা দিয়েছিলাম। এখন আমি বললাম, 'এরপরে তবেই লেখা পাওয়া যাবে, যদি ক্যামেরা পাওয়া যায়।' 'গঙ্গা'র লোকেরা

—১৯৩৩—

মণিঅর্ডার করে টাকা পাঠিয়ে দিল আর কিছুদিন পরে আমার কাছে ক্যামেরাটি চলে এলো। তখন থেকে ১১ বছর পর্যন্ত ঐ ক্যামেরা দেশে-বিদেশে আমার সঙ্গে ঘুরতে থাকে, আমি সেটা দিয়ে হাজার হাজার ফটো তুলি। ১৯৪৪ সালে আমার রাশিয়া যাবার সময় সেটা সঙ্গে নেবার অনুমতি না পাবার দরুন কোয়েটায় এক ভদ্রলোকের কাছে ক্যামেরাটি রেখে যাই এবং সেটা চিরদিনের জন্যে আমার কাছ ছাড়া হয়ে যায়।

প্রয়াগ—১ নভেম্বর আমি সারনাথে ছিলাম। 'মজ্‌ঝিমনিকায়' ছাপাবার খুব চিন্তা ছিল। মহাবোধি সভার সচিব দেবপ্রিয়জী যখন সেটা ছাপাবার দায়িত্ব নিলেন এবং লা-জার্নাল প্রেসের নামে একটা ৫০০টাকার চেকও দিয়ে দিলেন, তখন আমার ভীষণ আনন্দ হলো। আমি পরের দিনই প্রয়াগ পৌছাই। কিন্তু এখন ছাপার কাজের আগে আর এক অসুবিধে সামনে এলো। ভাগলপুর থেকেই পায়ের আঙুলে ব্যথা করছিল, সেটা দিন দিন বেড়েই চলছিল আর এক সময় তো মনে হচ্ছিল যে, অপারেশন করাতে হবে। ডাক্তার ধুয়ে দিচ্ছিলেন, ওষুধ দিচ্ছিলেন, কিন্তু কোনো লাভই হচ্ছিল না। রাতের ঘুম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি তো আঙুলটা বাদ দেবার জন্যও তৈরি ছিলাম। যদ্দূর মনে পড়ছে, এই পীড়া অনেক দিন ছিল। আমার মনে হচ্ছিল ফোঁড়া ভেতরে ভেতরে পাকছে। আঙুলটা কিন্তু ফোলাও ছিল না। অনেকদিন বাদে জানা গেল যে, রবারের জুতো পরার দরুন খোলা আঙুলে রবারের ঘষা লাগার কারণে এই ব্যথা হচ্ছিল। আমি জুতো খুলে ফেললাম, আর দু-একদিনেই পা একেবারে ঠিক হয়ে গেল।

৩ নভেম্বর লা-জার্নাল প্রেসকে বইটি দিলাম। পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রসাদ দর বললেন যে, বরোদা যাবার আগেই বইটি ছাপা হয়ে যাবে। পৌনে দুমাসে ৮০ ফর্মার বই ছাপা সহজ কাজ ছিলনা, তাছাড়া সে-সময় লা-জার্নাল প্রেসে এখনকার মতো মনোটাইপ মেশিনও ছিল না। হিসেব কষে জানা গেল ১৫০০ কপি বই-এর জন্য ২৭০০ টাকা খরচ হবে।

শ্রীবাঙ্‌মোলমকে আমি ইউরোপ যাবার সময় সিংহলে ছেড়ে এসেছিলাম। তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। একবার ক'মাস কনক-শান্তুরের স্বাস্থ্য আশ্রমে কাটিয়ে ফিরেও এসেছিলেন কিন্তু আবার পুরনো লক্ষণগুলো দেখা দিতে থাকে এবং তাঁকে ফিরে যেতে হয়। সিংহল থেকে ৮ নভেম্বর চিঠি পেলাম, যাতে বাঙ্‌মোলমের মৃত্যুসংবাদ ছিল। পরে এটাও জানতে পারি যে, বাঙ্‌মহাশয় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তিনি জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, ধীরে ধীরে কঙ্কাল হয়ে বেঁচে থাকতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই এভাবেই জীবন থেকে তিনি নিষ্কৃতি নিলেন। কিন্তু বন্ধুদের তো চিরকালের জন্য তাঁর স্মৃতি নিজেদের কাছে রাখতে হবে, যখন-তখন ওই আদর্শবাদী হৃদয় আর তাঁর সৌম্য মূর্তি স্মরণ করতে হবে। তবে হ্যাঁ, চিন্তা এক প্রজন্ম পর্যন্ত থাকবে। পরের প্রজন্ম জানবেই না যে চীনে এক আদর্শবাদী তরুণ ছিলেন যিনি বুদ্ধের বাণী প্রচারে নিজের জীবন নিবেদন করেছিলেন, এবং বুদ্ধের দেশ ও তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির জন্য ভারতের নিকটবর্তী সিংহলে এসেছিলেন। সেখানে কত সাধাসিধে আর শিশুসুলভ স্বভাব নিয়ে তিনি থাকতেন এবং শেষে, এভাবে

নিজের জীবন শেষ করেন।

সারনাথ—সারনাথের বার্ষিকউৎসব এলো। ৮ থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত আমাকে সেখানে থাকতে হলো। সারনাথ এখন লোকেদের কাছে আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠছিল। সে-বছর ৪০০-এর বেশি যাত্রী চাঁটগা থেকে এসেছিল। ১০ নভেম্বর বেনারসে আমি ভাষণ দিলাম, সেখানে একটি লোক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোথায় থাকো?' জবাব পেলাম, 'বেনারস।' আমি তখন বুঝতে পারিনি যে, সে আমার দ্বিতীয় সহোদর রামধারী। পরে যখন স্মৃতি জেগে উঠলো, তখন দুঃখ হলো। জানি না ও নিজের মনে কি ভাববে। কিন্তু পঁচিশ বছর পরেও স্মৃতি কি করে তরতাজা থাকতে পারে?

১১ নভেম্বর সারনাথে বৌদ্ধদের সভা ছিল। জাপানী প্রফেসর ব্যোদোও ওখানে বলেছিলেন, আর আমি তো সভাপতিই ছিলাম। বক্তাদের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলালও ছিলেন। তিনি বুদ্ধর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন। পেনাংগ (মিলায়া)-এর ভিক্ষু গুণরত্ন এখানে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, আমি সেটা দু-বছর বাদে পূরণ করতে পেরেছিলাম। সেই সময় শ্রীব্যোদোরও এখানে আতিথ্য নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

আমি বরোদার প্রাচ্য সম্মেলনে (Oriental Conference) হিন্দি বিভাগের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলাম। তার জন্য বক্তৃতা লেখার দরকার ছিল, কিন্তু আমার লিখতে ইচ্ছা করছিল না। অনিচ্ছার লেখা আমার কাছে খুব বোঝা মনে হয়। বস্তুত, সেটা বক্তৃতার আগের দিন বরোদায় গিয়ে শেষ করতে পেরেছিলাম।

আবার প্রয়াগে—আমি ভেবেছিলাম যে, সারনাথে থেকে প্রুফটা দেখে নেব, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলল, আঁকশি দিয়ে জল খাওয়ানো যায় না। তাই ১৯ নভেম্বর, প্রয়াগ চলে গেলাম। উদয়নারায়ণ তেওয়ারী (তিনি এখন ডাক্তার হননি) তখন দারাগঞ্জের একটি সরু গলির ভেতরে থাকতেন, ওখানেই ১৯ নভেম্বর থেকে এক মাসের জন্য আস্তানা নিলাম। প্রুফ দেখার কাজ খুব দ্রুতগতিতে চলছিল। কখনো-কখনো তো রাত আড়াইটে-তিনটে বেজে যেত। শেষে একদিন (১৭ ডিসেম্বব) প্রেসে গিয়ে ডেরা নিতে হলো। ওখানে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত প্রুফ দেখার কাজ চলল। ১৮ ডিসেম্বর 'মজ্ঝিমনিকায়' ছাপা শেষ হলো। আমার খুব ভাল লাগছিল।

প্রয়াগের সঙ্গে আমার এই প্রথম পবিচয় হচ্ছিল। তখন কি আমি জানতাম, প্রয়াগে ঘরবাড়ি না থাকা সত্ত্বেও প্রয়াগ আমার বাড়ির মতো হয়ে যাবে এবং ওখানে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুবান্ধব পাবো। ডঃ বদ্রীনাথপ্রসাদ ও ডঃ উদয়নারায়ণ তেওয়ারী তো প্রথম দিন থেকেই আমার বন্ধু হয়ে যান। এই সখ্য ধীরে ধীরে আরো বেশি আত্মীয়তাতে পরিণত হয়। ২৬ নভেম্বর মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম দেখার সময় পেলাম। দুবছর আগেই পণ্ডিত ব্রজমোহন ব্যাস সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিলেন, নিছক অন্তরের

তাগিদে। ওখানে ভারশিব-কালের মূর্তি আর অনেক লিপি সংগৃহীত ছিল। দুটি শিলালিপি মহারাজ ভদ্রমাঘের ছিল। ব্যাসজী অনেক ছবি এবং কয়েক হাজার হাতে লেখা গ্রন্থও সংগ্রহ করেছিলেন। ব্যাসজীর পুরনো জিনিস সংগ্রহের নেশা আছে। যতক্ষণ নেশা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষ অসাধারণ কাজ করতে পারে না। স্বল্প সম্বল বা সম্বলহীন মানুষও ঝোঁক থাকলে কি করতে পারে মিউজিয়মটি তার নিদর্শন। এক এক দশক করে শতাব্দী হবে, ততদিনে এই সংগ্রহশালাও এক বিরাট সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত হবে। তখন কেবল প্রয়াগেরই নয়, বাইরের ইতিহাসপ্রেমীরাও পণ্ডিত বজ্রমোহন ব্যাসের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। অনেকেই শখ করে পুরাতত্ত্বের সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন, অনেক মুদ্রা এবং মূর্তিও জড়ো করেছেন। ব্যবসার মনোবৃত্তি থেকে তাঁরা এসব করেননি, কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর সব জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। সব বিষয়েই পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হয় না, তাই দূরদর্শীর উচিত ব্যাসের পথ অনুসরণ করা। আর বস্তু সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যাসজী যে-যে রাস্তা নিয়েছিলেন, যেভাবে-যেভাবে ইতর লোকেদের পেটের ভেতর থেকে অমূল্য সামগ্রীকে বের করে এনেছেন, তা লিপিবদ্ধ করলে সেটা যে কেবল আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তাই না, সেই সঙ্গে তা আগামী দিনের সংগ্রহালয়ের পক্ষেও লাভের বস্তু হবে।

লাদাখে থাকাকালীন 'মজ্ঝিমনিকায়'[1] এর অনুবাদ ছাড়াও যে তিব্বতী প্রাইমার, তিব্বতী পাঠ্য বই এবং তিব্বতী ব্যাকরণ লিখেছিলাম, সেগুলো ছাপাবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু সে-সময় কেবল প্রাইমার ছাপাবার ব্যবস্থা হয়েছিল, ব্যাকরণ পরের বছর বের হয়। 'তিব্বতমেঁ বৌদ্ধধর্ম'[2]ও ওই সময়েই লেখা হয়েছিল। হিন্দুস্তানী অকাদেমির পত্রিকা একশো টাকা দিয়ে ওটা ছাপাবার দায়িত্ব নেয়। সেই শীতে চল্লিশ টাকা জয়সওয়ালজীর কাছ থেকে এবং চল্লিশ টাকা মহাবোধিসভা থেকেও পাওয়া গিয়েছিল। এই ছিল সম্বল, যার জোরে ঘুরে বেড়ানো যায় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও দাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়।

৪ ডিসেম্বর আমি যা কল্পনা করছিলাম সেটাই পরে 'ভোল্‌গাসে গঙ্গা'-র রূপে প্রকাশ পায়। আমার ইচ্ছে ছিল শিকারী জীবন থেকে শুরু করে ইংরেজি দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ঐতিহাসিক গল্প লিখে ফেলি। গল্প সংখ্যা দশটির বেশি হবে না এবং প্রত্যেকটি ৪০ পৃষ্ঠার বেশি হবে না। এই কল্পনা ৯ বছর পর[3] হাজারীবাগ জেলে কাগজে লিপিবদ্ধ হয়।

৯ ডিসেম্বর 'পুস্তকপ্রেমী চক্র'-এর লোকজনের চক্করে পড়ে গেলাম এবং তাঁদের বৈঠকে যেতে হলো। বৈঠক তেজবাহাদুর সপ্রুর বাড়িতে ছিল। সেখানে দু-জন হাইকোর্টের জজ, বাজপেয়ী ও নিয়ামতুল্লা এবং দুজন ইংরেজ ভদ্রলোক উপস্থিত

১· ১৯৩৩ সালে লিখিত এই গ্রন্থটি প্রকাশ কবেন মহাবোধি সভা—স·ম

২· ১৯৩৫ সালে লিখিত। কিতাব মহল (এলাহাবাদ) থেকে প্রকাশিত।—স·ম·

৩· ১৯৪৪ সালে লিখিত ভোল্‌গাসে গঙ্গা। এই গ্রন্থটি লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। প্রকাশক কিতাব মহল।—স·ম·

ছিলেন। আমি তিব্বতযাত্রার ওপর কিছু বললাম। সেখানকার লোকদের মধ্যে সপ্রুর মস্তিষ্ক একেবাবে বুড়োটে মনে হচ্ছিল। তিনি তখন ইউরোপ এবং আমেরিকা ঘুরে এসেছিলেন। খুব গুরুত্বের সঙ্গে বলশেভিকদের নিন্দা এবং হিটলারের প্রশস্তি করছিলেন। নিয়ামতুল্লার মস্তিষ্ক একটু বেশি সজীব মনে হচ্ছিল। দু-ঘণ্টা সেখানে দিতে হলো, যেটা তখন খুবই মূল্যবান ছিল। কিন্তু তাহলেও সমাজের ওপর-অংশকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল—যদিও তার অন্তর্দেশশূন্য ছিল, কিন্তু আমার পক্ষে এ অভিজ্ঞতা কাজেরই ছিল।

পাটনা থেকেই ভিক্ষু ধর্মকীর্তি আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। ধর্মকীর্তি ছিলেন বৈকাল হ্রদের কাছে বুরিয়ত মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী, আমার প্রথম তিব্বতযাত্রার সঙ্গী। তিনি দার্জিলিঙে এসেছিলেন আমার চিঠি পেয়ে। এখানে আসার পর তাঁর শরীর খারাপ হয়, তখন আমি তাঁকে বেনারসের রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে অপারেশন করবার জন্য রাখি। ১০ ডিসেম্বর তাঁর অপারেশন হয়। চতুর্থ দিনে খবর পেয়ে আমি ওখানে যাই। দেখলাম, তিনি ভালই আছেন। তাঁর ঘা পুরোপুরি না শুকোতেই জানুয়ারিতে ভূমিকম্প হয়। বাড়ি দুলতে দেখে ধর্মকীর্তি ওই অবস্থাতেও বেরিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

বরোদা যাত্রা

২০ ডিসেম্বর প্রয়াগ থেকে বরোদা যেতে হলো যদিও সভাপতির ভাষণ এখনও তৈরি ছিল না। তবে হ্যাঁ, আমি খুব খুশি ছিলাম—বিদ্বদজনের উপহারের জন্য ১২ কপি হিন্দি 'মজ্‌ঝিমনিকায়' সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। প্রয়াগ থেকে পণ্ডিত জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারও সঙ্গে যাচ্ছিলেন। রেলযাত্রার ব্যাপারে আমাদের দু-জনের চিন্তার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। আমি ট্রেন ছাড়ার আধঘণ্টা আগে পৌঁছবার পক্ষপাতি, অন্যদিকে বিদ্যালঙ্কারজী এক সেকেন্ড আগে পৌঁছনোকেও সময়ের ভীষণ অপব্যবহার মনে করেন। আমি তো ভাবলাম, উনি বোধহয় সঙ্গে যেতেই পারবেন না। কিন্তু গার্ড যখন পতাকা দেখাতে শুরু করেছে—এমন সময় তিনি হন্তদন্ত হয়ে কামরার ভেতরে এলেন।

ছিউকি-তে আমাদের গাড়ি পালটাতে হলো এবং সেখানে আমরা সেই গাড়িতে চড়লাম যে-গাড়িতে জয়সওয়ালজী যাচ্ছিলেন। আমাদের এক পুরো দঙ্গল ছিল, যার মধ্যে জয়সওয়ালজীর পরিবারের লোক ছাড়াও পাটনা মিউজিয়াম-এর কিউরেটর শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ, ফটোগ্রাফার এবং অন্যান্য সহকারীও ছিলেন। শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়ের সঙ্গে তো আমাকে সব থেকে বেশি সময় এবং বেশি দূর পর্যন্ত থাকতে হয়েছিল। আজও যখন আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত অথচ অমলিন-হাসিযুক্ত প্রতিভাশালী এই মানুষটির মুখ মনে পড়ে, তখন বলে উঠি, 'রায়মশাই, আপনি কেন এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন? আপনার ভেতরে যে রত্ন ছিল, তা না দেখিয়ে চলে যাওয়া কি উচিত হয়েছে?'

কটনীতে ডঃ হীরালাল দেখা করতে এলেন। বরোদায় তাঁর একটু পরে আসার কথা

ছিল। তাঁর বয়স যদিও ছিল ৬০ বছরের বেশি, কিন্তু শরীর সম্পূর্ণই সুস্থ ছিল। তখন কে জানত যে এত তাড়াতাড়ি এবং এমন একটা বড় কাজ হাতে নিয়ে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

অজন্তা-ইলোরা—২১ ডিসেম্বর ট্রেন জলগাঁও পৌঁছায়। ওখান থেকে ফরিদাবাদের জন্য মোটর-বাস করা হলো। তেরীগাঁও-ও সম্ভবত প্রাচীন নগরী। পাহুরে আমরা হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেলাম। আটটার কাছাকাছি ফরিদাবাদে অতিথিভবনে পৌঁছাই। জয়সওয়ালজীর পার্টি নিজামের অতিথি ছিল। সেখানে সরকারী ব্যবস্থা ছিল। খেতে খেতে বেলা ১২টা হয়ে গেল। এরপর আমরা লেনা (গুহা) দেখতে যাই এবং সাড়ে তিনঘণ্টা ধরে ঘুরতে থাকি। অধিকাংশ লেনা বাকাটক কালের। ওখানে বজ্রযানের কোনো চিত্র নেই। মহাযান বোধিসত্ত্বের মূর্তিও দু-এক জায়গায় দেখতে পেলাম। এটা প্রধানত হীনযানের বিহার ছিল। এক জায়গায় ভবচক্ক (ভবচক্র)-র ছবি দেখতে পেলাম কিন্তু যেহেতু সেটি অসম্পূর্ণ তাই বলা যায় না যে তিব্বতী ভবচক্রের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়। চৈত্য (স্তূপ)-এর বাড়িগুলো অনেক পুরনো। একটা চৈত্যকে কেটে বুদ্ধমূর্তি বানানো হয়েছিল, যা পরের দিকের কাজ ছিল। চিত্রগুলোর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ চরিত্রেব নাক উঁচু। ছবির সৌন্দর্যের বিষয়ে বলার প্রয়োজন আছে কি?

পরদিন আমরা ওখান থেকে ইলোরার দিকে রওনা দিই। পথে দেবগিরি (দৌলতাবাদ) পড়ে। কি করে এই দুর্জয় দুর্গের পতন হলো, কি করেই বা গুটি কয়েক মুসলমান দিল্লী থেকে এসে একে দখল করতে পারল? যার হিমাদ্রির মতো বিদ্বান মন্ত্রী আর ভাস্করাচার্যের মতো জ্যোতিষশাস্ত্রী ছিল, সেই দেবগিরিকে পবাভূত করার জন্যেই কি তাঁরা ছিলেন? দুর্গপাল হায়দরাবাদের সৈনিক ছিল। সে এবং তার সৈন্যরা সবাই মুসলমান ছিল। মুসলমান হওয়া খারাপ নয় কিন্তু নিজেব সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতির অভাব, নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে। দেবগিরির ওপর-নিচ দেখে আমরা ফিরে আসছিলাম। সিপাইদের সর্দারকে আমি জিজ্ঞেস কবলাম, 'তোমাদের এখানে শরিয়তের নিষেধ কি করে মানা হয়?' সে গর্বের সঙ্গে বলল, 'আমাদের ইসলামী আইন আছে।' আমি বললাম, 'তোমাদের ইসলামী বাদশার দুই পুত্রবধূ মুখ খোলা বেখে ঘোরাঘুরি করছে কেন?' সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলাম, 'সমস্ত জনসমষ্টি তাঁর সন্তান, সন্তানের সামনে পর্দার কি প্রয়োজন?'

পথে খুল্‌দাবাদ পড়ল। এখানে ঔরংজেবের কবর আছে। ঔরংজেবের প্রতি বিরক্ত হওয়ার কি দরকার? সমাজের পচন কোনো না কোনো দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়বেই, ব্যক্তি তো নিমিত্ত মাত্র।

সাড়ে এগারোটায় আমরা বেরুল পৌঁছই। এই বেরুলকেই ইংরেজরা ইলোরা বানিয়েছে। অহল্যাবাঈ এখানেই জন্মেছিলেন, এমন কি তিনি একবার 'কৈলাশে' পুজোও শুরু করিয়েছিলেন। ওই সময়েই কিছুটা এলোমেলোভাবে মেরামতের চেষ্টা হয়েছিল। এখনও ওই সময়ের কিছু রঙ এখানে-সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। পল্লবদের

মহাবলীপুরমের গুহাপ্রাসাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাষ্ট্রকূটের[১] শাসকরা 'কৈলাস' নির্মাণ করেছিল। পল্লব-কলা কেবল এখানেই নয়, সমুদ্রপার 'বরোবুদুর' (জাভা)-এর শিল্পীদেরও প্রেরণা জুগিয়েছিল, যার থেকে প্রেরণা পেয়ে কম্বুজরাজ অঙ্কোরথোম তৈরি করেছিলেন। বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ সব গুহাই আমরা দেখতে থাকি। বজ্রযানের এখানেও দেখা নেই। অবশ্য মহাযানের অমোঘপাশ অবলোকিতেশ্বর, প্রজ্ঞাপারমিতা আর তারার মূর্তি ছিল ঠিকই। এই গুহাগুলোর নির্মাণ-কাজ বাকাটকেরও[২] আগে শুরু হয়েছিল।

এরপর আমরা ২৩ ডিসেম্বর নাসিক এবং ২৪ ডিসেম্বর কার্লার গুহা দেখি। নাসিকের পাণ্ডবলেনী গুহা শক-সাতবাহন আমলের। এখানে অনেক শিলালিপি আছে। এখানেও কিছু স্তূপে পরবর্তীকালে বুদ্ধর মূর্তি খোদাই করা হয়েছে।

২৩ তারিখ আমরা লোনবড়া পৌঁছে গেলাম এবং শ্রীখোটের বাংলোতে উঠলাম। সিনেমা তারকা শ্রীদুর্গা খোটে ওখানে ছিলেন না, কিন্তু তাঁর বাড়ির বাচ্চা ছেলেটি ফর-ফর করে হিন্দি বলছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি হিন্দি কোত্থেকে শিখলে?' উত্তর পেলাম, 'সিনেমা থেকে, আবার কোত্থেকে?' সত্যি, সিনেমা অ-হিন্দি ভাষা-ভাষী অঞ্চলে যেভাবে হিন্দি প্রচার করেছে সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

পরদিন আমরা কার্লা এবং ভাজার গুহা দেখলাম। বড়দিনের ছুটি ছিল সেজন্য দর্শক সমাগম খুব ছিল। পাহাড় থেকে এক মাইলের কম চড়াই ছিল। আমি ঝর্ণা, সংঘারামেব বাড়ি, সিংহস্তম্ভ এবং চৈত্যগৃহ দেখি। চৈত্যগৃহের ভেতরে স্তম্ভের সারি আছে, যার ওপরে হাতির পিঠে বসা নারী পুরুষের সুন্দর মূর্তি বানানো আছে। অনেক অভিলেখ আছে যেগুলো ব্রাহ্মী ভাষাতে লেখা তাই আমার পক্ষে দুষ্পাঠ্য ছিল না। আমি ভেতরে ওই অভিলেখগুলো পড়ছিলাম এবং খ্রীস্টপূর্ব দুই শতাব্দীর বেশভূষাকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম। এদিকে বারান্দায় জয়সওয়ালজী রায়মশাইকে দিয়ে কিছু লেখাচ্ছিলেন। আমি বাইরে আসতেই তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'এই দেখুন, এই সময়ে বুদ্ধমূর্তি তৈরি হতো।' আমি বললাম, 'এটা হতে পারে না।' কিন্তু সত্যিসত্যি ওখানে বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। আমি ভাল করে দেখতেই বুঝতে পারলাম যেখানে বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ আছে, সেখানে আগে গাছ ছিল, যার উপর দিকটা এখনও দেখা যাচ্ছে। বুদ্ধমূর্তি ভিত্তির উপরি-তল খোদাই করে বানানো হয়েছে। আমি এ ব্যাপারটা বোঝালাম। জয়সওয়ালজী বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন, আমি বড ভুল করে ফেলেছিলাম।' রায়মশাইকে দিয়ে নোটবই-এর লাইনগুলো কাটিয়ে দেওয়া হলো।

কার্লা থেকে মড়বলী স্টেশনের ধার দিয়ে গিয়ে আধ মাইলের মাথায় ভাজা গ্রামে গেলাম। কিছুটা চড়াই ওঠার পর বৌদ্ধগুহা পাওয়া গেল। এখানকার গুহা কার্লা থেকেও

---

[১] আধুনিক রাঠোর-এর প্রাচীন নাম রাষ্ট্রকূট। —স ম

[২] সাতবাহন রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর প্রতিষ্ঠিত 'বাকাটক' রাজবংশ খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষমতাশালী হয়। এই রাজবংশের সঙ্গে গুপ্তদেব বৈবাহিক সম্পর্ক তথা ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং গুপ্তদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাকাটকেবও পতন হয়।—স ম

পুরনো। শেষ চৈত্যগুহার বারান্দায় সাতটি চৈত্য বানানো রয়েছে। এখানে সাতবাহন রাজা কৌশিকীপুত্রের সম্বন্ধে অভিলেখ আছে। এই উপত্যকার নাম নাড়ী মাংবড়। কোনো একসময় এখানে অনেক সমৃদ্ধ গ্রাম ও নগর হয়তো ছিল। ভাজার গুহাগুলোর ওপরে লৌহগড়ের পুরনো দুর্গ আছে, যার সঙ্গে শিবাজীর বীরত্বপূর্ণ ইতিহাসের বিশেষ সম্পর্ক আছে।

বোম্বাই—২৫ ডিসেম্বর আমরা বোম্বাই পৌঁছে গেলাম। সেখানে এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় পরিবারে উঠলাম। সারাটা দিন বোম্বাইয়ে থাকার ছিল। আমরা এলিফেন্টার গুহাপ্রাসাদ এবং সুন্দর মূর্তিও দেখলাম। ফাদার হেরাসও সান্তসাবিয়ে মহাবিদ্যালয় (সেন্টজেভিয়ার কলেজ)-তে তাঁদের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালা দেখালেন। ফাদার হেরাস দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তি, পণ্ডিত ব্রজমোহন ব্যাস এর মতন তো নন। কিন্তু ওঁরও সংগ্রহ খুব ভালো। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হত গৃহপত্নীটিকে। তিনি যদিও বিগত যৌবনা তবুও এখনো সাধ মেটেনি। যে বয়সে শাশুড়ীরা পুত্রবধূদের জন্য নিজেরা সাজগোজ করা ছেড়ে দেন, সেই বয়সেও তিনি এমন সাজতেন যে ত্রিপুর-সুন্দরী পুত্রবধূর লজ্জায় কান কাটা যেত। আমি তো মাত্র দশ-বারো ঘণ্টা ছিলাম, এরই মধ্যে না জানি কতবার তিনি শাড়ি পাল্টালেন। এটা অবশ্য ঠিক যে তাঁর এই কাজকে অরুচিকর মনে হচ্ছিল না, কারণ পাতাঝরার সময়েও চিরবিস্মৃত বসন্তের সুগন্ধ তাঁর মুখমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। তাছাড়া অতিথি সৎকারের জন্য তো তিনি সবসময় হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

বরোদা— ২৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের আগেই বরোদা হোটেলের কাছে অতিথিশালায় আমাদের পৌঁছে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর জয়সওয়ালজী অন্য গাড়িতে এলেন। রাজঅতিথিদের জন্য ছিল এই ভবন, আরাম এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা কি বলবো? ডঃ হীরালাল এবং ডঃ হীরানন্দও ঐদিনই এসেছিলেন এবং আমাদের সঙ্গেই ছিলেন।

বরোদাতে প্রাচ্য সম্মেলন ছাড়া আর যা দেখছিলাম, তার মধ্যে এক আর্যকন্যা মহাবিদ্যালয়ও ছিল। আমার বিহারের বন্ধু শ্রীশ্রুতবন্ধু শাস্ত্রী ওখানে অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়টি দেখালেন। হাফপ্যান্ট এবং জামা পরে ঘুরে বেড়ানো মেয়েদের খারাপ দেখাচ্ছিল না। ব্যায়ামেও ওদের খুব শখ ছিল, আবার সঙ্গীতের ন্যায় ললিতকলাও ওরা খুব ভুলতে চাইছিল না। আধুনিক এবং প্রাচীন দুই রীতিতেই পড়ানো হতো। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রাজরত্ন পণ্ডিত আত্মারাম অমৃতসরী খুব খুশি হয়ে দেখা করলেন। আর্যসমাজের প্রথম আবেগে আমি তাঁর বই পড়ে উপকৃত হয়েছিলাম, তাই ৬৮ বছরের ওই কর্মঠ পুরুষটির সঙ্গে দেখা হতে আমার খুবই আনন্দ হলো।

শ্রীদেবপ্রিয় মহাবোধিসভার প্রকাশনার কাজে মহারাজার সাহায্য নেওয়ার বিষয়ে বলেছিলেন। চাঁদা চাওয়ার ব্যাপারে আমি সবসময়েই কাঁচা, তার ওপর

রাজা-মহারাজাদের ছায়াও তো আমার তেতো লাগে। কিন্তু যখন মহারাজার তরফ থেকে দেখা করার বার্তা এলো, তখন আমি 'মজ্‌ঝিমনিকায়'-এর প্রকাশকের আগ্রহকে কি করে প্রত্যাখ্যান করি? তিনি ইন্দ্রভবনের মতো রাজপ্রাসাদের উপবনে রৌদ্র নিবারক ছাতা লাগানো চেয়ারে বসেছিলেন। এক-এক করে লোকেদের সামনে আনা হলো। আমিও পৌঁছলাম। এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমি ঐদিন লিখেছিলাম, 'ভালো মানুষ। অনুবাদের কাজে সহানুভূতি দেখালেন। শিক্ষা অধিকারিকে বলব, বললেন।'

ওইদিনই (২৭ ডিসেম্বর) ন্যায়মন্দিরে সাড়ে চারটার সময় প্রাচ্য সম্মেলনের কাজ শুরু হলো। সমগ্র ভারতবর্ষের বড় বড় ঐতিহাসিক, পুরাতত্ত্ববিদ, মুদ্রাবিশারদ, পুরালিপি-বিশারদ, ভাষাতত্ত্ববিদ ওই বিশাল ঘরে বসে চাঁদ-চকোর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। মহারাজা পদার্পণ করলেন পুরো আধঘণ্টা পরে। মহারাজাদের তো কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা চাই, যতই হোক পৃথিবীতে তাঁরা বিষ্ণুর অবতার। আর বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও বহু প্রাচীন ও বোকা কোনো রাজা ছিলেন না। তিনি সব ব্যাপারেই আগ বাড়িয়ে বলে দিচ্ছিলেন। যাহোক, তাঁর বক্তৃতা খুব ভালো হলো এবং শেষের দিকে অলিখিত বক্তৃতা তো আরো ভাল। সভাপতি হিসাবে জয়সওয়ালজী সুন্দর ভাষণ দিলেন।

এরপর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সম্মেলন শুরু হয়। ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে আমি আমার বক্তৃতা তৈরি করে নিয়েছিলাম। ২৯ তারিখ দুপুরে হিন্দি বিভাগের সভাতে সেটা পড়ি। অন্যান্য বিদ্বদ্‌জনেরাও কিছু কিছু লেখা পড়লেন, কিন্তু প্রাচ্য সম্মেলনে তো ইংরেজি সর্বেসর্বা ছিল, সেখানে হিন্দিকে কে পোঁছে?

বরোদাতে সে সময় কর্ণেল বেয়ার রেজিডেন্টে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে অবশ্য ভালো লাগল। যখন আমি আমার প্রথম তিব্বতযাত্রা থেকে ফিরে আসছিলাম, তখন ইনিই বড় সাহেব ছিলেন। ইনি নিজের তিব্বতী চিত্র, মূর্তি ও অন্যান্য সংগ্রহ দেখালেন। অবলোকিতেশ্বরেব একটি সুন্দর মূর্তি তাঁর কাছে ছিল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভদ্র, সংস্কৃত এবং শিল্পপ্রেমী ছিলেন। তাঁদের মেয়েটিও নিজের আঁকা অনেক ছবি দেখায়।

বরোদা থেকে ফেরার সময় আমাদের আমেদাবাদ, আবু, আজমীঢ়, চিতোর, উদয়পুর, সাঁচী এবং ভিলসা দেখার ছিল, কিন্তু জয়সওয়ালজীর সঙ্গে আজমীঢ় পর্যন্তই যাওয়া গেল। কোনো মামলার ব্যাপারে তাঁকে সেখান থেকে সোজা পাটনা চলে যেতে হয়েছিল।

আমেদাবাদ— ৩১ ডিসেম্বর দুপুরের আগেই আমরা আমেদাবাদ পৌঁছে গিয়েছিলাম। স্যার গিরিজাপ্রসাদ চিনুভাই মাধবলালের প্রাসাদে উঠেছিলাম। ইনি সাধারণ 'স্যার' ছিলেন না. স্যার পদাধিকারী (ব্যারনেট) ছিলেন। তাঁর বাড়িটি ইউরোপের কায়দায় সাজানো ছিল, কিন্তু আহার্য ভারতীয় এবং ভারতীয় কায়দায় তা পরিবেশিত হচ্ছিল। গৃহস্বামী উদারভাবে অতিথি সংকার করলেন। যেখানে স্যার গিরিজাপ্রসাদ নিজের তোলা সিনেমায় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখান, সেখানে বাড়ির মহিলারা গরবা নাচ দেখার

সুযোগ দেন। এমনিতে তো ভারতবর্ষের এমন কোনো স্থান নেই যেখানে আমি আত্মীয়তা বোধ করি না, কিন্তু গুজরাতের মাধুর্য অসাধারণ। এটা আমার গুজরাতে দ্বিতীয় যাত্রা। প্রথম যাত্রা (১৯১৩) আমি এতটাই ভুলে গেছি যে মনে হচ্ছে অন্য কোনো জায়গায় এসেছি। সে সময়ে তো আমার চোখ বন্ধ ছিল, সব অভিজ্ঞতাই ছিল স্পর্শ নির্ভর। আনন্দ এবং নাদিয়াদ তখনও দেখেছিলাম, আর আমেদাবাদে ছিলাম একমাস। কিন্তু তখন কি জানতাম যে এখানে 'হঠীভাঙ্গীনী বাড়ী' (১৮৬৪)-র মতো সুন্দর জৈন মন্দির আছে। এখানেই হেলানো স্তম্ভওলা মসজিদ আছে, যার অন্য একটি নমুনা দুবছর পর আমি ইস্পাহানে দেখেছিলাম। এখানে মসজিদগুলোর সাজ সজ্জায়—ইলোরার প্রভাব দেখা যাচ্ছিল। শত শত স্তম্ভযুক্ত মসজিদগুলো দেবগিরির মসজিদ ভেঙে বানানো মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। আমরা আমেদাবাদের পুরনো অট্টালিকা দেখেছি, দেখেছি আধুনিক যুগের উৎকৃষ্ট কাপড়ের মিলও। শহরের ভেতরে মসজিদের পাশে একটি কুয়ো দেখলাম, যার ভেতরে নামবার সিঁড়ির দুটো ধাপ জলের ওপর এবং পাঁচটি ধাপ জলের নিচে। এটা কোনো মুসলমান মহিলা বানিয়েছিলেন, কিন্তু এর গায়ে সংস্কৃততেও অভিলেখ ছিল। আমেদাবাদ এসে সত্যাগ্রহ আশ্রম না দেখে কি ফিরতে পারতাম? কিন্তু আমরা সাবরমতী (সত্যাগ্রহ) আশ্রমে তখন গিয়েছিলাম, যখন সোনার পাখি চিরকালের জন্য এই খাঁচাকে শূন্য করে চলে গিয়েছিল। বাড়িগুলোকে আর কে মনে রাখে? লোকেরা কাঠ খুলে নিয়ে যাচ্ছিল। অস্পৃশ্যতা নিবারণের কিছু কাজ এখান থেকে হতো কিন্তু উঠোন সমেত দু-মহলা বাড়ির বেশিটাই খালি পড়ে ছিল। ওখান থেকে ফেরার সময় মুনি জিনবিজয়জীর দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। ওঁর বৈদগ্ধ্য ও বিদ্যানুরাগের সুগন্ধ তো আগেই পেয়েছিলাম, কিন্তু এখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পাওয়া গেল।

রাজস্থানে— ৩১ ডিসেম্বর রাতের গাড়িতে জয়সওয়ালজী, আমি এবং আর একজন আবু রওনা হলাম। 'জীবন যাত্রা'র ৭ অক্টোবর ১৯৩৩ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪-এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় ১১ মাসের বর্ণনা হারিয়ে যাবার দরুন আমায় আবার লিখতে হচ্ছে। এর মধ্যে পৌনে ন-মাসের জন্য আমি দিনলিপি ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু ১ জানুয়ারি থেকে ৬ মার্চের ডায়েরিও আমার কাছে নেই, তাই এই সময়কার বর্ণনার জন্য আমাকে স্মৃতিনির্ভর হতে হচ্ছে।

আবু-রোড থেকে ট্যাক্সি করে আমরা আবু পৌঁছলাম। জয়সওয়ালজীর জাতভাই ওখানে পোস্টমাস্টার ছিলেন। নিজের ভগ্নকুটিরে রামকে দেখে শবরী হয়তো বা যেমন বিহ্বল ও চঞ্চল হয়েছিল, তাঁর অবস্থাও হয়েছিল তেমনি। আমাদের ওখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার ছিল না, তাই জলখাবার খেয়ে, আবুর মহাসরোবরে একটু চক্কর দিয়ে, দেলওয়াড়া মন্দিরের দিকে চললাম।

বস্তুপাল-তেজপালের এই অমরকীর্তি ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের অমর সম্পদ। মার্বেল পাথরকে মোম এবং মাখনের মতো কেটে সুন্দর সুন্দর ফুল-পাতা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

কিন্তু জানা যায় যে, মূর্তিশিল্প এর আগেই ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

আবু থেকে পরের বিরতি-স্থল পড়লো আজমীঢ়ে। আড়াই দিনের ঝুপড়ি, খাজা সাহেবের দরগা এবং পুস্কররাজের কুমীরও দেখলাম। এরই সঙ্গে ১৮ বছর পর পণ্ডিত রামসহায় শর্মাকে দেখারও সুযোগ আমার হলো, যিনি কোনো এক সময় সংস্কৃত শিক্ষায় হতাশ হয়ে আমার কাছে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু তাঁকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়নি। আজমীঢ় থেকে জয়সওয়ালজী পাটনা চলে গেলেন, তাই বাকি যাত্রার বেশি সময়টাই আমাকে চেত সিং, জয়সওয়ালজী এবং রায়মশাইয়ের সঙ্গেই কাটাতে হয়।

জয়পুর এবং চিতোর আমরা খুব ভালো করে দেখেছিলাম, কিন্তু দিনলিপির পাতা ছাড়া স্মৃতির ওপর নির্ভর করে আর কত প্রকাশ করা যায়? উদয়পুরেই কোনো অট্টালিকায় আমাদের রাখা হয়েছিল। ওখানকার অনেক নতুন পুরনো বাড়ি আমরা দেখেছিলাম। পরে ওখান থেকে এক কৃত্রিম সমুদ্রও (জয়সমুদ্র?) দেখতে গিয়েছিলাম, যেখান থেকে ফেরার পথে মহারাণা ভূপালসিংহের মোটর আমাদের পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর চেহারাটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য নজরে পড়েছিল, কিন্তু তাতে সিসোদিয়া[১] বংশের দীপ্তি দেখতে পেলাম না। অবশ্য, দীপ্তির জন্য আমরা তাঁকেই দোষ দেব কেন? অন্যান্য বংশের অবতংসরাই-বা কোন পাখির দিকে তাক করে আছেন?

চিতোরে আমাদের কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল। ওখানকার এক অর্ধনির্মিত নারীমূর্তি আমাদের বড় সুন্দর মনে হলো। চিতোর বা চিত্রকূট নামটা কেন? এখানে কূট বা পর্বত শিখর নেই। এর নাম চিত্রপীঠ হতে পারতো। কিন্তু পীঠের সংগে চিত্রের সম্বন্ধটা কিছুটা বিচিত্র মনে হতো! চিত্রকূটের দুটো কীর্তিস্তম্ভের মধ্যে রাণাকুম্ভার স্তম্ভটি তো আমার মূর্তিশিল্প হিসেবে খুবই নিকৃষ্ট মনে হয়েছিল, তবে অন্যটি ভালো ছিল।

উজ্জয়িনী— চিতোর থেকে আমরা মহাকালের নগরী উজ্জয়িনী পৌঁছলাম। কেন জানি না, অবন্তীপুরীকে সুন্দর কবিতার মতো আকর্ষণীয় মনে হয়। এর নামটা তো আরও আকর্ষণীয়। শূদ্রক, কালিদাস, বাণ, দণ্ডী সকলেই এর কীর্তি প্রসারে নিজেদের লেখনীকে ব্যবহার করেছেন। আমার এটি ছিল দ্বিতীয় যাত্রা। মহাকাল দেখলাম, কিন্তু এটা সেই মন্দির ছিল না, যেখানে ব্যাসদেব বাণকে মহাভারতের সুন্দর কথা শোনাতেন। কিন্তু আমার জন্য ওখানে এক ব্যাস উপস্থিত ছিলেন, যিনি আমাকে ভালভাবে অবন্তীপুরী দেখিয়ে ছিলেন। পণ্ডিত সূর্যনারায়ণ ব্যাসকে সত্যিই এবারের যাত্রায় কাব্যময় মনে হচ্ছিল। তিনি নিজের জন্মশহর 'জন্মভূমি মমপুরী সুহাবনি'[২]-র জন্য অবশ্যই গর্ববোধ করতে পারতেন। কেউ কি জানত যে, অবন্তীপুরী বিস্মৃতির গহ্বর থেকে উদ্ভাসিত হয়ে আবার আমাদের সামনে আসবে? আমার কাছে তো এটা সপ্তপুরীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

---

[১] রাজপুতানার ক্ষত্রিয়দের উপ-শাখা।—স·ম·

[২] অর্থাৎ জন্মভূমি আমার আপন ঘরের মতো সুন্দরী। — স· ম·

সাঁচী-ভিল্‌সা— উজ্জয়িনী থেকে আমরা ভিল্‌সা চলে এলাম। গোয়ালিয়র রাজও জয়সওয়ালজীর দেখাশোনার ব্যবস্থা করেছিলেন। যার সুযোগ আমরা তিনজনেই নিয়েছিলাম। সাঁচী তো আমি আগেও দেখেছিলাম এবং খুব মনোযোগের সঙ্গেই, কিন্তু বিদিশার ভগ্নস্তূপ এবারই দেখার সুযোগ পেলাম। 'খম্‌বাবা' নামে প্রসিদ্ধ গ্রীক দেবতা হেলিয়োদোরের গরুড়স্তম্ভ দেখলাম। উদয়গিরির গুহাতে সারা শরীর থেকে বীরত্ব বিচ্ছুরিত নরসিংহের গুপ্তযুগের মূর্তি দেখলাম। এতে সম্ভবত চন্দ্রগুপ্ত নিজেকেই নরসিংহ এবং গুপ্তরাজ-লক্ষ্মী ধ্রুবদেবীকে পৃথিবীরূপে উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। ভিল্‌সা থেকে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলো দেখতে গেলাম। ওখানকার কিছু মন্দির দশম শতাব্দীর এবং তার আগেকার সময়ের, যখন মূর্তিশিল্প ভারত থেকে লুপ্ত হয়নি। ওখানকার তোরণ সূক্ষ্ম তক্ষণকলা[১]-র শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ভূমিকম্প (১৯৩৪)— বরোদা-যাত্রা থেকে ফিরে জানুয়ারির মধ্যভাগে আমি প্রয়াগে পণ্ডিত উদয়নারায়ণ তেওয়ারির সেই গলির বাড়িতেই ছিলাম, যেখানে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সারারাত প্রুফ দেখা চলতো। দুপুরের পর কিছুটা সময় কেটে গিয়েছিল, এমনি সময়ে জানালা খড় খড় করতে লাগল এবং দেওয়াল দুলতে লাগল। লন্ডনে আমার তিনমাস ধরে এর অভিজ্ঞতা ছিল। অবচেতন মনে নিজেকে লন্ডনে কল্পনা করছিলাম। কিন্তু লন্ডনে তো ভূগর্ভ রেলেব জন্য এরকমটা হতো, এখানে এরকম কেন হচ্ছে এটা ভাবার দরকার মনে হয়নি। এই সময়েই লোকেরা বলল, 'ভূমিকম্প'। তখনও আমি তাড়াতাড়ি করে কোঠা ঘর থেকে নিচে নামিনি। তাড়াতাড়ি নিচে নামার দরকারই ছিল না কারণ ওখানে সব কিছুই সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে যাচ্ছিল। আমি কোঠা থেকে নিচে নেমে দু-গজ চললে তবে রাস্তায় পৌঁছতে পারি। দারাগঞ্জের রাস্তার দু-দিকই উঁচু উঁচু বাড়িতে ভর্তি, তারপর যদি মুঙ্গের বা মজফ্‌ফরপুরের মতো বাড়ি শুয়ে পড়তে শুরু করতো, তাহলে পালাবার সময় ছিল কোথায়? যখন আমি ঘর থেকে নিচে নেমে গলিতে পৌঁছলাম, তখনও দেওয়াল দুলছিল।

ভূমিকম্প বন্ধ হল। আমি বাড়ির ভেতরে গেলাম এবং আগের মতোই কথাবার্তা হতে লাগল। রাত্তিরের দিকে ব্যাপারটা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু পরদিন সংবাদপত্রে বিহারের ভূমিকম্পের প্রলয়লীলা ছাপার অক্ষরে দেখলাম। মুজফ্‌ফরপুর এবং দারভাঙ্গাকে এই সময় প্রলয়- সমুদ্রের গর্ভে মনে করা হতো, এখানকার কিন্তু কোনো খবরই ছিল না। জামালপুর এবং মুঙ্গেরের ধ্বংসলীলার কিছু কিছু খবর জানা গিয়েছিল। এই রকম সময়ে আমার মনে হলো আমার নিজের জায়গা ভূমিকম্প পীড়িত লোকেদের মধ্যে।

ভূমিকম্পস্থলে— আমি প্রয়াগ থেকে পাটনার দিকে রওনা দিলাম। প্রয়াগে তো

---

[১] কাঠ বা পাথরের মূর্তিনির্মাণ শিল্প। — স· ম·

ভূমিকম্পের প্রভাব নেই-এর মতো ছিল। মির্জাপুরে স্টেশনের কাছে কিছু ইঁট পড়ে থাকতে দেখলাম। পাটনায় জয়সওয়ালজীর পরিবারে কান্নাকাটি চলছিল—জয়সওয়ালজী কোনো মোকদ্দমার কাজে দারভাঙ্গা গিয়েছিলেন। রাতে যখন ফিরলেন তখন পুরো কাগজজুড়ে সংবাদ দেখলেন। সত্যি, লোকেরা হতাশ হয়ে গিয়েছিল, উত্তর বিহার থেকে এমনই সব খবর আসছিল।

আমি সেবাকর্মের জন্য উত্তর বিহার যাওয়া স্থির করলাম। ভূমিকম্পে এই প্রান্তের যে অবস্থা হয়ে গিয়েছিল তা সামলাবার জন্য একা সরকারই যথেষ্ট ছিল না। সরকার রাজেন্দ্রবাবু এবং অন্যান্য নেতাদের জেল থেকে ছেড়ে দেয়।[১] রাজেন্দ্রবাবু তাঁর পুরনো হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তবুও এই বিপদের সময় তিনি নিজের অসুখের কথা ভুলে গেলেন। দেশসেবক এবং উত্তর বিহারের ভূমিকম্পপীড়িত স্থানের নেতারা পাটনায় তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। রাতে যে দলটি প্রথম গঙ্গা পেরোলো তাতে আমিও ছিলাম এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও। পুরনো কংগ্রেসকর্মী বাবু দেবেন্দ্রগুপ্তকে একটা ট্রেনে আগেই পাঠানো হয়েছিল, যাতে তিনি হাজীপুরে কিছু খাবারের এবং একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে রাখতে পারেন। কিন্তু ভারতের ঘড়ি একঘণ্টা লেট থাকে আর বিহারের ঘড়ি তো তার থেকেও একঘণ্টা পিছনে। অন্ধকার থাকতে থাকতেই যখন আমরা হাজীপুর পৌঁছই, তখন ওখানে কোনো ব্যবস্থাই করা হয়ে ওঠেনি। লোকেরা বলতে লাগল, সব করা হচ্ছে। আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটতে লাগল, কিন্তু ট্যাক্সির দেখা নেই। হাজীপুর এবং মুজফ্ফরপুবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভূমিকম্পের দরুন রেললাইন ভেঙ্গে যাওয়ায় ট্যাক্সি আসার কোনো উপায় ছিল না। নেহেরুজী শঙ্কিত বোধ কবছিলেন। ব্যবস্থাপকদের মধ্যে বিশেষ কবে দেবেন্দ্রবাবুর , উদ্বেগ বেড়ে গেল। দেবেন্দ্রবাবু ওখানের বাসিন্দা ছিলেন না। তিনি অন্য কাউকে ব্যবস্থা করার জন্য বলে দিয়েছিলেন, তিনি আবার বলেছিলেন আর একজনকে। যাহোক, আমরা ওখানে উপস্থিত এক মোটর মালিকের হাতে-পায়ে ধরে একটা মোটর আনালাম। চাযের সঙ্গেও অনেক কিছু তৈরি হচ্ছিল। আমি ওটা বাদ দিয়ে ওখানে কোনো জায়গা থেকে কয়েকটা ডিম সেদ্ধ কবালাম এবং কয়েক কাপ চা তৈরি কবিয়ে নিলাম। তারপর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

মুজফ্ফরপুর— রাস্তার সেতু ভেঙে পড়েছিল। খাল-ডোব এবং ঝিলগুলোতে তো প্রায় বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। জানা গেল, এই সমস্ত জল ভূমিকম্পের সময় মাটি ফুঁড়ে

---

[১] যদিও রাজেন্দ্র প্রসাদের *আত্মকথা* থেকে জানা যায় যে, ভূমিকম্পেব জন্য সরকার তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেননি, তাব অসুস্থতার জন্যই ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়াব কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছিল। অতঃপর বিশৃঙ্খলার কাবণে মুক্তিব হুকুম আসতে দেরি হয় এবং তিনি দুদিন পরে ছাড়া পান। তবে ত্রিহুত, ভাগলপুর এবং পাটনা বিভাগে যাঁদেব বাড়ি, ভূমিকম্পের জন্য সরকার তাঁদের প্রায সবাইকে ধীবে ধীরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। (তথ্যসূত্র— আত্মকথা, পৃষ্ঠা ৪৭৯-৪৮১)—স ম

বেরিয়েছিল। রাস্তার ধারের গ্রামগুলোতে ইটের বাড়িগুলোরই ক্ষতি বেশি হয়েছিল। মুজফফরপুরে তো অনেক এলাকায় বাড়ির জায়গায় ইঁট এবং কড়ি-বরগা পাহাড় হয়ে ছিল। অনেক জায়গায় এখনও মৃতদেহ চাপা পড়ে ছিল। আহতদের সংখ্যা বেশি ছিল এবং তাদের থাকার জন্য হাসপাতালের ঝুপড়ি বানানো হয়েছিল। ভূমিকম্পের সম্পূর্ণ চেহারাটা এখনও বাইরের লোকেরা ভালো করে জানতো না। যে খবর গিয়েছিল, তাতে এত অতিশয়োক্তি ছিল যে সেটা বিশ্বাস করা মুশকিল ছিল।

শহর ঘুরে রাষ্ট্রকর্মীদের একটি ছোট সভা হলো। জানানো হলো, সীতামঢ়ীর অবস্থা খুব খারাপ। ওখানেই আমাকে সীতামঢ়ী যাওয়ার জন্য বলা হলো।

সীতামঢ়ী— পরের দিন সকালেই তিন জনের সঙ্গে আমি সীতামঢ়ীর উদ্দেশে রওনা দিলাম। রেলের পথ বন্ধ ছিল। রাস্তারও সেতু ভেঙে গিয়েছিল, তাই যানবাহনের কোনো প্রশ্নই ছিল না। আমরা চারজন রাস্তা ধরে সীতামঢ়ীর দিকে এগোলাম। একজন তো নিজের গ্রামের কাছে এসে অর্ন্তধান হয়ে গেল। কেবল তাই না, পরে যখন সাহায্যের জন্য জিনিসপত্র সীতামঢ়ী পাঠানো হচ্ছিল, সে তার থেকে দু-এক টিন তেলও নামিয়ে নিয়েছিল। বাকি দুজনের সঙ্গে আমি এগোই। সীতামঢ়ী এখনও অনেকটা দূর ছিল। আমরা যখন ভূমিকম্পে ভেঙে যাওয়া একটা সেতুর পাশ দিয়ে নৌকা করে নালা পার হচ্ছিলাম, তখন একটা মোটরলরি দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম। জানতে পারলাম, সেটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বাবু চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ নারায়ণ সিংহের জন্য এসেছে। আমি আমার এক সঙ্গীকে দৌড়ে গিয়ে বলতে বললাম, যেন আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যায়। লরিতে জায়গা খালি পড়ে ছিল, চেয়ারম্যান ওখানে ছিলেন এবং তিনি আমার নামের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর উত্তর তাঁর শিক্ষা এবং পদের উপযুক্ত ছিল না। আমরা সুখের জন্য নয়, ঐদিনই সীতামঢ়ী পৌঁছবার জন্যই এই আর্জি করেছিলাম। ওই দিন সন্ধেয় অথবা পরদিন আমরা সীতামঢ়ী পৌঁছে গেলাম। সীতামঢ়ীর কাছেই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল, তাই ভূমিকম্পের প্রবল রোষ সীতামঢ়ীর ওপর পড়েছিল। পাকা বাড়ি বোধহয় একটিও ছিল না। জেলের দেওয়াল তো শুইয়ে দিয়েছিল।

লোকের কষ্টে সাহায্য করার কিছু অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছিল। ওখানে ফক্কড়বাবা নরসিংদাসজীও ছিলেন। সাহায্য-সামগ্রীও তাড়াতাড়ি আসতে শুরু করল। আমি সাহায্য কেন্দ্র খুললাম। খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি ছিল আর শীত নিবারণের জন্য কম্বলও। দেড়-দু সপ্তাহ শেষ হতে হতেই অনেক সংগঠন সাহায্যের জন্য পৌঁছে গেল। আর 'বিহার কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি'র, যার কাজে আমি গিয়েছিলাম, কাজ করার জন্য অনেক লোক এলো। পণ্ডিত নেহেরুজীও দ্বিতীয়বার ওখানে এলেন। আমার সঙ্গের আর একজন কদিন পরই অদৃশ্য হয়ে গেল। আসলে এই দুজন অদৃশ্যই ছিল। একজন তো বিপজ্জনক ছিল আর একজন ছিল দায়িত্বহীন। তৃতীয় জন খুবই সাদাসিধে, পরিশ্রমী এবং সেবাপরায়ণ। তাঁর বাড়ি সীতামঢ়ীব কাছেই। তাঁর গ্রামেরও ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু তিনি কখনো বাড়ি যাবার কথা মুখেও আনেননি বা সাহায্য

'বিয়ের পরই বা এর নিশ্চয়তা কি?'

সুলতানগঞ্জ—৮ মার্চ পাটনা হয়ে সুলতানগঞ্জের দিকে রওনা দিলাম। এদিকে সীতামঢ়ী থেকেই গলা খুস-খুস এবং কাশি হচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম গলায় ক্ষত হয়েছে, কিংবা কাঁটা ফুটেছে। আমি তখনো বুঝিনি যে এটা টন্‌সিলের রোগ, যত তাড়াতাড়ি অপারেশন করে এটাকে বার করা যায় ততই মঙ্গল। জামালপুরে দেখলাম, ভূমিকম্পে বাড়িঘরের ক্ষতি হয়েছে বেশি। সুলতানগঞ্জে ধূপনাথ সিংহ এবং তাঁর বড়ভাই দেবনাথ সিংহের আতিথ্য ছিল। ওঁদের পরিবারের এবং বিশেষ করে ধূপনাথ সিংহের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। ধূপনাথ সিংহ জমিদারের তসিলদারি ছেড়ে বিবাগী হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য পরে তিনি কুমার কৃষ্ণানন্দ সিংহের কোষাধ্যক্ষের কাজ নিয়েছিলেন। তাঁর মতো সৎ লোকের পক্ষে দরবারে টেঁকা মুশকিল ছিল। দরবারের শকুনরা কেন কুমারের কাছে ধূপনাথের থাকাটা পছন্দ করবে? তাঁর চাকরি ছাড়ার অবস্থা হলো। আমার তো এটা ভালোই মনে হলো। এরকম বিশ্বাসী লোক কুমার পেতেন না, কিন্তু পেয়েও কুমারের বিশেষ লাভ হচ্ছিল না। খরচ অত্যধিক হয়ে যাচ্ছিল এবং লোকে সেই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছিল।[১] দুর্গে কুমার সাহেবের বাংলো তৈরি হচ্ছিল। ভূমিকম্পের দরুন ওটাকে আবার ভেঙে তৈরি করার দরকার হয়েছিল। দেওয়ালের জন্য ভিত খোঁড়া হচ্ছিল, তখনই ভূ-তল থেকে ৬ ফিট নিচে পুরনো দেয়াল বেরিয়ে পড়ল। ওখানে একটা বেদিও পাওয়া গিয়েছিল, যেটা পৌনে বারো ফিট অর্থাৎ ওপর থেকে সাড়ে সতেরো ফিট নিচে চলে গিয়েছিল। সবচেয়ে নিচের ইঁট সোয়া এগারো ইঞ্চি চওড়া আর সোয়া দু-ইঞ্চি মোটা ছিল। অন্যান্য ইঁটও ১৪ × ৭ × ২$\frac{১}{২}$, ১৩ × ৮ × ২, ১২$\frac{৩}{৮}$ × ৮$\frac{১}{২}$ × ২, ৯$\frac{৭}{৮}$ × ৭$\frac{১}{৮}$ × ২ ইঞ্চির। ওপর-তল থেকে দু-ফিট নিচে এক-ফিট চওড়া আর দু-ফুট লম্বা ছাইয়ের স্তর পাওয়া গিয়েছিল, অর্থাৎ কোনো এক সময়ে আগুন লেগেছিল। এক জায়গায় ওপর-তল থেকে ৪ ফিট নিচে ৯$\frac{৭}{৮}$ × ৭$\frac{১}{৮}$ × ২ ইঞ্চির দু-ফিট চওড়া দেওয়াল পাওয়া গেল, যেটা সুন্দরভাবে জোড়া ছিল আর দেওয়ালের গায়ে বাইরের দিকে একটা ফুটো করা ছিল। এই দেওয়াল ৯ থেকে ১২ শতাব্দীর মধ্যেকার মনে হচ্ছিল, অবশ্য যদি বেদির নিচের ভিতটার কথা বাদ দেওয়া যায়।

সুলতানগঞ্জ প্রাচীন স্থান। সেখানকার গুপ্তযুগের পিতলের বিশাল বুদ্ধমূর্তি এডিনবরায় রাখা আছে, সুতরাং গুপ্তযুগের সঙ্গে এর সম্বন্ধ তো আছেই।

১০ মার্চ মুঙ্গের দেখতে গেলাম। ভূমিকম্পে এই শহরেরই ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। চকবাজার আর পূর্ব পুরবসরায় সম্পূর্ণ ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। রাজা রঘুনন্দনপ্রসাদের বাড়ির কাছে এখনও চাপা-পড়া শব থেকে দুর্গন্ধ আসছিল। শহরের আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে এখনও অনেক দেরি ছিল।

পরদিন আমি ছিলাম পাটনায়। এখানে বিক্রমশিলা থেকে তিব্বতগামী আচার্য

---

[১] *এই ভাবার্থে লেখক এখানে একটি প্রবাদ (বহতী গঙ্গামে হাথ ধোনা)* ব্যবহার করেছেন।—স·ম·

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-এর শিষ্য ডোম্-তোন্-পা রচিত 'গুরুগুণধর্মাকর'-এ বিক্রমশিলা সম্বন্ধে দেখতে লাগলাম। ডোম্-তোন্-পা লিখেছেন, নালন্দার ভিক্ষু কপল গঙ্গাতীরে এক পাহাড়ের ওপর বিহার তৈরি করিয়েছিলেন। পরে ভিক্ষু পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ গোপালের পুত্র ধর্মপালরূপে জন্ম নেন। সেখানে ধর্মপাল এক বিশাল বিহার তৈরি করান। পালবংশীয় রাজা মহীপাল বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া)-বিহার থেকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিক্রমশিলা-বিহারে ডেকে আনেন। বিক্রমশিলা নামের পাথরটি বিহারের উত্তরদিকে ছিল আর ভঙ্গলপুর রাজধানী থেকে বিক্রমশিলা বিহার উত্তরদিকে ছিল। বিক্রমশিলাটি সুলতানগঞ্জের হওয়ার পক্ষে এবং বিপক্ষে সমান-সমান এত বেশি প্রমাণ আছে যে, এ-বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা সহজ নয়।

১৯ মার্চ পর্যন্ত আমার পাটনাতেই থাকার কথা ছিল। মোঙ্গল ভিক্ষু ধর্মকীর্তি আমার সঙ্গে ছিলেন। অপারেশনের পর তিনি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। আমার খুব ইচ্ছে ছিল তিনি যদি তাঁর তিব্বতী ভাষার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কিছু সংস্কৃত শিখে নিতেন তবে ভালো হতো। কিন্তু তাঁর পক্ষে সংস্কৃত সত্যিই 'বুড়ো তোতাকে রামনাম' শেখানোর মতো ছিল। মার্চের গরমই তাঁর সহ্যের অতীত ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ স্নান করার নামও করতেন না। আমার ভয় হতো, তিনি অসুস্থ না হয়ে পড়েন।

বিহার ভূমিকম্পে সাহায্যের ব্যাপারে গান্ধীজী পাটনায় এসেছিলেন।[১] তাঁর পরিচিত এক ইংরেজ মহিলার স্বদেশে ফেরার ছিল। তাড়াতাড়ি জাহাজের ব্যবস্থা হওয়া মুশকিল ছিল, যদি সেটা তাড়াতাড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তো তা লংকা থেকেই। রাজেন্দ্রবাবু তাঁকে বললেন যে, আমার লংকায় পরিচিত লোক আছে। আমি স্যার জয়তিলককে চিঠি এবং তার পাঠিয়ে দিয়েছি। এই কাজের ব্যাপারেই আমি গান্ধীজীর কাছে গিয়েছিলাম। এর আগেও গান্ধীজীর সঙ্গে আমার দেখা করার একাধিকবার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু আমার কখনো তাঁর কাছ থেকে বেশি কিছু জানার ইচ্ছে হয়নি। তাঁর আদর্শবাদের সম্মান করেও বৌদ্ধ হিসেবে আমি তাঁর থেকে অনেক দূরে ছিলাম এবং সে-কারণেই আমি যখন তাঁর কাছে গেছিও, তখন কয়েক মিনিটের বেশি থাকিনি। গান্ধীজীর কাছ থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন মালব্যজী মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, বুদ্ধ ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। যখন সারনাথে কেউ তাঁকে এর উল্টো কথা শুনিয়েছিল তখন তিনি খুব আশ্চর্য বোধ করেছিলেন। আমাকে বুদ্ধধর্মের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গণ্য করা হতো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যিই কি বুদ্ধ ঈশ্বরকে মানেন নি?' আমি 'সব্ব অনিচ্চ'[২] এই বুদ্ধ-বাক্যের উদ্ধৃতি দিই এবং বলি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। তারপর আমি মহাব্রহ্মা সম্বন্ধীয় দীর্ঘনিকায়ের কথা বলি, যেখানে ঈশ্বর সম্পর্কে সুস্পষ্ট নিষেধ আছে। মালব্যজী দুঃখ পেয়ে থাকবেন, কিন্তু আমি কি করে সত্যের অপলাপ করি?

১· পাটনা থেকে গান্ধীজীকে টেলিগ্রাম করেছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। গান্ধীজী তখন মাদ্রাজের কোনো গ্রামে হরিজনদের জন্য পদব্রজে ঘুরছিলেন। (তথ্যসূত্র : আত্মকথা, পৃষ্ঠা ৪৮১)—স·ম·

২· এই বুদ্ধ-বাক্যটির অর্থ *সব কিছুই অনিত্য*।—স·ম·

—১৯৩৪—

আমার এ বছর আবার তিব্বতে দ্বিতীয় যাত্রায় যাওয়ার কথা ছিল। যাওয়ার আগে জানতে পারলাম বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি আমাকে তাঁদের সম্মানীয় সদস্য করেছেন। এটা কোনো আনন্দ-বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল এই যে, জেমস্, ফাকস, হেলট এবং অন্য ইংরেজ আমলা এই সম্মান প্রদানকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, আর আমি আজও ইংরেজ আমলাদের ছায়াকেও ঘৃণা করি।

দ্বিতীয় তিব্বত যাত্রা, ১৯৩৪

লাসার দিকে

কালিম্পং—২০ মার্চ আমি ধর্মকীর্তির সঙ্গে পাটনা থেকে কালিম্পং-এর পথে রওনা দিলাম। জাহাজে গঙ্গা পেরিয়ে শোনপুর, কাটিহার এবং পার্বতীপুরে গাড়ি পাল্টে পরদিন সকাল হতে-হতেই আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলাম। ৪ টাকায় দুজনের জন্যই ট্যাক্সিতে জায়গা পাওয়া গেল। রাস্তায় ধর্মকীর্তির খুব বমি হলো। আড়াই ঘণ্টায় আমরা কালিম্পং পৌঁছাই। সাহু ভাজুরত্ন (যাঁকে তিব্বতীরা শমো -কর্পো—সাদা টুপি নামে ডাকতো) আমাদের স্বাগত অভ্যর্থনা করেন। আমাদের বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানে রাখা হলো। নেপালে পোশাক বদল করে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে দসরতন সাহু আমাকে সাহায্য করেছিলেন, এখন তিনি ছিলেন ভিক্ষু ধর্মালোক। ওঁর সঙ্গে এখানে দেখা হলো এবং জানতে পারলাম তাঁরও যাওয়ার কথা আছে। আমার কাশি বন্ধ হচ্ছিল না—কাশি হওয়া ভালো লক্ষণ নয়। আমি কিছু ওষুধ খেয়ে কাজকর্মের মধ্যেই একটু-আধটু বিশ্রামও নিতে লাগলাম।

কালিম্পং-এ বিহারের অনেক লোক থাকতো, আর তারা কি আর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো না? বালিয়া-নিবাসী হরেরাম বাবা, বারো-তেরো বছর ধরে এখানে ছিলেন। আমার নাস্তিকতাবাদের জন্য তাঁর দুঃখ তো নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু নিজের হাতে তৈরি খসখসে রুটিও মিষ্টি মনে হয়। দ্বিতীয় তরুণ ছিলেন পরমহংস মিশ্র যিনি এখানে অধ্যাপনা করছিলেন। তিনি তো প্রায়ই আসতেন। বাসুদেব ওঝা (ধনগডহা) ছিলেন তৃতীয় মিত্র, যিনি সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। ধর্মালোকজী তো সবসময় সঙ্গেই থাকতেন আর তাঁর কথাবার্তাও ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক। তিনি এখন আদর্শ পর্যটকদের মৌন পর্যটকাধিরাজ-এর ব্রত নিয়েছিলেন। তাঁর তিব্বত হয়ে 'বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী'র খোঁজে চীন যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ধর্মালোকজীর সঙ্গে একদিন নেপালের

ভূতেদের ব্যাপারে আলোচনা হতে লাগল। তাঁর কথা অনুসারে নেপালে আঠারো জাতের ভূত আছে—

(১) মুণ্ডকাটা—মাথা কেটে মারা যাওয়া ব্যক্তি।
(২) অগতিত্ব—খুব অসুখে ও অবহেলায় মরা ব্যক্তি।
(৩) রাক্ষস—বনের মধ্যে মানুষকে পেয়ে যে হৃদপিণ্ড খেয়ে নেয়।
(৪) কৌঁ—কঙ্কালসার শরীর যে 'কৌঁ' বলে ডাকে।
(৫) কীং-চুক-নীং—পেত্নী, যে সুন্দরীর রূপ ধরে ছলনা করে এবং মারে।
(৬) মীচু-লাখে—নদীতে এবং খালি মাঠে মুখ থেকে আগুন বার করে দৌড়তে থাকা রাক্ষস।
(৭) হাঁ-ন্যাঘর—হাওয়া ভূত, যে ঘরে বসে পাটকেল ছোঁড়ে।
(৮) সীক-অগতি—ওই ঘরেই মরে বাস করা ভূত।
(৯) স্যাক্-তুয়্-ম্হ—সাদা বাঁদরের মতো, ক্ষতিকারক নয়, উপকারী ভূত।
(১০) ভ্বাঠ্-প্বারা-খ্যাক্—কাপড় লেপটে নেওয়া ভূত, যে মানুষকে ফেলে দিয়ে হাসে।
(১১) নাঙ্-সূ-খ্যাক্—রাস্তাতে নাম ধরে ডাকে যে ভূত।
(১২) গুরু-রুরু-খ্যাক্—কোঠা ঘরে ধম-ধম শব্দ করে যে ভূত, যে অত্যন্ত কল্যাণ-সাধক।
(১৩) লঁ-পনেম্হ-খ্যাক্—রাস্তা আটকে দেয় যে ভূত।
(১৪) প্ব-দূ-মা-মি-সা—গোঁফওলা পেত্নী।
(১৫) জঙ-কী-কো—যমদূত।
(১৬) জু-মী—মানুষকে সোজা নিয়ে যায় যে ভূত।
(১৭) বারা-খ্যাক্—প্রথম ঋতুবতী হয়ে মারা যাওয়া পেত্নী।
(১৮) ইয়ো-খ্যাক্—চরকাকাটা পেত্নী।

আমার দুঃখ হলো, সংখ্যাটি ২০ অব্দি পৌঁছল না বলে। আমি কিন্তু এর অর্ধেকও আমাদের এখান থেকে পুরো করতে পারতাম না।

ছাপরার লোকেরা এখানে কলকাতার মতো মজুরের কাজ করে না। এরা সব ছোট ছোট মহাজন। প্রথমে এরা টাকা ধার দেওয়ার কাজ করত। পরে এক সিকি পরিমাণের হার আর নাকের লবঙ্গ রাখতে রাখতে স্বর্ণকার হয়ে যেতে হয়। কালিম্পং-এ তাদের পাঁচ-ছয়টা গয়নার দোকান ছিল, যেগুলোর মালিক ছিল বিভিন্ন জাতির লোকেরা।

আমার প্রথম যাত্রায় লাসা থাকাকালীন নেপালের প্রধানমন্ত্রী (যিনি আসলে রাজা ছিলেন) চন্দ্রশামশের মারা যান। তাঁর জায়গায় তাঁর ভাই ভীমশামশের গদীতে বসেন। তাঁর মৃত্যুর পর সবচেয়ে ছোট ভাই যুদ্ধশামশের প্রধানমন্ত্রী বা তিন-সরকার হন। এই সময়ে জানা গেল, নেপালে একটা ছোটোমোটো বিপ্লব হয়ে গেছে। যদিও তাঁর প্রভাব রাণা বংশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। চন্দ্রশামশেরের ছেলে যথেষ্ট শিক্ষিত, ধনী এবং

প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁর এ-ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ হতো না যে, অন্য একজন লোক অর্ধ-শতাব্দী ধরে রাজত্ব করতে থাকবে আর তাঁর কোনো সুযোগই হবে না—নেপালে প্রধানমন্ত্রীর পদ বংশানুক্রমিক। বয়স অনুসারে প্রথমে সব ভাইয়েরা এবং পরে ছেলেরা ও ভাইপোরা অধিকারী হয়। যুদ্ধশামশের এখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, রুদ্রশামশের তাঁর উত্তরাধিকারী চীফ সাহেব হয়েছিলেন। সংবাদপত্র মারফত জানলাম, রুদ্রশামশের এবং অন্য আরও কতজনকে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন ভীমশামশেরের ছেলে পদ্মশামশের চীফ হয়েছেন, তাঁর পরের তিন উত্তরাধিকারী হন চন্দ্রশামশেরের ছেলেরা—মোহনশামশের, ববরশামশের আর কেসরশামশের। এইভাবে ক্ষমতা চন্দ্রশামশেরের ছেলেদের হাতে চলে গেল। এই সময়েই তো আশংকা হচ্ছিল, বোধহয় যুদ্ধশামশের এবং পদ্মশামশেরকেও নেপাল ছাড়তে হবে। সেটা অবশ্য এক দশক পরে হয়েছিল। এই ছোট্ট বিপ্লব, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বংশের ছুতোয়, যুদ্ধশামশেরের বাইশ জন ছেলের মধ্যে আঠারো জনকেই উত্তরাধিকারীর সূচি থেকে বাদ দিয়ে দেয়। বীরশামশেরও রাণাবংশ-প্রতিষ্ঠাতা জঙ্গবাহাদুরের সন্তানের সঙ্গে এই রকমই করেছিলেন, এখন তাঁরই ছেলে রুদ্রশামশের এবং অন্যদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। চন্দ্রশামশেরের ছেলেও কি এ অসুখের ছোঁয়া বাঁচাতে পারবেন? হয়তো এটা মনে রেখেই তিনি যুদ্ধশামশের এবং পদ্মশামশেরকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করতে দিয়েছিলেন।

তিব্বতে ঢোকার জন্য গ্যাংটকের পলিটিকাল-অফিসারের আদেশপত্রের দরকার ছিল। পাটনা থেকে আধা-সরকারী পক্ষ থেকে গ্যাংটকে আমার সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল। আমি কালিম্পং-এ আদেশপত্র পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। ওদিকে শ্রীরাজনাথ পাণ্ডের এ-বছর প্রয়াগে এম· এ-র শেষ পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তিনিও লাসা যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তিব্বত যাওয়ার আগে আমার আরও অনেক কাজ ছিল। আমার ভোটিয়া ব্যাকরণের প্রুফ আসছিল। ওদিকে লংকা থাকাকালীন আমি য়েন্-চাঙ্ অনূদিত 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা'র প্রতিশব্দ শ্রীবাঙ্মোলম্-এর সাহায্যে একত্রিত করেছিলাম, যা এখন আমি সংস্কৃতে পরিবর্তন করছিলাম। আগের অন্য কাজের জন্য আমি 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি'-র অর্ধেকটাই সংস্কৃতে অনুবাদ করে প্রকাশ[১] করতে পেরেছিলাম। একই সঙ্গে এই সময় এস্পেরান্টো[2] ভাষা শেখারও কিছুটা ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সেটা আর বেশি এগোয়নি।

যাত্রার জন্য আমি এদিক-ওদিক থেকে পাঁচশো টাকা জোগাড় করেছিলাম, যার মধ্যে একশো টাকা ছিল 'হিন্দুস্তানী' পত্রিকার। বোধহয় মহাবোধিসভা থেকে কিছু পেয়েছিলাম। এতটা অর্থ-সম্পদহীন হয়ে তিব্বতে অনেক কাজ তো করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমার যাত্রা অর্থবলের ওপর হতো না।

---

১ *বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি*-এর জার্নালে।

2 *Esperanto*—পৃথিবীর সমস্ত জাতির মানুষের কথা বলার জন্য কৃত্রিম ভাষাবিশেষ।—স·ম·

১০ এপ্রিল আমার বই 'তিব্বতমে সোয়া বরস' এলো। দ্বিতীয় যাত্রার আগেই প্রথম যাত্রার বই ছেপে এলো, সেজন্য আমার বড় আনন্দ হলো। এপ্রিলে কাশির সঙ্গে একটু জ্বরও এলো। আমি এই ভেবে খুশি থাকলাম যে তিব্বতে ঢোকার আগেই অসুখ থেকে তো মুক্তি পাওয়া যাবে। জয়সওয়ালজী আমার যাত্রার গুরুত্ব জানতেন। ১৬ এপ্রিল তাঁর পাঠানো দুশো টাকা পাই। আমি ঐ ব্যাপারে লিখেছিলাম, 'সত্যি, তাঁর যা খরচ তাতে তো তাঁর কাছ থেকে কিছু নেওয়া ঠিক নয়। তবুও তিনি এত উদার, কিছুতেই শুনবেন না।'

জাপানী বৌদ্ধবিদ্বান ব্যোদো ১৭ এপ্রিল কালিম্পং আসেন আর কিছুদিন তাঁর যাতায়াত থাকে। এই সময়েই পরের বছর জাপান যাওয়ার ভাবনা পাকা হয়। একদিন বালিয়া জেলার এক হাবিলদারের মুখে মজার কথা শুনতে পেলাম। সে ব্রাহ্মণ ছিল এবং ওখানকার সাব-জেলে কাজ করতো। দারিদ্র্যের কারণে বেচারি সারাজীবন কুমারই থেকে গেল আর এখন পঞ্চাশের কাছে বয়স হওয়ায় প্রায় তামাদি হওয়ার জোগাড়। ছুটি নিয়ে কখনো-সখনো 'দেশ' যেতো ঠিকই, কিন্তু ভাগ্যের দরজা কোনোদিকে খোলা দেখা যেত না। একদিন অতি বিষণ্ণ মনে বলছিল, 'বাবা, সগাই শেষ পর্যন্ত হবে কিন্তু তেওয়ারী[1] মরলে!' (বিধবা বিবাহ তো শেষ পর্যন্ত হবে, কিন্তু হবে তখন যখন আমি মরে যাব)।

গ্যাংটক—কালিম্পং-এ আসা প্রায় একমাস হয়ে গেল, কিন্তু এখনও গ্যাংটক থেকে আদেশপত্র আসার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম না। ওখানে গিয়ে তদ্বির করার সিদ্ধান্তই নিতে হলো এবং শ্রীবাসুদেব ওঝার সঙ্গে মোটরে করে ১৯ এপ্রিল গ্যাংটকের উদ্দেশে রওনা দিলাম। ১০ মাইল নিচে নেমে তিস্তা নদীর তীরে পৌঁছাই, সেখান থেকে রাস্তা ওপরের দিকে এবং বাঁদিক ধরে ছিল। রম্-ফুমে নদীর পুল দার্জিলিং জেলা এবং সিকিম রাজ্যের সীমা। এখানকার বাজারেও বিহারী দোকানদারই বেশি ছিল। সিম্-তাঙ্-এর কাছে কমলালেবুর বাগান পাওয়া গেল—সিকিমের কমলালেবু নিজের মাধুর্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, যদিও তা এত বেশি হতো না যাতে দূরে দূরে রপ্তানি হতে পারে।

রাত সাড়ে সাতটায় আমরা গ্যাংটক পৌঁছলাম। গ্যাংটক সমুদ্রতল থেকে আটহাজার পাঁচশো ফিট ওপরে অবস্থিত, তাহলেও ঠাণ্ডা তেমন ছিল না। থাকার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, আমরা তাই এক মন্দিরের শরণাপন্ন হলাম। পলিটিক্যাল-অফিসারের হেডক্লার্ক ছাপরাবাসী ছিলেন। বাসুদেবজীর আশা ছিল যে, তাঁর কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন, 'আপনারা আজ মন্দিরে থাকুন, কাল সকাল দশটায় অফিসে আসবেন।' পূজারী অমনৌর (ছাপরা)-এর লোক, আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর খুব নজর ছিল। পরদিন পলিটিক্যাল-অফিসারের কেরানিবাবু গ্যল্-ছন্-ছে-রিঙ্-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে অতটা রুক্ষ মনে হলো না। তিনি

[1] এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পদবী।—স-ম

—১৯৩৪—

দশটায় অফিসে আসতে বললেন। পাটনা থেকে লিখেও কিছু লাভ হয়নি। এখানকার পারিষদদেরও বিশেষ অনুকূল মনে হচ্ছিল না, তাহলে আর সাহেবের কাছ থেকে বেশি কি প্রত্যাশা করতে পারতাম? আমি বাংলোয় গিয়ে আমার কার্ডটি পাঠিয়ে দিলাম। মিস্টার উইলিয়ামসন তৎক্ষণাৎ আমাকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন আর ভালভাবে কথা বললেন। তিনি বললেন যে, আদেশপত্রের ব্যাপারে আরও দু-একটি কথা জানার আছে। আমি পাটনায় লিখেছিলাম এবং উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিছুদিন আগেই বিহারের গভর্ণর বিহার রিসার্চ সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে আমার প্রথম তিব্বত-যাত্রা এবং প্রাসঙ্গিক কাজের খুব প্রশংসা করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে জার্নালের সেই সংখ্যাটি আমার কাছে ছিল যাতে তাঁর বক্তৃতাটি ছাপা হয়েছিল। উইলিয়ামসন এমনিতেই সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। এই বক্তৃতাটি পড়ে তো তিনি আরও প্রভাবিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ কেরানিকে আদেশপত্র লিখে আনতে বলে দিলেন। এরপর তো তিব্বত বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতো অনেকক্ষণ ধরে কথা হতে লাগল। তিনি নিজের তোলা ওখানকার অনেক ছবি দেখালেন এবং সবরকমের সাহায্যের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। আমি এইটুকুই বললাম, 'আপনি আপনার ট্রেড এজেন্টকে গ্যান্টীতে লিখে দিন।' বিশ্বাসই ছিল না কাজ এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এগারোটা নাগাদ আদেশপত্র আমার হাতে এসে গেলো।

গ্যাংটক যখন এলাম, তখন আরো কিছু দেখে নেওয়া উচিত। প্রথমে রাজকীয় বিহার এবং প্রাসাদের দিকে গেলাম। মহারাজা এবং মহারানীর সঙ্গে দেখা হলো। মহারানীকে যথেষ্ট বুঝদার মনে হলো। আমি আমার তিব্বতী প্রাইমারের[১] এক কপি উপহার দিই। যখন আমি বিহার দেখার জন্য ওখানকার লামার কাছে পৌছলাম, তখন দেখি রানীও হর্ষোৎফুল্ল হয়ে আমার প্রাইমারটি তাঁকে দেখাচ্ছেন। লামার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হয়। তিনি আমার নামের সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরে লাসাতেও দেখা হয়েছিল এবং সাহায্যের ব্যাপারে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

ওইদিনই চারটেতে বেরিয়ে পৌনে নটায় আমরা কালিম্পং-এ পৌছে গেলাম। এখন তিব্বতের উদ্দেশে রওনা হওয়ার ছিল। বাহনের ব্যবস্থা করাটা কোনো সমস্যার ব্যাপার ছিল না কারণ প্রত্যেকদিন শয়ে শয়ে খচ্চর এখান থেকে মালপত্র নিয়ে তিব্বতে যায়। আমাদের খুব সাবধানে টাকা খরচ করতে হতো। রাজনাথ-এর আদেশপত্র পাওয়া সহজ ছিল না, চাইলেই তাঁর জন্যও বেনারস পুলিশের রিপোর্টের কথা বলা হতো। তাই এটাই ভালো মনে হলো যে, তিনি নেপালী পোশাকে যাবেন। তাঁর রোগা শরীরও এতে সহায়কই হলো। ফরী পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ৩২ টাকায় মালপত্র এবং দুজন যাত্রী বহনকারী একটা খচ্চর ভাড়া করা হলো। রাস্তার জন্য দরকারি জিনিস আর ওষুধপত্র জমা করা হলো, যার মধ্যে সাবান, টুথপেস্ট, ব্লেড, ফাউন্টেন পেন, কালি, জুতো, ছাতা, তালা, তোয়ালে, পেন্সিল, কাগজ, লেটার পেপার, খাম, টিকিট, পোস্টকার্ড, লণ্ঠন,

---

[১] *লেখক এখানে তিব্বতমে সওয়া বরস* বইটিকে তিব্বত সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক ধ্যান-ধারণা সম্বলিত বই (Primer) বলে ইঙ্গিত করেছেন।

চায়ের বাসন, গায়ের চাদর, টর্চ, পেয়ালা, চামচ আর বর্ষাতি এবং অনেক সাধারণ ওষুধ (টিঞ্চার আয়োডিন, তুলো, ব্যান্ডেজ, জ্বরের ওষুধ. জোলাপ) ছিল।

ফরী-জোংএ—২২ এপ্রিল সোয়া ন'টায় আমরা সাহু ভাজুরত্নর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। রাজনাথ পাণ্ডে নেপালী টুপি আর পায়জামা পরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এক নেপালী তরুণকে অলগডহা বাজার (আট মাইল) পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাজনাথ নেপালী পোশাক তো পরে নিয়েছিলেন, কিন্তু কথা কি করে বলবেন? ঠিক হলো যে, জিজ্ঞেস করলে বলে দেবেন, 'আমার মা-বাবা সিমলা থাকেন তাই আমার নেপালী বলার সুযোগ হয় নি।' আরও চার মাইল চলার পর পেডোঙ্ এলো। পুলিশ নামধাম লিখল। আমি ভিক্ষুর বেশে, কিন্তু সঙ্গে আদেশপত্র ছিল, আর রাজনাথের পোশাকই তো আদেশপত্রের কাজ করছিল। ২৩ তাবিখ সকাল ছ'টাতেই আমাদের বিরাট দল রওনা দিল। ৩ মাইল উৎরাইয়ের পরে চড়াই শুরু হলো। ফরী সীমান্তে এবার সিকিম-পুলিশ নামধাম লিখল। ৫ মাইল চলার পর উৎরাই পাওয়া গেল। ওখানে বড় এলাচের বাগান ছিল। আগে বড় এলাচের ভাণ্ডার ছিল নেপাল, কিন্তু গোর্খারা এখন তাকে নেপালের বাইরের পাহাড়গুলোতেও ছড়িয়ে দিয়েছে। রং-গী-লী বাজারে সাড়ে দশটায় পৌছলাম। নেপালী বৌদ্ধ কাঞ্ছাবাস্তা (বন্দ্য) খুব আদর যত্ন করে খাওয়ালেন। সাড়ে বারোটায় আমরা আবার ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। তিনঘণ্টা পরে লিঙ্-তাঙ্ পৌছে গেলাম। জায়গাটা দেখতে ভারী সুন্দব মনে হলো কিন্তু রাতে পোকা মাকড় ঘুম নষ্ট করে দিল।

সকালে উঠে দেখি বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করার মতো সময় ছিল কোথায়? আমরা সাতটায় বেরিয়ে পড়লাম। সামনে এখন ছিল কেবলই চড়াই আর চড়াই। তিব্বতের বাণিজ্যপথ হওয়ার দরুন এখানে মানুষের আসা-যাওয়া খুব থাকে, তাই মিষ্টি চায়ের দোকান অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। ফদমচন্ (৪ মাইল) অব্দি আমরা সাড়ে চারঘণ্টা হেঁটেই যাই। এখানেই চা-রুটি খাওয়া হলো। এখন আমরা ডাঁড়ের দিকে যাচ্ছিলাম, তাই চড়াই-এর কষ্ট ছিল না। ওইদিন রাতে জ-লুতে গিয়ে থাকি। ওখানেও পোকামাকড়ে ঘুমোতে দেয়নি।

২৫ এপ্রিল ছ'টাতেই রওনা দিই। চড়াই খুব কষ্টের ছিল। প্রথমে ছোট ডাঁড়া (জোত) এলো, ওইখানে পাশে চায়ের দোকান ছিল। গঙ্-চন্-জোদ্-লুঙ্ (কাঞ্চনজঙ্ঘা)-র চূড়া দেখতে পেলাম। বেলা একটায় আমরা নাথঙ্ পৌছলাম। রাজনাথ অন্য নেপালী যাত্রীদের সঙ্গে আগে-আগে যাচ্ছিলেন, তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি। কিন্তু যেই আমি ওখান দিয়ে গেলাম পুলিশ দৌড়ে ডেকে উঠল এবং আমাকে পাশ দেখাতে বলল। পাশ দেখাতে দেখাতে আমি বললাম, 'আমার কাছ থেকেই কেন পাশ চাইছ?' জবাব পেলাম, 'নেপালীদের জন্য পাশ দেখা হয় না।' আমি মনে মনে হাসলাম—রাজনাথ দারুণ নেপালী! যে-সময় আমরা জা-লেপ্-লা পার হচ্ছিলাম, সে-সময় চারদিক ভীষণ মেঘলা ছিল। তাও ভালো যে বরফ পড়ছিল না। জা-লেপ্-লার ডাঁড়াটা ভারত এবং

ভুটানের সীমানা। সামনে কেবলই উৎরাই ছিল। সাড়ে পাঁচটায় গ্যুঁ-থঙ্ পৌঁছলাম আর সেই জায়গাতেই উঠলাম যেখানে আগের বার দেববাহিনীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

আমাদের খচ্চরওলা পদ্মোগঙ্-এর লোক। তাঁর গ্রাম রাস্তা থেকে সরে নদীরও ওপারে অনেক উঁচু জায়গায় ছিল। নিজের গ্রাম হয়ে তাঁর যাওয়ার ছিল। পথে রিন্-ছেন্-গঙ্-এ আমরা চা খেলাম। এখন আমরা বৌদ্ধদের দেশে। কিন্তু এ কেমন বৌদ্ধের দেশ, যেখানে ভূত-প্রেত আর জাদুমন্তর ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে শ্রদ্ধা নেই? স্যাসিমাতে ইংরেজ সৈনিকদের একটা অংশ ছিল। সেখানে আমরা একটা নাগাদ পৌঁছলাম। দেড় মাইল সামনে চলার পর পুল পেরিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। ৩ মাইল যাওয়ার পর ঙোই-ড়ুব আমাদের তাঁর নিজের গ্রাম পদ্মোগঙ্-এ নিয়ে গেল। চুম্-বী (টো-মো) উপত্যকার এটি একটি সুন্দর গ্রাম। চাষের সঙ্গে মাল বওয়াও এখানকার লোকেদের জীবিকা। গ্রামে ষোলোটি পরিবার আছে, যা সব ভাইদের একটাই বিয়ে হওয়ার দরুন সম্ভবত কখনো বাড়তে পারেনি। হয়তো বংশপরম্পরায় অভিব্যক্ত সম্পত্তি এখানে জমা হয়েছে, কিন্তু তিন বছর আগে আগুন লাগায় সমস্ত গ্রাম পুড়ে গেছে। গ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে এক বুড়ো জানালো, এটি দেড়হাজার বছরের পুরনো অর্থাৎ ভুটানের প্রথম সম্রাট স্রোঙ্-চন্-গম্বোরও আগেকার। এত দীর্ঘ সময়ের উল্লেখ তো পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু কোনো জায়গা প্রাগৈতিহাসিকও হতে পারে। হ্যাঁ, এই গ্রামের একটা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ছিল। এরা বোন্‌ধর্ম মানতেন, যা কিনা বৌদ্ধধর্ম আসার আগে ভূত-প্রেত পুজোর চেহারায় এখানে ছিল। গ্রামে বোন্‌ধর্মের দুটি মন্দির আছে। কিন্তু দুটোতেই শাক্যমুনিরও মূর্তি আছে। মন্দিবে বোন্‌ধর্ম সংক্রান্ত কিছু হাতে লেখা বইও আছে, যার মধ্যে বোন্-বুম্ (বোন্‌ধর্মের শতসাহস্রিকা)-এর ষোলোটি বই খুব পুরনো। এতে তালপাতার পুঁথির মতন ছিদ্র রয়েছে আর শতাব্দী-পূর্ব পরিত্যক্ত দকার (দ-দ্রগ)ও আছে। বস্তু, বোন্‌ধর্ম অনেক জিনিস বৌদ্ধধর্ম থেকে নিয়েছে, আর তাই সেই প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগের বোন্‌ধর্ম আর রইল না। আগের দেবালয়টি আরও পুরনো।। এর দরজায় চীনা অক্ষরেও কিছু লেখা আছে, কিন্তু কাঠের ঘরগুলোতে না জানি কতবার আগুন লেগেছে আর হয়তো খুব কম জিনিসই রক্ষা করা গেছে।

২৭ এপ্রিলও এখানে থাকতে হলো। এবারের গ্রীষ্মে 'বিনয়পিটক' হিন্দিতে অনুবাদ করার ছিল, তাই আজ থেকেই সে-কাজ শুরু করলাম।

২৮ এপ্রিল সাড়ে ছ-টায় রওনা দিলাম। আজ ২২ মাইল হেঁটে ফরী-জোঙ্ পৌঁছবার ছিল। দু-মাইল উৎরাই-এর পর টো-মো-গেশের বিহার পাওয়া গেল। টৌ-মো এই শস্যশ্যামল উপত্যকার নাম, যাকে ইংরেজিতে চম্বী বা চুম্বী বলা হয়। টৌ-মো-গেশে অবতারী লামা ছিলেন না কিন্তু তাঁর সিদ্ধাইর খ্যাতি দার্জিলিং এবং কনৌর অব্দি বিস্তৃত ছিল। বারোটার আগেই আমরা বিশ্রামস্থল গো-তে পৌঁছে গেলাম। আজ দিনটি সুন্দর ছিল। আকাশও ছিল নির্মল। আট মাইল আগে থেকেই ফরী এবং ফগ্-রী শিখর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এই সময় এক ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটল। রাজনাথকে আমি আগেই ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'মোটামুটি চড়তে পারি।' আমি

নিশ্চিন্তে ফরীগ্রাম দেখতে-দেখতে এগোচ্ছিলাম। এই সময় আমি পেছনে মুখ ফেরাতেই দেখি রাজনাথের খচ্চর ঢালু মাঠে নিচের দিকে পালাচ্ছে। পঞ্চাশ-ষাট গজ দৌড়বার পর রাজনাথ পড়ে যান। এটি মাল বইবার খচ্চর ছিল, তাই জিনের নিচে গদি এবং রেকাব ছিল না। রেকাবের কাজ চামড়ার ফিতে লাগিয়ে সারা হয়েছিল। একটা পা ফিতেতে আটকে গিয়েছিল। মাদি খচ্চরটা যত ঘুরতে থাকে পা-টাও তত বেশি করে আটকে যেতে থাকে। ভয়ে আমার বুক কাঠ হয়ে গিয়েছিল! কয়েক সেকেন্ডেই এক ভয়ানক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। এমন সময় খচ্চরটা বসে পড়ল। রাজনাথ পরে বলেছিলেন যে, তিনি খচ্চরটার সামনের পা ধরে ফেলেছিলেন। যাহোক্ লোকটা দৌড়ল, পা ছাড়ানো গেল। খচ্চরটাকে ঠিকঠাক করে তাঁকে আবার চড়ানো হলো। আমি আমার খচ্চরের পিঠেই ছিলাম কিন্তু সে সামনে ফরী দেখতে পেয়ে পেছনে ফিরে যেতে চাইছিল না। নামতে চাইলাম তো লাফাতে শুরু করল। রাজনাথ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছেন এতে সন্দেহ নেই। ফরী পৌঁছে ভালো করে শরীর দেখার পর বোঝা গেল হাড়টাড় কিছু ভাঙেনি, কেবল কয়েক জায়গায় চামড়ার ছাল উঠে গেছে। আমার মনে হচ্ছিল যদি খারাপ কিছু হত তবে—'কি মুখ নিয়ে অবধ ফিরে যাবো![1]"

২৮ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত ফরীতে থেকে যেতে হলো। রাজনাথ তো পরের দিন থেকেই তৈরি হয়েছিলেন, কিন্তু এখান থেকে খচ্চরের ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না। কি করা, ফরীই দেখে বেড়ালাম। ইউরোপীয় অভিযাত্রীরা ফরীকে সবচেয়ে নোংরা জায়গা বলেছে। সম্ভবত এ কথায় কিছুটা অতিশয়োক্তি আছে। কিন্তু শহরের ভেতরে এবং বাইরে সর্বত্র ময়লা-আবর্জনা, পায়খানা-পেচ্ছাপ ছড়ানো—যার ওপর দীর্ঘদিনের পুরনো কুকুরের মৃতদেহ পড়ে আছে দেখা যাবে। ১৪০০০ ফিটেরও উঁচু হওয়ার দরুন এখানে বারোমাস ঠাণ্ডার আধিক্য থাকে, তাই মৃতদেহ তাড়াতাড়ি পচেও না। ভারতের সীমা থেকে গ্যাঁচী পর্যন্ত রাস্তা এবং বাংলো ইংরেজ সরকার (ভারত সরকার)-এর তত্ত্বাবধানে। টৌ-মো উপত্যকা থেকে গ্যাঁচী পর্যন্ত সহজেই মোটর চালান যায়। ইংরেজরা দুটি মোটর আনিয়েও ছিল, যা এখানে এখনও গ্যারেজবন্দী ছিল। তাই দেখে খচ্চর আর চমরী গরু ঘাবড়ে যেতে লাগল। ভুটান সরকারের বিরোধিতার সময় থেকে মোটরদুটি গ্যারেজবন্দী।

ফরীতে তো প্রায় বারোমাসই বর্ষা, আর বৃষ্টি হয় বরফ-এর চেহারাতে। হাওয়া এত হালকা যে, ১৫ পা চললেও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। ফরীর পার্শ্ববর্তী পাহাড় পেরিয়ে অর্ধেক দিনে ভুটান পৌঁছনো যায়। ভুটানিরা ফল, শাক এবং চাল বিক্রি করতে এখানে আসে।

খচ্চর পাওয়ার অসুবিধে এখনও ছিল। সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল ধর্মকীর্তির। তাঁর শরীর ভাল ছিল না, তাই আমি চাইছিলাম অন্তত তাঁকে খচ্চরে চড়িয়ে লাসায় পাঠিয়ে দিই। ওদিকে ৫ মে কালিম্পং থেকে তার এলো যে, একশো টাকার চেকটি ভাঙানো যায়নি।

---

[1] *রামচরিত মানস থেকে উদ্ধৃত পংক্তি (জইহৌ অবধ কবন মুঁহ লাঈ)*—স·ম

অর্থাৎ খরচের জন্য আমার কাছে এখন তিনশো টাকাই ছিল। যাহোক, তার জন্য আমি বেশি চিন্তা করছিলাম না। যদিও এখানে থাকার সময় অনুবাদের কাজ চলছিল কিন্তু আমি এখন বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। পোস্টমাস্টার মশায়ের সাহায্যে শেষে ৫ মে চারটি ঘোড়ার ব্যবস্থা হলো। এই সময় ব্রিটিশ ট্রেড এজেন্টের ক্যাপ্টেন হেলিও ওখানে এসে পৌছান। মনে হলো, মিস্টার উইলিয়ামসন তাঁকে চিঠি দিয়েছেন। তিনি চা-পানে নিমন্ত্রণ করলেন এবং বললেন, 'আপনি সরকারী ডাক-বাংলো ব্যবহার করতে পারেন।' আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম যে, ফেরার পথে ব্যবহার করা যাবে—কিন্তু আমার ফেরাটা হলো নেপালের পথ দিয়ে।

লাসায়—৬ মে আমরা ফরী ছাড়লাম। পথে ক্যাপ্টেন হেলির সঙ্গে দেখা হলো, কিন্তু তাঁর আমাদের অনেক আগেই গ্যাচী পৌছাবার ছিল। ফরী থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত আকাশে ঝোলানো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু এই মাঠ চলে গেছে। এখানে সবসময় জোরে হাওয়া বয়। ভাগ্য ভাল, হাওয়া পেছন থেকে আসছিল। হাওয়ার ঠাণ্ডা আটকাবার জন্য আমাদের পর্যাপ্ত কাপড়জামা ছিল, তাছাড়া আগের সপ্তাহ ধরে ফরীর ঠ্যালায় রাজনাথও পাকা হয়ে গিয়েছিলেন। ওইদিন আমরা দুনাগ্রামে আস্তানা নিলাম।

৭ মে রাত দুটোতেই উঠে পড়লাম। থুক্-পা (মাংস সমেত পাতলা লপসী) খেতে খেতে সোয়া চারটে বেজে গেল। রাতের অন্ধকার কেটে কিছুটা ভোরের আলোও দেখা যেতে লাগল। তখন আমরা সেখান থেকে রওনা দিলাম। খুব ঠাণ্ডা ছিল। কোথাও কোথাও শিশিরের মতো বরফ পড়তে দেখলাম। সাড়ে তিনঘণ্টায় ১৪ মাইল চলে আমরা দোজিন্ পৌছ্‌ই। পাশের বিশাল ল্‌হ-ম্‌ছো (দেব-সরোবর) আজ একেবারে শান্ত ছিল। যেখানে-সেখানে হাঁসের কলরব শোনা যাচ্ছিল। সামনে ছিল ফরী-শিখরের অতি সুন্দর দৃশ্য। সাড়ে দশটায় ছ-লূ গ্রামে পৌছে গেলাম, ঘোড়াওলা কিন্তু এলো তিনটেতে। মাঝের দু-তিনটি বসতি থেকে নিরাশ হওয়ার পর সেই রাতে ক-লা-নুব্ গ্রামে থাকার জায়গা পেলাম। ফরী থেকে প্রথম দিন উনিশ মাইল, দ্বিতীয়দিন সতেরো মাইল এবং আজ আটত্রিশ মাইল (৬৭ থেকে ২৯তম মাইল পর্যন্ত) এলাম। ওই দিন খঙ্-মর গ্রামে থাকতে হলো। ডে-পুঙ্ বিহারের অবতারী লামার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, যার ফলে থাকার ভালো জায়গা পাওয়া গেল। এখন গ্যাচী ২৯ মাইল দূরে ছিল।

৯ মে সাড়ে চারটেতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মাঝপথে দু-ঘণ্টা চা খাওয়া এবং বিশ্রামে খরচ করে পৌনে চারটেতে গ্যাচী পৌছে গেলাম।

গ্যাচী ছিল নিশ্চিন্ত হওয়ার জায়গা। ধর্মমান সাহুর দোকানের এখানে একটি শাখা ছিল। ওঁর সুপুত্র জ্ঞানমান সাহু সোজা লাসা আসার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। গ্যাচী ছিল ভাবত সরকারের অধীনে বিশ্বাসযোগ্য শেষ ডাকঘর। চারদিন গ্যাচীতে থাকি, কিন্তু দিনগুলো নষ্ট হতে দিইনি। 'বিনয়পিটক' অনুবাদের কাজও চলতে লাগল, সঙ্গে চলল গ্যাচির পুরনো বিহার ভালো করে দেখা। এগারোই মে আমি গুম্বা (বিহার) দেখতে গেলাম। আগের যাত্রাতেও দেখেছিলাম কিন্তু তখন ঠিকমতো চোখ খোলেনি।

উপাসনাগারের ধারে তিনদিকে তিনটি সুন্দর মন্দির আছে। প্রধান মন্দিরে আছে বুদ্ধের মূর্তি। ডানদিকের মন্দিরটি আরও পুরনো মনে হয়। ওখানে নাথত্রয় (মঞ্জুঘোষ, একাদশমুখ অবলোকিতেশ্বর এবং বজ্রপাণি)-এর মূর্তি আছে।

বাঁ দিকের চারটি মূর্তির মধ্যে কোণের মূর্তিটি আচার্য শান্ত রক্ষিতের। তার নাক উঁচু এবং তোতা পাখির মতোও। অন্যগুলো ভুটানের তিন ধর্মরাজা— শ্রোঙ্-চন্-গম্বো, খ্রী-শ্রোঙ্-দে-চন্ এবং রল্-পা-চন্-এর মূর্তি। এখানকার ভিত্তিচিত্রও ভারি সুন্দর। এই দেবালয় নিশ্চয়ই ছয়-সাতশো বছরের এদিকে হবে না। জনশ্রুতি আছে, এই দেবালয় ধর্মরাজা রব্-তন্-কৈ-জন তৈরি করিয়েছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে। গুম্বার স্তূপও অসাধারণ। এতে অনেক ভিত্তিচিত্র আছে। স্তূপের পাশের এক মঠে চোঙ্-খ-পার মেধাবী শিষ্য খস্-গ্রুব্ (১৩৮৫-১৪৩৮) থাকতেন। একটা সিন্দুকের ভেতরে মূর্তির সঙ্গে তাঁর হাতের বহু জিনিস বন্ধ আছে। এই বিহারে স-স্ক-য়-পা, বু-স্তোন্-পা এবং গে-লুক্-পা তিন সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা একত্রে থাকে।

১৩ মে আমরা গ্যাঁচী ছাড়তে পারলাম। আজও এক জায়গায় ভিক্ষু ধর্মালোকের খচ্চরটি ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়, যা দেখে রাজনাথের খচ্চরটিও দুলে উঠে তাঁকে ফেলে দেয়। বস্তুত রাজনাথ মহাকর্ষের ভরসাতেই খচ্চরের পিঠে চড়তেন। আমার ভীষণ চিন্তা হতে লাগল। তিনি হাঁটতে পারছিলেন না, আর তিব্বতী খচ্চর তাঁর উপযুক্ত ছিল না—একটা রোগা-পটকা খচ্চরও তাঁর পক্ষে বাঘ হয়ে যাচ্ছিল। আর এবার তো খচ্চরটা তাঁকে পাথরের ওপর ফেলে দিয়েছিল। বুকেব বাঁদিকে এবং হাঁটুতে চোট লাগে। বুক অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। তিনি কিছুক্ষণ মূর্চ্ছিত থাকেন। কোনো রকমে ২২ মাইল পথ চলে ওইদিন স-ল-গঙ্ গ্রামে আস্তানা নিই। গ্রামের ধনীব্যক্তির বাড়িতে জায়গা পাওয়া গেল। এখন 'কার্তিক'-এর ভিড় ছিল, মজুর এবং কাজের লোকে ঘর ভরে ছিল। অভ্যর্থনা তো হলো, ভূত-ভবিষ্যতের অনেক কথারও জিজ্ঞাসাবাদ চলতে লাগল। লামা, আবার সে যদি ভারতীয় লামা হয় এবং ভাগ্যের কথা বলতে না পারে, তবে সে কেমন লামা?

এখন আর এক সমস্যা উপস্থিত হলো। ধর্মালোকজী পুরনো ধাঁচের লোক ছিলেন, দুনিয়ার খবর জানতেন না আর কথা বলতেন সাধাসিধে। রাজনাথ ছিলেন নবযুবক, এ বছরই এম·এ-তে প্রথম হয়েছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে কিছু ঠাট্টা তামাসা করছিলেন। প্রথমে তো ধর্মালোকজী কিছু বুঝতে পারতেন না, কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলেন, তারপর থেকে তাঁর নবীন সহযাত্রীর মুখ দেখতেই ঘৃণা হতো। ওই দিন দ্বিতীয়বার রাজনাথ মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু ধর্মালোকজী ওষুধ লাগাতে অস্বীকার করলেন। আমাদের বিরাট যাত্রী দলটা মহাদেবের ছোটখাটো পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোনরকমে সামলিয়ে তো নিয়ে যেতে হতো। ১৪ মে আমাদের পথ চলা থামেনি। রাজনাথ একেবারে মনমরা ছিলেন, কারণ চোট তো ছিলই, তার ওপর উদ্যমও কম ছিল। তিনি ছিলেনও কাঁচের বাসনের মতো। তাঁকে খুব সামলিয়ে নিয়ে যাওয়ার ছিল এবং একটা সাধাসিধে ঘোড়া কিনে কালিম্পং ফিরিয়ে দেওয়ারও কথা

ছিল। ধর্মালোকজী আজ সারাটা দিন হেঁটে আসেন এবং সাড়ে চারটার সময় জ-রার বিশ্রামাগারে পৌঁছে নিজের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তবে হ্যাঁ, তিনি রাজনাথের সঙ্গে কথা বলতে রাজি ছিলেন না।

জ-রার ডাঁড়া আমরা কালই পেরিয়ে এসেছিলাম। আজ (১৫ মে) এগারোটায় নঙ্-কর-চে পৌঁছাই। এখানে খচ্চর পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু সামনে ন্যম্-পা-সী-পো-ওত্ (নন্‌পা-শিবা)-তে ছু-শিঙ্-শা (ধর্মমান সাহুর দোকানের নাম)-এর মাল পাঠাবার এজেন্ট থাকতো। তার নামে চিঠিও ছিল। তাই আরো তিন মাইল চলার পর ওখানে পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে ফগ্-গ্রুব্ (ফগ্-ডুপ্)-এর ঐতিহাসিক বিহার সামনের দিকে কিন্তু দূরে দেখা যাচ্ছিল। তিব্বতের এটাই একটা বিহার, যেখানে স্ত্রী অবতারী লামা আছেন তাঁকে বজ্রবারাহী-র অবতার ভাবা হয়। বর্তমানে তিনি পুজো-ধ্যানে ব্যস্ত ছিলেন, তাই আমরা ওখানে যাওয়ার উৎসাহ দেখাইনি।

১৬ মে আমরা উম-ডোক্ সরোবরের পার ধরে ধরে এগিয়ে গেলাম। এই জায়গাটি প্রায় ফরীর মতো উঁচু। এক জায়গায় জংলী গোলাপের ঝাড় পেলাম, কিন্তু ওখানে এখন বসন্ত আসেনি আর তাই গাছ এখনও নিষ্পত্র ছিল। ওই দিন ২০ মাইলেরও বেশি চলার পর রাতে ঠমা-লুঙ্ গ্রামে থাকলাম।

১৭ মে খম্-বার উঁচু ডাঁড়া পার হওয়ার ছিল। চড়াই-দেড় মাইলের বেশি ছিল না, কিন্তু খুব কঠিন ছিল। পরে ৫ মাইল উৎরাই গিয়ে সাড়ে আটটায় আমরা খম্-বাকচে গ্রামে গিয়ে চা খেলাম এবং বিশ্রাম নিলাম। সোয়া বারোটায় আমরা ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে পৌঁছাই। চা-সম্-ছু-বো-রী নামের পবিত্র পর্বত পাশেই ছিল। লোকেরা দণ্ডবত (ভুঁইপরী) করতে করতে পরিক্রমা করে থাকে। ধর্মালোকজী বলছিলেন যে, এই পর্বত তিব্বতের নয় ভারতের, একে ওখান থেকে আনা হয়েছে। আমি বললাম, 'এটা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। পুরাণকালে পর্বত উড়তো।'

'আচ্ছা, ডানা হতো নাকি?'

'হ্যাঁ, ডানা হতো।'

'ব্রাহ্মণদের পুরাণে লেখা আছে যে, ইন্দ্র এর ডানা কেটে দেয়, তখন থেকে বেচারি ডানাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে আছে।'

'তাহলে, ওই সময় থেকে পর্বত এসে থাকবে?'

'তাই, নাহলে এত বড় পর্বতকে কে এখানে তুলে আনতো?'

আমি হনুমানজীর কথা বললাম না। এটা অবশ্য বলেছি যে, সে-সময় মানুষের জীবন বড় সংকটপূর্ণ ছিল। পাহাড়ের ওপর কত-কত পাথর এদিক ওদিক পড়ে থাকতো। উড়ন্ত পাহাড় থেকে যখন-তখন নিশ্চয়ই কিছু নিচে পড়ত, আর মাঠে কাজ করছে এমন কোনো চাষী তার নিচে চাপা পড়ত, কোনো গোচারণকারী গরু চরাতে চরাতে প্রাণ বলি দিত। ধর্মালোকজী জানালেন যে, এই পবিত্র পর্বতের ধারে ১০৮টি বিহার আছে। কিন্তু ওখানে পরিক্রমা করার উৎসাহ কারুরই ছিল না।

ব্রহ্মপুত্র আমরা নৌকা করে পেরোলাম এবং আড়াইটার সময় ছু-সুর্ পৌঁছলাম।

এখানের মাঠে কিছু কিছু ফসল ফলে ছিল। লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) উপত্যকার গাছ ছিল নতুন পাতায় সজ্জিত।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নির্বাণস্থল ছিল নেথঙ্-এর কাছে তারামন্দিরে। ওটা আমার দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। ১৮ মে পাঁচটায় রওনা দিলাম। পথে মধ্যাহ্নভোজনের পর বারোটায় তারামন্দির পৌছাই। এটা মূল সড়ক থেকে কিছুটা দূরে ছিল। একটা খাঁচার মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পাত্র, দণ্ড, ধর্মকরক এবং তারার ছোট মূর্তি বন্ধ করা আছে। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে সরকারি সীল দেওয়া ছিল, তাই খোলার উপায় ছিল না। এই পবিত্র জিনিসগুলো দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। এগুলো একসময় সেই মহাপুরুষের হাতে ছিল, যিনি বার্ধক্যকে উপেক্ষা করে, দেশের সুখ এবং সম্মানকে পদাঘাত করে, দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়কে উপেক্ষা করে ভারতের বার্তা এখানে পৌছে দিয়েছিলেন। মন্দিরে কিছু পিতলের স্তূপ আছে। পূজারী বললেন যে, প্রথমটাতে দীপঙ্করের শিষ্য ডোম্-তোন্-এর কাপড়, দ্বিতীয়টায় সিদ্ধ নারোপা (নাড়পাদ)-এর হৃৎপিণ্ড এবং অন্যগুলোতে 'অষ্টসাহস্রিকা'র বই আছে। মন্দিরে তারার ২১টি পিতলের মূর্তি ছাড়াও আরও কিছু মূর্তি আছে। হাতে লেখা ভোটিয়া গ্রন্থের ছড়ানো-ছেটানো পাতা ডাঁই করা ছিল, যার মধ্যে কিছু পাতা 'অষ্টসাহস্রিকা'র এবং 'শতসাহস্রিকা'র ছিল। এরপর অমিতায়ুর মন্দিরে গেলাম। দীপঙ্কর এখানেই থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই মন্দির তৈরি হয়। মূর্তির পেছন দিকের মকর-তোরণ বলে দিচ্ছিল যে, এটা খুব পুরনো। বাইরে দুটো স্তূপ ছিল, যার ডানদিকেরটায় ডোম্-তোন্ আর বাঁ দিকেরটায় দীপঙ্করের ঘোড়ার জিন রাখা আছে।

আজই লাসায় পৌছনো যেত, কিন্তু ঘোড়াওলা গঙ্ গ্রামে থেকে গেল।

লাসায়—১৯ মে সাড়ে পাঁচটায় রওনা দিলাম। ঠি-সম্-এর বড় পুলটি এখন সারানো হচ্ছিল। মাঠে এখন বোনার কাজ খুব চলছিল। গাছ সব সবুজ পাতপালায় ভরে ছিল। ধর্মালোকজী এক দুরারোহ পাথরখণ্ড দেখিয়ে বলছিলেন যে, এর ছিদ্রমধ্যে গুহ্যেশ্বরী দেবী বিরাজ করছেন। ডে-পুঙ্কে বাঁয়ে এবং দালাই লামার উদ্যান নোর্বু-লিঙ্-কাকে ডাইনে রেখে আমরা পোতলা রাজপ্রাসাদের সামনে এলাম। লাসার লোকেরা বোধহয় অনেকদিন পর পীতবস্ত্র ভারতীয় ভিক্ষুকে দেখছিল। সবাই নিজের জ্ঞান দেখাতে বল্-পো (নেপালী) লামা বলছিল। সাড়ে তিনটেয় আমরা লাসায় আমাদের অতিথি-সেবক পুণ্যাত্মা ধর্মমান সাহুর দোকান ছু-শিঙ্-শাতে পৌছলাম। জ্ঞানমান সাহু প্রাণ খুলে অভ্যর্থনা জানালেন। পথের সব কষ্ট ভুলে গেলাম।

আমার এবারকার যাত্রা বিশেষ করে সংস্কৃত বই-এর খোঁজেই হয়েছিল। 'তিব্বতমে বৌদ্ধধর্ম' লেখার সময় যখন আমি ভোটিয়া গ্রন্থের পাতা ওলটাই, তখন বিশ্বাস হয়ে গেল যে, ভারত থেকে যাওয়া কয়েক হাজার তালাপাতার পুঁথির মধ্যে কিছু নিশ্চয়ই ওখানে থাকবে। খাওয়া-দাওয়ার পর টেলিগ্রাফ অফিসের অফিসার কুশো-তন্-দর-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অনেকক্ষণ কথা হলো। আমি তাঁকে বললাম, 'সক্যা এবং

মণ্ডোর-এর বিহারে সংস্কৃত বই থাকতে পারে, কিন্তু ওগুলোর ওপরে সরকারী সীল থাকবে।' তিনি বললেন, 'তবে ওগুলো খোলার জন্য ভুটান সরকারের অনুমতিপত্র নিতে হবে।' আমি ভাবলাম, দেখি কতটা সফল হওয়া যায়। এখন ছিল পবিত্র বৈশাখ মাস, ভুটানে এটাকে 'স-গ-দাবা' বলা হয়। লাসার কেন্দ্রে আছে তিব্বতের সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে পবিত্র জো-খঙ্-এর মন্দির। দর্শন এবং পরিক্রমার জন্য শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের ভিড় ছিল। কত লোক পঞ্চকোশী করছিল। আমিও দর্শনের জন্য গেলাম।

এখন আমার প্রধান কাজ ছিল সংস্কৃত বই খোঁজার ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া। কিন্তু তার আগে 'বিনয়পিটক'-এর অনুবাদের কাজ শেষ করা এবং রাজনাথকে ঠিকঠাক ফেরত পাঠাবার কাজ করার ছিল। ১৯ মে থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত লাসাতেই থাকার ছিল,.কাজেই সময়ের অভাব ছিল না। কিন্তু কাজ রোজই কিছু কিছু করলে তবেই না হয়? আমি পরদিন থেকেই কাজে হাত দিলাম।

১৩ মে ১৯৩৩-এ দালাই লামার মৃত্যু হয়। তাঁর বিশেষ কৃপাপাত্ররা বেশি কুনজরে পড়ে। বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মহাসেনাপতি লুঙ্-শরকে ধরে জেলে পোরা হয়। ২০ মে খবর রটে যে উপুড় করে এবং পিঠে পাথরের বোঝা চাপিয়ে ওঁর দুটো চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে এবং রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য গরম তেল ঢালা হয়েছে। আর একজন কৃপাপাত্র এবং সবিশেষ প্রভাবশালী কুম্ভেলাকেও কোথাও নির্বাসিত করা হয়েছে।

যাক, আমার তো নিজের কাজ নিয়ে দরকার, ওখানকার রাজনীতির চিন্তা করে কোনো লাভ ছিল না। জানতে পারলাম, মুরু বিহারে গোলোগ্-গেশে নামের এক খুব বিদ্বান ব্যক্তি আছেন যাঁর দেশের বিশিষ্ট লোকেদের ওপর প্রভাব আছে। ২০ তারিখ আমি তাঁর কাছে পৌঁছই। আমি দর্শনের কিছু অপ্রচলিত বই-এর নাম করি, দেখলাম তিনি সেগুলো জানেন। ইতিহাস বিষয়েও তাঁর অনেক কিছু জানা ছিল। হাতে লেখা সংস্কৃত বই খোঁজার ব্যাপারে তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। যখন শুনলেন যে ভারত থেকে অধিকাংশ সংস্কৃত বই লুপ্ত হয়ে গেছে, তখন নিজেই প্রস্তাব দেন যে কিছু তিব্বতী বিদ্বান ব্যক্তি সংস্কৃত পড়ুক এবং তেমনি ভারতীয় বিদ্বদজন ভোটিয়া পড়ুক—তারপর দুজনে মিলে আবার তিব্বতী বই-এর অনুবাদ করুক। তাঁর কথা থেকে আমার আশা যথেষ্ট বেড়ে গেল।

'বিনয়পিটক' অনুবাদের কাজ তো চলছিলই। ২০ মে থেকে 'সাম্যবাদহী কিউঁ?' লেখার কাজে হাত দিলাম এবং ঐদিনই এক অধ্যায় শেষও করে ফেললাম।

২১ মে আমার পরিচিত ভূতপূর্ব ঠী-রিন্‌পো-ছে (গদীঘর)-এর কাছে গেলাম। তিনি এখন খুব বুড়ো হয়ে পড়েছিলেন। চোখে ভাল দেখতেও পেতেন না। তবুও আগের মতোই তিনি প্রায় ঘণ্টাখানেক স্নেহভরে কথা বললেন।

আমার লেখার কাজ শেষ করে বই-এর পেছনে লেগে পড়ার কথা ছিল, অথচ দেখা করার লোকেদের থেকে নিষ্কৃতি ছিল না। আমার তো নিজের ঘুম নষ্ট করেও কাজের লক্ষ্যমাত্রা পুরো করা ছিল জরুরি। রোববার আমি লেখার কাজ বন্ধ রাখতাম। বলে বলে লেখাবার সময় রাজনাথজী কেবল লেখার কাজে সুবিধেই করে দিতেন না, বরং তাতে

কাজের পরিমাণও বেড়ে যেত। ২৪ মে চোখ লালচে হয়ে এলো—দেবতা বাধা দিতে চাইছেন না তো? আজ প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে দেখি তিন-চারজন লোক চিত্রপট দেখিয়ে বুদ্ধের জীবন এবং জাতকের বিষয়ে বলছে। এবার ভুটান আর ভারত দুয়েরই বৈশাখী পূর্ণিমা একসঙ্গে পড়ছিল, না হলে অনেক মাস একসঙ্গে না হওয়ায় তা আগে-পরে পড়তো।

২৫ মে নেপালী রাজদূত আমার সম্পর্কে বিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি নেপালী প্রজার এখানে উঠেছিলাম, কাজেই এটা তাঁর অনধিকার চর্চা ছিল না। তিনি জানতে চাইছিলেন, আমি কি কাজে এসেছি। আগের দালাই লামার সবচেয়ে কৃপাপাত্র মহাসেনাপতি লুঙ্-শর আর উপ-দালাই লামা কুন্-বে-লা এখন খুবই বিপদে পড়েছিলেন। যখন তাঁদের ক্ষমতা ছিল তখন হয়ত ভালো-মন্দ সবরকম কাজই কবেছেন। তিব্বতে সংবাদপত্রের কাজ করে গুজব, আর তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গণ-সংগীত। আজকাল এই দুটোকে নিয়ে গান বানিয়ে বাজারে গাওয়া হচ্ছিল।

২৬ মে মোঙ্গল-বিদ্বান গোন্-কর-ক্যব-এর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি ভুটান এবং মঙ্গোলিয়ার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক হিসাবে গণ্য ছিলেন। গেশে-তন্-দর সে-বা গুম্বাতে ছিলেন। ২৭ মে তাঁর নিমন্ত্রণে সে-রা দেখতে গেলাম। সে-রা তিব্বতের দ্বিতীয় নালন্দা, প্রথমটি হলো ডে-পুঙ্। সম্-লো ছাত্রাবাসের খ-ল-খা-মী-ছঙ্-তে তাঁরই কাছে ছিলাম। আজ ছিল শাক্যমুনির জন্ম এবং নির্বাণের তিথি—বৈশাখী পূর্ণিমা। ড-সঙ্ (মহাবিদ্যালয়)-এর ঘরগুলোতে ভিক্ষুদের খুব ভিড় ছিল। স্মদ্ ড-সঙ্-এর মেরামতি চলছিল। দেয়ালগুলোতে ছিল সুন্দর ভিত্তি-চিত্র। পলেস্তরা খসানো হচ্ছিল। নতুন পলেস্তরার ওপর আবার নতুন করে ছবি আঁকা হবে। তিব্বতেব মঠগুলোতে অতি কষ্টে দশ শতাংশ শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী ভিক্ষু দেখতে পাওয়া যাবে, বাকি সবাই ধর্মের কলঙ্ক। ওই দিনই সন্ধেয় আমরা লাসা ফিরে আসি।

২৮ মে লাসাতে বৈশাখী পূর্ণিমা পালন করা হয়েছিল আর তা সে-রা গুম্বাতে ছিল কাল। বাজার একবকম বন্ধ ছিল। লোকজনের ভীষণ ভিড ছিল। পোতলার প্রধান মন্দিরে তো যাওয়া খুবই দুষ্কর ছিল। আগেকার দলাই লামার মৃতদেহটি যেখানে রাখা আছে সেই স্তূপটি দেখলাম। সোয়া একবছর আগে মৃত দালাই লামাব স্তূপটি তৈরি করা হচ্ছিল। যারা কাজ করছে তাদেরকে বিনে পয়সায় ধরে আনা হয়েছিল, তারা লোকজনদের কাছ থেকে বখশিশ চেয়ে পেট চালাচ্ছিল। রেডিঙ্ লামা বর্তমানে দালাই লামার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। এখন তাঁর বাজনীতির বলি হতে চোদ্দ বছর দেরি ছিল। আজ তাঁর গাড়ি খুব ধুমধাম করে বেরিয়েছিল। লোকেরা পঞ্চকোশী করছিল। অনেক নেপালী ভক্ত তো বাজনা বাজিয়ে সঙ্গে পরিক্রমা করছিল।

আমাদের অতিথি-সেবক জ্ঞানমান সাহু বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর খচ্চরও যাচ্ছিল। রাজনাথকে ফেরৎ পাঠাবার এর থেকে ভালো সুযোগ আর পাওয়া যেত না। রাজনাথ যদিও রাস্তার কষ্ট কিছুটা ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ভালভাবেই জানতাম যে পরে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় তাঁকে সামলিয়ে নিয়ে যেতে খুব মুশকিলে

পড়তে হবে। ৬ তারিখ রাতে সাহুজীর বিদায়-ভোজ হলো। মদ, সারসপাখির ডিম এবং মাছকে শুভ বলে ধরা হয়। গৃহভৃত্যরা এবং বন্ধুরা খা-তা(মালার বদলে রেশমী চিট) গলায় পরিয়ে দিল। বাচ্চা চীনা কুকুর মোতিও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিল, তার গলায়ও খা-তার মালা পরানো হল। রাজনাথ লাসাতে ২০ দিন রইলেন, কিন্তু তাঁর জিনিসপত্র দেখার খুব একটা শখ ছিল না। এটা ঠিক, আমার লেখার কাজে তিনি খুব পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর যাওয়ার সময় 'বিনয়পিটক'-এর অনুবাদের অতি সামান্যই বাকি থেকে গিয়েছিল। তিনি সঙ্গে থাকলে অবশ্যই খুব সাহায্য পাওয়া যেত। কিন্তু রাস্তায় দুটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, যা থেকে তিনি ব্রাহ্মণীর সিঁদুরের জোরেই বেঁচে গিয়েছিলেনন। আমি তাই আর তাঁর সিঁদুর মোছার পাপে নিজেকে জড়াতে চাইছিলাম না।

৭ জুন রাজনাথ এবং জ্ঞানমান সাহু ভারতের উদ্দেশে রওনা দিলেন। ভিক্ষু ধর্মালোকে লাসা পৌঁছেই অন্য জায়গায় থাকতে চলে গেলেন। এখন আমি আমার ঘরে একলা ছিলাম। আমার ঘরের একটা দরজা রান্না ঘরের দিকে খুলত, অন্যটা বন্ধ ছিল, কারণ ওদিকের ঘরে কাদিরভাই (তিব্বতী মা আর কাশ্মীরী বাবার সন্তান থাকতেন। দিনের অনেকটা সময় যারা আমার কাছে আসা-যাওয়া করতো, তাদের দিতে হতো। সেই সময়টা রাত জেগে পুষিয়ে নিতে হতো। কখনো-কখনো তো রাত দুটো হয়ে যেত।

ঘরে একা-একা কদিন কেটে গেল। একদিন কাদিরভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'লামাজী! আপনি অনেক রাত অব্দি জাগেন, কিছু দেখতে পাননি তো?' দেখতে পাওয়ার মানে এড়িয়ে গিয়ে বলি, 'দেখতে পাওয়ার কথা কি জিজ্ঞেস করছেন কাদিরভাই? রাত বারোটা বাজতে না বাজতেই আমার ঘরে তিল রাখার জায়গা থাকে না।'

কাদির ভাই এর স্ত্রী কদিজা (বিয়ের পরের মুসলমানী নাম) বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল এবং ব্যাপারটা গম্ভীর হচ্ছে দেখে সাহুর সত্তর বছরের রাঁধুনি অচা-চেঙাও থমকে দাঁড়ায়। কাদির ভাই বললেন, 'কি, দশ-বারোটা?'

আমি বললাম, 'আরে দশ-বারোটা নয়। আমার বিছানা বাদ দিয়ে পুরো ঘরটায়, কেবল মাটিতে নয় শূন্যেও—শুধু ভূত-পেত্নীই দেখতে পাওয়া যায়।'

'কাজে বাঁধা দেয় না?'

'একেবারে না, ওরা বড় ভাল মানুষ। কেউ কথা বলতে চাইলেও অন্যেরা ইশারা করে থামিয়ে দেয়। এমন ভালমানুষ তো আমার কাছে যারা দিনে আসে তাদের মধ্যেও থাকে না।'

কদিজা মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'না লামাজী! এতো কি করে হবে?'

আমি বললাম, 'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? রাত একটায় কেবল জানলা খোলার অপেক্ষা। বলতো দর্শন দেবার জন্য তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই?'

কদিজার এত সাহস কি করে হয়? ও বিড়বিড় করে বলল, 'ক্ষমা, ক্ষমা করুন লামাজী! আমার ঘরে পাঠাবেন না। আমি কখনো আওয়াজ শুনিনি, তাই বলছিলাম।'

আমি বললাম, 'এমনিতে আওয়াজ হয় না। কিন্তু শোয়ার সময় আমি খুব করুণ আওয়াজ শুনতে পাই।'

সবার কান খাড়া হয়ে গেল। কাদির ভাই বললেন, 'করুণ আওয়াজ!' অচা-চেঙা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল, 'আরে, সেই নেপালী, যে এই ঘরে নিজের গলা কেটে মরে ছিল।'

আমার এটা জানা ছিল না। আমি এখন তাতে আরো নুন-লঙ্কা লাগাই। মেয়েদেরও বিশ্বাস বেড়ে গেল এবং রাতের জন্য ভয়ও হতে লাগল। কাদিরভাই-এর বড় মেয়েও এরমধ্যে এসে পৌঁচেছে। ও বলল,'আর এখানে ঝুল-বারান্দায়, উঠোনো তো কিছু দেখা যাচ্ছে না?' আমি বললাম, 'ঝুল-বারান্দার কথা আলাদা। আমি তো তোমার ঘরের ভেতর থেকে একটা সাদা দাড়িওলাকে বেরোতে দেখতে পাচ্ছি।' শ্রোতাদের মধ্যে কেউ বলে উঠল, 'সিঙ্পা, সিঙ্পা!'

আমি সামলিয়ে নিলাম। দাড়িওলা আমি কাদিরভাই-এর বাবার কথা ভেবে বলেছিলাম। তিনি কাশ্মীরী মুসলমান ছিলেন। কিন্তু সেঙ্পা প্রায় একশো বছর আগে কাশ্মীর-তিব্বতের লড়াইয়ে ধরা পড়া সিংহদের শিখ বা রাজপুত বলা হতো। আমি আমার ভূতকে শিখ-পোশাক পরিয়ে দিলাম। মনে হলো, সত্যিসত্যিই এক সিঙ্-পা সেই ঘরে অনেক বছর থেকেছে। বেচারি তরুণীটি খুব ঘাবড়ে যেতে লাগল। উঠোন সম্পর্কে আরো কিছু বলতে গিয়ে আমি বলি, 'এই ঝুল-বারান্দায় তো সব জায়গাতেই ওটাই দেখা যায়, আর নিচে উঠোনে তো নববর্ষের মতো নাচের আসর জমে ওঠে।'

অচা-চেঙা আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বলল, 'না, লামাজী। আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন।' 'তার মানে মিছিমিছি ভয় পাওয়াচ্ছি? তাহলে রাত ১টায় নিজের দরজা খুলে দেখে নিচ্ছ না কেন? বলতো দু-চারটাকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিই?'

অচা-চেঙা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'না লামা! কু-চি, কু-চি (ক্ষমা, ক্ষমা) আমি মরে যাবো। আমি এমনিই বলছিলাম, আপনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন।'

'হ্যাঁ, আমি দেখি। ওরা এখানে খুব ভিড় করে থাকে, আমাকে সবাই পথ করে দেয়। আমি তো এমন ভালমানুষ ভূত পৃথিবীর কোথাও দেখিনি।'

ঘটনাক্রমে দুটো ব্যাপার সত্যি হয়ে গিয়েছিল। তাই এখন আমার কথা ওদের বিশ্বাস হবে না কেন? আর এই মজার কথা বলে আমি কি তাদের মিথ্যে বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিচ্ছিলামও। ওখানে তো এর সমুদ্র পড়ে ছিল। অতিরঞ্জন এই জন্য করছিলাম যাতে শ্রদ্ধার কোমল সুতো অধিক টানে ছিঁড়ে যায়।

আমি বন্ধুদের তালপাতার বই খোঁজার জন্যও বলে রেখেছিলাম। একদিন মাঘ (শিশুপালবধ) কাব্যের ওপর ভবদত্তর টীকা 'তত্ত্বকৌমুদী' এলো। বইটি খণ্ডিত আর তার মৈথিলী লিপি দু-তিনশো বছরের বেশি পুরনো ছিল না। ওর সঙ্গে কোনো এক ব্যাকরণ বই-এর দু-চারটে পাতা ছিল। টীকায়-কাশীর জগদ্ধরেরও নাম ছিল। অমর এবং বিশ্ব এই দুই কোষের যথেষ্ট উদাহরণ ছিল। অলঙ্কারে দণ্ডী এবং ছন্দের ক্ষেত্রে শ্রুতবোধের প্রমাণ দেওয়া হয়েছিল।

৮ জুন 'অভিসময়লাঙ্কার' এর ওপর বুদ্ধশ্রীজ্ঞান বিরচিত 'প্রজ্ঞাপ্রদীপাবলি' নামক বইটি আসে। এটা দর্শনের বই আর এখন এটা কোথাও ছাপা ছিল না। মালিক বইটা

বিক্রি করতে চাইছিল না, তাই আমি ওটাকে টুকে নেব স্থির করলাম। এই বইটি জ্ঞানমানসিং এনেছিলেন। তিনি আরও বই পাওয়ার কথা বললেন, আমারও বিশ্বাস এখন বাড়তে লাগল।

আমি জেনেছিলাম, রেডিঙ্ বিহারে কিছু তালপাতার বই আছে এই বিহারটি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিষ্য ডোম্-তান-পা একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈরি করিয়েছিলেন এবং ওখানকার বড় লামাই এখন ভুটানের স্থলাভিষিক্ত রাজা ছিলেন। ১০ জুন আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেড়ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা হতে লাগল। তিনি বললেন, 'যেখানেই দরকার হবে আমি চিঠি লিখে দেবো।' নিজের বিহারের তালপুঁথি সম্বন্ধে বললেন যে সেটা অর্ধেক জ্বলে গেছে।

লাসা ভীষণ ঠাণ্ডা জায়গা। ওখানকার লোকেরা তো বছরের পর বছর করাটা প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু আমার কি এত সাহস ছিল? হপ্তায় একদিন চান আমি জরুরি মনে করতাম। এজন্য অনুকূল স্থান ছিল শো-গঙ্ (সুর-খঙ্) রাজভবন। শো-গঙ্ বংশ অর্থ এবং ভূমি দুটোতেই তিব্বতের সবচেয়ে বড় সামন্ত বংশ। বাবা এক বেশ্যার জন্য বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দু-ছেলে উচ্চপদের সরকারি কর্মচারি। (১৯৪৯-তে বড় ছেলে তিব্বত সরকারের এক মন্ত্রী আর দ্বিতীয় জন জেনারেল)। দুজনই কুমার ছিলেন এবং তাঁদের মাতা ছিলেন অতি মধুর স্বভাবের। তাঁরা আমাকে সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। রবিবার আমি কাজ বন্ধ রাখতাম এবং ঐদিন ওঁদের প্রাসাদে চান করতে যেতাম। উঠোনে একটা বড় তামার বাসনে গরম জল রাখা থাকতো আর আমি সাবান মেখে চান করতাম। বাড়ির গৃহকর্ত্রী ছিলেন ল্হা-চম্ (দেবী-ভট্টারিকা)। তিনি স্রোঙ্-চন ধর্মরাজ বংশের মেয়ে। এই বংশের সামন্তের আজও তিব্বতে যথেষ্ট সম্মান। তাঁর কাছে 'তের্-গী-এর ব্লকে ছাপা কন্-জুর এসেছিল। 'তের-গী-এর ছাপা সবচাইতে সুন্দর মনে করা হয়। আমার বলাতে তিনি দিতে রাজি হয়েছিলেন, দাম হাজারের কাছাকাছি ছিল আর বোঝা ছিল সাড়ে তিন খচ্চরের মতো। আমি ওই সুপাঠ্য কন্জুরকে পাটনা নিয়ে আসি, কিন্তু 'ল্যাংটোর দেশে ধোপার কি কাজ'? আমার কাছে পয়সা ছিল কোথায় যে নিজের জন্য কিনে নিতাম? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জানতে পেরে তাড়াতাড়ি ডঃ বাগচীকে পাঠায় আর বই ওখানে চলে যায়।

আমাদের থাকাকালীন তের-গী-থৈজি (তের-গি-এর রাজা সাহেব) চলে এলেন। জানতে পারলাম ওঁর কাছে তালাপাতার পুথির ৪০০ পাতা আছে। পরে দেখে বুঝতে পারলাম যে ওটা হচ্ছে 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'-র কিছু অংশ, যা দুর্লভ বস্তু নয়।

দিনে ব্যাঘাত হলে আমি রাতে লিখে কাজ পুরো করতে চাইছিলাম কিন্তু ছার এবং পোকামাকড়ের মতো দানব যজ্ঞতে বাধা দেওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত ছিল। ১৩ জুন একটা ব্যাপার হলো। আমার এক সিংহলী বন্ধু ভিক্ষু ধর্মরত্ন দার্জিলিং অথবা কলকাতা থেকে তার করেন—'ভীষণ গুরুতর ব্যাপার। আপনার উপস্থিতি আবশ্যক, সত্বর চলে আসুন'। যমের ডাক পেলেও আমি কি ওখানকার কাজ ছেড়ে চলে আসতাম? তার পাঠাবার সময় হয়ত মনে হয়েছিল যে আমি কোথায়ও রেল লাইনের ওপরে বসে আছি।

শ্যাটা-কুশো সদ্য-সদ্য মন্ত্রী হয়েছিলেন, তখনো কাজ শুরু করতে পারেননি, এরই মধ্যে মৃত্যু এসে ধরে ফেললো। দানধ্যানের কিছু পয়সা আর একটা খাতা আমার কাছেও এলো। এটা ভালো লক্ষণ ছিল, কেননা বড় জায়গার পরিচয়েই বন্ধ জায়গার দরজা আমার জন্য খুলে যেত। শো-গঙ্-এর কুমার (বর্তমানে জেনারেল শো-গঙ)-ও আমার জন্য চেষ্টা করছিলেন। তিনি খবর দিলেন যে কুন্-দে-লিঙ্ বিহারে কিছু তালপাতার পুঁথি আছে। ১৮ জুন ওঁর সঙ্গে আমি' কুন্-দে-লিঙ্ গেলাম। ডেঙ্-পঙ্-এর গেশে-শে রব্-এর সঙ্গেও ওখানে দেখা হলো। ওঁর মতো পণ্ডিত সারা তিব্বতে দু-চার জনই পাওয়া যাবে। ভোটিয়াশাস্ত্রে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগর, চান্দ্র ব্যাকরণও[1] তাঁর মুখস্ত ছিল। কিন্তু সংস্কৃত পড়ার অবসর পাননি। তিনি জোর দিয়ে বলছিলেন যে 'গুরু' শব্দের দ্বিবচন 'গুরবৌ' হয়, এবং ভারতে চ, ছ, জ নয়, বরঞ্চ চ্, ছ্, জ্ বলা হয়ে থাকে। কথা বলার সময় তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূর্খতায় কখনো হাসি আসত আবার কখনো-বা বিরক্তি। কিন্তু সেদিন থেকেই আমাদের বন্ধুত্বের শুরু হয়ে গেল এবং পরে তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যান। কুন্-দে-লিঙ্ লামার তিনি অধ্যাপক ছিলেন তাই তালপাতার পুঁথি দেখতে অসুবিধে হয়নি। এর মধ্যে দুটি পুঁথি অষ্টসাহস্রিকার ছিল, যা ছাপা হয়ে গেছে। একটি পুঁথি রঞ্জন-অক্ষরের, যেটা গে-শের কথা অনুযায়ী আসল আচার্য নাগার্জুনের হাতের ছিল। হ্যাঁ আর একটি অমূল্য পুঁথি দেখতে পেলাম। সেটি ধর্মকীর্তির 'বাদন্যায়'-এর ওপর শান্তরক্ষিতের টীকা। আমি পরে তার ফটো নিই। সেই যাত্রায়ই ঙোর-বিহারে আসলটিও পেয়েছিলাম আর কিছুদিন পরে আমি তো প্রকাশিতও করেছিলাম।

ভুটান সরকারের কাছ থেকে চিঠি নেওয়াটা খুব দরকারি ছিল আর সেজন্য যে-যে জায়গা থেকে সুপারিশ করা সম্ভব ছিল আমি সেটা করাচ্ছিলাম। চার মন্ত্রীর মধ্যে ভিক্ষুমন্ত্রী (ক-লোন্ লামা)-র প্রশংসা শুনেছিলাম। তাঁর কাছে গেলাম। তিনি খুব উৎসাহ দেখালেন, কিন্তু পরের হপ্তায়ই তিনি মারা যান। ১৯ জুন গো-লোগ্-গেশে-র কাছে গেলাম। গো-লোগ্-গেশে খোঁড়া ছিলেন। লোকে বলে যে বসে বসে একভাবে নিয়মিত খুব পড়াশোনা এবং চিন্তা করার জন্যই তাঁর এই দশা হয়েছে। তিনি যে স্বাধ্যায়শীল ব্যক্তি এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি বড় জায়গায় সুপারিশ করার প্রতশ্রুতি দিলেন।

২০ জুন প্রথমবার ডে-পুঙ্-এর অমদো চিত্রশিল্পীর সঙ্গে দেখা হয়। গে-শে ধর্মবর্দ্ধনের (গেদুন-ছোম্‌ফেল) পরিচয় সেদিন এই নামেই করানো হয়েছিল। তখন আমার জানা ছিল না যে, এই রোগাপটকা সাদাসিধে লোকটি একজন ভোটিয়া-সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত, কুশলী চিত্রশিল্পী, উচ্চশ্রেণীর কবি এবং উদারচেতা আদর্শবাদী পুরুষ। তখন থেকে কয়েক বছর ধর্মবর্দ্ধন আমার সঙ্গে থাকেন এবং আমি তাঁর আরো বেশি প্রশংসাকারী হয়ে পড়ি। আমার খুব চিন্তা হলো, যখন ১৯৪৮-এ জানতে পারলাম যে, ভুটান সরকার স্বাধীন বিচারের জন্য তাঁকে জেলবন্দী করেছে। জানুয়ারি (১৯৪৯) জেনারেল শো-গঙ্-এর মুখে তাঁর মুক্তির খবর পেয়ে তবেই আমার চিন্তা থেকে আমিও

[1] চন্দ্রগোমী প্রবর্তিত পাণিনির পরবর্তী যুগের সংস্কৃত ব্যাকরণ।—স·ম·

মুক্তি পেয়েছিলাম। প্রথম দিন কথাবার্তা হলো। ধর্মবর্দ্ধন যে আমাদের সঙ্গে আসবেন তার কোনো আভাসও ছিল না। আমি আমার ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'সাহিত্য সম্পর্কেও জানেন, প্রমাণবার্তিক ভালো করে পড়েছেন। সারস্বতেরও অনেক সূত্র স্মরণে আছে। কাজেই তিনি নিছক চিত্রশিল্পী নন। ভারত চলতে চাইছে। সম্-য়ে-এর যাত্রায় তাঁকে সঙ্গে নিয়েই চলি না কেন?'

২২ জুন ডাক পেলাম এবং আমি তালপুঁথির জন্য কুন্-দে-লিঙ্ গেলাম। ওখানে একটি বই সদ্ধর্মপুণ্ডরীকেরও ছিল। যা মহারাজ বিজয়পালদেবের সময়ে লেখা হয়েছিল আর বাদন্যায়টিকা লেখা হয় কুটলাক্ষরে নেপাল মহারাজ আনন্দদেবের সময়ে। বইটির প্রকৃত অধিকারীর নাম ছুরি দিয়ে চেঁচে মুছে দেওয়া হয়েছিল। কুন্-দে-লিঙ্ বিহারের পুস্তকাগারে ভোটিয়া পণ্ডিতদের কিছু অপ্রকাশিত জীবনীও আছে। আসলে এই সব পুরনো বিহারে খুঁজলে না জানি কত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এবং কলার নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে।

২৮ জুন আমি লিখেছিলাম—'লাসাতে মানুষের পরই সবচেয়ে বেশি সংখ্যা সম্ভবত কুকুরের।' মানুষের সঙ্গে কুকুরের রেষারেষি কোথায়? এখানে তো পুরো বাড়িতে একজন স্ত্রী থাকে, তাই সন্তানও সীমিত আর অন্যদিকে এরকম কোনো বাধা নিষেধ নেই, অসুখ-বিসুখে মারা গেলে যদিবা কিছু সংখ্যা কমে। এই কুকুরগুলো গরিবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কাপড়জামা ভালো হলে কিছু বলে না। রাস্তা তো আসলে প্রধান মন্দির পরিক্রমাই তাই দোকানদারদের নিজেদের দরজা পরিষ্কার করতেই হয়। বাড়ির পেছন দিকের নোংরা অবস্থার কথা না বলাই ভালো। যদি এটি নিচের কোনো শহর হতো, তাহলে এখানে সবসময়ের জন্য কলেরা লেগে থাকত।

জুনের শেষের দিকে বিনয়পিটকের অনুবাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার একটা বড় যজ্ঞ শেষ করার ফলে বেশ একটা নিশ্চিন্ততা এসে গিয়েছিল, ফলে এখন যেখানে-সেখানে যাবার ছুটিও ছিল। মৃত দলাই লামার সর্বেসর্বা কুশো-কুন্-বে-লা কোনো এক দূর গ্রামে নজরবন্দী ছিলেন। আর তাঁর বহু বছরের সঞ্চিত সম্পদ নিলাম হচ্ছিল। হয়তো তার মধ্যে কোনো পুঁথি বা মূর্তি আছে একথা ভেবে আমি ৬ জুলাই নোর্বুলিঙ্কা গেলাম। নিলামের জিনিস দলাই লামার আস্তাবলে রাখা ছিল। ভাল জিনিসগুলো অফিসাররা বোধহয় আগেই তুলে নিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আর এখানে কিভাবে আসবে? জিজ্ঞাসা করে জানলাম এগুলো বিক্রি হয়ে যাবার পরে আরো জিনিস আসবে। ফেরার সময় জানা গেল, রেডিঙ লামার প্রাসাদে ল্হা-রম্-পা যাঁরা হবেন তাঁদের মধ্যে বিতর্ক হচ্ছে। ভুটান সরকার প্রতি বছর ১৬ জন বিদ্বানকে এই পদবী প্রদান করেন, যা কিনা বিদ্যার সর্বোচ্চ পদবী (ডক্টর বা আচার্য)। তিনটি বড় বড় বিহার (ডে-পুঙ্, সে-রা, গন্-দন্)-এর ছাত্ররাই শুধু মাত্র এই পরীক্ষায় সামিল হতে পারে। পরীক্ষা বিতর্কের মাধ্যমে নেওয়া হয়। এটা তিন বৎসরে শেষ হয়। আজকে শেষ বছরের পরীক্ষার্থীরা বিতর্ক করছিল। এখানে শুধু বিতর্কই হতো না, যথেষ্ট খেলাধুলোও হতো। বাদী কখনও গলার মালাটাকে টেনে বাণ ছোঁড়ার মুদ্রা ধারণ করে। কখনও চাদর

কোমরে জড়িয়ে পাঁয়তারা করে। তালি বাজানো আর বাঁদরের মতো ভেঙচি কেটে হাসাও এই বিতর্কের একটি অঙ্গ ছিল। তিব্বতের বিদ্বানদের বক্তব্য ছিল যে এই সব মুদ্রাই ভারত থেকে এসেছে। আমি ওখানে শুধু বিতর্ক দেখতেই গিয়েছিলাম, কিন্তু ভৃত্যটি ভাবলো মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। মালিক 'সময় নেই' বলে পাঠালেন, অবশ্য তা অনুচিত কাজ হয়নি।

১২ জুলাই আমি ডে-পুঙ্ বিহারে গেলাম। লুম্-বুঙ্ গেশে শেরব খুব খুশি হয়ে দেখা করলেন আর সাড়ে-নটার থেকে ৪টা পর্যন্ত দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হতে লাগল। এখানকার পড়াশোনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, অক্ষর জ্ঞানের আরম্ভ ৬ বছরের পর থেকেই শুরু হয়। তারপর দু-বছরের সাধারণ পাঠ, পরে আরো চার বছর 'শ্বেত—রক্ত-রঙ্' পড়ানো হয়। এটা কোনো চিত্রকরের বিদ্যা নয়। 'লাল-সাদা নয়। সাদা-লাল নয়' যেমন ন্যায়শাস্ত্রের গোড়ার কথা সেইভাবেই শেখান হয়। এই ভাবে ৬ বছর পড়ার পর প্রমাণবার্তিক শুরু হয়, যেটা শেষ করতে ৫ বছর লাগে। তারপর অন্যান্য দর্শন আর ধর্মপুস্তকের জন্য দরকার ২৩টা বছর। এইভাবে ২৭ বছর পড়ার পর সে ল্হা-রম্-পা-এর প্রার্থী হতে পারে। এর পরীক্ষা বিতর্কের রূপে তিন বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৬ জনকে প্রতি বছর ল্হা-রম্-পা বানানো হয়। সে যদি কোনো ধনী অবতারী লামা হয়, তাহলে তার পক্ষে লহা-রম্-পা হওয়া খুব কষ্টকর নয়। সেদিন লো-সলিঙ্ আর গো-মঙ্-এর মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীবা বিনয়সূত্রের ওপর বিতর্ক করছিল। আমি তামাশা দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু নিজেই তামাশা হযে গেলাম—সবাই আমাকেই দেখতে লাগল। রাতে ডে-পুঙ্-তেই থেকে যেতে হলো। পরের দিন (১৩ জুলাই) বিকেল সোয়া তিনটে পর্যন্ত ওখানেই রইলাম আর ডে-পুঙ্-এর ভিন্ন-ভিন্ন মহাবিদ্যালয় আর ছাত্রাবাসগুলোকে দেখে বেড়ালাম। শুনে দুঃখ হলো যে, আমার প্রথম যাত্রার সাথী মোঙ্গল ভিক্ষু সুমতিপ্রজ্ঞ দু-বছর আগেই মারা গেছেন। বুরয়ত ভিক্ষু প্রজ্ঞোপায়ও আর ওখানে ছিলেন না। গেশে শেরব্-এর সাথে আজো কথা হলো। তার কাছে শুনলাম—কুন্-দে লিঙ্-এর মতো কিছু বিহারে লী-চ-বা (ভোটিয়া অনুবাদে)-এর কিছু জীবনী রাখা আছে। ভুটানের ইতিহাসের না-জানি কত অমূল্য সম্পদ এই সব পুরাতন বিহারে পড়ে থেকে পচে যাচ্ছে।

লাসাতে এখন আর আমার অন্য কোনো কাজ ছিল না। সরকারের কাছ থেকে একটা চিঠি নেবার প্রয়োজন ছিল—যাতে একদিকে মোহরকরা কুঠরীগুলো খুলে বইপত্র দেখার সুবিধে পাওয়া যায় আর অন্যদিকে বহনকারী ঘোড়া সহজেই পাওয়া যায়। কখনও আশা জাগত যে, চিঠি তাড়াতাড়িই পেয়ে যাব, আবার কখনও নিরাশও হতাম। গো-লোগ্ গেশেও আমার জন্য কষ্ট করছিলেন। ১৮ জুলাই তিনি ভুটান সরকারের এক মন্ত্রী, থী-মোন্সাপে-র সাথে আমার সাক্ষাৎ করালেন। তিনিও ভারতে বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে বোঝালেন আর আমিও বললাম। মন্ত্রী রায় দিলেন যে, ক-শাক্ (মন্ত্রীসভা) -এর কাছে আবেদনপত্র দিয়ে লোঙ্-ছেন্ (মহামন্ত্রী) আর অন্য একজন মন্ত্রীর সাথেও দেখা করে নেওয়া উচিত। আগে আমার লাসার উত্তরদিকে যাত্রা করার

ছিল, তার জন্য তো চিঠি পাবার সম্ভাবনা ছিল না। আবেদনপত্র লেখার কাজের দায়িত্ব শো-গঙ্ (ক্ষুর-খণ্ড) কুমার নিয়ে নিলেন।

২০ জুলাই আমি গো-লোগ্ গেশে-কে নিয়ে ভুটানের মহামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম। বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর মহামন্ত্রীজী দর্শন দিলেন। তিনি মন্ত্রীসভার কাছে আবেদন করবার অনুমতি দিলেন।

লাসার এক তরুণ চিত্রকর এখন সাহুর জন্য ছবি তৈরি করছিল। আমি তার কাছ থেকে ভুটানে চিত্রকলার উপকরণ আর শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা জানলাম। পরে সেই নিয়ে একটা লেখাও লিখেছিলাম।

অনেক জায়গাতেই তালপাতার পুঁথি রয়েছে বলে খবরা-খবর পাওয়া যাচ্ছিল। যার ৩০ শতাংশই আমি অসম্ভব বলে মনে করতাম, তবুও কিছু কিছু জায়গায় এর থাকার সম্ভাবনা ছিল। সিকিমে লামা ওর্গ্যেন জানিয়েছিলেন যে, সম্-য়ে বিহারে সরকারী মোহর-ছাপের এক্তিয়ারে কিছু তালপুঁথি বন্দী হয়ে আছে। মিন-ডো-লিঙ্ বিহারেও চারটি পুঁথি থাকার সম্ভাবনা ছিল। ঙোর আর স-স্ক্যা-এর সম্বন্ধে তো অনেকেই বলেছিলেন। কিন্তু এখন তো আমার লাসা থেকে উত্তরের দিকে যাওয়ার ছিল, যেখানে কেবল রেডিঙ্-তেই থাকার সম্ভাবনা ছিল। ২৮ জুলাই রেডিঙ্ লামা তাদের অফিসারের জন্য চিঠি লিখে দিলেন। সিকিমের মহারানীও তাঁর ভাই র-ক-সা-কুশের কাছ থেকে একটি চিঠি তগ্-লুঙ্ গুম্বার জন্য লিখিয়ে দিলেন। সঙ্গে যাবার জন্য লাসার নেপালী ফটোগ্রাফার নাতিলাও তৈরি হলো। গেশে ধর্মবর্ধনও ২৭ তারিখে আমার কাছে চলে এলেন। চড়ে যাবার জন্য ছু-শিঙ্-শা নিজের খচ্চর দিয়ে দিলেন।

রেডিঙ্-র দিকে—১৯ মে থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাসাতে থাকতে থাকতে 'বিনয়পিটক'-এর হিন্দি অনুবাদ আর 'সাম্যবাদ হী ক্যোঁ?' লেখার অনেকটা কাজই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন আমার সেই সব গুম্বাগুলোতে যাবার দরকার ছিল যেখানে ভারত থেকে আনা সংস্কৃত তালপাতার পুস্তকগুলো ছিল। আমি খবর পেয়েছিলাম যে, রেডিঙ্ গুম্বাতে দীপংকর শ্রীজ্ঞানের স্বহস্তে লিখিত তালপাতার কিছু পুস্তক আছে। রেডিঙ্ লামা এখন দলাই লামার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। আমি তাঁর সাথে দেখা করলাম। জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে এক বাণ্ডিল গ্রন্থ আছে কিন্তু আগুন লাগায় কোনোসময় তার সামান্য অংশ পুড়ে গিয়েছিল। কি গ্রন্থ ছিল, সে বিষয়ে তিনি আর কি বলতে পারতেন? যদি ওগুলো দীপংকরের সহস্তে লিখিত গ্রন্থই হয় তাহলে তা ধর্ম, দর্শন, তন্ত্র যেকোনো বিষয়ের উপরেই হতে পারে। যদি দীপংকর শিষ্য ডোম-তোন-পা-র হস্ত-লিখিত গ্রন্থ হয় তাহলে তন্ত্র বা সিদ্ধির দোহা বিষয়ক পুস্তক হবার সম্ভাবনাই বেশি। কিছু তো বটেই, আমি সেগুলোকেই দেখতে উৎসুক ছিলাম। আমি ভুটান সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম যে, পুরাতন গ্রন্থসমূহ, চিত্রপট ইত্যাদির ওপরে যেখানে-যেখানে সরকারী মোহর পড়েছে সেগুলো আমাকে দেখার অনুমতি দেওয়া হোক। সাথেসাথে বাহন হিসেবে ঘোড়া আর খচ্চর পাবারও অনুমতি দেওয়া হোক। সারা পৃথিবীতে সরকারী

দপ্তরের কাজকর্ম ভীষণ ঢিমেতালে হয়, তাতে ভুটান সরকারের কাজকর্ম তো আরোই ধীরে ধীরে হয়। সেই ১৯৩৪-এর আবেদনপত্রের স্বীকৃতি চারবছর বাদে ১৯৩৮ সালে পেলাম, যখন আমি চতুর্থবার মধ্য তিব্বতে গিয়েছি। এতে অবশ্য ভুটান সরকারের কোনো দোষ ছিল না। তাড়াতাড়ি সরকারী জবাব পাবার কোনো আশা ছিল না। রেডিঙ্-রিন্-পোছে (রেডিঙ্ লামা)-এর কাছ থেকে আমি তাঁর মঠের জন্য চিঠি চাইলাম, যাতে আমি সেখানে সংগৃহীত যাবতীয় ভারতীয় পুস্তক আর চিত্রপটগুলোকে দেখতে পারি। তিনি একটি চিঠি দিলেন। খচ্চরের সমস্যা ছু-শিঙ্-শা-এর মালিক জ্ঞানমানসাহু নিজের খচ্চর দিয়ে মিটিয়ে দিলেন। একজন ফটোগ্রাফারের প্রয়োজন ছিল। লাসার নেপালী ফটোগ্রাফার নাতীলা (লক্ষ্মীরত্ন) সঙ্গে যেতে রাজি হলো। আমি মোঙ্গলভিক্ষু ধর্মকীর্তি আর অমদো-র শিল্পী পণ্ডিত ধর্মবর্ধন (গেন্-দুন্-ছোম্ফেল্)-কে সাথে নিয়ে যেতে চাইছিলাম। ধর্মকীর্তি ধর্মবর্ধনের সাথে যেতে রাজি হলেন না আর ধর্মবর্ধন নিজের গুম্বা (ডে-পুঙ্) ছেড়ে চলে এসেছিলেন। তাই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া জরুরি ছিল। ·এবার আমরা তিনজন সঙ্গী ছিলাম। চতুর্থজন ছিল সোনাম্-গ্যন্জে ছু-শিঙ্-শা-এর খচ্চরওলা।

৩০ জুলাই একটি খচ্চরের পিঠে জিনিসপত্র আর বাকি তিনটি খচ্চরের পিঠে চড়ে আমরা তিনজন সাড়ে নটার সময় লাসা থেকে রওনা হলাম। ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছিল। দু-মাইল পরে তব্‌চী-র টাঁকশাল পাওয়া গেল। আমরা সবুজ-সবুজ খেতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলাম। তারপর ডানদিকের উপত্যকা ছেড়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরলাম। ৫ মাইল পর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘর পেলাম। সামনে একটি পরিত্যক্ত গ্রাম ছিল। তারপর আসল চড়াই শুরু হয়েছিল। দেড়টার সময় গোলা-জোতের ওপরে পৌঁছলাম। সেখান থেকে উৎরাই ছিল, তবে কঠিন ছিল না। সাড়ে ৪টার সময় আমরা পায়া গ্রামে পৌঁছলাম। এক কৃষকের বাড়িতে উঠলাম।

আমরা জানতাম না যে লঙ্থঙ্ গুম্বা মাত্র দুমাইল সামনেই আছে। তাহলে কালকেই ওখানে পৌঁছে যেতাম। কন্-পো-এর বিস্তীর্ণ উপত্যকা সামনে পড়ল। পুরনো গুম্বাগুলোর মতো লঙ্থঙ্ গুম্বাও সমতলভূমির ওপরে। লঙ্সঙ্পা দোরজে-সেঙ্গে একজন অত্যন্ত বিনয়ী ভিক্ষু ছিলেন। বাইরে থেকে দেখলে গুম্বাকে একেবারে দরিদ্র মনে হতো, পূজারীও দরিদ্র শ্রেণীর, ভেতরের জিনিসপত্রও অগোছাল রাখা আছে। কিন্তু কিছু অত্যন্ত সুন্দর ভারতীয় মূর্তি রয়েছে। মৈত্রেয় আর বুদ্ধের মূর্তি পিতলের।

ভারতীয় যোগী ফদম্প সেঙ্গে-র মাটির মূর্তিটিকে অনেক পুরনো বলেই মনে হয়। পুস্তকাদির মধ্যে লঙ্য়ঙ্পা-র সময়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা' খুব সুন্দর। আমরা কত জিনিসের ফটো তুললাম। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করলাম আর ১২টার সময় সামনের দিকে রওনা দিলাম। দু ঘণ্টা চলার পর আমরা নালন্দা বিহারে পৌঁছলাম। ভারতের নালন্দার নামে পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভে এই বিহার বানান হয়েছিল। বর্ষার জন্য সব পাহাড়েই সবুজ ঘাস জন্মেছিল, যদিও তা খুব ছোট ছিল, কিন্তু দূর থেকে দেখলে আরোই ছোট লাগত। নালন্দার জন্য খুব ভালো জায়গাই পছন্দ করা হয়েছিল।

এটি উপত্যকার একটু ওপরে ঢালু মাঠে স্থাপিত। গুম্বার কাছে গাছও অনেক আছে। চু-ল্হ্-খঙ্ সবচেয়ে পুরনো মন্দির। এটি সক্যাপা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত রোঙ-স্তোন্ বানিয়ে ছিলেন। এখানকার ভিক্ষুরা আমার কাজে সবরকমের সাহায্য করেছিল। থাকার জায়গা দিয়েছিল। লাসাতে খুব তাড়াতাড়ি উকুন জন্মায়, কিন্তু কে জানে কেন কন্‌পো-তে উকুন একেবারেই দেখা যায় না।

পরের দিন (১ আগস্ট) আমরা ৮টার সময় রওনা হলাম। মেঘ ছিল। কিন্তু তিব্বতে বর্ষাকে খুব কম ভয় লাগে। বাঁদিকে ঘুরে আমরা একটা ছোট জোত (ডাঁড়া) পার হলাম। রাস্তা বেশিটাই পশ্চিমদিকে ছিল। দুটো জায়গায় দুটো নদী পার হতে হলো। পাহাড়ের ওপর কয়েকটি ঘর জুড়ে দুটো বিহার পেলাম। তারপর সেই নদীকে আবার পার হয়ে পাছব্ গ্রামে পৌছলাম। পুরনো অনুবাদকদের (লোচবা) মধ্যে পাছব্ ঞিমঙগ্ খুবই বড় বিদ্বান ছিলেন। তিনি কয়েক ডজন গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। বলা হয়, এই গ্রাম সেই বিদ্বানের জন্মভূমি। লোচবা বিহার পাহাড়ের কিনারার গ্রাম থেকে একটু সরে গিয়ে। কোনো পুরনো ইমারত নেই। একটা স্তূপ আছে, বলা হয়, এর ভিতরে লোচবার দেহ আছে। বর্তমানে, এখানে একটি ভিক্ষু-বিহার আছে, যাতে ২০, ২৫ জন ভিক্ষুণী বাস করে। এই জায়গাটা নালন্দা থেকে বারো মাইল দূরে। বেলা ১২টার সময় আবার আমরা সামনের দিকে রওনা হলাম। এখান থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে গিয়ে খুব পুরনো বিহার গ্যল্‌হখঙ্ পেলাম। এখানে দোরিঙ (পাষাণ-স্তম্ভ) আর পুরনো ধরনের স্তূপ দেখলে মনে হয়, আমরা অষ্টম বা নবম শতাব্দীর কোনো মঠে এসে পড়েছি। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই বিহারটিকে তিব্বতের অশোক সম্রাট ঠি-স্রোঙ বানিয়ে ছিলেন। পাষাণ-স্তম্ভ চতুর্ভুজাকার, যার পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে বজ্র, যুগলপদ্ম, পদ্ম আর রত্ন বানানো রয়েছে। সবচেয়ে পুরনো মন্দির বোধ হয় মৈত্রেয়র। এখানে হস্তলিখিত তিনটি কন্-জুর তন্-জুর আছে। এই পুরনো বিহারগুলোতে এত বেশি বই দান করা রয়েছে যে, কতগুলো বই তো কয়েকশো বছর হয়ে গেছে, খোলাই হয়নি। দাতারা নিজেদের গ্রন্থের ওপর নাম আর দেশ-কালও লিখে দিতেন। এই সব লেখা থেকে তিব্বতের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যেতে পারে, তিব্বত নিজের ইতিহাস (সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক) আর ভারতের ইতিহাসের না-জানি কত সামগ্রী নিজের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তার রহস্যের উদ্ঘাটন কে করতে পারবে? একথা ঠিক, তিব্বত আমাদের থেকে চার পাঁচশো বছর পিছিয়ে আছে, কিন্তু তার এমন ক্ষমতা আছে যে. পুরনো বাধাগুলোকে সরিয়ে ফেললে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সে আমাদের থেকে অন্তত একশো বছর এগিয়ে যাবে। যাই হোক, তিব্বত আর ভারতের ইতিহাস প্রেমিকদের খুব উৎসাহ নিয়ে ততদিন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হবে, যখন তিব্বতের শত শত বিহারের হাজার বছরের জমান এই লক্ষ পুঁথির আবরণ ভেঙে তার বিবরণসহ সূচিপত্র তৈরি করা হবে।

আমরা মৈত্রেয়র বিশাল মন্দিরে উঠলাম। এই মন্দিরে কিছু পুরনো মূর্তিও ছিল। অন্যান্য মন্দিরে কিছু পুরনো মূর্তি আর চিত্রপট আছে। এখানে তোয় এবং মে নামে দুটো

ড-সঙ্ (কলেজ) আছে যেখানে এক সময় নিয়ম করে পড়ান হতো। কিন্তু আজকাল আর এখানে পড়াবার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই। পাষাণ-স্তম্ভের ওপর পুরনো লিপি লেখা আছে। মৈত্রেয়মন্দিরে কতগুলো পুঁথি আবর্জনার মাঝে পড়ে রয়েছে। পূজারীকে বলায় তিনি শতসাহস্রীর একটি পুঁথি (ফ·) দিয়ে দিলেন। ওটা এনে আমি পাটনা মিউজিয়ামে রেখে দিয়েছিলাম। এর অক্ষরগুলো পুরনো, তবে ত্রয়োদশ শতকের পরেরেই। শুরুতে বুদ্ধের দুটো চিত্র আছে।

পরের দিন ২ আগস্ট ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। চা খেয়ে আমরা সামনের দিকে রওনা হলাম। দুটো ছোট জোত পার হয়ে আমরা দুপুরের পরে শরবুম্পা বিহারে পৌঁছলাম। দীপংকর শ্রীজ্ঞানের শিষ্য ডোম্-তোন্-পা, তাঁর শিষ্য গেশে শর্‌বা, যিনি দ্বাদশ শতকে হয়েছিলেন। তন্ত্রমন্ত্রের ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি ছিলেন তার্কিক ও দার্শনিক। মানুষ তাঁর জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করত, কিন্তু তন্ত্রমন্ত্র, দেবদেবীকে না মানায় এটাও সবাই বিশ্বাস করত যে তিনি মরে নরকে গিয়েছেন। এখানে শর্‌বার স্তূপ আছে। মূর্তি এমন কিছু পুরনো নয়, কিন্তু স্তূপের ভেতরে পুরনো মাহাত্ম্যপূর্ণ জিনিস থাকতে পারে। এখন এখানে সত্তর, আশিজন ভিক্ষুণী আছেন, তাঁরাই পুজারিনী। তীর্থ করার জন্য যাত্রীরা এখানে প্রায়ই আসেন।

আমরা দর্শন আর ভোজন করবার পর আড়াইটার সময় সামনের রাস্তা ধরলাম। চড়াই ধরে একটা জোত পার হলাম। আবার কিছুটা উৎরাই এল। তারপর রাস্তা সমতল ভূমিতে এসে পড়ল। ৫টার সময় আমরা ফন্দাগ্রামে পৌঁছলাম, এক গরিব চাষীর ঘরে উঠলাম। এই গ্রামে সব গরিবদের বাস। কাছেই স্নেউ-সুর্-এর স্তূপ।

পরের দিন আমরা আবার সামনের রাস্তা ধরলাম। এখানকার পাহাড়ে কয়েকটা ঝোপ-ঝাড় দেখা গেল, যাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল গোলাপের। একটা ভাঙা পুল পার হয়েই চড়াও শুরু হলো, কিন্তু খুব কঠিন চড়াই শেষের দেড়-দুমাইলই ছিল। চারদিকেই কালো কালো চমরি গাই চরে বেড়াচ্ছিল। একটা কস্তুরীমৃগকেও পালাতে দেখলাম। সোয়া তিনঘণ্টা চলবার পর ছ-লা জোতে এসে পৌঁছলাম। এই জোতে ডাকাতদেরই খুব ভয় ছিল। কিন্তু আমাদের কাছে কয়েকটি পিস্তল আর একটা রাইফেল ছিল, এই জন্য ডাকাতদের সাবধানে আমাদের দিকে দৃষ্টি দিতে হতো। লাসা থেকে বেরুবার সময় নাতীলা (ফটোগ্রাফার) পিস্তল না রাখার জন্য খুব জেদ করেছিল, বলছিল, 'আমার পিস্তলের দরকার নেই। আমার কাছে মি-টি-কূ (স্মৃতিজ্ঞানকীর্তির বানানো মাটির ছোট মূর্তি) আছে। তিব্বতীদের বিশ্বাস, যার কাছে মি-টি-কূ আছে তার শরীরে গুলি একেবারেই কিছু করতে পারে না। আমি তাকে বললাম, 'পিস্তল দাও, মি-টি-কূর ওপর দুটো গুলি চালিয়ে পরীক্ষা করে নি। যদি ও না ভাঙে তাহলে তোমার পিস্তল নিয়ে ঘুরবার কোনো দরকার হবে না।' নাতীলা এতে রাজি ছিল না। একটি পিস্তল ওর সাথেও বেঁধে দেয়া হলো। তবে সন্দেহ ছিল যে, প্রয়োজনে সে সেই পিস্তল ব্যবহার করবে কিনা। যাইহোক, দর্শকের তো মনে হবে যে তিনজন সওয়ারের কাছে তিনটি পিস্তল আছে।

উৎরাই একটু বেশি কঠিন ছিল। দু ঘণ্টা নামবার পর বাঁ দিকে পাহাড়ের পিঠ ধরে আমরা তগলুঙ্ নদীর উপত্যকায় এলাম। নামবার সময় ধর্মবর্দ্ধন তাঁর নিজের খচ্চরের লাগাম ছেড়ে দিলেন। সেও লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে লাগাম ছিঁড়ে ফেলল। এরকমটা আজ দ্বিতীয়বার হলো। সোনাম্- গ্যন্জে রেগে আগুন হয়ে গেলেন। আর শেষে ধর্মবর্দ্ধনের রাগ গিয়ে পড়ল খচ্চরের ওপরে। দেড় মাইল যাবার পর তগল্যুঙ্ বিহার পাওয়া গেল। এটাও সমতলভূমির ওপরেই। পুরনো বিহার খুবই বিশাল এবং তার ছাদও উঁচু আর থামগুলো বড় বড় ছিল। এখানেও বিপুল সংখ্যক পুরনো গ্রন্থগুলোকে দেওয়ালের গায়ে তাক বানিয়ে রাখা হয়েছিল। সিকিমের মহারাজার শালা রক্সাকুশের চিঠি এনেছিলাম, তবু আমরা থাকার জন্য খুব খারাপ জায়গা পেলাম। এখন আমরা প্রতীক্ষা করছিলাম, কিন্তু খচ্চরগুলোর আসতে দেরি হচ্ছিল। অনেকক্ষণ বাদে সোনাম্-গ্যন্জে খচ্চরদের নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, 'আমি সঙ্গে যাব না, লাসা ফিরে যাব।' আমরা কত করে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি মানলেন না এবং ফুন্দোর দিকে চলে গেলেন। এবার আমাদের আর একটি চিন্তা এলো—পাঁচ-পাঁচটি খচ্চরকে বাধা, খাওয়ানো, পায়খানা করানো সহজ কাজ ছিল না। আমাদের তিনজনের মধ্যে কেউই কখনও এমন কাজ শিখি নি। খচ্চরগুলোকে বেঁধে দিলাম। আমরা তুগ্লুঙ্-এর এই বড গুম্বার মন্দিরগুলোকে দর্শন করলাম। বিশাল পিতলের মূর্তি দেখলাম। এই বিহারকে একাদশ শতাব্দীতে স্থাপন করা হয়েছে। এর একটি মন্দিরের ওপর চীনের ঢঙে তৈরি সোনালি ছাত আছে।

রাতে আমরা অনেক ছোটাছুটি করে দুটি লোককে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য রাজি করলাম।

পরের দিন ৪ আগস্ট। তখনও একটু অন্ধকারই ছিল। সোনাম্-গ্যন্জে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। সোনাম্-গ্যন্জে মধ্য তিব্বতের নন। বরং চীন সীমান্তের ওপারে খম্প্রদেশের লোক ছিলেন আর এমন হিংস্র গোষ্ঠীর, যেখানে কোনো তরুণের পক্ষে দুটো খুন করা অপমানের ব্যাপার। ওখানে ছোট ছোট ছেলেরা মাংসের টুকরো হাতে নিয়ে তলোয়ার দিয়ে কাটার খেলা খেলে। ওরা নিজেদের প্রাণের পরোয়া যেমন করে না, তেমনি অপরের প্রাণ নিতেও এতটুকু ইতস্তত করে না। এরা একেবারেই স্বাধীনচেতা হয়ে থাকে। মালিককেও বকাবকি করতে ছাড়ে না। পাশাপাশি এদের গুণও আছে। এরা চোর, মিথ্যেবাদী আর বেইমান হয় না। যা করবার দরকার, সোজাসুজিই করে থাকে। বাঁকা-টেরা চাল-চলন এদের জানা নেই। আর একবার বিশ্বাস করে ফেললে বন্ধুর জন্য জীবন বিসর্জন দেয়া এদের কাছে কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। সোনাম্-গ্যন্জে এই ধরনের জনগোষ্ঠীরই প্রতিনিধি ছিলেন। অজান্তে হলেও সাপকে আমরা ক্রুদ্ধ করে তুলেছিলাম। আমি প্রথমে এই ব্যাপারটাকে খেয়াল করিনি, না হলে, হয়তো আরো সাবধান থাকতাম। একথা ঠিক যে, তিনি আমাদের সঙ্গেই সব সময় বসতেন, চা খেতেন, ছাতু-মাংস খেতেন, কিন্তু এটাই যথেষ্ট ছিল না। আমরা তিনজনই সুশিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলাম, আমরা নিজেদের কথা নিয়েই মেতে থাকতাম। হয়তো

ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না যদি আমাদের মধ্যে একজনও সোনাম্-গ্যন্জের সঙ্গে বসে ছঙ্ খেতাম আর তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতাম। যে-সমাজে সাংস্কৃতিক উন্নতির সাথে সাথে অনেক বেশি বৈষম্য এসে গেছে, সেখানে চাকর-বাকররাও নিজেদের জায়গাটা বুঝতে পারে আর বহু উপেক্ষা অবহেলাকে পরোয়া করে না। কিন্তু আদিবাসী সমাজের লোকেরা এই বৈষম্যকে মনে-প্রাণে মেনে নেয় নি, সেই জন্যই তারা যে কোনো সময়েই বিদ্রোহ করে বসে। তাদের বিদ্রোহ বড় নিষ্ঠুর আর ভয়ানক হয়। এই ব্যাপারটা জানতাম বলেই আমরা পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারছিলাম। সোনাম্-গ্যন্জেকে সকালে ফিরতে দেখে আমার নানান আশঙ্কা হতে লাগল। তিনি বললেন, 'রাতে আমি কোন এক জায়গায় শুয়েছিলাম। একজন লোক আমার তাড়ু (ঘোড়ার পিঠে রাখা চামড়ার ঝোলা) তুলে নিয়ে গেছে।' তাঁর কথায় আমার বিশ্বাস ছিল না। আমি বুঝতেই পারছিলাম যে, তিনি লুটপাট করবার জন্যই ফিরে এসেছেন। আমি তাঁকে বন্দুক দেবার সময় তার মধ্যে গুলি দিলাম না। কার্তুজের মালাটাকেও আমার তাড়ুর ভেতরে রেখে দিয়েছিলাম। সবাই খুব সাবধান হয়েই চলছিলাম।

এদিকের পাহাড়গুলো জংলী গোলাপ আর করৌন্দা[১]-র ঝোপঝাড়ে ভরা। একে ঠিক ন্যাড়া বলা যায় না। বিচ্ছু ঘাসও অনেক রয়েছে। তবে আমাদের ধ্যান মাঝেমাঝে ভেঙে যাচ্ছিল। কাল পর্যন্ত সোনাম্-গ্যন্জে আমাদের রক্ষক ছিলেন আর আজকে তাঁর আগে-আগে চলতেও আমাদের সাবধান থাকতে হচ্ছে। আমরা একটা ছোট নদীর কিনারার দিকে চললাম। যেটা লাসার উই-ছু নদীতে মিশেছে। এখানেই ফোনদো-এর ছোট্ট গ্রাম। ১২টার সময় আমরা নদীর কিনারায় পৌছলাম। পাশে লোহার শিকলে বাঁধা একটা পুল ছিল, কিন্তু খচ্চরগুলোকে সাঁতরে পার করানোর দরকার ছিল। তাদের ঘিরে ফেলে জলে নামিয়ে দেয়া হয়, তারপর লোকেরা চেঁচামেচি করতে করতে পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করে। এইভাবেই খচ্চরদের পারাপার করা হয়। বর্ষার জল ছিল, ফলে নদীর স্রোত যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। আমরা চামড়ার নৌকায় (খেয়া) নদী পার হলাম। দুটোর সময় নদী থেকে আরো এগিয়ে যেতে পারলাম। আমরা এখন রেডিঙ্ ছাড়িয়ে সামনের নদীটার উপত্যকা ধরে চলছিলাম। এখানকার সবুজ গাছে ছাওয়া পাহাড়গুলো দেখে বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, আমরা তিব্বতে আছি। সামনে থেকে একজন কালো ইয়াকের পিঠে চড়ে আসছিল। আমার মনে হয় মহাদেবের ষাঁড়ও বোধ হয় সাদা নয়, কালই হবে। কৈলাশে ষাঁড়ের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর তাই মহাদেবের বাহন ষাঁড় নয়, ইয়াকই হবে। ইয়াকও গো-জাতিরই মধ্যে। আর মহাদেব যখন তাঁর নন্দী ইয়াকের ওপর উঠে চলতে লাগলেন, তখন তাকে দেখতেও নিশ্চয় এই লামাটির মতোই লাগে।

পাঁচটার সময় আমরা ল্হখঙ্ পৌছলাম। আজকে এখানেই থাকার ছিল। এখান থেকেই বাঁ দিকের রাস্তা মঙ্গোলিয়া যায়। আর ডানদিকের রাস্তাটা যায় রেডিঙ্ গুম্বার দিকে। ল্হখঙ্-এর অর্থ দেবালয়; আজো সেখানে একটি দেবালয় আছে, কিন্তু প্রথম

---

[১] কাঁটাযুক্ত এক ধরনের গুল্ম (goasseberry, *carissa carandus*) ।—স·ম·

প্রথম সম্রাট শ্রোঙচন্ এখানে কোনো মন্দির বানিয়েছিলেন। চীন, মঙ্গোলিয়া, মধ্য এশিয়ার রাস্তার ওপরে এই স্থান হওয়ায় হয়তো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। বাইরে থেকে যারা আসে তারা সম্ভবত এখানে এসেই বুঝে নেয়, তারা তিব্বতে পৌঁছে গেছে।

সেদিন সন্ধেবেলা সাথীরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সঙ্গে আনা মাংস শেষ হয়ে গেছে। মাংস বিক্রি করতে এলে কি নিয়ে নেব?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, নিয়ে নিও।' ওঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতটা?' আমি বললাম, 'পুরো শরীর।' ওঁরা বললেন, 'পুরো শরীর নেবার দরকার নেই, একটা পা নিয়ে নিচ্ছি।' আমি বললাম, 'নিয়ে নাও।' আবার ওঁরা তিন-চারসের মাংসের টুকরোকে পাত্রে রেখে আমার সামনে নিয়ে এলেন। নিশ্চয়ই ওটা ভেড়ার মাংস হতে পারে না। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কিসের মাংস?' জবাব পেলাম, 'ইয়াকের'। 'না, না।' আমি খুব অবাক হয়ে বললাম, 'হয়তো এটা আমার জন্য নয়। তোমরা তো জানই আমি ইয়াকের মাংস খাই না।' তাঁরা বললেন, 'তিন দিন ধরে তো আপনি ইয়াকের মাংসই খেয়ে আসছেন।' লাসা থেকে আমাদের সঙ্গে শুকনো মাংস এসেছিল। ওগুলোর ছোট ছোট টুকরো কেটে শুকানো হয়েছিল। ফলে ওটা ইয়াকের না ভেড়ার তা বোঝা মুশকিল ছিল। আমার সাথীরা বলছিলেন যে, ওটা ইয়াকের মাংস ছিল। আমার এটাও জানা ছিল যে নেপালীরা ইয়াকের মাংস খায়, অথচ গরুর মাংসের নাম শুনতেও পারে না। ওরা ইয়াককে গরু বলে মনে করে না, কিন্তু আমার একদমই সন্দেহ ছিল না যে, ভারতীয় ও বিলাতী গরুর মতোই ইয়াক এবং গরুর জাতও একই। যদিও নিজেদের প্রাচীন গ্রন্থগুলোর অধ্যয়ন, বিদেশ পর্যটন আর নিজেও বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক থেকে বুঝেছিলাম যে গরু, ভেড়া আর শুয়োর তিনটির মাংসই সমান, ভেড়া শুয়োরের মাংস খেতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু পুরনো সংস্কারের বাধা ছিল বলে আমি ইয়াকের মাংস খাওয়ার ব্যাপারে সংযমী হয়ে থাকতাম। কিন্তু তখন তো ছ-দিন খেয়েই ফেলেছিলাম এবং কোনো দিন ভেতর থেকে বমি হওয়া দূরে থাক গা-ও গুলোয় নি। আমি বললাম, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, কিছু রান্না করে সকালের জন্যও রেখে দিও।' ভিক্ষুদের নিয়মানুসারে আমি দুপুরের পর আহার করতাম না। তাই এ-কথা বলেছিলাম। পরের দিন ছাতু খাবার সময় যখন ঐ মাংস সামলে নিয়ে এলো, তখন আমার মনে হলো আমি যদি এই মাংস মুখে দি তাহলে নিশ্চয় বমি হয়ে যাবে। বুদ্ধি এবং তর্ক খুব সমর্থন করছিল যে, এতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু সেদিন পুরনো সংস্কারের পাল্লা ভারি হয়ে গেল। পুরনো সংস্কার কবে চাপা পড়ে গেল, তা আমার ঠিক মনে নেই। পরে তো আমার ইয়াকের মাংসই সব চাইতে ভাল লাগত।

পরের দিন (৫ আগস্ট) পৌনে আটটার সময় যখন আমরা রওনা হলাম তখন ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। তিন মাইল চলার পর দেবদারুর দু-একটি ছোট ছোট গাছ চোখে পড়ল। এক পাশে জবের কিছু খেতও ছিল। এখানকার লোকেরা খেতের চাইতেও ইয়াক আর ভেড়া পোষা বেশি পছন্দ করে। কোথাও কোথাও মানি (মন্ত্র লেখা পাথর)-এর স্তূপও ছিল। শ্রদ্ধাশীল পথিক তাকে নিজের ডাইনে রেখে পরিক্রমা করার পুণ্য সঞ্চয় করতে চাইছিল। তগ্‌লুঙ্ থেকে সঙ্গে আসা দুজন লোককেই আমি

দেখেছিলাম, তারা সেই পাথর ঠুকে ঠুকে 'চা-ফৃ, মা-ফৃ' করছিল। 'চা-ফৃ-মা-ফৃ'-র প্রতি আমার খুব ঘৃণা রয়েছে। এর শব্দার্থ হলো 'চা দাও, মাখন দাও', কিন্তু এই চা-মাখন দেবতার কাছে পাথরে পাথরে ঘষে চাইতে গিয়ে এরা অনেক সময় খুব নিষ্ঠুর কাজও করে। লাসাতে একটি এগারশো বছরের পুরনো শিলালেখ আছে। লোকেরা 'চা-ফৃ মা-ফৃ' করে তার অনেক অক্ষর উড়িয়ে দিয়েছে আর তাতে গোল গোল গর্ত বানিয়ে দিয়েছে। আমি শঙ্কিত হৃদয়ে কাছে গিয়ে দেখলাম। বুঝলাম এটি মামুলি রাস্তার পাথর।

একটি পাহাড়ের মোড় পার হতেই দেবদারু গাছের জঙ্গলের মাঝে রেডিঙ্ বিহার দেখা গেল। এই দেবদারুগুলোকে দেখে মনে হলো, ইয়াক আর ভেড়া বাঁচাতে যদি দেবদারু গাছ লাগানোর চেষ্টা করা যায়, তাহলে তিব্বতের অনেক উলঙ্গ পাহাড় দেবদারুর বনে ঢেকে যাবে।

রেডিঙ্-এর অফিসার লামাকে চিঠি দেয়া হলো। থাকার জন্য খুব ভালো জায়গা পাওয়া গেল, কিন্তু যখন আমি পুস্তক দেখাতে বললাম, তখন তিনি অস্বীকার করলেন। চিঠিতে লামা পুস্তক দেখাবার ব্যাপারে কিছুই লেখেননি শুনে আমরা খুব আশ্চর্য হলাম! ফলে আমার এত কষ্ট আর ঝামেলা পোয়ানো যে সবটাই বেকার হয়ে গেল—এটা পরিষ্কার। নাতীলা বেচারা নিজের কাজ ফেলে এখানে এসেছিল, যদি রেডিঙ্ লামার বইগুলো দেখানোর ইচ্ছে ছিল না, তাহলে সেটা ওখানেই বলে দিতে পারতেন। আমাদের সবারই খুব ক্ষোভ হয়েছিল কিন্তু করারই বা কি ছিল? লাসাতে চিঠি পাঠিয়ে জবাব চাইতে গেলেও অন্তত বিশদিন অপেক্ষা করতে হবে। যদি দু-তিনশ টাকা এখানেই অফিসারদের দেয়া যেত, তাহলে হয়তো কিছু কাজ হতে পারতো। কিন্তু আমি তো আমার সারাটা যাত্রা কোনো জিনিসপত্র ছাড়াই করছিলাম। একদিক থেকে এটাকে আপনি বজ্জাতি চলতে পারেন। আমি আমার নিজেব শরীরের ওপর দিয়ে সমস্ত বিপদ, সমস্ত কষ্টকে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু যেখানে একমাত্র টাকা দিয়েই কাজ চলতে পারে সেখানে আর কি করা যায়! হয়ত পাঠকদের জানতে ইচ্ছা করবে যে আমি পৃথিবীর এত-এত জায়গায় ঘুরেছি, আর সবখানেই তো টাকার প্রয়োজন হয়, তাহলে এই টাকা আসতো কোথা থেকে? এ-বিষয়ে এটুকুই বলতে পারি ইউরোপ-যাত্রায় অবশ্য মহাবোধিসভার মতো ধনী সংস্থা আমাকে পাঠিয়েছিল, তারা আমেরিকাও পাঠাতে চাইছিল, কিন্তু আমি নিজেই সেখানে যাওয়া পছন্দ করি নি। ব্যাস একটি যাত্রাতেই আমি টাকার ব্যাপারে একটু বেশি নিশ্চিন্ত ছিলাম। বাকি যাত্রাগুলোর টাকা কিছুটা তো আমার কলম থেকে পেয়েছিলাম—সব চাইতে বেশি টাকা একটা মার্কিন পত্রিকা আমার একটা লেখার জন্য দিয়েছিল। আর সেটা বড় উপযুক্ত সময়ে আমি জাপানে থাকতে পেয়েছিলাম যার জন্য আমি রাশিয়া, ইরানও ঘুরে আসতে পেরেছিলাম। ডঃ জয়সওয়াল আমাকে সাহায্য করার জন্য সবসময়ই উৎস্যুক থাকতেন কিন্তু আমি তাঁর বাড়ির লোকের মতো হয়ে যাওয়ায়, তাঁর আর্থিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। এইজন্য সবসময়ই তাঁর ওপরে কোনো চাপ সৃষ্টি করা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতাম। তিব্বত চিত্র, মূর্তি ইত্যাদি থেকে নিজের যাত্রার জন্য আমি অনেক টাকা করতে

পারতাম। কিন্তু যখনই আমি কোনো ভাল জিনিস পেতাম তখনই তাকে বিক্রি করার চাইতে কোনো মিউজিয়ামে দেয়াই বেশি পছন্দ করতাম। তা হলেও দু-তিনটি জিনিসের জন্য পাটনা মিউজিয়াম থেকে আমি কিছু টাকা পেয়েছিলাম। কোনো কোনো বন্ধুও কখনো কিছু সাহায্য করতেন। কিন্তু আমার বন্ধুরা সবাই বিদ্বান আর গুণগ্রাহী ছিলেন, লক্ষ্মীর বরদহস্ত তাঁদের ওপরে ছিল না। লক্ষ্মীর পুত্রদের সঙ্গে আমার বরাবরই সম্পর্ক খারাপ ছিল। হতে পারে, কেউ হয়তো মনে করবে আমি ভুল করছি। আমিও বুঝি যে যথেষ্ট পয়সা থাকলে আমি যেকোনো ইউরোপীয় অনুসন্ধানকারীর চাইতে একশো গুণ বেশি কাজ করতে পারতাম, আমার অবস্থাটাই এমন ছিল যে, তাদের চাইতে হাজার গুণে বেশি সংখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সংগ্রহ করে নিতাম।

রেডিঙ্ বিহার একাদশ শতকে তৈরি হয়েছিল। তখন থেকেই এটি তিব্বতের এক মহাপ্রসিদ্ধ বিহার। আজও তার অধীনে লক্ষাধিক জায়গীর আছে এবং এর লামা দলাই লামা বাদে তিব্বতের অপর চারজন প্রভাবশালী লামাদের মধ্যে একজন। এই প্রভাবের কারণেই ২২ বৎসর বয়সেই রেডিঙ্ লামা দলাই লামার স্থলাভিষিক্ত হতে পেরেছিল। তালপাতার পুঁথিগুলোকে দেখার আশা তো আর ছিলই না, আমি মন্দির দেখতে বেরুলাম। চারদিকে ঘর দিয়ে ঘেরা একটা আঙিনা ছিল। তার একদিকে তিনটি দেবালয়, যার একটিতে মৈত্রেয়র মূর্তি ছিল—মূর্তিটা সুন্দর ছিল। রেডিঙ্-এ ষোলটি ভারতীয় চিত্র আছে। তাছাড়াও দীপংকর শ্রীজ্ঞান ও ডোম্-তোন্‌পা-এরও ছবি আছে। ওপরের দেবালয়ে কতকগুলো ছোট ছোট চিত্রপটকে ভারতীয় তুলির সৃষ্টি মনে হয়। সেই সময় ষোলটি চিত্রপটই বারান্দায় টাঙানো ছিল। অজন্তার অনেক চিত্রই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এখানকার এই হাজার বছরের পুরনো চিত্রপটগুলো খুবই সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। এগুলোর রেখা, হাল্কা রং সবই বলে দিচ্ছিল যে, এগুলো কোনো কুশলী হাতের তৈরি। আমি চিত্রপটেরই ছবি তুলে নিয়ে যেতে চাইছিলাম কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার জন্যও অনুমতি দিলেন না। গেশে ধর্মবর্ধন নিজেই একজন ভালো শিল্পী। তিনি চাইলেন দু-একটা নকল করতে, কিন্তু এটা করতেও অফিসার বারণ করে দিলেন। সেদিন এবং পরের দিনও দুবার আমি সেই চিত্র দেখেই সন্তুষ্ট রইলাম।

এখন আমার জন্য এখানে আর কোনো কাজ ছিল না। তাই বড় খেদ আর ক্ষোভ নিয়েই আমি ৭ আগস্ট ৮টার সময় রেডিঙ্ ছাড়লাম। আমাদেব ডীগুঙ্-এর প্রসিদ্ধ গুম্বাতেও যাবার ছিল। সেটা ওখান থেকে দূরে ছিল না। ডীগুঙ্ গুম্বার লামা কোনো এক সময়ে চীন সম্রাটের গুরু ছিলেন। এটাও জানা গেছে যে ওখানে অনেক পুরনো জিনিস রাখা আছে। কিন্তু সোনাম্-গ্যন্‌জেকে নিয়ে আমরা সেখানে যেতে পারতাম না। কাজেই আমরা লাসা ফিরে যাওয়াই ঠিক করলাম। সাড়ে নটার সময় আমরা লহ্‌খঙ্‌দোঙ্ পৌঁছলাম আর একটার সময় নদীর কিনারায়। নদী পেরতে সোয়া ঘণ্টা লাগল। সেই দিনটা ফুন-দোতে থেকে গেলাম। পরের দিন আমাদের তগ্‌লুঙ্-এর দু-জন লোককেই ছেড়ে দেবার ছিল। খাওয়া বাদে ছ-আনা রোজে আমরা একজন লোককে দু-দিনের জন্য রাখলাম। বুঝতে পারছিলাম, সোনাম্-গ্যন্‌জে যে কোনো দিন চলে গেলেই তো

খচ্চরদের জন্য একজন লোক রাখা দরকার। আমার ইচ্ছে ছিল গেনদুনছোকোর্ আর য়ের্‌বাকে-র পুরনো বিহার দুটোকে দেখা।

পরের দিন ৭ আগস্ট ৭টার সময় আমরা রওনা হয়ে গেলাম। তগ্‌লুঙ্ গুম্বা ডানদিকে অনেকটা দূরে বয়ে গেল। সাড়ে ১১টার সময় আমরা ছ-লা জোতে পৌঁছলাম। আমরা পোতো গুম্বা যেতে চাইছিলাম। এটাও দ্বাদশ শতকের এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পোতোপা-এর নিবাস-স্থান ছিল, কিন্তু আমরা পৌঁছে গেলাম ডগ্‌গ্যব্ গুম্বাতে। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই সেখানে থাকাই স্থির করলাম। এখানে আমরা সেই ঘরে থাকার জায়গা পেলাম, যেখানে আগের অবতারী লামার মমি করা শরীর (মর্‌দোঙ্) রাখা ছিল। দেখতে সাধারণ মূর্তির মতো মনে হচ্ছিল। প্রথমে পেট চিরে অন্ত্র পরিষ্কার করে নেয়া হতো তারপর শরীরটাকে শুকিয়ে নেয়া হতো। কিন্তু আজকাল শবকে নুনে দু-মাস ধরে রেখে দেয়া হয়। আর প্রতি সাত দিনে তার ওপরে নুন ঢালা হতে থাকে। শুকনো শরীরের ওপর এখনো এবং আগেও বিশেষ ধরনের পলেস্তরা লাগিয়ে দেয়া হয়। এরকম মর্‌দোঙ্ অন্যান্য মঠেও আছে, কিন্তু সেগুলো স্তূপের ভেতরে বন্ধ আছে। তাই তাদের দেখা যায় না। এই গুম্বাটিকে ডগ্‌গ্যব্‌পা বানিয়ে ছিলেন যেটা কিনা পোতোপা (১০২৭-১১০৪)-র সমকালীন ছিল। এখন আর এখানে তেমন পুরনো কোনো জিনিস ছিল না।

ফনপো (ফন্‌য়ুল্) একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত পণ্ডিতদের স্থান ছিল। এখনও তাদের নিবাস-স্থানে ভালো ভালো গুম্বা দেখা যায়, কিন্তু বিদ্যা গো-লা জোতের পারে লাসা প্রদেশে চলে গেছে।

পরের দিন (৮ আগস্ট) আমরা ৭টার সময়েই বেরুলাম। আজ আমার পোতো বিহার দেখবার ছিল। নিচে নেমে যেই পোতোর দিকে ফিরলাম সোনাম্-গ্যন্‌জে বললেন, 'আমি যাব না। তোমরাই তিনজনে যাও।' যখন আমি বললাম যে, আমাদের ওখানে ক্যামেরার প্রয়োজন হবে তখন তলোয়ারের ওপর হাত রেখে বললেন, 'তনদে চে' (খবরদার)। আমরা এই থেকে বুঝে নিলাম যে তিনি কি চান। রাগে গা জ্বলে উঠল। পিস্তলে হাত চলে যেতে চাইছিল, কিন্তু আমার আক্কেল বোঝাল, 'কি, তুমিও জানোয়ার হবে?'

এখন সোনাম্-গ্যন্‌জেকে একটা দিনও সঙ্গে রাখাটা বেকার ছিল। নাতীলার শ্যালিকা পাশের গ্রামেই থাকত। আমরা তিনজনে সেখানে গেলাম, চা খেলাম। নাতীলাকে জিনিসপত্রের সঙ্গে আসার জন্য ছেড়ে দিলাম। বর্ষায় নদী সহস্রধার হয়ে মাইলের পর মাইল বয়ে যাচ্ছিল। ওখানে রাস্তা ভুল হবার ভয় ছিল। নদী পার করানোর জন্য আমরা একজন লোককে সঙ্গে নিলাম, আর দশটার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তিন চারটি ছোট নদী পার হতে হলো। ১২টার সময় আমরা আগের দিনের আশ্রয়স্থল পায়াতে পৌঁছলাম। গোলা (জোত) পার হবার সময় খচ্চর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। গেশে ধর্মবর্ধনের খচ্চর খুব কষ্ট করে ওপর পর্যন্ত পৌঁছল। এই জোতও ডাকাতির জন্য বিখ্যাত। কিন্তু যখন ৩টে বেজে ২০ মিনিটে ডাঁড়াতে পৌঁছলাম, তখন ওখানে কেউ ছিল

না। উৎরাই পথে নেমে সূর্যাস্তের আগেই আমরা দুজনে লাসা পৌঁছে গেলাম।

রেডিঙ্‌-যাত্রা আমাদের নিষ্ফল রইল, দুটো-তিনটি বাধা আমাদের পথে এসে পড়ল। যদিও নাতীলা আমাকে সব রকমের সহায়তাই করেছে এবং গেশে ধর্মবর্ধনের চেহারায় তো আমি একজন স্থায়ী বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছিলাম। গেশে তিব্বতের বড় বড় পণ্ডিতদেরই বলা হয়, আর তিনি যে খুব প্রতিভাশালী পণ্ডিত তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বিধিসম্মতভাবে বৌদ্ধন্যায় সুগভীর অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সম্পূর্ণই বুদ্ধিবাদী ছিলেন। তিনি একজন ভালো কবি, প্রাচীন-নবীন বৌদ্ধসাহিত্য এবং বৌদ্ধপরম্পরা সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। সেই সঙ্গে তাঁর সবথেকে বড় গুণ হলো, বিদ্যার গর্ব তাঁর নেই এবং তিনি মনে করেন যে, অপার বিদ্যা-সমুদ্র থেকে একটি কি দুটি ফোঁটা মাত্র তাঁর কাছে এসেছে। তিনি খুব উঁচু দরের শিল্পী ছিলেন। লাসার সামন্তশ্রেণীর ঘরগুলোতে তাঁর বিদ্যার তেমন কদব ছিল না। কিন্তু তাঁর চিত্রকর্মের জন্য তাঁর খুব সমাদর ছিল। বিদ্যার প্রতি প্রেম তাঁকে সুখ আর আরামের জীবন পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। তিনি অমদো প্রদেশের (চীন-এলাকা) একটি গুম্বার অবতারী লামা ছিলেন। অন্যান্য অবতারী লামাদের মতো তাঁর কাছেও ধনীদের ভোগ-বিলাস সুলভ ছিল, কিন্তু তিনি গদি ছাড়লেন, গুম্বার বৈভব ছাড়লেন এবং বিদ্যা অর্জনের জন্য লাসার রাস্তা ধরলেন। তিনি ডে-পুঙ্‌-এ কয়েক বছর পড়াশোনা করলেন। পরে আমাদের দুজনের সঙ্গে এক বছর রইলেন, যদিও এক নাগাড়ে নয়, কেননা অন্য কাজেব জন্য আমাকে কখনও কখনও একা-একাও দেশ-বিদেশে ঘুরতে হতো, তাছাড়া সরকারী জেলগুলোতেই বা কি করে তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে পারতাম? তবে এটা আমি বলবো যে, গেশে ধর্মবর্ধনের মতো বিদ্বান, গুণী, ত্যাগী, সংস্কৃতি-সম্পন্ন, আদর্শবাদী এবং সহৃদয় মানুষ তিব্বতে পাওয়া খুব মুশকিল। বার বার আমার মন বলতো যে, আমরা দুজন সঙ্গে থাকি। কিন্তু সেটা আমাব সাধ্যের বাইরে ছিল। অগত্যা মধুর স্মৃতিগুলোই যখন-তখন উজ্জীবিত করে মনকে শান্ত করা যেতে পারে। পরে উগ্র রাজনৈতিক সমর্থক সন্দেহে লাসার সরকার তাঁকে জেলে পুরে দিয়েছিল।

আমরা চাইছিলাম ল্হোখা (সম্‌-য়ে) প্রদেশের বিহারে ঘুরে আসতে, কেননা ওদিকে অনেক পুরনো মঠ আছে। কিন্তু বাহনের খুব সমস্যা ছিল। আমার কাছে এত পয়সা ছিল না যে দুটো খচ্চর কিনতে পারতাম এবং আমরা ঘুরতে পারতাম। আবার আমার কাছে কেবল রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা ছিল। সেটা দিয়ে মানুষের এবং পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সুন্দর ফটো তোলা যেত কিন্তু বইয়ের ফটো আমি তুলতে পারতাম না, অন্ধকারে মন্দিরের মূর্তিগুলোরও ফটো নিতে পারতাম না। বাহন ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য ভুটান সরকারকে যে-চিঠি আমি দিয়েছিলাম, তার সম্বন্ধে জানতে পারলাম (১৪ আগস্ট) যে, সেই চিঠি মন্ত্রীসভাতে পড়া হয়েছে এবং তাঁরা সাহায্য করার জন্য তৈরি। কিন্তু সরকারী চিঠি কি আর এতো তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়?

চীনের প্রতিনিধি এখন লাসাতে এসেছিলেন। চীনারা কখনো সরাসরি তিব্বত শাসন করেনি এবং গুম্বাগুলোর প্রতি তাদের মনোভাব সবসময় ভালো। বড় বড় গুম্বাগুলোতে

এখনো চীনের সম্রাটের দেয়া মহাদানে প্রায়ই ভোজের আয়োজন করা হয়। বেশির ভাগ ভিক্ষু এবং সাধারণ মানুষ এটাই জানে যে, চীনে এখনও সম্রাটের শাসন। ১৪ তারিখে চীনের প্রতিনিধিরা নিজেদের সরকারের একটি ঘোষণাপত্র লাসার দেয়ালে টাঙিয়ে দিল। চীন-সরকার তিব্বতের জনসাধারণের সঙ্গে সোজাসুজি সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায় না। এরকম করলে নিশ্চয় তিব্বতের প্রভুবর্গ তাকে পছন্দ করবে না। তা হলেও এই ধরনের ঘোষণাপত্র টাঙানোতে সমস্ত বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছিল। প্রভুরা সেটা পছন্দ করছিলেন না।

আরো এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলাম, কিন্তু দেখলাম, ল্হোখা যাবার কোনো ব্যবস্থাই হবে না। কথাবার্তা বলে এটাও বিশ্বাস হলো যে চাঙ্ প্রদেশে (টশী-লহুন্-পো আর সক্যায়) নিশ্চয়ই সংস্কৃততে লেখা তালপাতার পুঁথিগুলো আছে। পোইখঙ্ বিহারের এক ভিক্ষু অফিসারের সঙ্গে লাসায় দেখা হলো। তিনি নিশ্চিতভাবে বললেন 'আমাদের এখানে তালপাতার তিনটি পুঁথি আছে।' আমার মনে হলো, ল্হোখা তো যেতে পারছি না, তাহলে চাঙ্ প্রদেশের বিহারটাই দেখে আসি না কেন। গেশেও আমার সঙ্গে একমত ছিলেন। ততদিন আমার 'সাম্যবাদ হী ক্যোঁ'-এর অধ্যায়গুলো সম্পূর্ণ করার দরকার ছিল। আমি তাতেই লেগে পড়লাম। চীনের অফিসার নিজের সঙ্গে রেডিও এনেছিলেন সেটা শোনার জন্য খুব ভিড় হতো। অফিসারটি ভয় পাচ্ছিলেন যে, ঢাবা কোনো ঝগড়াঝাটি না করে বসে। ২৮ আগস্ট একজন চীনা জেনারেল এলো, সরকারের পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানান হলো। চারশোর বেশি সেনা গিয়েছিল, মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করবার জন্য কলোন্ লামা আর এক গৃহস্থ মন্ত্রী গিয়েছিলেন। অন্যান্য লোকজন ৫, ৬ হাজার হবে। চীনা, নেপালী আর মুসলমানও পৌঁছে গিয়েছিল। চীনা জেনারেল আর তার সাথীরা চীন সীমান্ত থেকে এখানে পাল্কিতে এসেছিল। এক-একটি পাল্কি ছজন করে বয়ে আনছিল। তাদের সঙ্গে এক ডজনের বেশি সেপাই ছিল না। অভ্যর্থনার চলন্ত ক্যামেরায় ফোটো নেয়া হলো। তাদের যেখানে রাখা হলো, তার সামনেও ভিড় লেগেই থাকত। সন্ধেবেলায় একজন তব্-তব্ ঢাবা (ভবঘুরে, নিরক্ষর ভিক্ষু) ভেতরে যেতে গেলে পাহারাদাররা আটকালো, তখন সে ছুরি বের করেছিল।

২৬ তারিখে কশা (মন্ত্রীসভা)-এর পক্ষ থেকে যাত্রী বহনের জন্য ঘোড়া ক-টা লাগবে জানতে চাওয়া হলো। আমি পাঁচ-ছটির কথা বলে দিলম। ৩১ তারিখে লোন্-ছেন্ (মহামন্ত্রী)-কে শুভালা ধীরেন্দ্র বজ্র অনুমতি পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করলে, জবাব পাওয়া গেল—কাজের চাপে এখন চিঠি লেখা যাচ্ছে না, তবে তাড়াতাড়িই লিখে দেয়া হবে। তাড়াতাড়ি অনুমতি পত্র পাব বলে আমার কোনো আশাই ছিল না। ২৭ আগস্ট 'সাম্যবাদ হী ক্যোঁ?'[১] শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন একমাত্র চিন্তা ছিল কবে খচ্চর পাব আর আমি এখান থেকে রওনা হতে পারব। আমি ছু-শিঙ্-এর খচ্চরগুলিকে সঙ্গে নিয়ে

[১] *লেখকের রাজনৈতিক প্রবন্ধ সংকলন। ১৯৩৪ সালে লিখিত এই গ্রন্থটির প্রকাশক কিতাব মহল।*—স.ম.

যেতে চাইছিলাম না। কিন্তু বেশ কয়েকটি জায়গার দেয়া প্রতিশ্রুতি মিথ্যে হওয়ায় আমাকে জ্ঞানমান সাহুর কাছেই খচ্চরের জন্য বলতে হলো।

৪ সেপ্টেম্বরে কেউ মারা গিয়েছিল, তার লাশ লোকজন শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি ওখানে যেতে পারি নি, কিন্তু জানতে পেলাম, যে তব্‌চী-এর পেছনে একটা পাহাড় আছে, সেখানেই মড়া নিয়ে যাওয়া হয়। বহনকারী রাকোয়ারা এক বিশেষ জাতির লোক। সেখানে নিয়ে গিয়ে ওরা মড়াকে পাথরের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দেয় তা""র চারজন রাকোয়া সেখানে এসে দাঁড়ায়। তাদের হাতে গড়াসীর মতো ধারাল ছুরি থাকে। প্রথমে পায়ের তলার মাংসের ছোট ছোট টুকরো কেটে পাথরের গর্তে রাখে, এইভাবে সারা শরীরের মাংস বের করে জমা করে দেয়। ওদিকে ধূপের ধোঁয়া দেখে কয়েকশ শকুন এসে আশেপাশে জমা হয়ে যায়। সমস্ত মাংস কেটে নিয়ে গহ্বরে ঢেকে রেখে দেয়া হয়, তারপর পাথর দিয়ে হাড়গুলোকে গুড়ো-গুড়ো করে ছাতুর সঙ্গে মেখে নেয়া হয়। শকুনদের তাড়াবার জন্য একজন লোক লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হাড় মেশান ছাতুর গুড়োগুলো প্রথমে ছোঁড়া হয়, তারপর মাংসের টুকরোগুলোকে। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই গোটা মড়াটা শকুনের পেটে চলে যায়। এই পদ্ধতিকে থেক্‌ছেন্ (মহাযান) বলা হয়।

রাকোয়ারা মড়া কাটতে কাটতে চা-ছাতু খেতে থাকে। ঠাণ্ডার দিনে বরফ হয়ে যাওয়ায় জল পাওয়া যায় না। ওরা নিজের পেচ্ছাব দিয়েই হাত ধুয়ে নেয়। রাকোয়াদেরকে তাদের এই কাজের জন্য খুব ঘৃণার চোখে দেখা হয়। তিব্বতে কাঠের এত অভাব যে মড়া পোড়ান যায় না। শরীর দিয়ে কিছু প্রাণীর পেট ভরে যাক—এই ভাবনা থেকেই এই প্রথার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু এর ফলে রাকোয়ারা অচ্ছুৎ হয়ে গেছে।

সাক্যার দিকে

৮ সেপ্টেম্বর আমরা দুজনে লাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। গেশে ধর্মবর্ধন ডে-পুঙ্ গুম্বার এক মোঙ্গল ভিক্ষুককে সঙ্গে যাওয়ার জন্য ঠিক করেছিলেন, চারটি খচ্চরকেই তার সামলানোর কথা। ছি ছু-শিঙ্-শা-র লোকেরা সোনাম্-গ্যন্‌জেকে খচ্চরগুলো বেঁধে তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছিল। তিনি একটি বুড়ো, একটি খোঁড়া এবং একটি একেবারেই দুর্বল—এই তিনটি খচ্চরকে তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমরা যখন লাসা থেকে বেরিয়ে পোতলার কাছে চলে এসেছি, তখন এটা জানতে পারলাম। আমার খচ্চরের পিঠে জিনের নিচে তো গদিও রাখেনি, খচ্চরের লাগাম এবং বাঁধবার জন্য দড়িও দেয়নি। অন্য খচ্চরওলাটি ছু-শিঙ্-শার একটি লাল খচ্চর চড়বার জন্য এনেছিল, আমরা সেটি পালটে নিলাম। ডে-পুঙের নিচের গ্রামটিতে আমরা মোঙ্গল ভিক্ষুটির আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় গ্যন্‌জে এলেন। । দূর থেকেই হাত তুলে আসছিলেন। আমরা এই জানোয়ারটির সঙ্গে একটি কথাও বলব না ঠিক করেছিলাম। তিনি লাল খচ্চরটি নিয়ে চলে গেলেন। দেরি হয়ে যাচ্ছিল আর মোঙ্গল ভিক্ষুও এসে পৌঁছয় নি।

এই খচ্চরগুলো ফেরত দিয়ে নতুন খচ্চর আনানোর চিন্তা ছেড়ে দিতে হল। চারটি খচ্চরকেই আমরা লাসা ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। নিজেদের জিনিসপত্রের জন্য কয়েকটা গাধা ভাড়া করলাম আর তাদের সঙ্গেই হেঁটে হেঁটে রওনা হলাম। আজ রাতে গঙ্ গ্রামে পৌঁছলাম।

পরের দিন (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল হওয়ার দেড় ঘণ্টা আগেই সাড়ে পাঁচটার সময় গাধাওলা যাত্রা করল। ৯ মাইল চলার পর নদীর ধারে আহার ও বিশ্রাম করার জন্য দাঁড়াল। কিছুক্ষণ তো ঠিকমতো হাঁটলাম, তারপর শরীর খুব দুর্বল লাগতে লাগল। মনে হলো যেন জ্বর আসছে। ৭, ৮ মাইল আরও চলার পর নদীর ধারে জঙ্নে গ্রামে পৌঁছলাম। আজ রাতটা এখানেই বিশ্রাম করার ছিল। কালকের চেয়ে আজ থাকার জায়গাটি ভালো ছিল কিন্তু পোকা মাকড়ের ভয় হচ্ছিল। পথে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, আমরা এগিয়ে গিয়েছি জেনে মোঙ্গল ভিক্ষু আগে আগে যাচ্ছে। রাতে জ্বর-জ্বর লাগছিল। ছার ও পোকামাকড়গুলো একজোট হয়ে আক্রমণ করে বসল। আমি দু-ঘণ্টা পর্যন্ত কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে থাকলাম। কিন্তু দেখলাম সারা শরীর কামড়ে চাকা-চাকা দাগ করে দিয়েছে। টর্চ (চোরবাতি) দিয়ে দেখলাম, দেওয়ালে ছারপোকাদের বিরাট পল্টন কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে। আর সেই মোর্চায় বেপরোয়া হয়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ ছিল না। ছাতে বিছানা নিয়ে চলে গেলাম, কিন্তু কিছু ছার এবং পোকামাকড়ও সঙ্গে চলে এল।

রাতের জ্বরে আজ আরও দুর্বল হয়ে পড়লাম। সামনের পথ পায়ে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছিল। চেষ্টা করে ছুসুর যাওয়ার জন্য একটি ঘোড়া ভাড়া পাওয়া গেল। ফসল পেকে উঠেছিল, গাছের পাতা কোথাও কোথাও হলদে হয়ে আসছিল। এইগুলো সবই ছিল শীতের আগমনের সূচনা। ছুসুরে তারঘর নেই। কিন্তু তার-লাইন দেখার জন্য লোক থাকে। টেলিফোনও আছে। লাসার তারঘরের অফিসার আমার বন্ধু কুশো তন্দর টেলিফোনের লোকেদের বলে রেখেছিল যে, আমাকে যেন সবরকম সাহায্য দেওয়া হয়। লোকটি আমাকে দেখেই চিনে ফেলল। চা খাওয়াল। গতকাল বিকেল থেকেই কিছু খাওয়া হয়নি, আজ ডিম দিয়ে দুধ খেলাম। খিদে তো একেবারেই ছিল না, মুখ তেতো হয়ে ছিল। কিন্তু না খেয়ে পথ চলাটা ঠিক নয়। তারওয়ালা লোকটি ঞবসো ঘাট পর্যন্ত একটি ঘোড়া ঠিক করে দিল। এখন ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ তীব্র ছিল, তাই ছুবো-রি-এর ঘাটে কাঠের নৌকো চলা শুরু হয়নি। বর্ষাকালে ঞবসো থেকেই যাত্রীরা চামড়ার নৌকোয় নদী পারাপার করে। ছুবো-রি-এর সামনে মোঙ্গল ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হল। বেচারি খুব হয়রান হল। ভেবেছিল আমরা আগে আগে যাচ্ছি, তাই এই পর্যন্ত চলে এসেছে। আমি তাকে কিছু পয়সা দিলাম। সে ডে-পুঙ্-এর দিকে ফিরে গেল। আমরা সেই দিন তিন-চারটি ঘরওলা সেমাথোব্ গ্রামে থাকলাম। রাতে পোকা মাকড় আর ছারে যে দুর্দশা করল, সেটা দেখে আমরা গাছতলে শোয়াই পছন্দ করলাম।

পরের দিন (১১ সেপ্টেম্বর) বখোর এবং ছোস-কোর-য়ঙ্চে-র দুটি বড়-বড় গুম্বা দেখলাম। দ্বিতীয় গুম্বাটি খুব বড়। তার আশেপাশে অনেক গাছ লাগানো রয়েছে।

কাছাকাছি ডানদিকের পাহাড়ে আরও অনেক গুম্বা আছে। ঘাটে পৌঁছতে যখন দু-তিন মাইল বাকি, তখন একটি দোরিঙ্ (পাষাণস্তম্ভ) পাওয়া গেল। এর অনেক অক্ষর মুছে গিয়েছিল। তবে এটি নিশ্চয় সম্রাটদের সময়কার (৬৩০-৯০২) পাষাণস্তম্ভ। সেই সময় এটিই ভারতে যাওয়ার প্রধান রাস্তা ছিল। আমরা ব্রহ্মপুত্রের ধারে পৌঁছলাম। ঞব্সো, রোঙ্, শিগর্চে, সাক্যা, কেরোঙ্ হয়ে নেপাল যাওয়ার এটাই পুরনো রাস্তা ছিল। এই রাস্তার জায়গায়-জায়গায় বিহার ও পুরনো গ্রাম আছে, কিন্তু আজকাল অনেক জায়গায় রাস্তা বদলে গেছে। আমরা যখন একেবারেই অসহায়, তখন এই রাস্তায় যাওয়া কি করে স্থির করতে পারতাম? যদিও ব্রহ্মপুত্র নদী শিগর্চে থেকেই এখানে এসেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন কিছু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে গেছে যে তার কিনারা ধরে কেউ যেতে পারে না।

নটার আগেই আমরা ঘাটে পৌঁছেগেলাম। এখানে দুটি তীরই একটু বেশি উঁচু। তাই নদী বেশি এদিক-ওদিক সরতে পারেনি। চামড়ার নৌকায় আমাদের নদী পার হতে দুঘণ্টা লাগল। তিনটের সময় আমরা খঙ্-ছুঙ্ গ্রামে পৌঁছে গোয়া (গ্রামের মুখিয়া)-র বাড়িতে উঠলাম। রাস্তার পাশের গ্রামগুলোতে সিফিলিস এবং গনোরিয়ার অসুখ খুব বেশি বলে মনে হচ্ছিল—কিছু মহিলা সিফিলিসের ওষুধ নিতেও এসেছিল। আমি পেটের অসুখ, জ্বর, মাথাব্যথার মতো সাধারণ অসুখ বিসুখের ওষুধ ও মলম নিজের কাছে রাখতাম। তাদের মলম দিয়ে ছাড়ান পেলাম।

পরের দিন গোয়া জিনিসপত্রের জন্য দুটো বলদ ও চড়ার জন্য দুটি ঘোড়া ঠিক করে দিলেন। আমরা এবার ঞব্সো জোতের দিকে উঠছিলাম। প্রথম চড়াই সাধারণ ছিল। কিন্তু ডাকওলার ঘর থেকে সেটা কষ্টকর হয়ে উঠছিল। আমাদের সব জানোয়ারগুলো দুর্বল ছিল তাই তারা খুব ধীরে ধীরে এগোতে পারত। সামান্য বৃষ্টিও হতে লাগল। এই জোতটা খুন ও ডাকাতির জন্য বিখ্যাত ছিল। যাকগে, কোনো রকমে আমরা জোতে পৌঁছলাম, অন্যদিকে আমাদের রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত সমতলভূমিতে ছিল, তারপর উতরাই শুরু হল। জোত থেকে আমরা এক পাশে ব্রহ্মপুত্র নদী, অন্য পাশে বিশাল য়ুম্ডোক্ সরোবর দেখতে পেলাম। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার গ্রামগুলোতে জায়গায় জায়গায় সফেদা,বিরি,খুবানি এবং হয়ত আখরোটের গাছও দেখা যাচ্ছিল, অথচ এখানে য়ুম্ডোক্ সরোবরের ধারের গ্রামগুলোতে গাছের চিহ্নমাত্র ছিল না। বর্ষায় যে সবুজ সবুজ ঘাস হয়েছিল তা এখনও শুকিয়ে যায়নি। তিনটেয় আমরা গ্রামে পৌঁছলাম। এখানেই চা খেলাম এবং দুদিন পর আজ ছাতু খেলাম। দুজন তীর্থযাত্রী তরুণী কিছু চাইতে এসেছিল, একজনের পায়ে কুকুর কামড়েছিল। আমি গেশেকে টিঞ্চার-আইডিন লাগিয়ে দিতে বললাম। কথায়-কথায় জানা গেল এই দুজনেই গেশের জন্মভূমি অমদো প্রদেশের। অমদো (তংগুত্) লাসা থেকে মঙ্গোলিয়ার দিকে দুমাসের পথ। মাঝে এমনও সব জায়গা আছে, যেখানে সপ্তাহ-ব্যাপী হাঁটলেও কোনো গ্রাম চোখে পড়ে না। এই দুটি মেয়ে একলাই ছিল। তাদের সঙ্গে কোনো পুরুষ ছিল না। তাদের বয়স বাইশ-চব্বিশ-এর বেশি হবে না। এবং তাদের মধ্যে একজনকে তো সুন্দরী বলা যায়। আমি ভাবতাম, এদের সাহসের কাছে আমার যাত্রা তো কিছুই নয়। এই যুবতী মেয়েরা নিজের দেশ

ছেড়ে দু-তিন মাসের পথে বেরিয়ে পড়েছে। এদের কাছে যথেষ্ট টাকা-পয়সা ছিল না, তাই অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের মতো ছাতু আর চা চেয়ে নিচ্ছিল। গেশে বললেন, 'লাসার উত্তরের নির্জন জায়গাগুলো ওরা নিশ্চয়ই মরুযাত্রীদের দলের সঙ্গে পেরিয়ে এসেছে। তবুও বহু জোত ওদের একা পেরিয়ে আসতে হয়েছে, যেগুলোতে ভীষণ ডাকাতের ভয়।' একে স্ত্রীলোক, তার ওপর সঙ্গে টাকা-পয়সা নেই, পথে ডাকাতের ভয় এবং কয়েক বছরের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া—এই সব গুলো গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেশে বলার পর আমি চিন্তা করছিলাম। আমি ওদের কিছু টাকা দিয়েছিলাম। আগে জানতে পারলে ওদেরকে গ্যন্‌চে পর্যন্ত ভালভাবে নিয়ে আসতে পারতাম। গেশে তো একজনকে তাঁর গ্রামের মেয়ে বলে জানিয়েছিলেন, তাই আরও আফশোশ হল। কিন্তু এটা জেনে নিশ্চিন্ত হলাম যে, ওরা আমাদের সাহায্যের ভরসায় নয়, নিজেদের ক্ষমতার ভরসায় তীর্থযাত্রা এবং দুঃসাহস যাত্রা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। তিব্বতে প্রায়ই এই ধরনের স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রীদের দেখা যায়। এখনও তারা তথাকথিত সভ্যতার পাল্লায় পড়েনি, তাই তারা অনেক সরল স্বভাবের ছিল। গেশে জানালেন , ওখানকার কুমারী মেয়েরা খুব স্বাধীন স্বভাবের হয়, কিন্তু বিয়ের পর তাদেব এই স্বাধীনতার দিকে খেয়াল রাখা হয় না।

সেই দিন (১২ সেপ্টেম্বর) আমরা পেদে-র তারঘরের কর্মীর বাড়িতে থাকলাম। এখানেও আমাদের সহৃদয় বন্ধু কুশো তন্দর টেলিফোন করে দিয়েছিল, তারকর্মীরা তাই আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। এই গ্রামটি য়ুমডোক্ মহাসরোবরের ধারে। এই সরোবরের মাছ খুব সুস্বাদু। লোকে এগুলো শুকিয়ে রেখে নেয়। তাবকর্মীটি আমাদেরকে এই শুঁটকি মাছ খেতে দিল। মাছ চিরে কাঁটা বের করে তাদের শুকোনো হয়। শুকিয়ে গেলে সেগুলো বেশ হাল্কা হয়ে যায়। আমি ভাবলাম, পাঁচ-সাত সের পাওযা গেলে বাস্তায় খাওয়ার জন্য নিয়ে নেওযা যেত। কিন্তু জানা গেল, এখানে লোকেরা পযসা নিয়ে নয় শষ্য নিয়ে বদল কবে। তাই খুব সামান্যই মাছ আমরা পেলাম। তারকর্মী আমাদের জন্য দুটি ঘোড়া ও দুটি খচ্চর এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আমাদের ঘোড়াগুলো নাম্পা-শিবা গ্রাম পর্যন্ত ছিল। সেই গ্রামে ছু-শিঙ্-শা এবং আমারও পবিচিত গোয়া (নম্বরদার) ছিল, তাই ভীষণ আশা করেছিলাম যে সেখান থেকে অন্য খচ্চর পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় দিন (১৩ সেপ্টেম্বর) আমরা সকাল ছটায় রওনা হলাম। আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। বেলা ১০টা নাগাদ নম্পা-শিরা-এর মাইল খানেক আগে দলবলসহ স্যার চার্লস্ বেল এর সঙ্গে দেখা হল। স্যার চার্লস গতবছর প্রয়াত দালাই লামার খুব বন্ধু ছিলেন। তিনি যখন পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন, সেই সময তাঁর প্রভাবে তিব্বতের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। এখন তিনি খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং পেন্‌শন নিয়ে বিলেতেই থাকতেন। মৃত্যুর আগে আবার একবার তিব্বত দেখার ইচ্ছে ছিল তাঁর। দালাই লামা আসার অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু নিজের বন্ধুকে দেখার আগেই বন্ধুর মৃত্যু হয়। সার চার্লস্-এর সাথে পথেই দেখা হল। হয়ত

তিনি জানতেন যে, আমি এখন তিব্বতে আছি। আমার চেহারা ও পীতবস্ত্র দেখেই বুঝেতে পারতেন যে, আমি কে। ঘোড়ায় চড়েই আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে থাকলাম। ওদিকে ফোটোগ্রাফার চলমান ছবি নিচ্ছিল। তিনি আমার যাত্রার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম যে, ভারত থেকে লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থের খোঁজে এসেছি। আমার বাসস্থান জিজ্ঞাসা করায় আমি ছাপরার কথা বললাম। তিনি বললেন যে, যুবাবস্থায় আই·সি·এস· হয়ে আসার পর একবছর ছাপরাতে ছিলেন। তিনি একমা স্টেশনটি ভোলেননি, কোনোরকমে হিন্দিও বলছিলেন। তিনি কিছু টাকা বের করে দিতে চাইলেন, আমি ধন্যবাদ জানিয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করলাম। যদিও তিনি আমার মতো যাত্রা করছিলেন না, তবু তাঁর সঙ্গে এক বিরাট সহযাত্রিদল ছিল। কিন্তু ৭০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধের পক্ষে এটা সাধারণ যাত্রা ছিল না। আমি তাঁর সাহসের প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না।

বেলা এগারোটায় নম্পা-শিবা গ্রামে পৌঁছলাম। চোলা (গ্রামের এক পরিচিত ভাই) কে খবর দিলাম, কিন্তু সে আমাদের কাছেও এল না। গ্যান্চী-র জন্য খচ্চর চাওয়ায় অজুহাত দেখিয়ে দিল। তিব্বতে সাধারণ পরিচয় এবং পরিচিতর পরিচয় কোনো কাজ দেয় না। লোকেরা নিজেদের প্রভুদের খুব ভয় পায় এবং তাদের সামনে হাতজোড় করে থাকে। আসলে বহু শতাব্দীর ক্রূর সামন্ত-পুরোহিতদের জন্য মানুষের মধ্যে সহৃদয়তা পাওয়া যায় না—সেখানে প্রভু এবং ভৃত্য দুটি শ্রেণী এবং দুটিই সম্পর্ক রয়েছে। যাকগে, ন-গ-চে সেখান থেকে তিন মাইল—অনেক বলে-কয়ে সেখান পর্যন্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। কুশো তন্দর-এর দয়ায় ন-গ-চে-র তারকর্মী চোলা (ভাই) আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। তা না হলে কতদিন সেখানে বসে থাকতে হতো। সেদিন গোরখা রাজদূত ন-গ-চে এসে পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক বিনে পয়সার ঘোড়া ছিল। বারো টংকা করে আমরা চারটি ঘোড়া পেলাম রা-লুঙ্ পর্যন্ত।

পরের দিন (১৪ সেপ্টেম্বর) পাঁচটায় ভোরের অন্ধকারেই আমরা চললাম। আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। অন্ধকার কেটে যেতেই টিপ-টিপ করে বৃষ্টি এল এবং একটুক্ষণ থাকল। ঠাণ্ডাও খুব বেড়ে গিয়েছিল। পাহাড়ের ওপর টাটকা বরফ পড়েছিল। ১৭ মাইল হাঁটার পর ডাক বহনকারীর বাড়িতে চা আর ছাতু খাওয়া হল। তারপর চারটের সময় রা-লুঙ্-এর তার-খাঙ (তারঘর)-এ পৌঁছলাম। সেখানে তারঘর ছিল না। শুধু তারকর্মীরা লাইনগুলো দেখাশুনা করতো। আর টেলিফোনে খবর পাঠাতো। তারকর্মী লাসা চলে গিয়েছিল। কিন্তু তিব্বতে পুরুষদের কাজ মহিলারা সহজেই সামলে নেয়। তার-খাঙ্টা আগে চীনের ফৌজী-চৌকী ছিল। তাতে যেতে-আসতে চীনের অফিসাররা থাকত। এখন তার কয়েকটা ঘর তারকর্মীরা ব্যবহার করছে, বাকি ভেঙে পড়ার মুখে। সারাবার কোনো ইচ্ছে নেই। ভুটান সরকারের সরকারি বাড়িগুলোর দেখাশোনার জন্য কোনো বিভাগ নেই। তারমো (তারকর্মীর স্ত্রী) আমাদের গ্যান্চীর জন্য চারটি ঘোড়া ঠিক করে দিল কিন্তু আমাদের এখন রা-লুঙ্ গুম্বাও দেখার কথা ছিল।

পরের দিন আমরা দুজন ঘোড়ায় চড়ে তিন মাইল দূরে রা-লুঙ্ গুম্বা দেখতে গেলাম।

এটা একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পুরনো গুম্বা। বাড়িগুলো একসময় নিশ্চয় খুব ভালো ছিল। কিছু মূর্তি খুবই সুন্দর। চারটি প্রদান দেবালয়ে কাঠ এবং পিতলের বড় বড় সীল করা মূর্তি আছে। ওপরের একটি কুঠরীতে অনেকগুলো ছোট পিতলের মূর্তি রয়েছে। এগুলো লোহার রেলিঙের ভেতরে রাখা হয়েছে যার দরজাগুলোতে মোহর লাগানো বোধ হয় এইজন্যে যে, যাতে কেউ চুরি করে বেচে না দেয়। এই গুম্বায় সত্তরজন ঢাবা (ভিক্ষু) এবং একশর ওপর অনী (ভিক্ষুণী) থাকে। এই বিহারটি করয়ুদপা সম্প্রদায়ের ভুক্পা শাখার অন্তর্গত। ঢাবা এবং অনী দুজনেরই এটি সম্মিলিত মঠ। পরের প্রজন্ম চালাবার জন্য এদের বাইরে থেকে শিষ্য-শিষ্যা আনার প্রয়োজন ছিল না। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা স্বামী-স্ত্রীও এবং তাদের যত ছেলে-মেয়ে হয়, তারা সবাই ঢাবা-অনী হয়ে যায়। তাই অন্যান্য মঠে যেমন যৌন দুরাচার দেখা যায়, তা এখানে ছিল না। কিন্তু জনসংখ্যা এত বেশি হয়ে আছে যে, গুম্বার জায়গীর জীবিকার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তিব্বতের গৃহস্থদের সব ভাইদের এক স্ত্রী হওয়ার জন্য জনসংখ্যা বাডতে পারে না। কিন্তু এখানে তার কোনো বাধা নেই। তাই দিন-কে-দিন বেড়েই চলছে।

এখন ফসল কাটা হচ্ছিল, তাই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা খেত-কাটার কাজে ব্যস্ত ছিল। শীতের সময় এখানকার ভিক্ষুণীরা পাঁচ-সাত জন করে দল বেঁধে-বেঁধে তারা বা অন্য কোনো দেবী-দেবতার স্তোত্র পাঠ করতে করতে বহু দূর পর্যন্ত ভিক্ষা চাইতে বেরিয়ে পড়ে। এখানে তালপাতার কোনো পুঁথি ছিল না, যদিও সে-খবর শুনেই আমরা এখানে এসেছিলাম।

এগারোটায় আমরা তার-খঙ্‌মে-তে ফিরে এলাম। জিনিসপত্র নিয়ে ঘোড়াটি আগেই চলে গিয়েছিল। আমবাও দ্রুত গ্যান্‌চীর জন্য রওনা হলাম। পথে একটু বৃষ্টি হল। যদিও উচ্চতার জন্য এখানে আগে-পরে ফসল লাগানো হয় কিন্তু কাটা হচ্ছিল একই সাথে। অন্ধকার হতে-হতে আমরা চার-পাঁচটি ঘরওলা ছুঙরা গ্রামে পৌছলাম। পরের দিন সাড়ে তিন ঘণ্টা হাঁটাব পর সাড়ে আটটায় গ্যান্‌চী পৌছলাম। অনেকগুলো চিঠি ছাড়াও শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র চৌধুরী (আই·সি·এস·)-র পাঠানো ক্যামেরা এসেছিল, তার সঙ্গে অনেকগুলো ফিল্মও ছিল। এখনও পর্যন্ত আমি ফিল্ম ধোয়ার কাজটা শিখিনি। যাত্রাগুলো আমাকে টোপিটি করে আধা-ফোটোগ্রাফার বানিয়ে দিয়েছিল। এখন আমার রোলিফ্লেক্স-টাতে ভালো ছবি তুলতে পারতাম। সম্ভবত এই দুগুণ ক্যামেরাতে আমি বইয়ের ছবি তুলতাম, কিন্তু সেগুলো ধোয়া তত সহজ ছিল না। ৩৪ বছর বয়সে যখন ভবঘুরে হওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা করলাম তখন কি জানতাম, এই জগতে আমাকে এখন কি-কি শিখতে হবে? খেতে ফসল কাটা চলছিল বলে খচ্চর পাওয়া যাচ্ছিল না, এক সপ্তাহ আমাদেরকে গ্যান্‌চীতেই থেকে যেতে হলো।

২২ সেপ্টেম্বর আমরা অশ্বতর (খচ্চর) নয়, 'খরতর' (মাদী গাধার পেটে ঘোড়ার বাচ্চা) পেলাম। প্রথমে আমরা ভাবলাম, নদীর ওপারে গিয়ে পোইখঙ্-এর কাছ থেকে নৌকোয় এপাবে চলে আসব। কিন্তু পরে সে-চিন্তা ছেড়ে দিতে হলো। এবং সেটা ভালই হলো, কারণ নদী পার করা অত সহজ ছিলনা। পোইখঙ্ গ্যান্‌চী থেকে প্রায় ২৩

মাইল, তার মধ্যে আড়াই-তিন মাইল রাস্তা ছাড়া বাকিটা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এখানে একশোর মতো ভিক্ষু থাকে। লামা ঞ্রম্‌জে-র সঙ্গে আমার লাসাতে দেখা হয়েছিল, তিনি খুব খাতির করেছিলেন। জানা গেল যে, বিক্রমশিলার শেষ সংঘরাম শাক্যশ্রী ভদ্র (১১২৭-১২৩৫), তিব্বতের যে চারটি মঠে বেশি থেকে ছিলেন—এটি তাদের একটি। কিন্তু সেই সময়ে এই বিহারটি নদীর তীরে সমতল ভূমিতে ছিল। বোধহয় এটি আরও আগের তৈরি ছিল। সেই বিহারটি কোনো কারণে ভেঙে পড়েছিল। পরে তাঁর পরম্পরার কোনো ভিক্ষু এই বিহারটি আবার তৈরি করিয়ে ছিলেন। এখানে শাক্যশ্রী ভদ্রের তিনটি চীবর (ভিক্ষুবস্ত্র), কাপড়ের জুতো, ভিক্ষাপাত্র, আর জলছক্কা রাখা ছিল। তাঁর একটি ছোট মূর্তিও আছে—তার টিয়াপাখির মতো নাক এবং মুখ-চোখ দেখে বোঝা যায় এটা কোনো ভারতীয় শিল্পীর হাতে তৈরি। গেশে-পো-তো-পা এবং ভুটানের অন্য আচার্যদের ভিক্ষাপাত্র-ও অন্যান্য জিনিসও এখানে সুরক্ষিত আছে। একটি ছোট ভারতীয় চিত্রপট আছে, অমোঘপাশ অবলোকিতেশ্বর-এর। একশোরও বেশি খুব সুন্দর চিত্রপটও এখানে রাখা আছে। এগুলো কোনো দক্ষ চিত্রকর ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে (কুন্‌সঙ্‌ রবতঙ্‌-এর সময়ে) তৈরি করেছিল। এখানে তিনটি খণ্ডে সংস্কৃত পুঁথি ছিল। একটিতে খণ্ডিত সূত্র, ধারিণী, ব্যাকরণ ও অজাতশত্রুর ওপরে লেখা কাব্যের পাতা। দ্বিতীয় খণ্ডটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ ছিল। এতে ছোট ছোট দুটি পুঁথি ছিল। প্রথমটি 'সাকেতক-আর্যসুর্বণাক্ষীপুত্র—সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষু অশ্বঘোষকী দণ্ডমালা'। এতে উপদেশ দেওয়ার নমুনা দেওয়া ছিল। মনে হয়, সেই সময় ভিক্ষুদের ভাষণ দেওয়ার বিধিসম্মত শিক্ষা দেওয়া হতো। দ্বিতীয় পুঁথিটি (পরিকাথা)-ও ভাষণ শেখাবার জন্যই ছিল। কিন্তু তাতে গ্রন্থ-লেখকের নাম ছিল না। তৃতীয় খণ্ডে তিনটি ছোট-ছোট পুঁথি কাগজে লেখা ছিল—'মধ্যান্ত-বিভঙ্গ', 'ধর্ম-ধর্মতা-বিভঙ্গ' এবং 'অভিসময়ালংকার'। লাসার কুন্দে-লিঙ গুম্বরি পর এটি ছিল দ্বিতীয় গুম্বা, যেখানে ভারত থেকে আনা সংস্কৃতগ্রন্থ রাখা ছিল। আমি বইগুলোর সূচি তৈরি করলাম, কিছু ছবি তুললাম, বিহারটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম এবং পরের দিন (২৩ সেপ্টেম্বর) চারটের সময় শিগর্চে রওনা হলাম। সেইদিন ৪, ৫ মাইল হেঁটে গিয়ে টশীবু গ্রামে থাকলাম। আর ২৪ তারিখ ৩৫ মাইল হেঁটে সূর্যাস্তের মুখে শিগর্চে পৌঁছলাম। এখন গাছের পাতা আরো হলুদ হয়ে গিয়েছিল এবং সেই হিসেবে ঠাণ্ডাও বেড়ে গিয়েছিল।

যাত্রার সময় মনের মতো সঙ্গী পাওয়া গেলে অনেকটা চিন্তা দূর হয়ে যায়। গেশে ও আমি পরস্পর সেইরকমই সঙ্গী ছিলাম। শলু, ঙোর ও সস্ক্যা এই তিনটি মঠে সংস্কৃত বই পাওয়ার আশা করেছিলাম। সেপ্টেম্বর শেষ হতে চলেছিল, শীত প্রায় মাথার ওপরে এসে পড়েছিল, তাই ভারতে ফেরার তাড়া ছিল। সেই সময় আমার কর্মসূচি এই রকম হতো যে, গরম ও বর্ষায় তিব্বতে কাটানো আর শীতের সময়ে পাটনাতে এসে বইগুলোর মুদ্রণ ও সম্পাদনার কাজ করা। এই শীতেও আমার 'বিনয়পিটক' ছাপানোর ছিল, কিন্তু এখন আমার কাছে এত টাকাও ছিল না যা দিয়ে আমি সারা শীতটা এখানে কাটাতে মনস্থ করতাম। ফসল কাটার সময় হয়ে গিয়েছিল তাই এখানেও তাড়াতাড়ি ঘোড়া

পাওয়ার আশা ছিল না। রঘুবীর (ছোঙ্গেলা) এখনও টশী-ল্হুন-পো-তে পড়াশোনা করছিলেন এবং বেশ উন্নতিও করছিলেন। গেশে ধর্মবর্দ্ধনের কাছ থেকে জানলাম যে, সমলো গেশে (য়োনতান) তিব্বতের মুষ্টিমেয় মহাপণ্ডিতদের একজন—বোধহয় আমি আগে লিখতে ভুলে গিয়েছি যে, আমার প্রথম তিব্বত যাত্রার সময় কাশীর পণ্ডিতেরা আমায় 'মহাপণ্ডিত' উপাধি দিয়েছিলেন। তিব্বতী ভাষায় 'মহাপণ্ডিত'-এর প্রতিশব্দ (পণ্-ছেন্) আছে, কিন্তু এটা টাশী লামার বিশেষ উপাধি, যার জন্য সেটা অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারে না। রঘুবীর সমলো গেশে-র ছাত্র ছিলেন। একদিন রঘুবীরকে নিয়ে আমরা দুজনে সমলো গেশে-র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খুব সারল্যও অর্জন করেছিলেন। বছর দশেকেরও আগে, টশী লামা মধ্য-তিব্বতের বিদ্যার স্তরকে আরও তোলার জন্য অম্‌দো থেকে কিছু বিদ্বানদের ডেকে ছিলেন। সেই সময়ে সমলো গেশে টশী-ল্হুন্-পো-তে এসেছিলেন। আগের দলাই লামার সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় টশী লামাকে তিব্বত ছেড়ে চীনে চলে যেতে হয়েছিল। তখন থেকে টশী-ল্হুন্-পো গুম্বা শ্রীহীন হয়ে যায়। দলাই লামার মৃত্যুর পর আশা ছিল যে, টশী লামা এবার তিব্বতে ফিরে আসবেন। আমি শিগর্চেতে থাকতেই কয়েকশ খচ্চরে টশী লামার জিনিসপত্র সেখানে এসে পৌঁছেছিল। টশী লামা তিব্বতের সীমানায় এসে গিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমান প্রভুবর্গ তাঁর আগমনকে তাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করছিলেন এবং সবরকমভাবে বাধা দিচ্ছিলেন। সমলো গেশেরও আর মন লাগছিল না, তিনি অনেকটা সময় এখানে কাটিয়ে দিয়েছেন, আর অম্‌দো-ও তো কাছে নয়, তাই এখানেই পড়েছিলেন।

পরের দিন (২৬ সেপ্টেম্বর) আমরা শলু যাওয়ার জন্য খচ্চর পেয়ে গেলাম। চার ঘণ্টা চলার পর সাড়ে এগারোটায় আমরা বিহারে পৌঁছলাম। রিসুর রিম্‌পোছে আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন জানালেন। তিনি জানালেন যে, তালপাতার পুঁথি রিফুগ (পাহাড়ের ওপরের বিহার)-এ আছে। যে বন্ধ-কুঠরীতে আছে তার দরজা দুই অবতারী লামা (রিসুর রিম্‌পোছে ও বুতোন রিম্‌পোছে) এবং চার খানপোর জমা হলে তবেই খোলা হয়। আমরা সেইদিন মন্দির দেখতে গেলাম। অন্যান্য পুরনো বিহারগুলোর মতোই এই বিহাবটিও চৌকো। মন্দির প্রদক্ষিণ করার পথটিতে চতুর্দশ শতাব্দীর কোনো শিল্পী খুব সুন্দর ছবি এঁকেছেন, যার মধ্যে অনেকগুলো হলো জাতকের ছবি। পরের দিন দুপুরে এগারোটা তালপাতার পুঁথি এলো। আমি চারটে পর্যন্ত সেগুলো দেখলাম। বেশিরভাগ বই-ই অসম্পূর্ণ। এগুলো সপ্তম শতাব্দীর কাবুল-তুর্কিস্তানের শারদারঞ্জন তথা তিন রকমের বর্তুল লিপিতে লেখা। একটি গ্রন্থ দেখে বোঝা গেল যে সেটা মহাসাংঘিক লোকোত্তরবাদ সম্প্রদায়ের একিট সম্পূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ (বিনয়গ্রন্থ)। বিক্রমশীলার নৈয়ায়িক জ্ঞানশ্রীর নবগ্রন্থটিও সম্পূর্ণ রয়েছে।

এই দুটি গ্রন্থ আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো। আমি ছবিও তুলে নিলাম। কিন্তু যতক্ষণ না সেখানেই ধুয়ে দেখে নিচ্ছি ততক্ষণ কোনো বিশ্বাস নেই। বসে লেখারও তো সময় ছিল না। তিব্বতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের একজন বুতোন্ (রিনছেন্ ডুব্,

১২৯০-১৩৬৪) এই শলু বিহারের ছিলেন। তিনি বহুবছর সাক্যাতে ছিলেন। মনে হয় উনিই এই বইটি সাক্যা থেকে তুলে এনেছিলেন। কথা বলে জানা গেল যে, তালপাতার আরও কিছু পুঁথি সেখানে আছে। কিন্তু এখন ওখানের লোকেরা দেখাতে চাইছে না। রিসুর রিম্‌পোছে-র একা কিছু করার অধিকার ছিল না। তিনি বললেন, 'আগামী মাসে (মার্চ) আমি ঐ বইগুলো (ভোটিয়া) আলাদা করে রাখব। তারপর আপনাকে তার সংখ্যা ইত্যাদি ব্যাপারে লিখব।' পরের দিন (২৮ সেপ্টেম্বর) রিসুর্‌-রিম্‌পোছে তাঁর ঘোড়া আমাদের দিলেন এবং দুপুরে আমরা শিগর্চে পৌঁছলাম। লাদাখে আমি যে লামার কাছে কিছু তালপত্র দেখেছিলাম, তিনি ছিলেন ঙোর গুম্বার। আমি তাকে 'এবং' নামে জানতাম কিন্তু লোকেদের মধ্যে এই নাম প্রসিদ্ধ ছিল না বলে গুম্বাটিকে খুঁজতে আমার দেরি হলো। সেই দিনই ঙোব-এর এক ভিক্ষুক এলো। সে বলল যে, যে-লামা লাদাখ গিয়েছিলেন, তিনি এখন খম্‌ প্রদেশে আছেন। সে এও বলল যে ঙোর-এ সাতশো-র বেশি তাল-পুঁথি আছে। এতদিন আমি শুধু অনুমান করতাম, কিন্তু এবার নিশ্চিত হলাম যে, সেখানে কিছু তালপুঁথি অবশ্যই আছে।

৩০ নভেম্বর আমরা নরথঙ্‌ গেলাম। দুটিমাত্র খচ্চর পাওয়া গিয়েছিল, তার একটিতে আমার জিনিসপত্র ছিল। গেশেকে হাঁটতে হচ্ছিল। যদি আমরা এই খচ্চরগুলো ছেড়ে দিতাম, তাহলে জানিনা কত দিন আমাদের এখানে বসে থাকতে হতো। সামলো গেশে ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে এলাম। সামলো গেশে বললেন, 'আপনি যে সংস্কৃতবিদ যুবককে পাঠাতে চান, পাঠিয়ে দিন। আমি তাঁকে পড়াবো আর এই বুড়ো বয়সেও কিছুটা সংস্কৃত শিখব।'

ভূমিকম্পের পর যখন আমি সীতামঢ়ী গিয়েছিলাম, তখন আমার কাশি হয়েছিল, আর দু-আড়াই মাস ছিল। এখন আবার একটু একটু কাশি শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং জ্বরও এসেছিল। কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারিনি যে, এটা টনসিল-এর ব্যাপার। আমি ভাবলাম বোধহয় সর্দি হবে। শিগর্চে থেকে দেরি করে রওনা হয়েছিলাম, তাই নরথঙ্‌ যখন পৌঁছলাম তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন (১ অক্টোবর) প্রথমে এখানকার গুম্বা দেখার ছিল। এখানে কোনো তাল-পুঁথি পাওয়া গেল না। যদি কোনো পুঁথি কখনো ছিল, তাহলে এখন তা কোনো স্তূপে বা টশী লামার নিজস্ব ভাণ্ডারে আছে। নরথঙ্‌ গুম্বা টশী-ল্‌হুন্‌-পোর দায়িত্বে কিন্তু ওখানে তালপাতার পুঁথির সন্ধান পাওয়া যেত না। গতবার যখন আমি নরথঙ্‌ এসেছিলাম, তখন কাছের জিনিসগুলো জিজ্ঞাসা করে করে জানার চেষ্টা করতাম না। এবারে এগুলোর প্রতি বেশি নজর ছিল। শীলমোহরে বন্ধ কিছু জিনিস ছিল, কিন্তু এর মধ্যে বেশির ভাগই গেশে শররা ও ভুটানের অন্যান্য গুরুদের জুতো, ডোমতোন্‌-পা ইত্যাদির ছড়ি ছিল। একটি মন্দিরে দুটো মূর্তি দেখা গেল। সেগুলো ভারতীয় ছিল। হ্‌তের মন্দিরে কিছু ভারতীয় চিত্রপটও ছিল তার থেকে কয়েকটির ছবি তুললাম। কন্‌-জুর-এর ছাপাখানার যে-মন্দির, তার দেওয়ালগুলো দেখতে থাকলাম। সেখানে বড় বড় কিছু ছবি টাঙানো ছিল। কাছ থেকে দেখে বুঝলাম, এগুলো ভারতীয় ছবি। এদের

সংখ্যা বারো এবং খুবই অসংরক্ষিত জায়গায় রয়েছে। সৌভাগ্য যে এখনও আছে। তারামন্দিরে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের একটি পাথরের নমুনা রাখা ছিল। এটির ওপর যদিও দরজার নাম তিব্বতী ভাষায় লেখা ছিল, তাও এই তৈলাক্ত পাথরটি দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, কেউ এটিকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বুদ্ধগয়া থেকে এনেছিল।

পয়লা অক্টোবর এগারোটায় আমরা ঙোর রওনা হলাম। গেশেকে হাঁটতে হল। সাড়ে তিন ঘণ্টায় আমরা ঙোর পৌঁছলাম। গুম্বাটি বিশাল। বহু মন্দির আছে। এখানে পরিচিত কেউ ছিল না। অনেক চেষ্টা করে একটি নির্জন বাড়িতে জায়গা পাওয়া গেল, যে-বাড়ির দরজা-জানালা কিছুই ছিল না। তার মানে আমরা ওদিকে মন্দিরে যেতাম আর এদিকে এটা-ওটা সব চুরি হয়ে যেত। রাত্রে দুটো তালপত্র এলো। এগুলো কোনো ন্যায়গ্রন্থের পাতা। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, কুড়িটি পুঁথি আছে। যাইহোক, একশোর মধ্যে কুড়িটি রয়েছে। তবু তো কিছু আছে। এটা জেনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সকালে চা খাওয়ার ছিল। গেশে জ্বালানি জোগাড় করতে বেরুলেন, অনেক কষ্টে সামান্য কাঠ পাওয়া গেল, তাতে চায়ের জল গরম হবে কিনা সন্দেহ ছিল। সকালেই মনে হতে লাগল যে, তাড়াতাড়ি আমাদের এ-জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। বাড়ির যা হাল তার জন্য একজনকে পাহারা দিতে হবে, জ্বালানির জন্য ত্রাহি-ত্রাহি করতে হবে, তার ওপর মঠের ছগ্‌জোদ্ (ম্যানেজার) ছিল অত্যন্ত রুক্ষ স্বভাবের। মঠের ম্যানেজার না হয়ে সে ভালো ডাকাতের সর্দার হতে পারত। গেশে জোর করছিলেন। কোনোরকমে দু-একটা দিন আমরা এখানে টিকে থাকতে পেরেছিলাম। গেশে নিজে খুবই পণ্ডিত লোক কিন্তু মূর্খদের সভায়—'দিগম্বরদের গ্রামে ধোপা বসবাস করে কি করবে?'[১]

লামা গেন্দুলা এখানকার বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য ছিলেন। তিনি মানুষটি খারাপ ছিলেন না, তবে ভীষণ দুর্মুখ ছিলেন। তানার লামা ঙ-বঙ্-এর কাছে গেলাম। তানা লামা বেচারি গরিব ভিক্ষু ছিলেন। তাঁর মাত্র একটি কুঠরী ছিল, তাতে চা করতে হতো আবার থাকতেও হতো; তবু খুব খুশি হয়ে আমাদের সেই কুঠরীতে থাকতে জায়গা দিলেন।

লংকাতে এক ভয়ংকর ভক্তকে পাওয়া গেল। এখন আমরা এদিক-ওদিক যেতেও পারতাম। কাছেই দুজন অবতারী লামার বাড়ি ছিল। নিচে একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি বেশ ভালোভাবে কথাবার্তা বললেন। এও বললেন যে, তাল-পুঁথি নিশ্চয়ই দেখার জন্যে পাওয়া যাবে। ওপরে একজন বৃদ্ধ অবতারী লামা উছেন (রিন্‌পোছে) থাকতেন। তিনি খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। আরো একজন লামার খবর পাওয়া গেল। তাঁর কাছেও গেলাম। জানা গেল যে, লামাদের মত থাকলে সমস্ত পুঁথিই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন সেগুলোর দেখাশোনার ভার লবরঙ-শুঙ্-ছগ্‌জোদ্-এর হাতে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি গোলমেলে জবাব দিচ্ছিলেন। যাকগে, পৌঁছনোর পরের দিন আমরা তানা লামার কুঠরীতে চলে গেলাম। এই ব্যাপারে চালাকি করতে পারতাম। নিচে প্রধান মন্দিরে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি আছে, সামনে সংঘ ভবন। ওপরের মন্দিরে কিছু

---

[১] উদ্ধৃত লোক-কথাটির হিন্দিরূপ— *ধোবী বসিকে কা করে দীগম্বরকে গাঁও।*—স.ম.

ভারতীয় মূর্তিও আছে। একটা মন্দিরে ভুটানের মহাবৈয়াকরণ সিতু পণ্ছেন-এর আঁকা অনেক চিত্রপট আছে, যাতে তিনি বুদ্ধের জীবনীকে চিত্রিত করেছেন। তাঁর চিত্রকর্মে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তেমন ভালো হয়নি। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর। অঙ্কনে চৈনিক প্রভাব আছে। ছগ্জোদ্ অজুহাত দেখাচ্ছিলেন। দুটো নাগাদ লোক ডাকতে এল। দোতলার ওপরে একটা ঘরের দরজা খোলা। ভেতরেও দরজা খোলা, অন্ধকার ছিল। দেয়ালের গায়ে গায়ে অনেক মূর্তি রাখা ছিল। একটি দেয়ালের পাশে কাঠের একটা ফ্রেম রাখা ছিল, যার ওপরে কয়েকশো হাতে লেখা বই রাখা ছিল। বইগুলোর অধিকাংশ ছিল তিব্বতী ভাষার। এগুলোরও নিজস্ব ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু আমার তো দরকার ছিল তাল-পুঁথির। বোধহয়, কাগজের বইগুলোর মধ্যেও কিছু সংস্কৃতের বই ছিল, কিন্তু তা খুঁজতে তো প্রায় হাজারখানেক পুঁথি খুলতে এবং বাঁধতে হতো। আর এজন্যে ছগ্জোদ্ কি করে অনুমতি দিতে পারতো? তালপাতার পুঁথিগুলো আকারে পাতলা এবং লম্বাটে হওয়ায়, খুব সহজেই চিনে নেওয়া যেত। আমি একটা একটা করে নামাতে শুরু করলাম। মোট ৩৮ বাণ্ডিল (গাঁট) বেরিয়ে এল। খুশির কথা আর কি বলবো। আর যখন বাইরে নিয়ে গিয়ে ছগ্জোদ্-এর ঘরে খুলে দেখতে লাগলাম, তখন দেখি 'বাদন্যায়'-এর দুটো মূল পুঁথি রয়েছে। আমি ধর্মকীর্তি এবং দিগ্নাগ-এর জন্য পাগল হয়ে ছিলাম। 'বাদন্যায়' ছিল ধর্মকীর্তির সেই পুস্তক। এইবারই লাসাতে 'বাদন্যায়'-এর টীকা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু মূলটা সেখানে ছিল না। আমি ভোটিয়া-অনুবাদের সাহায্য নিয়ে একটু একটু করে মূলের সংস্কৃত অনুবাদ শুরু করেছিলাম। কিন্তু এখন তো মূল পুস্তকই পেয়ে গেছি! আমি আজ বারোটা পুঁথি দেখলাম, তার মধ্যে একটা পুঁথিতে ধর্মকীর্তির দুটো গ্রন্থ 'হেতুবিন্দু' এবং 'ন্যায়বিন্দু'র ওপর দুর্বেক মিশ্র-র দুটো অন্য টীকা ছিল। এই সব গ্রন্থই বৌদ্ধন্যায়ের ছিল। দিগ্নাগ ও ধর্মকীর্তির মতো নৈয়ায়িক বৌদ্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এবং তাঁরা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ছিলেন। ধর্মকীর্তির এই গ্রন্থগুলো দেখে আমি আনন্দে ফেটে পড়তে লাগলাম। সব কষ্ট আমি ভুলে গেলাম। অন্যগুলোর আমি ফটোই নিতে পারতাম, যদিও সে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল আমি তাতে সফল হতে পারবো কিনা। কিন্তু 'বাদন্যায়'-কে আমি দৈবের ওপরে ছেড়ে দিতে পারতাম না। সেইদিনই আমি তার তিন পাতা কপি করে ফেললাম। চতুর্থ দিনে তো লিখে শেষই করলাম।

পরদিন (৪ অক্টোবর) বাকি সাতাশটি পুঁথি দেখলাম। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহত্বপূর্ণ ছিল—(১) বাদন্যায় টীকা, (২) অভিধর্মকোষ মূল, (৩) সুভাষিত রত্নকোষ (ভীমজ্ঞান সোম), (৪) অমরকোষ টীকা (কামধেনু), (৫) ন্যায়বিন্দুপঞ্জিকা টীকা (ধর্মোত্তর + দুর্বেক মিশ্র), (৬) হেতুবিন্দু-অনুটীকা (ধর্মাকরদত্ত অর্চট + দুর্বেক মিশ্র), (৭) প্রাতিমোক্ষসূত্র (লোকোত্তরবাদ), (৮) মধ্যান্তবিভঙ্গ ভাষ্য।

জ্বালানির কষ্ট প্রচণ্ড ছিল, কিনতেও পাওয়া যাচ্ছিল না। ঠাণ্ডা বেড়ে চলছিল। এখন আমাদের সাক্যাও যাওয়ার ছিল। তারপর হিমালয়ের বড় বড় জোত পার হওয়ার ছিল। ৮ অক্টোবর ছিল আমাদের প্রস্থান করার কথা। একদিন আগেই উছেন-রিম্পোছে-র কাছ

থেকে বিদায় নিলাম। তিনি মাখনের নোড়া এবং চায়ের জন্য একটা প্যাকেট দিয়ে বিদায় দিলেন। জুঙ্ রিম্পোছে চায়ের পাঁচটি প্যাকেট দিলেন, নিতে অসম্মত হলেও তিনি মানলেন না। সেই সঙ্গে তিনটি পুস্তক দিলেন, যার একটি ছিল বিহার-প্রতিষ্ঠাতা কুন্গা জঙ্পো-র জীবনী। ঙোর-তে এসে প্রথম দিন যেমন স্বাগত জানানো হয়েছিল, তাতে আমরা যতটা বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম, আজ ততটাই প্রসন্ন ছিলাম। সাক্যার জন্য আমরা পরিচয়পত্রও পেলাম। ঙোর গুম্বাও সাক্যা-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, এই সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় লামা (গুরু) সাক্যাতে থাকেন।

আমরা সেদিন সাড়ে সাতটার সময় রওনা হলাম। শব গ্রামের জন্য আমরা একটি ঘোড়া আর দুটো খচ্চর পেয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে সাক্যার একটি লোকও যাচ্ছিল। তিন মাইলের আগে একটা ছোটমতন জোত এল, তারপর সবচেয়ে বড় জোত ছগ্পালাতে আমরা পৌঁছলাম দুটোর সময়। উৎরাই ধরে নামতে নামতে প্রায় চারটের সময় শব-তে পৌঁছলাম। যাকে চিঠি দেওয়ার, দিয়ে দিলাম। প্রথম স্বাগত তো এই হলো যে, থাকার জন্য ঘরের বাইরে আমরা জায়গা পেলাম। ঘোড়া-খচ্চরের কথা বলতে গিয়ে, জানতে পাবলাম, এসব পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ভাবলাম, যদি মাল বওয়ার জন্য গাধা পাওয়া যায়, তো তাই ভাড়া করে নেব। তারও ঠিকানা ছিল না! ঙোর থেকে আসা ঘোড়া-খচ্চর তো আগেই ফিরে গিয়েছিল। রাতে আমরা দুজন মুখ শুকনো করে শুয়ে পড়লাম। সম্ভবত, এটা ছিল সেই শব গ্রাম, যেখানে ভারতীয় পণ্ডিত স্মৃতিজ্ঞানকীর্তি কিছুদিন ভেড়া চরিয়েছিলেন।

পরের দিন (৯ অক্টোবর) অনেক ছুটোছুটির পর 'সেঙ্গেচে' গ্রাম অব্দি নয়-টংকাতে দুটি গাধা পাওয়া গেল। সূর্য ওঠার আগেই আমরা রওনা হলাম আর সাতটায় সেঙ্গেচে পৌঁছে গেলাম। কাছের পাহাড়ের (সেঙ্গে) ওপর এক সময় একটি বড় বিহার ছিল, সেটা এখন প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। নিচে দু-তিনটে মানী[১] থাক করে রাখা ছিল। একটি মানীর কাছে কিছু লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তার মধ্যে একজনের কানে পেন্সিলের মতো কর্নভূষণ ঝুলছিল। অর্থাৎ সে কোনো ছোট-খাটো রাজ্যাধিকারী ছিল। আমরা তার সঙ্গে কথা বললাম এবং সে সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের জন্য চাঙ্শুম্ পর্যন্ত দুটো গাধা ও একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিল। নটা নাগাদ আমরা বড় নদীর ধারে পৌঁছে গেলাম। নদীতে জল বেশি ছিল। এদিক-ওদিক খোঁজ-খবর করে আমরা এমন জায়গা দিয়ে নদী পার হলাম, যেখানে নদীটির দুটো ধারা হয়ে গিয়েছিল। রোদ লাগছিল খুব। গেশে নিজের টুপিটা ঘোড়ার সাথে বেঁধে দিয়েছিল, কিন্তু সেটা পড়ে গেল। খুঁজে দেখার জন্যে আমরা ঘোড়াওলাকে পাঠালাম। সে ফিরে এসে জানালো, খুঁজে পায়নি। কিন্তু আমরা পরিষ্কার দেখছিলাম, ওর পেটটা ফোলা-ফোলা। আমরা বললাম, 'ঠিক আছে, টুপিটা না হয়

---

[১] মন্ত্র লেখা পাথর। তিব্বতের বহু শ্রদ্ধাশীল পথিক এই পাথরের থাককে ডান হাতে রেখে প্রদক্ষিণ করেন। এর ফলে পুণ্যার্জন হয় বলে তাঁদের বিশ্বাস। লেখক ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য পৃ· ২২৫।

গেছে, কিন্তু তোমার কি হয়েছে? পেটে কোনো অসুখ নেই তো?' গেশে হেঁটেই যাচ্ছিলেন, তিনি অসুখ পরীক্ষা করতে চাইলেন আর অমনি টুপি বেরিয়ে এল। লোকটি হাসতে থাকল। বেচারি এরা এখনও সভ্যতার সঙ্গে এতটা এগোয়নি যে সব কাজ দূরদর্শিতার সঙ্গে করবে। চাঙ্‌শুম্‌-এর দেড় মাইল আগে সম্‌দোঙ্‌-এ আমরা বেলা বারোটায় পৌঁছলাম। ঘোড়া-গাধার ব্যবস্থা আগেই করে নেওয়া ভালো ভেবে আমরা খোঁজখবর করতে লাগলাম। তিব্বতের দেবতাদের সাহায্য পাওয়া গেল। সাক্যা পর্যন্ত দুটো ঘোড়া ও মালবাহী গাধা পাওয়া গেল। আজ এখানেই থেকে গেলাম।

পরের দিন (১০ অক্টোবর) সাতটা কুড়িতে রওনা হলাম। আমাদের পথ নদীর বাঁদিক ধরে ছিল। কিছুটা যাওয়ার পর ডানদিকে একটি নদী পাওয়া গেল, এখন আমরা এর ধারে ধারে চলতে লাগলাম। এই উপত্যকাটিতে দূর পর্যন্ত ক্ষেত ও বাগান দেখতে পাওয়া গেল। বারোটায় সুম্‌দো গ্রামে পৌঁছলাম। আগে এটি কোনো সামন্তর রাজধানী কিংবা সেনানিবাস ছিল। দেওয়ালোর চিনাই সুন্দর। পুরনো বাড়ির অনেক ধ্বংসাবশেষ আছে। চা-ছাতু খেলাম। একটায় আবার রওনা হলাম। দেড় ঘন্টা পরে এক ত্রিবেণী পাওয়া গেল। এখানে ছোট একটি কেল্লা ছিল। নেপাল থেকে লাসা যাওয়ার এটি প্রধান রাস্তা ছিল তাই সেনা রাখার ব্যবস্থা জরুরি ছিল। পাশেই একটি পুরনো ধরনের বাড়ি ছিল, যেটাকে ভিক্ষুণীরা তাদের মঠে পরিণত করেছিল। সমস্ত ঘাসে হলুদ রং ধরেছিল। শোঙ্‌লা জোত আসতে দেড় মাইল বাকি, এখনই জিগ্‌য়্যুবা নামের পশুপালকদের গ্রাম পাওয়া গেল। তিন কি চারটি ঘর ছিল। এদের জীবিকা ভেড়া এবং চমরী নিয়ে। এছাড়া পথিকদের থাকা আর পশুদের খাবার থেকেও কিছু পেয়ে যেত। এই জায়গাটি পনেরো-ষোলো হাজার ফিটের চেয়ে কম উঁচু নয়।

পরের দিন (১১ অক্টোবর) পাঁচটা কুড়ি মিনিটে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। বেশ শীত ছিল। হাওয়া সামনের দিক দিয়ে আসছিল এবং মুখে শীতের জোরালো চাঁটি লাগছিল। আমাদের মুখ ঢাকতে হলো। চড়াই বেশি কঠিন ছিল না, উৎরাই অবশ্যই কিছু দূর পর্যন্ত কষ্টকর ছিল। এখন আমরা নদীর বাঁদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। নদীর ওপারে দুটি—একটি ডোক্‌পা (পশুপালক) গ্রাম ছিল। দশটার সময় নদী পার করে তিন-চারটি ঘরওলা ডোক্‌পা গ্রামে খাওয়া-দাওয়ার জন্য দাঁড়ালাম। সাড়ে বারোটায় আবার নদী পার হলাম। কিছুদূর গিয়ে আমরা পাহাড়ের বাঁদিকে উঠতে আরম্ভ করলাম, তারপর দু-মাইল যাওয়ার পর অটুলা জোত পাওয়া গেল। উৎরাই অবশ্যই কঠিন ছিল, কিন্তু সেটা মাইল খানেকের বেশি ছিল না। এগিয়ে আমরা সাক্যা নদী পেলাম। সামনে ছিল সাক্যার ভব্য বিহার—একটি পাহাড়ের সঙ্গে লাগোয়া, অন্যটি নদীর ওপারে সমতল ভূমিতে।

সাক্যা বিহার ১০৭৩ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এখানকার সবচেয়ে পুরনো বাড়িটি হলো একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে ভুটানের বেশি অংশের রাজধানী ছিল সাক্যা। আজও সাক্যার মোহান্তরাজের অনেক জমি-জমা আছে। আর দলাই লামা, টশী লামার পর তিব্বতে সবচেয়ে বেশি সম্মান তাঁরই। নদী পেরিয়ে

গ্রামে যাওয়ার জন্য তিন-তিনটি পুল আছে। গ্রাম পাহাড়ের নিচে নদীর ধারে-ধারে আছে। আমাদের কাছে মোহান্তরাজের প্রিয়পাত্র ডোনির্ ছেন্‌পো (মহাপেশকার)-এর নামে চিঠি ছিল। দরজার সামনে ডাকাডাকি করলাম, বাইরের ফটক খুলল। আমরা ভেতরে উঠোনে গেলাম, সেখানে মোষের মত একাটি কালো কুকুর বাঁধা ছিল। লোক এসে কুকুরটিকে ধরল। আমরা দরজার ভেতরে গেলাম। ডোনির্ ছেন্‌পো আমাদের ভালোভাবে স্বাগত জানালেন। তিব্বতীদের এই ধরনের আপ্যায়নের কোনো বিশ্বাস নেই, সবই তাদের আবেগের ওপর নির্ভর করে। কোনো সময় ইচ্ছে হলো তো মাথায় চড়াবে আবার কোনো সময় কথাও বলবে না। কিন্তু ডোনির্ ছেন্‌পো এর ব্যতিক্রম। আমাকে তিনবার সাক্যা যেতে হয়েছে এবং মাসের পর মাস তাঁর বাড়িতে থেকেছি কিন্তু তার স্নেহের কিছুমাত্র তারতম্য হয়নি। আমাদের কন্-জুর মন্দিরে থাকতে জায়গা দেওয়া হল। ডোনির্ ছেন্‌পো-এর চাম-কুশো ছেরিঙ্ পল্‌মো (দীর্ঘায়ুশ্রী) নিজে এসে আমাদের বসার ও চা-জল খাবারের ব্যবস্থা করলেন। ডোনির্ ছেন্‌পো বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ধর্মগ্রন্থ সেইটুকুই পড়েছিলেন যেটুকু পুজো ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন কিন্তু তিব্বতী সাহিত্য ও ব্যাকরণে তাঁর বেশ ভালো জ্ঞান ছিল। তাছাড়া তিনি একজন সিদ্ধহস্ত বৈদ্যও ছিলেন কিন্তু বৈদ্যগিরি তিনি পয়সার জন্য করতেন না। তিনি দগ্‌ছেন্ রিন্‌পোছে (মোহান্তরাজ)-কে একটি আর্জি দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। দরকারী চিঠিপত্র লিখতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তিনি নিজেই চিঠি লিখে দিলেন।

দশটার সময় আমরা ময়দানে ল্হখঙ্ ছেনপো বিহারটি দেখতে গেলাম। এই বিহারটি চেঙ্গিজ খানের পৌত্র চীন সম্রাট কুবলাই খানের গুরু সংঘরাজ ফগ্‌ফা (১২৩৪-৮০) তৈরি করিয়েছিলেন। মাঝখানে বড় উঠোন, তার তিন দিকে অনেকগুলো দেওয়াল এবং ফটকের দিকে যেতে বড় বড় মূর্তি আছে। একেবারে বাইরে বেরিয়ে দেখলে এটাকে কেল্লার মতো মনে হয়। দেবালয়গুলোতে বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের বড বড় মূর্তি আছে। এখানকার পরিক্রমার পথে তগ্‌লুঙ্-এর চেয়েও বেশি বই ইঁটের মত সাজানো আছে। এই সব বইয়ের পরিচ্ছেদগুলোতে যে সিদ্ধান্তের কথা আছে, কে জানে তাতে তিব্বত-ইতিহাসের কত সামগ্রী পাওয়া যেতে পারে। এরা কয়েক শতাব্দী ধরে অপেক্ষায় আছে কোন তিব্বতী ঐতিহাসিক এগুলোর সদ্ব্যবহার করবেন। প্রধান মন্দিরের বাইরে খোলা সভামণ্ডপে বিশাল দেবদারুর বিশাল স্তম্ভ আছে। মানুষের বিশ্বাস এই স্তম্ভগুলো হিমালয়ের দিক থেকে নিয়ে আসা মানুষের পক্ষে অসাধ্য কাজ, এই ভেবে সংঘরাজ ফাগফার আদেশে দেবতারা এই স্তম্ভগুলো এখানে খাড়া করে দিয়েছে। মুখ্যমন্দিরের বাইরে এসে বাঁদিকে একটি খুব উঁচু ও সোজা সিঁড়ি আছে। আপনি যদি সত্যিই ওপর থেকে নিচে নামতে যান, তাহলে ঘাবড়ে যাবেন। ছাতেও কয়েকটি মন্দির আছে আর একটি কুঠরী তো সিঁড়ির ওপরেই। সেই কুঠরীতে কত যে অমুল্য সংস্কৃত গ্রন্থ রাখা আছে,তা সে-যাত্রায় না আমি জানতে পেরেছিলাম, না কর্তৃপক্ষের লোকেরা। আমি সেই কুঠরীর দরজার ধার দিয়ে কায়স্থ পণ্ডিত গয়াধর-এর দেবালয়ের দিকে গেলাম। হিরণ্য-নিধির গয়াধর পণ্ডিতের মূর্তিটি একেবারে ভারতীয়। গেশে পরে গিয়ে তার ছবি

তুললেন।

দুপুরের পরে আমরা মোহান্তরাজের সঙ্গে দেখা করতে তারাপ্রাসাদ গেলাম। তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বছর। ডোনির্ ছেন্‌পো মোহান্তরাজের বিশ্বস্ত অফিসার। সুতরাং তাঁর চেয়ে বড় পরিচয়দাতা আর কে হতে পারতেন? আমরা মোহান্তরাজের হাতে বই দিলাম, কথাবার্তা হল। তিনি বইগুলো দেখানোর জন্য অনুমতি দিয়ে দিলেন।

সেই দিন আমরা নদী পেরিয়ে বিহারটি দর্শন করে এসেছিলাম। এখন আমাদের পাহাড়ের বহু মন্দির দেখার ছিল। আমাদের থাকার জায়গার পাশেই পুরনো মোহান্তরাজের স্তূপ ছিল। এর ভেতরে তাঁর দেহ রাখা ছিল। শবের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির বহুমূল্য জিনিসপত্র ও বইপত্র রাখার প্রথা আছে। এই স্তূপগুলোতে না-জানি কত তালপাতার পুঁথি আছে। কিন্তু সেগুলো তখনই দেখা সম্ভব হবে যখন তিব্বত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দীতে আসবে। গোরিম্ ল্‌হখঙ্ একটি গ্রন্থাগার। শাক্যশ্রী ভদ্র এখানেই থেকে ছিলেন। এখানেই তিনি সাক্যা পন্‌ছেন্‌কে পড়িয়েছিলেন। মন্দিরটি ছোট। এখানেও কিছু পুরনো চিত্রপট আছে, তবে সেগুলো ভারতীয় নয়। পাশেই অন্য একটি অন্ধকার ঘর আছে। সেই ঘরে ঢুকলে কিছুক্ষণ সময় লাগলো দৃষ্টি ফিরে পেতে। কাজেই প্রদীপ চাওয়ার প্রয়োজন হল। আমি শুনেছিলাম যে, এখানে বহু গ্যা-পোত্ আছে। ওপরে কাগজের অনেকগুলো বাণ্ডিল রাখা ছিল। হাজার না হলেও তার সংখ্যা অনেক। এগুলো ভারতীয় পুস্তক কি করে হতে পারত? তবে গ্রন্থগুলো খুব মহত্ত্বপূর্ণ এবং ব্লকে ছাপা চৈনিক ত্রিপিটক। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর হতে পারে। অর্থাৎ মুঘল-শাসনের প্রারম্ভিককালের। এগুলো গ্যা-পোত্ ঠিকই কিন্তু গ্যগর-পোত (ভারতীয় পুস্তক) নয়। গ্যনক্-পোত্ চৈনিক পুস্তক। এর নিচেই কাঠের তক্তার ওপর দু-তিন হাত উঁচু বইয়ের স্তূপ অনেক দূর অব্দি ছড়িয়ে ছিল। এইগুলো সব ছিল তিব্বতী বই। আমরা ঙোর-তে দেখেছিলাম তালপুঁথিগুলো কিভাবে কাগজে ছাপা তিব্বতী বইগুলোর মধ্যে মিশে ছিল। হঠাৎ গেশের হাতে পড়ল একটি পঁচিশ ইঞ্চি লম্বা, চার ইঞ্চি চওড়া কাগজের বই। দেখে বোঝা গেল সেটা 'প্রমাণবার্তিকার দেড় পরিচ্ছদের ওপর প্রজ্ঞাকর গুপ্তের ভাষ্য বার্তিকালংকার। সন্দেহ নেই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বই হাতে লেগেছে। আমাদের উৎসাহ আরও বাড়ল এবং পরের দিন আবার দেখতে গিয়ে একটি তালপাতার পুস্তক পাওয়া গেল, তবে সেটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমরা ওই বইটি সঙ্গে নিয়ে এলাম। সেখান থেকে বুচে ল্‌হখঙ্-তে গেলাম। এখানে সাক্যা পন্‌ছেন্ (১১৮২-১২৫১)-এর চিত্রপট পাওয়া গেল। আমি তার ছবি তুললাম। তারপর চিদোঙ্ প্রাসাদে গেলাম। এখানকার একটি ঘর হলো গ্যগর-ল্‌হখঙ্ (ভারতীয় মন্দির)। এখানে সাত-আটটি পঙ্‌ক্তিতে পেতলের মূর্তি রাখা আছে, যার অনেকগুলো হলো ভারতীয়। কয়েকটি তো খুবই সুন্দর। আর কিছু সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর হতে পারে সংবত্ ১১৯২ (১১৩৫)-এর একটি জৈনমূর্তিও দেখলাম। আঠাশটি মূর্তি শ্বেতপাথরের, তার কয়েকটির আমি ছবি তুললাম। সেখান থেকে আমরা মহাকালের মন্দিরে গেলাম। এখানে তামার কড়াইতে জল রাখা ছিল। চাম্‌কুশো দীর্ঘায়ুশ্রী জানাল, এই জল কখনো কমে না, আবার শুকোয়ও

না। এর মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলে ভাল-ভাল জিনিসের দর্শন হয়, ভবিষ্যতের কথা জানা যায়। খুব অন্ধকার ঘরে এটা রাখা ছিল, যার ভেতরে আমরা আলো থাকলে তবেই ঘোরা-ফেরা কতে পারতাম। ওই কড়াইয়ের জল প্রলয় ঘটে যাওয়া পর্যন্ত শুকোবে না—এটা তো ছিল শিশুদের মতো কথা। তবে দর্শন হওয়াটা স্বাভাবিক। অমন অন্ধকারে প্রদীপের মৃদু আলোর সঙ্গে কড়াইয়ের জল মেসমেরিজম্-এর কালো বিন্দুর কাজ দিত এবং যদি শ্রদ্ধাবান মানুষের মন একাগ্র হয়ে পড়ে, তাহলে মস্তিষ্কের ভেতরের সংস্কার এই দর্পণে প্রতিফলিত হতেই পারে।

প্রমাণবার্তিক ভাষ্য শাক্যশ্রী ভদ্র-এর শিষ্য বিভূতিচন্দ্রের হাতে লেখা ছিল। বিক্রমশিলা ধ্বংস হওয়ায় শাক্যশ্রী ভদ্র প্রথমে বারীন্দ্র (পূর্ববঙ্গ)-তে যান, সেখান থেকে নেপালে আসেন। নেপালে সাক্যা লামা ডগ্‌পা-গ্যলছন (১১৪৭-১২১৬)-এর দূত ঠোকুস্রোচবাকে আমন্ত্রণ করায় তিনি সাক্যা আসেন আর বহু বছর এখানে থেকে যান। এখানেই সাক্যা পন্‌ছেন্ তাঁর ভিক্ষু শিষ্য হয়ে যান। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁর এই যোগ্য শিষ্য তিব্বতের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত এবং চিন্তাবিদ হয়ে উঠেছিলেন। ভারতে এখনো কাগজ পৌঁছোয়নি, কিন্তু তিব্বতে তা চীনের সূত্রে চারশো বছর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। ভারতে যেমন তালপাতা সুলভ ছিল, এখানে তেমনি ছিল কাগজ। তাই বিভূতিচন্দ্র বার্তিকালংকারকে কাগজে লিখেছিলেন। এতে মূলটাও দেওয়া ছিল। আমরা এটাকে কপি করবো স্থির করলাম। দ্বিতীয় পুঁথিতে এগারোটি পুস্তকের খণ্ডিত অংশ ছিল, যার মধ্যে 'অষ্টসাহস্রিকা' এবং 'মহাপ্রতিসরা'-র অনেকগুলো পাতা ছিল। সাক্যা পণ্‌ছেন্-এর বাবার সময় পর্যন্ত সাক্যা-গুম্বা ভিক্ষুর নয়, এক গৃহস্থ সামন্তের মহল ছিল। সাক্যা পণ্‌ছেন্ ভিক্ষু ছিলেন এবং তারপর ৭,৮ প্রজন্ম পর্যন্ত সাক্যার নদীতে ভিক্ষুরাই বসতে থাকেন। সাক্যা পণ্‌ছেন্-ই সর্বপ্রথম মোঙ্গলদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেন। এটা সেই সময় যখন ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল আর ওদিকে মঙ্গোলিয়াতে তা দৃঢ় হয়ে উঠছিল। সাক্যা পণ্‌ছেন্-এর ভাইপো ও উত্তরাধিকারী ফগ্‌কা কুবলাই খাঁ-র গুরু হন এবং তিব্বতের রাজ্য তিনি গুরুদক্ষিণাও পান। যদিও ৭,৮ প্রজন্ম পর্যন্ত ভিক্ষু গদিতে বসে আসছে, কিন্তু গদী সর্বদাই নিজের বংশের মধ্যেই থেকেছে। কেননা, উত্তরাধিকারী সব সময় ভাইপো-ই হচ্ছিল। পরে ভিক্ষুদের নিয়মও ভেঙে যায়, এবং ঘরের জ্যেষ্ঠপুত্র গদিতে বসতে থাকে। আজও তা চলে আসছে। পরবর্তীকালে দুভাই আলাদা-আলাদা বিয়ে করেন আর তাঁদের ডোল্‌মা (ডারা) এবং ফুন্‌ছোগ্—দুটো প্রাসাদ হয়ে যায়। এখন গদিতে একবার ডোল্‌মা প্রাসাদের জ্যৈষ্ঠপুত্র বসেন, আবার তাঁর মৃত্যু হলে বসেন অন্য প্রাসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র। বর্তমানে গদিঘরটি হলো দগ্‌ছেন্ (মহাত্মা) রিম্‌পোছে ডোল্‌মা প্রাসাদের। তাঁর পরে ফুন্‌ছোগ্ প্রাসাদের মালিক গদিতে বসবেন। আমরা পরের দিন (১৪ অক্টোবর) ফুন্‌ছোগ্ প্রাসাদে গেলাম। এই প্রাসাদের মালিকের স্বভাব শিশুর মতো সরল। দেখতে সুন্দর, তবে তাঁর দুটো মেয়ে এবং সবার ছোট দুটো ছেলে দেখতে বেশ সুন্দর। ৪,৫ ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা হতে লাগল। তিনি জানালেন, 'গুরিম গ্রন্থাগারের ঘর যখন সারানো হচ্ছিল, সেই সময় বইপত্র সরাতে হয়েছিল। তখন

অনেক তালপাতার পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল।' তিনি বললেন, 'আরো খোঁজা দরকার। বই নিশ্চয় পাওয়া যাবে।' কিন্তু সে যাত্রায় জানতে পারা গেল না যে, সেখানে আরো তালপুঁথি আছে।

পরের দিন আমি বার্তিকালংকারের ফটো তুললাম। কিন্তু আমি আমার ফটোর ওপর ভরসা করতে পারতাম না। তাই কপি করতে লাগলাম। পুঁথির খোঁজ করতে যেতেন গেশে। দ্বিতীয় দিন তিনি তিনটি তালপুঁথির বাণ্ডিল নিয়ে এলেন। এই বাণ্ডিল গুরিম্-লেম্ ল্হখঙ্ থেকে এসেছিল। এতে অনেক বইয়ের দুটো-চারটে করে পাতা ছিল। লোকের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, তালপুঁথি ধোওয়া জল খাওয়ালে রোগও চলে যায়, পাপও চলে যায়। ধনী ভক্তদের এই তালপাতাগুলো থেকে কেটে কেটে প্রসাদও দেওয়া হয়। এটা শুনে আমার মন বিচলিত হয়ে পড়ল। কয়েকশো বছরে ভুটানের কয়েক ডজন মঠে না জানি কত কত অমূল্য গ্রন্থ এইভাবে কেটে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সময় আমার মনে হলো, বাইরে রেখে প্রসাদ করে দেওয়ার চেয়ে লক্ষগুণ ভালো ছিল বইগুলো স্তূপ কিংবা মূর্তির পেটের ভেতরে রাখা। সেগুলো আমরা দেখার জন্যে পেতাম না, কিন্তু আমাদের আগামী দিনের বিদ্বান কোনো না কোনো সময় সেগুলো সুরক্ষিত অবস্থায় পেতেন। এখন আমি বই কপি করতে লেগে গেলাম। গেশে পণ্ডিত গয়াধরের ফটো তুলে এনেছেন। জানা গেল, গয়াধরের মূর্তির পাশের কোনো ঘরে ধর্মকীর্তির মূর্তি আছে, যার পেটের ভেতরে প্রমাণবার্তিক রাখা আছে।

চাম্-কুশো ন্যুনে (উপবাস) ব্রত করছিলেন। সেই ব্রত, যা প্রথম যাত্রাতে আমি দুপুর পর্যন্ত করে দণ্ডবতের জ্বালায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। ব্রতে প্রথম দিন মধ্যাহ্নের পরে ভোজন করতে হয়। দ্বিতীয় দিন নিরাহার থাকতে হয়। তৃতীয় দিন ভোজন গ্রহণ করতে হয়। ২০ অক্টোবর চাম্-কুশোর পান্না[১] ছিল। তিনি পান্না করে আমার কাছে এসে বসে পড়লেন। আমি বই কপি করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম এবং গেশে স্মৃতিজ্ঞানকীর্তির জীবনের একটি ঘটনাকে নিয়ে ছবি করছিলেন। স্মৃতিজ্ঞানকীর্তি ভারতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। কোনো তিব্বতী বিদ্বান তাঁকে ধর্মপ্রচার এবং অনুবাদের কাজের জন্য তিব্বত নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই বিদ্বান নেপালে মারা গেলেন। যদিও স্মৃতিজ্ঞান না ভাষা জানতেন, না এ-দেশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর মন এতটা সাহসে পরিপূর্ণ ছিল যা দেখে আমি তো নিজেকে তাঁর চরণধূলি নেওয়ার যোগ্যও মনে করতাম না। তিনি স্থির করেছিলেন যে, আগে ভাষার ওপর দখল আনা জরুরি। তাই তিনি ভিক্ষু পোশাক ছাড়লেন। সাধারণ ভোটিয়াদের পোশাক পরলেন। শব্ গ্রামে কিছুদিন ভেড়া চরাতে লাগলেন। কিন্তু সেই জায়গাটি ভারতের পথের ওপরে ছিল, তাই সেখানে তিনি সুরক্ষিত নন ভেবে ব্রহ্মপুত্রের পারে শিগর্চে থেকে দু-মাইল দূরে পশুপালকের (ডোক্‌পা) এলাকা তানাতে দশ-বারো বছর ভেড়া চরিয়ে কাটান। তাঁর কর্ত্রী ছিল বড় কঠিন হৃদয়ের। ইয়াকের দুধ দুইবার সময় স্তন উঁচুতে থাকায় স্মৃতিজ্ঞানকে কখনও

---

[১] পারণ বা ব্রতের শেষে প্রথম ভোজন।— স ম·

কখনও মোড়া হতে হতো, যার ওপর বসে তাঁর কর্ত্রী আরামে দুধ দুইতেন।

বই কপি করার সময় তেমন কিছু ব্যাপার থাকলে গেশেকে বলাও চলত। সেই সময় বইয়ের এক জায়গায় ছিল যে, এই পূজা-অর্চনা সব শিশুদের একধরনের খেলা। আমি এবং গেশে হাসছিলাম। সেই সময় চাম্-কুশো এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?' আমি বললাম, 'এই বইয়ের লেখা নিয়ে কথা হচ্ছে।' তিনি বললেন, 'আমাকেও শোনান।' বই পড়ে শোনানো সহজ ছিল না, কেননা প্রজ্ঞাকরের গদ্য-পদ্যময় ভাষ্যের আবার দীর্ঘ ভাষ্য করার দরকার হতো। কিন্তু চাম্-কুশো ছাড়ার পাত্রী ছিলেন না। আর আমার ওপর তাঁর পুরো অধিকার ছিল। তাঁর স্বামী গেশের পাণ্ডিত্য দেখে এবং আমার ব্যাপারে শুনে আমাদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব রাখতেন। চাম-কুশো বুদ্ধিমতী স্ত্রী ছিলেন। পূজা-পাঠের বইও পড়তেন। কিন্তু আমাদের দুজনের গুণের পরিচয় তিনি শুনে-শুনেই পেতেন। আমাদের খাওয়া-দাওয়া আর সুখ-সুবিধের প্রতি তাঁর খুব খেয়াল ছিল। এই কাজটা তিনি শুধু চাকর-চাকরাণীদের ওপর ছেড়ে দিতে চাইতেন না। ফুরসৎ পেলেই তিনি আমাদের কাছে এসে বসে পড়তেন, কখনো গেশের ছবি আঁকা দেখতেন, আবার কখনো দেখতেন কাগজের ওপরে আমার কলমের চলা। গেশের ছবি তিনি বুঝতে পারতেন কিন্তু আমার কলমকে বুঝতে পারতেন না। তাহলেও সেদিন হাসার কারণ জানার জন্য জিদ করতে লাগলেন। আমি বলতে শুরু করলাম যে, এতে লেখা আছে পূজা-পাঠ শিশুদের খেলা। ফালতু। চাম্-কুশো বেচারি দুদিন আগেই ব্রত করেছিলেন। আমার দশ দিন হয়ে গিয়েছিল এই বাড়িতে থাকা। আর স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠায় সঙ্কোচও ছিল না। আমি বলতে লাগলাম, 'মালকিন তিনদিন ধরে ন্যুনে ব্রত রেখেছিল। আজ ছিল পান্নার দিন। চাকরাণী সুপ বানিয়ে মালকিনের সামনে রাখল। হয়ত সুপটা জলো হয়ে গিয়েছিল কিংবা মালকিনের মেজাজই খিটখিটে হয়ে ছিল, মালকিন সুপের পেয়ালাটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল আর চাকরাণীর গালে চার থাপ্পড় মারল! বল, এই ব্রত করে কি পুণ্য হল?'

চাম্-কুশো হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমি মারিনি, কেবল একটু রাগ হয়েছিল।' এটা একেবারেই আকস্মিক ঘটনা, আমি তার কিছুই জানতাম না। আমি ওই পূজারিণীদের নিয়ে ঠাট্টা করতে চাইছিলাম। চাম্-কুশো সারাজীবন বলতে থাকবেন যে, ভারতের লামা খুব দিব্যদৃষ্টি রাখে। আমার আশঙ্কা ছিল চাম্-কুশো হয়ত একটু রাগ করবেন, কিন্তু তিনি সেটা মনেই রাখেননি। চাম্-কুশো ও ডোনির্ ছেন্‌পো নিঃসন্তান। চাম্-কুশোর বয়স ৩৫ বছর, মনে হয় না এখন আর বাচ্চা হবে। তাঁর মাসতুতো বোন দিকীলাও ওদের সাথে থাকে। দিকীলার একটি ছোট মেয়ে ডোল্‌মা ছেরিঙ্ (তারা দীর্ঘায়ুষী)-কে কুশো দত্তক নেওয়ার কথা ভাবছিলেন। চাম্-কুশোর ভাই ডোনির্‌লা ভগ্নিপতির বাড়ির উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর অত্যন্ত রুগ্ন একটি মাসকয়েকের মেয়ে ছিল। যদি সে নাও থাকে (পরের যাত্রার পূর্বে বেচারির মৃত্যু হয়), তাহলে দুই বাড়ি মিলিয়ে একটি বাড়ির উত্তরাধিকারী ডোল্‌মা এবং তার স্বামীই হবে।

এখন শীত খুব বেড়ে গিয়েছিল। অক্টোবর শেষ হয়ে আসছিল। বারো-তের দিনের

ভেতরে দশম ভোটিয়া মাস শুরু হওয়ার ছিল। আর তখন থেকে শুরু হয় পোস্তীন পরা। একবছর আগে ইংরেজ পলিটিকাল এজেন্ট মিঃ উইলিয়ামসন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সাক্যা এসেছিলেন। চাম্-কুশো বলছিলেন, 'আছেটা কি? ইংরেজ চাম্-কুশো'[১] তো ভিখিরির মতো এসেছিল। না তার কানে ছিল কোনো আভূষণ, না গলায় ছিল, না হাতে ছিল। আবার পুরুষের মতো নিজেই লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ছিল।' আমি বললাম, 'কিন্তু তাদের কাছে তো ধনুক-বাণওলা আভূষণ আছে, তোমাদের কাছে তো বাণ ছাড়া শুধু ধনুক থাকে। ওই চাম্-কুশোর ধনুষ-বাণওলা আভূষণটিতে ২৫-৩০ হাজার টাকার মণি-মুক্তো লাগান থাকে।' চাম্-কুশো বললেন, 'কই, আমি তো ওর মাথায় কোনো ধনুক-বাণওলা আভূষণ দেখলাম না।' গেশে আগে থেকেই মুচকে মুচকে হাসছিলেন। আমিও হাসতে হাসতে বললাম, 'ইংরেজ-চাম্-কুশোর ধনুকবাণ কেবল ইংরেজ পুরুষ দেখতে পায়।'

ফুন্ছোগ্ প্রাসাদের কর্তা বার বার আসার জন্য অনুরোধ করতেন। আমি কয়েকবার তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি পেতল ও কাঠের দুটো মূর্তি দিয়ে ছিলেন এবং আবার আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আমি যদিও 'বার্তিকালংকার'-এর খণ্ডিত পরিচ্ছেদই (তৃতীয়-র উত্তরার্ধ) লিখতে পেরেছিলাম, চতুর্থ পরিচ্ছেদ লিখতে হলে নভেম্বরটাও ওখানেই কাটাতে হতো। তাই চলে আসতে বাধ্য হই।

নেপালের পথে— সাক্যায় ১৭ দিন থাকার পর, ২৭ অক্টোবর ৮টার সময় আমরা ওখান থেকে রওনা হই। চাম্-কুশোর ভাই-এর সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর গ্রাম মব্জা থেকে আমাদের জন্যে চারটি ঘোড়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঘোড়াগুলো ভালো ছিল। আমি, গেশে ও আরেকজন লোক ঘোড়ার ওপরে ছিলাম, চতুর্থ একজন ঘোড়ায় জিনিসপত্র নিয়ে আগেই চলে গিয়েছিল। সাক্যা ছাড়ার সময় আমার দুঃখ হচ্ছিল, এখানে এত বেশি প্রিয়জন পেয়েছিলাম যা তীব্বতে কখনো পাইনি। আর এটা শুধু ওই যাত্রাতে না—পরে আমাকে আরো দুবার তিব্বত যেতে হয়েছিল, তখনো সেই ভালোবাসা একইরকম ছিল। আগে তো এখানে চল্লিশটার বেশি সংস্কৃত পুস্তক বেরিয়ে ছিল। যেগুলোর জন্য সাক্যা আমার কাছে তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। সোয়া তিন ঘণ্টা পথচলার পর সাড়ে এগারোটার সময় আমরা ডোলা জোতে পৌছলাম। চড়াই খুব বেশি ছিল না, কিন্তু অনেক দূর অব্দি ছিল। জোত থেকে দক্ষিণের দিকে হিমালয়ের বরফে ঢাকা শিখরগুলো দেখা যাচ্ছিল। পায়ে পায়ে এক মাইল নেমে এলাম, তারপর ঘোড়ায় চড়লাম। পথে একজায়গায় চা-ছাতু খাওয়া হলো। এখন আমরা মব্জা-র বিস্তৃত উপত্যকায় ছিলাম, সেটা উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে। দেখে মনে হয়, কখনও এখানে ঘনবসতি ছিল। স্থানে স্থানে জনশূন্য ঘর-এর আর গ্রামের ভগ্নাবশেষ পড়ে রয়েছে। কিছু জায়গাতে তো বড় বড় দেওয়াল এমনিই দাঁড়িয়ে আছে, যেমন সেগুলো

---

[১] এক্ষেত্রে 'ইংরেজ চাম্-কুশো'র অর্থ ইংরেজ পুরুষ মি· উইলিয়ামসন-এর স্ত্রী।—স·ম·

বানানোর সময় হয়ত ছিল। যদি সেগুলোর ওপরে ছাদ করা যায় এবং দরজা বসানো যায়, তাহলে এখনো তাতে মানুষ থাকতে পারবে। ল্হাদোঙ্ গ্রামটি কোনো একসময় বড় গ্রাম ছিল। এখানে একটি খুব বড় বিহারও ছিল, কিন্তু এখন মাত্র কয়েকটা ঘর রয়েছে। আমাদের বাঁদিকে গ্রোংপা-র ধ্বংসাবশেষ। তার বিশাল প্রাচীর এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকে বলে, আগে এখানে বিধর্মী 'মোন্'-রা বাস করত, যাদেরকে রাজা মিবঙ্ তোব্গ্যে পরাস্ত করেছিল।

এক মিবঙ্ পঞ্চম দালাই লামা (১৬১৭—৮২)-র মন্ত্রী ছিল। সম্ভবত সে-ই মব্জার সমৃদ্ধ উপত্যকাকে নষ্ট করেছে। তার সৈন্যরা এখানকার শুধু লড়াকু পুরুষদের ওপরেই নয়, শিশুদের ওপরেও যে অত্যাচার করেছিল, তা 'পরাস্ত' শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

চারটের সময় আমরা মব্জা পৌঁছে গেলাম। কুশো ডোনির্লার সঙ্গে দেখা হল। ১০ বছর আগে তৈরি একটি দেবালয়ে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল।

মব্জা খুবই ঠাণ্ডা জায়গা। পরের দিন এখানেই থাকার কথা ছিল। বেলা দশটা পর্যন্ত কম্বল চাপা দিয়ে পড়ে থাকলাম, তারপর কুশো ডোনির্লার সঙ্গে কথাবার্তা চলতে লাগল। তিব্বতের প্রতিটি গ্রামের বাড়ির নাম আলাদা-আলাদা হয়। সরকারী কাগজে খেত ওই নামেই লেখা হয়। বাড়ির মালিকের নাম থাকে না। বড় ছেলে বাড়ির মালিক হয়। ছোট ভাই যদি আলাদা বিয়ে করে তাহলে সম্পত্তির ভাগ পায় না, সামান্য ভরণপোষণ পায়। সাক্যার রাজ্য (গ্যল্খব্)-তে প্রায় দুশো গ্রাম ও দুহাজার ঘর আছে। খম্ প্রদেশেও এই রাজ্যের কিছু গ্রাম আছে। ছেলে না হলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই আনা হয় এবং সেই ঘরের মালিক হয়। যদি মেয়েও না হয়, তাহলে কোনো আত্মীয়কে উত্তরাধিকারী করে নেওয়া হয়। কুশো ডোনির্লার অনেক জমি-জমা ছিল আর তার ভগ্নিপতি তো ছিল বেশ ধনী।

পরের দিন (২৯ অক্টোবর) আমরা ৮টার সময় এখান থেকে যাত্রা করলাম। ৩৩ সাঙ্ দিয়ে তেরসা পর্যন্ত যেতে তিনটে ঘোড়া নেওয়া হল। তের্সা সাক্যার জমিদারী। সেখান থেকে অন্য ঘোড়া আগে যাওয়ার জন্য পাওয়া যাবে—এই ভরসা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দু-জনের কাছেও একটি করে পিস্তল ছিল। যে লোকটি ঘোড়ার সাথে ছিল তার কাছেও একটি পিস্তল ছিল। সামনেও অনেকটা দূর পর্যন্ত মব্জা উপত্যকা চলে গিয়েছিল। 'মব্জা'র অর্থ ময়ূর। কিন্তু হিমালয়ের মত ঠাণ্ডা জায়গায় ময়ূর থাকা সম্ভব নয়, তবে কেন এরকম নাম রাখা হয়েছে? মব্জা ১৪ হাজার ফিটের চেয়ে কম উঁচু নয়। আশপাশের শিখরগুলোর মধ্যে কোনোটা ১৭, ১৮ হাজার ফিট উঁচুও হবে। ডোনির্লা জানালেন যে, আগে এইসব শিখরগুলোতে বারোমাস বরফ থাকত, কিন্তু এখন কয়েক মাস মাত্র থাকে। নদীর ধার থেকে সুগন্ধিত দেবদারু গাছ কেটে কিছু লোক নিয়ে যাচ্ছিল। আগে ওখানে বেশ ভালো জঙ্গল ছিল কিন্তু এখন তাকে রক্ষা করার চিন্তা কেউ করে না। সবাই ওখান থেকে কাঠ কেটে-কেটে নিয়ে যাচ্ছে। হতে পারে, এই কারণেও তিব্বতের বহু উপত্যকার জঙ্গল বৃক্ষহীন হয়ে গেছে। এখান

থেকে দু-দিনে বরফের পাহাড়গুলো পার হয়ে দেবদারু ও অন্যান্য গাছে ভরা জঙ্গলে পৌঁছনো যায়। অর্থাৎ সাক্যার বিহারে যে বড় বড় কাঠের থামগুলো লাগানো হয়েছে, তার জঙ্গল সেখান থেকে মাত্র তিন দিনের পথ। তবে হ্যাঁ চড়াই খুব কঠিন। কয়েক হাজার লোক মাসের পর মাস টেনে টেনে এক-একটি থামকে হয়ত সাক্যা পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। কোসীর ধারে ধারে রাস্তা খুব খারাপ। যেখানে তিঙ্‌রীর নদী ও মব্‌জা নদীর সঙ্গম সেখানে একটা জায়গা দড়ি ধরে নদী পার করতে হয়। যদি পায়ে হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা হত এবং আমাদের কাঠমাণ্ডু যাওয়ার প্রয়োজন না থাকত, তাহলে ওখান থেকে সোজা ধনকুটা হয়ে নিচে জয়নগর (দারভাঙ্গা) স্টেশনে পৌঁছে যেতাম। এ পথে লোক বেশি দেখা যায় না। দূরে দূরে গ্রাম, তাছাড়া ডাকাতের ভয় তো আছেই। আমরা নিশা-র এলাকায় পৌঁছলাম এবং রাতে সেই এলাকার গন্‌জঙ্‌ গ্রামে থাকলাম।

পরের দিন (৩০ অক্টোবর) যখন আমরা যাত্রা শুরু করলাম, তখন গৃহস্থ লোকজনেরা সোগ্‌পো (মোঙ্গল) লামাকে চা উপহার দিল। হাত রাখার জন্য গ্রামবাসীরা নিজের নিজের মাথা নিচু করে দিল। মাথায় হাত নেওয়ার জন্য সারা গ্রামের লোক দৌড় দিয়ে এল ঘোড়াওলারা। আমাকে সোগ্‌পো লামা বলেই প্রসিদ্ধ করে তুলেছিল। সামনে একটা বড় জোত পেলাম। জোত (ঠঙ্‌লা)-এর পর থেকে একটা পাঁচ-ছ মাইল ঘেরওলা হ্রদ দেখা গেল। উৎরাই পেরোবার পর শুধু মাঠ আর মাঠ। ছোঙ্‌ গ্রামে চা-ছাতু খেলাম, তারপর পৌনে চারটের সময় আমরা দেন্‌-বঙ্‌-জুগ্‌ গ্রামে রাতটুকু থাকলাম। সামনে চড়াই-এর রাস্তা ছিল না। ওইদিন সন্ধেয় আমরা চকোর গ্রামে চলে এলাম। পাঁচ বছর আগে সুমতিপ্রজ্ঞের সাথে এই গ্রাম দিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিলাম। কাছেই চিব্‌রী-র পবিত্র পাহাড়।

পরের দিন (১ নভেম্বর) চা খেয়ে সাড়ে ছ-টার সময় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মেমোঁ এল আর আমার মনে পড়ে যেতে লাগল কুকুরের হাত থেকে রেহাই পাওয়া, ছাতু ফেলে আসা এবং সুমতিপ্রজ্ঞর রেগে যাওয়ার ঘটনাগুলো। ডাকাত উপদ্রুত গ্রাম ঙম্‌বা কাছেই ফেলে এলাম। বারোটার পর আমরা তিঙ্‌রী পৌঁছে গেলাম। প্রথম বারের যাত্রার দু-দিনের রাস্তা আজ অর্ধেক দিনে শেষ হল। তিঙ্‌রীতে চা খাওয়ার জন্য খানিকক্ষণ থাকলাম। গেশে এখানকার ভোটিয়া পণ্ডিত পূরা গ্যর্‌গেন-এর সাথে দেখা করতে গেলেন। সেই দিনই পৌনে চারটের সময় আমরা তেরসা পৌঁছলাম। তেরসা গ্রাম নেপালের পথে পড়ে। সাক্যার অধিকারী আমাদের স্বাগত জানাল। সবচেয়ে ভালো ঘরে থাকার ব্যবস্থা করল। পরের দিন (২ নভেম্বর) খচ্চর পাওয়া যাবে না ভেবে আমরা এখানেই থেকে গেলাম।

পূরা গ্যেরগেন-এর সম্বন্ধে একটা দারুণ মজার কথা শুনলাম। সে বৃদ্ধ আর বৃদ্ধরা তরুণী স্ত্রী খুবই পছন্দ করে। পূরার স্ত্রী কোনো খম্‌পা যুবকের সঙ্গে প্রেম করে। তাই পূরা জোঙ্‌পোন্‌-এর কাছে অভিযোগ জানায়। খম্‌পাকে খুব করে বেত্রাঘাত করা হয়। কেমনভাবে খম্‌পাকে বেত মারা হচ্ছিল, সে কেমন ছট্‌ফট্‌ করছিল—এই নিয়ে পূরা একটি কবিতা বানিয়েছিল। কবিতাটি মন্দ ছিল না। পূরা সেটা তার ছাত্রকে শিখিয়ে

দেয়। আমি তার কপি করিয়ে নিই।

এখানে এক ধরনের টক ফল হয়, গেশে* মানা করছিলেন। কিন্তু আমি খেয়ে দেখতে চাইছিলাম। তাই জিম্বু (জংলী পেঁয়াজ), নুন ও লংকা দিয়ে চাটনি তৈরি করালাম। গেশে কোথায় খাবে না বলে দিব্যি গেলেছিলেন অথচ এখন বলছেন, 'পথে খাবার জন্যেও একটু বানিয়ে নিয়ে চলি।' তাঁর ধারণা এটা খেলে দাঁত কষে যাবে কিন্তু চাটনি খাবার পর সেরকম কিছুই হয়নি।

আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, তার জানলা থেকে চমো-লোঙ্মা (গৌরীশঙ্কর বা এভারেস্ট শৃঙ্গ) একেবারে কাছে এবং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমাদের গৃহস্বামী শুনেছিলেন যে, কোনো এক বছর ইংরেজ উড়ো জাহাজ ওই পর্বতের ওপর চক্কর কেটেছিল। তিনি এও জানতেন যে, কয়েক বছর ধরে বিদেশীরা তার মাথায় চড়তে চাইছে। আর সব লোকের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, ওপরে উড়ো জাহাজ ওড়ার জন্যে শিখর-দেবতা রেগে গেছেন, তাই ভূকম্পন হয়েছিল, যাতে বিহারে কয়েক হাজার মানুষ মাবা গিয়েছিল। আমি তাঁকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেবী-দেবতা সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলাম। তিব্বতে দেবী-দেবতাব সংখ্যা অনেক। আমাদের অনেক ভারতীয় দেবতাও ওখানে চলে গেছেন, তাঁদের জন্যে বড় বড় মন্দিরও হয়েছে। তিব্বতী দেবতার সংখ্যাও কিছু কম নয়, তবে তাদের খাওয়া-থাকার অবস্থা খুবই খারাপ। তিব্বতের দেবতাদের প্রধান প্রধান জাতিগুলো এই প্রকারের :

১। তো-টৌ-ডক্-পা (শ্মশানবাসী)।
২। থো-গো-মেন-পা (মুখ থেকে যারা আগুন বের করে)।
৩। ডে-কু-শুঁ (সুর সুর করে এসে পেছনে লেগে থাকা)।
৪। শো-লঁ-দো-ঙ-শি-(কয়লার মতো কালো মুখওলা)।
৫। চঁ-মর-পো (লাল রঙের)।
৬। শিন্-ডে-(পেত্নি)।
৭। থো-গো-ক-রি—(শ্বেতকঙ্কাল)।
৮। থেব্-রঙ্ (দৃষ্টভূত)।
৯। দক্ (মরা কৃপণ)।
১০। তোঙ্-ডে-ঠি-বা (যে ভুলিয়ে নিয়ে যায়)।
১১। তোঙ্-ডে-পী-বা (সঙ্গে চলা ভূত)।

ভূতেদের জন্য তিব্বতীরা সকাল-সন্ধে ছাতে শুধু একটু ছাতু রেখে ধূপ-ধুনো দেয়। তাহলে তারা রেগে যাবে না কেন? চোলা (গৃহস্বামী) বললেন, 'এই বিদেশীরা তো মানে মানে চলে যায়, আর দেবতা রেগে গিয়ে আমাদের ক্ষতি করে। ভূমিকম্পে এখানের কোনো ক্ষতি হয়নি।' আমি বললাম, উড়োজাহাজে জ্বলে ওঠা স-নুম্ (পেট্রোল)-এ দেবতা ও ভূতেদের খুব খারাপ হয়। সেই কারণে আমাদের দেশের অনেক দেবতা

---

* বাক্যটির অর্থ অসম্পূর্ণ। সম্ভবত তারকা চিহ্নিত অংশে 'খেতে' শব্দটি প্রয়োজন।—স·ম·

পালিয়ে গেছে, এখন অতি সামান্য রয়েছে।'একথা শুনে সে খুব খুশি হলো,কারণ তাহলে আর ওর খচ্চরদের পিঠ কেটে যাবে না, জুতোয় পা কেটে যাবে না, রোগও হবে না।

পরের দিন (৩ নভেম্বর) ১৬ সাঙ্ দিয়ে তিনটি ঘোড়া ভাড়ায় পাওয়া গেল। আর আমরা দশটার সময় রওনা হলাম। সেই রাতটা লঙ্‌কোরে এক বৈদ্যের বাড়িতে ছিলাম। ৪ নভেম্বর সোয়া তিনটের সময়েই রওনা হলাম। দেরি হলে থোঙ্-লা জোতে হাওয়ার গতি বেড়ে যায়। তার ওপর এখন সময়টা ছিল শীতের। তাড়াতাড়ি চলেও কোনো লাভ নেই। ঠাণ্ডা হাওয়া হাড় এঁফোড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছিল। সাড়ে বারোটার সময় জোতে পৌঁছলাম। নামার সময় অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে গেলাম। এক জায়গায় চা-ছাতু খেলাম ও দেড় ঘণ্টা বিশ্রাম কবলাম। রাস্তায় জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। ঘোড়াব পা তার ওপরে পড়ে পিছলে যাচ্ছিল। ছটার সময় অন্ধকার নামতে নামতে আমরা থুলুঙ্ গ্রামে পৌঁছলাম। খুবই গরিব একজন লোকের বাড়িতে উঠলাম। পরের দিনই আমাদের ঞেনম্ পৌঁছবার কথা, কাজেই চাল ও খাবার জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। আড়াই-তিনসের চাল ওই বাড়ির লোকেদের দিয়ে দিলাম।

পরের দিন (৫ নভেম্বর) সকাল আটটায় রওনা হলাম। ঘোড়াওলাদের থাকার জায়গা বলে দিয়ে আমরা দু-জন চলে গেলাম। সেই গ্রামটাও এল, যেখনে একজনের বাড়িতে সুমতি ছেলে হওয়ার জন্যে যন্তর[১]লিখিয়েছিল। গতবার ঠিক রাস্তা থেকে একটু সরের গিয়েছিলাম। এবার আমরা মূল রাস্তা ধরেই যাচ্ছিলাম। খানিকটা পথ চলার পর একটা চালু পাহাড়ের ওপরে কোনো পুরনো বসতির চিহ্ন দেখা গেল। এখানে জলও আছে, লোকজন থাকলে একটি ভালো গ্রামের পত্তন হতে পারে। সেখান থেকে নামার সময় যত্র-তত্র মাটি ফুঁড়ে শয়ে-শয়ে ঝর্ণা বইতে দেখা গেল। এর কাছেই ছিল সেই মঠ, যেখানে সুমতির সঙ্গে আমি চা খেয়েছিলাম। ঞেনম্ পৌঁছতে এখন ছয় মাইল বাকি ছিল। পিছনের পাঁচ মাইল পথ অত্যন্ত খারাপ ছিল। তার মধ্যে শেষ তিন মাইলে তো ছিল ভীষণ উৎরাই আমাদের হেঁটে যেতে হয়েছিল। চারটের সময় ঞেনম্ পৌঁছলাম। যোগমান সাহু (নেপালী)-র ঘরে উঠলাম। রাতে জ্বর এসে গেল। সামনে ঘোড়া পাবার কোনো আশা ছিল না। মনে হল, রাত থেকেই বরফ পড়ছিল এবং সারাদিনই খানিক-খানিক পড়ছিল। সেদিনটা আমাদের এখানেই থাকতে হল। আমাদের কাছে কাঠ ও পিতলের বারোটি মূর্তি ছিল এবং একটি পুস্তকও। নেপালী দীঠা (রাজদূত)-কে ওইগুলোর জন্য একটা চিঠি লিখে দিতে বললাম, কারণ নেপাল থেকে বেরোবার সময় বাধা দিতে পারে। সে চিঠি লিখতে ভয় পাচ্ছিল। বলল, 'আমি সরকারকে লিখে দেব।'

৩৯টি নেপালী মোহর দিয়ে আমি তিনজন ভারী (ভারবাহক) কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত করলাম। ভারীরা বলল, আমরা এক্ষুনি আসছি।' 'আমরা দুজন এগারোটার সময় রওনা হলাম। কয়েক মাইল যাওয়ার পর রাস্তার ধারে একটিই ঘর পেলাম। এখান থেকেই পাহাড়ের মাথায় বৃক্ষ-বনস্পতি দেখা দিতে লাগল। এখান থেকে এগোবার পর একটু

[১] *এখানে যন্ত্র অর্থে নিয়ন্ত্রণসাধন* বোঝানো হয়েছে।—স ম·

বরফও পড়তে লাগল। কোথাও কোথাও রাস্তাও দারুণ খারাপ ছিল। সাড়ে তিনঘণ্টা চলার পর আমরা গরম জলের কুণ্ড ছুক্সম্-এ পৌঁছলাম। আমাদের কাছে গায়ে দেওয়ার, পাতার বিছানা বা খাবার-দাবার কিছুই ছিল না। সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম। যাক্‌গে, বাড়িউলির কাছে আমরা খাবার ব্যবস্থা করে নিলাম। রাতে ঠাণ্ডায় কাঁপছি, এমনি সময়ে সাহুর কাছ থেকে লেপ-বিছানা নিয়ে একজন লোক এসে হাজির। রাত তো কাটল। দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম কিন্তু কুলিদের[১] এখনো কোনো পাত্তা নেই। দুপুরের পর ধর্মবর্ধনকে ঞেনম্-এর দিকে পাঠালাম, দেখে আসার জন্যে। সূর্যাস্তের সময় কুলিরা এল। রাতে এখানেই থাকতে হল। শর্‌বা নামে এক নেপালী প্রজা বলছিল, 'নেপালে তো তবু আমাদের আইন আছে কিন্তু ভোটিয়াদের ওখানে কোনো আইন নেই। জোঙ্‌পোন্-এর যেমন ইচ্ছে হয়, সেরকম ফয়সালা করে দেয়।'

পরের দিন (৯ নভেম্বর) দশটা পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া সারতেই থেকে গেলাম। রাস্তা খুব খারাপ ছিল। রাস্তায় সেই ঘরটির ভগ্নদশা দেখলাম, যেটা পাঁচবছর আগে তৈরি হয়েছিল এবং ঝর্ণা বেরিয়ে আসায় গৃহস্বামী ভয় পেয়ে ডুক্‌পা লামার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিল। আশীর্বাদ মিথ্যে হয়ে যায় এবং শেষে ঝর্ণা থেকে বেরিয়ে আসা নাগ দেবতা এই ঘরটিকে জনশূন্য করেই ছাড়ে।[২] ডাম্ আসতে তিন মাইল বাকি। পথে এখন আর দেবদারু নেই। আজ গরমও লাগছিল।

রাতটা ডাম্-এ থেকে পরের দিন দশটার সময় আবার রওনা হলাম। থঙ্-থুঙ্ গ্যল্‌পো-এর লোহার পুল পার হবার সময় গেশে ভয়ে কাঁপছিলেন। পুলটা খুব দুলছিল। থঙ্-থুঙ্ গ্যাল্‌পো একজন সিদ্ধ লামা ছিল। সব জায়গায় সে নদীতে পুল তৈরি করে বেড়াত। হয়ত দশ-বিশ কিংবা পঁচিশটা পুল বানিয়েছিল, কিন্তু পরে শেকলওলা যে কোনো পুলকেই থঙ্-থুঙ্-গ্যলপোর পুল বলা হতে থাকে। বারোটার সময় আমরা নেপালের ছাউনিতে পৌঁছলাম। সেনা-নায়ক এলেন, নাম লিখে নিয়ে গেলেন। তিনি মধেস-এর লোকদের ছাড়তে ভয় পাচ্ছিলেন ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ওখানেই বসে থাকলাম। তারপর চা খাবার জন্য পিছনের গ্রামটিতে যেতে অনুমতি পেলাম। সাড়ে চারটের সময় যখন এলাম, তখন তিনি আমাদের বাক্সগুলো খুলে দেখলেন। ফিল্মটা দেখে বলতে লাগলেন, 'এটা টর্চ লাইট।'

সূর্যাস্তের আগেই আমরা তাতপানী গ্রামে পৌঁছলাম। চুঙ্গী আদায়কারীরাও বাক্স খুলে দেখাল। গিয়ে খুব করে গরম জলে স্নান করলাম। রাতে আমাদের গৃহস্বামী (লক্‌পা) নেপালী কায়দায় শাক, শিম, খেকসা ইত্যাদি রান্না করে ভাতের সঙ্গে খাওয়ালো।

সামনে যাওয়ার দুটো পথ ছিল—একটি ওপরে-ওপরে, আরেকটি নিচ দিয়ে।

---

[১] প্রাগুক্ত 'ভারী' (ভারবাহক)। লেখক কোথাও কোথাও তাদেরকে 'কুলি'ও বলছেন।—স·ম

[২] এই যাত্রার পাঁচ বছর পূর্বে লেখক ডুক্‌পা লামার সঙ্গে এই গ্রামের মধ্য দিয়ে তিব্বতের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। তখনি আশীর্বাদ পাওয়ার এই ঘটনাটি ঘটে, এই গ্রন্থে ইতিপূর্বে তা বর্ণিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক তবুও দেখতে পারেন, 'তিব্বতে সওয়া বছর' অধ্যায়ের ৩৯ পৃষ্ঠা।—স·ম·

ওপরের রাস্তাটা ছিল খুব কঠিন কিন্তু আমাদের কুলিরা ওই পথ ধরল। প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন কষ্টদায়ক পথ শুরু হয়ে গেল। ততক্ষণে আমরা অনেকটা রাস্তা চলে এসেছি। ভীষণ খাড়াই। রাস্তাটি ছিল পাকদণ্ডীর। ডাঁড়াতে শরবোদের গ্রাম ছঙ্-চিঙ্ পেলাম। এটি প্রধান রাস্তা তো ছিল না যে দোকানপাট পাওয়া যাবে। ওপরের ওই ঠাণ্ডার ঘা খেয়েছিলাম, তাই এখানে মনে হচ্ছিল যেন বৈশাখ-জৈষ্ঠ্যের গরম। রাস্তা সামনেও এত চড়াই ছিল যে পয়ের দিকে না তাকিয়ে এদিক-ওদিক উঁকি মারতেও ভয় করছিল। রাস্তা সেখানে এক-সোয়া এক বিঘৎ-এর চেয়ে চওড়া ছিল না। আমি তো সমতলেরই লোক—এমনকি গেশে পর্যন্ত ভয়ে কাঁপছিলেন। শরবোদের গ্রাম গোম্থন পাওয়া গেল। এখান থেকে চওড়া রাস্তা ছিল। সাড়ে চারটের সময় য়ঙ্লাকোট গ্রাম এল। অধিকাংশ বসতি তমংদের ছিল, পাঁচটি ঘর ছিল নেবার মহাজনদের দুটি 'পাসল' (পণ্যশালা-দোকান) ছিল। খিদে পেয়েছিল ভীষণ। আমি একটু চিড়ে ও মিছরি নিয়ে খেলাম।

পরের দিন (১৩ নভেম্বর) আমরা জলবীরা বাজারে পৌঁছলাম। এটা বড়সড় একটা গ্রাম। দশ-বারোটা দোকান রয়েছে। ভারীরা আমাদের নদী পার করে সামনের গ্রাম ফলম-সাঁকুতে নিয়ে গেল। একটি দোকানে আমাদের খাবার রান্না করল। এখন তিব্বতের প্রচণ্ড কষ্ট ভুলে গেছি, ওখানকার মানুষের শুধু গুণের কথাই মনে আসতে লাগল। এটা ঠিক যে, ওদের কখনো কখনো রুক্ষ মনে হয়। আবার ওদের কখন যে কেমন মেজাজ থাকবে তারও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু যেখানে মানুষে-মানুষে পরিচয় হয়ে যাচ্ছে, সেখানে তার ঘর যেন আপনারই ঘর। তার নিজের উনুনে সে আপনার খাবার রান্না করে দেবে। বড় বড় বাড়ির মেয়েরাও চা নিয়ে আপনার সামনে এসে হাজির হবে। আপনার সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞেস করবে, নিজের কথা বলবে। কিন্তু এখানে জলবীরাতে আমরা এখন ভারতীয় সভ্যতার অঞ্চলে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম, যেখানে প্রত্যেকটি ব্যাপারে কি ঝামেলাই না হচ্ছিল। ভাড়ায় বাসন নেওয়ার ব্যবস্থা কর, নিজের হাতে উনুনে ফুঁ দাও—যখন পথ চলতে চলতে ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। বড় বাড়িগুলোতে তো চেনাশুনো ছাড়া আশ্রয়ই পাওয়া যায় না। আবার ছোট ঘরগুলোতে অত জায়গা থাকে না। আর অন্তঃপুরের তো কথাই আলাদা। হেঁসেল-উনুন আপনি তখন ব্যবহার করতে পারবেন, যখন আপনার সাত পুরুষকে আপনি তাদের সঙ্গে মেলাতে পারবেন। যাক্ গে, আমাদের কুলিরা হাজির ছিল, তারা যে জাতেরই হোক না কেন, আমরা তাদের হাতের খাবার খেতে রাজি ছিলাম, তারা খাবার রান্না করল। ঞেনম্ থেকে এদিককার সবাই শাকসব্জি খেয়ে কাটিত, কিন্তু এখানে দেখছি মাছ পোড়া বিক্রি হচ্ছে। পোয়া-পোয়া ওজনে। আমরা সাতটা মাছ কিনলাম। কিছুটা রান্না করে খেলামও কিছুটা সঙ্গে নিলাম। আর দুপুরের পর বেরিয়ে পড়লাম।' এমনিতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের ঋতুটা আমরা পছন্দ করছিলাম না, তার অপর আবার রোদটা ছিল সামনে থেকে। বহু ধান খেত ছিল। এখানে ভালো জাতের ধান হয়। পাহাড়ি ডাঁড়ের ওপরে চৌতরিয়া বাজারে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন সূর্যাস্ত হচ্ছিল। একটি দোকানে

রাতে থাকার জায়গা পাওয়া গেল।

পরদিন (১৪ নভেম্বর) দুটোতেই আমরা সিপা গ্রামে পৌঁছলাম। আমাদের কুলিরা এই গ্রামের লোক ছিল। আজ তাদের নিজেদের ঘরে থাকার কথা ছিল। পেঁপেকে এখানে 'মেওয়া' বলে। আমরা চেষ্টা করলাম, কিন্তু মেওয়া ভাগ্যে জুটল না। রাতে দুধ-ভাত আর সঙ্গে নিয়ে আসা মাছ দিয়ে সারলাম। সে রাতে খুব জ্বর এল। কিন্তু জ্বর এলেও কি আর পথচলা বন্ধ করা যেত? পরের দিন (১৫ নভেম্বর) একটা ছোটমত ডাঁড়া পেরিয়ে ১১টার সময় ইন্দ্রাবতী নদীর ধারে পৌঁছলাম। গাছের গুঁড়ি ফোঁপরা করে দুটো নৌকা বানানো হয়েছিল। সাড়ে পাঁচ আনা নেপালী পয়সা দিয়ে নদী পার হলাম। কোথাও কোথাও চড়াই ভীষণ কষ্টসাধ্য ছিল। সন্ধের সময় দেবপুর গ্রামে পৌঁছলাম। ভূমিকম্পে পড়ে যাওয়া অনেক বাড়ি ঘর দেখলাম। পান্থশালায় আশ্রয় নিলাম আর রাতে এখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন (১৬ নভেম্বর) সূর্যোদয়ের আগেই খাওয়া-দাওয়া না সেরেই বেরিয়ে পড়লাম। নটার সময় নল্‌দোম্ (চীসপানী)-এর ডাঁড়াতে পৌঁছলাম। এখান থেকে নেপাল উপত্যকা দেখা যায়, কিন্তু সেদিন মেঘলা ছিল। কুলিদের রান্না করতে দিয়ে বারোটার সময় আমরা সাখু পৌঁছে গেলাম। এটাকে একটা ভালো মফঃস্বল শহরও বলা যায়। ১৮ আনা (ভারতীয় ৯ আনা) দিয়ে একটা দোকানে দই-মিষ্টি খেলাম। ভূমিকম্পে পড়ে যাওয়া বাড়িগুলো দেখলাম। এখান পর্যন্ত মোটর গাড়ির রাস্তা এসেছে, কিন্তু তাতে লরি চলে না। সূর্যাস্তের সময় বৌধা (মহাবৌধা) পৌঁছলাম। গত যাত্রায় এখানেই আমাকে পুরো মাস লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। চীনা লামার সঙ্গে কথাবার্তা হতে থাকল। পাঁচদিন আগেকার (১১ নভেম্বর) 'স্টেটসম্যান' পড়তে দিলেন। গ্যান্‌চী ছাড়ার পর (২২ সেপ্টেম্বর) এবার বাইরের জগতের খবর পেলাম।

১৭ নভেম্বর আমরা সকালেই ধর্মা সাহুর বাড়ি (৪৭ তন্‌লাছী টোল, কাঠমাণ্ডু) পৌঁছলাম। সাহু ত্রিরত্নমান ও জ্ঞানমান দুজনেই বাড়িতে ছিলেন। ভারীদের মজুরি দিয়ে বিদায় করে দিলাম, কাপড় কাচতে দিলাম। রাজগুরু পণ্ডিত হেমরাজকে আসার খবর দিলাম। ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এখন এখানেই থাকার কথা ছিল।

বইয়ের যে ছবিগুলো তুলেছিলাম, ধোয়ার পরে দেখা গেল সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। কাঠমাণ্ডু আর পাটন-এর শহর দেখলাম। বহু বাড়ি পড়ে রয়ে ছিল। অনেক স্তূপ এবং মন্দির ভেঙে গিয়েছিল। তার মধ্যে পাটন-এর মহাবোধি মন্দিরও ছিল।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে আমি সুনয়শ্রীর বিহারের জায়গাটিতে পৌঁছলাম। বিহারটি পড়ে গিয়েছিল। সুনয়শ্রীর ভেঙে যাওয়া মাটির মূর্তিটি এক জায়গায় রাখা ছিল, মাথা বেঁচে গিয়েছিল। আমি তার ছবি তুললাম। সুনয়শ্রী ভুটান গিয়েছিলেন এবং কিছু গ্রন্থ অনুবাদের ব্যাপারে তিনি সাহায্য করেছিলেন। আমি সন্ধেবেলা রাজগুরুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেইসময় সুনয়শ্রী বিহারের প্রসঙ্গ তুললাম। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওখানে তো নাড়া দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। ওই বিহার অনেক বহুমূল্যবান তালপুঁথি ছিল, আমি বহুবার সেগুলো দেখার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু গুভাজুরা

(বৌদ্ধপুরহিত) দেখাতে রাজি হয়নি। ভূমিকম্পের সময় আমাকেও কাজ করতে হতো। বর্ষার পরে একদিন ওই স্থানে গেলাম। তখন পুস্তকগুলোর কথা মনে পড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই পুস্তকগুলো কোথায় আছে? বলা হলো, এখানেই, মাটিতে। সারা বর্ষাকালটা বৃষ্টি পড়েছিল। ওই পুস্তকগুলোর ব্যাপারে আর কোনো আশাও ছিল না। তবু আমি তাড়াতাড়ি কিছু লোক ডেকে ওই জায়াটা খোঁড়াতে শুরু করলাম। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল, যখন আমি পুস্তক বাঁধার কাঠগুলো হাতে তুলে দেখলাম যে, তালপাতাগুলো পচে কাদা-কাদা হয়ে গেছে।'

আমি বেশির ভাগ সময় রাজগুরুর খণ্ডিত পুস্তক ও গেশের কণ্ঠস্থ ভোটিয়া প্রবচনগুলোর সাহায্যে 'প্রমাণবার্তিক'-এর ব্যাখ্যাগুলো ক্রমানুসারে সাজানোর কাজে ব্যস্ত থাকতাম। প্রথম তিব্বত যাত্রা থেকে ফিরে ধর্মকীর্তীর 'প্রমাণবার্তিক'-এর গুরুত্ব আমি এতটা টের পেয়েছিলাম যে, তিব্বতী থেকেই সেটা সংস্কৃতে অনুবাদ করতে শুরু করে দিয়েছিলাম। পরে শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার খবর দেন যে, রাজগুরুর কাছে 'প্রমাণবার্তিক'-এর সংস্কৃত কপি আছে। নেপালের রাস্তা দিয়ে ফেরার এটাও একটা কারণ ছিল। মূলগ্রন্থটি তো রাজগুরু ইটালিয়ান প্রফেসর তুচী-কে দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু খোঁজ করার পর তার ফটো পাওয়া গেল। পাতাগুলো এত জীর্ণ পড়েছিল যে, কযেকটি পাতার নম্বর উড়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন সেটা নিয়ে লড়াই করার পর বোঝা গেল, ১০টি পাতা নেই। আমি কাঠমাণ্ডু, পাটন, এবং জাতগ্রামের গ্রন্থগুলো দেখার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোথাও নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দেখতে পাওয়া গেল না।

২১ নভেম্বর আমরা বিক্রমশিলা-বিহার (কাঠমাণ্ডু) দেখতে গেলাম। এখানকার মূর্তি আসলে বুদ্ধের, কিন্তু তাকে সিংহসার্থবাহ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি ওপরে কাপড় পরিয়ে সার্থবাহ বানানো হতো, তাহলেও খারাপ ছিল না। কিন্তু এখানে তো ছেনি দিযে বুদ্ধের শরীরের চীবরকে কেটে ফেলা হয়েছিল, তারপরেও বাঁ হাতে চীবরের প্রান্ত এখনও লেগে রয়েছে। নিজের ধর্মের লোকই যে তাদের মূর্তির সঙ্গে এমন ব্যবহাব করতে পারে, এটা আশা করা যায় না। এখানেও কিছু সংস্কৃত বই আছে, তবে শ্রাবণ মাসে সেগুলোর দর্শন পাওয়া যেতে পারে। একটি কাগজে সোনা দিয়ে লেখা 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'ও আছে, যা নাগার্জুন নিজের হাতে লিখেছিলেন। সেটা সামনের সরোবরটি থেকে বেবিয়েছে। কাগজ বেরিয়েছে সরোবর থেকে! তবে হ্যাঁ, ধর্ম এরকমই করে থাকে। আপনি কি করে তাকে অস্বীকার করতে পারেন? দ্বাদশ শতাব্দীর আগে ভারতবর্ষে কাগজের প্রচলন ছিল না, আর নাগার্জুন তো এক হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন। তিনি কাগজে কি করে লিখবেন—এ প্রশ্নের কোনো প্রয়োজন নেই। নাগার্জুন অমর, তিনি আজও জীবিত। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হয়, যদি মনোটাইপ ও রোটারি মেশিনে 'অষ্টসাহস্রিকা' ছাপা হয়। স্বয়ংভূ স্তূপও দেখতে গেলাম। এখানেও চারকোণে চারটি পেতলের বুদ্ধমূর্তির চীবরগুলো নষ্ট করে তাতে অলংকার পরানো রয়েছে।

এবারের যাত্রায় দু-তিনজন রাজবংশী পুরুষদের সঙ্গেও দেখা করতে হয়েছিল।

মৃগেন্দ্র শামসের রাণাবংশের প্রথম এম· এ·, দরবার গ্রন্থাগারের তিনিই অধ্যক্ষ। গ্রন্থাগারের পুঁথি আমার দেখার ছিল, তাই তাঁর কাছেও যেতে হয়েছিল। অন্যান্য কথার পর তিব্বতের রাজনীতির কথাও হল। যখন আমি বললাম যে, নেপালের ব্যবসায়ীদের নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি নেই, তখন এটা শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

২৮ নভেম্বর দুপুরে জেনারেল কেসর শামসেরের কাছে যেতে হলো। তিনি খুব সাধারণ পোশাকে ছিলেন। বিদ্যার প্রতি তাঁরও ভালোবাসা রয়েছে। ওপর তাঁর চারশোর ওপর হাতে-লেখা পুস্তকের সংগ্রহ আছে। তিনি আমার 'বুদ্ধচর্যা' পড়েছিলেন। বইটির ওপর সেই করতে বললেন, আমি করে দিলাম। মূর্তি ও ছবির সংগ্রহ দেখে মনে হচ্ছিল, শিল্পকলাতেও তাঁর রুচি আছে। এছাড়া জেনারেল কেসর নেপাল রাজের বিদেশমন্ত্রীও ছিলেন। এটা হতে পারে না যে, একদিকে যে ব্যক্তি সাহিত্য, কলা ও সূক্ষ্ম ভাবনা-চিন্তার জন্য প্রাণপাত করছেন, অন্যদিকে তিনি তাঁর চারপাশে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা নরককুণ্ড দেখে নির্বিকার থাকবেন।

একদিন (১ ডিসেম্বর) জেনারেল মোহন শামসেরের কাছেও যেতে হলো। তাঁর কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আমার ছিল না। কিন্তু তিনি ধর্মমান সাহুকে বলে রেখেছিলেন যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন। আমি সম্ভবত আট-নয় মিনিট সেখানে ছিলাম। আর আমি তো কোনো রাজসভাসদ ছিলাম না যে বিশেষ কোনো কথা হয়নি। সপ্রশংস কাব্য পড়তে থাকব। এবং তাঁরও বোধ হয় আমার কাছ থেকে কিছু জানার ইচ্ছে ছিল না। তাহলেও তাঁর ব্যবহার ভদ্রতাপূর্ণ ছিল। তিনি শুনে খুব অবাক হয়ে গেলেন যে, বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।

রাতে জ্বর এসেছিল, তবুও পরের দিন (২ ডিসেম্বর) সেখান থেকে রওনা হলাম। আমার সাথে ত্রিরত্নমাস সাহুও ছিলেন। থানকোট পর্যন্ত মোটরে এলাম। চড়ার জন্যে ঘোড়া পাওয়া গিয়েছিল, তাই চন্দ্রাগঢ়ীর চড়াইতে উঠতে কোনো কষ্ট হয়নি। চিত্‌লাঙ্‌ পৌঁছতে-পৌঁছতে প্রচণ্ড জ্বর এল। ঘোড়া না আনলে খুব মুশকিলে পড়তাম।

সকালে জ্বর ছিল না। চীসপানী (সীসাগঢ়ী)-র চড়াইও কষ্টসাধ্য মনে হল না। ১১টার সময় চীসপানী পৌঁছলাম। কুলিরা এখনো পিছনে ছিল। ১টার সময় আবার জ্বর শুরু হল। তাই গেশেকে সঙ্গে নিয়ে আমি ভীমফেরী চললাম। এক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেলাম। চিররত্নমান সাহু ও ভারীরা ৩টের সময় এল। খবর পেলাম, কাস্টম্‌-এর লোকে 'প্রমাণবার্তিক' ও 'বার্তিকালংকার'-এর ফটোকপিগুলো আটকে রেখেছে। রাজগুরুর ঘোড়া এখান থেকে ফিরে যাচ্ছিল। আমি ফটোর ব্যাপারে তাঁকে চিঠি লিখে দিলাম।

সাড়ে তিনটের সময় আমাদের মোটর-লরি ছাড়ল। পথে চার জায়গায় ছাড়পত্র এবং দু-জায়গায় বাক্স দেখার লোক এল। সন্ধের সময় অমলেখগঞ্জ পৌঁছলাম। রাতে খুব জ্বর ছিল, ঘুম আসেনি, খাওয়া তো দুদিন থেকে বন্ধ।

পরের দিন সওয়া ৩টে পর্যন্ত এখানেই থাকতে হল। আগের চেয়ে বাজার এখন

আরো বড় হয়েছে। হিন্দু হোটেলও হয়েছে। জ্বর তো ছিল না, কিন্তু গলায় ঘায়ের মতো হচ্ছিল। সোয়া তিনটের সময় রেলগাড়ি পেলাম। অন্ধকার হওয়ার আগেই রকসৌল পৌঁছে গেলাম। রাত আটটায় সুগৌলীর গাড়ি পেলাম। ভূমিকম্পের জন্য যে সব রাস্তা ভেঙে গিয়েছিল, তা ন-মাস পরে প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সুগৌলী যাওয়ার লাইন তো এই সবে চার দিন আগে ঠিক হয়েছে। এখান থেকে মুজফ্‌ফরপুরের গাড়ি ধরলাম। চারটের সময় গঙ্গাতটে যাবার গাড়ি পেলাম। আটটার সময় গঙ্গাতটে পহলে-জা ঘাটে পৌঁছলাম, তারপর জাহাজে করে মহেন্দ্রু-জা ঘাট, এগারোটার সময় (৫ ডিসেম্বর) জয়সওয়াল-নিবাসে পৌঁছলাম।

শীতকালে, ভারতে

৫ ডিসেম্বর (১৯৩৪) থেকে ২ এপ্রিল (১৯৩৫) পর্যন্ত চারমাস আমাকে ভারতে থাকতে হয়। গলার ঘা ও জ্বর তো সঙ্গেই নিয়ে এসেছিলাম, এখন ঢোক গিললেই অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। বদ্যির ও হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা চলতে লাগল। হোমিওপ্যাথিকে তো আমি সাধুদের ছাইভস্ম এবং ওঝার লবঙ্গের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই না, কিন্তু জয়সওয়ালজীর বিশ্বাস ছিল। আমি ভাবলাম, এটার বিষয়েও অভিজ্ঞতা হোক। রোগ আরো বেড়ে গেল। তখন ডাঃ হসনৈনকে ডাকা হল। আমার বদ্যিও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রোগ না চিনেই ওষুধ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ডাঃ হসনৈন বললেন যে, এটা টনসিল, কেটে দেওয়াটাই ভালো। পরের দিন তিনি এসে কেটে দিলেন। আমি হাসপাতালে চলে গেলাম। যন্ত্রণা সেই রাতে খুব ছিল, আর জ্বরও ছিল ১০০ ডিগ্রি। পরের দিন (৮ ডিসেম্বর) তিনি আবার একটু অস্ত্র চালালেন। এবার যন্ত্রণা একদম শেষ হয়ে গেল। আমার তো কোনো অভিযোগ থাকার কথা নয়, কিন্তু দেখতাম গরিব রুগীদের কেউ গ্রাহ্য করে না। পরের দিন হাসপাতাল থেকে আমি চলে এলাম। ধূপনাথ ও এলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। ধূপনাথের ইচ্ছে ছিল, নালন্দার জমির জন্যে আমার কাছে থেকেই টাকাটা নেওয়া হোক। নালন্দার ব্যাপারে আমি একটু ঢিলে দিয়েছিলাম। ১২ ডিসেম্বর শ্রীমতী বোসী সেন এলেন। তিনি 'এশিয়া' (আমেরিকান) পত্রিকার জন্যে তিব্বতের চিত্রকলার ওপর একটা প্রবন্ধ লেখার কথা বললেন। আমি তাতে রাজি হলাম।

১৮ (ডিসেম্বর) তারিখ পর্যন্ত শরীর কিছুটা দুর্বল ছিল। পরের দিন আনন্দজী, জয়চন্দজী, ধূপনাথ এবং গেশের সঙ্গে রাজগীরে গেলাম। রাজগীরে এখন লোক বসতি বাড়ছিল। তপ্তকুণ্ডে স্নান করার জন্যে অনেক লোক আসছিল। আমি গৃদ্ধকূট, মনিয়র মঠ, সোনভাণ্ডার ইত্যাদি পৌরাণিক জায়গাগুলো দেখতে গেলাম। দ্বিতীয় দিন নালন্দা

পৌঁছলাম। ভোটিয়া গ্রন্থে লেখা আছে যে, নালন্দায় ১৪টি মহাবিহার আছে কিন্তু এখন এখানে মাত্র এগারোটা খনন করা হয়েছিল। সেইদিনই আমি পাটনা চলে গেলাম।

২৩ ডিসেম্বর যখন আমি বেনারস স্টেশনে নামলাম, তখন সাক্যার ফুন্‌ছোগ্ প্রাসাদের দগ্‌ছেন্, রিম্‌পোছের চিঠি পেলাম, তিনি সিকিম পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর সেবা পেয়ে আমার খুব ইচ্ছে ছিল পাল্টা সেবা করার, কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি এসেছিলেন এবং ফিরেও গিয়েছিলেন। সারনাথ হয়ে ২৫ তারিখে প্রয়াগ পৌঁছে গিয়েছিলেন। 'বিনয়পিটক'-এর অনুবাদ আমি লাসায় করেছিলাম, আর এখন সেটা লা-জার্নাল প্রেসে কম্পোজ হচ্ছিল। ১০, ১১ ফর্মার প্রুফও পেয়েছিলাম। আমি ডাঃ বদ্রিনাথপ্রসাদের ওখানে উঠেছিলাম। ২৪ দিন শুধু প্রয়াগেই থাকতে হয়েছিল, কাজের বেশিটাই ছিল প্রুফ দেখা। 'বাদ্যন্যায়'ও লা-জার্নাল প্রেসে ছাপতে দিয়েছিলাম। গেশে এক সপ্তাহ আমার সঙ্গে ছিলেন, তারপর তিনি সারনাথ চলে গেলেন। আমি এবারের তিব্বত-যাত্রাও লিখে ফেললাম। সেটা এখনও প্রেসে যায়নি, তবে হ্যাঁ, 'সাম্যবাদ হী কেঁ্যা' প্রেসে চলে গিয়েছিল।

১২ জানুয়ারি ২৮ বৎসর পর পুরনো বন্ধু মহাদেবপ্রসাদজীর (সাদাবাদ, ইণ্ডিয়া) সঙ্গে দেখা হল। কোথায় সেই ১৪, ১৫ বছরের নবযুবক আর কোথায় এই ৪২, ৪৩-এর আধবুড়ো—আমাদের দেশে চিন্তা বেশি, তাই বছরের বোঝাটা খুব ভারি হয়। এখন তার চেহারায় বার্দ্ধক্যের ছাপ ছিল। যৌবনে সেও একবার কলকাতা পর্যন্ত লাফ দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পরে সে উৎসাহ হারিয়ে বসে পড়েছিল। নুন, তেল, কাঠের চিন্তা সমস্ত জীবনকে গ্রাস করল। আমি লাফের পর লাফ মারছিলাম, আর আজও নতুন লাফ দেওয়ার জন্য সেরকমই উৎসাহ রয়েছে। আমি যখন মরবো তখনো লাফ দিয়েই মরবো।

যে সময় তিব্বতী চিত্রকলার ওপর আমি প্রবন্ধ লিখছিলাম, সেই সময় ভারতীয় চিত্রকলার বিষয়েও কিছু ভাবনা তৈরি হয়েছিল। আমার বিশ্বাস ছিল না যে এ বিষয়ে আমি কলম ধরব। সেই সময় ভারতীয় চিত্রকলাকে আমি সাতটি যুগে বিভক্ত করেছিলাম—(১) মৌর্য (৩০০ খ্রী· পূ·) (২) গান্ধার-কুষাণ (১০০ খ্রী·), (৩) গুপ্ত (৪০০ খ্রী·), (৪) অন্তিম হিন্দু (১০০০ খ্রী·) (৫) মুঘল (১৬০০ খ্রী·), (৬) রাজপুত (১৭০০ খ্রী·), (৭) আধুনিক (১৯০০ খ্রী·)।

প্রথম দু'যুগের চিত্রকলার মিলনের সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু সেই সময়কার খোদাইকরা মূর্তির থেকে আমরা কিছু কিছু চিত্রকলার অনুমান করতে পারি। সেই যুগের চিত্রকলাতে স্বাভাবিকতা অনেক বেশি। তৃতীয়-চতুর্থ যুগের চিত্রকলায় স্বাভাবিকতা কম, কল্পনা বেশি। বিশেষভাবে সুন্দর গুপ্তকালের চিত্র—তার সূক্ষ্ম রেখার জন্য তা অদ্বিতীয়। ত্রিভঙ্গি-আকৃতিগুলো খুবই আকর্ষণীয়। পঞ্চম যুগে ইরানি প্রভাব বেশি। ষষ্ঠ যুগের চিত্রকলা মুঘল চিত্রকলার ভারতীয়করণ। সপ্তম যুগের আমাদের আধুনিক চিত্রকলা

গুপ্তকালীন চিত্রকলার দ্বারা বেশি প্রভাবিত।

পণ্ডিত অবধ উপাধ্যায় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের এই অভাগা দেশকে অনেক প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক গরিব। প্রতিভাও অধিকাংশ গরিবদেরই ঘরে জন্মায়। তারা না পড়ার সুযোগ পায়, না উন্নতির। অবধ উপাধ্যায় এরকমই এক প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। অঙ্কে তাঁর খুব মাথা ছিল। কোনো একটা বিষয়ে যে অসাধারণ হয় তার যে অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও তেমনি আকর্ষণ থাকবে, তা নাও হতে পারে। অবধ উপাধ্যায় কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন কিন্তু তারপরে আর পড়াশোনা করার কোনো উপায় তাঁর ছিল না। তিনি পুরনো পরিবেশের মধ্যেই বড় হয়েছিলেন, তাই ব্রাহ্মণদের ছুত-অচ্ছুত, জাতপাতের ভয়ানক ব্যাধি তাঁর মাথার ওপরে চেপে ছিল। অন্যান্য বহু ভারতীয়দের মতো তাঁরও বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রাচীন নির্বুদ্ধিতা কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর স্থাপিত—সাড়ে তিন হাজার বছর পুরনো আমাদের ঋষিদের মস্তিষ্ক অনেক বেশি উর্বর ছিল। তাই গরুর খুরের সমান টিকি রাখা উচিত, আঙুল সমান মোটা পৈতাও গলায় ঝোলানো উচিত, শীতে কাপড় ছেঁড়ে লাফিয়ে রান্নাঘরে ঢোকা উচিত। কোনো এক সময় যখন শ্রীচিন্তামণি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি অবধকে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে বিলেত পাঠাতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু তিনি ম্লেচ্ছদের দেশে যেতে রাজি হবেন কেন? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভার খবর পান। অবধজীকে কলকাতায় ডাকা হয়। কিন্তু আশুতোষ বেশিদিন জীবিত থাকতে পারেননি। অবধজী উচ্চ-গণিতের কিছু বিষয়ের ওপর লেখা লিখেছিলেন, যা ইউরোপের প্রতিষ্ঠিত গবেষণাধর্মী পত্রিকাগুলো ছেপে ছিল। সেগুলো প্রশংসিতও হয়েছিল। কিছুদিন তিনি খুব হৈচৈ করলেন, কিন্তু দেখলেন কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তখন ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া তাঁর করণীয় কি ছিল? এখন তিনি কোনো স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন। আমি ভাবছিলাম—এ তো প্রতিভাকে হত্যা করা। এখন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি, তবু আমি কোনো শিষ্টাচার না দেখিয়ে সরাসরি চিঠি লিখলাম—প্রতিভাকে এভাবে নষ্ট করার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। ১৮ জানুয়ারি তাঁর চিঠি এল বিদেশ যেতে তিনি রাজি, সেই সঙ্গে কিছু অসুবিধের কথাও জানিয়েছেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রয়াগে এলেন। তারপর আমাদের খোলাখুলি কথাবার্তা হল। নিজের লেখা বই থেকে আমার মাসে এক-দেড়শ টাকা চলে আসত। আমি হিসেব করে বললাম, 'এই টাকাটাই যথেষ্ট।' তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য আর এক বন্ধুর কাছে নিয়ে গেলাম। কিন্তু বন্ধুটি না দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছিল, না ছিল তার সাহসী জীবনের সঙ্গে সামান্য পরিচয়। সে নিরুৎসাহজনক কথাই বলল। বিশেষ করে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ব্যাপারে নানান অসুবিধের ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরল। আমরা দুজনে ফিরে এলাম।

আমি অবধজীকে বললাম, 'ওর কথা এখনই ঝেড়ে ফেলে দিন। গণিতে আমারও কোনো একসময় রুচি ছিল, বলতে পারি না, যদি গণিত নিয়েই থাকতাম তাহলে

কোথায় পৌঁছে যেতাম। আমি এটা বলতে পারবো না, গণিতের কোন কোন বিষয়ে কোথায় কোথায় ভালো শিক্ষা দেওয়া হয়, আর সেখানে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ কে কে আছেন। কিন্তু আপনাকে একটু বিশ্বাস দিতে পারি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য একটুও অসুবিধে হবে না। আপনার লেখাও গবেষণাধর্মী পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয়েছে। যদি আপনি প্রতিভাকে মাথার ভেতর লুকিয়েও সেখানে পৌঁছে যেতেন, তাহলেও আপনার জন্য দরজা বন্ধ হত না।' অবধজী দু-তিনদিন থাকলেন। তারপর তিনি বললেন, 'এখন আমি কোনো কিছুর তোয়াক্কা করব না, আমি ফ্রান্স যাব। ওখানে যা খাওয়া-দাওয়া করতে হয়, আমি তার জন্য চিন্তা করব না।' তখনও উপাধ্যায়জীর বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি ছিল। আমি জানতাম, তাঁর জীবনের বহুমূল্য পঁচিশটি বছর আমাদের আর্থিক-সামাজিক ব্যবস্থা নষ্ট করে দিয়েছে। গর্দভের ছেলে গর্দভ, তার পিছনে টিউশন লাগিয়ে লাগিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সে পারে, শুধু এই জন্যেই যে, সে ধনী। আর প্রতিভাবান ছেলেরা রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি খায়।

একটা ব্যাপারে আমাকে এই সমাজ তার কট্টর শত্রু করে তুলেছে, তা হলো, প্রতিভার অবহেলা। প্রতিভা শখের জিনিস নয়। প্রতিভা হলো রাষ্ট্রের সবচেয়ে জোরালো ও বহুমূল্য পুঁজি। বিজ্ঞানের একেকটি আবিষ্কার পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করার জন্য কি কি উপায় আমাদেরকে প্রদান করেছে? যে বছরগুলো চলে গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। অবধজীর হাতে তো এখনো আরো কিছু বছর সময় ছিল—কিন্তু আমি খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম যে, সেই সংকল্পের পর মোট ছ-টি বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। তিনি ফ্রান্সে গেলেন। সেখানে ডক্টরেট উপাধি পেলেন। কিন্তু আমাদের এখানকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'মুড়ি মুড়কির এক দর'[১]—এই কাণ্ডই মূলত ঘটে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে যে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ধরুন আর তার এক-একটি ছাত্রের মুখের দিকে এক-একবার করে তাকান। এতে কোনো সন্দেহ নেই, যে, সেখানে টুপি, নেকটাই আর কোটই বেশি দেখা যাবে। কিন্তু সেই টুপিগুলোর নিচে হলুদ শাসটুকুকে ওজন করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন, আমরা কি দেখছি। শুধুমাত্র তোষামোদের ভরসায়, শুধুমাত্র ছেলে-জামাই আর কাকা-ভাইপো হওয়ার কারণে সেখানে পঞ্চাশ শতাংশ গাধা, খচ্চর, টাট্টু ভরে রয়েছে।

আর যাঁদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার, তাঁদের ভেতরে তো আরো কম যোগ্য লোক দেখা যায়। অবধজীর মত যোগ্য ব্যক্তির জন্য যখনই কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যাপার হয়েছে তখনই সেই অসুবিধে দেখা দিয়েছে। যাই হোক, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গণিত বিষয়ে গবেষণায় ছাত্রদের সাহায্য করার কাজ পেয়ে যান। নিজের সবটুকু সময় তিনি ওই কাজে দিতে চাইতেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে দু-তিন বছরও কাজ করতে দিল না।

---

[১] মূলগ্রন্থে ব্যবহৃত লোক-কথাটি— *সব ধান বাইস পঁসেরী।*—স·ম·

—১৯৩৫—

বেনারসে (২০ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে ভাষণ দিতে গেলাম। আমার কথাগুলো নিশ্চয়ই বুড়োদের খুব তেতো লাগত। যদিও আমার শরীরে ভিক্ষুর হলুদ বস্ত্র ছিল, কিন্তু আমার কথাতে ধর্মের কোনো প্রয়াস ছিল না।

খবর পেলাম, ভিক্ষু উত্তম চাইছেন যে, পালি-ত্রিপিটক হিন্দি অক্ষরে ছাপা হোক। আমি ত্রিপিটকের থেকে 'বুদ্ধচর্চা', 'ধম্মপদ' ও 'মজ্‌ঝিমনিকায়' অনুবাদ করে ফেলেছিলাম। 'বিনয়পিটক'-এর অনুবাদও প্রেসে কম্পোজ হচ্ছিল। মনে নেই, ছাপা হতে হতে কোনো প্রকাশক পাওয়া গিয়েছিল কিনা। 'ছাদনাতলা বানিয়ে বর খোঁজা'র পদ্ধতি আমি একটু-একটু করে আয়ত্ব করেছিলাম। লা-জার্নাল প্রেসের মালিকও বিশ্বাস করে বসছিলেন যে, ছাদনাতলা বানাতে সাহায্য করলে ক্ষতির কিছু নেই। হিন্দি বইগুলোর ব্যাপারে আমি এরকমটা করতে পারতাম, কিন্তু পালি-ত্রিপিটকের জন্য সেটা করতে চাইতাম না। ২৩ জানুয়ারি কলকাতা গেলাম। ভিক্ষু উত্তমের সঙ্গে দেখা হলো আর ঠিক হলো যে, খুদ্দকনিকায়-এর কিছু রচনার প্রথম খণ্ড বেরিয়ে যাক। এদিকে যখন আমি প্রয়াগে ছিলাম, তখন একদিন পণ্ডিত ব্রজমোহন ব্যাস আমাকে দূরে কাগজে রেখে পড়তে দেখলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন এবং কলকাতা থেকে আমি চশমা আনিয়ে বিয়াল্লিশ বছর বয়স (২৭ জানুয়ারি) থেকে চশমা পরা শুরু করলাম। ২৮ জানুয়ারি গয়াতে ছিলাম। শ্রীমোহনলাল মহতোর ওখানেবেশ গল্পসল্প হতো। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সেই দূরবস্থাই ছিল। বুদ্ধমূর্তির মাথায় ত্রিফটকার চন্দন ও গেরুয়া কোপনী পড়েছিল।

যথার্থবাদের দিকে আমি কতটা অগ্রসর হয়েছিলাম তা ২ ফেব্রুয়ারিতে লেখা ডায়েরির এই লাইনগুলো থেকে বোঝা যাবে—'বস্তুর মূল্য বর্তমানে আছে এবং ক-মিনিট পর্যন্ত সে-মূল্য থাকে?' অতীতের স্মৃতিকেও আমি প্রিয় বস্তু বলে মনে করতাম। মধুর সম্পর্কের স্মৃতি পৃথিবীতে সবচেয়ে মধুর বস্তু।

২৮ জানুয়ারি থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমি নিজের বই-এর কাজে লেগে ছিলাম। সেই সময় (৩ ফেব্রুয়ারি) ত্রিবেণীর তীরে অমাবস্যার খুব ভিড় ছিল। আমিও দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে নদীর চড়ায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ গোরখপুরের এক বৃদ্ধ আমার পা জড়িয়ে ধরলেন। হলুদ কাপড় পরা হৃষ্টপুষ্ট শরীর দেখে তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, ইনি কোনো দিব্যপুরুষ। আমি কত করে তাঁকে বললাম কিন্তু তিনি কিছু না খাইয়ে আমায় ছাড়তে রাজি হলেন না। সে-সময় প্রুফ দেখা, ফটো থেকে 'বাদন্যায়'কে কপি করা ইত্যাদি ইত্যাদি এত বেশি কাজ ছিল যে, কোনো কোনোদিন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত জাগতে হতো। ২৯ ফেব্রুয়ারি আমি প্রথম ফিল্ম (চণ্ডীদাস) দেখতে গেলাম। আমার এটা একেবারে খারাপ লেগেছিল। তার আগে ১৯৩০ সালে কেবল একটি ইংরেজি ফিল্ম দেখেছিলাম, তবে সেটা ছিল নির্বাক ছবি। ছাপরাতেও গিয়েছিলাম (২৪ ফেব্রুয়ারি) এবং সিওয়ানেও (২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি)। ছাপরাতে তো আমার পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে এবং সিওয়ানে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করার ছিল। চৌধুরী একজন তরুণ আই·সি·এস· ছিলেন। ঐতিহাসিক গবেষণায় তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি আমার

জন্য তিব্বতে ক্যামেরা পাঠিয়েছিলেন। গেশেও এখন তাঁর কাছেই ছিলেন। সে-সময় তিনি সিওয়ানের সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর ন্যায়শীলতা এবং প্রজাবৎসলতার অনেক গল্পই প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বহু মোকদ্দমাই তিনি মিটমাট করিয়ে দিতেন। একটি বিখ্যাত কাহিনী ছিল—এক ধোপা তার গাধার পিঠে প্রচুর পরিমাণ বোঝা চাপিয়ে আসছিল। গাধা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোর সামনে এসে চেঁচাতে আরম্ভ করল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাইরে বেরিয়ে এলেন। ধোপাকে বললেন, 'তোমার পিঠে যদি এই বোঝা চাপানো হতো তাহলে তোমার কি অবস্থা হতো বলো ত?'

এখানেও আমি প্রুফগুলো নিয়ে এসেছিলাম। চৌধুরীসাহেব যখন কাছারী যেতেন আমি তখন প্রুফ দেখার কাজ করতাম। ধূপনাথ আমার প্রিয় ছিলেন—আমি কাছাকাছি আছি অথচ তিনি আমার কাছে এলেন না—এটা কি হতে পারত? চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে রাঁধুনি হল চীনা—সুতরাং খাদ্য-অখাদ্যের আর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কোনো খাদ্যবস্তু আছে চীনারা যার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেনি? ধূপনাথের খাবার মুসলমান চাপরাসী নিজের হাতে নিয়ে এল। সে তার নিজের জেলার একজন গাট্টা-গোট্টা লোককে টেবিলে বসে খেতে দেখে খুব আশ্চর্য হল। জানিনা ধূপনাথ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন কিনা। ধূপনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল ন-বছর আগে। সে-সময় তাঁর ঘাড়ে বৈরাগ্য আর বেদান্তের জবরদস্ত ভূত চেপেছিল। বাড়ির লোকেরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় ছিলেন। আমিও সাধু-ফকির ছিলাম এবং ছিলাম পাশেই পরসী বলে জায়গার একজন বিদ্বান সাধু। তখনকার ত্যাগের কথা আর কি বলবো—শুধু একটা কালো কম্বলের জোব্বা আর ল্যাংগটের সঙ্গে ছিল সম্পর্ক। ধূপনাথ ইতিমধ্যে দু-চারজন সাধু-সন্ন্যাসীর কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন—কিন্তু তাতে সাধ মেটেনি। হয়ত ভেবেছিলেন এই কালো কম্বলে কোনো গুণ আছে। তিনি আমার কাছে এলেন। প্রথমে আমি তাঁকে ১৯২৬ সালের কাউন্সিল ইলেকশনের কাজে লাগিয়ে দিলাম। সে-বছরই কংগ্রেস প্রথমবার নিজেদের প্রতিনিধি দাঁড় করিয়েছিল। এরপর শীতের সময় যখনই আমি এখানে আসতাম, হয় ধূপনাথ আমার কাছে আসতেন না হয় আমিই সুলতানগঞ্জ যেতাম। আমার কথা শুনে এবং বই পড়ে তিনি ঈশ্বর ও বেদান্তের ফাঁদ থেকে ছাড়া পেলেন। কিন্তু গুরু গুড়ই রয়ে গেল, আর শিষ্য হয়ে গেল চিনি—আমি ধর্মের নানা ব্যাপার থেকে এখন তো দূরে সরে এসেছিলাম, বৌদ্ধদের নির্বাণকেও ফালতু বলে ভাবছিলাম। কিন্তু যুক্তিবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করার পথে একটা জিনিস বাধা সৃষ্টি করছিল—সেটা ছিল পুনর্জন্মের কল্পনা। এমন নয় যে পুনর্জন্মে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাকে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করার মত প্রস্তুতিও আমার ছিল না। ধূপনাথ আগেই আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, একদিন বললেন, 'এই পুনর্জন্মও মিথ্যা কল্পনা।'

সিওয়ান থেকে গেশে আর আমি দুজনে কসয়া (কুশীনারা) গেলাম। কসয়া বুদ্ধের নির্বাণস্থান। প্রায় বছর ত্রিশেক হল মহাবীর ভিক্ষু ও চন্দ্রমণি মহাস্থবির ওখানে ধুনি

জ্বালিয়েছিলেন। তার আগে ঐ স্থানটির মাহাত্ম্য সম্পর্কে কারো খেয়ালও ছিল না। এখন ঐ জায়গাটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান—দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ আসে। কিছু হিন্দু নেতাদের বাতিক হচ্ছে যে, যদি তাদের সঙ্গে বৌদ্ধদেরও জুড়ে দেয়া যায় তবে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাব। কিন্তু শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা তাঁরা কখনও করেছেন কি? হিন্দুদের সংখ্যা তো ভারতবর্ষেই অধিক, কিন্তু তার এক-তৃতীয়াংশকে অচ্ছ্যুৎ বানিয়ে মানুষ নয়, জানোয়ারের শ্রেণীতে রেখে দেয়া হয়েছে। সংখ্যায় অর্দ্ধেক মহিলা, যারা হিন্দু পরিবারে সবচেয়ে দুর্বল এবং অধিকার থেকে বঞ্চিতা। হাজার জাতিতে বিভক্ত হয়ে, একে অপরকে নিচু জ্ঞান করে এরা ভাবছে যে দুনিয়ার বৌদ্ধদের মিলিয়ে দিয়ে নিজেদের শক্তিশালী করবে। এইসব হিন্দুদের ধর্মের ছায়া থেকে ঈশ্বর বৌদ্ধদের রক্ষে করুন। তবে মনে হচ্ছে ভগবানও অনেকদিন হল আর নেই, না হলে এই সব হিন্দুদের কবেই ভরাডুবি হতো। আর এই নেতারা নিজেদের সঙ্গে বৌদ্ধদের নিতে চান তাঁদের শর্তানুযায়ী। তাঁরা চান বৌদ্ধরা ঈশ্বরকে স্বীকার করুন আর প্রচার করুন যে বুদ্ধও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করার জন্য উপদেশ দিতেন, নয়তো একথা অন্তত বলুন যে বুদ্ধ নিজেই ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। সিলোন, বার্মা, তিব্বতের বৌদ্ধরা যতই গরু, মোষ, ইয়াক, শুয়োরের মাংস খাক না কেন, তাদের এবার গোমাতার ক্ষুর মস্তকে ধারণ করা উচিত—ইত্যাদি ইত্যাদি। শেঠ যুগলকিশোর বিড়লা ও বাবা রাঘবদাস এই ধরনের হিন্দুনেতা। বিড়লাদের টাকা আছে। এরা যদি সাট্টা খেলার দশমাংশও এরকম কাজে লাগায় তাহলেও বহু ধর্মশালা তৈরি করাতে পারে। সে-সময় এখানে বিড়লার টাকা আর বাবা রাঘবদাসের পরিশ্রমে একটি ধর্মশালা তৈরি হতে যাচ্ছিল। হয়ত কিছু মূর্খের ধারণা যে, ২৫, ৫০ হাজার টাকা খরচ করে অনীশ্বরবাদী, জাতিভেদবিরোধী, খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে স্বাধীন, বৌদ্ধদের হিন্দু বানিয়ে ফেলা যাবে। এই কারণে বাবা চন্দ্রমণির ধর্মশালার সঙ্গে নয়—তার থেকে আলাদা করে একটি ধর্মশালা বানানো হচ্ছিল। এবারই দেখলাম চন্দাবাবার যথেষ্ট বার্ধক্য এসে গেছে।

পরের দিন (১ মার্চ) আমরা গোরখপুর গেলাম। গেশেকে ভারতের দ্রষ্টব্যগুলো দেখাবাব ছিল। তাঁকে আমরা 'গীতা প্রেস'ও নিয়ে গেলাম। তিনি অবশ্য লা জার্নাল-এর মত ছাপাখানাও দেখে এসেছেন। আমি বললাম, 'এটা হল চীনের থেকেও সস্তা আফিমের দোকান। এখান থেকে মনুষ্যত্বের কলঙ্ক, হিন্দুদের ভণ্ডামিকে মজবুত করার জন্য কাগজ-কালির মাধ্যমে সস্তা থেকে আরো সস্তায় আফিম বিক্রি করা হয়।' দেখার বিষয় হল প্রাচীন যুগের নৃপতিরাও অন্য জাতি—ব্রাহ্মণকে আফিম বেচার ঠিকা দিয়েছিল, কিন্তু এখন কলিযুগে বেনেদের হাতে টাকা আছে, এই ঠিকা বেনেদের হাতে এসেছে। বেনেরা তুলো কেনা থেকে শুরু করে সেগুলো দেশ-বিদেশে বয়ে নিয়ে যাওয়া, সুতো কাটা, কাপড় বোনা, আবার সেই তৈরি কাপড় দেশে-বিদেশে রপ্তানি করা, বিক্রি করা—তাকে টাকায় পরিণত করা পর্যন্ত সমস্ত কাজ এবং সমস্ত লাভই যেমন নিজের হাতে রাখে, সেরকমই ধর্মের পুরো ব্যবসাটাও এখন তারা নিজেদের হাতে রাখতে চায়। আমি গেশেকে বললাম, 'আপনি যদি তিব্বতের যোগীদের নাম দিয়ে বড় বড় অলৌকিক

ব্যাপারের কথা জানান, তাহলে সেগুলোকে সত্যঘটনা বলে ছাপিয়ে ৩০ কোটি হিন্দুদের মধ্যে বিলোবার দায়িত্ব নিতে এই দোকান প্রস্তুত আছে।'

আমরা রাতে সোজা নৌতনওয়াঁ পৌঁছে গেলাম তারপর আবার সেখান থেকে গরুর গাড়ি নিয়ে লুম্বিনী গেলাম। এবার দেখলাম লুম্বিনীর চেহারাও পাল্টে গেছে। আশেপাশের জমি খোঁড়া হয়েছে। পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড় শেষ হয়ে গেছে, আর প্রথমবার যখন এসেছিলাম তখন যেগুলোকে চোর-ছাঁচোড়দের লুকোবার জায়গা বলা হতো সেগুলো এখন আর নেই। জায়গাটা এবার বেশ খোলামেলা মনে হচ্ছিল। কিন্তু খননের কাজ এমন লোককে দিয়ে করান হচ্ছিল যার উৎসাহ প্রচুর থাকলেও পুরাতত্ত্বের ক-খ জ্ঞানও ছিল না। পাথরের, চুনের, মাটির—সব রকম মূর্তিগুলো এলোমেলোভাবে ঝুড়িতে ভরে বা মাটিতে এক জায়গায় রেখে দেয়া হয়েছিল। ঠোকাঠুকাতে মূর্তিগুলো ভেঙে যাচ্ছিল। না-জানি এগুলোর মধ্যে ক-টা নেপাল মিউজিয়াম পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। এগুলোর মধ্যে কোনোটা শুঙ্গকালীন[১] মাটির খেলনা, আবার কোনোটা কুষাণ-যুগের[২] লালপাথরের মস্তক, একটি ৬-৭ আঙুলের অবলোকিতেশ্বরের অত্যন্ত সুন্দর পাথরের মূর্তিও আছে। একটি মুদ্রায় খড়্গধারী পুরুষের ওপর সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর অক্ষরে 'এই ধর্মা· · ·' অঙ্কিত আছে। গুপ্তযুগের[৩] বহু সুন্দর মাটির মস্তক আছে। আমি ডায়েরিতে লিখেছিলাম, 'মূর্তিগুলোর তাৎপর্য কিছুমাত্র না বোঝার ফলে ততটা মনোযোগ দেয়া হয়নি, ফলে ভয়ংকর ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।'

গুপ্তযুগের পরবর্তী সময়ের মূর্তির সংখ্যা খুব কম। মাটি খুঁড়ে বের করা মূর্তিগুলো দুটি স্তূপ ও বড় একটি বেদির আকারে জমা করে রাখা হয়েছে। এখন যাত্রীদের থাকার জন্য একটি ভালো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাংলো তৈরি হয়েছে। গেশে সামনে দৃশ্যমান হিমালয়ের একখানি ছবি এঁকে ফেললেন।

পরের দিন (৩ মার্চ) এগারোটার সময় রওনা হয়ে সন্ধে সাতটায় আমরা নৌতনওয়াঁ ষ্টেশন পৌঁছলাম। সেখান থেকে আমরা বলরামপুরের উত্তরে সহেট-মহেট (জেতবন, শ্রাবস্তী) গেলাম। পুরনো জায়গাগুলো আবার দেখলাম। কাহুভারী গ্রামে অনেকগুলো পুরনো কার্ষাপণের (মুদ্রা) সঙ্গে একটি শুঙ্গকালীন মাটির খেলনাও কিনলাম। এ ধরনের

---

[১] ১৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। এই সময়কার মৌর্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উত্তরাধিকারী হলো শুঙ্গরা। পশ্চিম ভারতের উজ্জয়িনী অঞ্চল থেকে আগত এরা ছিল এক অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ বংশজাত এবং মৌর্যদেব অধীনস্থ কর্মচারী। শেষ মৌর্যরাজাকে হত্যা করে পুষ্যমিত্র সিংহাসন দখল করে শুঙ্গরাজবংশেব প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধসূত্র থেকে জানা যায় যে, পুষ্যমিত্র বৌদ্ধদেব ওপর অত্যাচার করেন, বিশেষ করে অশোকেব তৈরি তাদের উপাসনাগারগুলো ধ্বংস করে দেন। কিন্তু এ তথ্য অতিরঞ্জিত, কারণ এ সময়ে বৌদ্ধস্তম্ভগুলো পুনর্নির্মিত হয়েছিল।—স·ম

[২] কনিষ্কের রাজত্বকালই কুষাণযুগের শ্রীবৃদ্ধিময় উল্লেখযোগ্য সময়। কণিষ্ক সিংহাসনে বসেছিলেন ৭৮ থেকে ১৪৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে।—স·ম·

[৩] গুপ্তযুগের সূচনা ধরা হয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের কাল থেকে। অর্থাৎ ৩১৯-২০ খ্রীস্টাব্দ থেকে।—স·ম·

—১৯৩৫—

জিনিস এখানকার লোকজন প্রায়ই পেয়ে যায়। বলরামপুর গোণ্ডা হয়ে আমরা লক্ষ্ণৌ পৌঁছলাম। ভদন্ত বোধানন্দ মহাস্থবির খুব আন্তরিকতার সঙ্গে দেখা করলেন। ইনিই প্রথম বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন, যাকে দেখার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। গেশেকে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়াম দেখালাম। হড়হা-র শিলালেখটি দেখে তিনি বললেন, 'এটাতো মনে হয় তিব্বতী অক্ষরে লেখা, কিন্তু পড়ে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এই অক্ষর থেকেই তিব্বতী লিপি তৈরি হয়েছে।' ৭ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত আমরা প্রয়াগে থেকে প্রুফ দেখলাম। 'বিনয়পিটক' প্রকাশের দায়িত্ব মহাবোধি সভা নিয়েছিল, তাই একটা বড় চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেলাম। ১১ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত পাটনায় রইলাম, কাজ সেই প্রুফ দেখা। একাজে ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপও হাত লাগালেন।

এ বছর গরমে আমি জাপান যাওয়ার প্রোগ্রাম তৈরি করেছিলাম। বন্ধুরা ছ-সাতশ টাকা জোগাড় করে আমার হাতে দিয়েছিলেন, ফলে কুশলে জাপান পৌঁছে যাবার ব্যাপারে আর সন্দেহ ছিল না। ২৭ তারিখ ধুপনাথের সঙ্গে সুলতানগঞ্জে গেলাম আর সেখান থেকে তার পরের দিন কলকাতা গেলাম।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায় এখন পাটনা থেকে কলকাতা চলে এসেছিলেন। রায় সাহেব প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁর আশ্চর্য কর্তৃত্ব ছিল। ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্বে তাঁর অনায়াস দখল ছিল। তরুণ বয়সে তিনি দেশপ্রেম এবং বিবাহ—এই দুটি বিপত্তি ঘাড়ে নিয়েছিলেন। এখন ঘরে সন্তানও অনেকগুলো হয়ে গিয়েছিল। আজকাল চাকরির ক্ষেত্রে জাতপাত আর প্রাদেশিকতার মহান শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জয়সওয়ালজী তাঁকে যোগ্য পুরুষ বিচার করে সবরকম সাহায্য করতে চাইতেন। বহু বছর ক্ষীরোদবাবু পাটনায় ছিলেন। আমরা অজন্তা, ইলোরা, সাঁচী, ভিলসা, ইত্যাদি কত প্রাচীন জায়গায় একসঙ্গে বেড়িয়ে এসেছি। আমি একদিকে তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভা খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম, অন্যদিকে তাঁর অর্থকষ্টও দেখেছিলাম। জয়সওয়ালজী পাটনা মিউজিয়ামের কিউরেটরের পদে তাঁর জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাঙালী-বিহারীর প্রশ্ন উঠল। সুতরাং পাটনা মিউজিয়াম একজন মহৎ তথা যোগ্য ব্যক্তির সেবা থেকে বঞ্চিত হল। তারপর ক্ষীরোদবাবু কলকাতা চলে এসেছিলেন এবং কোনো এক ধনী ব্যক্তির হয়ে লিখে দিনযাপন করছিলেন। কত সুন্দর আর মধুর ছিল তাঁর স্বভাব। দুশ্চিন্তার আগুন তার মনের ভেতর ধিকি ধিকি জ্বলত কিন্তু সে-আগুনের ধোঁয়া তিনি তাঁর মুখের ওপর আনতে চাইতেন না। তিনি সে-সময় আমার বই (তিব্বতমে সওয়া বরস) এক আমেরিকান প্রকাশকের জন্য অনুবাদ করছিলেন। তখন কি আর জানতাম যে এই মৃদুহাসি-মুখ আর কখনও দেখতে পাব না।

ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপেরও আমার সঙ্গে পেনাঙ পর্যন্ত যাওয়ার কথা ছিল। ১ এপ্রিল আমি আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানিকে টাকা দিয়ে ২৯০ ডলারের চেক নিলাম, জাপানের ভিসাও করিয়ে নিলাম। ১৪৲ টাকা করে দিয়ে রেঙ্গুনের টিকিট কাটলাম। গেশের কাছ থেকেও বিদায় নিলাম, তাঁর এখন দার্জিলিঙ থাকার ছিল।

জাপানে, ১৯৩৫

জাপানের দিকে

২ এপ্রিল বেলা দুটোর সময় 'গঙ্গাসাগর' জাহাজে কলকাতা থেকে রওনা হলাম আর ৫ তারিখ নটা-দশটার সময় রেঙ্গুন পৌঁছলাম। আমরা ডেকের যাত্রী ছিলাম। ইংরেজ জাহাজ-কর্তৃপক্ষ আর রেল-কোম্পানি তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের নিয়ে কতটা চিন্তা করে তা আর বলার দরকার নেই। ডেকের ওপর কয়েকশো যাত্রী ঠাসাঠাসি করে বসেছিল। তাদের জন্য স্রেফ একটি জলের কলের ব্যবস্থা ছিল। স্নানের জন্য কোনো ঘর নেই, পায়খানা অত্যন্ত নোংরা ছিল। ডেকের ওপর ছিল ক্যানভাসের ছাত, এপ্রিল-মে মাসের রোদ সে কি ঠেকাতে পারত? খাবার ব্যবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ, হিন্দুদের খাবারের তো কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। একটা মুসলিম হোটেল ছিল, কিন্তু হিন্দুরা নিজেদের বোকামির জন্যই তার সুবিধে নিতে পারছিল না। খাবার জন্য আমরা যখন এদিক-ওদিক খুঁজছিলাম তখনই এই মুসলিম হোটেলটির সন্ধান পাই। ভাত আর মুর্গির মাংস তৈরি ছিল—আমার এলাহাবাদের মোমিন[১] ভাইকে হাজার হাজার ধন্যবাদ দিতে আমি রাজি ছিলাম। হিন্দুযাত্রীদের এই সুখদায়ক বৃক্ষছায়া ভোগ করার সুযোগ ছিল না। কাশ্যপজীও কেবল অর্দ্ধেক লোভ তুলতে পেরেছিলেন—কারণ আনন্দজীর মত তিনিও ঘাস-পাতাতেই আটকে ছিলেন। আমি তাঁদের বলতাম, 'আরে ভাই! মুর্গির মাংস খাও শরীরে চর্বি কম হবে, শরীর একটু হালকা হবে, মনে একটু ফুর্তি আসবে।' কিন্তু 'সকল পদারথ এহি জগ মাঁহী, কর্মহীন নর পাবত নাহী।'[২] তিনি কেবল রুটি, তরকারি খেলেন। তরকারিতে এবং মাংসেও লঙ্কা বেশি ছিল না। জয়পুরের পণ্ডিত হনুমান প্রসাদ রেঙ্গুনে ডাক্তারী করতেন। তিনি সপরিবারে বাড়ি থেকে আসছিলেন। আমাদের হলুদ কাপড়চোপড় আর শিক্ষাদীক্ষা দেখে খুব খাতির করছিলেন। তবে মুসলমান হোটেলে ভাত, মুর্গির মাংসের ব্যাপারটাতে তাঁর নিশ্চয় খটকা লাগছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'অহিংস মতাবলম্বী হয়েও মাংস কেন খান? এতে কি আপনি হিংসার ভাগীদার হচ্ছেন না?' আমি বললাম, 'কার্যসম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যদি ঐ কাজ করার ইচ্ছে পুরুষের থাকে তবেই সে ঐ কাজের কর্তা হতে পারে। আপনি জানেন, বাজারে যে-সময়ে পাঁঠাকে কাটা হচ্ছিল তার আগে আমার মনে ঐ কাজটি করার কোনো ইচ্ছেই ছিল না, তাহলে মিছিমিছি একাজের জন্য আমি কি করে কর্তা হতে পারি? আমরা মাংসকে যে-অবস্থাতে খাই, সেটা তো ডাল-ভাতের মত নির্জীব অবস্থা। হ্যাঁ, আমি খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ

---

[১] ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান পুরুষ।—স·ম·

[২] তুলসীদাসের *রামচরিত মানস* থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ হল, 'এই জগতে সবকিছুই আছে, কিন্তু নিষ্কর্মা মানুষ তার সন্ধান পায় না'।—স·ম·

করলাম, তারপর যদি কেউ ছুরি নিয়ে মুর্গি জবাই করতে যায়, তাহলে আমি অবশ্যই তার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করব।'

খাওয়া-দাওয়ার সমস্যা তো সেদিনই মিটিয়ে ফেলেছিলাম, এখন বাকি রইল স্নান আর পায়খানার ব্যাপারটা। আমাদের বেনারস জেলারই বুদ্‌ধু ভগত জাহাজে মেথরের কাজ করছিল। আমি তার সঙ্গে ভাই-ভাই পাতিয়ে ফেললাম—আর এটা করতে মাতৃভাষা প্রচুর সাহায্য করল। শুধু পয়সা দিয়ে দিলে বুদ্‌ধু অত ভালোবেসে কাজ করে দিত না। কোনো একটি ঘর ছিল সেখানে ও বালতি ভর্তি করে রেখে দিত এবং আমরা বেশ সাবান লাগিয়ে মজা করে স্নান করতাম। মেথরের হাতের জলে চান করেছি বলে আমার সাথী ও প্রতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে যা বলাবলি করত তাতে আমি কান দিতাম না। প্রথম দিন বেলা দুটোর সময় গঙ্গাতেই আমাদের জাহাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। জানা গেল যে, নদীতে জল কমে গেছে। তিন ঘণ্টা বাদে জাহাজ আবার চলল। সন্ধের আগেই আমরা সমুদ্রে পৌঁছে গেলাম। সমুদ্র খুব শান্ত ছিল। আকাশে মেঘ ছিল কিন্তু ভাগ্যি ভাল যে বৃষ্টি হচ্ছিল না, নাহলে ডেকের যাত্রীদের যে কি দশা হতো! আমাদের জাহাজে বেশিরভাগ কেন প্রায় সবাই ভারতীয় ছিল। যুক্তপ্রদেশ, বিহার, নেপাল, পাঞ্জাব, গুজরাত, সিন্ধ আর বাংলা—সব জায়গারই লোক ছিল। পাঞ্জাবীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

৫ তারিখ অন্ধকার থাকতেই জাহাজ 'গঙ্গাসাগর' রেঙ্গুনের খাঁড়িতে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ছ-টার সময় সকালে বন্দরের দিকে চলতে শুরু করল। সাতটার সময় পাড়ে লাগল। এক গুজরাতী বন্ধুর সহায়তা আমার পাসও সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রীদের সঙ্গে হয়ে গেল। রেঙ্গুনের 'হিন্দি-গোষ্ঠী' যখন শুনল আমি জাপান যাচ্ছি, তখন তাদের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি হবার জন্য আমাকে লিখেছিল, আমিও তখন মেনে নিয়েছিলাম। শ্রীধর্মচন্দ্র খেমকা এসেছিলেন। কাস্টম ইত্যাদিতে কোনো অসুবিধো হয় নি। আমরা মোটরে করে লক্ষ্মীনারায়ণ ধর্মশালায় পৌঁছে গেলাম। সন্ধেবেলা মোটরে চড়ে শহরটাও দেখে এসেছিলাম। রেঙ্গুনের ৪ লক্ষ বসতির মধ্যে ১ লক্ষ ভারতীয় আর ৫০ হাজার চীনা, তাই প্রতি চারজনে একজন করে ভারতীয় দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক ছিল। রাজসরোবর দেখলাম এবং সেদংগঙ স্তূপও। এই সোনালি স্তূপটি অত্যন্ত সুন্দর। কিন্তু অতটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন নয়। ফুল আর ধূপবাতির দোকান প্রচুর। লোকেরা পায়রার সামনে শস্যদানা ছুঁড়ে দিচ্ছে। আরো দু-চার জায়গা ঘুরে আমরা নিজের জায়গায় ফিরে এলাম।

গোষ্ঠীর উৎসব ১০ এপ্রিল হবার কথা ছিল আর পেনাঙ্-এর জাহাজ ছাড়ছিল ১১ তারিখ। এই চার-পাঁচ দিন আমরা বর্মা দেখবার কাজে লাগাব ঠিক করলাম। ৬ এপ্রিল বেলা সোয়া দুটোর মান্দালয় যাবার গাড়ি ধরলাম। বর্মায় রেলযাত্রার নিয়মকানুন তাদের একেবারে নিজস্ব। বসার বেঞ্চের একধারে একজনের বসার জায়গা ছেড়ে সারা কামরায় আসা-যাওয়ার রাস্তা কাটা থাকে। বেঞ্চের বড় ভাগে তিনজন লোক বসতে পারে, কিন্তু যে প্রথমে এসে নিজের বিছানাটি পাততে পেরেছে স্বয়ং ব্রহ্মারও সাধ্য নেই তাকে ওঠায়। বাকি লোক যদি আসে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের দুজনেরও দুটি বেঞ্চ দখল

করার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, তাই সারাটা পথ আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। রেল লাইনের দূরে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। স্তূপের তো ছড়াছড়ি, এমন একটাও গ্রাম ছিল না যেখানে একটি স্তূপ নেই। জায়গায়-জায়গায় ভিক্ষুদের বিহারও ছিল, কোনো কোনো জায়গায় লংকার অভয়গিরির মতো কৃত্রিম পর্বতাকার স্তূপ বানানো ছিল। দূরে গাছপালার ভেতরে একটি অতি বিশাল বুদ্ধমূর্তি দেখা গেল। মাটি অত্যন্ত উর্বর বলে মনে হল আর খেত বেশির ভাগ ছিল ধানের। ফলের মধ্যে আম, কলা ছিল প্রচুর এবং নারকেল কম। বর্মীরা খুব নিরুদ্বিগ্ন হয়। ওরা মনে করে জীবনের আনন্দ বর্তমানের মধ্যে, ভবিষ্যতের জন্য অত চিন্তা এরা করে না। গান-বাজনা, নাচ-খেলা এরা খুব পছন্দ করে। যদি কোনো গাঁয়ে যাত্রা আসে, তো সারা পরিবারের লোক চাটাই নিয়ে ঠিক সেখানে পৌঁছে যাবে—বাড়ি যদি লুঠও হয়ে যায় তবু এরা যাবেই। ভোর হয়ে আসছিল—যখন আমাদের ট্রেন কোনো একটি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, দেখলাম, কোনো নাটক তখনও চলছে।

পরের দিন (৭ এপ্রিল) ছ-টার সময় আমরা মান্দালয় স্টেশনে পৌঁছলাম। এখানে অন্য কোনো পরিচিত জায়গা না থাকায় আমরা সোজা আর্যসমাজে গেলাম। বিনা তালা-শিকলের ঘরে বিছানা ছুঁড়ে দিলাম এবং আমরা শহর দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। একটি বিহারে গেলাম। এক বৃদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাইছিলাম কিন্তু তিনি হাত নাড়িয়ে আমাদের দূর করে দিলেন। বর্মায় ভিক্ষুর সংখ্যা এত বেশি যে এতে বৌদ্ধধর্মের বদনাম হবারই কথা। অধিকাংশ ভিক্ষুই তিব্বতী ভিক্ষুদের চেয়ে অবশ্যই কিছুটা ভাল অবস্থায় আছে। ছোরা চালা, খুন করা, কথায় কথায় মারামারি করা, সিনেমা হল আর খেলার মাঠে গিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গা করা—এসব এমন কর্ম নয় যার জন্য শিক্ষিত লোকেরা তাদের শ্রদ্ধা করবে। আমরা তিন টাকা দিয়ে সগাই যাবার জন্য ঘোড়াগাড়ি ভাড়া করলাম। ১২ মাইল চলার পর বর্মার প্রাচীন রাজধানী—মান্দালয়েরও আগের রাজধানী অমরপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম। হাজার-হাজার স্তূপ ভেঙে পড়ছিল। পুরনো মন্দির আর স্তূপগুলোকে মেরামত করার বদলে প্রত্যেকেই চায় নতুন মন্দির নতুন স্তূপ বানাতে। হয়ত এই কারণে যে সেগুলো তাদের নিজস্ব কীর্তি হবে। অথচ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে দেড়শ-দুশ বছরের মধ্যে আগেকার লোকেদের সব কীর্তি ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। মানুষ এত বেকুফ কি করে হয়? নিজেকে এত ধোঁকা সে দেয় কেন? আরো এগিয়ে নদীর (ইরাবদি) কিনারে ছিল আরো আগেকার রাজধানী আবা-র ধ্বংসাবশেষ। আমরা নতুন পুলের ওপর দিয়ে নদী পার হলাম। ইরাবদি খুব চওড়া নদী।

সগাই একটি ভাল বাজার। অনেক দোকান আছে। বেলা দশটার কিছু আগেই আমরা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ একটাকা ভাড়া দিয়ে অন্য একটি ঘোড়া গাড়ি করে সগাই পাহাড়ের বিহার দেখার জন্য রওনা হলাম। সেজন্য আরো দুমাইল হাঁটতে এবং কিছুটা পাহাড়ে চড়তেও হল। চারদিকে ভিক্ষুদের ছোট বড় আবাস। আমাদের গাড়িওলা মণিপুরের ব্রাহ্মণ ছিল। তার গলায় তুলসীর মালা ছিল, কিন্তু মুখ

একেবারে বর্মীদের মত। হতে পারে বিশ্বামিত্র আর ঋষ্যশৃঙ্গের কোনো সন্তান মণিপুরে এসেছিল—অপ্সরাগণ তার ধ্যান ভঙ্গ করে আর সে নিজের সন্তান ওখানে রেখেই চলে যায়। লোকটি বড় ভাল ছিল। সে নিয়ে গিয়ে বিহারগুলো দেখাল। এক জায়গায় একটি মাদি কুকুর চুপিচুপি এসে সেই তরুণটিকে কামড়ে দিল। এখানকার ভিক্ষুরা পুরোপুরি রুক্ষ, অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং অভদ্র। শুনেছি এই পাহাড়ে বড়-বড় ধ্যানী মহাত্মা থাকেন, কিন্তু ধ্যানী মহাত্মাদের দর্শন কবার সাধ না-জানি আমার কবেই মিটে গেছে।

ফিরে এলাম সগাইতে। এক চেটী (মাদ্রাজী) ভিক্ষুর ঠিকানা পাওয়া গেল। ভিক্ষুকে তো পাওয়া গেল না, তবে তার আত্মীয়-স্বজনরা ছিলেন। তাঁরা আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন করালেন। দুটোর মধ্যে আমরা মান্দালয় ফিরে এলাম। আবার কেল্লাতে গেলাম, রাজা আর রানীদের প্রাসাদগুলো দেখলাম। বেশিরভাগই ছিল কাঠের।

সোয়া চারটের গাড়িতে আমরা আবার রেঙ্গুন রওনা হলাম। এবার গাড়িতে অনেক কষ্টে বসবার জায়গাটুকু মাত্র পেলাম। পরের দিন (৮ এপ্রিল) সকাল আটটার সময় আমরা রেঙ্গুন পৌঁছলাম। আমার অনেকগুলো চিঠি এসেছিল, অনেক বইয়ের প্রুফ এসেছিল—এগুলো এখানে দেখে ফেরৎ পাঠানোর ছিল। রাত দুটো পর্যন্ত চিঠি লেখা আর প্রুফ দেখার কাজ করতে থাকলাম। পরের দুদিনও লোকে দেখা করতে আসতে লাগল, তার মধ্যে যেটুকু সময় পেতাম তাতে প্রুফ দেখতাম। বর্মা আর ভারত আগে এক ছিল। ইংরেজরা দেখল বর্মীরা ভারতের সঙ্গে থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমে পড়ছে। সেজন্য বর্মাকে ওরা আলাদা করে দিল। কেরোসিন তেল, জাহাজ, রেল, চাল আর শাল কাঠের বড় বড় কোম্পানি ইংরেজদের হাতে। তারপরে আছে বড় বড় ব্যাপারী, ভারতীয়—তাদের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হল মাড়োয়ারী, চেট্টী আর গুজরাতী। কুলিরা হল ইউ· পি· আর বিহারের। ইউ· পি· তো চাষ-বাসের জায়গা, কিন্তু বিহারীদের, সে বাবুই হোক আর নাই হোক, তাদের দারোয়ানই বলা হয়, যেমন—বোম্বাই এবং সিন্ধ-তে ভাই বলা হয়। রেঙ্গুনের এক হিন্দি দৈনিকের (বর্মা সমাচারপত্র) সম্পাদক আজমগড় জেলারই বাসিন্দা—আমার পাশে বসেছিলেন। ধর্মশালার চৌকিদার হাঁক দিল, 'এ দারোয়ানজী, এ দারোয়ানজী।' আমি পাটেশ্বরীবাবুকে উঠে যেতে দেখলাম। পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকে ও দারোয়ানজী বলছিল?' তিনি বললেন, 'যদি হাথুয়া আর বলরামপুরের মহারাজাও এখানে আসেন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ বা জওহরলাল নেহরুও যদি এখানে আসেন তো তাঁদেরও দারোয়ানজীই বলা হবে।' ভেতরে ভেতরে আমার একরকম আনন্দও হল, চলুক, 'মুড়ি-মিছরির এক দর'। তাছাড়া দারোয়ান তো ফাঁকিবাজ নয়, সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই খায়। বর্মা আর ভারত প্রতিবেশী। বর্মা ভারতের ধর্মকে (বৌদ্ধ) গ্রহণ করেছে এবং তার বড় বড় তীর্থস্থান ভারতে আছে, অথচ ভারতীয়দের এরাও 'কালা' বলে। জানিনা এই কথাটির মধ্যে 'গোরা'রা যখন 'কালা' বলে তখনকার মত ঘৃণা আছে কিনা? কিন্তু ঘৃণা করার অন্য কারণ আছে। মাড়োয়ারী, চেট্টী, গুজরাতী ব্যবসাদারদের কাছে বর্মী ব্যবসাদারদের হার মানতে হয়, সেজন্য কালা-লোকেরা খুব খারাপ। রেলে এবং অন্যান্য চাকরিতে ভারতীরা

অনেক কম পয়সায় কাজ করতে রাজি থাকে, শিক্ষিত বর্মীদের চাকরি জোটে না—এজন্যেও কালা লোকেরা খারাপ। ভারতীয় কুলিরা আধপেটা খেয়ে আধা মাইনেতে কাজ করতে রাজি, ফলে বর্মী মজদুরের পক্ষে কাজ জোটানো মুশকিল হয়ে পড়ে—এজন্য কালা লোকেরা খারাপ। একথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, বর্মা বর্মীদেরই এবং বর্মীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কোনো লোকেরই এখানে বাস করার অধিকার না থাকাই উচিত? ওখানে ইংরেজরা ভারতীয়দের যেতে দিয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পনের লক্ষ ভারতীয়দের মোকাবিলা করতে হচ্ছে দেখে বর্মীদের অসদ্ভাবাপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এই অসদ্ভাবকে ইংরেজরা নিজেদের ফায়দা তোলার জন্য ব্যবহার করে। আমাদের দেশের এতে কি লাভ, যদি আমার দেশের দশ-বিশ লক্ষ লোক অন্য একটি ছোট দেশে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের জীবন ছিন্নভিন্ন করে? নিজের দেশকে স্বাধীন করতে পারলে আমাদের দুঃখ-দারিদ্র দূর করা সম্ভব। এই অল্প কিছু লোকেদের জন্য একটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শত্রুতা করা আমাদের পক্ষে মোটেই লাভজনক ব্যাপার নয়। তাছাড়া ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যেও অসদ্ভাব রয়েছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও তাদের কর্মীদের দারোয়ান বলে ঘৃণার চোখে দেখে। আমাদের দারোয়ানেরাও এই শোষকদের ভাল চোখে দেখে না। বর্মার স্ত্রীজাতি সারা এশিয়াতে (সোভিয়েত রাশিয়া বাদে) সবচেয়ে বেশি স্বাধীন—অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং সামাজিক দিক থেকেও। ভারতীয়রা এসে তাদেরকে প্রেমের জালে ফেলে কিন্তু এদের রাখতে চায় বেশ্যা আর দাসীর মত করে, এমনকি নিজের সন্তানদের পর্যন্ত বিদেশীর মতোই মনে করে। বর্মীরা মনে করে যে হিন্দুরা তাদের নীচ ভাবে। ভারতীয় মুসলমানেরা এ বিষয়ে অনেক উদার, কিন্তু তারা তাদের বাচ্চাদের বর্মী না বানিয়ে নিজেদের ধর্ম আর সংস্কৃতি এদের ওপর চাপিয়ে দেয়। বর্মীরা মনে করে মুসলমানেরা তাদের জাতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এও একটি বড় উৎস, ফলে সম্প্রতি কত খুন, ঝগড়া এই সব কারণে ঘটেছে। এই সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে যে, বর্মা বর্মীদেরই হোক এবং ভারত ভারতীয়দের হোক, রক্তচোষা দেশী-বিদেশী জোঁক ধ্বংস হয়ে যাক।

১০ এপ্রিল সোনী হলে গোষ্ঠীর বার্ষিক উৎসব হল। সাতটায় শুরু হয়ে সোয়া দু-ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেল। আমি আমার ভাষণ পাঠ করলাম। কাশ্যপজীও বললেন। আরো কয়েকজন বক্তৃতা দিলেন।

১১ এপ্রিল ছ-টার সময় আমি বন্দরে পৌঁছলাম। 'খণ্ডালা' জাহাজটি কিছু দূরে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তাররা ডেকের যাত্রীদের খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। এদের কাপড়-চোপড় বাষ্পে দিয়ে দেয়া হল। যাদের টীকা নেয়া হয়নি তাদের টীকা দেওয়া হল। আমি যদিও ডেকের যাত্রীই ছিলাম তবে কাপড়চোপড় সাফ সুতরো থাকার ফলে বেঁচে গেলাম। ছোট স্টিম-বোটে করে জাহাজে এসে উঠলাম। জলের কলের কাছে জায়গা পাওয়া গেল। এখন চারদিন পর্যন্ত এই জাহাজেই থাকার ছিল। পরের দিন (১২ এপ্রিল) খুব জ্বর এল। বিকেলেও সামান্য জ্বর থাকল। আমি শুধু জল খেতে থাকলাম। জাহাজে অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবী মুসলমান, তারপর পাঞ্জাবী শিখ।

কাপড়-চোপড়ের নোংরার কথা আর বলবেন না! তবে আমি তো তিব্বতে থেকে ছিলাম। তৃতীয় দিন (১৩ এপ্রিল) কাশ্যপজীও জ্বরকে আবাহন করলেন। মাঝরাতে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আমরা কিছুটা ভিজলাম আর কিছুটা কম্বল ঢাকা দিয়ে কুঁকড়ে রইলাম। কাশ্যপজীর খুব জ্বর ছিল। এই জাহাজে আমাদের খুব বাজে অবস্থা হয়েছিল।

পেনাঙ্-এ—সাতটার সময় (১৪ এপ্রিল) জাহাজ পেনাঙ্-এর খাড়িতে পৌছল। আমরা লাইন করে দাঁড়ালাম। ডাক্তার সবাইকে কোয়ারানটাইন[১]-এ যাবার হুকুম দিলেন। আমাদের সহযাত্রীদের কাপড়-চোপড় এবং জীবনযাপন-প্রণালী এত নোংরা ছিল যে তার জন্য এটা দরকার ছিল। জানা গেল এখন আড়াই দিন কোয়ারানটাইনে থাকতে হবে। কোয়ারানটাইনের দ্বীপটি ছিল ৬ মাইল দূরে। নৌকোয় করে আমাদের সেখানে পৌছান হল। নৌকো থেকে নেমে সারি সারি বসলাম। আমাদের কাপড়-চোপড় সেদ্ধ করতে দেওয়া হয়েছিল। আবার সবাইকে টীকা দেওয়া হল। শেষে ওষুধ দেওয়া জলে স্নান করানো হল। ততক্ষণে এগারোটা বেজে গিয়েছিল। টিনের খোলা চালা ছিল। আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে রেখে দেওয়া হল। রোদ ছিল প্রচণ্ড আর মাথার ওপর টিনের ছাত তেতে উঠছিল। ভীষণ গরম লাগছিল। আশেপাশের পাহাড়গুলো সবুজে ঢাকা ছিল। কিন্তু আমরা এক অন্য ঝামেলায় ফেঁসে ছিলাম। সেকেন্ড ক্লাসে না এসে আমরা ভুল করেছিলাম। সেপাইরা ছিল পাঞ্জাবী শিখ। আমরা এক ভারতীয় সজ্জনকে জ্ঞানোদয়-অ্যাসোসিয়েশনে টেলিফোন করে দিতে বলেছিলাম। কিন্তু তারা আসবে বলে খুব আশান্বিত ছিলাম না। কপালে হাত রেখে আমরা বসেছিলাম। ৫০ ঘণ্টা আমি খাইনি কিছু। এটা জ্বরের পক্ষে ভাল চিকিৎসা বলে অনেকবার প্রমাণ পেয়েছি। বারোটা বাজার কিছু পরে পেনাঙ্ থেকে বৌদ্ধ ভদ্রলোকেরা মোটর-বোট নিয়ে হাজির হলেন। আমরা তাঁদের লিখিনি যে আমরা ডেকে আসছি, ফলে এঁরা সেকেন্ড ক্লাশের যাত্রীদের অপেক্ষায় ছিলেন। যাইহোক, ভালোয় ভালোয় আমরা এই কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেলাম এবং বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি সুন্দর মন্দিরে এসে উঠলাম। ৫৬ ঘণ্টা পর একটু দুধ খেয়ে অনশন ভঙ্গ করলাম। এখন চারদিন আমার এখানেই থাকার কথা ছিল, কাশ্যপজী তো এখানে কয়েক মাস থাকার জন্য এসে এসেছিলেন।

বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন বেশ ধনী সংস্থা। মন্দির অত্যন্ত ঝকঝকে—দেখেই শরীর ভাল হয়ে যায়। বুদ্ধ, আনন্দ, কাশ্যপ, অমিতাভ ইত্যাদির মার্বেলের মূর্তি ইটালি থেকে তৈরি করিয়ে আনা হয়েছে। রক্তকমলে অলংকৃত চীনামাটির তৈরি ইট দিয়ে ঢাকা দ্বার এবং দ্বারের দীপসজ্জায় অতিশয় সুরুচির পরিচয় ছিল। মন্দিরের পিছনে একপাশে কার্যালয় এবং অন্য পাশে বক্তৃতাভবন। ভিক্ষুদের থাকার জন্য ছিল পরিচ্ছন্ন ঘর।

১৬ এপ্রিল পেনাঙের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখতে যাবার মত শারীরিকভাবে যোগ্য

---

[১] *Quarantine:* রোগসংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য (জাহাজ, মানুষ বা প্রাণীকে) পৃথক করে রাখা অথবা আটকে রাখা।—স.ম.

হয়ে উঠতে পারলাম। তিনটের সময় কাশ্যাপজীর ১০৩ ডিগ্রি জ্বর ছিল। বিকেল চারটের সময় মোটরে চড়ে ঘুরতে বেরোলাম। পেনাঙ্ হল একটি ছোট পাহাড়ী দ্বীপ। প্রকৃতি তার মন খুলে এই দ্বীপকে সবুজ করে তুলেছে। চারদিকে নারকেল আর রবারের গাছ দেখা যাচ্ছে। পথে কয়েকটা গ্রামে দেখলাম। গ্রামে বেশিরভাগ মালয়ীরা থাকে। বোঝা যায় বিদেশীদের কারণেই পেনাঙ্-এর বৈভব।

পরেরদিন (১৭ এপ্রিল) ছ-টা বাজতেই ঘুরতে বেরোলাম। দুটো শ্যামদেশীয় বিহার দেখলাম। বিহার তো নয়—দোকান। একটি বিহারে ভিক্ষুদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। টাকা-পয়সা সরকারের হাতে চলে গিয়েছিল, শুধু খরচ-খরচার জন্য কিছু মাসোহারা দেওয়া হতো। উঁচুশ্রেণীর বা বিশ্বাসী যাত্রীদের কোয়ারেনটাইনে না রেখে এই শর্তে ছুটি দেওয়া হতো যে, তাঁরা স্বাস্থ্য-অফিসারের কাছে তাঁর নজরে থাকবেন। সেদিন দশটার সময় স্বাস্থ্য-অফিসারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এলাম।

আমার ইচ্ছে ছিল এখান থেকেই কোনো জাপানি জাহাজ ধরি, কিন্তু এখন কোনো জাপানি জাহাজ ছাড়ছিল না। এখন সিংগাপুর পর্যন্ত রেলে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। খবর পেলাম 'অন্যোমারু' জাহাজটি সিংগাপুর থেকে কিছুদিনের মধ্যেই ছাড়বে। জয়সওয়ালজীর বড় ছেলে চেতসিংহ মলাক্কায় ব্যারিস্টারি করছিলেন। তাঁর দুটো চিঠি এসেছিল এবং মলাক্কা যাবার জন্য খুব করে লিখেছিলেন। ট্রেনের নাম দিয়ে আমি তার করে দিলাম। মলাক্কা রাস্তা থেকে অনেকদূর—তাই ওখানে যাবার মত সময় ছিল না। রাতে মহাযান আর হীনযানের[১] ওপর আমার বক্তৃতা হল।

সিংগাপুর—১৮ এপ্রিল কাশ্যাপজীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম, এখনও তাঁর শরীর সুস্থ হয়নি। তবে চিন্তার কোনো ব্যাপার ছিল না। মোটরে বন্দর পর্যন্ত গিয়ে তারপর স্টিমারে খাঁড়ি পেরিয়ে একটি নদীতে সামান্য ঢুকে পড়লাম। নদীর পাড়েই 'পাই' স্টেশন। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটা ছিল। গাড়িতে ভিড় ছিল না। ছ-টার সময় ট্রেন ছাড়ল। পাহাড়-জমি সবই সবুজ গাছগাছালিতে ঢাকা ছিল। রবারের বাগানই ছিল বেশি, তবে কোথাও কোথাও জংগলও ছিল। নারকেলের বাগানও ছিল। মজদুরেরা মাদ্রাজী ছিল আর মালিক চীনা কিংবা ইংরেজ। সমতলভূমি খুব অল্পই ছিল। যেখানে-সেখানে ছিল টিনের বাড়ি, যেগুলোর ৩৫ শতাংশ মালিক ইংরেজ আর বাকিগুলোর চীনা।

ছ-টার সময় আমরা কুয়ালালামপুরে পৌঁছলাম। স্টেশনেই বৌদ্ধসভার কয়েকজন

---

[১] বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্ম নিয়ে মতভেদ শুরু হয় এবং বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান নামে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দুটো ভাগের মধ্যে বিরোধও চলতে থাকে, বার বার ধর্মসভা ডেকেও যার কোনো মীমাংসা হয়নি। অবশেষে খ্রীস্টোত্তর দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে কাশ্মীরে যে চতুর্থ বৌদ্ধ-সম্মেলন হয়েছিল, সেখানেই এই বিরোধ স্বীকৃতি পায়। গোঁড়া বৌদ্ধদের বলা হল হীনযানপন্থী এবং নব্যবাদী বৌদ্ধদের বলা হয় মহাযানপন্থী। শেষমেশ হীনযানপন্থীরা সিংহল, বর্মা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে শক্তিশালী হয়ে রইল। আর অন্যদিকে ভারত, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত, চীন ও জাপানে থেকে গেল মহাযানপন্থীরা।—স·ম·

সজ্জন আর একজন সিংহলী ভিক্ষুর দেখা পেলাম। কুয়ালালামপুর মালয়ের রাজধানী এবং অতি রমণীয় জায়গায় অবস্থিত। দেড়ঘণ্টা ধরে ঘুরে শহর দেখলাম। মালয়ে পেনাঙ্, মলক্কা, সিংগাপুর সরাসরি ইংরেজের হাতে, তাছাড়াও অনেক রাজ্য আছে। সব মিলিয়ে সংযুক্ত মালয়রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছে। শহর দেখে আমরা বৌদ্ধমন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি সুন্দর এবং সুন্দর জায়গার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ গৃহস্থদের ছোট সভায় আমাকে কিছুক্ষণ বলতে হল। সাড়ে আটটার সময় চেতসিংহ্ জয়সওয়াল পৌঁছে গেলেন। তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিল, খুব দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়েছিল। যদি জানতাম যে 'অন্যোমারু' চতুর্থ দিন সিংগাপুর থেকে ছাড়বে, তাহলে মলাক্কাতেও যেতাম। চেতসিংহ্জীর মোটর রাস্তায় বিগড়ে গিয়েছিল, তারফলে যেমন-তেমন করে এখানে পৌঁছেছেন। আমার ট্রেন ছাড়তে দেড় ঘণ্টা দেরি ছিল। আমরা স্টেশনে গেলাম, কিছু খাওয়া এবং কথাবার্তা চলল। আমি বাড়ির খবর দিলাম। শুনে খুব ভাল লাগল যে চেতসিংহও নিজের কাজে অত্যন্ত তৎপর। চেতসিংহের মধ্যে তাঁর পিতার সব গুণই যে বর্তমান, তা নয়। তবে অনেক ব্যাপার ভাল ছিল। যদিও তিনি সাহেবের মত মানুষ হয়েছেন তবু কষ্ট সহ্য করতে পারেন। সাহিত্য এবং শিল্পে তাঁর অতিশয় অনুরাগ, আত্মনির্ভরতা এবং আত্মসম্মানবোধও তাঁর যথেষ্ট। সেরম্বন্' পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে রইলেন। মালয়েতে বহু জাপানিও থাকে। আমরা যাচ্ছিলাম রাত্তিরবেলা—একটি স্টেশনে কয়েকজন জাপানি স্ত্রী-পুরুষ তাদের বন্ধুদের বিদায় জানাতে এসেছিল। গাড়ি ছাড়ার সময় ওরা বড় মধুর স্বরে 'সায়োনারা' বলছিল। তখন আমি জানতাম না যে, 'সায়োনারা'-র অর্থ হল 'পুনর্দর্শনায়,' যদিও ঐ সময় একথার অন্য কোনো অর্থ হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯ তারিখ যখন ভোরের আলো ফুটছিল, তখন আমরা জোহোরের পরে পুলের ওপর দিয়ে খাঁড়ি পেরোচ্ছিলাম।

ছ-টার সময় সিংগাপুর পৌঁছে গেলাম। স্টেশনে কয়েকজন বৌদ্ধ ভদ্রলোক এসেছিলেন। আমাকে তাঁরা বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনে নিয়ে গেলেন। সিংগাপুরে প্রায় ছ-শো সিংহলী বৌদ্ধ আছেন, তাঁদেরই এই সভা। সারাটা দিন বিশ্রাম, খাওয়া-দাওয়া আর কথাবার্তা বলেই কেটে গেল, বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় ঘুরতে বেরোলাম। সিংগাপুর ১৬ মাইল লম্বা, ১৬ মাইল চওড়া একটি দ্বীপ। পোর্ট সঈদের মতো এটাও বহু দ্বীপের লোকেদের মিলন-স্থান। ভারত, লংকা, শ্যাম, চীন, জাপান, জাভা, সুমাত্রা আর ইউরোপ—সব জায়গারই লোক এখানে থাকে। বড় বড় কোম্পানিগুলো ইংরেজদের, বণিকেরা চীনা, দুধ বিক্রেতারা 'ভাই' (যুক্তপ্রদেশ আর বিহারের লোক) এবং কুলিরা সব মাদ্রাজী। শহর খুব পরিচ্ছন্ন, রাস্তাগুলোও ভাল, তবে গরিবদের পাড়াগুলোর কথা জিজ্ঞেস করবেন না। এখানে একটি শ্যামদেশীয় মন্দিরও আছে।

বুদ্ধের একটি বিশাল মূর্তি দেখলাম। সড়ক ছেড়ে ঘুরতে-ফিরতে একটি চীনা মন্দিরে এসে পড়লাম। মন্দিরটি খুব বড় এবং কোনো এক সময়ে হয়ত বেশ সুন্দরও ছিল, কিন্তু এখন বড়ই উপেক্ষিত। মন্দির এবং তার ভেতরের সজ্জা, পাথরের স্তম্ভ, সব কিছুর ওপরেই মৃত্যুর ছায়া দেখা যাচ্ছিল। ভিক্ষুটি অযোগ্য এবং নিষ্কর্মা ছিল, তাই নিজের প্রতি

—১৯৩৫—

কোনো গৃহস্থের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি।

একদিন আগেই (২০ এপ্রিল) আমরা নিপ্পন্-য়ুশেন—কইসা-এর কার্যালয় থেকে জাহাজের টিকিট কেটে আনলাম। জাপান পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৫০ ইয়েন-এর থেকে কিছু বেশি পড়ল। সেদিন সন্ধেবেলা চীনা বৌদ্ধসভায় গেলাম। লোকেরা অমিতাভ-এর ভজনে মগ্ন ছিল। একজন গৃহস্থ এই মস্ত ঘর তৈরি করে দান করে দিয়েছেন। সিংহল বৌদ্ধসভাতেও একটি বক্তৃতা দিতে হল। আমি পালি ভাষায় বললাম এবং একজন শ্রমণ সেটা সিংহলীতে অনুবাদ করল।

হংকং—২১ এপ্রিল সকালেই 'অন্যোমারু' সিংগাপুর পৌছল। আড়াইটার সময় আমিও জাহাজে চড়লাম। ২৩ নভেম্বরের কেবিনে চারটি বার্থ ছিল কিন্তু তাতে আমরা দুজন হিন্দুস্থানী আর একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক ছিলেন। 'অন্যোমারুতে' সন্ধে পর্যন্ত লোহার টুকরো আর বাতিল টীনের বাক্স বোঝাই হতে থাকল। এখানে এসব জিনিসের কদর নেই, যদিও এগুলোকেই গলিয়ে উন্নত মানের লোহা তৈরি করা যায়। জাপান এসব আবর্জনাকে স্বাগত জানায়। প্রথমবার আমি যখন লংকা গিয়েছিলাম তখন আমার জানলা দিয়ে প্রায়ই দেখতাম রেলের লাইনের এক জায়গায় রেলের ভাঙা চাকা, যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য লোহার টুকরো একটা গর্তে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন পর দেখি সেসব খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জানা গেল, এই সব আবর্জনা কোনো এক জাপানি কোম্পানি কিনে নিয়েছে। ইংরেজ কোম্পানি বা ইংরেজ সরকার এসব আবর্জনার পরোয়া করে না। আজ যুদ্ধের দিনে লোহার এত অভাব থাকা সত্ত্বেও রেললাইন আর নানা জায়গায় না-জানি কত লক্ষ মণ লোহা পড়ে আছে, কেউ তা ভ্রুক্ষেপ করে না। সাড়ে ছটার সময় জাহাজ ছাড়ল। জাহাজে পাঁচজন মাদ্রাজী (যাদের মধ্যে দুজন মহিলা) দুজন বাঙালী, দুজন পার্সী, একজন ভাই (একা আমি) সব মিলিয়ে দশজন ভারতীয়। একজন অস্ট্রিয়ান আর দুজন জাপানিও ছিল। আমার কাছে সিগারেট খাওয়ার ঘরটি পড়া-লেখার পক্ষে অতি উত্তম মনে হল। বিকেলে ডেকের ওপর টহল দিতে বেশ ভাল লাগত। 'বাদন্যায়'-এর প্রুফ আমার সঙ্গে যাচ্ছিল—একা একা তা ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে বেশ সময় লাগছিল। রামস্বামী আইয়ার সংস্কৃত জানতেন, তিনি প্রুফ কপিকে মেলাতে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমার কাজ হয়ে গেল।

জাহাজে আমরা সকাল সাতটায় পেতাম চা-রুটি-মাখন, সাড়ে আটটা বাজলে জলখাবার, বারোটার সময় পুরো ভোজন, সোয়া তিনটের সময় চা-রুটি-মাখন আর সন্ধে ছটার সময় রাতের খাবার। খাবার ইউরোপীয় ধরনের ছিল। ফরাসি জাহাজে যেমন পেতাম সেরকমই। পাঁচজন মাদ্রাজী সহযাত্রীই ছিলেন ব্রাহ্মণ, তাই মাছ-মাংস ছুঁতেও পারতেন না। সমুদ্র বরাবর শান্ত ছিল। এই বিশাল সমুদ্রের যেদিকে তাকাও একই দৃশ্য থাকত চোখের সামনে। জাহাজ একটুও দুলত না। প্রুফ দেখার কাজের পর যে-সময় থাকত তা জাপান সম্বন্ধে বই পড়ার কাজে লাগাতাম অথবা কাঠের বোর্ডে গুলি গড়িয়ে

দেওয়ার খেলা খেলতাম।

সপ্তম দিন (২৭ এপ্রিল) সকাল ছটার সময়েই জাহাজ হংকং পৌছল। এটি হল চীনের দ্বীপ, একশ বছরের ওপর হল যাকে ইংরেজরা দখল করে নিয়েছে। হংকং ওদের একটি বড় বাণিজ্যকেন্দ্র এবং সেই সঙ্গে সৈন্যাবাসও। শেষমেশ সেনাদলও তো বাণিজ্য রক্ষার জন্যই। চতুর্দিক পাহাড় ঘেরা হংকং হল একটি প্রাকৃতিক বন্দর। এর শুধু একটি দিকই সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত। জলখাবার খেয়ে ছ-টার সময় আমরা তীরে গেলাম। পাহাড়গুলো সবুজে ঢাকা। আর শহরের পাহাড়ে তো নিচ থেকে চূড়া পর্যন্ত ঘর আর বাংলো বাড়ি গড়ে উঠেছে। পাহাড়ের ওপর শুধু ইউরোপীয়ানরাই বাড়ি তৈরি করতে পারে। এশিয়ার মাটিতেই এশিয়াবাসীদের এই অপমান! যেন 'জোর যার মুলুক তার'[১]-গোছের ব্যাপার। ইউরোপীয় বাজারের বাড়িগুলো খুব জমকালো। আমরা পাহাড়ের ওপর যাবার ট্রাম ডিপোতে গেলাম। শেষ স্টেশন পর্যন্ত গেলাম। একটা এক হাজার ফিটেরও বেশি উঁচু। মেঘলা থাকায় ফোটো তোলা গেল না। এমনিতে অনেক জায়গার ফোটো তোলাও বারণ ছিল। নিচে নেমে আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে ২৭ মাইল চক্কর দিলাম। চীনা মালিদের ফুলের বাগিচায় শাকসব্জীর খেতে কাজ করতে দেখলাম। এখানকার রাস্তাঘাট ভাল, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, হাসপাতাল আছে। এখান থেকে ক্যান্টন শহর ৮০ মাইল। বেলা দুটো নাগাদ আমরা জাহাজে ফিরে এলাম। আড়াইটের সময় জাহাজ চলতে শুরু করল।

সাংহাই—ষষ্ঠ দিন আমাদের সাংহাই পৌছনোর কথা ছিল। সকালবেলা উঠে দেখি চারদিক কুয়াশায় ঢেকে গেছে। দুপুর পর্যন্ত এরকমই থাকল। জাহাজ বারবার ভোঁ দিচ্ছিল। জাহাজের গতি অত্যন্ত মন্থর ছিল। পরের দিন (২৯ এপ্রিল) দুপুরবেলা তাপমাত্রা ছিল ৬৩ ডিগ্রি। আমরা ২৬ অক্ষাংশে চলছিলাম—এলাহাবাদেরও তাই—কিন্তু এখানে এই এপ্রিলের শেষেও একদম গরম লাগছিল না। ৩০ এপ্রিল তো বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। মনেই হচ্ছিল না যে এটা গ্রীষ্মকাল। সেদিন দুপুরবেলা ইয়াংসি নদী আর সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌছে গেলাম। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ওপরের মাটি ধুয়ে নিয়ে এসে সমুদ্রকে ভরাট করতে লেগে আছে নদী। সে-সময় সমুদ্র নিশ্চয় আরো আগে পর্যন্ত ছিল। এখানে নদীর জল কিছুটা অগভীর ছিল আর পৌনে তিন লাখ মণ (সাড়ে ন-হাজার টন) ভারি এই অন্যোমারু। কোথাও আটকে যাতে না যায় তাই আমাদের জাহাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। এবার একটি পথ-প্রদর্শক মোটর-বোট এল, তারপর আমাদের জাহাজ তার সঙ্গে চলতে লাগল। এখানে আশেপাশে দ্বীপ আছে। বাঁ পাশে পোতো দ্বীপ, সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বহু মন্দির আর বিহার আছে। অন্ধকার হয়ে যাবার পর জাহাজ সাংহাই পৌছল।

পরের দিন (১ মে) নটার সময় আমরা জাহাজ থেকে নেমে বাঁদিকের পাড়ে

[১] মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত হিন্দি প্রবচনটি, *জিসকী লাঠী উসকী ভৈঁস*।—স·ম·

গেলাম। সাংহাই এশিয়ার সবচেয়ে বড় শহর। যদিও ৫০ লাখ জনবসতির টোকিও-র পাশাপাশি এর ৩০ লাখ জনবসতি সত্যিই কম। প্রথমে আমরা ডাকঘরে গেলাম। আমার চিঠিপত্র আর প্রুফ পার্সেলে পাঠানার ছিল। কাজ শেষ হলে আমরা ঘণ্টায় তিন ডলার (১ ডলার= $\frac{১২}{১০}$) টাকা ভাড়ায় ট্যাক্সি নিলাম। প্রথমে শহর ঘুরলাম। ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্র সাংহাইতে নিজেদের ছোট ছোট রাজ্য বানিয়ে বসেছে। সাংহাই চীনের একটি জীবিত অংগ যার ওপর বসে বসে বিদেশী শকুনেরা তাকে ঠোকরাচ্ছে। চাপই নামের চীনা মহল্লার দিকে গেলাম। কোনো একসময় এটা জনবসতিপূর্ণ একটি শহর ছিল, কিন্তু জাপান সদ্য তিন-চার বছর আগে সাংহাই আক্রমণ করে। মাঞ্চুরিয়ায় সফলতা পেয়ে তার স্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। সে জানত যে, স্বার্থান্ধতার জন্য ইউরোপীয় রাজ্যগুলোতে পরস্পরের মধ্যে একতা নেই। এরা আমাদের পথে বাধা দিতে পারবে না। ওরা চাপইকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ির দরজা আজও দাঁড়িয়ে আছে। বিশতলা সাসুনভবন সম্ভবত এশিয়ার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। সাংহাইয়ের ইংরেজ-এলাকায় শিখ পুলিশ-সেপাই প্রচুর আছে। এদের সস্তাতে পাওয়া যায় আর এরা গোরা মালিকদের আজ্ঞাবাহীও। এটা আমরা আগেই জানতাম যে, সাংহাইতে ভারতীয় আছে। খুঁজতে খুঁজতে একটা-ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ (ভারতীয় হোটেল) দেখলাম, সেখানেই রুটি আর মাংস খেলাম। সাংহাইতে ইংরেজি খবরের কাগজও বেরোয়। কয়েকটি খবরের কাগজ আমরা কিনলাম। বুঝতে পারলাম, চিয়াং কাইশেক কয়েকবার ব্যর্থ হবার পর এবার জোর প্রস্তুতি নিয়ে কম্যুনিস্টদের ওপর আক্রমণ করেছে। চিয়াং চীনে জোঁকদের পৃষ্ঠপোষক আর গোরা সাহেবরা তার পিঠে আঘাত করতে উদ্যত।

সেদিনই আমাদের জাহাজ সামনে রওনা দিল। খুব ঠাণ্ডা লাগছিল। ভেতরের কেবিন এখন গরম করা হচ্ছিল। বেতারে খবর পাওয়া গেল যে, জাপানের উত্তরাংশে খুব বরফ পড়েছে, সে-কারণে এখানে ঠাণ্ডা বেড়েছে। এখন আমরা সাংহাই এবং জাপানের মধ্যবর্তী সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছিলাম। এটা দু-আড়াই দিনের পথ। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য সমুদ্রও খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আমি কি এসব বুঝি। কাশ্যপজী যদি থাকতেন, তাহলে তাঁরও এই দশা হতো, যা আমাদের সাথীদের হচ্ছিল। আমাদের টিকিট কোবে পর্যন্ত ছিল। আমাদের সাথী ইয়াকোহামার টিকিট করিয়ে নিচ্ছিল, আমিও তেমনিই করে নিলাম।

জাপানে

৬ মে দুপুরে দুদিকে পাহাড় দেখা যেতে লাগল, এটাই ছিল জাপান। ডানদিকে ক্যুশো (কোশু) দ্বীপ আর বাঁদিকে প্রধান দ্বীপ। সামনে অনেক নৌকো আর স্টীমার দেখা গেল। আমরা সিমোনোসকি-র দুর্গপ্রাচীরের ভেতরে ঢুকছিলাম। এক কপি করে ছাপা নোটিস বিতরণ করা হল, তাতে নির্দেশ ছিল যে, এখানে ফটো তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মোটর-বোট থেকে ডাক্তার আর কয়েকজন অফিসার আমাদের জাহাজে এল। ডাক্তার

মোটামুটি পরীক্ষা করলেন, কেউ অসুস্থ ছিল না। জাহাজ আবার চলতে শুরু করল। অফিসাররা সবাইকে কিছু কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করল। আমাকে যাত্রার উদ্দেশ্য কি তাই নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। আমি বললাম, 'আমি একজন বৌদ্ধভিক্ষু, আপনাদের এই বৌদ্ধ-দেশে অধ্যয়ন করার জন্য এসেছি।' অফিসার আমার পাসপোর্টে ছাপ মেরে ছিল।

রাত সাড়ে আটটার সময় আমরা জাপানের মাটিতে পা রাখলাম। এটা ক্যুশো দ্বীপের মোজী শহর। এক লাখের ওপর অধিবাসী। পাহাড়ের গোড়া থেকে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত শহর বিস্তৃত। আমরা এখানে বেপ্‌পু-র উষ্ণ প্রস্রবণ আর দু-একটি গ্রাম দেখা স্থির করলাম। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসাফিরখানা একটিই ছিল এবং তৃতীয় শ্রেণীরটা ছিল অন্য দিকে। দুটোতেই লোকের বসার জন্য চেয়ার ছিল। তফাৎ এইটুকুই যে, তৃতীয় শ্রেণীতে গদি ছিল না। অধিকাংশ পুরুষের পরনে ছিল কোট-প্যান্ট, কিন্তু স্ত্রীলোকদের সবার পরনেই ছিল কিমোনো (লম্বা চোগা) আর সুন্দর কোমর-বন্দনী। দশটা নাগাদ আমাদের ট্রেন ছাড়ল। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনেছিলাম। এতেও গদি লাগানো ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পিঠের দিকেও গদি দেওয়া থাকে, যেটা তৃতীয় শ্রেণীতে থাকে না। লোকজনের পোশাক খুব পরিষ্কার ছিল। আমাদের কামরাও খুব পরিষ্কার ছিল। রাতে জাপানি ঢঙের একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্টেশন থেকেই টেলিফোন করে দেওয়া হয়েছিল এবং আমাকে হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য পথপ্রদর্শকও এসে গিয়েছিল।

পরের দিন (৪ মে) আমি হোটেলেই জলখাবার খেলাম। আমার কয়েকজন সঙ্গী স্নান করতে চাইছিলেন। গরম জলের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এখানে একই চৌবাচ্চায় স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে উলঙ্গ হয়ে স্নান করছিল। আমার সঙ্গীদের সাহসে কুলোল না—তাঁরা ফিরে এলেন। সাড়ে আটটার সময় আমরা উষ্ণ প্রস্রবণের দিকে চললাম। মনে হচ্ছিল এই এলাকাটাই উষ্ণ প্রস্রবণের। কোনো কোনো জায়গায় কাদার মধ্যেই বুদবুদ কাটছিল, কোথাও ফুটন্ত জল পড়ছিল। পথপ্রদর্শক ইংরেজিতে বলে যাচ্ছিল যে এই গরম কুণ্ডের গভীরতা কত, তাপ কত। জিগোশকুর পিছনের দিকের দৃশ্য অতি সুন্দর ছিল। সমস্ত পাহাড় ছিল সবুজে ঢাকা। পথে অনেক গাঁ দেখলাম—তাদের ছোট ছোট ঘর আর ঘাসের চালা হিমালয়ের কোনো জায়গার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ঘোড়াও হাল টানছিল, বলদও হাল টানছিল। একদম শেষের তপ্তকুণ্ডে স্নান করলাম। জানালার নিচে ঢালু উপত্যকা ছিল, সেখানে দেবদারু এবং অন্যান্য গাছ দেখা যাচ্ছিল। ফেরার পথে গরমকুণ্ড থেকে আমরা একটা বড় হাসপাতাল দেখতে পেলাম। বেলা দেড়টার সময় স্টেশনে পৌঁছে মোজী-র উদ্দেশে রওনা হলাম আর সন্ধে নাগাদ অন্যোমারু জাহাজে পৌঁছে গেলাম।

কোবে—এখন আমরা জাপানের দুটো বড় দ্বীপের মাঝখানের সাগর দিয়ে যাচ্ছিলাম। দুদিকের তীরই দেখা যাচ্ছিল। দৃশ্য সেরকমই সুন্দর ছিল। ভোর পাঁচটার সময় জাহাজ কোবের বন্দরে ঢুকল এবং সোজা পাড়ে গিয়ে লাগল। আনন্দমোহন সহায় (ভাগলপুর)

এবং আরো কত ভারতীয় বোম্বাইবাসী ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করতে এসে ছিলেন। আনন্দমোহনকে তেরো বছর আগে দেখেছিলাম যখন তিনি মেডিকেল কলেজে অসহযোগ করে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়েছিলেন। আমরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলাম। একদল তো সোজা কোতক মশাইয়ের বাড়িতে গেল আর আমাদের দুজনকে আনন্দমোহন এক বৌদ্ধমন্দিরে নিয়ে গেলেন। মন্দির খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। বুদ্ধের মূর্তি ছিল প্রশান্ত। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এদের সংগঠন এবং ব্যবস্থার নমুনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। মন্দিরের মোহান্ত অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণভাবে কথা বললেন। ওখান থেকে আমরা কোতক মশাইয়ের বাড়ি গেলাম, ওখানে ভারতীয়দের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, খবর পেলাম অন্যোমারু চারদিন পর এখান থেকে ছাড়বে এবং ১১ মে ইওকোহামা পৌঁছবে। জার্মানির পরিচিত বন্ধু শ্রীসকা কিওয়ারার চিঠি পেলাম। তিনি তাঁর মন্দিরে থাকার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাতে আমরা জাহাজে থাকলাম।

পরের দিন (৬ মে) দশটার সময় আমরা জাহাজ থেকে নামলাম। প্রথমে জিনিসপত্র আর বিশেষ করে ক্যামেরা দেখাবার জন্য কাস্টম অফিস যেতে হল। সেখান থেকে সেন্নোমিয়া স্টেশন গেলাম। মিস্টার মুরাওকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পাওয়া গেল। তিনি ইংরেজি জানতেন তাই ভাষার সমস্যা দূর হল। পথে ওসাকা পড়ল। ওসাকা বিশাল বড় শহর। বস্ত্রশিল্পে এই শহর জাপানের ল্যাংকাশায়ার-ম্যানচেস্টার। কয়েক জায়গাতেই আমাদের বিদ্যুৎ-চালিত রেলগাড়ি বদল করতে হল। মজুরদের বাড়ি খুব ছোট কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। হোরোমিয়া স্টেশনে নেমে মোটরবাসে চড়ে হোরিয়োজী গেলাম। হোরিয়োজী জাপানের সবচেয়ে পুরনো বিহার। এই বিহারের ঘরবাড়ি, মন্দির, মূর্তি জাপানি সংস্কৃতির ইতিহাসে পূর্ণ হয়ে আছে। এখানকার মন্দির বেশিরভাগই কাঠের, এবং এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনমন্দিরটি আজ থেকে চোদ্দশ বছর আগের (ষষ্ঠ শতাব্দী) তৈরি। প্রধান মন্দিরের দেওয়ালগুলোর ওপর অজন্তার মত চিত্র রয়েছে। বোধিসত্ত্বের মূর্তি তো শিল্পকলার আশ্চর্য নমুনা। পিতলের অনেকগুলো সুন্দর মূর্তি দেখলাম। মন্দিরে ঢোকার আগে নিজের জুতোর ওপরে পরার জন্য কাপড়ের জুতো আমাদের দেয়া হল। মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য এই ব্যবস্থা। শুধু মূর্তি নয়, চিত্রপট এবং বাদ্যযন্ত্রেরও ভালো সংগ্রহ আছে। একটি ছ-তলা স্তূপ আছে। বুদ্ধপরিনির্বাণের একটি মূর্তি সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে, এটি ভারতের মাটি দিয়ে তৈরি। উমিদোনো বিহারটি একটু দূরে, ওখানেও চার-পাঁচটি সুন্দর মূর্তি আছে। পাশের চুগুজী বিহারে দশজন ভিক্ষুণী থাকে। এখানে অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তি আছে, যার সম্পর্কে বলা হয় যে, জাপানের অশোক শোতোকু এটি নিজের হাতে বানিয়েছিলেন। এই পথেই সপ্তম শতাব্দীর দুটি প্রসিদ্ধ মন্দির দেখার জন্য আমরা নারাতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নারা-তে আরেকবারও গিয়েছিলাম, তাই এই বিষয়ে পরে লিখবো। মোটরে চড়ে আমরা ওসাকা শহর দেখলাম। শহরটি কলকাতা বোম্বাইয়ের মতোই-সেইরকমই বিশাল বিশাল ইমারত।

পরের দিন (৭ মে) বেলা নটার সময় আমরা কোবে থেকে কিয়োটো রওনা হলাম

এবং দুঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেলাম। আমাদের বৌদ্ধদৈনিক পত্রিকা 'চুগাইনিপ্লো'র অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। ওখানে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বৌদ্ধধর্মের ওপর আলোচনা হল। তারপর ওতানী বিশ্ববিদ্যালয় গেলাম। ডক্টর সুজুকী বাড়ি ছিলেন না। শ্রীমতী সুজুকীর সঙ্গে দেখা হল। আলাপ-পরিচয় এবং কথাবার্তাও হল। জানা গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত, পালি আর তিব্বতী ভাষা পড়ানো হয়। কিয়োটো উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জাপানের রাজধানী ছিল। তখন জাপান-সম্রাট পর্দার আড়ালে থাকতেন আর সমস্ত রাজকার্য নেপালের তিন-সরকারের মতো শোগোন-এর হাতে ছিল। কিয়োতোর তিনদিকে আছে দেবদারু গাছে ঢাকা সবুজ পর্বতশ্রেণী। জায়গাটি অতি রমণীয়। তাইতো সিনেমা-ফিল্ম নির্মাতারা টোকিও ছেড়ে কিয়োতোকে তাদের রাজধানী বানিয়েছে। আমরা হিগাশী হোঙ্‌গনজীর বিশাল মন্দিরে গেলাম। গোটা মন্দিরটা কাঠের তৈরি। মন্দিরের মোটা মোটা দেবদারুর থামগুলোকে টেনে আনার জন্য যখন মোটা মোটা দড়ির প্রয়োজন হয়েছিল, তখন হাজার হাজার বৌদ্ধনারী নিজেদের চুল কেটে দড়ি বানাতে দিয়েছিল। আজও সেই দড়িগুলো ওখানে যত্ন করে রাখা আছে। নটার সময় আমরা কোবেতে ফিরে এলাম।

পরের দিন (৮ মে) দশটার সময় আমাদের জাহাজ চলতে শুরু করল। সমুদ্র ছিল চঞ্চল। এখন কেবলমাত্র বাঁদিকে জাপানের তীরভূমি দেখা যাচ্ছিল। আর ডানদিকে ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের অনন্ত জলরাশি। পথে য়োক্কাইচীতে চীনা মাটির বাসনের একটা বড় কারখানা দেখলাম। মাটিকাটা, জলে গোলা, থিতানো, শুকনো করা, পেষাই করা, মাখা, ছাঁচ বা চাকার ওপর ফেলে বাসন তৈরি করা, অন্য চাকায় সেই বাসন নিখুঁত করা, একটু পোড়ানো, রং করা, চিত্রিত করা, পোড়ানো সব কিছুই দেখলাম। মজুরদের মাইনে ছিল মাসে ১৫ ইয়েন (১২ টাকা) থেকে ৫১ ইয়েন (৪২ টাকা) পর্যন্ত। মজুরি রোজের হিসাবে দেয়া হতো। বেশিরভাগ মজুরদের মাইনে দিনে ছ-আনা থেকে আটা আনা ছিল। হ্যাঁ, ভারতে কারখানার মজুরদের মাইনেও এরকমই। এগারোটার সময় আমরা জাহাজে ফিরলাম আর ঘণ্টাখানেক পর জাহাজ এগোতে শুরু করল।

১০ মে খুব সকালে আমাদের জাহাজ ইয়োকোহামার পাড়ে এসে লাগল। পাশপোর্ট অফিসাররা আমাদের পাসপোর্ট দেখল, টাকাকড়ি দেখল, কিছু প্রশ্ন করল—বিশেষ করে আমার বৌদ্ধ পোশাকের বিষয়ে। আমাদের মালপত্র কাস্টম অফিসে গেল। ওরা ওপর-ওপর দেখে ছেড়ে দিল। মালপত্র আমরা ইয়োকোহামা এক্সপ্রেসের জিম্মায় দিয়ে দিলাম। এই কোম্পানি যাত্রীদের মালপত্র বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেয়। আমেরিকান এক্সপ্রেসের অফিসে গেলাম। আমার চিঠিপত্র আমি এদের মাধ্যমেই আনাতাম। কতদূর থেকে আমরা ট্যাক্সি নিয়েছিলাম কিন্তু ভাড়া মাত্র দুই ইয়েন (দেড় টাকা) দিতে হল। এতেই বোঝা যাচ্ছিল জাপানে মোটরের ভাড়া কত সস্তা। চল্লিশ ইয়েনে (প্রায় পাঁচ আনা) মুর্গির মাংস আর ভাত খেলাম। পাঁচ আনায় থোড়াই এইরকম খাবার ভারতে মিলবে?

—১৯৩৫—

টোকিও—ইয়োকোহামা থেকে বৈদ্যুতিক ট্রেন ধরে বেলা একটা নাগাদ টোকিও পৌঁছে গেলাম। ট্যাক্সি করে প্রথমে মহীশূরের এক ভদ্রলোকের কাছে গেলাম, তারপর আবার ৭০ সেন (প্রায় ৯ আনা) দিয়ে ট্যাক্সি করে শহরের অপর প্রান্তে নাকা-ওকাচী-মাচী পাড়ায় কোসীয়োজীর মন্দিরে শ্রীসকাকীবারার কাছে গেলাম। রাস্তায় কয়েক জায়গায় জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল। এত সস্তায় বেনারসে এক্কাও পাওয়া যায় না। টোকিও শহরকে লন্ডনের মতো মনে হচ্ছিল। ১০ মে থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত এখন টোকিওতেই থাকার কথা ছিল। টোকিওতে ট্রামও আছে আবার ট্যাক্সিও আছে। ট্যাক্সির ভাড়া একই—সেই ভাড়া দিয়ে আপনি দশ পা দূরে গিয়ে নেমে পড়তে পারেন আবার শহরের অন্য প্রান্তেও চলে যেতে পারেন। টোকিওর দিনগুলোর বেশির ভাগ সময়ই বিদ্বানদের সঙ্গে দেখা করতে, বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলো দেখতে কেটে গেল। আমি টোকিওতে পৌঁছনোর পাঁচদিন পর সিংহলের ভিক্ষু নারদ টোকিও এসে পৌঁছলেন। তিনি উঠেছিলেন অন্য জায়গায়। সকাকীবারা আমার সব রকম স্বাচ্ছন্দের দিকেই খেয়াল রাখতেন। তাঁর মা তো এ ব্যাপারে আরো তৎপর ছিলেন। জাপানের শিষ্টাচারের সঙ্গে ভারতের যেমন কিছু পার্থক্য আছে, তেমনি অনেক বিষয়ে মিলও রয়েছে। ওখানে লোকে মাটিতে চাটাই পেতে বসে, শোয়। খাট-চেয়ার-টেবিলের রেওয়াজ ওখানে নেই। ঘরদোর খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, খোলা থামের বাইরের দিকে সরানো যায় এমন কাঠের পাটাতন আর ভেতরের দিকে পরিষ্কাব কাগজ চিটিয়ে সরানো যায় এমন ফ্রেম লাগিয়ে দেয়াল বানানো হয়। বাইরের পাটাতন তো শুধু রাত্তিরবেলাতেই লাগানো হয়, ভেতরের কাগজের কাঠামো সব সময় থাকে। কাগজ ভেদ করে আলো ভেতরে আসে। মাটিতে বিছানো হয় এক বিঘত মোটা চাটাই, তার ওপর সুতির বা সিল্কের পাড় লাগানো শীতলপাটী (চাটাই) সেলাই করা থাকে। এই চাটাইগুলো একই মাপে বানানো হয়, আর চাটাইগুলো গুনলে আপনি বুঝতে পারবেন ঘরটা কত বড়। চাটাইয়ের মেঝে বেশ আরামদায়ক হয়—পা দিলেই স্প্রিংয়ের গদির মত দেবে যায়।

থাকার ঘর জিনিসপত্র দিয়ে ভরিয়ে রাখা জাপানিরা একদম পছন্দ করে না। একটি বা দুটির বেশি ছবি দেয়ালে টাঙানো হয় না। রাতে শোয়ার বিছানা-বালিশ-লেপ কাগজের দেয়ালের আড়ালে এমনভাবে রাখা হয় যে বোঝাই যায়না। একটা ঘর বসার জন্য, যেটা খাবার জায়গা আর শোবার জায়গা হিসেবেও ব্যবহার হয়।

ইউরোপে কাঁটা-চামচে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। জাপানে চীনের মতোই দশ ইঞ্চি সমান দুটো পেন্সিলের মত কাঠি দিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ। আমি জাহাজেই কাঠি দিয়ে খাওয়া শিখে নিয়েছিলাম। এমনিতে তিব্বতেও বড় বড় ঘরে কাঠের বা হাতির দাঁতের দুটো 'পেন্সিল' দেওয়া হয়, কিন্তু ওখানে হাত বা চামচও ব্যবহার করা চলে, তাই কাঠি দিয়ে খাওয়া আগে শিখিনি। তবে এবার জাপানে পৌঁছানোর আগেই কাঠি দিয়ে খাবার কায়দা ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলাম। প্রথম প্রথম জাপানি খাবার কিছুটা বিস্বাদ লাগত, কারণ তাতে না ছিল তেল-ঘি না মরিচ-মশলা। মাছের রান্না শুধু নুন দিয়ে সেদ্ধ করা। শাক আছে, কিন্তু তাতে তো নুনজল ছাড়া আর কিছুই নেই। সয়াবীনের অনেক রকমের

পদ হয়, কিন্তু তাতেও ঘি-তেল, মশলা-মরিচের নাম নেই। ভাত ততটা সরু নয়, কোনো সুগন্ধও তাতে নেই। তবে মিষ্টি লাগে খেতে। তার ওপর গৃহিণী ঢাকা দেওয়া কাঠের বালতিতে ভাপওঠা গরমভাত নিয়ে আপনার সামনে বসে থাকে। জাপানে একদানাও এঁটো ফেলে রাখা অনুচিত মনে করা হয়। চীনা পাত্রের গায়ে যেটুকু দানা গায়ে লেগে থাকে জল দিয়ে ধুয়ে সেটাও পান করা হয়। দু-একবার আমার পাতে কিছু উচ্ছিষ্ট থেকে গিয়েছিল। তাতে বন্ধুটি বললেন, 'এসব শিষ্টাচার আমরা ভারত থেকেই শিখেছি, আপনিই যদি এঁটো রাখেন তবে লোকে কি বলবে?' জাপানে শেখা এই অভ্যেস আজও আমার সঙ্গে আছে। পাতে উচ্ছিষ্ট রেখেছি এরকম কদাচিৎ হয়েছে। এরকম সুযোগ তখনই আসে যখন গৃহস্বামী বা গৃহিণী যে খায় তার কথা না ভেবে নিজের ইচ্ছানুসারে পাতে দেয়।

এক দেড় মাস পর জাপানি রান্না আমার কাছে বেশ সুস্বাদু মনে হতে লাগল। প্রথম প্রথম চা-ও ওষুধের ক্বাথের মত লাগত, স্বাদ একটু তেতো—না তাতে তিব্বতের মত নুন-মাখন দেওয়া, না ভারতের মত দুধ চিনি, না কাশ্মীরের মত মিছরি-এলাচ দেওয়া। শুধু জলে সিদ্ধ করা চা-পাতার আরক, যার রঙ সবজে-হলুদ। চায়ের পেয়ালাও আমাদের দেশের পেয়ালার চাইতে ছোট। কিছুদিন পর এই চাতেও স্বাদ পেতে লাগলাম। বস্তুত, খাদ্য এবং সংগীতের স্বাদ দুটোই মূলত অভ্যাস থেকে আসে।

টোকিওর রাজপ্রাসাদ আমরা পাশ থেকে দেখলাম। এর ভেতর সূর্যদেবীর পুত্র সম্রাট হিরোহিতো থাকেন। জাপানের লোক সত্যিসত্যি তাঁকে দেবতা বলে ভাবে, শাসকবর্গ এই শ্রদ্ধাকে আরও জোরদার করার চেষ্টা করে। এখনকার সম্রাটের দাদা অবশ্যই খানিকটা সমঝদার ছিলেন, তবে বইয়ে যতটা লেখা হয় ততটা নয়। পিতা পাগল ছিলেন, যদিও একথা কখনও প্রকাশ পায়নি। বর্তমান সম্রাটের বিলাস-ব্যসনের অবসরে দূরবীণ দিয়ে তারা দেখা আর কবিতা লেখার শখ আছে। মিকাডো (জাপান-সম্রাট) তোকুগাওয়া শোগান-এর যে এখন আর বন্দী নন এতে সন্দেহ নেই কিন্তু এখনো তিনি রাজকার্যে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতেন না।

পাঁচ-ছ বছর আগে জাপানেও গণতন্ত্রের হাওয়া উঠেছিল। মার্ক্সবাদ এবং কম্যুনিজমের বেশ চর্চা আরম্ভ হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে উঠেছিল এসবের কেন্দ্র। এই হাওয়া বারো টাকা মজুরি পাওয়া ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের কাছে আর সাত-আট টাকা মজুরির খেত-মজুরদের কাছেও পৌঁছতে লাগল। শাসকশ্রেণী আতঙ্কিত হয়ে উঠল। যদিও এরা সূর্যদেবীর পুত্র মিকাডোকে দেবতা বানিয়ে পুজো করতে এবং ইতিহাসের দোহাই দিয়ে সূর্যদেবী ও অন্যান্যদের গল্প পড়িয়ে জনগণের মস্তিষ্কে মিথ্যা বিশ্বাস ভরে দিতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে ছিল, তবুও এটা জানা যে, ক্ষুধা আর ভবিষ্যৎ-চিন্তা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য মানুষ এইসব জিনিস শিকেয় তুলে রাখতে পারে। জনগণের মনে এই ভয়ংকর ভাবনা ছড়িয়ে পড়তে দেখে শাসকবর্গ কোদো (জাপানি ফ্যাসিবাদ)-এর প্রচার শুরু করে দিয়েছিল। হাজার হাজার মার্ক্সবাদী আজও জেলে পচছে। আজ জাপানের শাসনক্ষমতা না সম্রাটের হাতে আছে, না বণিকদের

হাতে। হায়াশী, আরাকী, মিনামী আর মসাকী—সেনাবাহিনীর এই চার সেনাপতি আর তাদের সামন্ত বংশ—এরাই এখন বাস্তবিক জাপানের শাসক। বস্তুত সামন্ততন্ত্র এখনও এখান থেকে লুপ্ত হয়নি। এরা পুঁজিপতিদের বাড়তে দিয়েছে, পার্লামেন্ট এবং নির্বাচন মেনে নিয়েছে, তবু ভোটকে নয়—সৈন্যবাহিনীকেই চরম নির্ণায়ক বানিয়েছে। দেশের আয়ের ৪৬ শতাংশ (অর্ধেকের কিছু কম) তখনো খরচ হতো সেনাবাহিনীর পেছনে। সেনাবাহিনীর ওপর পার্লামেন্টের কোনো অধিকার নেই। মুখে তাকে সূর্যদেবীর পুত্র সম্রাটের অধীন বলে মানা হয়, কিন্তু সম্রাট স্বয়ং কিছু সামন্তবংশীয় সেনাপতিদের হাতের পুতুল হয়ে আছেন। যদি তিনি এব চেয়ে কিছু বেশি হয়ে থাকেন তো জাপানের সবচেয়ে বড় তালুকদার-জায়গীরদার, বিভিন্ন কলকারখানাতেও তাঁর কয়েক কোটি ইয়েন লগ্নী করা আছে।

টোকিয়োর ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটি হল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন ইত্যাদি সব বিষয়ই পড়ানো হয়। এখানকার গ্রন্থাগারে চার লাখেরও বেশি বই আছে। রিশশো একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। এর সঙ্গে নিচেরিন সম্প্রদায়ের যোগ রয়েছে। প্রফেসর কিমুরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তাঁর সঙ্গে অনেকবার আমার কথাবার্তা হয়েছে। দুটি জাপানি সভা আর অন্যান্য সংস্থার পক্ষ থেকে ভারতীয় এবং সিংহলী (নারদ) ভিক্ষুদের স্বাগত জানানো হল, বক্তৃতা দেওয়া হল। আমি মনে করি, এতে যে মূলত শিষ্টাচারই ছিল তা নয়—জাপানিদের ধর্মপ্রেমও কাজ করছিল। প্রফেসর ইনোয়ে, নাগাই, কাবাগুচী, কিমুরা, বতনবে, তাকেদাসে—এঁদের সঙ্গে দেখা করে খুব খুশি হলাম। এই বিদ্বজ্জনেরা একটি সভায় আমাদের স্বাগত জানালেন। তার উত্তর ভিক্ষু নারদ পালি ভাষায় এবং আমি সংস্কৃত ভাষায় দিলাম। কাবাগুচীর তিব্বত-যাত্রার কথা আমি তিব্বত যাবার আগেই পড়েছিলাম এবং তাঁর সাহসের আমি খুবই প্রশংসাকারী ছিলাম। এখানে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। এখনও তিনি তিব্বতী ভাষায় কথা বলছিলেন।

জাপান বাণিজ্যে যে সাফল্য অর্জন করেছে তার পুরো লাভটা পুঁজিপতিদের হাতেই গেছে। এরা শ্রমিকদের মজুরি বাড়তে দেয়নি। যে কাপড় দৈনিক ৬ টাকার মজুরি তৈরি করে সেই কাপড়ই যদি দৈনিক ৬ আনার মজুরও তৈরি করে তবে ৬ আনার দৈনিক মজুরিতে বানানো কাপড় ১৬ গুণ সস্তা হবে। জাপানি কারখানার মালিকরা কাপড় যদি বিলিতি কাপড়ের সমান দামে বিক্রি করে তবে ১৬ গুণ লাভ করবে, কিন্তু এরা এরকম করে না। এরা লাভ কিছু কম করে জিনিসকে সস্তা করে দেয়—তাই বিশ্বের বাজারে এদের জিনিসের চাহিদা বেড়ে যায়। জাপানিদের ব্যবসার এই কৌশলের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় মজুরদের। জাপানি পুঁজিপতিদের তো লাখ টাকাকে কোটি এবং কোটিকে দশ কোটি করতেও সময় লাগেনি। তাদের কারখানাগুলোতে একশ শতাংশ মুনাফা বাড়তে দেখা গেছে। ভারতেও এই লুট চলে—কাপড়ের কারখানাতেও এবং চিনিকলেও। একই ইংরেজ পুঁজিপতি বিলেতে তাদের কারখানার শ্রমিকদের সোয়াশ-দেড়শ টাকা মাইনে দেয়, আবার ভারতে দেয় ১২ কিংবা ১৫ টাকা।

একই ইংরেজ জাহাজী কোম্পানি ইংরেজ খালাসিকে মাইনে দেয় মাসে দেড়শ টাকা আর ভারতীয় খালাসীকে রাখে ৩০ টাকায়। জাপানে পুঁজিপতিদের বেশ মজা। জাপানি মজুর তার কষ্টের প্রতিবাদে হরতাল করতেও পারে না। সে শুধু আর্জি পেশ করতে পারে।

তবে ব্যবসায়ীরা যে কোটিকোটি টাকা পকেটস্থ করছে তার কিছু অংশ মন্দিরগুলোও পেয়েছে। জাপানি মন্দির আর ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইমারত দেখলেই বোঝা যায় যে এই ব্যবসায়ীরা ধর্মের প্রতি কতই না উদারতা দেখিয়েছে। নিশি হোঙ্ওয়ানজীর ১৬, ১৭ লাখ ইয়েন খরচা করে ১৯৩০ সালে তৈরি মন্দিরের কথা তো ছেড়েই দিন। সেটিও একজন কোটিপতি গৃহস্থ মোহান্তের সম্পত্তি। অন্যান্য মন্দিরগুলোও দেখুন, বুঝবেন সেগুলো বানাতেও প্রচুর খরচ করা হয়েছে। আমরা প্রাচীন মন্দিরগুলোও দেখলাম। সোয়োজী মন্দিরে লাক্ষা দিয়ে পশু, পাখি, ফুল-পাতা এত সুন্দর করে বানানো হয়েছে যে দেখে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। জাপানি মন্দিরগুলো দেখলে বোঝা যায় ওখানে শিল্পকলার কতটা উন্নতি হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, জাপানের শিল্পকলার ঐতিহ্যে কোনো ছেদ পড়েনি।

জাপানের শাসকশ্রেণী তাদের সামাজিক কাঠামোটি পুরনোই রেখেছে, তবে অর্থ এবং ক্ষমতা নিজেদের হাতে জমা করার জন্য কোনো পশ্চিমী ব্যাপার গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। এরা কারখানা আর মিলগুলোকে যেভাবে নতুন নতুন মেশিনে সুসজ্জিত করেছে, যেভাবে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে , তা পশ্চিমী দেশগুলোরও কান কেটে দিয়েছে। আমেরিকান ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে নতুন ধরনের দোকান ডিপার্টমেন্ট-স্টোর খুবই চালু করা হয়েছে। এক-একটি ডিপার্টমেন্ট-স্টোরে বিশ হাজার রকমের জিনিস বিক্রি হয়—আর সেখানে পাঁচ হাজার বিক্রেতা কাজ করে। আপনি স্টেশনে নামছেন, সেখানেই ঝকঝকে আরামদায়ক এক মোটর-বাস ডিপার্টমেন্ট-স্টোরের তরফ থেকে আপনার জন্য তৈরি। আপনাকে দু-তিন আনা ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু এই টিকিটে আপনি এই স্টোরের জিনিস কিনতে পারবেন, ফলে গাড়ির ভাড়া লাগল না। এই স্টোরে ছোট ছোট খেলনা থেকে শুরু করে রেডিমেড কোট-প্যান্ট, ফুল-ফল আর খাবার সবই পাওয়া যায়। এর বিশাল সভাকক্ষ বিনামূল্যে সভা, ধর্মোৎসব আর নাটকের জন্য পাওয়া যেতে পারে। পুঁজিপতিরা জানে যে এসব ওদের দোকানের বিজ্ঞাপনের পক্ষে খুব ভালো। যদিও ভারতের দারিদ্র্যের সঙ্গে এদেশের কোনো তুলনা করা চলে না, তবু বেকার এবং ক্ষুধার্ত লোক এখানেও প্রচুর আছে, ক্ষুধার জ্বালায় কত মানুষ আত্মহত্যা করে বসে।

বন্ধু সকাকিরা যথেষ্ট উন্নত ভাবধারার তরুণ ছিলেন, যদিও হিটলারের জার্মানিতে থেকে তিনি নাৎসীদের সংগঠনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।—তবু তিনি তাঁর নিজের দেশের শাসকশ্রেণীর ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

নিক্কো—সওয়া একমাসে টোকিওতে থাকার পর ইচ্ছে হলো জাপানের কোনো এক গ্রামে

থেকে ওদের গ্রাম্যজীবনকে কাছ থেকে দেখি। শ্রীব্যোদোর সঙ্গে আগেই ভারতে পরিচয় হয়েছিল, এখানেও দেখা হল—তাঁর ইচ্ছে ছিল যে আমি তাঁর গ্রাম নিত্তাতে গিয়ে থাকি। ব্যোদোর মা ছেষট্টি আর বাবা সত্তর বছরের। ব্যোদোর ছোট ভাই কম্যুনিস্ট ভাবধারা ছিল, যার জন্য তাকে বহুমাস জেলের হাওয়া খেতে হয়েছে। এখন সে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিল। আমরা ২৮ মে ব্যোদোর সঙ্গে তাঁর গ্রাম নিত্তা গেলাম। স্টেশন থেকে দুমাইল ট্যাক্সিতে যেতে হল—তারপর আধ মাইল পাহাড়ী রাস্তায় চড়াই-উৎরাই ভাঙতে হল। এদের মন্দির একটি ছোট পাহাড়ের পাশে। মন্দিরটি ছ-সাতশ বছরের পুরনো। বৌদ্ধ পুরোহিতদের পরিবার এরা। যজমানী আয় ছাড়াও এদের কাছে প্রচুর জমি আছে। জাপানের গ্রামগুলোতেও এখন বিদ্যুতের আলো ঢুকেছে, তবে কেবল রাত্তিরবেলাই বিদ্যুতের ব্যবহার করা যেতে পারে। সে-সময় নিত্তা গ্রামের খেতগুলোতে জব, গম, আর বাকলা (ক্লৌভ্যার)-এর গাছগুলো ঢেউ তুলছিল, কিছু পরিণতও হয়ে উঠেছিল। স্ট্রবেরিরও অনেক খেত ছিল। ধানের চারা এখন ছ-আঙুল বেড়েছিল। বোনার জন্য জমি তৈরি করা হচ্ছিল। কৃষকদের বাড়ির বেশির ভাগ ছাতই ছিল খড়ের। পাশেই বাঁশ, দেবদারু ইত্যাদি গাছে ঢাকা টিলা। বাঁশ এখানে একটা একটা করে আলাদা আলাদা লাগানো হয়। কিছুদিন আগেও বাঁশের চেয়ে বাঁশের মোথা বিক্রিতে বেশি লাভ ছিল। নরম বাঁশের মোথার তরকারি জাপানিদের অত্যন্ত প্রিয়। সেদিন আমরা নিত্তা গ্রামেই থেকে গেলাম। গ্রামটি আমাদের খুবই সুন্দর লেগেছিল।

পরের দিন (২৯ মে) আমি টোকিও ফিরে এলাম। সেখানে দু-একটি জাপানি ফিল্ম দেখলাম। ফিল্মে সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে যে-বিষয়ের ওপর তা হল—যুদ্ধ আর সৈন্যদলের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য জনগণকে তৈরি থাকার প্রেরণা। অবশ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য গ্রহণেও শিল্পবোধের পরিচয় ছিল।

২ জুন আমি নিত্তাতে থাকার জন্য গিয়েছিলাম আর ২০ জুলাই পর্যন্ত, ওখানেই দেড় মাস ছিলাম। রেলে দেড় ঘণ্টার রাস্তা অথচ এতটা দূরত্বের জন্য মোটর ট্যাক্সির ভাড়া আমাকে দিতে হল মাত্র আড়াই ইয়েন (১ টাকা ১৪ আনা)। এখানে ব্যোদো মশাই-ই ইংরেজি জানতেন। তাঁর মা-বাবার সঙ্গে হয় হাতের ইশারাতে কথা বলতাম, নয়তো জাপানি-ইংরেজির 'নিজে শেখো' বইয়ের সাহায্যে। ব্যোদোর বন্ধুরা (দুজন) কেউ এখনো বিয়ে করেনি। ওদের বাড়িতে আরো একজন তরুণী ভিক্ষুণী ছিল—তাকে অবশ্য ভিক্ষুণীর বদলে ব্রহ্মচারিণী বলাই ঠিক হবে, কারণ তার বেশভূষায় কোনো তফাৎ ছিল না। এই জায়গাটি ছিল খুবই শান্ত আর নির্জন। মন্দির আর ঘরের উঠোনে একটি ছোট বাগান ছিল, সেখানে কয়েকটি দেবদারু গাছও ছিল। শীতে যখন তুষারপাত হয়, তখন কাঁচের গরম ঘরে সব্জী ফলানোর ব্যবস্থাও রয়েছে। এখন স্ট্রবেরি পেকে গিয়েছিল। একদম তাজা আর সস্তায় স্ট্রবেরি পাওয়া যাচ্ছিল। জাপানিরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে অত্যন্ত ভালোবাসে, এরা নিজেদের বাগানকেও প্রাকৃতিক বনের মতো করে বানায়। দেবদারুর সৌন্দর্য্যে এরা মুগ্ধ আর হিমালয়ের দেবদারুকে তো এরা সৌন্দর্য্যশিখার মণি বলে মানে। হিমালয়ের দেবদারু এখানে আনা হয়েছে এবং তার আটহাত-দশহাতের

—১৯৩৫—

চারা বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে। নিত্তা ছেড়ে যাবার আগে ব্যোদোসান্ (ব্যোদোজীর)-এর ইচ্ছে হল আমার স্মৃতি রক্ষার্থে আমি যেন একটি হিমালয়ের দেবদারু মন্দিরের সামনে পুঁতে যাই। স্মৃতি রক্ষার ওপর অবশ্য আমার খুব একটা বিশ্বাস নেই, তবে দুই, চার, দশ প্রজন্মের জন্য সুন্দর একটি জিনিস রেখে যাওয়া তো ভালোই।

এখানেও আমাকে অনেকটা সময় দিতে হতো প্রুফ দেখা আর 'দীঘনিকায়'-এর হিন্দি অনুবাদ করতে। জাপানি দৈনিক পত্রিকা আসত সেখানে কিন্তু আমি তা পড়তে পারতাম না। তবে হ্যাঁ, রাতে রেডিও চলত। কয়েক মিনিট ইংরেজিতেও খবর শোনানো হতো। ৩ জুন রেডিওতে খবর দিল—কোয়েটাতে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছে আর ৬০ হাজারের ওপর মানুষ মারা গেছে। খবরটা শুনে মন বিচলিত হয়ে উঠল। সারারাত এক বছর আগে হওয়া বিহারের ভূমিকম্পের হৃদয়বিদারক দৃশ্যই দেখলাম।

কখনো-সখনো বৃষ্টিও হচ্ছিল, তবে এমনিতে আবহাওয়া চমৎকার ছিল। এখানে প্রচুর মশা ছিল। দিনের বেলা একটু গরমও লাগত। অবসর সময়ে আমি জাপানি ভাষা শেখার চেষ্টা করতাম। ব্যোদোসান্ সংস্কৃত জানতেন। তিনি আমার কাছে কোনো কাব্যগ্রন্থ পড়তেন। এধার-ওধারের গ্রামে বা আশেপাশের শহরে যাওয়ার সময় তিনি আমার পথপ্রদর্শক হতেন।

২০ জুন চাষীদের বাড়ি দেখতে গেলাম। খড়ের ছাউনিওলা ছোট ছোট ঘর—একটা আরেক্টার থেকে আলাদা হয়ে গড়ে উঠেছে। চাষীদের ঘরের চাকরানীদের কাপড়চোপড়, খাওয়া, সামান্য টাকা দেয়া হয়—সব মিলিয়ে মাসে পাঁচ-ছ টাকার বেশি হবে না। জাপানিরা খাবারে কত কম খরচ করে সেটা এ থেকেই বোঝা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের খাবার জন্য চার বা পাঁচ টাকার বেশি খরচ করতে হয় না। দুধ, মাখন, তেল, মাংস, মশলা খাওয়া ওদের খাবারে জরুরি নয়, মাছ-মাংসও মাঝে-সাঝে খাওয়া হয়। গ্রামের লোকেদের খরচ তো আরো কম।

কৃষিতে জাপানি চাষী আধুনিক জিনিসপত্র খুব ব্যবহার করে, জমিতে সারও খুব দেয়। কারখানায় উৎপন্ন সার এবং কাঁচা পায়খানাও জমিতে দেয়। শহরে গ্রামে পায়খানার খদ্দের ঘুরে বেড়ায়। আপনি আপনার পায়খানা যদি নিজের জমিতে না দেন তবে সেটা ভাল দামে বিক্রি করতে পারেন। শহরে মিউনিসিপ্যালিটি পায়খানা বিক্রি করে দেয়। মুখবন্ধ নৌকোয় ভরে গাঁয়ে গাঁয়ে নিয়ে যায়। চাষী সেটা কিনে নেয়। বালতিতে পায়খানা নিয়ে নাকে কাপড় বেঁধে হাত দিয়ে যখন ছিটোতে থাকে, দেখে আপনার মনে হবে বীজ ছেটানো হচ্ছে। কাঁচা পায়খানা জমিতে পড়ার পর কিছুদিন খেতের রাস্তায় যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। আমাদের চাষীদের চেয়ে এরা চার-পাঁচগুণ বেশি ফসল ফলায়। ওখানেও বড় বড় জমিদার আছে, সবচেয়ে বড় জমিদার তো জাপানের সম্রাট। চাষীদের ঘামঝরা পরিশ্রমে উপার্জিত ফসলের অনেকটা অংশই এইসব নিষ্কর্মাদের দিয়ে দিতে হয়, তবু সেখানে সরকার এইসব চাষীদের নানাভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করে। কৃষিবিদ্যালয় ওখানে সরকারী চাকর তৈরি করে না, বরং নতুন ধরনের চাষী তৈরি করে। চাষীরা জমিতে মেশিনও ব্যবহার করে। বিশেষ করে পায়ে

চাপ দেওয়া এবং তেলের ইঞ্জিনে চলা মেশিন ব্যবহার করে। ফসল উঠে গেলে জাপানি কৃষক নিশ্চিন্তে জীবন কাটায় কিন্তু ফসল নষ্ট হয়ে গেলে খুবই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ খাওয়া-পরার পর খুব কম ঘরেই কিছু উদ্বৃত্ত থাকে।

একে অপরকে সাহায্য করার সুফলের কথা জাপানি কৃষক আগে থেকেই জানত। জাপানিদের ঘর কাঠ আর কাগজের দেওয়ালের ওপর খড়ের চাল ছাড়া আর কিছুই নয়। জাপানে এমনটা কদাচিৎ হয় যে, কয়েক মাস চলে গেল কিন্তু ভূমিকম্প হল না। খুব তীব্র ভূমিকম্পও মাঝে মাঝে হয়। ইট, পাথরের দেয়াল তো এই ভূমিকম্পের করস্পর্শেই শুয়ে পড়ে। তখন এই ঘরগুলো শুধু মানুষকে কবর দেবার কাজে লাগে। কাঠের বাড়ি যে ভূমিকম্পের খুবই সহায়ক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে আগুনও খুব সহজেই ধরে যায়। কপাল ভাল যে, ঘরগুলো একটার থেকে আরেকটা দূরে দূরে থাকে। আমাদের গ্রামের মত হলে গ্রামকে গ্রাম জ্বলে যেত। এখানে কারো ঘর পুড়ে গেলে নতুন ফসল ওঠা পর্যন্ত গাঁয়ের সব রান্নাঘরই তার জন্য খোলা। একদিন আমরা যাচ্ছিলাম, দেখলাম—দুটো থামের ওপরে কাঠের চওড়া পাটাতন লাগানো হয়েছে, তার ওপর হাতে লেখা অনেকগুলো কাগজের টুকরো সাঁটা আছে। ব্যোদোসান্ বললেন, 'এই ঘরে আগুন লেগেছিল।' কোনো ঘরে আগুন লাগলে গ্রামের প্রতিটি মানুষের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা আবশ্যিক, ফলে পুড়ে যাওয়া ঘর কয়েকদিনের মধ্যেই আবার খাড়া হয়ে যায়। জমি ভাগাভাগি হয়না, কারণ ঘরের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয় বড় ছেলে। মা, বাবা হাতে করে নগদ কিছু দিলে বা দাদা যদি কিছু দয়া করে তবে ছোট ভাইয়ের কিছু জুটে যায়, তা না হলে ওর কোনো কিছু পাওয়ার অধিকারই নেই। আমি একদিন ব্যোদোসানের কাছে এই প্রথার নিন্দা করছিলাম এবং তিনি এই প্রথার সমর্থন করছিলেন। আমি বললাম, 'বড় ভাই এরকমটাই করবে।' তিনি জবাব দিলেন, 'বড় ভাইয়ের দায়িত্ব অনেক বেশি, শুধুমাত্র নিজের ছোটভাইদের দেখাশোনা করাই নয় উপরন্তু ঐ ঘর থেকে আলাদা হয়ে আরো যত ঘর হয়েছে প্রত্যেকের সম্মান রক্ষা করা তার কাজ। প্রত্যেকের ধর্ম হল পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা, তাদের সমাধিগুলোতে পুজো দিতে আসা—যে সমাধিগুলোতে পিতৃপুরুষের চিতাভস্ম রাখা আছে। সে-সময় পরিবারের মধ্যে যে বড় সে-ই সবার খাবার দেয়। আমি বললাম, 'এর সঙ্গে যদি তিব্বতের মতো সব ভাইদের একজন স্ত্রী হতো তবে নতুন নতুন ঘর তৈরি করা আর নতুন সম্পত্তি তৈরি করার দুর্ভাবনার হাত থেকে মানুষ রক্ষা পেত।' জাপানে ছোট ভাইয়েরা যখন বেশ সাবালক হয়ে ওঠে, কিছু কামাতে পারে, তখনই সে বিয়ে করে। মেয়েদেরও বিয়ের জন্য টাকা জমানো খুব প্রয়োজন। এরা তিন-চার বছরের জন্য কোনো কারখানার বা ধনীর বাড়ির চাকরানী হয়ে যায়। গরিব মা-বাবা দু-তিনশ টাকা আগাম নিয়ে নেয়, আর এই মেয়েকে ততদিনের জন্য প্রায় বিক্রিই করে দেয়।

নতুন জাপান মহিলাদের অবস্থার কোনো উন্নতি করেনি। বিবাহের আগে এদের কর্তব্য হল শরীর পর্যন্ত বিক্রি করে মা-বাবার সেবা করা। যে-মেয়েরা নাচ-গানের পেশা নিয়ে থাকে, তাদের গৈশা বলা হয়। এরকম গৈশা-ঘর সমস্ত শহরে এবং মফস্বল শহরে

দেখা যায়, যেখানে ১০-১৫ অথবা তার চেয়েও বেশি মেয়ে থাকে। আপনি ইচ্ছে করলে ফী দিয়ে গৈশা-ঘরে নাচ গান শুনে আসতে পারেন, কিংবা কোনো মেয়েকে আপনার বাড়িতেও ডাকতে পারেন। মেয়ের ফী মালিক নেয়। মেয়েরা বেশির ভাগ এমন মা-বাবার হয়, যারা দারিদ্রের জন্য গৈশা-ঘরের মালিকের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে কিছুদিনের জন্য তাদেরকে মালিকের হাতে সঁপে দেয়। গৈশা-ঘরের মালিক খাওয়া-পরা আর সামান্য হাত খরচ দিয়ে দেয়। গ্রাহক আরো কিছু বকশিশ দেয়, কিন্তু এর পরিণাম কতখানি খারাপ হতে পারে সেটা আপনি নিজেই অনুমান করতে পারবেন। মা-বাবার সঙ্গে থাকে এমন মেয়েরাও দারিদ্রের বোঝা হালকা করার চেষ্টায় টাকার বিনিময়ে অন্যের বাড়িতে নাচ-গান করতে যায়, এর পরিণামও খারাপ হয়। তবে কুমারী মেয়েদের এই জীবনের কথা বিয়ের পর আর মনে রাখা হয় না। বিবাহিত তরুণী স্বামীর পূর্ণ আস্থা লাভ করে। জাপানে ছেলেদের মতো মেয়েদেরও প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক কিন্তু জাপানিদের রাষ্ট্রের পুঁরো চেষ্টা থাকে মেয়েরা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে। মেয়েদের পড়ার বিষয় গান, নাচ, রান্না, নান্দনিক ভঙ্গিতে চা পবিবেশন, ফুল-পাতা সাজানো, সেলাই, সূচিশিল্প ইত্যাদি ইত্যাদিতে ভরে রাখা হয়েছে। তাদের পড়াশুনো হাইস্কুলেই শেষ হয়। টোকিও থেকে অনেক দূরে সেন্দাই-ই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে মেয়েরা পড়তে পারে, কিন্তু সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য এবং রাজনীতির কেন্দ্র থেকে খুব দূরে হওয়ার ফলে খুব মেয়েই ওখানে পড়তে যায়। সামন্তযুগে নারী যে-অবস্থায় ছিল আজও তাদের সেই দশা। উপরন্তু কলকারখানায় অবিবাহিত মেয়েদের দল দশ-বারো ঘণ্টা কাজ করে শুধু নিজেদের শরীরই নয়—জীবনটাও তাদেব নষ্ট হয়ে যায়।

একদিন (৩০ জুন) বোগিহারার কাছে গেলাম। ইনি জাপানে সংস্কৃতের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত। ৬৮ বছর বয়স, কিন্তু লেভী ও পেলিয়ো-র মত ইনিও রাতদিন বিদ্যাভ্যাসেই রত থাকেন। ইনি জার্মানিতে পড়াশুনো করেছেন, এখন থৈসো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সেই সঙ্গে তিনি একটি মন্দিরের মোহান্ত। আগে তাঁর মন্দির শহরে ছিল। শহরের জমির দাম খুব বেড়ে গেল। জমি বেচে দিয়ে এখন শহরের বাইরে জমি কিনে এই সাধাসিধে অথচ সুন্দর মন্দির বানিয়েছেন। মন্দিবের আশেপাশে সুন্দর বাগান আছে—বাগানের চেয়ে এর সঙ্গে বনের মিলই বেশি। আজ খাওয়া-দাওয়া এখানে হল এবং দীর্ঘসময় ধরে বৌদ্ধসাহিত্য নিয়ে আমাদের আলোচনা চলল। তাঁর পরিক্রমার প্রশংসা করাতে তিনি বললেন, 'আমি ৬৮ বছরের হয়ে গেছি, আমি মনে করি যা করার তা তাড়াতাড়ি করে ফেলা উচিত।' আমরা যখন ওখান থেকে ফিরছিলাম, তখন ব্যোদোসানের এক পরিচিত এবং ছাত্রী সকাইকে স্টেশনে পেলাম। সে একটি মন্দিরের মোহান্তের মেয়ে, আমাদের সবাইকে তাদের মন্দিরে নিয়ে গেল। মেয়েটির বাবা এবং ভাই আমাদের খুব অভ্যর্থনা করল। মন্দির ছোট হলেও অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ তার গঠন। মেয়েটি মার্কসবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিল, তাই যখন থেকে মার্কসবাদীদের ওপর সরকারের কোপদৃষ্টি পড়ল তখন থেকেই তাকে গা ঢাকা দিতে হয়েছিল।

গ্রামের গরিব চাষীর একটি ভাল উদাহরণ ছিল ব্যোদোসানের বাড়ির পাশের

কৃষক-পরিবারটি। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া পরিবারে ছিল চারটি ছেলে ও ছ-টি মেয়ে। বড় ছেলে বাবার সঙ্গে জমিতে কাজ করত, দ্বিতীয়টি ইয়োকোহামায় ট্যাক্সি চালাত। একজন তার মেয়েকে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে এবং একটি গাড়ি কিনে ভাড়ায় চালাতে দিয়েছে। তৃতীয় ছেলেটি যখন পনের বছরের ছিল তখন এক ফুল-চাষীর হাতে তাকে ৫০০ ইয়েনে 'বিক্রি করা হয়েছে'। দুশো টাকা সে আগাম দিয়েছে, পাঁচ বছর হল সে ওখানে কাজ করছে, আরো একবছর হলে তার ছুটি হবে। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। দুই মেয়ে টোকিওতে—একজন নয় ইয়েন আর একজন দশ ইয়েন মাইনেতে কারো বাড়িতে কাজ করে। ওরা বছরে দুবার বাড়ি আসে। বাকি সবাই ছোট। ছোট ভাই হওয়ার ফলে সে বাবার সম্পত্তির কিছু পায় নি। মজুরি খেটে কোনরকমে সে এই ঘর কিনেছে। এখন অন্যের জমিতে আধাআধি ভাগে চাষ করে পেট চালায়।

জাপানিদের সম্পর্কে এটুকুই বলব যে, সাধারণ লোকেরা বড় মধুর স্বভাবের হয়। বিদেশে গিয়েছে এমন জাপানি ব্যবসাদারদের মিথ্যাচার এবং ধোঁকাবাজি দেখলে হয়ত লোকে অন্যরকম ধারণা করতে পারে, কিন্তু সেটা ভুল হবে। জাপানি জনসাধারণ খুবই সৎ প্রকৃতির হয়। তাদের মধ্যে স্নেহ এবং প্রেম রয়েছে। বিদেশীদের জন্য তা আরো বেড়ে যায়। যেকোনো গ্রামে গেলে দেখা যায় গ্রামের প্রতিটি মানুষ পর্যটকের সেবা করার জন্য উৎসুক। কষ্ট সহ্য করার এক অদ্ভুত শক্তি আছে তাদের মধ্যে। বাড়িতে অতিপ্রিয় আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু মুখের স্মিত হাসি দেখে আপনি বুঝতে পারবেন না এর হৃদয়ে তখন কি যন্ত্রণার ঝড় বয়ে চলেছে। নিজের দুঃখে অন্যকে দুঃখী করা এরা পছন্দ করে না। কিন্তু অপমান জাপানিরা সইতে পারে না। মৃত্যুতে এত নির্ভীক জাতি খুব কম আছে। তবে জাপানি শাসকদের ক্ষেত্রে এসব কথা খাটে না। এরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবকিছু করতে পারে। এরা জাপানি জনগণকে শেখায়, 'দেশের জন্য যা কিছু করা যায় সবই ধর্ম'। দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিজস্ব স্বার্থের। সাধারণ নাগরিক এবং ধর্মীয় নেতাদের আমি দেখলাম খুব মিশুকে। কিন্তু যে লোকেদের হাতে জাপানের শাসনের লাগাম রয়েছে তারা ধোকাবাজি, চালবাজি আর ক্রূরতায় ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদীদেরও কান কাটে। তারা নিজেদের দেশের ভাইদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে যে, আজও পাঁচ-ছ হাজার জাপানি তাদের জনহিতৈষী ভাবনার জন্য জেলে বন্দী ছিল।

ব্যোদোসান্ খুব সাদা-সিধে সংস্কারমুক্ত কিন্তু উদার চিন্তা-ভাবনার পুরুষ। তিনি একজন মোহান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। আমি জাপানি জীবন আর তার আর্থিক অবস্থা খুব কাছ থেকে দেখতে চেয়েছিলাম। সেজন্য আয়-ব্যয়, বেতন-মজুরি সবকিছুরই গভীরভাবে অনুসন্ধান করার ছিল। জানতে পারলাম, ব্যোদোসান ভেবে নিয়েছিলেন যে আমি এমন কোনো বই লিখব যাতে জাপানকে খানিকটা কালো করে চিত্রিত করা হবে। আমরা নিত্তার স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম। দুপুরে খুব গরম ছিল কিন্তু সেই রোদেও বাচ্চা সৈনিকরা কুচকাওয়াজ করছিল। জাপানি নেতা সূর্যদেবীর সন্তান হওয়ার জন্য সারা পৃথিবী জয় করার স্বপ্ন দেখছিলেন, ঠিক সেই রকম, যেরকম

—১৯৩৫—

হিটলার—জার্মান জাতির আর্য হওয়ায় একমাত্র নিজেকেই সে পৃথিবী শাসন করার অধিকারী মনে করতো। জাপানি শাসক এখন শুধু মাঞ্চুরিয়া আর কোরিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। বিশ্ববিজয়ের জন্য রক্ত আর তরবারি প্রয়োজন হবে তাই স্কুলের ছোট-ছোট ছেলেদের থেকেই সৈনিক করে তোলার কাজ শুরু হওয়া দরকার ছিল। আমরা স্কুলের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা দেখলাম। প্রধান শিক্ষক সবকথা আন্তরিকভাবে জানালেন। এখানে ছ-বছরের শিক্ষা অনিবার্য। ছেলে-মেয়ে দুজনের জন্যই। তারপর ৪ বছরের জন্য মিড্‌ল-এর পড়াশোনা এবং ৩ বছর হাইস্কুলের। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ৩ বছরের, মেডিক্যাল কলেজের চার বছরের। সারা জাপানে আধ ডজনের বেশি মহিলা-ডাক্তার নেই। স্কুলে আমি প্রশ্ন করার সময় একবার ব্যোদোসান্ অসন্তুষ্ট হলেন। বলতে লাগলেন, 'এটা আমি জানাব না, এতে জাপানের বদনাম হবে।' আমি ঠাণ্ডা মাথায় বোঝালাম, 'পৃথিবীতে কোনো দেশই দেবতা নয়। এমন কোনো দেশ আছে যেখানে দারিদ্র, মুর্খতা আর স্বার্থপরতা নেই?'

আমরা একদিন নিত্তা থেকে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম। আমি জাপান সম্বন্ধে ইংরেজিতে যত বই পাওয়া যেত তা পড়ে নিচ্ছিলাম। একদিন কোথায় পড়লাম যে ওখানে একটি অচ্ছুৎ জাতি আছে। আমি ব্যোদোসান্‌কে জিজ্ঞেস করতে থাকলাম যে অমুক জাতি এখন আছে কি না। তিনি আমার হাত ধরে বললেন, 'এখন চুপ করে থাকুন।' যখন আমরা সেই তিন-চারটে ঘর পেরিয়ে চলে গেলাম, তখন তিনি বললেন, এইগুলো সেই জাতেরই ঘর। যদি ওরা শুনতে পেত তাহলে খুব খারাপ হতো। সরকারের পক্ষ থেকে আইন আছে, যদি কেউ এই জাতিকে আলাদা করে দেখে তবে তাকে দণ্ড দেওয়া হবে। শহরে তো এরা বিয়ে-টিয়ে করে মিশে গেছে। কিন্তু গ্রামে এখনো লোকের মন থেকে এই পার্থক্যজ্ঞান দূর হয়নি, অন্তত বিয়োসাদিতে।'

১১ জুলাই বিকেল পাঁচটা বেজে পঁচিশ মিনিটে ভূমিকম্প হল। প্রায় আধ মিনিট ধরে ছিল। পুরো নড়ছিল। বিজলীর আলোগুলো খুব দুলছিল। সাতটায় রেডিওতে শুনলাম যে সিজুওকা নগরের খুব ক্ষতি হয়েছে। সেখানে অনেক বাড়ি পড়ে গেছে। ভূমিকম্প হলেই সেখানকার লোকেদের প্রথম কাজ হয় আগুন নিবিয়ে দেওয়া।

ইয়োকোহামা আমি অনেকবার দেখেছি, আশেপাশের অন্যান্য জায়গাগুলোও দেখে নিয়েছিলাম। যাত্রাতে আমার পছন্দ হচ্ছে—যে-রাস্তায় গিয়েছি সেই রাস্তায় না ফেরা। আমি ভাবছিলাম সোভিয়েতের রাস্তায় ফিরলে ভাল হয়, কিন্তু আমার কাছে টাকা ছিল না। আমি আমেরিকান মাসিক পত্রিকা 'এশিয়া'তে তিব্বতী চিত্রকলার বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তার ৮০ ডলার (প্রায় ৩০০ টাকা)-এর চেক চলে এল।আমি খুশি হলাম যে এবার আমি সোভিয়েতের রাস্তায় ফিরতে পারি। কিন্তু এখন সোভিয়েতের ভিসা নেওয়ার ছিল। সোভিয়েত ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে কথা বললাম। সেই সঙ্গে মাঞ্চুরিয়া (মংচুকুও) থেকেও ভিসা নেওয়ার ছিল। মাঞ্চুরিয়ার অফিসে গেলাম, তো তারা বলল, 'আমাদের দেশের নাম আপনার পাসপোর্টে নেই। আগে ব্রিটিশ কন্‌সল্‌-এর কাছে গিয়ে আমাদের দেশের নাম লিখিয়ে আনুন, তারপর আমরা ভিসা দেব।' ব্রিটিশ

কন্‌সল্ বলল, 'আমাদের সরকার মাঞ্চুরিয়া সরকারকে স্বীকার করেনি, তাই মাঞ্চুরিয়া তো লিখতে পারি না, কিন্তু সমস্ত দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর জন্য লিখে দিচ্ছি।' যাইহোক, মাঞ্চুরিয়ার অফিসেও পাসপোর্টের ওপরে ভিসা লিখে দিল।

২১ জুলাই নিত্তা থেকে আমি টোকিও ফিরে গেলাম। সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করতে হল মাঞ্চুরিয়া এবং সোভিয়েতের ভিসার জন্য। যাক, সব কাজ শেষ হয়ে গেল। এখন জাপানের আরো কিছু জায়গা দেখতে চাইছিলাম। ব্যোদোসান্ এবং তাঁর পরিবার যে স্নেহ দেখিয়ে ছিলেন, তার জন্য শাব্দিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি ঋণমুক্ত হতো পারব না। নিত্তা, ওখানকার গ্রামের ভদ্র নরনারী, ব্যোদোসান্ এবং তাঁর বৃদ্ধ মাতা-পিতা ও ভিক্ষুণীর স্মৃতি আমার পক্ষে সর্বদা মধুর হয়ে থাকবে। বন্ধু সকাকিবারা আমার সঙ্গে ঘোরার জন্য একটি সপ্তাহ দিয়েছিলেন। আমরা দুজন ২৭ তারিখ মাঝরাতে টোকিও থেকে রওনা হলাম। পরের দিন সকাল সাতটার সময় কোদা স্টেশনে নামলাম। মালপত্র বাইসাইকেলে রেখে দিলাম। জাপানি কৃষকরা খুব বাইসাইকেল ব্যবহার করে। বাইসাইকেলের পিছনে একটা দু-চাকার রবারের টায়ারওলা গাড়ি বেঁধে দেয় এবং দুমণ বোঝা তুলে ছুটিয়ে নিয়ে যায়।

সকাকিবারার হচিজো-বিহারে বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। দু-মাইল রাস্তা। আমরা পায়ে হেঁটেই চললাম। চারদিকের খেতে একহাত, সোয়া হাত লম্বা ধান গাছ খাড়া হয়ে ছিল। যেখানে-সেখানে উঁচু-নিচু জমি আর সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। উঁচু খেতগুলোতে তুঁতগাছ লাগানো ছিল। এগুলো ছিল রেশম পোকার জন্য। সকাকিবারা সন্ধে এবং রাতে তিনবার বক্তৃতা দিলেন। একবার আমাকেও বলতে হল। পরের দিন তিনি চারবার বক্তৃতা দিলেন। আমার আশ্চর্য লাগছিল যে লোকে এত বক্তৃতা ধৈর্য্য ধরে শোনে কি করে।

৩১ জুলাই আমরা কিয়োতো পৌঁছলাম। আমরা একবার কিয়োতো দেখেছিলাম, তবে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে। এবার ৩১ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত ওখানেই থাকতে হল। প্রাচীন রাজবাড়িগুলো দেখলাম। রুশ বিজেতা নোগীর সমাধিও দেখলাম। দু তারিখ নারা দেখা হয়ে গেল। মিউজিয়ামে মূর্তি আর চিত্রকলার সংগ্রহ খুব ভাল। দাইবুৎসু (মহাবুদ্ধ)-এর ধাতুর বিশাল প্রতিমা দর্শন করলাম। সেখান থেকে তোশো দাইজী গেলাম। এটি একটি প্রাচীন বিহার, দশজন ভিক্ষু এখানে থাকেন। স্থবির কিতাগাওয়াকির বয়স বাহাত্তর। জাপানের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিনয়-নিয়ম অনুসারী এই একটাই ভিক্ষু সম্প্রদায় আছে। এদের ৪০০ মন্দির সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। মহাস্থবির তাঁর নিজের বিনয় সম্প্রদায়েরই এক ভিক্ষু এবং সেইসঙ্গে বুদ্ধের জন্মভূমি-নিবাসীকে দেখার মতোই অপার স্নেহ প্রকাশ করলেন। ওখানে থাকার জন্য তিনি খুবই আগ্রহ দেখালেন কিন্তু আমার তো এবার জাপান ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি খুব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। বৌদ্ধ গৃহস্থরা তাঁকে খুব সম্মান করে। তিনি নিজের নানা সমস্যার কথা বলছিলেন, 'কি করা যাবে, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে ছেলেদের তৈরি করি, তারপর যৌবনের তীব্রতা আসে আর সব বিয়ে করতে চলে যায়।' বস্তুত জাপানে গৃহত্যাগী ভিক্ষু হয়ে

থাকা কঠিন, কারণ এখানে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা অবাধ। এই মন্দিরে অনেক শিল্পমণ্ডিত প্রাচীন মূর্তি আছে। জাপানে এই ধরনের বস্তুকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করে নেওয়া হয়। যদিও ঐ মূর্তি ওখানেই রাখতে দেওয়া হয় কিন্তু তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকার নিজে গ্রহণ করে। এই বিহারে এরকম রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অনেক আছে। আমরা নারা-তে কেগোন্ (অবতংসক) সম্প্রদায়ের বিহার দেখলাম, এখানে রিত্সু (বিনয়) সম্প্রদায়ের বিহার আর হাশীমোতোয় হোসসী (বিজ্ঞানবাদ) সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের দেখলাম। এই তিনটে হল জাপানের সবচেয়ে প্রাচীন সম্প্রদায়। সেদিনই আমরা কিয়োটোতে ফিরে এলাম।

পরের দিন একটি বৌদ্ধসভার তরফ থেকে জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল। তারপর ৪ আগস্ট কিয়োজু বিহারের প্রধান এবং জাপানের সুপণ্ডিত ওনিশীর সঙ্গে দেখা করলাম। জাপানের বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের মধ্যে তাঁকেই সবচেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি বলে মনে হল। তিনি অত্যন্ত বিদ্বান এবং সম্মানিত পুরুষ। তিনি বললেন, 'আপনি পড়াশুনোর জন্য পাঠিয়ে দিন—আমি পাঁচজন ভারতীয় ছাত্রের সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজি আছি।' এই বিহারটি কিয়োতের পাশেই পাহাড়ের ওপর অত্যন্ত সুন্দর জায়গায় বানানো হয়েছে।

কোয়াসান্—বেলা দেড়টার সময় আমরা ওসাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের তরুণী-স্ত্রী স্টেশনে দেখা করতে এলেন। খুব গরম পড়ছিল, তিনি পাখা দিতে চাইলেন কিন্তু জাপানে মহিলাদের পাখা পুরুষেরা ব্যবহার করতে পারে না, তাই সেটা নেওয়ার প্রয়োজন হল না। ট্যাক্সি করে আমরা পরের স্টেশনে গেলাম। এখান থেকেই সকাকিবারা বিদায় নিলেন। সকাকিবারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমি বার্লিনে পেয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে অতটা ঘনিষ্ঠতা হয়নি আর এখন গোসাইজীর চৌপাই[১] মনে পড়ছে—'বিছুরত এক প্রাণ হরি লেঁহী।' কিছুদুর পর্যন্ত সাধারণ গাড়িতে যেতে হল। তারপর পাহাড়ে চড়ার বিদ্যুৎচালিত তারের গাড়ি পাওয়া গেল। তখন আমি একদম একলা ছিলাম। তবে তিনমাস এখানে থাকার ফলে এক-দেড়শ জাপানি শব্দ তো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তাই কোনো অসুবিধে হয়নি। বিদ্যুৎচালিত গাড়ি থেকে নেমে মোটর-বাস ধরলাম। কোয়াসান্ বিহারে (মঠে) ভর্তি শহর। ফটক-রক্ষী ভদ্রলোকটি একজন পথ-প্রদর্শক দিয়েছিলেন—সে আমাকে মিজুহারা সানের কাছে পৌঁছে দিল। মিজুহারা সান্ আগেই আমার সম্বন্ধে চিঠি পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পীত চীবরধারী ভিক্ষু। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ স্নানের জন্য গরম জলের ব্যবস্থা। চারদিকে সৌন্দর্য আর পরিচ্ছন্নতার ছাপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল কোয়াসান্‌কে একেবারে হিমালয়ের টুকরো বলে মনে হচ্ছিল। যদিও এটা মাত্র তিন হাজার ফিট উঁচু, তবে জাপানে তো সমুদ্রতটে তিন ফিট বরফ জমে যায়। সারা পাহাড় উঁচু উঁচু দেবদারু গাছে ঢাকা। এখানকার সমস্ত প্রতিষ্ঠানই ভিক্ষুদের হাতে। হাইস্কুলের

---

[১] *তুলসীদাস (গোসাইজী)* রচিত চার পংক্তি বিশিষ্ট কবিতা।—স·ম·

চারশ ছাত্রের মধ্যে তিনশই ভিক্ষু। কলেজের দুশ ষাট জন ছাত্রের মধ্যে পাঁচ-সাত জন ছেড়ে বাকি সবই ভিক্ষু। পরেরদিন আমরা এখানকার মিউজিয়াম দেখলাম। চিত্র এবং মূর্তির ভাল সংগ্রহ আছে। কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ফুচীদা আর উয়েদার সঙ্গে পরিচয় হল। গ্রন্থাগারে ৭০ হাজার গ্রন্থ রয়েছে। কোয়াসান্ জাপানের মহান ধর্মাচার্য কোবো থইশীর নিবাসস্থান—এখানেই তাঁর সমাধি আছে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এই স্থান জাপানি বৌদ্ধদের কাছে প্রায় তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। আমি এখানকার কয়েক কুড়ি বিহার ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম। দাইজোইন বিহারে তিনজন মোঙ্গল ভিক্ষুকে পেলাম। যে কনৌর (বুশহর রাজ্য)-এর দেবদারু বন দেখেছে অথবা দেখেছে দেবদারু আচ্ছাদিত হিমালয়ের পর্বত-খণ্ড, কেবলমাত্র সে-ই অনুমান করতে পারবে কোয়াসানের এই অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। দু-রাতের বেশি এখানে আমি থাকতে পারলাম না বলে মিজুহারা সানের খুবই আফশোশ রইল। আমিও বুঝতে পারছিলাম যে, জাপানের জন্য সময় আমি খুব কমই দিয়েছি। বিশেষ করে তোশোদাইজী কিয়োমীজু আর কোয়াশানের জন্য দিন নয়—মাসখানেক সময় দিতে হতো। এসব জায়গায় আমার মনেই হচ্ছিল না যে আমি অন্য কোনো দেশে এসেছি।

পরের দিন সকাল সাতটার সময় আমাকে বিদায় নিতে হল। প্রোফেসর ফুচীদা স্টেশন পর্যন্ত পৌছে দিতে এলেন। তারপর ঐ রাস্তা ধরেই ওসাকা স্টেশনে পৌছলাম এবং ট্রেন ধরে কোবেতে আনন্দমোহন সহায়ের কাছে পৌছে গেলাম। আনন্দমোহন এদিক-সেদিক খবর দিয়ে রেখেছিলেন, ফলে কাগজের সংবাদদাতা আর ফোটোগ্রাফার এসে গেল।

সাত-আট আগস্ট কোবোতেই থাকতে হল। এখনও টাকা কিছুটা কমই মনে হচ্ছিল, সে-কারণে রাশিয়া যাওয়া সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। আনন্দজীর চেষ্টায় ভারত থেকে তিনশ সাতষট্টি ইয়েনের চেক পাওয়া গেল। এবার রাশিয়া যাওয়া নিশ্চিত হয়ে গেল। তবে সেই সঙ্গে মধ্য-চীন দেখারও আর সম্ভাবনা রইল না।

৯ তারিখ দশটার সময় আনন্দমোহনের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ট্রেনে চড়লাম। রাত আটটার সময় শীমোনসকী পৌছলাম। এবার আমি কোরিয়া যাচ্ছি। রাত দশটায় জাহাজে উঠলাম কিন্তু সমুদ্রে ঝড়ের আশঙ্কা থাকায় জাহাজ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো। আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলাম কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা কি বলব। বসার জন্য অত্যন্ত পরিষ্কার শীতলপাটি বিছানো ছিল, বাতাস দেবার জন্য পাইপ লাগানো ছিল। পায়খানা ছিল পরিষ্কার। মুখ ধোবার জন্য পিতলের পাত্রগুলোর গায়ে বহু কল লাগানো ছিল—আর সামনে আয়নাও লাগানো ছিল। খাবার ব্যবস্থাও ভালো। ৩০ সেন (পৌনে চার আনা) দিয়ে তরকারি, মাছ, আচার ইত্যাদির সঙ্গে এক কাঠের বাক্স ভাত পাওয়া যাচ্ছিল। ভারতে তো এই কাঠের বাক্সের দামই লেগে যাবে দু-আনা। তবে হ্যাঁ, ভিড় ছিল খুব। ঝড়ের ভয়ে সেদিন জাহাজ আর ছাড়ল না। পরের দিন ১০ আগস্টেও একই হাল হল। এদিকে জাহাজ রয়েছে থেমে আর ওদিকে যাত্রীদেরকে বয়ে বয়ে আনছিল রেল। আমাকে দু-দুবার জাহাজ ছেড়ে নিচে নামতে হল। রাত নটার সময় যখন জাহাজ

ছাড়া হল, তখন ভিড় দেখে কুম্ভমেলার কথা মনে পড়ছিল। যাইহোক, কোনোরকমে রাত দশটার সময় জাহাজ কোরিয়ার উদ্দেশে রওনা দিল।

কোরিয়ায়

নয় ঘণ্টা চলার পর আমাদের জাহাজ সীমোনসকী থেকে ফুসন (কোরিয়া) পৌঁছল। ছোট ছোট পাহাড় আর তার গায়ে যেখানে-সেখানে ছোট ছোট দেবদারু গাছ। খুসনী ১ লক্ষ ১৩ হাজার (৪১ হাজার জাপানি) লোকের বেশ ভালো একটি শহর। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য জাপানের মতোই তবে বড় গাছ এখানে কম। জাপানের রেলওয়ে আই· আর· এবং ও· টি· আর· লাইনের মাঝামাঝি, তবে এখানে যে রেললাইন সেটা চওড়ায় ই· আই· এ·-এর সমান। আমাদের ট্রেন প্রস্তুত ছিল, তাতে আসনে গদিও ছিল। আমাদের কামরায় দুজন কোরিয়ান ছাত্রও যাচ্ছিল। সোয়া তিনটের সময় কোরিয়ার রাজধানী কেয়িজোতে আমরা পৌঁছলাম। কেরিজোর জনসংখ্যা ৩ লক্ষ ১৫ হাজার। এর মধ্যে ৭৮ হাজার জাপানি আর ৪৩০০ চীনাও রয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে আমি হিগাশী বিহারে পৌঁছলাম। সেখানকার ধর্মাচার্য চিঠি পেয়েছিলেন। তিনি কোঙ্গোশান (বজ্রপর্বত) যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। তিনি আমাকেও সঙ্গে যেতে বললেন।

পরের দিন (১২ আগস্ট) ভোর পাঁচটায় আমরা সকুওজী স্টেশনে এলাম। খুব ভোরবেলা বলে গাড়ি পেলাম না তাই পায়ে হেঁটে যেতে হল। পথে একটি কোরিয়ান গ্রাম দেখলাম। পাহাড় যদিও দূরে ছিল কিন্তু এখানেও জমি সমতল ছিল না। কোরিয়ার কৃষকদের বাড়িগুলো একতলা আর ছাত খড়ের। দু পাল্লার দরজা এবং তার ওপর কাগজ সাঁটানো। আমরা একটা জাপানি হোটেলে উঠলাম। বেলা দশটায় মোটরে করে মন্দিরের দিকে চললাম—কিন্তু গাড়ি মন্দিরের প্রথম দরজা পর্যন্তই যেতে পারল। সেখানে ছিল বড় বড় দেবদারু গাছ। পাঁচ-ছটি দেবালয় আছে, যার মধ্যে ভৈষজগুরু (বুদ্ধ), শাক্যমুনি এবং অমিতাভর মূর্তি ছিল। শিল্পের দৃষ্টিতে সেগুলো কিছুই না। একটি মন্দিরে ৫০০টি অর্হত[১]-এর·পাথরের মূর্তি আছে। বলা হয়, এক অর্হত অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যায় তখন থেকে তার জায়গা খালি রয়ে গেছে। এই মূর্তিগুলোর মধ্যেও কোনো শিল্প নেই। এই মন্দিরটি চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। আমাদের দেশেও একাদশ শতাব্দী থেকে শিল্পের ওপর শনির দৃষ্টি পড়েছিল। এখানকার মঠের উপনায়ক এক তরুণ

[১] অর্হত—বুদ্ধের অনুগামী। —স·ম·

কোরিয়ান ভিক্ষু—ইনি জাপানে শিক্ষিত। শিল্প ও পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে এই বিহার একেবারে নগন্য।

স্টেশনে ফিরে এসে আমরা দুটোর ট্রেন ধরলাম, তারপর পুবের সমুদ্র পাড়ের বন্দর গন্‌সেন্‌-এ পৌছলাম। এখানেও হিগাশী হোঙ্‌গন্‌জী সম্প্রদায়ের মন্দিরে উঠলাম। জানা গেল, ব্লাডিভোস্তক (সোভিয়েত) থেকে জাহাজ ঘন ঘন এখানে আসে। সোভিয়েত সীমান্ত এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

কোঙ্গোসান্‌—পরের দিন (১৩ আগস্ট) সকালে জলখাবারের পর কোঙ্গোসানের পথে রওনা হলাম। এখন আমরা কোরিয়ার গ্রামাঞ্চলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। ধান দেখতে পেলাম না, তাছাড়া সয়া ছিল, বাজরাও ছিল, ভুট্টার খেতও ছিল। আলের ওপর ফসল বোনা হয়েছে দেখে বোঝা গেল, এখানকার লোক চাষের নুতন পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করেছে। রাস্তায় আমাদের অনেকগুলো সুড়ঙ্গ পেরোতে হলো যতই হোক, কোঙ্গোসান্‌ বারো হাজার পর্বত শিখরের দেশ। দশটা নাগাদ আমরা চুশেন স্টেশনে পৌছে গেলাম। মোটর-বাস প্রস্তুত ছিল। হোটেলের এজেন্টও উপস্থিত ছিল। ১ ঘণ্টা পর আমরা জাপানি হোটেলে পৌছে গেলাম। জাপানি ভাষাতে এই জায়গাটাকে ওসেইরী বলে। এখানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। জাপানিদের স্নানের খুব সখ—তাই তারা কি আর আমাদের মত উষ্ণ প্রস্রবণ বেকার ফেলে রেখে দেবে? এখানে জাপানিরা বেশ কয়েকটি হোটেল খুলেছে। যে সব হোটেলে সস্তায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে—সেখানে পাইপ দিয়ে চৌবাচ্চা ভর্তি করা হয়েছে। লোকে সেখানে বসে বসে স্নান করে। আমার ভয় ছিল পাছে আমাকে নগ্ন মহিলাদের সঙ্গে নগ্ন হয়ে স্নান করতে হয়। কিন্তু সে-সময় ময়দান ফাঁকা ছিল। স্নানের পর খেলাম, তারপর দু ইয়েন (দেড় টাকা) দিয়ে ট্যাক্সি করে তিন মাইল দূরের সিঙ্‌কেইজী (কোরিয়ান নাম ছিনগেনা) বিহার দেখতে গেলাম। এই বিহার চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। জায়গাটির নির্বাচনে ভিক্ষুরা একেবারে মাত করে দিয়েছেন—তিনদিকে দেবদারু আচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী, যার মধ্যে তিন-চারটি উতুঙ্গ শিখর অনিবার্যভাবে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার সবকটি বাড়িই নতুন, কেবল একটি চীনা ঢঙের পাষাণ স্তূপই পুরনো। বিহারের খরচপত্র চালানোর জন্য নিজস্ব জঙ্গল ও খেত আছে। ২০ জন ভিক্ষু এখানে আছেন, ধর্মপ্রচারে তাঁদের কোনো আগ্রহ নেই। একটি প্রাথমিক পাঠশালা আছে। এমনিতে বিহারটির অবস্থা ভালোই। নায়ক স্থবির ওখানে থাকার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেন কিন্তু আমাদের তো এখনও চার-পাঁচ মাইল সামনের দিকে যাওয়ার ছিল। দেবদারুময় হিমালয়ের কথা আমার মনে হচ্ছিল। ফিরে এসে কোরিয়ান খাবারের স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ হলো। খাবারে লঙ্কা ছিল না, আমি ভাবলাম জাপানের মত এখানেও লঙ্কা খাওয়া হয় না। পরে জানলাম যে, আমার সঙ্গী শ্রীকুরিতার ইচ্ছেতেই এই রকমটা হয়েছিল। সাঁঝের আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

পরের দিন (১৪ আগস্ট) সাড়ে সাতটার সময় মোটরে করে রওনা হলাম। আজ

কোরিয়ার একটি খুব বড় বিহার 'য়ুতেনজী' দেখার ছিল। কোতেই একটি ভালো বাজার। এখানে কোরিয়ান আর জাপানিদের দোকান আছে। সামনে পায়ে হাঁটা পথ, পথ দেখাবার জন্য একটি লোক নিযুক্ত করা হয়েছিল। সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে তিনঘণ্টা চলার পর আমরা পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছলাম, তারপর আরও সোয়া তিনঘণ্টা পর য়ুতেনজী বিহারে পৌঁছে গেলাম। এখানে একশোরও বেশি ভিক্ষু থাকে। একটি পাঠশালা আছে, সেখানে ছাত্ররা পড়াশুনা করে। এই বিহারটিও চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত কিন্তু সেই সময়কার শুধু একটি নয়তলা পাষাণ স্তূপ এখনও আছে।। চারশ বছরের পুরনো এক বিশাল ঘণ্টা আছে। গ্রন্থাগারে ৭০০ বছরের পুরনো বই আছে। জায়গাটি দেবদারু গাছে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে, তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কোনো ভারতীয় ভিক্ষুর কোরিয়াতে আসার অবসর তো সাত-আটশ বছরের মধ্যে হয়নি মনে হয়। আমি সেদিনই ফিরে আসব শুনে ভিক্ষুরা খুব আফশোশ করলেন। বস্তুত আমারও ফা-হিয়েন আর হিউ-এন-সাঙ্-এর মত হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে বেরোতে হতো, কিন্তু তাহলেও হয়ত আমি এখনও ওদিকেই ঘুরতাম। সন্ধে সাড়ে সাতটায় হোটেলে ফিরে এলাম।

এবার পরের দিন আমাদের কোরিয়ার সবচেয়ে উঁচু পর্বত বির্‌হো দেখার ছিল। আমাদের সঙ্গীদের এবার ফিরে যাবার কথা, তারা তিনজন জাপানি অফিসারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—এদের মধ্যে একজন কোরিয়ার রেলওয়ে লাইনের বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আমাদের কিছুদূর মোটরে যেতে হল। তারপর পায়ে হেঁটে ডাঁড়া পার হলাম এবং উৎরাইয়ে খানিকটা নেমে ট্যাক্সি পেলাম। ৪০ সেন (৫ আনা) দিয়ে হোতেন পর্যন্ত গেলাম। সেখান থেকে আবার হাঁটা। রাস্তায় সয়া, ভুট্টার খেত পেলাম। সর্বাঙ্গে সাদা কাপড় পরে কোরিয়ান স্ত্রী-পুরুষ তাদের কাজে ব্যস্ত ছিল। বাড়িগুলো সেই ছোট ছোট চালার। যেখানে ট্যাক্সি ছাড়লাম সেখান থেকে ছ মাইল চলার পর হোটেল পাওয়া গেল। শুরুতে চড়াই ছিল মোটামুটি রকমের কিন্তু ক্রমেই তা কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। পাহাড়গুলোর আকৃতি ছিল বিভিন্ন প্রকারেব—কোনোটা নাগের আকারে, কোনোটা ঘোড়ার মত। জলপথগুলোও নাগ, ত্রিপুণ্ড্রী ইত্যাদি আকারের ছিল। শিলাখণ্ডের ওপর জাপানি কোম্পানিগুলো মোটা মোটা অক্ষরে নিজেদের বিজ্ঞাপন খোদাই করে রেখেছে। শেষ তিন মাইলের দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর ছিল। দর্শনীয় জলপ্রপাত, বিচিত্র শিলা আর শিখর, ঘন গাছপালা—যার নিচের দিকে দেবদারু আর ওপর দিকে ভূর্জপত্র ছিল। ওসেইরী-র হোটেল থেকে খাবার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল, পথে আমরা সেখানে খেলাম। ওরা দুদিনের থাকা-খাওয়া-স্নান ইত্যাদি সমেত দাম নিয়েছিল ৮ ইয়েন (৬ টাকা)—এ খুবই কম। আমরা 'কুমে' হোটেলে উঠলাম। কুমে কোরিয়ার রেলের প্রধান অফিসার ছিলেন। তাঁরই স্মৃতিতে এই হোটেল খোলা হয়েছিল। জাপানি হোটেলগুলোর মতোই সাদামাটা এবং পরিচ্ছন্ন। বিছানাপত্র হোটেল থেকেই দেওয়া হয়। কোরিয়ার সর্বোচ্চ শিখর থেকে এটা এক মাইলের পথ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিল, তবে যাত্রীদের সুখ-সুবিধার সবরকম ব্যবস্থাই ছিল। রেডিও-ও লাগানো ছিল।

—১৯৩৫—

পরের দিন (১৬ আগস্ট) আটটার সময় আমরা 'বিরহো' (বৈরোচন) শিখরে পৌছলাম। সেদিন মেঘলা ছিল তাই দূর পর্যন্ত দেখতে পারিনি। আশেপাশের সবুজে ভরা পাহাড় শুধু দেখা যাচ্ছিল। ফেরার পথে অনেকটা নেমে পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ এক বুদ্ধমূর্তি দেখলাম। তারপর মকাইন (মহাযান) বিহারে গেলাম। এখানে ৩০ জন ভিক্ষু ছিল। বিহার নতুন কিন্তু ভালো অবস্থাতে ছিল। পথে বেশ কয়েকটি জায়গায় পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ বুদ্ধমূর্তি এবং মঠ দেখলাম। বিহারগুলোর অবস্থা ভালো ছিল, তাছাড়া জাপানি বৌদ্ধভিক্ষুরা সাহায্য দিত। একটার সময় চোঅনজী বিহারে গেলাম। এটি বড় বিহার—যার মধ্যে অনেকগুলো দেবালয় ছিল, কার্যালয়টিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। একটু বিশ্রাম নিলাম। আজকের তিন সঙ্গী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আর ভিক্ষু গোতো স্টেশন পর্যন্ত আমাকে পৌছতে এলেন। জাপানের মতো এখানেও প্রত্যেকটা জিনিস সস্তা।

কেইজো (সিওল) সাড়ে তিনটের গাড়ি পেলাম। ৫ ইয়েন ২২ সেন (প্রায় ৪ টাকা) দিয়ে কেইজোর টিকিট কাটলাম। সাড়ে তিন ঘণ্টা বৈদ্যুতিক ট্রেনে আর আড়াই-তিনঘণ্টা সাধারণ ট্রেনে চলার কেইজো শহরে পৌছলাম। বিহারের ধর্মাচার্য স্টেশনে এসেছিলেন। বাজারে এক-আধজনের সঙ্গে পরিচয় হলো—তারপর তাঁর জায়গায় পৌছে গেলাম। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে ছিল।

আমার বন্ধুরা জাপান থেকে বেশ কয়েকজন পরিচিতদের চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। চোজিয়া ডিপার্টমেন্ট স্টোর (মহাদোকান)-এর মালিক ক্যোতোব ধর্মাচার্য ওনীশীর চিঠি পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর বাড়িতে আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁর মহাদোকানে কয়েক হাজার রকমের জিনিস বিক্রি হতো এবং সেই বহুতল বাড়িতে কয়েকশ স্ত্রী-পুরুষ সর্বক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকত। ইংরেজি জানা একজন কোরিয়ান কিম মশাইকে তিনি আমার পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে দিলেন। কিম মশাই বেশ কয়েক বছর আমেরিকায় ছিলেন। তিনি ইংরেজিতে কবিতাও লিখতেন কিন্তু আমার তাতে কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি আমাকে ছোসনের (কোরিয়া) সরকারি সচিবালয় দেখালেন। কোরিয়ান এবং জাপানিদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কটা অনেকটা ভারতীয় আর ইংরেজদের মধ্যে যেমন, সেইরকম। তবে এটুকু তফাৎ নিশ্চয়ই আছে—কোরিয়ান জামাইকে জাপানিরা সমাদর করে, কিন্তু কোরিয়ানরা এটাকে সন্দেহের চোখে দেখে। ওদের ভয় হয় যে এরকম চললে মাত্র কয়েক লাখ কোরিয়ান ৬ কোটি জাপানিকে হজম করে ফেলবে। যাইহোক, এখানে আমার বন্ধু ও সাহায্যকারীরা সকলেই গণ্যমান্য জাপানি ছিলেন। অধ্যাপকেরা গ্রীষ্মের ছুটিতে বাইরে গিয়েছিলেন, তাই তাঁদের সঙ্গে দেখা করার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পুরোহিত এবং ব্যবসায়ীরা সবদিক থেকে আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল।

সচিবালয়ে আমি একজন বিশেষ পথপ্রদর্শককে পেলাম, তিনি ঘুরে ঘুরে আমাকে অফিস, ভাইসরয়ের সভাকক্ষ, মিউজিয়াম প্রভৃতি দেখালেন। মিউজিয়ামে অনেকগুলো সুন্দর-সুন্দর বুদ্ধের মূর্তি ছিল, যা দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে কোরিয়ান শিল্পের মান

একসময় অত্যন্ত উন্নত ছিল। কোরিয়ান রাজার সিংহাসন-ভবনও দেখলাম। জাপান কোরিয়ার রাজবংশকে উচ্ছেদ করেনি। তাঁকে রাজার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল, সেই সঙ্গে জাপানি সম্রাট বংশে বিয়ে-সাদি করিয়ে তাঁদের আর কোরিয়ান থাকতে দেয়নি। জাপানি সিংহাসন-দরবার কি রকম তা আমি দেখিনি, দেখবার ইচ্ছেও ছিল না। সূর্যদেবীর পুত্র হওয়ার ফলে জাপানের সম্রাট মরণশীল নন—তিনি দেবতা। দেবতার জন্য মানুষ যেসব বোকামি করে, সাদাসিধে সম্রাটভক্ত জাপানিদের সে-সবই করতে হতো। জাপান সম্রাটের রাজপ্রাসাদ হল কাবা-কাশী—সেদিকে পা করে শোওয়া উচিত নয়। সম্রাটের ছায়ার সামনেও সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করতে হবে। তার ব্যক্তিগত নাম উচ্চারণ করা চলবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও প্রজাকে এরকম নাটক করতে হতো, কোরিয়ান দরবার তো পুরনো যুগের অবশেষ। ওদের রাজা যদি দুজন অমাত্যের কাঁধে চেপে মাটিতে নামে এবং নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রজারা আলাদা আলাদা প্রস্তর ফলকের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভাইসরয়ের সভাকক্ষ খুব সাজানো ছিল। সামনেই জাপান সম্রাটের এক বিশাল ছবি টাঙানো ছিল। এখানেই কোরিয়ার রাজ-সিংহাসন পড়ে ছিল। পুরনো রাজমহলও ছিল শ্রীহীন। শহর দেখাতে দেখাতে কিম মশাই আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। সাধারণ লোকেরো ছোট ছোট ঘরে থাকে। কিম মশাই ২৭ ইয়েন (প্রায় ২০ টাকা) মাসিক ভাড়া দিতেন তাতে তিনি থাকার জন্য ঘর এবং খাবারও পেতেন।

আমার কথাবার্তায় কিম বুঝে গিয়েছিলেন যে আমি কোরিয়ার স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তিনি আমাকে কোরিয়ান খাবার খাওয়ালেন, তাতে ভাত, তরকারি, মাছ, মাংস ও আচার ছিল। এখানকার লোক রান্নায় লঙ্কা-মশলা ব্যবহার করে। খাবার ভারতীয় জিভের খুব অনুকূল মনে হলো। সোয়া আটটার সময় একটি কোরিয়ান নাটক দেখাতে নিয়ে গেলেন। নাটকে মাঞ্চুরিয়ায় চীনা সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখানো হয়েছিল। কোরিয়ান সংগীতে জাপানি সংগীতের মতই ইউরোপীয় প্রভাব আছে। বেশ কয়েকজন কোরিয়ান যুবকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। যদিও কয়েক বছরের জাপানের নিষ্ঠুর দমন নীতির জন্য ওরা নিজেদের মনের কথা খুলে বলতে পারছিল না, তবু বুঝতে পারছিলাম যে কোরিয়ান তার নিজের দেশকে স্বাধীন দেখতে চায়। জাপানি পুরুষ অবাধে ইউরোপীয়ান পোশাক পরে, কিন্তু কোরিয়ান ওরকম পোশাক পরে নিজেকে জাপানি বলতে রাজি নয়। ওরা লম্বা চোগার মতো পোশাক পরতেই গর্ব বোধ করে।

পরের দিন (১৮ আগস্ট) সারাটা দিন এখানেই থাকতে হল। বেলা চারটের সময় বৌদ্ধক্লাবে আমার সম্মানে চা-এর পার্টি দেওয়া হল। সেখানে কয়েকজন জাপানি ব্যবসায়ী এবং ধর্মাচার্য উপস্থিত ছিলেন। সবাই বৌদ্ধ হবার ফলে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা প্রকাশ করছিলেন। তাঁদের ব্যবহারে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। রাত সোয়া আটটার সময় বন্ধুরা আমাকে ট্রেন ধরাতে নিয়ে এলেন, তাঁদের ইচ্ছে ছিল আমি যেন ভারত থেকে কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে এখানে পাঠাই। ট্রেন ছাড়ল। আমি কিছু লিখতে চাইছিলাম কিন্তু গাড়ি খুব দুলছিল।

মাঞ্চুরিয়ায়

১৯ আগস্ট সকালে আমি কোরিয়ার সীমা পার হয়ে মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করলাম। সাতটায় গাড়ি আয়তুঙ্ পৌঁছোল। কাস্টম্-এর লোকজন জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখলো। গাড়ি আবার চলতে আরম্ভ করলো। বেশির ভাগই ছিল পাহাড়ী জমি তবু চারদিকে শুধু খেত আর খেত চোখে পড়ছিল। খেতে আমার পরিচিত চারা ভুট্টা, বাজরা দেখতে পেলাম। সিম এবং কলাইয়ের পাতাওলা গাছও দেখতে পেলাম। বৃষ্টি পড়ছিল। সব স্টেশনেই ট্রেঞ্চ আর জাপানি সৈনিক দেখলাম। বোঝা যাচ্ছিল জাপানিরা এখনও নিশ্চিন্ত নয়। সাধারণ লোকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল চীনা। চুল ছেঁটে লম্বা আঙরাখা পরে চীনা মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই পোশাক আমার খুবই বিশ্রী লাগল, বিশেষ করে মেয়েদের এক বিঘত ছোট করে ছাঁটা চুল—লোহার তারের মত খাড়া খাড়া দেখাচ্ছিল। ঘড়ি এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হল কারণ অনেকটা পশ্চিমে চলে এসেছিলাম। দেড়টার সময় মুক্দন পৌঁছলাম।

মুক্দন—স্টেশনে হিগাশী মন্দিরের ধর্মাচার্য এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর বিহারে গেলাম। এখানেও আমাকে জাপানি পরিবারের অতিথি হতে হল। মুক্দন শহরটি কিছুদিন পর্যন্ত রাজধানী ছিল। মাঞ্চু রাজবংশ প্রথমে এখানকারই ছিল। এখনও এখানে মাঞ্চু সম্রাটদের প্রাসাদ আছে। পুরনো সিংহাসন এবং রাজপোশাক রাখা আছে। প্রাদেশিক জাদুঘরটি (মিউজিয়াম) প্রথমে মাঞ্চু রাজপ্রাসাদ ছিল। সেখানে মোঙ্গল, শুঙ্গ এবং মাঞ্চু সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীদের ছবি রাখা আছে। মুকদন্-এ আরো কয়েকটি দর্শনীয় জায়গা দেখলাম। পুরনো শহরের চতুর্দিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই। আমার বন্ধু আমাকে বনস্‌সুই নামে এক বড় বৌদ্ধবিহারে নিয়ে গেলেন। একে মাঞ্চুরিয়ার সবচেয়ে বড় চীনা মঠ মনে করা হয়। কিন্তু জাপানি তো দূরের কথা কোবিয়ান মঠেরমতও কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। সমস্ত জিনিসপত্র অগোছাল মনে হচ্ছিল। জানা গেল এখানে একটি লামা-মন্দিরও আছে। আমরা লামা-মন্দির দেখতে গেলাম। এটা একটু দূরে, নির্জন স্থানে। লামা-মন্দিরে রাজার দেওয়া বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। এখানে ৪০, ৪৫ জন মোঙ্গল ভিক্ষু ছিলেন। মনে হচ্ছিল আমি তিব্বতের কোনো এক গুম্বায় এসে গিয়েছি। এখানে টশী লামার দু-তিনজন লোক ছিলেন। আমাকে ফর ফর করে তিব্বতী বলতে দেখে ওরা মন খুলে কথা বললেন, চা খাওয়ালেন, তিব্বতের কথা জিজ্ঞেস করলেন। এরা খুব বিষণ্ণ ছিলেন কারণ তিব্বতে ফেরার কোনো রাস্তাই তাঁদের সামনে ছিল না।

২২ আগস্ট আমি উড়োজাহাজে সিঙ্‌কিঙ্ যাওয়া স্থির করেছিলাম কিন্তু আগের দিনই আমার পায়খানা শুরু হল। পরের দিনও তাই চলল। সুতরাং উড়োজাহাজে যাবার

সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে হল। সিঙকিঙ্ মুক্‌দন্ থেকে ২০০ মাইল। রাত দশটা ২৫ মিনিটের ট্রেন ধরলাম।

সিঙকিঙ্—সকাল ছটা বেজে ৪০ মিনিটে সিঙকিঙ্ পৌঁছলাম। এখানেও হিগাশী বিহারের পুরোহিত স্টেশনে এসেছিলেন। মোটরে করে তাঁর সঙ্গে বিহারে গেলাম। বিহারটি একটি ছোট জায়গায় অবস্থিত। মাঞ্চুরিয়ার রাজধানীতে তাঁর এত ছোট একটি মন্দির থাকা জাপানের এক কোটিপতি কাউন্ট-মোহান্তের পক্ষে শোভা পায় না। কিন্তু এটা তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা হয়েছিল, এখন সুযোগমত আরো বড় একটি জায়গা নেওয়া হয়েছে—সেখানে কয়েক লাখ টাকার মন্দির তৈরি হতে যাচ্ছে। আমার শরীর ঠিক হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমি পুরোহিতের সঙ্গে শহর দেখতে বেরোলাম। প্রত্যেকটি জাপানি, তা সে ব্যবসায়ীই হোক বা পুরোহিত, অধ্যাপক হোক বা সৈনিক সবাই জাপানের গৌরবের পতাকাকে উঁচু করতে চায়। তাদের একথা মনেই আসে না যে যাদের স্বাধীনতা তারা অপহরণ করেছে তাদের মনের ভেতর কি বয়ে চলেছে। কূটনীতিকদের কথা ছেড়ে দিন, সৎ জাপানিরাও ভাবে—'নিজেদের ভেতরের দুর্বলতার জন্য যারা ইউরোপের নেকড়েদের শিকার হয়েছে তাদের যদি আমরা আমাদের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসি, তো কি অন্যায় কাজটা হল? চীনা মূর্তিশিল্প, চিত্রশিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির ও সভ্যতার আমরাও নিজেদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করি, তাই আমরা সেগুলো রক্ষা করতেই চাই। আমরা বর্ণবৈষম্য মানি না এবং সবার সঙ্গেই খোলামেলা বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। ক্রুর, লুণ্ঠনকারী জেনারেলদের শাসনকে সরিয়ে আমরা সুব্যবস্থিত শাসনব্যবস্থা কায়েম করছি, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেছি, এবং তাতে চীনা, ব্যবসায়ীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত আছি।' কিন্তু এদের এই কথা ভাবা পুরোপুরি একতরফা। এসবই জাতীয় স্বাধীনতার কাছে তুচ্ছ। অন্ধলোকেও বুঝতে পারবে যে জাপানিরা মাঞ্চুরিয়াতে শুধুমাত্র পরোপকার করতেই আসেনি। বিগত তিন বছরেই কেবলমাত্র সিঙকিঙ্ শহরেই জাপানিদের সংখ্যা ১০ হাজার থেকে ৪০ হাজার হয়ে গেছে। শহরের ভালো ভালো বাড়ি, দোকান এবং শহরের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন জায়গাগুলো ওদেরই হাতে। জাপানি সৈন্যবাহিনীর একেবারে আলাদা সরকার—এমনকি জাপানেও এবং জাপানি সেনারা যেখানে যাবে সেখানেও।

প্রথমে আমরা জাপানি সেনাদের কুয়োমিনটাঙ্ অফিসে গেলাম। প্রচারের জন্য ছাপা অনেকগুলো ইংরেজি বুলেটিন আমাদের দেওয়া হল। জাপানিরা প্রচারের গুরুত্ব বোঝে, কিন্তু তাদের সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস নিজেদের চাতুরী এবং তলোয়ারের ওপর। দ্বিতীয় দিন ২৪ আগস্ট কয়েকটি সরকারি বিভাগে গেলাম। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর এবং অন্য অফিসারদের সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা আমাকে এটাই বোঝবার চেষ্টা করলেন যে জাপান মাঞ্চুরিয়া থেকে অজ্ঞানতাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করতে চায়। মোঙ্গল বিভাগটি আলাদা ছিল। এই বিভাগটি মাঞ্চুরিয়ার মোঙ্গল এলাকাগুলোর দায়িত্বে ছিল। তবে জাপানিরা এটাকে কেবল মাঞ্চুরিয়ার মোঙ্গলদের জন্যই ব্যবহার করতে চাযনি,

বরং বাহির-মোঙ্গলিয়ার স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ও বুর্‌য়ত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ওপরও তাদের নজর ছিল। এরা আশা করত যে একদিন সমস্ত মোঙ্গলজাতি এদের পতাকার নিচে এসে দাঁড়াবে। তিন-চার বছর পরে ওরা মোঙ্গল প্রজাতন্ত্রে পা-ও রেখেছিল কিন্তু প্রচণ্ড মার খেতে হল—কয়েক হাজার লোকের মৃত্যুর পর শান্তি-চুক্তির জন্য নাকে খৎ দিতে হয়েছিল। আমি পুরনো শহরটিকে দেখলাম। সেই প্রাসাদটিও দেখলাম যেখানে মাঞ্চুরিয়ার পুতুল রাজা পূঈ থাকতেন। শহরে বেড়ানোর সময় দুটো সিন্ধিদের দোকান দেখলাম। বুলচন্দ ও দৌতরাম হায়দ্রাবাদ সিন্ধের বাসিন্দা ছিলেন। আমি যখন প্রথম শুনেছিলাম যে এখানে ভারতীয় দর্জি আছে, তখন ভেবেছিলাম সেটা কোনো দর্জিরই দোকান। কিন্তু ওখানে তো সুন্দর সাজানো-গোছানো কাপড়ের দোকান ছিল—যেমনটি আমি পোর্ট সঈদ আর কলম্বোতে দেখেছিলাম। এরা আমাকে বললেন, 'আমাদের আরো দোকান মুক্‌দন্ এবং হর্‌বিন্-এ আছে।' জাপানিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এরা হয়রান হয়েছিল, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও এরা খুব একটা আশাবাদী ছিল না।

সিঙ্‌কি নগরটিকে বিশাল বড় করে তৈরি করা হচ্ছিল। তিন বছরের মধ্যেই নগরটির জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৫২ হাজার থেকে ২ লক্ষ ১৮ হাজার হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই এই সংখ্যা ছ-সাত লক্ষ হতে যাচ্ছিল। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলওয়ে আমাকে ভ্রমণ করার জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিয়েছিল কিন্তু আমি তখন সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে তাড়াতাড়ি যেতে চাইছিলাম, সুতরাং ধন্যবাদসহ টিকিট ফিরিয়ে দিতে হল।

হর্‌বিন্—কিছুদিন আগেও সিঙ্‌কিঙ্ এর পর থেকে রেললাইনটি সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পত্তি ছিল এবং সিঙ্‌কিঙ্ ও অন্যান্য স্টেশনে অধিক সংখ্যায় রুশী কর্মচারীরা থাকত। পরে জাপানিরা এই রেলওয়ে সোভিয়েতের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল। রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটলো। ধনীরা বিপ্লবকে খতম করার উদ্দেশে কোনো চেষ্টাই বাদ রাখেনি। সারা দুনিয়ার পুঁজিপতিরা বিপ্লববিরোধীদের প্রচুর সাহায্য করল। বিপ্লবীদের বলা হল 'লাল' ও বিপ্লববিরোধীদের 'সাদা' রাশিয়ান। 'সাদা' রুশীরা কয়েক বছর লড়াই করে পরাজয় স্বীকার করলো তারপর তারা পালিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে চলে গেল। লাখ খানেকেরও বেশি 'সাদা' রুশী মাঞ্চুরিয়াতে পালিয়ে এল। সেরকম হাজার হাজার ইরানে পালালো আর লাখে লাখে পালালো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ধর্মের কথা এবং আরও কত কথা বলে বহু সাধারণ রুশীদেরও বিভ্রান্ত করা হল। ধনী রুশীরা তো অন্য দেশে গিয়ে সোনা-হীরে-মোতি ইত্যাদি বেচে দোকান দিয়ে বা অন্যভাবে রোজগার করতে সফল হল। আর তা না হলে তাদের ফ্যাশনেবল সুন্দরী মেয়েরা শরীর বেচবার রোজগার আরম্ভ করল। সাংহাইয়ে শ্বেতাঙ্গ বেশ্যাদের মধ্যে সাদা রুশীদের সংখ্যা খুব বেশি। কিন্তু এদের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে যে সাধারণ রুশীরা এসেছিল তাদের হল বিপদ। সোভিয়েত রাশিয়া হাজার হাজার মানুষকে দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু এখনো এরা হাজারে হাজারে সিঙ্‌কিঙ্-এ রয়ে গেছে। এদের ছোট্ট একটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। প্রচুর সংখ্যক সাদা রুশীরা রেলে চাপরাসী, প্যাটম্যান-এর

মতো কাজ করে পেট চালাতো। এদের গায়ের চামড়া ইংরেজ, আমেরিকান ও ফরাসিদের মতোই সাদা, কিন্তু মাঞ্চুরিয়াতে সত্যিই সাদা চামড়ার কোনো দাম ছিল না।

চারটে বাজার পর আমাদের ট্রেন সিঙ্‌কিঙ্‌ থেকে ছাড়লো। কামরাগুলো তত পরিষ্কার ছিল না। স্টেশনগুলোর নাম তখনো রুশভাষায় লেখা ছিল। আশেপাশের খেতে বাজরা আর সয়ার গাছ দাঁড়িয়ে ছিল। নীল রঙের কুর্তা-পায়জামা পরে চীনা কৃষক কোথাও কাজ করছিল, কোথাও-বা তাদের ছোট ছোট ঝুপড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সাড়ে ছটার সময় আমাদের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানেই আটকে থাকতে হল। তারপর হর্‌বিন্‌ থেকে ইঞ্জিন এল, তবে আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করলো। রাত্তির সাড়ে বারোটার সময় আমরা হর্‌বিন্‌ পৌছলাম। ঐ সময় হিগাশী মন্দিরে পৌছোতে অসুবিধে হতো কিন্তু মন্দিরের পুজারী সিঙ্‌কিঙ্‌ থেকে আমাদের সঙ্গেই এসেছিলেন সুতরাং তিনিই আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। ছোট্ট একটুখানি জায়গা আটজন যাত্রীর পক্ষে মোটেই যথেষ্ট ছিল না, পিছনের দিকে লোহা-লক্কড়, কাঠ বোঝাই করা ছিল। একটি সুন্দর মন্দির তৈরি করার জন্য জমিও সংগ্রহ করা হয়ে গিয়েছিল। মশা না থাকায় আমরা আরামেই ঘুমোলাম। এখন দুদিন হর্‌বিন্‌-এই থাকার কথা ছিল। ব্যাঙ্কও আজ (২৫ আগস্ট) রোববার বলে বন্ধ ছিল।

এখানে ঘোড়ার গাড়িওলারা বেশির ভাগই রুশী, প্রচুর পুলিম্যানও রুশী এবং বেশিরভাগ কুলিও তাই। অনেক সাদা রুশীকে ছেঁড়া আর জীর্ণ পোশাকে দেখলাম। কত জনের পায়ে জুতো ছিল না, তারা ফুটপাথে বসেছিল। একটি মৃত রুশীর শোভাযাত্রা দেখলাম। সম্ভবত কোনো সাদা রুশীদের নেতা মারা গিয়েছিল। শোভাযাত্রা বেশ বড় ছিল, শোভাযাত্রীদের মধ্যে হাজার হাজার স্বস্তিকাধারীও ছিল। হয়তো এরা হিটলারের কাছে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশা করত। সবার আগে রুশী খ্রীস্টান ভিক্ষুরা যাচ্ছিলেন, তাদের বড় বড় চু, দাড়ি ও বিচিত্র পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল যে জারতন্ত্রের রাশিয়ায় শোভাযাত্রা কেমন হতো। পরের দিন আমরা মালপত্র নিয়ে চিরোস্‌সু (গোকুরাজী অথবা সুখাবতী) বিহারে গেলাম। সম্ভবত মাঞ্চুরিয়ার আর কোনো মন্দিরে এত বৌদ্ধ ভিক্ষু নেই। এখানে ১৭৫ জন ভিক্ষু থাকতেন। এঁদের মধ্যে ৩৫ জন বিদ্যালয়ে পড়তেন। তেনদাই সম্প্রদায়ের ৭ জন জাপানি ভিক্ষুও এঁদের সঙ্গে থাকতেন। বিহারের নায়ক ভারতীয় ভিক্ষুদের উত্তমরূপে সৎকার করলেন। চীনা খাবার খাওয়ালেন। চীনারা মাংস খায়না কিন্তু এরা অনেকরকম ফলাহারী-ভোজন আবিষ্কার করেছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা বিহারটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এখানে অনেকগুলো মন্দির আর থাকার জন্য অনেকগুলো ঘর আছে। বিহারের অবস্থা বেশ ভালো। মোহান্তও আমাদের সঙ্গ নিলেন, আমরা শহরের দিকে চললাম। এক জাপানি ভিক্ষু দোভাষীর কাজ করছিলেন আর আমি নিজের এক-দেড়শ জাপানি শব্দ সম্বল করে কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম। মন্দিরটি শহরের বাইরে। রুশীদের পাড়ায় বড় বড় দোকান আর সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে। রাস্তাগুলো খুব খারাপ নয় কিন্তু চীনা পাড়াগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা জুঙ্‌গারী নদীর ধারে গেলাম। এটি গঙ্গা নদীর মতই বড় নদী। এর ওপর

দিয়ে রেলগাড়ি যাবার জন্য সেতু বাঁধা হয়েছে। নৌকো চড়ে একটু বেড়ালাম। শহরে এসে একটা ফিল্ম দেখতে গেলাম। ফিল্মটি ছিল আমেরিকান কিন্তু দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল রাশিয়ান। হর্‌বিন্ হলো রাশিয়ান ভিক্ষুক এবং দুশ্চরিত্র মহিলাদের আড্ডা। আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, কেন এরা আমেরিকার ফাঁদে পড়ে এই জীবন বেছে নিয়েছে?

পরের দিন (২৬ আগস্ট) আমি 'এশিয়া'র চেকটা ভাঙালাম। ৭৮ ডলারের কিছু বেশি পেলাম। আরো কিছু ডলার যেটা আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানির ট্রাভেলার্স চেক-এ ছিল—তা আমি আগেই ভাঙিয়ে ফেলেছিলাম। একশ ষাটটি ডলার দিয়ে মনচুলী থেকে মস্কো হয়ে বাকু পর্যন্ত টিকিট কিনে নিলাম। তখনো আমার কাছে ২১০ ডলার মজুত ছিল। বিহারের নায়ক এবং অন্য ভিক্ষুরা আমার সঙ্গে যে কতটা সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন সেটা আমার ডায়েরির এই বাক্যটি থেকে বোঝা যাবে—'এই বিহারবাসীদের সৌজন্য ছিল সীমাহীন।'

মনচুলী—পরদিন (২৭ আগস্ট) নটার পর আমাদের গাড়ি ছাড়ল। জুঙ্গারীর পুল পার হলাম। ভূমি ময়দানের মত সমতল ছিল। খেতে সবুজ ফসল খাড়া ছিল। গাঁয়ে ছিল চীনাদের বসতি। স্টেশনে রাশিয়ানদেরও দেখা যেত। রেলের অফিসাররা বেশিরভাগই জাপানি, কয়েকজন চীনা অফিসারকেও দেখলাম। রাশিয়ানদের মধ্যে অধিকাংশই পোর্টম্যান, চৌকিদার বা সেপাই অর্থাৎ এরা সেই কাজ করে যে-কাজ ইউ· পি· আর বিহারের লোকেরা বাংলাদেশে করে। আমাদের কামরায় তিনজন রুশী ছিল, এদের মধ্যে দুজন মহিলা। একজন মহিলা একটি পুরনো ছেঁড়া উপন্যাস শেষ করতে ব্যস্ত ছিলেন। ট্রেনে ও স্টেশনগুলোতে সশস্ত্র সৈনিকেরা পাহারা দিচ্ছিল, বোঝা যাচ্ছিল যে চীনা দেশপ্রেমিকরা এখনো আত্মসমর্পণ করেনি। কামরায় জায়গা ছিল প্রচুর, শোওয়ার আরাম ছিল। জাপান থেকে এই পর্যন্ত লাল লাল তরমুজ খুব পাওয়া যাচ্ছিল।

সকালে উঠে বুঝতে পারলাম যে আমাদের গাড়িও কোথাও শুয়েছিল। এখন আশেপাশে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছিল—পাহাড়ের ওপর দেবদারু আর ভূর্জপত্র দাঁড়িয়েছিল। এখানে মাঠে যে ভূর্জপত্রের গাছগুলো ছিল সেগুলো হিমালয়ে ১২ বা ১৩ হাজার ফিটের নিচে হয় না। এর অর্থ হলো এই জায়গাটি গঙ্গোত্রী ও বদ্রীনাথ-এর চেয়েও বেশি ঠাণ্ডা। এবার খেত কম দেখা যাচ্ছিল, তবে অনেক গবাদি পশু দেখতে পেলাম এবং তাদের জন্য প্রচুর ঘাসও ছিল। সোয়া সাতটার সময় আমাদের মনচুলী পৌছনোর কথা, কিন্তু গাড়ি ন-ঘণ্টা লেট ছিল। এগারোটার সময় খৈলার (হৈলার) পৌছলাম। এটা মোঙ্গল এলাকা। মোঙ্গলরা বেশিরভাগ পশুপালন থেকেই জীবিকা অর্জন করে, তাই তাদের নগর বা শহরের সঙ্গে কি সম্পর্ক? খৈলারে চীনা ও রাশিয়ানরা বেশি থাকে। মোঙ্গল ও জাপানিরাও আছে। খৈলার মাঞ্চুরিয়ার মোঙ্গল প্রদেশের চার

জেলার মধ্যে একটির সদর শহর। এখানে আমাদের এই কামরায় তিনজন মোঙ্গল যাত্রী উঠল। এদের মধ্যে একজনের তো হিন্দুদের মতো মাথায় টিকি ছিল, যা থেকে বোঝা গেল যে সে একজন গৃহস্থ। ভিক্ষুদের থেকে আলাদা করার জন্য গৃহস্থদেরকে মাথার সব চুল কাটাতে হয় না, তারা মাথায় একটা ছোট্ট টিকি রেখে দেয়। পৃথিবীর সব দেশেই হাজার হাজার বছর ধরে মাথায় লম্বা চুল রাখার রেওয়াজ ছিল, তখন ক্ষুর সংগ্রহ করাও তো সহজ ছিল না। কিন্তু যখন এই অপদার্থ নোংরা মাথার বোঝাটি সাফ করা শুরু হলো তখনও মোঙ্গলরা প্রাচীনতার (ধর্ম) পক্ষপাতিত্বের জন্য পুরো মাথা পরিষ্কার করল না, তারা টিকি রাখল। চীনাদের মাথায়ও টিকি থাকল। সোভিয়েত রাশিয়ার এক ঐতিহাসিক সিনেমায় ইউক্রেন প্রদেশের পুরুষদের মাথায় আমি এইরকম টিকি দেখেছিলাম। ভারতেও সেই টিকি, তবে সম্ভবত আর কোথাও টিকিকে এত জবরদস্ত করে ধর্ম-পতাকা হিসেবে তৈরি করার সময় পাওয়া যায় না। হিন্দুরাই সবচেয়ে মূর্খ প্রমাণিত হলো। অন্য সব জায়গার টিকি অচল হয়ে গেছে শুধু এখানে এখনও এর চল্। আমাদের সঙ্গী মোঙ্গলটি এখন ভেড়া চরায়, তাই তার কাছে যুগের হাওয়া পৌঁছোয়নি। অন্য মোঙ্গলরা তো অন্ধকার যুগের এই চিহ্নটি মুছে ফেলেছে।

আমার নজর দুজন মোঙ্গল ভিক্ষুর ওপর পড়লো। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে তিব্বতী শব্দ বেরিয়ে গেল। আমি আশা করি নি যে, মনচুলী পর্যন্ত আমার মুখখোলার দরকার হবে। ভিক্ষুটি তক্ষুণি জবাব দিল। আমি জানতাম মোঙ্গলরা তাদের ধর্মগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় পড়ে কিন্তু যে হিন্দুরা গীতা পাঠ করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যে সংস্কৃতে জবাব দেবেন এমন আশা করা যায় না। যাইহোক, আমি ওখানকার ভিক্ষুদের সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। সে যখন জানতে পারলো আমি বুদ্ধের মাতৃভূমির দেশবাসী, তখন আমার প্রতি তার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। সে বলল যে, রাস্তা থেকে একটু তফাতে অনেক মঠ আছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল এই সব মঠগুলোকেও দেখে আসি, সেখানে ভাষারও কোনো অসুবিধে ছিল না এবং ভারতীয় ভিক্ষুর সব জায়গাতেই খুব সমাদর হতো। মোঙ্গলদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানার ও শোনার সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু আমার শরীর তো রজ্জুতে বাঁধা ছিল। দুপুরের পর সমতল ময়দান কিছুটা উঁচু-নিচু দেখা গেল। ঘাস ছিল প্রচুর। ঘোড়ায় চালানো মেসিন দিয়ে রুশীরা ঘাস কাটছিল। এদিককার অধিকাংশ রুশী ঘোড়া, গরু, শুয়োর পালন করে আর এরা স্টেশনের কাছেই বসতি করে। মোঙ্গলরা রেললাইন থেকে দূরে তাঁদের তাঁবুতে থাকে।

গাছের পাতা হলুদ হতে আরম্ভ করেছিল। এটা ছিল শীতের সূচনা। ঘাসও শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। কোথাও জঙ্গল নেই। খুব অল্প জায়গাতেই জংলী বিরি-কলাই-এর গাছ দেখতে পেলাম। স্টেশনে সফেদা দেখলাম। এখানকার বাড়িগুলো ছোট ছোট আর ছাত মাটির, যেরকম হয় পশ্চিম ইউ·পি· আর পাঞ্জাবে। তবে ধোঁয়া বেরোবার জন্য প্রতি ঘরে চিমনি আছে। চারটের সময় গাড়ি মনচুলী স্টেশনে পৌঁছল। এটাই হলো মাঞ্চুরিয়ার শেষ স্টেশন—এরপরের স্টেশন সোভিয়েত দেশে। খবর পেলাম মস্কোর ট্রেন কাল পৌনে চারটার সময় ছাড়বে। জাপানিরা যেখানেই যাক না

হোটেলে না উঠে থাকতে পারে না। এতে সন্দেহ নেই যে ওদের হোটেল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সস্তার হয়। আমি তমায়া হোটেলে চলে গেলাম। একটা ঘর পেলাম। একটি জাপানি তরুণী মিষ্টি হেসে আমাকে অভিবাদন জানালো। স্নানের ভালো ব্যবস্থা ছিল। এখানে ঠাণ্ডা অত্যন্ত বেশি ছিল, আর এরপর আমাকে এক সপ্তাহ সাইবেরিয়ার শীতের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আমি এখান থেকে একটা ওভারকোট কিনে নিলাম, যেটা দেখে ভারতে আমার বন্ধুরা বলতেন, 'এর সেলাইতেই তো কুড়ি টাকার বেশি লাগবে।' আর কি-কি পোশাক কিনেছিলাম মনে নেই তবে এটা অবশ্যই মনে আছে যে, মাঞ্চুরিয়াতেই আমার ভিক্ষুর পোশাক বাক্সবন্দী হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম সোভিয়েত দেশ দর্শন

লোকে রটিয়ে রেখেছিল যে সোভিয়েত দেশে রুটি, পনির, মাংস খেতে পাওয়া যায় না। যদিও বা পাওয়া যায় তো তার অনেক দাম। আমি সারা সপ্তাহের খাবার—প্রচুর পাঁউরুটি কিনলাম, মাখন আর পনিরের দুটো বড় বড় গোল্লা নিলাম। শুয়োরের মাংসের সসেজও প্রচুর পরিমাণে বেঁধে নিলাম (নাড়ীভুঁড়ির ভেতর মাংসের টুকরো ভরে রান্না করা হয়। তাতে নুন-মশলাও মেশান থাকে। এই লম্বা লম্বা লাঠিকে সসেজ বলে)। কিন্তু পরে বুঝেছিলাম যে আমি শুধু শুধু এই জিনিসগুলো দিয়ে কামরা বোঝাই করেছিলাম। ২৯ আগস্ট বিকেল চারটেয় আমাদের গাড়ি রওনা হলো। এখন এই ট্রেনটির ৪ সেপ্টেম্বর (৭ দিনে) মস্কো পৌঁছবার কথা। ২৯ আগস্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (১৪ দিনে) আমি সোভিয়েত রাশিয়ার বাতাসে নিশ্বাস নেবার সুযোগ পেলাম। নিজেকে এজন্য ভাগ্যবান মনে হলো। ১৯১৭ সালের লাল বিদ্রোহ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের চিন্তায় বিপ্লব এনেছিল। আর আমার চিন্তাধারায় রেখেছিল স্থায়ী ছাপ। যদিও এখনো আমার আরো দশ বছর আর্যসমাজের সংস্পর্শে একটু আধটু থাকার কথা, তারপরে বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল, তবুও আমার গন্তব্য কোন দিকে তা নির্ণীত হয়ে গিয়েছিল ১৯১৭ সালের শেষ মাসগুলোতে—যখন খবর শুনে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, রাশিয়াতে রাজা আর ধনীদের প্রভুত্ব শেষ হয়ে গেছে, এখন ওখানে গরিবদের রাজত্ব। আমি শুধুমাত্র এই পুঁজিটুকু দিয়ে পরের বছর (১৯৩৮) 'বাইশবী সদী' লেখার ছকও তৈরি করে নিয়েছিলাম। যদিও এটিকে পুস্তকের আকার দিতে এখনও পাঁচ-ছয় বছর লাগার কথা। গ্রাম, শহর, স্ত্রী-পুরুষের যে স্বরূপ আমি 'বাইশবী সদী'তে চিত্রিত করেছিলাম তা ছিল কল্পনা জগতের জিনিস। কিন্তু এখানকার কঠিন জগতে তাকে সাকার করা হচ্ছিল। এতে করে সোভিয়েত দেশ যে আমার কাছে

শ্রদ্ধাস্পদ হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? মনচুলী থেকে কিছুটা এগিয়ে ফ্যাসিস্টবাদী জাপান ও সাম্যবাদী সোভিয়েতের সীমায় পৌঁছলাম। এখানে ছিল বৃক্ষহীন ঘাসে ঢাকা পাহাড়। তারপর সোভিয়েতের প্রথম স্টেশন এলো, গাড়ি থেমে গেল। কাস্টম-এর লোকে আমাদের জিনিসপত্র দেখল। আমার কাছে এমন কিছু জিনিস ছিল না। পাসপোর্ট দেখলে জানা গেল যে, আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আমি ভয় পেতে লাগলাম, আমাকে এখান থেকেই না মনচুলী ফিরে যেতে হয়। তখন আমি তাঁকে বোঝালাম, 'আমাদের নির্ভরশীল দেশের মানুষদের পক্ষে সোভিয়েত-দেশে আসার হাজার রকম বাধা থাকে, আপনাদের এটাও মনে রাখা উচিত।' একটু পরে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, চিন্তার কিছু নেই।' আমি ভবঘুরে মানুষ সেজন্য আমার রোলিফ্লেক্সটাকে (ক্যামেরা) বেঁধে মোহর আটকে দেওয়া হলো। আমাদের কম্পার্টমেন্টে চারজন লোকের মধ্যে একজন লিথুয়ানিয়ার ছিল। সে আমেরিকা থেকে আসছিল। সে কাপ, স্ফটিকের বাসন এবং আরো কী কী সব জিনিস কাগজে মুড়ে মুড়ে বাক্সে ভরে রেখেছিল। তার জিনিসপত্রের খুব বেশি তল্লাসী করা হলো। স্টেশনে লেনিন, স্ট্যালিন আর অন্যান্য নেতাদের বড় বড় ছবি টাঙানো ছিল। বাচ্চাদের বেশ হাসিখুশি ও সুস্থ-সবল মনে হচ্ছিল। মহিলারা লণ্ডন আর প্যারিসের মহিলাদের মতোই ফরসা ছিল। কিন্তু ইউরোপের ভিন্নভিন্ন শ্রেণীর মহিলাদের ভেতরে যে পার্থক্য, এখানে তাদের ভেতরে সেই পার্থক্য ছিল না। ট্রেনে চার নম্বর বগীর ওপরের ১৬ নম্বর বার্থটা আমার ছিল। কম্পার্টমেন্টের চারজন লোকের কাছেই অনেক জিনিসপত্র ছিল, আর সেগুলো চারদিক রাখা ছিল। এটাই বাঁচোয়া যে, সোভিয়েতের রেলে পুরো বার্থটাই একজন যাত্রীর ছিল। তাই শোবার কোনো অসুবিধে হয়নি।

সেদিন তো বিকেলে তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাওয়াতে আমি শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে নিচে এলাম। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম বৃক্ষের মধ্যে ভূর্জ বৃক্ষই বেশি। গ্রামের বাড়িগুলোর চেহারাতে পার্থক্য ছিল—ওগুলো বেশি ভালো ছিল। লোকজনের গায়ে জামাকাপড় ছিল মজবুত, কিন্তু তা ফ্যাশানদুরস্ত ছিল না। গাড়ির কম্পার্টমেন্টের এককোণায় পায়খানা ও হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা ছিল। তা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল, আর ভারতে তো তৃতীয় শ্রেণীর কথা দূরে থাক, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যও এরকমটা আশা করা যায় না। প্রত্যেক কামরায় দুজন করে লোক পরিষ্কার করা এবং যাত্রীদের দেখাশোনা করার কাজে নিযুক্ত ছিল। বললে ওরা চা বানিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল।

আমি হাত-মুখ ধুলাম, জলখাবার খেলাম, তারপর বারান্দায় এসে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। তিন ঘণ্টা হলো সূর্যোদয় হয়ে গেছে। এখন পাহাড়ের ওপর দেবদারুর গাছ চোখে পড়ছিল। আমাদের ট্রেন কোনো নদীর ধার দিয়ে চলছিল। এখানে ওখানে সম্মিলিত চাষাবাদ—কল্‌খোজ্-এর বড় বড় খেত ছিল যা ট্রাক্টর (মোটরচালিত হাল) দিয়ে চাষ করা হচ্ছিল। অনেক ফসল কাটা হয়ে গিয়েছিল। বাকি কাটার উপযুক্ত ছিল। বড় শহর চিতা এলো। এখানে জায়গায় জায়গায় নতুন বাড়ি তৈরি

হচ্ছিল। বাড়ির দেওয়ালগুলো অধিকাংশই কাঠের। এখানে অনেক মোঙ্গল স্ত্রী-পুরুষ দেখা গেল। তবে তাদের মধ্যে বিনুনি-বাঁধা কেউ ছিল না। মোঙ্গল তরুণীরাও রুশী মেয়েদের মতোই পোশাক পরেছিল। এদেরও চুল কাটা ছিল। গ্রামের মধ্যেও বৈদ্যুতিক আলো ও রেডিওর তার-খুঁটি দেখা যাচ্ছিল। আমি একটি গ্রামে গোলাপী গালের একটি তরুণী সুন্দরীকে বাঁকে জল ভরে নিয়ে আসতে দেখলাম, আমার প্রবাদটি মনে পড়ে গেল—'রানী ভরে পানি' কিন্তু সেই রানীদের যুগ তো পৃথিবীর এই ষষ্ঠাংশ থেকে উঠে গেছে। এখানে এখন জল ভরে আনাটা লজ্জার ব্যাপার নয়। একটি জায়গায় কম্বাইন যন্ত্রে গম ঝাড়া হচ্ছিল আর গমের দানা আলাদা হয়ে বস্তাতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের ট্রেনে ইনতুরিস্ত (সোবিয়েত যাত্রাবিভাগ)-এর একজন প্রতিনিধি যাচ্ছিলেন। তিনি খুব ইংরিজি বলছিলেন। আমার কম্পার্টমেন্ট-এর লোকেরা লেনিনগ্রাদ দেখার অনুমতি পাবার জন্য মস্কোতে তার করেছিল, আমিও করেছিলাম।

পরদিন (৩১ আগস্ট) সকালে আমাদের গাড়ি বৈকাল হ্রদের তীর দিয়ে চলছিল। খুব রমণীয় দৃশ্য ছিল। আমাদের ডানদিকে নীলাভ সরোবর ছিল, যার পাশ দিয়ে আবছা পর্বত দেখা যাচ্ছিল। বাঁদিকে তো আমরা পর্বতের সঙ্গে চলছিলামই। প্রতিটি জায়গায় আমাদের ট্রেনকে সুড়ঙ্গ দিয়ে পার হতে হচ্ছিল। পাহাড় জঙ্গলে ঢাকা ছিল। পাথর ছিল কালো রঙের (তৈলাক্ত)। এক জায়গায় স্কুল বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। তবে দোলনা আর প্যারালাল-বার সেখানে আগে থেকেই বসানো ছিল। বৈকাল স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখানে কয়েকটি বুরয়ত্ (মোঙ্গল) তরুণীকে রুশী মেয়েদের পোশাকে দেখলাম। রেলওয়ে অফিসারও একজন মহিলা ছিলেন। এগিয়ে আমরা আমাদের ডানদিকে অঙ্গারা নদীর তীব্র জলস্রোত বইতে দেখলাম। বিরাট হরকুত্স্ক শহর এলো। প্ল্যাটফর্মের দিকে স্টেশনের দালানে লেনিন, স্ট্যালিন-এর ছবি লাগানো ছিল। এখানে মহিলা-পুরুষ সবাই দেখছিলাম রাশিয়ান। আমি ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামলাম। যাত্রীদের বসার ভাল ব্যবস্থা ছিল। স্টেশন থেকে বাইরে শহরটা এক ঝলক তাকিয়ে দেখলাম। পরিষ্কার ও চওড়া রাস্তা আর কোনো কোনো বাড়ির মাথায় লাল পতাকা দেখা যাচ্ছিল। এখন ট্রেনে চড়া তিনদিন হয়ে গিয়েছিল। আমার কম্পার্টমেন্টের বাকি তিন সহযাত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার আমার ইচ্ছে ছিল না। লিথুয়ানিয়ান ভদ্রলোক বলশেভিকদের গালি দিয়েই সন্তোষ লাভ করছিলেন। চীনা যুবকটি জার্মানিতে পড়তে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে অবশ্যই একটু বেশি বন্ধুত্ব হলো। আর সে আমার সসেজ দেখে আমাকে চীনের সসেজ খেতে দিল। বস্তুত, সসেজ বানাতে চীনারাই জানে। আমার জানা ছিল না শূওরের মাংস এতখানি সুস্বাদু হতে পারে। তবে আমার সবচেয়ে বেশি খেয়াল ছিল রাশিয়ানদের সঙ্গে মেলামেশা বাড়ানোর দিকে। মিসেস মোলের্ মস্কো যাচ্ছিলেন। আর তিনি সখালেন দ্বীপ থেকে আসছিলেন। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। তাঁর বাবা ছিলেন একজন কোটিপতি ঠিকেদার। তাঁর সেই দিনগুলোর কথা মনে ছিল, সেই প্রস্তুতিও মনে ছিল, যখন তিনি রাজকুমারীর রূপে প্রচুর সাজগোজ করে প্যারিস এবং সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ করে বেড়াতেন। রুশ-ভাষার মতোই তিনি ইংরেজি এবং ফ্রেঞ্চও অনর্গল বলছিলেন।

তাঁকে ইংরেজি বলতে দেখে আমিও তাঁর কাছে বার বার যাচ্ছিলাম। তাঁরও কথা বলায় কোনো আপত্তি ছিল না। বরং প্রাণ খুলে বলশেভিকদের গালি দিচ্ছিলেন। আমি ভাবছিলাম, কোটিপতির মেয়ে পিতার সম্পত্তি ছিনতাইকারী বলশেভিকদের গালি দেবে না তো কি আশীর্বাদ করবে? তিনি বলছিলেন, 'বলশেভিকরা বড় মিথ্যেবাদী হয়। এদের খবরের কাগজে এবং বইয়ে কেবল মিথ্যে প্রোপাগাণ্ডা থাকে। আগে তো আরো মিথ্যে বলতো। কিন্তু এদিকে খাওয়াদাওয়ার জিনিস বেশি পাওয়া যাচ্ছে, লোকজনের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে, ফলে মিথ্যে বলাটাও কম হয়েছে।' এঁর বোনকে খবারোব্স্কতে কোনো ব্যাপারে সন্দেহের জন্য জেলে পুরে দিয়েছিল। এখন তাকে ছাড়ানোর চেষ্টায় তিনি মস্কো যাচ্ছিলেন। তিনি কোনো নতুন কথা বললেন না যা আমি পড়িনি। কিন্তু হায়, এই শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি দেখানোর এতটুকুও ইচ্ছা আমার মনে ছিল না। এখন আমি এই শ্রেণীর নাম জোঁক রাখিনি ঠিকই, কিন্তু তাকে সাপ অবশ্যই বলতাম।

আমার পাশের কম্পার্টমেন্টে তিনজন রাশিয়ান—দুইজন মা-ছেলে এবং একজন ইঞ্জিনিয়ার। এদের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। পরের দিকে তো কেবল শোবার জন্য আমি আমার কম্পার্টমেন্টে আসতাম, বাকি সময়টা এঁদের সঙ্গেই কাটাতাম। আমার রাশিয়ান শব্দের স্টক একশর বেশি হবে না কিন্তু কি জানি কিভাবে আমি ওই সামান্য পুঁজি দিয়ে আমার সারাদিনের কাজ চালিয়ে নিতাম। ছেলেটি এবং তার মা আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আরো বেশি উৎসুক ছিলেন। স্বামী লালসেনাদের অফিসার ছিলেন। মা-ছেলে তাঁর কাছ থেকেই ফিরছিলেন। তাঁরা খরকোফে নিজের বাড়ির ঠিকানা দিলেন, আর আমাকে সেখানে আসার জন্য খুব করে বললেন। ইঞ্জিনিয়ার মস্কোর ছিলেন। তিনিও ঠিকানা দিয়েছিলেন এবং মস্কোয় যখন তাঁর স্ত্রী দেখা করতে এলেন, তখন স্ত্রীর সঙ্গেও আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। একই আদর্শ এবং একই চিন্তা ভাষাগত বাধা সত্ত্বেও মানুষকে কত কাছের করে তোলে, এখানে তারই একটা খুব ভালো উদাহরণ। পাঁচদিন পাঁচ রাত আমরা একসাথে ছিলাম। সময় খুব আনন্দে কাটল। একদিন ভোদকার একটি বড় বোতল আনা হলো, আর আমার কাছেও পেয়ালা এলো। আমি বড় মুশকিলে পড়ে গেলাম। ধর্মের ভাবনা থেকে মদ খাওয়াকে যে আমি ঘৃণার চোখে দেখতাম, তা নয়। কিন্তু মদের প্রতি সর্বদা আমার ঘৃণা থেকে গেছে। এটা পান করাকে আমি মস্ত বোকামি মনে করি। 'নেত' (না) শব্দটার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, কিন্তু যে ভালোবেসে তাঁরা দিয়েছিলেন তাতে চট করে না করতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম, তাঁরা অন্য কিছু ভেবে না বসেন। আমি পেয়ালা ঠোঁটে ছুঁইয়েই মাথায় হাত দিয়ে বসে দেখাতে চেষ্টা করলাম যে, আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। তারপরে আমাকে আর ভোদকা দেওয়া হয়নি। ইনতুরিস্তের লোক আমাদের ট্রেনে যাচ্ছিল, তার প্রতি আমার ধারণা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। সে আমাকে দিয়ে সিগারেট কিনিয়ে নিজের জন্য চেয়ে নিল। সেই সময় বিদেশীরা যত খুশি সিগারেট নিতে পারতো, কিন্তু স্বদেশীদের জন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল। আমি এমনিতেও সিগারেটের দাম নিতাম না, কিন্তু সে দামের কথা উচ্চারণই করল না। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, এই রকম লোক

বিদেশীদের মনে বলশেভিকদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা তৈরি করবে। বলশেভিকদের নিন্দা করার জন্য তো প্রতি বছর লাখ লাখ মণ কাগজ নষ্ট করা হচ্ছে, সোভিয়েত বিরোধীদের হাতে এরকম হাতিয়ার দিয়ে দেওয়া অন্যায়। এইজন্য ওই লোকটিকে আমি সুনজরে দেখতে পারছিলাম না, যদিও সে বলেছিল, 'আমি সাদা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম।'

পয়লা সেপ্টেম্বর আমরা যে জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে অন্য গাছের নামই ছিল না। কোথাও কোথাও ভূর্জপত্রের গাছ এবং ঘাসে ঢাকা পাহাড় নিশ্চয়ই ছিল। পরে য়েনেসই নদী এলো, এটা গঙ্গার চেয়েও বড় নদী। এগিয়ে ক্রাস্তোয়ার্স্ক-এর কারখানা পড়ল। শ্রমিকদের বাড়িগুলো প্রাসাদের মতো দেখাচ্ছিল। সমস্ত বাড়িগুলো নতুন বানানো হয়েছিল। নদীতে কাঠের বড় বড় পাটাতন বইছিল। মহিলাদের দেখে স্বাস্থ্যবতী এবং চটপটে মনে হচ্ছিল। পরের অনেক গ্রামে কারখানা দেখলাম। একটি গ্রামে আট, ন-টি ট্রাক্টরের সারি দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের ট্রেনে অনেক লাল সেপাই যাচ্ছিলেন, তাঁরা সবাই মিলে কোনো গান গাইছিলেন।

পরের দিন (২ ডিসেম্বর) কয়েকটি স্থানে শৃংগারহীনা কয়েকটি মহিলাকে হেলেদুলে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলাম। গ্রামে কোথাও কোথাও সুরক্ষিত গির্জা দেখলাম। তাদের দরজাগুলোতে সাদা প্লাস্টার করা, কবরখানায় নতুন কবরগুলোতে ক্রসও (সলের) লাগানো ছিল। এতে করে বোঝা যাচ্ছিল যে, ধর্ম মানা লোকও যথেষ্ট আছে। ওম্স্ক স্টেশন এলো। বড় স্টেশন, বড় শহর। নেমে বাইরে গেলাম, সেখানে লেনিনের পাষাণমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। হ্যাঁ, জিনিসপত্রের দাম অত্যধিক মনে হলো।

৩ সেপ্টেম্বর মনচুলী ছেড়ে আসা ষষ্ঠ দিন চলছিল। সকাল থেকেই ট্রেনের দুধারে ভূর্জপত্রের জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল। এখানকার মাটি ছিল কালো, খেতগুলো ছিল বেশ লম্বা-চওড়া। অমরা পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে যত এগোতে লাগলাম খেতগুলোতে মেশিনের ব্যবহার ততই বেশি দেখতে পেলাম।

আমি পড়েছিলাম, ইওরোপ এবং এশিয়াকে ইউরাল পর্বতটি আলাদা করেছে। সেই ভেবে আমি একটি বড় পর্বতের আসার অপেক্ষা করছিলাম, এই সময় পুকুর পাড়ের মতো পাহাড়ের পিঠের ওপর দিয়ে ট্রেন পার হয়ে গেল, সঙ্গীরা বললেন, এটিই ইউরাল পর্বত। আমার মনে হলো এটিকে পাহাড় নাম দেওয়া উচিত নয়, তবে পাথরেরই তো, অন্য আর কিই-বা নাম দেওয়া যায়। এব্বার স্বের্দলোব্স্ক শহর এলো। গাড়ি এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। আমিও স্টেশনের বাইরে গেলাম। সামনে ছিল বেশ বড় এক শহর, তার সবচেয়ে বড় গীর্জার ওপরে লাল পতাকা উড়ছিল। চোখ ভরে দেখলাম, ঘুরে আসার মতো সময় তো ছিল না। স্টেশনেই পাথরের নানান রঙের ফটোর ফ্রেম, খেলনা ও অন্যান্য জিনিস বিক্রি হচ্ছিল। পরে রাত হয়ে গিয়েছিল। পরদিন (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, আবার সেই দেবদারু আর ভূর্জপত্রের ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে গ্রাম এবং পঞ্চায়েতি খেত আসছিল। এদিককার দেবদারু গাছগুলো আরো একটু বড় ছিল। কয়েকজন কৃষকের গায়ে ছেঁড়া কাপড়ও ছিল। আমার মনে

হলো, মদও এর কারণ হতে পারে, কেননা মদ খাওয়ার তো এখানে বাধা নেই।

মস্কো—মাঝরাতে মস্কো স্টেশন এল। বাকি রাতটা ট্রেনেই কাটাতে হল। পরদিন (৫ সেপ্টেম্বর) নটার সময় মেট্রোপোল হোটেলে গেলাম। পৌনে দু ডলার জলখাবারের জন্য লাগল। জানতে পারলাম, আমাদের মধ্যে কেউ লেনিনগ্রাদ দেখার অনুমতি পায়নি। খুব মন খারাপ লাগল। ব্যক্তিগতভাবে ভাবলে খারাপ লাগবারই কথা। কিন্তু মানুষ এটা তো ভাবে না যে, সোভিয়েতের বাইরের শত্রু কিভাবে ভেতরে গুপ্তচর পাঠাচ্ছে, আর কিভাবে পুরনো ধনীরা আঠার বছর আগেকার তাদের পুরনো জীবনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় আছে। মোটরে করে শহর দেখতে চললাম। ক্রেমলিন দেখলাম। সেই ক্রেমলিন যা পৃথিবীর ষষ্ঠ অংশের শাসনের কেন্দ্র। লাল ময়দান দিয়ে যেতে যেতে লেনিনের একটি ছোট্ট সমাধি দেখলাম। বিশ্ববিদ্যালয় এবং লেনিন গ্রন্থাগার দেখলাম। তারপর সাংস্কৃতিক উদ্যানে (পার্ক কুল্‌তুর) গেলাম। এখানে হাজার হাজার নব যুবক-যুবতী, বুড়ো-বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এরপর হোটেলে ফিরে এলাম। একটার সময় আমি একলাই পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তার সব জায়গাতেই ভিড় ছিল। বাস, ট্রাম আর পাতাল রেল থাকা সত্ত্বেও এত ভিড় কেন? চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল বিশাল অট্টালিকা দাঁড়িয়েছিল। কত কত নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। বড় রাস্তা ছাড়াও গোলপাথর বিছান রাস্তাও অনেক ছিল। ডাঃ শ্চেরবাৎস্কী আর ডাঃ ওল্দেন্‌বর্গ-এর সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে ছিল। ইউরোপ যাত্রার সময়ই আমি জেনেছিলাম যে ডাঃ ওল্দেন্‌বর্গ অকাদেমিতে আছেন। আমি অকাদেমির ঠিকানাটা নোট করে নিলাম—এবং ট্রামের রাস্তাও জেনে নিলাম। ট্রামে চড়েই প্রথম সমস্যা হল টাকার। আমার কাছে রাশিয়ান টাকা ছিল না, আর এরা আমেরিকান সেন্ট নিতে রাজি ছিল না। পাশের এক ভদ্রলোক পয়সা দিয়ে দিলেন। গন্তব্যস্থানের কথা বলায়, একজন তুর্কী বললো, 'আমি পৌছে দেব।' সে খুঁজে খুঁজে সেখানে আমাকে পৌছেও দিল। সেখানে গিয়ে খবর পেলাম, ডাঃ ওল্দেন্‌বার্গ মারা গেছেন। ডাঃ শ্চেরবাৎস্কী লেনিনগ্রাদে থাকেন। ভারতীয় বিদ্যার বড় বড় পণ্ডিত সেখানে থাকেন, সেইজন্য নিজের বিষয়ের কোনো পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হল না। আমি আবার হোটেলে ফিরে এলাম। চীনের তরুণ চাঙ্ বড় আশ্চর্য হল যখন সে শুনল যে, মস্কোর সমস্ত ছোট-বড় দোকান, বাস, মোটর কোনো ব্যক্তির নয়, সমস্তই রাষ্ট্রের।

রাত দশটায় আমি বাকুর গাড়ি পেলাম। বেড়াতেই এত সময় লেগে গেল যে রুশী মুদ্রাও নেবার সময় হল না। এই গাড়িতে সবাই ছিল সোভিয়েত নাগরিক, যাদের মধ্যে রাশিয়ান বেশি। এখানেও প্রত্যেক যাত্রী একটি করে বার্থ পেয়েছিল। প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে দুটি বার্থ নিচে এবং দুটি বার্থ ওপরে ছিল। সকালে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম উঁচু উঁচু সবুজ মাটি। চারদিকে বড় বড় খেত দেখা যাচ্ছিল। আমি দুএক জায়গায় পয়সা বদলানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু বদলাতে পারলাম না। এখন আমাদের ট্রেন উক্রেইন দিয়ে চলছিল। এদিককার গ্রামগুলোর বাড়ি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা

এবং দেওয়ালগুলো সাদা সাদা। যদিও ভাষার অসুবিধে ছিল তবু গাড়ির সব লোকের মধ্যে বেশ সহৃদয়তা দেখা গেল। গাড়িতে একজন প্রৌঢ়া টাইপিস্ট যাচ্ছিলেন। তিনি সকালেই রুটি-মাখন আমার ও তাঁর মাঝখানে রেখে দিলেন। আমি দু-একবার না বললাম, কিন্তু সবাই জানত যে আমার কাছে একটাও রুশী পয়সা নেই। তিনি মুচকি হেসে ইশারা করে বললেন, 'নাও নাও, আর নকশা করো না।' আমিও নিজের বোকামি বুঝলাম আর খাওয়াতে যোগ দিলাম। তারপর সেই একশ-সওয়াশো শব্দ দিয়ে কাজ চলতে থাকল। পাশের মহিলাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম তিনি একজন টাইপিস্ট। কি জানি, আমার মুখে তিনি কি ভাব দেখলেন। চট করে নিজের হাত দেখিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি উড়ো জাহাজ চালাই—এটা তার চিহ্ন। আমি বন্দুকের দ্রুত নিশানা করি—এটা তার প্রতীক। হিটলার এদিকে মুখ ঘোরালে দেখিয়ে দেবো সোভিয়েত মহিলারা কেমন হয়।' তারপর নিজের শক্ত হাতের তালু দেখিয়ে বললেন, 'আমি ট্রাক্টরও চালাতে পারি।' আমি বুঝে গেলাম, এখানে মাখনের মত হাতের তালুযুক্ত পদ্মিনীদের মান নেই।

সামনে খড়িমাটির পাহাড় পাওয়া গেল। আমাদের কামরায় ইওরোপিয়ানও ছিল, এশিয়ানও ছিল কিন্তু এখানে হাসিফুর্তি নামমাত্রও ছিল না। বড় স্টেশন এলে তরুণ-তরুণীরা হাত ধরাধরি করে প্ল্যাটফর্মে ঘুরতে থাকতো। স্টেশনে আপেল এবং অন্যান্য ফল খুব বিক্রি হচ্ছিল। অনেক জায়গায় মোটা লম্বা কাঠ বেঞ্চের মত রাখা ছিল। তার ওপর রান্না করা মুর্গি, ফল ও অন্যান্য জিনিস রেখে অনেক মহিলা দাঁড়িয়ে ছিল। আমি আর কী কিনতাম? আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেউ না কেউ সবসময় রুটি মাখন চা দিয়ে দিত। একজন শ্রমিক ককেশাস যাচ্ছিল, সে আমেরিকায় কয়েক বছর ছিল। ইংরেজি জানতো। ছেলেটি আমার খাওয়া-দাওয়ার দিকে বেশ নজর রাখত। আমি তার কাছ থেকে কুড়ি রুবল চেয়ে তিন ডলার দিতে গেলাম। সে না বলতে লাগল, তখন আমি বললাম, 'সম্ভব হলে ওটা কোথাও ভাঙ্গিয়ে দিন কিন্তু নিতে আপত্তি করবেন না।' রাতে উক্রেইনের সব থেকে বড় শহর খরকোফ্ এল। বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল-ঝলমল করছিল। পরদিন (৭ সেপ্টেম্বর) সকালেই দোনবাস পৌঁছলাম। এখানে চতুর্দিকে কয়লার খাদান। ঘরবাড়ির শেষ দেখা যাচ্ছিল না। এরপর দোন নদীর তীরবর্তী রোসতোফ শহর এল। দোন পার হলাম। অন্ধকার হতে হতে এখন আমাদের গাড়ি ককেশাস দিয়ে যাচ্ছিল। ডানদিকে বরফে ঢাকা পর্বতশিখর দেখা যাচ্ছিল। সেদিন ট্রেনের গার্ডও কিছুক্ষণ আমার কাছে বসে রইল আর আমার সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগল।

পরদিন (৮ সেপ্টেম্বর) সকালে ডানদিকে ককেশাসের পর্বতশ্রেণী দেখতে পেলাম। বাঁদিকে সূর্য উঠছিল। আমার কম্পার্টমেণ্টে একই স্টেশন থেকে একটি তুর্কী পরিবারও চড়েছিল। এরা তাশখন্দ-এর বাসিন্দা ছিল, তবে বর্তমানে তিফলিস-এর কাছে কোথাও থাকত। এদের মধ্যে কয়েকজন ছেলে এবং মহিলা ছিল। ছেলে ও মহিলাদের গলায় গুচ্ছ গুচ্ছ তাবিজ বাঁধা দেখলাম। বলশেভিকরা এই তাবিজ জোর করে ছিঁড়ে ফেলতে

চাইছিল না। তবে হ্যাঁ, দেখলাম মহিলারা তাদের তাবিজগুলোকে পাঞ্জাবীর ভেতরে রাখতে চাইছিল। এঁদের পোশাক ছিল পাঞ্জাবী-পাজামা আর ওড়না, পাঞ্জাবী মহিলাদের সঙ্গে যার বেশি সাদৃশ্য ছিল। মুসলমান-খ্রীস্টানের তো কোনো প্রশ্নই ছিল না। সবাই একসাথে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে চলেছিল। এখন গ্রামগুলোতে খালি পায়ের অনেক মহিলাদের দেখা যাচ্ছিল। ককেশাসে ঢুকেই বুঝলাম, আমি ভারতের কাছাকাছি এসে পড়েছি। পাঁউরুটির সঙ্গে সঙ্গে এবার তন্দুরী রুটিও পাওয়া যেতে লাগল। অনেকের পায়ের জুতো ভারতীয়দের মত, মহিলাদের ঘাগরা এবং কুর্তা পাঞ্জাবীদের মত এবং গরু-বলদ উত্তর ভারতের জাতের মত ছিল—ইউরোপীয় বলদের কাঁধের ওপরে পিণ্ড (কোকুদ) হয় না। এখানকার এবং ভারতীয় বলদ কোকুদযুক্ত হয়। এদিককার গ্রামে বাড়িগুলো খোলার এবং দেওয়াল সাদা রঙের ছিল। তরুণ-তরুণীরা পুরনো পোশাক ছেড়ে নতুন ধরনের পোশাক পরেছিল। তবুও রাশিয়ানদের এবং এদের মধ্যে গায়ের রঙের ফারাক ছিল। সওয়া ছটার সময় সন্ধেবেলা রাস্তার দু-ধারে দু-এক মাইলের মধ্যে পাহাড় ছিল। কোনো কোনো স্টেশনে গান গেয়ে পয়সা চাইছে এমনও দু-একজন চোখে পড়লো। এখন ইঞ্জিন কয়লার বদলে তেলে চলছিল। রাত দুটোর সময় আমরা বাকু পৌঁছলাম।

বাকু—শহরে মনে হচ্ছিল যেন দীপাবলী। স্টেশন খুব পরিষ্কার ছিল। যাত্রীনিবাসে লোকজন চেয়ারে বসেছিল। ইংরেজি জানা সঙ্গীটি আমার জিনিসপত্র এশিয়ান মহিলা স্টেশন মাস্টারের কাছে পৌঁছে আমাকে সাহায্য করার কথা বলে খুব জোরে করমর্দন করল। আমি স্টেশনের ক্লাবে গিয়ে বসে পড়লাম। মহিলা বেচারি তুর্কী এবং রাশিয়ান জানতেন। আমি আর বেশি কিই বা বলতে পারতাম? তিনি বললেন, 'সকালে ইনতুরিস্ত হোটেলে পৌঁছিয়ে দেব।' মহিলা মাঝবয়সী ছিলেন। তাঁর চুল কাটা ছিল। কিছুক্ষণ পরে আরো একটি এশিয়াবাসী পরিবার এল। মা পুরনো ঢঙের পোশাক পরে ছিল, ব্যাটা-বউ দুজনেরই ছিল নতুন পোশাক। এরা কয়েক বছর আগে পর্যন্ত কট্টর মুসলমান ছিল। সে-সময় এই তরুণী বধূটিকে সূর্যও দেখতে পেত না।

সকালে একটি লোক আর মালপত্র নিয়ে আমাকে ইনতুরিস্তের অফিসে পৌঁছে দিয়ে এল। ইনতুরিস্ত-এর অফিসে ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, রাশিয়ান ভাষা জানা অনেক মহিলা ছিলেন। এক সাতমহলা বাড়ি টুরিস্টদের হোটেল ছিল। অন্য দেশে যাচ্ছে যেসব যাত্রী, তাদের যাত্রা, থাকা, খাওয়া-দাওয়া, দর্শনীয় স্থান দেখানো ইত্যাদির ব্যবস্থা ইনতুরিস্তই করে। সোভিয়েতের বড় বড় শহরে এদের নিজেদের অফিস আর হোটেল আছে। এদের পথপ্রদর্শক, দোভাষী আর মোটর আছে। আমি ভাল একটি ঘর পেলাম। স্নানেরও সুবন্দোবস্ত ছিল। অফিসের মহিলাটি বলে দিয়েছিলেন যে ইরানের জাহাজ পরশু দুপুরের পরে পাওয়া যাবে, এইজন্য এই আড়াইটে দিন আমার পুরো কাজে লাগানোর ছিল। বেড়াতে নিয়ে যাবার মোটর একটু দেরিতে ছাড়ার কথা ছিল, সেজন্য আমি একলাই বেরিয়ে পড়লাম। বড় বড় বাড়িগুলো দেখতে দেখতে আমি সমুদ্রতট

থেকে একটি উদ্যানে গেলাম। বিপ্লবের পরে এই উদ্যানটি তৈরি হয়েছিল। রাস্তাগুলো পিচের। কিছু কিছু গোল নুড়ি বিছানো রাস্তাও ছিল। একটি জায়গায় একটি ইহুদী মন্দির (সিনোগোজ) দেখলাম ক্লাবে পরিণত হয়েছে। একটি খ্রীস্টান গীর্জাকেও অন্য কিছুতে পরিণত করা হয়েছে। একটি মসজিদ ভেঙে পড়ছিল। বাইরের জগতের কাছে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রচার করার যথেষ্ট মালমসলা ছিল, কারণ এটা তো কেউ জিজ্ঞেস করবে না যে, এই মন্দিরগুলোকে বলশেভিক ক্লাবে সরকারই পরিণত করছে নাকি ভক্তেরা এই বাড়িগুলোকে অন্যরূপ দিতে চায়। পুরো সাইবেরিয়া এবং বাকুর রাস্তায় আমি কত গির্জা সুরক্ষিত অবস্থায় দেখলাম। বলশেভিক সরকার এই কথাই বলছে যে, সরকারী কোষাগার থেকে একটি কানাকড়িও কেউ পাবে না। মসজিদ-গীর্জা যদি চালাতে হয়, তাহলে ভক্তেরা তাদের ঘাম ফেলে রোজগার করা পয়সায় চাঁদা করে চালাক। ভারত সরকার যে হিন্দু-মুসলমান করদাতাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খ্রীস্টান-চার্চগুলোর জন্য দেয়, এটাকে যে উচিত বলবে সে-ই বলশেভিকদেরকে খারাপ বলতে পারে। আমি ছোট রাস্তাগুলো দিয়ে বেনারসের মত আঁকাবাঁকা গলিওলা পুরনো মহল্লাতে গেলাম। এখনো এখানে বেনারসের মত সৌন্দর্য ছিল। তুর্কী জানতাম না, নইলে আরো কিছু জিজ্ঞাসা করা যেত।

খাওয়ার পরে একজন মহিলা দোভাষী পেলাম। গাড়িতে করে আমরা বাকু আর তার চারপাশের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখতে বেরোলাম। কিছু বাড়ির ওপর ১৯২৪ সন লেখাছিল। এগুলো ছিল আগেকার দোতলা পাকা বাড়ি, নতুন বাড়িগুলোকে ত প্রাসাদ বলতে হয়। এই প্রাসাদগুলোতে এশিয়া ইউরোপের সব জাতির মজুর একত্রে বসবাস করে। এদের মাইনে এক রকম। রঙ, ধর্ম আর জাতির ভাবনা এতটাই ঘুচে গেছে যে, পরস্পরের মধ্যে অনেক বিয়ে হচ্ছে। শহরের বাইরে একটি বিশাল বিমানবন্দর দেখা গেল। রাস্তায় কোথাও কোথাও উট এবং গাধাও মাল বইছে দেখলাম। আরো দূরে খনিজ তেলের কুয়োগুলো পাওয়া যেতে লাগলো। কখনো হয়তো কুয়ো ছিল। এখন তো সেগুলো মোটা মোটা পাইপ-কূপ হয়ে গেছে। মাটিতে পোঁতা ছিল, যার ওপর লোহার কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। পাম্পগুলো বিদ্যুতে চলছিল আর ছোট বড় পাইপ দিয়ে তেল বড় কারখানাগুলোতে চলে যাচ্ছিল। এরকম হাজার হাজার কাঠামোকে জঙ্গলের মত দেখাচ্ছিল।

প্রায় ৫ মাইল যাবার পর আমরা বড় জ্বালাদেবীর মন্দিরের দরজায় পৌঁছলাম। এখানকার লোকেরা একে অগ্নিপূজারীদের মন্দির বলে। তবে আসলে এটি হিন্দুদের বড় জ্বালামাঈ। ১৬ বছর আগে আমি এই জ্বালামাঈ-এর কথা শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। সেবার গরমের সময় নেপাল যাবার জন্য রক্সৌলে (চম্পারণ জেলা) পৌঁছেছিলাম। রক্সৌলের নদীতটে নেপাল রাজ্যের রাস্তার ওপর বৈষ্ণবদের একটি কুটির ছিল। আমি ওখানেই ছিলাম। ওখানে একটি বৈষ্ণব বৈরাগী যুবকও এসে ছিল। তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কোথা থেকে এসেছ?' সে উত্তর দিয়েছিল, 'বড় জ্বালামাঈ থেকে। বড় জ্বালামাঈ রুশদেশে, বড় জাগ্রত দেবী। তাঁর সামনে যে নৈবেদ্য

রাখা হয় মা নিজে নিজেই তা গ্রহণ করেন। সেখান থেকে মাসের পর মাস অনেক ঘুরতে-ঘুরতে হিমালয়ের কত কত পাহাড় পার হয়ে আমি এখানে পৌঁছেছি।' তাকে আমার মিথ্যুক মনে হয়েছিল। যদিও তার মুখের ওপর আমি তা বলিনি। পরে কোনো এক ইংরেজি গবেষণা পত্রিকায় বাকুর হিন্দু মন্দির এবং তার জ্বালামাঈ-এর বিবরণ পড়লাম, তখন বিশ্বাস হয়েছিল যে ওই সাধুটি ঠিক কথাই বলেছিল। এখন আমি জ্বালামাঈ-এর দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। পথপ্রদর্শিকা চৌকিদারকে ডাকলেন। গেট খোলা হল। একটি চৌকো আঙিনা যার চারদিকে পাকা কুঠরী ছিল। অনেকগুলো কুঠরীতে পাথরের ওপর লেখা খোদাই করা ছিল, যাদের সংখ্যা বারো-তেরটার কম হত না। এই লেখাগুলো অধিকাংশ দেবনাগরী অক্ষরে লেখা ছিল, দুটো গুরুমুখী ভাষায়ও ছিল। আঙিনার মধ্যিখানে ছিল একটি কুণ্ড, যার মাথায় থামের ওপরে পাকা ছাত ছিল। আজ থেকে দশ বছর আগে এই কুণ্ডে আগুন জ্বলতে থাকত। এটিই ছিল হিন্দুদের বড় জ্বালামাঈ। আশেপাশে তো সমস্ত খনিজ তেলের কুয়ো রয়েছেই, এরকম জায়গায় কোনো সংঘর্ষে আগুন জ্বলে ওঠা এবং তারপরে তার ভেতরকার গ্যাসে তা বরাবর জ্বলতে থাকা একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার। বোধহয় যখন খনিজ তেলের ব্যবহার শুরু হয়নি তখন থেকে হিন্দুদের এই বড় জ্বালামাঈ প্রকাশিত হয়েছে।

আমি যখন ওখানকার শিলালিপিগুলো চটপট পড়তে শুরু করলাম, তখন আমার অপার জ্ঞান দেখে পথ-প্রদর্শিকা খুব আশ্চর্য হলেন। তিনি বললেন, 'এখানে বড় বড় পণ্ডিত এসেছেন কিন্তু কেউ এই লেখাগুলো পড়তে পারেননি।' আমি বললাম, 'এই লেখাগুলো আমাদের দেশের যে কোনো চতুর্থ শ্রেণীতে পড়া ছেলেও গড়গড় করে পড়ে দেবে। ওই লেখাগুলোর মধ্যে একটি দেবনাগরী লেখা নিম্নরূপ—

'॥ ৬০ ॥ ওঁ শ্রী গণেশায়নমঃ ॥ শ্লোক ॥ স্বস্তিশ্রী
নরপতি বিক্রমাদিত রাজসাকে ॥ শ্রীজ্বালাজী
নিয়ত দরওয়াজা বণায়াঃ শ্রীকেচনগির
সন্ন্যাসী রামদহাবাসী কোটেশ্বর মহাদেবকা ॥...
আসোজ বদি ৮। সংবত্ ১৮৬৬ ॥'

জ্বালামাঈ-এর সমাধি দেখে তারপর আমাদের গাড়ি একটি পুরনো গ্রাম দেখানোর জন্য জিখ পৌঁছল। বাড়িগুলোকে পুরনো ঢঙের রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এখানকার বাসিন্দারা পুরনো ঢঙের মধ্যে থাকতে চাইবেই না? বাড়িগুলোতে বিদ্যুৎ এবং জলের কল লাগানো ছিল, জানালাগুলোতেও কাঁচ বসান ছিল। এরপর সমুদ্রতটে গেলাম। এখানে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে সমুদ্রে স্নানের ব্যবস্থা আছে। বাকুর পাথুরে জমিতে মিষ্টিজল দুর্লভ জিনিস, দুর্লভ তা সত্ত্বেও এখানে একটি বিশাল উদ্যান করা হয়েছে। আমরা দুপুররোদে পৌঁছেছিলাম। সেজন্য শীতল ছায়ার মূল্য ভালভাবেই বুঝেছিলাম। এখন গাছগুলো ছোট ছোট ছিল, কিন্তু দশ-পনের বছরের মধ্যে এর সঘন ছায়ার ভেতরে সূর্যের তাপ ঢুকতে পারবে না। উদ্যানে নাটক এবং সিনেমার জন্য একটি বড় রঙ্গশালা ছিল আর একটি বড় রেস্তোরাঁও। ওখান থেকে ফিরে আমি হোটেলে চলে এলাম। রাতে

আর্মেনিয়ান ভাষার ফিল্ম দেখতে গেলাম। ফিল্মে প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর ও প্রচুর দেখিয়ে ছিল। জারের শাসনকালে অফিসাররা কি রকম ন্যায়-এর নাটক করতেন, এটাই ছিল গল্পের বিষয়।

পরদিন (১০ সেপ্টেম্বর) আমি আরো কিছু স্থান দেখলাম। প্রথমে স্টালিন শ্রমিক সাংস্কৃতিক প্রাসাদে গেলাম। এটি একটি পাঁচতলা দালান ছিল। এর দুটি সভা ভবনের মধ্যে একটিতে এক হাজার, অন্যটিতে চারশো চেয়ার ছিল। নাটক, সিনেমা, ভাষণ এবং সোভিয়েত নির্বাচনের জন্য এই ভবনগুলো ব্যবহার করা হয়। এখানে একটি খনিজ তেলের মিউজিয়ম ছিল, যা থেকে খনিজ তেল বিষয়ে অনেক কথা জানা যেত। গ্রন্থাগারে পাঁচ হাজার বই ছিল। একটি ঘরে পাখা ছাড়া একটি উড়োজাহাজ রাখা ছিল, উৎসাহী শ্রমিকরা এখানে উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশের বিষয়ে শিক্ষা নিত। এরপর জনসাধারণের ভোজনালয়ে গেলাম। এটিও পাঁচতলা অট্টালিকা। ভেতরে ঢোকার আগে ওপর থেকে ডাক্তারদের মতো সাদা আলখাল্লা আমাদের পরতে দেওয়া হলো। খাবার-দাবার দেখার জন্য এখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ছিলেন। একটি রসায়নাগার ছিল, যেখানে রান্না করা ও রান্না না করা খাদ্যসামগ্রী পরীক্ষা করা হতো। ভেতরে চেয়ার টেবিলে বসে খাবার জন্য অনেকগুলো ঘর ছিল। তরকারি, মাংস সবই মেশিনে কাটা হচ্ছিল আর মেশিনেই ধোয়া হচ্ছিল। দৈনিক এখানে ত্রিশ হাজার মিল (পরোসা) তৈরি হতো। অর্থাৎ সাত হাজারের ওপর লোক রোজ জলখাবার, দুপুরের খাবার, চা-পান এবং রাতের খাবার সেখানে খেত। ছটার সময়ই জল খাবার তৈরি হয়ে যেত। রান্নাঘরে গেলাম। এখানে দু-তিন মণ একসঙ্গে রান্না করার মতো অনেক কড়াই ছিল। আঁচ একটা সরু নল দিয়ে কড়াইয়ের নিচে পাঠানো হত। প্রতিটি কড়াইতে তাপ মাপবার জন্য থার্মোমিটার লাগান ছিল। সামনের দেওয়ালে ঘড়ি টাঙানো ছিল। প্রতিটি বস্তু মেপে, ওজন করে দেওয়া হত। থার্মোমিটার, ঘড়ি বলে দিত রান্না কখন হবে। এক জায়গায় মেশিনে এঁটো বাসন ধোয়া হচ্ছিল। খাবার ঘরে যাওয়ার পর আমাদের কিছু খেতে বলা হলো। আমি কাঁচের গ্লাসে জমানো দই খেলাম, অত্যন্ত সুস্বাদু। আমার সঙ্গী ইংরেজ মহিলাটি এই সংস্থার বিষয়ে বললেন যে, এটি একেবারে নতুন জিনিস। ওখানে থেকে আমি আবার স্তালিন প্রাসাদ-স্কুলে গেলাম। এখানে ৭ থেকে ১৭ বছর বয়সের ১৮০০ বালক-বালিকা একসাথে পড়ছে। এদের মধ্যে ১৯০টি তুর্কী, ২৫০ জন তাতার, ৩২০ জন আর্মেনিয়ান এবং ১০৪০ জন রাশিয়ান ছিল। ছেলেদের থেকে মেয়েদের সংখ্যা বেশি ছিল। প্রতি মাসের ষষ্ঠ, দ্বাদশ, অষ্টাদশ ও চতুর্বিংশ দিনে এবং মাসের শেষ দিনে ছুটি থাকতো। ৭ থেকে ১২ বছর যাদের বয়স তারা প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে পড়ে। ১৩ বছর থেকে ১৭ বছরের যারা তারা ৬ ঘণ্টা করে পড়ে। স্কুলের সঙ্গেই খাবার ঘর ছিল। এখানে ছেলেমেয়েরা বিনে পয়সায় খাবার পেত। মাইনের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার সঙ্গী ইংরেজ মহিলাটি এক শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ধর্মের বিরোধিতা করতে কি করে শিক্ষা দেন?' শিক্ষকটি বললেন, 'ধর্মের বিরোধিতা কি, আমরা তো আমাদের পাঠ্য পুস্তকগুলোতে ধর্মের নামও উল্লেখ করতে দিই না। তবে

হ্যাঁ, বাড়ি থেকে শুনে শুনে এসে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।'

এরপর আমরা বাগীরোফ শিশুশালায় গেলাম। এখানে ৪ থেকে ৬ বছরের দেড়শো শিশু পড়াশুনো করে। এদের মুখ ধোওয়ার জন্য দেওয়ালের গায়ে নিচু নিচু কল লাগান রয়েছে। পাশে ঝুলিয়ে রাখার খোঁটা রয়েছে। তোয়ালে সাবান রাখবারও জায়গা আছে। খাবার ঘরে ছোট ছোট টেবিল, ছোট ছোট চেয়ার, এদের কাপ ডিসগুলোও ছোট ছোট। দেড়শোরও বেশি রকমের খেলনা রয়েছে। বাচ্চাদের এখন অক্ষর পরিচয় করানো হয় না, তাদের রুমালে এবং নিজের নিজের আলমারির গায়ে কুকুর, বেড়াল, বাঁদর ইত্যাদির ছবি আঁকা রয়েছে। এই ছবিগুলো এক-একটি শিশুর আলাদা আলাদা, আর এগুলোকে তারা নিজের নিজের কাজের জিনিস বলে চিনে নিতে পারে। মায়েরা নিজের নিজের বাচ্চাকে সকাল ৮টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত এখানে রেখে যান। শিশুশালার পক্ষ থেকেই ওদের দুবার খাবার দেওয়া হয়। নার্স আমাদেরকে বাচ্চাদের আঁকা ছবি দেখালেন। বাচ্চারা ছবি আঁকতে ভালোবাসে। ওদের খেলার জন্য কাগজ ও রঙবেরঙের পেনসিল দেওয়া হয়। ওরা খেলার জন্যে ছবি আঁকে। কিন্তু কাগজের এক-একটি টুকরো ফাইলে রেখে দেওয়া হয়। যারা ছবি আঁকায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেয়, তাদেরকে ছ বছর বয়সের মধ্যে ধরে ফেলা হয় এবং লেখাপড়ার জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সংগীত, অভিনয়, গণিত ইত্যাদি বিষয়েও অসাধারণ প্রতিভাশালী শিশুদের এভাবে আলাদা করে সুশিক্ষিত করে তোলা হয়। আমরা দুটোর সময় পৌঁছেছিলাম। সে-সময় শিশুরা তক্তপোষে শুয়ে ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কথাবার্তাও বলছিল। আমরা পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ঘরগুলো পেরিয়ে গেলাম। বাকুতে এরকম শত খানেকের চেয়েও বেশি শিশুশিক্ষায়তন রয়েছে।

পরদিন (১১ সেপ্টেম্বর) আবার আমি একলাই শহরে বেরোলাম আর রাস্তায় রাস্তায় অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম। ওখানে ছোটখাট সোডাওয়াটারের দোকান থেকে শুরু করে বিশাল বিশাল দোকান অব্দি সবই রাষ্ট্রের, এটা আমি জানতাম। একটি মাঝারি ধরনের দোকানে গিয়ে আমি একটি চামড়ার মানিব্যাগ পছন্দ করলাম। সেটির ওপরে ৮ রুবল ১০ কোপেক দাম লেখা ছিল। আমি তারপর ক্যাশিয়ারের কাছে। গেলাম তাঁকে দাম দিলাম। তিনি দুটি বিল দিলেন। তার মধ্যে একটি যিনি বিক্রি করছিলেন তার হাতে দিয়ে মানিব্যাগ নিয়ে চলে এলাম। বাকুতে দুদিন পাঁচ ঘণ্টা করে ঘোরার জন্য ১৪ ডলার লাগল। জাহাজের সেকেণ্ড ক্লাশের জন্য ১৯ ডলার, বাকি খাওয়া-থাকা ইত্যাদির জন্য ৯ ডলার—সব মিলিয়ে ২৩ ডলার বা ৭০ টাকা খরচ হলো।

ইরান কন্‌সল্ থেকে আমার ভিসা নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। আড়াইটের সময় বন্দরে পৌঁছলাম। কাস্টম-এর অফিসার একজন এশিয়ার লোক ছিলেন। তিনি ফারসী জানতেন। তিনি মোটামুটিভাবে সব দেখে নিলেন। টাকা-পয়সা গুনে নিলেন। তারপর আমি জাহাজে পৌঁছলাম। জাহাজটির নাম ছিল 'ফোমিন'। এটা ছিল একটা হালকা জাহাজ। আমার কেবিনে তিনটি বার্থ ছিল। তবে আমি সেখানে একাই ছিলাম। জাহাজে

উঠে বাকুর দুখানা ছবি তুললাম। সমুদ্রের তীরে বাকুকে ধনুকাকার মনে হয়।

যাত্রীদের মধ্যে কিছু ইউরোপিয়ান আর দু-চার জন ইরানী ছিলেন। রেডিওতে আজারবাইজানের (বাকুর) গান হচ্ছিল। ওপরের ডেকে গেলাম। সেখানে একজন মাঝবয়সী ইরানীর সঙ্গে দেখা হল। সে সোভিয়েত সরকারকে শাপ দিচ্ছিল, 'আমি ১২ বছর গঞ্জাতে রইলাম, বউ-ছেলে-মেয়ে সব এখানে। যখন শরীরে শক্তি ছিল রোজগার করেছি। এখন হাড়গোড় বেঁচে আছে, এখন বলে দিল তুমি চলে যাও নিজের দেশে।' ভদ্রলোক একতরফা বলে গেলেন। একথা বললেন না যে তিনি কতবার সাম্যবাদী নিয়ম অবহেলা করেছেন। মদ খেয়ে কতবার বউ-ছেলে-মেয়েদের মারধোর করেছেন। যাই হোক, আমি খুশি হলাম যে আর আমাকে কেবল দেড়শ শব্দের ভরসায় থেকে ভাষার গলা টিপতে হবে না। এখন আমি ফারসী ভাষাভাষীদের কাছে চলেছি। কাস্পিয়ান সাগরের শান্ত জলের ওপর দিয়ে 'ফোমিন' ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিল—আর আমি মনে মনে গত ১৪ দিনে দেখা দৃশ্যাবলীর মানসিক আবৃত্তি করে যাচ্ছিলাম।

ইরানে প্রথমবার

১২ সেপ্টেম্বর সকাল আটটা নাগাদ, দূরে একদিকে একটি আবছা তটভূমি দেখা যেতে লাগল। জাহাজ দশটার সময় একটি অপরিসর ঝিল দিয়ে কিনারে পৌঁছল। এই ঝিলটির একদিকে কজিয়ান আর অন্য দিকে পহলবী ছিল। পহলবীর জনসংখ্যা ১৪ হাজার, যার মধ্যে রাশিয়ানের সংখ্যা যথেষ্ট। এই বন্দর এবং নগরীটির গোড়াপত্তন করেন জার শাসকরা। এখানকার বাড়িগুলোর গড়ন রাশিয়ানদের মতো, রাস্তাগুলো চওড়া। পাসপোর্ট এবং কাস্টম-এর জন্য কোনোরকম অসুবিধে হয়নি। এরপর আমাদের তেহরান যাবার কথা। ১৫ তুমান (১৫০ রিয়াল)) দিয়ে একটি মোটরে জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল। অন্য এক মোটরওলা ১০ তুমানেই নিয়ে যাবে বলল, কিন্তু প্রথম মোটরটা চলে যেতেই সে দোনামোনা শুরু করল। অবশেষে আমরা ১৩ তুমান দিতে রাজি হলাম। এই মোটরে চেকোস্লোভাকিয়ারও এক দম্পতি যাচ্ছিল। পহলবীতে আঙুর মনে হলো সবচেয়ে সস্তা জিনিস। একটার সময় আমাদের মোটর ছাড়লো। ৩৯ কিলোমিটার (২৬ মাইল) এগুনোর পর রেশ্‌ত শহর দেখা গেল। এদিকটায় বসতি খুব ঘন। প্রধান সড়কটি বেশ চওড়া। অনেক বাড়ির ছাদ লাল টালি খাপরার, যেমনটি পূর্ব ইউ· পি-তে দেখা যায়। গ্রামগুলোতে ধানের খেত, খড় আর টালির ছাতগুলো দেখতে দেখতে আমার ভারতের কথা মনে পড়তে লাগল। গিলানের এই এলাকাটাকে ইরানীরাও ছোট হিন্দুস্থান (হিন্দ-কোচক) বলে। সামনে ছোট ছোট বৃক্ষের ঘন জঙ্গল দূর পর্যন্ত চলে গেছে। আমার

মনে হল এবার সমস্ত গাছ ভারতবর্ষের গাছের মতো হবে। ১২০ কিলোমিটার (৮০ মাইল) পরে মন্‌জিল নামে একটা জায়গা এল। এখানে প্রচুর হাওয়া বইছিল। জানা গেল গরমের দিনে এই পাহাড়ী উপত্যকায় সব সময় জোর হাওয়া বইতে থাকে। আমাদের রাস্তা সফেদরুদ (শ্বেত রোদম্) নদীর পুল দিয়ে পার হয়েছিল। এই রাস্তায় অনেক লরি চলছিল। চেকোস্লোভাকিয়ার ভদ্রলোক অনেকদিন ধরে ইরানে বাস করে আসছেন। ফরাসী খুব ভাল বলতেন। তেহ্‌রানে তো আমার পরিচিত কেউ ছিল না। সুতরাং রাতে অন্য জায়গার খোঁজ করার চেয়ে তিনি যে হোটেলে উঠবেন, সেই হোটেলে থাকাই শ্রেয় মনে হল। নটার সময় আমরা কুহিন্ (১৯৪ কিলোমিতর) পৌঁছলাম। এখানে অনেক ভোজনালয় ছিল। তিনজনে মিলে পেটভরে তন্দুরী রুটি আর মুরগীর মাংস খেলাম। সঙ্গীটি জানালো যে, ঠাণ্ডার সময় রাস্তা এখানে কখনো কখনো বরফে আটকে ঢেকে যায়। এগারটার পর আমরা কজবীন (২৩২ কিলোমিতর) পৌঁছলাম। কোনো একমসয় এটি ইরানের রাজধানী ছিল। চওড়া সড়ক, বিশাল তোরণ আর বৈদ্যুতিক আলো। আগেও অনেক জায়গাতে আমাদেরকে পাসপোর্ট দেখাতে হয়েছিল। এখানেও দেখাতে হলো। একটার সময় গারাজে (৩৩৭ কিলোমিতর) পৌঁছলাম। রাস্তা খুব ভালো। রাতে পূর্ণিমার মতো চাঁদের আলো রাস্তায় ছড়াচ্ছিল। রাত দুটোতে তেহ্‌রান (পহলবী থেকে ৩৭৭ কিলোমিতর বা ১৫০ মাইল) পৌঁছে গেলাম। কস্র (প্রাসাদ হোটেল) অতিথিশালায় উঠলাম।

তেহ্‌রানে—নটায় মুখ হাত ধুয়ে বাইরে বেরোলাম। রাস্তাগুলো বেশ চওড়া, বাঁধানো আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। বাড়িও খুব ভালো ভালো ছিল। সরকারি দপ্তর, আর ইরান রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের বিল্ডিং ছিল বিশাল ও সুন্দর। একটি হোস্টেলে ২ রিয়াল (পাঁচ আনা) দিয়ে মাংস-রুটি খেলাম। সস্তার ব্যাপারে ইরান তো জাপানকেও হার মানিয়ে দিচ্ছিল। হ্যাঁ, এঁটো-কাঁটার বালাই এখানে নেই। কাঁচের একটা বড় গেলাসে বরফ দিয়ে একজন লোককে জল খাওয়ায়, আবার সেই বরফের টুকরোর সঙ্গে অন্য জল মিশিয়ে অন্য একজনকে খাইয়ে দেয়। লোকজনের পোশাক-পরিচ্ছদ পুরো ইউরোপিয়ান। রজাশাহ পহলবী ইরানের সমস্ত পুরাতন ঐতিহ্যকে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে এটাকে জরুরি মনে করছেন। মহিলারাও ইউরোপিয়ান পোশাক পরে, তবে ওপর থেকে একটা কালো পর্দা নিয়ে নেয়, কিন্তু মুখটা পুরোটাই খোলা থাকে। বেড়াতে বেড়াতে এক আরমেনিয়ন বাস ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। ইরান সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বললেন। তিনি বাড়িয়েই বললেন, এখানে পর্দার আড়ালে গভীর ব্যাভিচার চলে। খুব কম মহিলাই নিজের স্বামীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে বা কেবল পয়সার জন্য অন্য পুরুষের কাছে যায় না। সরকার এই ব্যাভিচার বন্ধ করার জন্যেও পর্দা প্রথা তুলে দেওয়াটা প্রয়োজন মনে করেছেন।

আজ শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) ছুটির দিন। ইরানীরা ছুটির দিনটা ধর্মের জন্য নয়, আমোদ-আহ্লাদের জন্য কাজে লাগায়। লোকজন তেহ্‌রানের ১৫ কিলোমিটার (১০

মাইল) দূরে শমিরানে বাসে করে যাচ্ছিল। এই জায়গাটা তেহরানের উত্তরে ইরানের সর্বোচ্চ তথা সুন্দরতম পর্বতশিখর অলবুর্জ-এর পাদদেশে। শমিরান তেহরান থেকে ৮০০ মিটার উঁচু এবং ভীষণ ঠাণ্ডা জায়গা। আমিও বাসে করে শমিরান গেলাম। রাস্তা ভারি সুন্দর, রাস্তায় অনেক বাগান। আর শমিরানে তো আরো বেশি। রাস্তাতে কেল্লার মতো একটি পুরনো জেল, ফৌজি ছাউনি আর রেডিও স্টেশন চোখে পড়ল। সব দেখে আমি রাত্তিরে আবার হোটেলে ফিরে এলাম। পরের দিন আবার বেরোলাম। পহলবী প্রাসাদ অস্ত্রাগার, মজলিস (পার্লামেন্ট ভবন) ইত্যাদি বিল্ডিং দেখলাম। খয়াবান চিরাগ-বক (বিজলীবাতি-সড়ক)-তে কয়েকটি ভাবতীয় দোকান দেখলাম। সর্দার রণবীর সিংহের সঙ্গে আলাপ হলো, আর আমি তাঁর পাশের অহবাজ হোটেলে চলে এলাম। আগের হোটেলটিতে একদিনের জন্য যেখানে চোদ্দ-পনের রিয়াল ভাড়া ছিল, সেখানে এই হোটেলে দৈনিক চার রিয়াল (১০ আনা) হিসেবে একটি ঘর পাওয়া গেল।

ইস্পাহানের দিকে—ইরানে এখন আরো কিছুদিন আমি থাকতে পারতাম, তাই কয়েকটা শহর দেখবো ঠিক করেছিলাম। রজাশাহ-পহলবী যখন থেকে ইরানের শাসক হয়েছেন, তখন থেকে তিনি দেশের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছেন। শিক্ষাও বেড়েছে, ব্যবসাতেও ইরানীরা এগিয়ে এসেছে। চুরি-ডাকাতিও দেশ থেকে চলে গেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, ইরানীরা নিজেদেরকে চিনেছে। পুরনো সংস্কারগুলোকে উৎপাটিত করে এরা উন্নতিব জন্য মজবুত ভিত গড়েছে। ভাল কাজে বাধাও থাকে, সে-কথা আমি প্রসঙ্গত এখানে-ওখানে জানাবো। সাধারণ মানুষের জীবনে বহু অনাবশ্যক বিধিনিষেধ এসেছে, যার একটির জন্য ইরানে যাত্রা করা ঝামেলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের মানুষদেরও এখানে নিজের ফটোর সঙ্গে একটি প্রমাণ-পত্র (জাওয়াজ) নিতে হয়। এতে সন্দেহ নেই যে, সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকারী লোকদের পথে এটা বাধা দেয়, কিন্তু গ্রাম ও শহরের প্রতিটি যাত্রীর এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়ার জন্য প্রমাণ-পত্র নেওয় আর সেটা শহরে শহরে দেখানো বড় ঝামেলার ব্যাপার। বিশেষ করে সেই সব অফিসারদের মধ্যে, যাদের কুঁড়েমি, বেপরোয়া ভাব আর ঘুষ-টুষের স্বভাব রয়েছে। বিদেশীদের কাছে তো পাসপোর্ট থাকেই, তাদের জাওয়াজ-এর জন্য অসহায় করে তোলা মানে অবশ্যই হয়রান করা আর জাওয়াজ দেবার অফিসার তো আরো বিরক্ত করেন। লোকে পাসপোর্ট ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে, আর তিনি রেজিস্টার মেলাতে থাকেন। যাই হোক, কোনোরকমে আমি জাওয়াজ নিয়ে ২৬ রিয়াল (৪ টাকা ১ আনা) দিয়ে ইস্পাহান যাওয়ার বাসের টিকিট নিলাম। এদিকের হোটেলগুলোতে বিছানা-চাদর পাওয়াই যায়, তাই আমি আমার মালপত্র সর্দার রণবীর সিংহের কাছে রেখে এসেছিলাম। আমার কাছে ছিল একটি ফোলিও ব্যাগ, তাতে ক্যামেরা ভরা। রাত আটটায় বাস ছাড়ল। বাসে যাত্রীদের সংখ্যা লেখা থাকে, কিন্তু কেউ তার পরোয়া করে না। ঠেসেঠেসে লোক ভরে দেওয়া হয়। পুলিশের লোক কাগজে লেখালেখির জন্যে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত বাস থামিয়ে রাখলো। আবার শহর থেকে কয়েক মাইল পথ যেতেই

এক জায়গাতে কাগজপত্র দেখার জন্য দাঁড় করানো হলো। আমাদের বাসে তিনজন যাত্রী বিনা জাওয়াজ-এর ছিল। জায়গাটা তো জানাই ছিল, তাই তারা আগেই নেমে হাঁটতে শুরু করে। এরা পরে আবার বাস ধরে নেয়। রাত দুটোয় আমরা কুম্ পৌঁছলাম। ২ রিয়াল (৫ আনা) দিয়ে যাত্রীনিবাসে শোবার জন্য খাট, বিছানাপত্র সব পাওয়া গেল। কুম্ তেহরান থেকে ১৪৯ কিলোমিতর আর সমুদ্রতল থেকে ৩২০০ ফিট ওপরে, লোকসংখ্যা ৩০ হাজার। এখানে ইমারজার বোন ফাতমার সোনার ছাদযুক্ত একটি দরগা আছে। তাই কুম্ও ছোটখাটো একটা তীর্থ। লোকে বলাছিল যে, দরগার সামনে আগে কয়েক লাখ কবর ছিল। এখন সেগুলোর কোনো চিহ্ন নেই। এখন তার জায়গায় একটি সর্বজনীন বাগান (বাগে-মিল্লী—জাতীয় উদ্যান) আর মাঠ। আমি বললাম, 'সাবাস রজা শাহ!' এখানকার ঘরগুলোর ছাদ মাটির, তাকে মজবুত করার জন্য খড় মেশানো মাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইরানে বৃষ্টি কম হয়, তাই লোকে জলের মূল্য বোঝে। প্রত্যেকটি বাড়ির নীচে চৌবাচ্চা থাকে, যাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়! এই জল হাত-পা ধোয়া ও স্নানের কাজে লাগে। এক লোকের এঁটো বরফ দিয়ে প্রচুর লোক এখানেও ঠাণ্ডা জল খাচ্ছিল। এর থেকে বাঁচার জন্য আমি খরবুজা (সরদা) আর তরমুজ নেওয়া স্থির করলাম। কুম্-এর বাজারের গলিগুলোও ছাদ দিয়ে ঢাকা। ছাদ খিলানযুক্ত। যে হোটেলটিতে আমি ছিলাম তাতে লেখা ছিল, 'মুসাফিরখানা-ইকতিসাদ, বাকমাল এহ্তরাম্ অজ আকায়ান মুসাফিরীন্ পজীরাই মীশবদ্'। এরকম অন্য মুসাফিরখানাতেও লেখা ছিল। এখানে মেহমানখানা ভালো বড় হোটেলকে বলা হয়, আর মুসাফিরখানা বলে ছোট হোটেলকে। বিকেল তিনটেয় আবার আমাদের বাস ছাড়লো। শহর থেকে বেরোতেই পাসপোর্ট দেখা হলো। দেখতে এই প্রদেশটি তিব্বতের মতো মনে হচ্ছিল। ওই রকমই ছোট ছোট ন্যাড়া পাহাড়, ওই রকমই উপত্যকাগুলো, গাছপালার নাম নেই। হ্যাঁ, তিব্বতে প্রচুর নদী বইতে দেখ যায়, এখানে তাও নেই। কিন্তু মাটির থেকে সহজেই জল বেরিয়ে আসে। এই জলকে কোথাও কোথাও মাটির তলায় নালা কেটে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। এই নালাগুলো বানানোর জন্য কিছু দূরে দূরে কুঁয়ো খোঁড়া হয় আর একটি কুয়োর সঙ্গে অন্যটিকে ভেতরে ভেতরে খাল কেটে জুড়ে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও নালা খোলা মুখের হয়, যেমনটা এখানে কুম্-এ আমি দেখলাম। ইরানের মাটির এমনই গুণ যে, এখানে যা ফলই লাগান হয় তাই অমৃত হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, আম, লিচুর মতো গরমের দেশের ফল এখানে হয় না। যদি জলের ব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে সারা ইরান মেওয়ার বাগানে পরিণত হতে পারে। ইরানে এখন ডাকাতির ভয় নেই, তাই সারারাত বাস চলাচল করে। পর্যটকদের কাছে আপদ এমন যাত্রীও থাকে, কেননা তারা নিজের সিটে বসে ঢুলতে থাকে। রাত দুটো বা তিনটের সময় কোনো গ্রামে বাস দাঁড়াল, আর আমি একটি মুসাফিরখানায় (হোটেলে) শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে ইস্পাহান পৌঁছলাম। ইস্পাহান অনেকদিন পর্যন্ত ইরানের রাজধানী ছিল ' এর রাস্তাগুলোও চওড়া আর ভালো অবস্থায় রয়েছে। রাস্তার পাশ দিয়ে খাল বয়ে

চলে, যা থেকে জল ছিটানোর কাজ চলতে থাকে। রাস্তা বের করার ব্যাপারে সরকার বাড়ি, কবর, মসজিদের তোয়াক্কা করেনি। যা সামনে পড়েছে তাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। শহর ঘোরার জন্য তিন তুমান = ৩০ রিয়াল (৪ টাকা ১১ আনা) দিয়ে একটি ফিটন(দুরুশকা)ভাড়ায় নিলাম।গাড়ির চালক অসগর ছ ফুটের একজন গাট্টাগোট্টা যুবক ছিল। তার বাদামী চুলের সঙ্গে নীল চোখ দুটোতে রুক্ষতা, কঠোরতার ছাপ ছিল না। চহলসুতুন (চত্বারিংশত্ স্থান) দেখতে গেলাম। এই গ্রীষ্মাবাস-গৃহটিতে আছে কুড়িটিই মাত্র থাম, কিন্তু সামনের জলকুণ্ডে এই কুড়িটি থামের ছায়া পড়ে, তাই জন্যে এটিকে চল্লিশ থাম বলে। মৈদানশাহ-তে গেলাম। এখানে একটি সুন্দর পুকুর আর বাগান রয়েছে। পুরো ময়দানকে ঘিরে বাড়ি বানানো হয়েছে। আর খালি জায়গাটিতে নতুন বাড়ি দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে। হারুন-বলায়ত-এর কবরকে খুব মান্য করা হয়। স্যার আগাখুন-এর কবরও তাই। এখানে ভক্তদের বড় ভিড় দেখা গেল। ইমামজাদা ইস্মাইলের কবরের সামনে একটি যুবক নিজের হ্যাটটি খুলে মাথা নিচু করছিল। জানা গেল, হ্যাটকোটে ইসলামের কোনো বিপদ নেই। তাহলে মোল্লারা হায়, হায় বলে চেঁচায় কেন? পুরনো ইস্পাহানের যদি কিছু জিনিস এখানে বেঁচে-টেঁচে আছে, তবে তাও আমার দেখার ইচ্ছে হলো, কারণ ইসলামের আসার আগেও ইস্পাহান ইরানের একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল। শহরের বাইরে কুহ (কোহ) আতিশগাহ হলো সেই পর্বতটি যার ওপরে কখনো পুরাতন পার্শীদের অগ্নিমন্দির ছিল। কথিত আছে, হাজার বছর ধরে ওখানে নাকি আগুন জ্বলে আসছিল, ইসলাম এসে যাকে নেভায়। এখন অগ্নিমন্দিরের কয়েকটি দেওয়াল মাত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দুপুর হতে চলল। আমি অসগরকে বললাম, 'ভাই! কোনো সুন্দর বাগান আর খালের ধারে চলো, ওখানেই খাবার খাওয়া যাবে।' ও আমাকে শহরের নিকটবর্তী গ্রামে নিয়ে গেল। চার-পাঁচ হাত চওড়া আর তিন হাত গভীর নীলজল খাল দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, ধারে ছায়াঘন গাছ। খরবুজের চেয়েও সস্তায় মিষ্টি কুমড়ো বিক্রি হচ্ছিল। আঙুরও সস্তা ছিল। আমি যথেষ্ট আঙুর আর কুমড়ো কিনে নিলাম। ওখানে কোনো ঘরে অসগর চায়েরও ব্যবস্থা করে ফেলল। যখন আমি খালের ধারে বসে খাবার খাচ্ছিলাম, সেই সময় ছোটবেলায় পড়া 'হাতেমতাই-এর গল্প'-এর কোনো দৃশ্য—দেবতা আর পরীগুলোকে মনে পড়ছিল। তবে হ্যাঁ, এটা কোহকাক নয়, তেহরান ছিল। খেয়ে-দেয়ে বাইরের দিকটায় চললাম। শহরের বাইরে ভাঙাচোরা ঘর অনেক ছিল, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল, নজরে এল। শিরাজের রাস্তার কাছেই এই রাস্তা থেকে দূরে ছিল কুহসপেদ, যেখানে খ্রীস্টান সাধুদের একটা মঠ ছিল। অসগর বলল যে, বর্ষাকালে এই পাহাড়টা সবুজ ঘাসে ঢেকে গিয়ে ভারি সুন্দর লাগে দেখতে। শীতের সময় বরফ পড়ে। বাইরে থেকে দেখলে ইস্পাহানকে বাগানের শহর বলে মনে হচ্ছিল, যার মাঝে মাঝে মসজিদের নীল নীল গম্বুজগুলো যেখানে-সেখানে দেখা যাচ্ছিল। ইস্পাহানের পূর্বে করমান, দক্ষিণে শিরাজ (পারস্য), পশ্চিমে বক্তিয়ারী আর উত্তরে তেহরানের এলাকা। ইস্পাহানে কাপড়ের মিল আর অন্য অনেক রকমের কারখানাও আছে। শহরের দিকে ফিরলাম, রাস্তায় চহার

বাগ-এর সুন্দর উদ্যান দেখতে পেলাম।

শিরাজের দিকে—২৮ রিয়াল (৪ টাকা ৬ আনা) দিয়ে শিরাজের বাসে চড়ে [illegible] চারটেয় বাস।ছাড়বে বলা হচ্ছিল, কিন্তু এখানে কথার কোনো ঠিক নেই। আমাদের বাস ছাড়ল ৮টার সময়। এতেও যাত্রী ঠেসেঠুসে ভরা হয়েছিল। দুজন লোক কাল থেকেই টিকিট কেটে বসেছিল। আমি আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। রাত দুটোয় আবাদি পৌঁছলাম। একটি খাট পাওয়া গেল কিন্তু পাতবার বা গায়ে দেবতার মত কিছু ছিল না। কোট-প্যান্ট পরেই শুয়ে পড়লাম। ড্রাইভার একেবারে বেপরোয়া, তার ওপর মোদক আফিম খায়। আফিম খাওয়া তো এখানে তামাক খাওয়ার মতো। লরি এত জোরে চালানো হচ্ছিল যে, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার ভয় ছিল। সরকারি তরফ থেকে আফিমের ওপর কোনো বাধা নেই।

আটটার সময় বাস রওনা হলো। পুরোটা রাস্তা পাহাড়ী ছিল। বেশ কিছু ডাঁড়া পেরোবার পর অনেকটা দূরে দূরে গ্রাম পাওয়া যাচ্ছিল আর গাছ গ্রামগুলোতেই দেখা যাচ্ছিল। একটা জায়গাতে আমি সঙ্গীব সঙ্গে খাবার খেলাম। দুটি মানুষ মিলে আয়েস করে মাংস-রুটি, চা-আঙুর খেলাম আর দাম লাগল পাঁচ আনারও কম। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে আমরা আবার চললাম। বাসে একজন পলটনের হাবিলদার ছিলেন, তাঁর মেজাজ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি শাহ-এর উত্তরাধিকারী। আমার বাসে বোর্খা পরা নয়জন মহিলা ছিলেন, যাদের মধ্যে বারো বছরের একটি মেয়েও ছিল। এখন আমরা দারখোশ (দাবা)-এর নিজের জন্মভূমি পারস্যের সুবার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। চারদিকে সেই ন্যাড়া ও শুকনো পাহাড় ছিল। ধুলো উড়ছিল। অবাক লাগছিল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত এই দেশে হাফিজ আর শাদী-র মত কবি কি করে জন্মেছিলেন। সময় চারটে নাগাদ আমরা তখ্‌তজমশিদ (পরসে-পুলিখ = পারসপুরী) পৌঁছলাম। সামনে খুব লম্বা চওড়া উপত্যকা, কিন্তু পাহাড় একেবারে ন্যাডা ছিল। উপত্যকাও সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত। ইরানের মহান শাহেনশাহের রাজত্বকালেও কি এই স্থান এই রকমই শুকনো আর নগ্ন ছিল? পারসপুরী সে-সময় সারা সভ্য দুনিয়ার রাজধানী ছিল। দারার রাজ্য পূর্বে সিন্ধ, পশ্চিমে গ্রীস আর মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাহাড়ের পাদদেশে ছিল দারার মহল। এখনও সেখানে বড় বড় স্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সন্ধেব বাতি জ্বলে ওঠার মুখে আমরা শিরাজ পৌঁছলাম। পুলিশ আগেই জাওয়াজ নিয়েছিল। মেহমানখানা ইরানেও দৈনিক ৫ রিয়াল (সাড়ে ১২ আনা) দিয়ে একটা ভাল ঘর পাওয়া গেল। চেয়ার টেবিল, পালঙ্ক, বিছানা, চাদর, বিদ্যুতের আলো সব ছিল। আধ রিয়াল (৫ পয়সা) দিয়ে স্নানের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। এখন দুদিন (১৯,২০ সেপ্টেম্বর) শিরাজেই থাকার কথা। শিরাজ পারস্য সুবার সদর। শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫২০০ ফিট উঁচুতে। এর লোকসংখ্যা ৩০ হাজার। করীম খাঁ বাজার, আর্ক (কেল্লা) দেখলাম। শাহরজা সাধারণ সৈনিক থেকে বাদশাহ হয়েছিলেন, তাই সেপাইদের দিকে তাঁর খেয়াল একটু বেশি। পলটন, পুলিশ তাঁর অনুগত। দশ তুমান (১৫ টাকা) মাসিক বেতন মন্দ

সমাধির ধারে ধারে পাথরের বেড়া দেওয়া, *পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং মেরামতের দিকে* খেয়াল রাখা হয়েছে। কিন্তু নতুন ইরান এটুকুতেই সন্তুষ্ট নয়, সে সাধারণ মানুষের মন থেকে এই ধারণাকেও সরিয়ে ফেলতে চায় যে, ছবি বা মূর্তির সম্মান করা খারাপ। সেজন্য বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে সাদী-র ছবির একটি ছবি তুলে এখানে রাখা হয়েছে। বাইরে আছে ছয়টি পাইন গাছ। চতুর্দিকে নীরস পাহাড়ী ভূমি, তারই মাঝে সরস কবি জন্ম নিয়েছিলেন।

রাতে একটি ফিল্ম দেখতে গেলাম। স্ত্রী-পুরুষের ভিড় খুব ছিল। ফিল্মটি ছিল ইংরিজি, কিন্তু তাতে ফারসীতে হেডিং দেওয়া হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে একজন লোক ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিল। সিনেমা খোলা জায়গাতে হচ্ছিল। বাকুতেও একটি সোভিয়েত ফিল্ম খোলা জায়গাতে দেখেছিলাম। আগা অস্র আমার সঙ্গেই ইস্পাহান থেকে এসেছিলেন। তিনি আমাকে জোর করছিলেন, 'আপনি আমার বাড়ি চলে আসুন, আপনার সঙ্গে আমার তরুণী বোনের বিয়ে দেব।' আর এদিকে একবার উঁকি মেরেও দেখা দিলেন না, আমিও বেড়ানোর ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলাম যে ওঁর বাড়ি খুঁজে বের করার চেষ্টা করিনি।

তেহরানের দিকে—২১ সেপ্টেম্বর ৫৭ রিয়াল (প্রায় ৯ টাকা) দিয়ে আমি সোজা তেহরানের জন্য বাসের টিকিট নিলাম। কখনও কখনও বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, সেজন্যই আমি এরকমটা করলাম। রাত ৯টায় বাস ছাড়ল। রাস্তায় দাঁড়াল রাত দুটোয়। পরদিন অর্থাৎ (২২ সেপ্টেম্বর) ৭টার সময় বাস ছাড়ল। যজ্দ-খস্ত পুরনো গ্রাম। কিছু কিছু বাড়ি মাটি কেটে বানানো হয়েছে। সে সময় খেতে যব আর গমের প্রচুর সবুজ ফসল ছিল। এখানে মাটির বহু ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছিল। সাতটার সময় ইস্পাহান পৌছলাম। গাড়ি এখান থেকে আর সামনে এগোবে না। আমি শুধু শুধুই ভেবেছিলাম যে, এখন তেহরান যাওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত। ইরানে খাওয়া আর থাকার সস্তা এবং ভালো ব্যবস্থা হয়ে যায়। অসুবিধে কেবল এই বাসগুলোকে নিয়েই। পরদিন ২৩ সেপ্টেম্বর আমাকে এখানেই থেকে যেতে হল। নদীর পারে আরমেনিয়ানদের মহল্লা জুল্ফা। গতবার সেটা আমি দেখতে যাইনি, এবার তাও দেখে

এলাম। এখন তো ইরানের সব শহরে আর ইরানীদের মধ্যেও পুরনো পোশাক উঠে গেছে। জীবন-যাপনেও ভীষণ পার্থক্য এসে গেছে। সেজন্য জুল্ফার আরমেনিয়ান স্ত্রী-পুরুষদের দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু দশ-পনের বছর আগে এই স্থানটিকে নিশ্চয়ই আধুনিকতার কেন্দ্র বলে মনে করা হতো। এখানে আরমেনিয়ানদের অনেকগুলো গীর্জা (কলীসিমো) আছে, আমি ঘুরে ঘুরে আপনমনে সেগুলো দেখতে লাগলাম। খাবার জন্য আবার শহরে ফিরে এলাম। ইস্পাহানে তেহরানের মতো কিছু ভারতীয় দোকান আছে এবং বেশির ভাগই পাঞ্জাবী শিখ ভাইদের। যুদ্ধের সময় অনেক পাঞ্জাবী সৈনিক ইরানে এসে পড়েছিল। সে সময় কিছু পাঞ্জাবী যুদ্ধের গাড়িগুলোকে চালিয়েছিল। যুদ্ধের পর তারা নিজের মোটর আর লরি কিনে নেয়, ফলে মোটরের সমস্ত কাজ তাদের হাতে চলে আসে। পরে সরকার ইরানী ব্যবসায়ীদেরও এক্ষেত্রে আসার জন্য সাহায্য করে। মোটরের রোজগার যদিও ভারতীয়দের একচেটিয়া নয়, তবু এখনও অনেক লরি এদের হাতে, অনেক ভারতীয় ড্রাইভারও আছে, আর মোটরের কল-কবজার ব্যবসা তো প্রায় সবটাই ভারতীয়দের হাতে। সর্দার সাহেব সিংহ আগে এসেছিলেন, যিনি মোটরের কাজ শুরু করেছিলেন, আজ তিনি পঁচিশ-তিরিশ লাখ টাকার মালিক।

পরের দিন (২৪ সেপ্টেম্বর) তেহরানের উদ্দেশে রওনা হলাম। বাসটি একেবারে নতুন আর পরিচ্ছন্ন ছিল। মনটা বেশ খুশি হলো। কিন্তু রাত বারোটার সময় এক নির্জন জায়গায় কোনো যন্ত্রাংশ ভেঙে বাসটি ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো। আকাশের নিচে খোলা জায়গায় শুতে হলো। ঠাণ্ডায় প্রত্যেকে হি-হি করে কাঁপছিল। ড্রাইভারটি ছিল ভাল। সে বলছিল যে, আগেকার দিন হলে এখানে সব লুট হয়ে যেত। এও জানা গেল যে, ইরানীরা জংলী শুয়োর শিকার করতে শুরু করেছে। কেউ বলছিল, টুপি (হ্যাট) পরার জন্য সরকারি হুকুম বেরিয়েছিল। বুশহর বন্দরের মোল্লারা লোকজনকে ভড়কে দিয়েছিল যে, ইসলাম শেষ হয়ে যাবে। দাঙ্গা হয়ে গেল। সেনাবাহিনী মেশিন গান লাগিয়ে দিল, আর এক হাজার লোক ওখানেই স্তূপ হয়ে গেল। তারপর টুপি পরতে কেউ আপত্তি করেনি। প্রথমে চলল সামনের দিক বেরিয়ে থাকা গোল টুপি। আমার সঙ্গী গুরুত্বের সঙ্গে বলল, আসলে শাহর ইচ্ছে ছিল সবাই নমাজ পড়া ছেড়ে দিক। কিন্তু চোখের ওপর ঢাকা ওই টুপি দিয়ে কারুর নমাজ পড়া আটকাল না। নমাজ পড়ার সময়ে শুধু ওই ঢাকার দিকটা পেছনে পিঠের দিকে করে নমাজ পড়াটা সেরে নিত। এরপর সরকারি হুকুম হলো পুরোটাই ঘের দেওয়া টুপী পরতে হবে। যাইহোক, আমি তো অনেককেই নমাজ পড়তে দেখেছিলাম, কজনকে তো পীরের কবরের সামনে হ্যাট খুলে নিতেও দেখেছিলাম।

সকাল হতেই আমি ড্রাইভারের সঙ্গে পায়ে হেঁটেই কুম্-এর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। কুম্ এখান থেকে সাত মাইল। ড্রাইভার আমাকে অন্য বাসে বসিয়ে দিল। আর আমি তেহরান চলে এলাম। আমি চাইছিলাম আফগানিস্থানের রাস্তা দিয়ে ফিরতে। আফগানিস্থানের কন্সলের কাছ থেকে ভিসা নিতে গেলাম। প্রথমে তো বলা হলো যে,

যাবার রাস্তা নেই। আমি যখন বললাম মশহদ থেকে হিরাট হয়ে যাওয়া যেতে পারে, তখন বললো, 'মশহদেই আপনি ভিসা নিয়ে নিন।' তেহরানে দুদিন (২৬, ২৭ সেপ্টেম্বর) আরো থাকলাম। একদিন ফটোগ্রাফারের কাছে আমার কিছু ফিল্ম ধোওয়ার জন্য গেছি, সেখান একটি তুর্কী যুবক বসে ছিল। কথায় কথায় বলতে লাগল, ইরানীরা এখন অনেক পিছিয়ে আছে, এদের মেয়েরা এখনও কালো চাদর ছাড়তে পারে নি। আর এরা এই হিজিবিজি আরবীলিপিকেও ব্যবহার-করে চলেছে। সেখানে হমীদ খাঁ নামে এক ইহুদী দাঁতের ডাক্তার দোকানে বসেছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। ইহুদী মেয়েদের মোটেই পর্দা নেই। হমীদ খাঁ তাঁর বাবা, সৎমা এবং পত্নীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। এখানের ইহুদী ও মুসলমান উভয়েই ফারসী বলে। দুজনেরই এক ধরনের নাম হয়। হমীদ খাঁর বাবা প্যারিসে পড়া ডাক্তার, ভারি হাসিখুশি। তিনি ইরানী রান্না খাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করলেন। চাল, মাংস, আর ডাল এক সঙ্গে রান্না করা হয়েছিল, তার সঙ্গে পুদিনা ও রোজমেরির সবুজ সবুজ পাতা আর পেঁয়াজের টুকরোও ছিল। রুটি ছিল পাতলা পাতলা। পরে খাবার জন্য এলো আঙুর। যেখানে দু আনা সের আঙুর সেখানে তার কি কদর হতে পারে। শিরাজে গাধার পিঠে লম্বা লম্বা সোনালি আঙুর বিক্রি হচ্ছিল। দু-আনার আঙুর আমি সারাদিনে খেতে পারলাম না। সন্ধেবেলায় 'নুমাইশ-মরকজী'তে আমি একটি ইরানী নাটক 'মেহ্‌র-গয়াহ' (প্রেমবুটী) দেখতে গেলাম। দর্শকদের মধ্যে মোটামুটি অর্ধেক ছিল মহিলা। স্ত্রী-পুরুষ একসাথে বসেছিল। নাটকে ইংরেজি কায়দার নাচও ছিল। একটি আরমেনিয়ান তরুণী নায়িকার পার্টটি ভারি সুন্দর করেছিল। পরের দিনও (২৭ সেপ্টেম্বর) শহরের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরলাম। হমীদ খাঁর বাড়ি গেলাম। তার বাবা তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে আগা রুহুল্লা খান বলে আমার পরিচয় করালেন। আমি কখনও ভাবতে পারিনি রাহুল এত সহজেই রুহুল্লা হয়ে যেতে পারে।

মশহদের দিকে—২৮ সেপ্টেম্বর সকালে গিয়ে আমি জাওয়াজ নিয়ে এলাম। ৩৬ রিয়াল (৫ টাকা ১০ আনা) দিয়ে মশহদ যাবার টিকিটও নিয়ে নিলাম। রাত সাড়ে আটটার সময় বাস ছাড়ল। বেশ ঝামেলার জায়গায় আমার সিট পড়েছিল। ড্রাইভারের পাশে আসন। না পা রাখার জায়গা, না পিঠের দিকে হেলান দেবার একটা কিছু। পুরো তিন দিনের রাস্তা তাও আবার রাত দিন। রাত দুটোর সময় জাবুনে গাড়ি দাঁড়াল শোবার জন্য। মাটিতেই শোবার ব্যবস্থা। পরদিন (২৯ সেপ্টেম্বর) ছ-টার সময়ই রওনা হলাম। একটা বড় জোত পার হতে হলো। তিব্বতের মতো পাহাড়ী দৃশ্য। সাড়ে আটটার সময় ফিরোজকুহ শহরে পৌঁছলাম। এখানে অনেক দোকানপাট ছিল। মদের দোকানে অনেক 'মৈকদৎ' লিখে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। আগে লোকে লুকিয়ে মদ খেত। এখন কোনো বাধা ছিল না। পাশেই একটি নদী বয়ে যাচ্ছিল, যার দুটো তীরে লোকেরা পায়খানা করে নোংরা করে দিয়েছিল। সামনে একটি জায়গার বেশ কিছু জংলী দেবদারু গাছ চোখে পড়ল। বসম্ জোত খুব উঁচু জোত, এখানে শীতকালে কখনও কখনও

বরফের জন্য রাস্তা বন্ধ যায়। সেমরানে বেশ বড় মাঠ আছে। এখানে খনিজ তেলের কূপ খোঁড়া হচ্ছে। রাত দুটোয় শাহরুদে পৌঁছলাম। এখান থেকে খোরাসানের শুরু। রাতে এখানেই ঘুমোলাম। পরদিন (৩০ সেপ্টেম্বর) একটি সুনসান নির্জন স্থানে মিয়ান্‌দস্ত নামে শাহ-আব্বাসের বানানো দুর্গ দেখলাম। সব জায়গাতেই খাবার জন্য রুটি-মাংস-ফল পাওয়া যাচ্ছিল। ইরানীরাও মাংসে ঝাল-মসলা দিতে জানে না। বোঝা যাচ্ছে, ঝাল মসলা দেওয়া মাংস ভারতের নিজস্ব জিনিস। আমার এক ভারতীয় বন্ধু বলছিলেন, 'খানা আর গানা তো ভারতীয়রাই জানে।' এই বন্ধুটি হিন্দু নন, মুসলমান ছিলেন। রাতে সব্‌জবারে থাকতে হলো। এখানে খুব ভালো বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু দু-তিন ঘণ্টা থাকার পরে বাসওয়ালারা আবার লোকজনকে তুলে দিল। রাত সাড়ে চারটেতেই আমরা নেশাপোর পৌঁছে গেলাম। এখানে বিশ্বকবি ওমর খৈয়ামের সমাধি রয়েছে। ঘুমে কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। বাসওলাকে আরো কিছু পয়সা দিতে চাইলাম, তবু সে সমাধিস্থলে যেতে রাজি হল না। মশহদ নগরী যে স্থান থেকে দেখা যাচ্ছিল সেখানে আমার সঙ্গের তীর্থযাত্রীরা পাথরে গুম্বদ (স্তূপ) বানাতে লাগলেন। মশহদ ইমামরজা শিয়াদের ১২ ইমামের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। মশহদ তাঁর সমাধিস্থল।তাই পৃথিবীতে সমস্ত শিয়াদের এটা বিখ্যাত তীর্থ। টুপীর জন্য এখানেও মোল্লারাও লোককে উত্তেজিত করেছিল। যদিও মারা গিয়েছিল পনেরো-কুড়ি জন। কিন্তু লোকে বলে যে, হাজরেরও বেশি মানুষকে মেশিন দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমরা যখন মশহদ পৌঁছলাম, দিনের আলো যথেষ্ট ছিল। মশহদ সুন্দর শহর। লোকসংখ্যা একলাখ তিরিশ হাজার। রাস্তা খুব চওড়া আর পরিষ্কার। ইরানের শহরগুলোর রাস্তার সঙ্গে ভারতে একমাত্র নতুন দিল্লীর রাস্তার তুলনা কবা যেতে পারে। সোজা রাস্তা বের করার জন্য না জানি কত হাজার কবর আর কতশো মসজিদ খতম করে দেওয়া হয়েছে।

কাবুলের রাস্তায় যাবার চিন্তা আমি এখনও ছাড়িনি। 'মেহমান-খানা মিল্লী' (জাতীয় হোটেল)-তে দৈনিক ৬ রিয়াল (সাড়ে পনেরো আনা) দিয়ে একটি সুন্দর ঘর পেয়ে গেলাম। জানা গেল, এখান থেকে হিরাত (আফগানিস্তান)-এর রাস্তা খোলা আছে। আফগান-কন্‌সলের কাছে গেলাম। জানতে পারলাম ভিসার জন্য দশদিন অপেক্ষা করতে হবে। এখন ওদিককার আশা ছাড়তে হলো। শহরটিকে সুন্দর করার পুরো চেষ্টা করা হয়েছে, আরো নতুন বাড়ি তৈরি হয়ে চলেছে। এখান থেকে ২৮ কিলোমিতর (প্রায় ১৮ মাইল) দূরে তূস। মহাকবি ফিরদৌসীর সমাধি স্থল দেখার জন্য আমি ঘোড়ার গাড়ি করলাম। দু-ঘণ্টা পরে তূস পৌঁছলাম। তূস এখন কৌশাম্বীর মতো একটি পরিত্যক্ত স্তূপ। এরই একপাশে নতুন একটি বাগান করা হয়েছে, যেখানে ইরানের এই মহাকবির সমাধি আছে। সমাধি গৃহটি ইরানী ঢঙে শ্বেত পাথর দিয়ে বানানো হয়েছে। স্তম্ভগুলোর ওপর পারস্যপুরীর স্তম্ভের মতো বলদ ইত্যাদির মূর্তি আছে। দরজায় শাহনামার পাঁচটি দৃশ্য শ্বেতপাথরের ওপর উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সম্ভবত, এগুলোর একটিতে মহমুদ আর ফিরদৌসীর মূর্তিও রয়েছে—নবীন ইরান ইসলামের মূর্তিভাঙা-নীতির কোনো পরোয়া

করে না। পাশেই একটি ছোট বাগান ছিল, আমি গাছের ছায়ায় বসে মিষ্টি সরদা খেলাম। এখানকার জলটাও ভাল ছিল।

রাতে মশহদ শহরে বেড়াতে গেলাম। কি জানি কোন মুহূর্তে আমার মানিব্যাগটা চুরি হয়ে গেল। ওটার মধ্যে ইরানী ও আমেরিকান মুদ্রা মিলিয়ে ৯০ টাকা ছিল। ভাগ্যিস চেকটা আমি আমার বাক্সেই ফেলে এসেছিলাম।

ভারতের দিকে—৩ অক্টোবর আমি ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙিয়ে আনলাম। রাত নটায় আমাদের বাস রওনা হল। এই বাসে যা কষ্ট হল বলার নয়। বোধহয় এত কষ্ট সারা জীবনে কোনো যাত্রায় হয়নি। এটি একটি মাল বোঝাই করার লরি ছিল। নিচে দুটি ভাগে মাল ভরা ছিল। পেছনের এক চতুর্থাংশ জায়গা পুরোটা মালে ঠাসা ছিল। ছাতটাও মালের ভারে ফেটে পড়ছিল। লরির গায়ে লেখা ছিল 'মখ্‌সুস হম্ল-বার' (কেবলমাত্র বোঝা বওয়ার জন্য), তবুও আঠারজন যাত্রীকে এর মধ্যে ঠেসে ঢোকান হয়েছিল। লরির অভাবের কারণে যাত্রীরা নিরুপায়। কিন্তু এখানে ১৮টি লোকের বসারও জায়গা ছিল না। আর আমাদের পাঁচ দিন পাঁচ রাত এই বাসেই যাওয়ার কথা। বাসে একে অপরের সঙ্গে আলাপ হল। পণ্ডিত মস্তরাম শর্মা স্ত্রী ও ভগিনী সহ বোধহয় তিনজন ছিলেন। এঁরা ছিলেন গুরুদাসপুরের (দীনানগর) বাসিন্দা। গুজরাটের মুল্লাজী, তাঁর জামাই অহমেদভাই আর স্ত্রী-কন্যা চারজন তীর্থ করে ফিরছিলেন। আম্বালার তরুণ অলমদাদ হুসেন মশহদ থেকে তীর্থ এবং প্রেম করে ফিরছিলেন। এভাবে আমরা নয়জন ভারতীয় এবং নয়জন ইরানী ছিলাম। প্রথম রাতে বসার পর এবার শোবার প্রশ্ন। আমি আমার মত প্রকাশ করে বললাম, 'শুধুমাত্র মাথাটা আমাদের নিজের মনে করা উচিত, বাকি শরীরটা বস্তার গাদা ভাবাই ভাল।' তাই হল। রাস্তায় তুরবতে-হৈদরী, কাইন, বিরজন্দ হয়ে ৭ অক্টোবর আমরা জাহিদান পৌঁছলাম। এটি আট হাজার লোকসংখ্যার একটি ভাল মফস্বল শহর। আশেপাশের গ্রামে বেলুচিস্তানের লোকরা থাকে। কিন্তু শহরে ইরানী এবং তার চেয়েও বেশি ভারতীয়দের দোকান। এখানেও আশেপাশে ন্যাড়া পাহাড় আছে। গত যুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) কোয়েটার ট্রেন এখান পর্যন্ত আনা হয়েছিল। আজও শহরের কিছু রাস্তার ওপর ট্রেনের লাইন বিছানো রয়েছে, তবে ট্রেন নোককুণ্ডির পর আর সামনে যায় না। ওই সময় সৈন্যদের জন্য ইংরেজ সরকার অনেক বাড়ি বানিয়েছিলেন, যার বেশির ভাগই আজ খালি পড়ে আছে। কিছু বাড়িতে এখন ইরানী সেপাই থাকে। ১৯২০-তে ইংরেজদের ইরান ছেড়ে চলে যেতে হয়। ওরা ভেবেছিল যে, বলশেভিকরা আসাতে রুশরা দুর্বল হয়ে গেছে এবং অর্দ্ধেকের জায়গায় পুরো ইরান আমাদের। কিন্তু বলশেভিকরা জারের সময় ইরানীদের ছিনিয়ে নেওয়া অধিকারগুলো ছাড়াও ইংরেজদের পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। গুমরগ্ (কাস্টম)-এর গুদামে বাদাম এবং পেস্তা ছাড়াও জিরের হাজার হাজার বস্তা ছিল, আর হিং-এর বস্তাও রাখা ছিল। ইরানীরা না জিরের ব্যবহার জানে, না হিং-এর। ৯ অক্টোবর একটার সময় লরি নোককুণ্ডির উদ্দেশে রওনা হল। এদিকে মালের লরিই বেশি চলে, আর ড্রাইভার নিজের

পাশে দু-একজন যাত্রীকে বসিয়ে নেয়। সাড়ে চার ঘণ্টা যাওয়ার পর মীরজাবা পৌঁছলাম। কোনো এক সময় এটি ভাল স্টেশন ছিল। ইংরেজদের রেখে যাওয়া জলের ট্যাংকি এখনও কাজে দিচ্ছিল। মীরজাবা থেকে দু-এক মাইল দূরেই ইরান আর ভারতের সীমা। যদি মীরজাবা ভারতের সীমায় থাকত, তাহলে এখান পর্যন্ত ট্রেন আসত, কিন্তু ওপারে কয়েকশো মাইল পর্যন্ত জলই নেই। নোককুণ্ডিতেও দূর থেকে ট্রেনে করে জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়। কাস্টম-এর লোকেরা জিনিসপত্র ও পাসপোর্ট দেখতে আড়াই ঘণ্টা লাগিয়ে দিল। আটটার সময় যখন রওনা হতে গেল, লরিটাই গেল বিগড়ে। ড্রাইভার ওটা মেরামত করতে লাগল। ১টার সময় ব্রিটিশ ইংরেজি সীমার ফৌজি চৌকীতে পৌঁছলাম, দুই রাজ্যের সীমারেখা হল একটি শুকনো সরু নালা। যাই হোক, ফৌজিচৌকীতে পাসপোর্ট দেখা হল। আমরা আবার চলতে লাগলাম এবং রাস্তায় রেলওয়ে মজুরদের একটি খালি ঘরে পৌঁছে ঘুমিয়ে পড়লাম। এখানে হাওয়া খুব ছিল, ঠাণ্ডাও খুব ছিল, তবে বিরজন্দের কাছে যেমন ছিল সেরকম নয়। সেখানে তো রাতে চামড়ার থলির জল বরফ হয়ে গিয়েছিল। ১০ তারিখ সকালেই রওনা হলাম। হাওয়ার তীব্র গতি ছিল, ছোট ছোট কাঁকর উড়ছিল। তিনটি স্থানে বালিতে গাড়ি আটকে গেল। কখনও কখনও পুরো দুদিন গাড়ি এই শুকনো পাঁকে আটকে থাকে। কয়েক শতাব্দী ধরে এই নির্জল, নির্জন শত-শত মাইলের কান্তার ভারতকে রক্ষা করে আসত। শত্রুদের হিম্মত ছিল না যে বড় সৈন্য দল নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যায়। কিন্তু এখন তো লরিগুলো এই বন্ধ্যা জায়গাকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে। আমরা একটার সময় নোককুণ্ডি পৌঁছে গেলাম।

মৃত্যুর মুখোমুখি, ১৯৩৫-৩৬

নোককুণ্ডি বেলুচিস্তানের একটি ছোট্ট রেলওয়ে স্টেশন। আমি আগেই বলেছি, এখান থেকে জাহিদান পর্যন্ত ট্রেনের লাইন রয়েছে কিন্তু ট্রেন এখন এই পর্যন্ত আসে। এখানে তিরিশ-চল্লিশটি দোকান আছে। পাঞ্জাবী এবং সিন্ধি দু-ধরনেরই দোকানদার আছে। জল একেবারেই নেই। জল অনেক দূর থেকে ট্যাংকে করে নিয়ে আসতে হয়, আর মেপে পাওয়া যায়। বাড়িগুলোও ছোট ছোট। গাছ-পালার নামমাত্র নেই। সপ্তাহে কেবল বৃহস্পতিবার একটি গাড়ি যায়, আজ বৃহস্পতিবার। ১৬ টাকা ২ আনাতে লাহোরের টিকিট নিলাম। দুবার করে পাসপোর্ট দেখা হল। রাত আটটায় গাড়ি রওনা হল। ন্যাড়া পাহাড় আর বালুকাময় ভূমি চোখে পড়ছিল, যখন আমি গাড়ি থেকে বাইরে উঁকি দিচ্ছিলাম। স্টেশন কোথাও কোথাও একশ মাইল দূরে ছিল। জলই নেই, মানুষের বসতি

গড়ে উঠবে কি করে? দুপুরের পরে ট্রেন বোলান উপত্যকায় ঢুকল। বেশ কয়েকটা সুড়ঙ্গ পার করতে হল। এদিক দিয়ে বিদেশী শত্রুদের আসার দুটো বাধা ছিল। এক তো কয়েকশো মাইলব্যাপী সেই নির্জন-নির্জল বন্ধ্যাভূমি, আর দ্বিতীয়ত বোলানের এই পাহাড়। ভারতের পক্ষে এ যে, কতখানি সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে, তা এ থেকেই বোঝা যায় যে ইংরেজের আগেকার সব আগমনকারীই খাইবার গিরিপথ দিয়ে এসেছিল। বোলান দিয়ে আসার সাহস কারো হয়নি। তৃতীয় প্রহরে গাড়ি মস্তুংগ-রোড স্টেশনে পৌঁছল। এখানে সব বাড়ি-ঘরদোর ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। আমি জাপানের কোয়েটার ভূমিকম্পের খবর শুনেছিলাম, কিন্তু এখানে দেখছিলাম কিভাবে তা জলের ট্যাংকের স্তম্ভগুলো দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে, কিভাবে বাগানের দেওয়ালগুলো মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। স্পেজন্দ জংশন থেকে একটি লাইন কোয়েটা যায়, অন্যটি সক্‌খর-রোড়ীকো। আমরা লাহোরের বগিতে চড়লাম। বোঝা গেল এবার ভারতীয়রা তৃতীয় শ্রেণীরও বাইরে। রেলওয়ে কোম্পানির কাছে আমরা মানুষ নই, জানোয়ার। আমি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আর জার্মানীর রেল গাড়ি দেখেছি, জাপানের রেলগাড়িও দেখেছি, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়ার রেলগাড়ি দেখেছি। যাই হোক, সোভিয়েতের রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর আরামের সঙ্গে তুলনা করার প্রয়োজন নেই। আমাদের তৃতীয় শ্রেণী নরক। সক্কর-রোহড়ী হয়ে ১২ তারিখ সন্ধে সওয়া ৭টায় লাহোর পৌঁছলাম। ডাঃ লক্ষ্মণস্বরূপকে স্টেশনেই পাওয়া গেল। আমি তাঁর বাড়ি চলে গেলাম। এখন ছ-দিন লাহোরে কাটাবার কথা। শ্রীবিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলাম। আমি চেষ্টা করে ছিলাম, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ও যাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত তিব্বতী ভাষাকে পাঠ্যবিষয় রূপে গ্রহণ করে। ডাঃ লক্ষ্মণস্বরূপ প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু কাশ্মীরের শিক্ষামন্ত্রী এর বিপক্ষে লেখেন। কাশ্মীর রাজ্যে তিব্বতী ভাষাভাষী মানুষ রয়েছে, অতএব বিশ্ববিদ্যালয এটা মঞ্জুর করবে কেন? আমি ভাইস চ্যান্সেলর ডাঃ বুলনরের সঙ্গে দেখা করলাম আর এও বললাম যে কেবল কাশ্মীর রাজ্যেই নয় কাঁগড়া জেলার লাহুল তহসীলেও তিব্বতী ভাষা বলা হয়। তিনি বললেন, 'যদি ওখানকার লোক ডেপুটি কমিশনারের মারফত আবেদন পত্র পাঠায় তাহলে আমাদের হাত শক্ত হবে।'

লাহোরে দু-তিনটি জায়গায় বক্তৃতা দিতে হল। ১৮-তে আমি দিল্লির উদ্দেশে রওনা হলাম, আর পরদিন সাড়ে আটটাতেই ওখানে পৌঁছে গেলাম। প্রফেসর সুধাকরের বাড়িতে উঠলাম। হরিজন সেবক সংঘে শ্রীমলকানি এবং বিয়োগী হরিজীর সঙ্গে দেখা হল। সন্ধেবেলায় পাহাড়ের দিকে ঘুরতে গেলাম। মিরাট থেকে নিয়ে আসা অশোক স্তম্ভ এখানেই বসান হয়েছে।

পরদিনও (২১ অক্টোবর) পুরনো জায়গাগুলো ঘুরে দেখাব কথা ছিল। সন্ধেবেলায় হিন্দি প্রচারিণী সভার তরফ থেকে মানপত্র পেলাম। মহামহোপাধ্যায় হরিনারায়ণজী এর সভাপতি ছিলেন। চতুরসেন শাস্ত্রী, জৈনেন্দ্রজী, চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালংকার, পণ্ডিত ইন্দ্রর মতো দিল্লির সাহিত্যের প্রধানদের সঙ্গে আলাপ হযে বেশ আনন্দ পেলাম। ২২ তারিখ সকালে কানপুরে নেমে গেলাম। স্বামী ভগবানের সঙ্গে জাজামউ দেখতে (২৩

অক্টোবর) গেলাম। পুরনো জায়গা, ভাঙ্গাচোরা মূর্তি বেশি নেই তাই খুব বেশি পুরনো জায়গা বলে মনে হল না।

প্রয়াগে চারদিনের (২৪-২৭ অক্টোবর) জন্য ডঃ বদ্রীনারায়ণ প্রসাদের ওখানে রইলাম। কিছু প্রুফ দেখলাম। ২৬ তারিখে টনসিলের ব্যথা শুরু হল আর জ্বরও এল দু-এক ডিগ্রি। ভারতের বাইরের যাত্রাতে যে এই অসুখ মাথায় চাপেনি তাই রক্ষে। থুথু ফেলতেও ভীষণ ব্যথা হতে লাগল। বোধহয়, লক্ষ্মীদেবী বললেন যে, গলায় গামছা বেঁধে দিয়ে টনসিলের ব্যাপারে কোনো গুণীন ঠিক করে দিতে পারে। আমি বললাম, 'ভাল কথা, গুণীনেরও হাতযশ দেখে নেওয়া যাক।' শেষমেশ বৈদ্যের চূরণ আর হোমিওপ্যাথির ছাইভস্মের তো পরীক্ষা হয়েই গেছে। এখন এটাই আর কেন বাকি থাকে? কিন্তু আমি জানতাম এর চিকিৎসা পাটনার ডাঃ হসনৈন করতে পারেন। ২৯ অক্টোবর সাড়ে ছটায় পাটনা পৌঁছলাম। জয়সওয়ালজীর স্নেহ ও অভ্যর্থনা পেলাম; তিন ঘণ্টা পর ডাঃ হসনৈন দেখতে এলেন। দশটার সময় আমি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেলাম; ডাক্তার আগে থেকেই বলছিলেন টনসিলটা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়াই ভাল। আমারও কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন তো টনসিল পাকছিল, যতদিন না ওটা ঠিক হয় তত দিন পর্যন্ত অপারেশন করা সম্ভব ছিল না। পয়লা নভেম্বর ধূপনাথজী চলে এলেন। ব্যথা তো এখনও ছিল, তবে কথাবার্তা বলার সময় ততটা বোঝা যাচ্ছিল না। ৩ আর ৪ তারিখে টনসিলটা একটু চিরে দেওয়া হল। একটু পুঁজ আর রক্ত বেরোল। এবার এক বছরের জন্য আবার বিশ্রাম। সাতটার সময় আমি হাসপাতাল থেকে জয়সওয়ালজীর বাড়িতে চলে এলাম।

সারনাথে মূলগন্ধকুটী বিহারের বার্ষিকোৎসব ছিল। আনন্দজী এবং ধূপনাথের সঙ্গে আমি সেখানের জন্য রওনা হলাম।

মেলা বেশ ভাল ছিল। এইসময় আমি এখানে অবশ্যই আসবো, সম্ভবত একথা শ্যামলাল জেনে ফেলেছিলেন, আর ১৮ বছর পর শ্যামলাল, রামধারী এবং শ্রীনাথ—আমার এই তিনভাইকে এখানে দেখলাম। ১৪ নভেম্বর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে জাপানের ওপর বক্তৃতা দিলাম। ধ্রুবজী সভাপতি ছিলেন। কোথায় আমার মতো নাক পর্যন্ত ডুবে থাকা নাস্তিক, আর কোথায় ধ্রুবজীর মতো আস্তিক। আমার অনেক কথাই হয়ত তাঁর ভাল লাগেনি, বিশেষ করে খাদ্য-অখাদ্যর বিষয়ে কথাগুলো।

এবারের গরমে আমার আবার তিব্বত যাবার কথা ছিল, কারণ শলু-বিহারের সমস্ত বই আমি দেখতে পাই নি। আর দেখা বইগুলোর মধ্যেও অনেকগুলো কপি করে আনার ছিল। দুদিনের (১৫-১৭ নভেম্বর) জন্য কলকাতা হয়ে এলাম। তেরগীর দুষ্প্রাপ্য কন্-জুর আমি অনেক কষ্টে পেয়েছিলাম। তবে তা ছু-শিঙ্-শার কাছে টাকা ধার করে কিনেছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল কন্-জুরটা পাটনাতেই থাকুক, কিন্তু ওখানে জয়সওয়ালজী ছাড়া তার কদর করার মতো আর কেই বা ছিল? না বিহার-রিসার্চ সোসাইটি তার গুরুত্ব বুঝবে আর না পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়। নিরুপায় হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেই লিখতে হল। পাটনা-বেনারস হয়ে আবার আমি প্রয়াগে চলে এলাম।

আর ২০ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওখানেই 'দীর্ঘনিকায়' (হিন্দি-অনুবাদ) 'জাপান', 'বাদন্যায় ইত্যাদির প্রুফ দেখতে লাগলাম। ১৫ ডিসেম্বর জয়সওয়ালজীর চিঠি পেলাম—'কন্-জুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিচ্ছে, চলে আসুন।' আমি পরের দিন পাটনা পৌঁছে গেলাম। পরদিন (১৭) ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এলেন এবং কন্-জুর-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এরপর আমি পাটনাতেই ছিলাম। সকালে খুব ভোরে জয়সওয়ালজীর সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে যেতাম। সেখানে একটু আমি সাঁতরেও নিতাম। জলখাবার খাওয়ার পর জয়সওয়ালজী মক্কেলদের কাগজপত্র দেখতেন তারপর খেয়ে হাইকোর্ট চলে যেতেন। আমি জলখাবার খেয়ে চওড়া পালঙ্কে কাগজপত্র ছড়িয়ে প্রুফ দেখতে বসতাম। খাবার সময় হলে আমার খেয়ালও থাকত না। খাবার তৈরি হয়ে এখানেই ছোট টেবিলের ওপর চলে আসত। খাবার খেয়ে আবার আমি ঐভাবেই কাজে লেগে যেতাম। অনেক পরে আমার একথাও কানে এসেছিল—'রাহুলজী লেখাপড়ায় এত তন্ময় থাকেন যে ওঁর খেয়ালও থাকে না যে খাবারে নুন আছে না নেই।' এটা শুনে আমার খুব আশ্চর্য লাগল। কারণ, আমি এরকম অসাড় নই, হতেও চাই না। এই উক্তি অব্দি মাইজীর (জয়সওয়াল পত্নীর) কানে গিয়ে পড়ল। এরকমটা খুবই কম দেখা যায় যে, কোনো বিদ্বান বন্ধুর যেমন স্নেহ পাওয়া গেছে তেমনি বন্ধুপত্নীরও বাৎসল্য পাওয়া গেছে।

জয়সওয়ালজী নিজে বিদ্বান ছিলেন। অসাধারণ গবেষক ও বিচারক ছিলেন। তার চেয়েও বেশি তিনি অন্য বিদ্বান এবং সহকর্মীদের সাহায্যের জন্য আগ্রহী ছিলেন। বিজ্ঞান মার্তণ্ড বলে আজমীঢ়ে এক তরুণ ছিলেন। প্রথমে লাহোরে পরে কাশীতে তিনি সংস্কৃত পড়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। সব রকম ছন্দে সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন। সচ্ছন্দে সংস্কৃত ভাষা বলতেন। তিনি পাটনায় এলেন। জয়সওয়ালজী পাটনার দুজন নামী পণ্ডিতকে ডাকলেন। বিজ্ঞান মার্তণ্ড তাঁর ব্যাকরণের পাণ্ডিত্য তো দেখালেনই সেইসঙ্গে এই বলে খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যেরও পংক্তি উদ্ধৃত করতে লাগলেন যে, বস্তুত এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শনকে অবলম্বন করে রচিত, আর গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ যুক্ত করে নিজেকে আস্তিক রাখতে চেষ্টা করেছেন। বেচারি পণ্ডিত বিদ্বান তো ছিলেন, কিন্তু এটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বিজ্ঞান-মার্তণ্ড আমার খোঁজে এখানে পৌঁছেছিলেন। এখন তিনি বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করতে চাইছিলেন। আমি তাঁকে সিংহল বা বর্মা যাবার পরামর্শ দিলাম। পরিচয়পত্রও দিয়ে দিলাম। আমার খুবই ইচ্ছে ছিল ওঁর জ্ঞান আরও বিস্তৃত হোক, জয়সওয়ালজী তো ওঁর প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। একদিন কাছারি থেকে ফিরে লুকিয়ে একশ এক টাকা বিজ্ঞান-মার্তণ্ডের জন্য দিয়ে দিলেন। ওঁর পত্নী কঞ্জুষ ছিলেন না, কিন্তু স্বামীর এই দানখয়রাতের জন্য কষ্ট তাঁকেই পোয়াতে হত। জয়সওয়ালজীর গুণগ্রাহীতার জন্য আমি তাঁর স্নেহের পাত্র ছিলাম। বেচারি মাইজীর রামায়ণ পড়তে খুবই কষ্ট হত। কিন্তু তিনিও নিজের ছেলের মতই আমাকে স্নেহ করতেন। সেই গুণের কথাটার উৎস খোঁজার সময়, আমার মনে হল, সম্ভবত সেদিন খাবারে নুন ছিল না, বা কম ছিল। সেকথা আমি অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু

নুনের জন্য ভৃত্যদের ছোটানো আর ততক্ষণ হাত গুটিয়ে বসে থাকা আমি পছন্দ করতাম না। তাছাড়া প্রুফগুলোও তো পাশে পড়েছিল আমার অপেক্ষায়। আর আমার কাছে তখন শীতের হাতে গোনা কটা দিন ছিল। মুঙ্গের জেলার লোকগুলো তাদের জেলা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হবার জন্য আমাকে খুব করে বলছিল। আমি তা স্বীকার করে নিলাম। এবারের ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স মহীশূরে হবার কথা ছিল। জওসওয়ালজী যাচ্ছিলেন, তিনি আমাকেও যাবার জন্য বললেন। কিন্তু আমার নিজের কাছ থেকে ছুটি ছিল না। এবারের শিবরাত্রিতে নেপালের পথে তিব্বতও যাওয়ার কথা ছিল।

টাইফয়েডের কবলে—২৩ ডিসেম্বর একটু জ্বর এল। জওসওয়ালজী দেখলেন আর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি থেকে যাব?' সে-সময় তেমন জ্বর ছিল না। আমি বললাম, 'না, আপনি যান।' হোমিওপ্যাথির ওপর যতটা আমার অবিশ্বাস ততটাই ওঁর বিশ্বাস। তিনি একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ওষুধের জন্য বলেছিলেন। তিনি ২৩ ডিসেম্বরেই মহীশূরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। চারদিন পর্যন্ত হোমিওপ্যাথির ওষুধই চলল। জ্বরটা রাতদিন থাকছিল। হায় হায় করার অভ্যেস আমার ছিল না। চুপচাপ পড়ে থাকতাম। ২৬ তারিখ দুপুরে থার্মোমিটার লাগানো হল, জ্বর ১০৩° ডিগ্রি ছিল। আর রাত্রে ১০৫° ডিগ্রি। আমি ভাবলাম, আর হোমিওপ্যাথির ওপর বিশ্বাস রাখা উচিত হবে না। পরদিন দশটার সময় শ্যামবাবুকে (ব্যারিস্টার শ্যামবাহাদুর) ডাকলাম। রুগীর চিকিৎসার জায়গা আমি হাসপাতালকে মনে করি, বাড়িকে নয়। সেখানে ওষুধ পথ্যের যতটা খেয়াল রাখা সম্ভব, ততটা বাড়িতে সম্ভব নয়। বাড়ির লোকেদের অযথা ঝামেলায় পড়তে হয়। বাড়ির লোকেরা ডাক্তার ডাকার কথা বললেন। আমি বললাম, 'না, হাসপাতালে নিয়ে চলুন।' আমাকে সেখানে হথুয়া ওয়ার্ডের ১১ নম্বর খাটে পৌঁছে দেওয়া হল। সেদিন জ্বর ১০৩° থেকে ১০৫° ডিগ্রি রইল। যখন ১০৩° থেকে বাড়তে আরম্ভ করত, তখন মাথায় বরফ রাখা হত। আজ (২৭ ডিসেম্বর) ধূপনাথ চলে এলেন। তিনি রাতেও আমার কাছে থাকতে চাইছিলেন কিন্তু আমি তাঁকে হোটেলে শোবার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। পরদিনও রাতে আমি তাঁকে হোটেলে পাঠালাম। হাসপাতালের লোকেদের বড় আশ্চর্য লাগত যে আমি ভুল বকছি না। ২৯ তারিখে জ্বর ১০৩° থেকে ১০৪° ডিগ্রি পর্যন্ত থাকল। সেদিন মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার কোনো রকম অস্থিরতা ছিল না। এখন ধূপনাথ রাতদিন আমার খাটের পাশে বসে থাকতেন। শুধু খাবার সময়টা বাইরে যেতেন। আজ শরীরে লাল লাল দাগ বেরোল, সেজন্য সন্দেহ রইল না যে এটা টাইফয়েড (মোতিঝরা) জ্বর।

৩০ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। এই সময়কার কথা আমি ধূপনাথের কাছ থেকে শুনে পরে ডায়েরিতে লিখে রাখি। অজ্ঞানতার মধ্যে পায়খানা পেচ্ছাপেরও চেতনা ছিল না। নার্স এবং ডাক্তার অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে দেখতে থাকতেন। আর ধূপনাথ তো অসুবিধেয় পড়ে এক-আধ ঘণ্টা এদিক-ওদিক যেতেন, না

হলে সমানে সেখানে বসে থাকতেন। পায়খানায় প্রচণ্ড দুর্গন্ধ হচ্ছিল। ধূপনাথ কাপড় পাল্টাতেন আর আতর ছিটিয়ে দিতেন। ৩০ আর ৩১ ডিসেম্বর জ্বর ১০৫° ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে থাকল। খবরের কাগজে অসুস্থতার খবর ছাপা হয়ে গিয়েছিল, তাই অনেক বন্ধু দেখা করতে আসছিল। অজ্ঞানতার মধ্যে এদের আমি কি করে চিনবো? তবে মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো জ্ঞানও ফিরে আসত। পয়লা জানুয়ারি নারায়ণবাবু (বাবু নারায়ণপ্রসাদ সিংহ, গোরয়াকোঠি, ছপরা) এসেছিলেন। আমি ওঁকে চিনতে পারলাম। দু-একটা কথাও বললাম। দোসরা জানুয়ারি জ্বর ১০১° থেকে ১০৩° ডিগ্রি পর্যন্ত থাকলো। আর ৩ জানুয়ারি ১০১° থেকে ১০৩° ডিগ্রি পর্যন্ত। যদিও ৪ জানুয়ারিও ১০১° থেকে ১০৩° ডিগ্রি পর্যন্ত জ্বর ছিল, তবে আজ অজ্ঞানতা ছিল না। নিউমোনিয়ার ভয় ছিল, তাই ডাক্তার খুব সাবধানেই রাখছিল। ডাক্তার সেন আর ঘোষাল আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য খুব পরিশ্রম করেছিলেন। ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত পাঁচদিন জীবন ও মৃত্যুর মাঝে ঝুলছিলাম। ধূপনাথ অত্যন্ত বিমর্ষ ছিলেন, বুঝতে পারছিলাম, যে কোনো মুহূর্তে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তিনি তো এই পর্যন্তও ভেবে নিয়েছিলেন যে, পোড়াবার পর হাড়গুলো গ্রামে নিয়ে গিয়ে তার ওপর স্তূপ বানাবেন। পরে যখন আমি বিপদ কাটিয়ে উঠলাম, তখন দেখলাম ১০৩° জ্বরের টাইফয়েডের রুগীকে লোকে ধরে-বেঁধে রাখছে আর সে উঠে উঠে পালিয়ে যেতে চাইছে। আমি এই পুরো অসুখের মধ্যে না চেঁচামেচি করেছি, না আঃ উঃ করেছি, না ভুল বকেছি। আমি শুনে খুব খুশি হয়েছিলাম যে, অজ্ঞান অবস্থাতেও আমি রাম বা ভগবানের নাম নিইনি। আমি যে নাস্তিক এটা তার অকাট্য প্রমাণ ছিল। ধূপনাথ জানালেন, 'একবার আপনার মুখ থেকে ধর্মকীর্তির নাম বেরিয়ে ছিল।' এটা বেরোনো স্বাভাবিক ছিল। মৃত্যুর জন্য আমার একটুও আনন্দ বা দুঃখ ছিল না, কিন্তু আমার এটাই মনে হত যে, ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিককে আমি পুরোটা সম্পাদনা করে প্রকাশ করে উঠতে পারিনি। বেহুঁস অবস্থায় আমি কেবল গ্লুকোজের জল আর ছানার জল পথ্য পাচ্ছিলাম। ৫ জানুয়ারি বেদানার রস পেলাম। আজ জ্বর ১০০° ডিগ্রি ছিল। জ্ঞানও হারাইনি। ৬ জানুয়ারি জ্বর ছিল না। নিজের ঘরের চারদিকে আমি চোখ ফেললাম। দেখলাম সেখানে বাইশজন রুগী শুয়ে রয়েছে। আমার পাশের ১২ নম্বর খাটের রুগী ৬ সপ্তাহ ধরে টাইফয়েডে পড়ে আছে। জয়সওয়ালজী আজই মহীশূর থেকে ফিরলেন। খবর শুনেই মাইজীকে নিয়ে দৌড়ে এলেন। তাঁর খুব আফশোশ হয়েছিল যে তিনি কেন চলে গেলেন। কিন্তু প্রথম দিন কে ভেবে রেখেছিল যে এটা সাধারণ জ্বর নয়। এখন জ্বর ছিল না। ৭ তারিখে কমলা লেবু, বেদানার রস আর চারবার দুধও খেতে পেলাম। ৮ তারিখে কলার তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পেলাম। ৯ তারিখে মাংসের সুপ দেওয়া হল। ১০ তারিখেও ওই খাবারই থাকল, কিন্তু সকাল দশটা থেকে আবার শীত করতে লাগল আর দুপুরের পর জ্বর আসতে লাগল। রাতে সেটা ১০১° ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ডাক্তার বন্ধুদের বোঝালেন যে, চিন্তার কিছু নেই, স্বাভাবিক খাবার দেওয়াতে এমনটা হয়ে থাকে। জ্বর আর বাড়ল না কিন্তু খুবই দুর্বল লাগছিল। খাটে উঠে বসাও মুশকিল ছিল।'

—১৯৩৫—

২৭ ডিসেম্বর হাসপাতালে গিয়েছিলাম। ১৫ জানুয়ারি নটার সময় ওখান থেকে জয়সওয়ালভবনে চলে এলাম। পায়ে জোর ছিল না। খাট থেকে ধূপনাথ এবং অন্যান্যদের সহায়তায় মোটর পর্যন্ত পৌঁছতে পারলাম। এখন সকালে দুধ-রুটি আর দুটো করে ডিম, দুপুরে মাংসের সুপ আর ভাত, চারটের সময় টোস্ট আর ওমলেট, আর রাতে মাছ ভাত খাবার জন্য পাওয়া যেত।

১৬ জানুয়ারি লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু দু-চার পা হাঁটতেই পা জবাব দিয়ে দিল। দুর্গম পাহাড়ে চষে বেড়ান এই পা দুটোর বর্তমান অবস্থা দেখে আমার মন আফশোশ করতে লাগল। কিন্তু মনের কেবল পরমার্থের খেয়ালই ছিল না, উপরন্তু সে প্রমাণবার্তিক-এর জন্য আবার তিব্বত যাওয়া পাকা করে ফেলেছিল। ভয় হতে লাগল, পা যদি দ্রুত সেরে না ওঠে! ১৭ তারিখ থেকে খাবার সাথে সাথে দুবার করে টনিক পাওয়া যেত। ১৯ তারিখে তিব্বতী শিল্পী দেব্‌জোর্ পাটনায় এলেন। আমি তাঁকে তিব্বতের প্রথম বৌদ্ধমন্দির (জোখঙ্, লাসা)-এর একটি কাঠের মডেল বানানোর জন্য বলেছিলাম। তিনি মডেলটা সঙ্গে করেই এনেছিলেন। পরে সেটি পাটনার মিউজিয়ামে রেখে দেওয়া হয়েছিল। ২০ তারিখে লাঠির সাহায্য ছাড়াই যখন একটু হাঁটতে পারলাম তখন বড় আনন্দ হল।

২১ তারিখে ইংলণ্ডের বাদশাহ পঞ্চম জর্জ-এর মৃত্যু সংবাদ এল। সমস্ত অফিস বন্ধ হয়ে গেল। সেদিন আমি 'জাপান'-এর প্রুফ দেখতে চাইলাম কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্তি বোধ করতে লাগলাম। ২৩ তারিখে জয়সওয়ালজীর বাড়ি (বাঁকীপুর জেলের সামনে) থেকে স্টেশন পর্যন্ত বেড়াতে গেলাম। কিন্তু ফিরে আসার পর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। 'বাদন্যায়'-এর প্রুফ দেখার কাজ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু 'জাপান' আর 'দীর্ঘনিকায়'-এর প্রুফ দেখা বাকি ছিল। কিন্তু কয়েকটা পাতা দেখতে দেখতেই ক্লান্ত হয়ে যেতাম। শরীরের কয়েক সের মাংসের অভাব মানুষের শরীরকে কী থেকে কী বানিয়ে দেয়! ২৬ জানুয়ারি আমি লিখেছিলাম—'১৫ জানুয়ারি শরীরটা দু-মণের বোঝা মনে হচ্ছিল আজ হাঁটার পর বিশ সের মনে হচ্ছে। রোজ পাঁচসের করে বোঝা কমে কমে গেছে, এই হিসেবে চারদিন আরো লাগবে প্রকৃতিস্থ হতে।'

২৭ জানুয়ারি মুঙ্গের সাহিত্য সম্মেলনের জন্য ভাষণ লিখে দিলাম। সেদিন প্রাক্তন রাজার মৃত্যু এবং নতুন রাজার সম্বন্ধে পাটনার ময়দানে সর্বজনীন সভা হল। হাজার লোক ছিল, তার মধ্যে অর্ধেক ছিল স্কুলের ছাত্র। ড্রাইভার বলছিল, 'রায়বাহাদুর খান বাহাদুর পদবী পাবার জন্য অনেক খোসামোদকারীরা এসেছিল। আমার জন্য যদি বংশে বাতি দেবারও কেউ না থাকে, তাহলেও কিছু নয়।'

বরিয়ারপুর এবং মুঙ্গের—ধূপনাথ এখন সঙ্গে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি (২৯ জানুয়ারি) বরিয়ারপুর গেলাম। তাঁর ছোট ভাই বর্ম্ভা ইদানিং এখানে কনৈলীর তহসীলদার ছিলেন। বড় ভাই দেবনারায়ণ সিংহও এসেছিলেন। এখানে আমার কাজ ছিল—যত তাড়াতাড়ি এবং যতটা সম্ভব নিজের শরীরে মাংস জমা করা। সেজন্য এখানে দিনে মাংস, মাছ ডিম

চারবার পাঁচবার করে খেয়ে যাচ্ছিলাম। সামনে গঙ্গা বয়ে চলেছে। তার ধারে ধারে গম, যবের সবুজ ফসল দুলতে থাকত।

কয়েক বছর আগের কথা। গঙ্গা বেশ কয়েকটি গ্রামকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। লোকে পালিয়ে সড়কের পাশে আশ্রয় নিয়েছিল। জমিটা বনৈলীর রাজার ছিল, সেখানেই লোকজনেরা কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকছিল। ইংরেজ ম্যানেজার ওখান থেকে সরে যেতে বলল। কিন্তু বেচারারা যায় কোথায়? ওদের সব জমি তো ডাকাতরা ভাগ করে নিয়েছে। ম্যানেজার আগুন লাগিয়ে দিল। পাঁচশো কুঁড়ে ঘর জ্বলে গেল। কোথা থেকেও না কেউ খোঁজ-খবর করতে এল, না সরকার কোনো ন্যায় দেখাল। বৈষয়িক সম্পত্তি মানুষকে কত নিষ্ঠুর করে দেয়।

পয়লা ফেব্রুয়ারি মোটরে করে আমি মুঙ্গের গেলাম। দুবছর আগেও এই রাস্তা দিয়ে গেছি। আজ সম্মেলনের অধিবেশন ছিল। আমি আমার ভাষণ কষ্ট করে পড়লাম। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ারে বসার ক্ষমতা ছিল না। পরদিন বেশ কিছু বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ হল। সুবক্তা পণ্ডিত জনার্দন ঝা 'দ্বিজ' ঝাঁসির রানী বিষয়ক কবিতা পড়লেন।

৩ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাটনাতে থাকলাম। কলেজের বিদ্যার্থীরা সামনে দু-একটা বক্তৃতা দিয়ে, বাকি সময়টা প্রুফ দেখার কাজেই লাগাতাম। ৮ ফেব্রুয়ারিতে শরীর দেখতে আগের মতই মনে হল কিন্তু সে-পরিমাণে জোর পাচ্ছিলাম না—মাংস তো বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখনো তা ভালভাবে তৈরি হয়নি। ১২ ফেব্রুয়ারি ছাপরা হয়ে প্রয়াগে পৌঁছলাম। দুদিন প্রেসের কাজ দেখলাম। ১৪ ফেব্রুয়ারি বেনারস। সিংহলের শ্রীঅভয়সিংহ পরেরা দশ-বারো বছর ধরে ভারতে সংস্কৃত পড়ছিলেন। এবছর তিনি সংস্কৃত কলেজের ন্যায়াচার্যের শেষ পরীক্ষাটি দিচ্ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'ভোটিয়াতে বৌদ্ধ ন্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্লভ গ্রন্থ রয়েছে, ভারতীয় ন্যায়ের বিকাশকে ভালোভাবে বোঝার জন্য এইসব গ্রন্থের পাঠ অত্যন্ত জরুরি, কারণ এগুলোর মূল সংস্কৃত লেখাটি লুপ্ত হয়ে গেছে, আপনি যদি তিব্বত যেতে চান তাহলে পরীক্ষা দিয়ে নেপাল চলে আসুন। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো এবং টশী-ল্হুন্-পো-তে একজন বিদ্বানের কাছে পড়ার ব্যবস্থা করে দেব।'

বেনারস থেকে ছাপরার গাড়িতে উঠলাম। এবার ধূপনাথেরও নেপাল পর্যন্ত সঙ্গে যাবার ছিল। মাঝি স্টেশনে নেমে একমা গেলাম। অসহযোগের সময় একমাতে (১৯২১-২২) একটি হিন্দি মিডিল স্কুল ছিল। পরে আবার লক্ষ্মীনারায়ণ, প্রভুনাথ গিরীশ, হরিহর, রামবাহাদুর ইত্যাদি তরুণ মিলে একটি গান্ধীস্কুল খোলে যেটি অসহযোগের কয়েক বছর পর পর্যন্ত কোনোরকমে চলেছিল। সেটাই এখন একটি হাইস্কুলে পরিণত হয়ে গেছে, এটা দেখে আমার খুব আনন্দ হল। বিদ্যার্থীরা আমাকে কিছু বলতে বলল। আমি কিছু যাত্রার কথা জানালাম, আর ডিমের মাহাত্ম্যের কথাও। অনেকেই হয়ত অবাক হয়েছিলেন, তরুণ বিদ্যার্থীরা নয়, অবশ্যই বৃদ্ধ শ্রোতারা, যারা এখনও রামউদার বাবা বলে ডাকার জন্য জিদ করছিলেন। সেদিনই দুপুরে ধূপনাথের সঙ্গে ছাপরা এলাম। আর সন্ধের গাড়িতে নেপালের জন্য রওনা হলাম। ১৭-তে

সাতটার সময় রক্সৌল আর নটায় অন্য গাড়িতে করে আমরা অমলেখগঞ্জ পৌঁছে গেলাম।

তিব্বতে তৃতীয়বার, ১৯৩৬

শিবরাত্রির যাত্রী অনেক যাচ্ছিল। এইসময় পথ-করের প্রশ্নই ওঠে না। খোলা লরি এক টাকা করে নিয়ে ভীমফেরী পৌঁছে দিচ্ছিল। আড়াই ঘণ্টায় আমরা ভীমফেরী পৌঁছে গেলাম। এবার এই ভাল ব্যবস্থাটা দেখলাম যে, জিনিসপত্রের তল্লাসী ওপরে সীসাগড়িতে না করে এখানেই করে নেওয়া হচ্ছিল। এখন আমার শরীরে এতটা তাকত ছিল না। যাতে করে দুটি ডাঁড়া পার হতে পারি। ১৪ টাকা সাড়ে আট আনায় চারটি কুলির একটি খাট ভাড়া করা গেল। খাটে এতটা চেপে চুপে বসতে হত যে বেশ কষ্ট হত। সন্ধের মুখে আমরা সীসাগড়িতে পৌঁছলাম। আর কোথাও থাকার জায়গা না পেয়ে মন্দিরের আঙ্গিনাতেই শুয়ে পড়লাম। মাঝরাতে বৃষ্টি শুরু হল। তখন নিচের একটি ঘরে চলে এলাম। পরদিন (১৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেল পাঁচটায় চন্দ্রাগঢ়ীর ওপরে পৌঁছলাম। উৎরাই-এর সময় মাটি এত পেছল ছিল যে, লোকে পিছলে পিছলে পড়ছিল। সন্ধে সাড়ে ছটায় থানকোটের নিচে বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছলাম। আট আনা করে নিয়ে মোটর ইন্দ্রচৌক-তে পৌঁছে দিল। খোঁজাখুঁজি করে কোনোরকমে ধর্মমানশাহুর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। উৎরাই-এর পথে লোকজনকে পিছলে পড়তে দেখে, আমি খাটে বসা বোকামি হবে বিবেচনা করে পায়ে হেঁটেই এসেছিলাম। তাই কোমরে আর পায়ে ব্যথা টের পাচ্ছিলাম।

নেপালে

দশ বছর পর হেমিস লামাকে আজ এখানে দেখলাম। সেই সময় লাদাখে যখন তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল, তখন তিনি হিন্দি বলতে পারতেন না আর আমি তিব্বতী বলতে পারতাম না। এখন দেখলাম তিনি হিন্দিও বলছেন। তিনি তীর্থ করতে এদিকে এসেছিলেন। এখন লাদাখে ফিরছিলেন। ঞেনম্-এর জোঙ্‌পোন্‌ও এখানেই উঠেছিলেন। এখন একমাস তাঁর এখানে থাকার কথা ছিল। কিন্তু ততদিনে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে কিনা সন্দেহ ছিল আর হলও তাই। আমাকে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় দুমাস কাঠমাণ্ডুতে থাকতে হল। ধূপনাথের এখান থেকে ভারতে

ফেরার কথা ছিল। যদিও তাঁরও আমার সঙ্গে যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেকথা প্রকাশ করেন নি। তাঁকে নেপালের অনেকগুলো স্থান দেখিয়ে দেওয়া জরুরি ছিল। আমরা থাপাথলি গেলাম, এখনও ওখানে সাধু সেরকমই ছিলেন যেমনটা আমি তের বছর আগে দেখেছিলাম। পশুপতি এবং গুহ্যেশ্বরী দেখালাম, কিন্তু ধূপনাথের শ্রদ্ধা ছিল না। মহাবৌধা গেলাম। চৈনিক-লামা চা খাওয়ালেন। তিন ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা হল। এখন তিব্বতের বহু যাত্রী এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মহাবৌধায় এটা আমার চতুর্থবার আসা। আমি ধূপনাথকে কুঠরীগুলো দেখিয়ে বললাম যে, কেমন করে আমি সেখানে স্বেচ্ছা নির্বাসনে, একাকীত্বে কাটিয়েছি। এখন আমি প্রকাশ্যে ছিলাম। লোকজনেরা জেনেই যেত, কেননা এখানে দু-চারজন জিজ্ঞাসু আসতেই থাকতেন। একদিন কলেজের প্রফেসর পণ্ডিত গোকুলচন্দ্র শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল। তাঁর কাছ থেকে জানলাম যে স্বামী প্রণবানন্দ এসেছেন—লাহোরের ছাত্রাবস্থার বন্ধু সোময়াজুলু, যাঁকে আদর করে আমরা মিস্টার বলে ডাকতাম। ১৭ বছর পরে আজ এত কাছে এসেছেন, আর দেখা করার ইচ্ছে হবে না? যদিও তাঁর শরীর এখনও সেরকমই পাতলা ছিল, সেরকমই শ্যামল বর্ণ ছিল, কিন্তু মাথায় লম্বা লম্বা চুল ও মুখে লম্বা দাড়ি—এমন বেশ দেখে লোকের দ্রুত বিভ্রম হতে পারে, তবে আমার চিনতে অসুবিধে হয়নি। ১৭ বছর আগে আমরা দুজন একই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।পরে আমরা আপন আপন পা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছি, আর এখন কত তফাৎ। তিনি ঘর-সংসার ছেড়ে যোগী হলেন। ১৯২৬ পর্যন্ত তিনিও কংগ্রেসের কাজে লেগেছিলেন। পরে ব্রহ্ম আর যোগ তাঁকে নিজের দিকে টানল। তিনি একজন ভাল গুরু পেলেন আর দশ ঘণ্টা ধরে ধ্যান করতে লাগলেন। বলছিলেন, রোগের জন্য অপারেশন করতে হয়েছে। সেজন্য এখন চার-পাঁচ ঘণ্টাই ধ্যানে বসতে পারেন। প্রণবানন্দ রমণ-মহর্ষি এবং স্বামী সিয়ারাম (স্বর্গীয়)-এর একজন বড় প্রশংসাকারী ছিলেন। আমি তাঁর মুখ থেকে যোগ সম্বন্ধীয় কথাবার্তা শুনছিলাম, কিন্তু এসব শোনার স্পৃহা আমার মনে কোনো দিন হয়নি। বেশির বেশি আমি এটুকুই মেনে নিতে পারতাম যে, আমাদের যোগীরা হয়ত ক্লোরোফর্ম ছাড়াই অজ্ঞান হবার কোনো উপায় বের করেছেন। এরকম উপায়কে বোঝা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু আমার কাছে তার সময় কোথায়? সেই সঙ্গে আমার এটাও বিশ্বাস যে, যোগ মানুষের স্বভাবে কোনো পার্থক্য আনতে পারে না। এখনও 'মিস্টার'-এর মতই প্রণবানন্দ নিঃসঙ্কোচে বক্তৃতা দিতে পারেন। যখন প্রথমবার আমি সিংহলে ছিলাম (১৯২৭-২৯) তখন তিনি লাদাখ হয়ে মানস সরোবর গিয়েছিলেন। তখন থেকে তিনি কয়েকবারই মানস সরোবর ঘুরে এসেছেন। একবার তো বছরখানেকের ওপর ওখানেই ছিলেন। নতুন যোগী হওয়ায়, আমার মনে হয়, তিনি কোনদিন ইয়াকের কাঁচা মাংসের স্বাদ গ্রহণ করেন নি। হ্যাঁ, কৈলাসের আবহাওয়ায় আধ্যাত্মিকতার বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়—এটা, তাঁর বিশ্বাস। আমরা একজন আরেক জনকে এক মতের তৈরি করার জন্য উৎসুক ছিলাম না। তাই শুধু কথোপকথনেই আনন্দ ছিল। দু-চারদিন আমরা দু-জনে একই বাড়িতে রইলাম। আমরা আমাদের পুরনো জীবনের স্মৃতিচারণ করলাম। একটি ব্যাপারে আমরা

দুজনে এক ছিলাম, তিনিও তিব্বতের কষ্টকে স্বাগত জানাতে আনন্দ পেতেন, আমিও।

একদিন আমি নেপাল আর জাপানের তুলনা করছিলাম—(১) দুটি দেশই শস্য-শ্যামল ও ঠাণ্ডা, (২) দুটি দেশের মানুষই মোঙ্গল-কিরাত (মলাই)-শ্বেতাঙ্গ (অয়িনু অথবা ইন্দো-আর্য) মিশ্রিত জাতি, (৩) দুটি দেশের অধিবাসীই খুব পরিশ্রমী এবং সাহসী, (৪) আজ যদিও এ কথাটার কোনো গুরুত্ব নেই,কিন্তু ৬৮ বছর আগে দুটির শাসন ব্যবস্থাও প্রায় এক রকম ছিল—ওখানে মিকাডোকে আড়ালে রেখে শোগুন রাজত্ব করত, এখানে ধিরাজকে আড়ালে রেখে এখনও তিনসরকার রাজত্ব করছে। জাপানের চাষ-বাস, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি সমস্ত বিদ্যাই নেপাল নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারে।

ধূপনাথ ফেব্রুয়ারি ১০ থেকে ১৫ এই ছ-দিন ছাড়া ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুরোটাই আমার সঙ্গে ছিলেন। আজ তিনি যখন চলে যাচ্ছেন, তখন অবশ্যই আমার একটু দুঃখ হচ্ছিল। এরকম বন্ধুর অনুপস্থিতি দুঃখহীন কি করে হতে পারে? আমি নেপালে ছিলাম। জয়সওয়ালজীর ইচ্ছে হয়েছিল যে, নেপালটা ঘুরে দেখে নিই। আমিই লিখে দিলাম, নিশ্চয়ই আসুন। তারপর নেপাল সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেবার জন্য আমি রাজগুরু পণ্ডিত হেমরাজ শর্মাকে বললাম। তিনি সে-ব্যাপারে চেষ্টা করার দায়িত্ব নিলেন। এদিকে জ্যোতিষিরা আবার ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, ৩ মার্চ ভূমিকম্প হবে। ১৯৩৪-এর ভূমিকম্পের ফলে লোকে রীতিমত আতঙ্কিত ছিল। নেপালে অনেক ক্ষতি হয়েছিল। আমি ২ মার্চ লিখেছিলাম—'এখানে আগামীকাল ভূমিকম্প হবে বলে লোকজন এত আতঙ্কিত যে অনেক লোক ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে শুরু করেছে। এই মূর্খতার মানে কী? এরকম জ্যোতিষিদের তো সাজা দেওয়া উচিত। খ্যাতি আর প্রাপ্তির জন্য তো এরা লিখে দেয় আর সংবাদপত্রগুলোও তার লাভ ওঠায়, এদিকে অসংখ্য মানুষ হয়রান হচ্ছে। অনেকের ঘরে চুরি হয়ে যাচ্ছে।' ৩ তারিখে ভূমিকম্প হয়নি। এবার জ্যোতিষিরা ২০ তারিখে ভূমিকম্প হবে বলে জানায়।

৬ মার্চ জানা গেল যে, জয়সওয়ালজীর আসার ব্যাপারে অনুমতি পেতে একটাই অসুবিধে আছে—তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে আসবেন, সম্ভবত তিনি পশুপতির দর্শন করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর স্বামী বিলেত ঘুরে এসেছেন, সেজন্য পশুপতি দর্শন করতে পারবেন না। যাক্, রাস্তার অসুবিধে দেখে তিনি নিজেই এলেন না এবং পশুপতি-দর্শনেরও প্রয়োজন রইল না। ১৭ মার্চ অভয়সিংহ চলে এলেন। এখন তাঁকে তিব্বতের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। আমি তাঁকে তিব্বতী অক্ষর শেখাতে শুরু করে দিলাম। পয়লা এপ্রিল জয়সওয়ালজী, শ্যামবাবু এবং তাঁর সবচেয়ে ছোট ছেলে দীপকে সঙ্গে করে নেপাল পৌঁছে গেলেন। পরদিন, আমরা পশুপতি গেলাম। সঙ্গে 'সাহেব মানুষ' ছিলেন, তাই মন্দির-এর ভেতরে যেতে পারিনি। বাইরে বাইরেই দেখলাম।

পয়লা এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত জয়সওয়ালজী নেপালে রইলেন। তখন আমার বেশির ভাগ সময়টা তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন স্থান দেখতে লেগে যায়। ৫ তারিখে

আমরা মিউজিয়াম গেলাম। এখানে নতুন-পুরনো অস্ত্রের ভাল সংগ্রহ আছে। ছবিও ভাল আছে। মূর্তিগুলো সেরকম সুন্দর নয়, তবে কিছু মল্লদাতাদের পেতলের মূর্তিগুলো সুন্দর।

তিনটের সময় আমরা কম্যান্ডার-ইন-চিফ স্যার পদ্ম শামশেরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মধুর স্বভাব, স্পষ্টবাদী এবং ব্যবহারে অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি বলে মনে হল। আমার 'তিব্বতমে সওয়া বরস' তিনি মন দিয়ে পড়েছিলেন। বলছিলেন, 'সত্য বেশির ভাগ সময় অপ্রিয় হয়।' আমি তাতে কিছু কটু সত্যের কথা নিশ্চয়ই লিখেছিলাম। ফর্সা রঙ, লম্বা গড়ন, প্রায় সমস্ত চুল সাদা। তার মুখেই হৃদয়ের কোমলতা ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। একেবারে সাদা পোশাক পরেছিলেন। নেবার সম্প্রদায়ের লোক তাঁদের চিফ সাহেবের অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। বলছিলেন, ভূমিকম্পের সময় তিনি একলাই লোকজনের কাছে ঘোরাঘুরি করতেন। তাঁর বাড়িটিও ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছিল। দু বছর হয়ে গেছে, কিন্তু আজও তিনি সেটা বানাননি। তিনি একটি সাধারণ অস্থায়ী বাড়িতে থাকছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি নিজের প্রজাদের এবং নেপালের কল্যাণ চান। কিন্তু চাইলে কি হবে, তিনি যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ তাতে কিছু করাও সম্ভব নয়।

৭ এপ্রিল আমরা চাংগুনারায়ণ গেলাম। এই মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ে। মন্দিরটির বাইরে চারদিকে খুব সুন্দর কাঠের প্রতিমা দিয়ে সাজান হয়েছে। যেখানে সেখানে অনেক ভাঙাচোরা মূর্তি পড়ে আছে। সেদিনই আমরা স্বয়ম্ভূ চৈত্য দেখতে গেলাম। এককোণায় জয়ার্জুনদেবের শিলালেখ রয়েছে। এদিকে আমি কিছুদিন ধরে নেপালের রাজবংশাবলীর অধ্যয়ন করছিলাম। তা থেকে জানলাম, ৭৭০ নেপাল সংবত্ (১৩৫০)-তে বাংলার 'সুরত্রাণ শমসদীন ভাঁগরা' (সুলতান শমসুদ্দীন বাগরা) নেপালে এসেছিলেন। তিনি অনেক মন্দির ভেঙে দিয়েছিলেন। আমি নেপালের যেখানে সেখানে নাক-কাটা মূর্তি তো দেখেছিলাম, সেজন্য বংশাবলীটা মন দিয়ে দেখলাম। এই লেখা ওই কথাকেই পুষ্ট করছিল। আমি রাজগুরুর কাছে এই ব্যাপারটি নিয়ে একদিন কথা বললাম, তিনি বললেন, 'নেপালে কোনো মুসলমান বিজেতা পা ফেলেনি।' কিন্তু এই তিনটি প্রমাণ ওইটুকুতে কি করে খণ্ডন করা যায়? আমি জয়সওয়ালজীকে সব ব্যাপারটা খুলে বললাম, তারপর ওই শিলালেখটি দেখালাম। ব্যাপারটা একেবারে পরিষ্কার ছিল। ভারতে ফেরার পর জয়সওয়ালজী এই বিষয়ে একটি বয়ান দিলেন, যাতে নেপালের রাজবংশাবলীর ওপর কিছু লেখার ইচ্ছেও তিনি প্রকাশ করলেন। নেপাল দরবারের পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হল যে, ছাপানোর আগে বইটি একবার যেন তাঁকে দেখিয়ে নেওয়া হয়। অবশ্যই এটি ধৃষ্টতা ছিল। জয়সওয়ালজী যা কিছুই লিখুন না কেন ঐতিহাসিক সত্যের ওপর ভিত্তি করেই লিখতেন। তিনি এই কথা কি করে মেনে নিতেন? তিনি পরে তাঁর অসুনন্ধান করা তথ্য প্রকাশ করেন। ১২ এপ্রিল জয়সওয়ালজী ফিরে গেলেন। আমারও আর বেশিদিন থাকার প্রয়োজন ছিল না।

আমি আমার দু মাসের বসবাসে 'দীর্ঘনিকায়' এবং 'জাপান'-এর প্রুফ দেখার কাজ

শেষ করলাম, সেই সঙ্গে নেপালের বংশাবলী, মুদ্রা, তালপত্রেরও পড়াশুনো চালিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রচুর মুদ্রা পাটনা মিউজিয়ামের জন্য জমা করলাম। জানা গেল যে, একটি লোকের কাছে ৫০০ বছর আগেকার তালপাতায় লেখা একটি বেচাকেনার দস্তাবেজ আছে। আমি তার কিছু দেখলাম। এই পাতাগুলো উত্তর ভারতের তালগাছের, সেজন্য তেমন মজবুত নয়। এই তালপাতাগুলোর এককোণায় রাজার মোহর মারা থাকে। চিত্ত হর্ষের কাছে এরকম তিনশ তালপাতা জমা আছে। তাতে কেবল নেপালের রাজনৈতিক ইতিহাসই নয়, অর্থনৈতিক ইতিহাসের ওপরেও আলোকপাত সম্ভব।

রাজগুরু একদিন বললেন, 'তিব্বতমে সওয়া বরস'-তে আপনি এখানকার শাসকবর্গের ওপর যে মন্তব্য করেছেন, তাতে তারা বেশ অসন্তুষ্ট। সেজন্য আপনার অন্যান্য বইগুলো এদিকে আসতে বেশ বাধা পাচ্ছে। কাজেই ওই ব্যাপারটি যদি আপনি সরিয়ে দেন, তাহলে ভাল হয়। অসন্তুষ্টির আরো একটি প্রমাণ ২৪ মার্চ পাওয়া গেল। 'জাপান' এবং 'খুদ্দকনিকায়' (পালী)-এর প্রুফ ডাকে পাঠাবার আগে অভয়সিংহজী কাস্টম্ (ভনসার)-এর লোকদেরকে দেখাতে নিয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন, 'যতক্ষণ না আপনি 'তিব্বতমে সওয়া বরস'-এর একটি কপি দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা এটি পাঠাতে পারব না।' ওখানে কপি কোত্থেকে থাকবে। তারপর এই বইটি তো সরকার আটক রেখেছে। তাঁরা অস্বীকার করলেন। পরে গুরুজী চেষ্টা করে ওগুলো পাঠালেন। আমিও দেখলাম, আমার একটি বই-এর দায়ে অন্যটির পড়া থেকে পাঠক কেন বঞ্চিত হয়, সেজন্যে 'তিব্বতমে সওয়া বরস' -এর ৩৩ থেকে ৩৬ পৃষ্ঠা আবার লিখে নরম করে দিলাম।

৩০ মার্চ মহাদশমী ছিল। আজ পুরাতন রাজমহলে খুব বলিদান হল। মোষই কাটা গেল দেড়শো। নেপালে উজ্জয়িনীর দেবী হরিসিদ্ধির মন্দির আছে। আগে বারো বছর পর পর ওখানে নরবলি হত—বারো বছর পূর্ণ হওয়া তিন বছর হয়েছিল। শোনা যায়, সেই সময় পূজারী নাকি লুকিয়ে একটি বলি দিয়েছিল।

সীমার দিকে—১৫ এপ্রিল আমি কাঠমাণ্ডু থেকে বিদায় নিলাম। রাজগুরু পণ্ডিত হেমরাজ শর্মার মধ্যে জ্ঞান, বিদ্যার প্রতি ভালবাসা, সহৃদয়তা, কালচেতনা ও রাজনীতির জ্ঞানের সুন্দর সংমিশ্রণ রয়েছে। যখনই আমি এখানে এসেছি আমার কাজে তিনি সহায়তা করেছেন। ধর্মমান সাহু এবং তাঁর পুত্র আমাকে প্রথম যাত্রা থেকেই সহায়তা করেছেন। ধর্মমান সাহু এখন দুর্বল হয়ে পড়েছেন, এটা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল। ৭৪ বছর বয়স, তার ওপর হাঁপানির কষ্ট। তাঁকে দেখার সুযোগ যে আবার হবে সে আশা খুবই কম ছিল। জিনিসপত্র বইবার জন্য আমি চারটি ভারিকে (কুলি) ভাড়া করেছিলাম। শরীরে এখন যদিও আগেকার মতোই শক্তি পাচ্ছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও গুরুজী তাতপানী পর্যন্ত যাবার জন্য দুটো ঘোড়া দিয়ে দিলেন। তাতপানীর পরে ঘোড়া তো যায় না। জ্ঞানমান সাহুর সঙ্গে সাখু পর্যন্ত আমরা মোটরেই গেলাম। আজ সারারাত এখানেই থাকতে হয়েছিল। পরদিন (১৬ এপ্রিল) পাঁচটাতেই রওনা হয়ে গেলাম। এবার

—১৯৩৬—

দেবপুর-ডাঁড়া দিয়ে না গিয়ে নওঙ্লা দিয়ে পার হলাম। ভারিরা খুব আস্তে আস্তে চলছিল। সেদিন নবলপুর বাজারে থেকে যেতে হল। ভারির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু ওরা সারারাতেও এল না। বাজার ছিল, তবু সেখানে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হল না। জিনিসপত্রও সব ভারিদের কাছে ছিল। আমার চীবর যথেষ্ট শক্ত ছিল। হ্যাঁ, ছার আর পোকামাকড় খুব জ্বালাতন করেছিল। দ্বিতীয় দিন (১৭ এপ্রিল) ভারি ৭টার সময় এল। বোঝার জন্য দুটি ছেলে চলতে পারছিল না, তাই পিছিয়ে থাকতে হয়েছিল। এখান থেকে আমরা ১২টার সময় রওনা হলাম। সারাটা রাস্তা চড়াই উৎরাই ছিল। আমাদের ঘোড়া সাড়ে তিনটের সময় চৌতারা পৌঁছে গেল। কিন্তু ভারি পৌঁছল ৬টার সময়। এখানে একটি সহিস পেট খারাপের ভান করে বসলো। তাকে আমাদের ফেরত পাঠাতে হল। একজন ভারিও অসুস্থ হয়ে পড়ল। ফলে অন্য একজন লোককে তাতপানী পর্যন্ত যেতে নিতে হল। পরদিন (১৮ এপ্রিল) আমরা জলবীর পৌঁছলাম। এবার সেই বাজারটা ফাঁকা ছিল। ভাজা মাছও কোথাও ছিল না। মনে হয়, ফসল কাটার সময়ই জলবীরের বাজার জমে ওঠে। সামনে চড়াই ছিল। আর কিছুদূর পর্যন্ত তা এত কঠিন ছিল যে, ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে যেতে হল। পইরে গ্রামে থাকবার জন্য একটা তিনতলা বাড়ি পেলাম। কিন্তু ঘোড়ার জন্য খোঁজ করেও খড় পাওয়া গেল না। ওদের শুধু দানা খেয়েই থাকতে হল। ১৯ এপ্রিল আমরা দেবরালীর ডাঁড়ায় পৌঁছলাম। এটি সবচেয়ে উঁচু ডাঁড়া আর চড়াইও খুব কঠিন। পুরো চড়াই-এর রাস্তাটা পায়ে হেঁটে পার হতে হল। য়ন্‌লাকোট হয়ে চারটের সময় ঠাগম পৌঁছলাম। এটা বেশ বড় একটা গ্রাম। বাসিন্দারা নেবার। বেচারারা দোকান করতে এসেছিল কিন্তু ব্যবসার স্রোত অনেক বছর আগেই শুকিয়ে গেছে এখন চাষবাস করে দিন কাটায়। বহুকষ্টে একটা ঘর থেকে চাল পাওয়া গেল। পরের দিনও (২০ এপ্রিল) রাস্তা খারাপ পেলাম। খিন্নী গ্রামে মাইথান দেবীর থান আছে। মন্দিরের সামনে একটি পাথরের স্তম্ভের ওপর আছে পেতলের সিংহ। কর্ণেল গঙ্গাবাহাদুর বানিয়ে ছিলেন। এখানেও নেবারদের চার-পাঁচটি ঘর আছে। কিন্তু এরা ব্যবসায়ী নয়। আলু ইত্যাদির চাষ করে। আরো অনেক চড়াই পেরিয়ে শরবা সম্প্রদায়ের গ্রাম পাওয়া গেল। এখানে একটি মঠও আছে। নিচের দিকের গ্রামগুলোতে যব কাটা হয়ে গিয়েছিল, আর ওখানে শরবাদের গ্রামে যব এখনো একেবারে সবুজ ছিল। সেদিন আমরা দ্বিগুণ রাস্তা গেলাম। পরের দিন (২১ তারিখ) তাতপানী পৌঁছে গেলাম। গরমকুণ্ডে স্নান হল গুরুজীর ঘোড়া আর সহিস কেবল যাত্রারই সহায়ক প্রমাণিত হল না, বরং তাদের জন্য অধিকারীদেরও প্রভাবিত করা গেল। আমাদের একজন ভারির অভাব ছিল, ভনসারের কর্তৃপক্ষ নিজের লোক দিয়ে দিল। কুদারীর সেনা-শিবিরে অফিসার গুরুজীর সহিসকে দেখলো। সে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে বাধা তো দিল না, তবে নম্র হয়ে বলল, 'এরপর যখনই আসবেন একটা সরকারি চিঠি নিয়ে আসবেন, তাতে আমাদেরও সুবিধে হবে। এখন আপনাদের রাস্তা আটকালে কষ্ট হবে।' এখন আমরা পাঁচজন ছিলাম। তিনজন ভারি, অভয়সিংহ আর আমি। ভুটানের সীমাতে পৌঁছে চড়াই পাওয়া গেল। অল্প একটু হাঁটতেই পা জবাব দিয়ে দিল। আমরা তেজীগণ্ডে (রমইত) রাতটা থেকে গেলাম।

তিব্বতে

ড্যাম-এর কাছে এসেই আমরা রাতে বিশ্রাম নিলাম। সকাল ছটাতেই চলে গেলাম। শেকল দেওয়া পুলটা অভয়সিংহকে অনেক উৎসাহিত করে পার করাতে হল। ড্যামে আমরা নিচ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের এম্মো-র পরিচিতা ভুট্টি এবং ডুক্‌পা লামার এক শিষ্য বসে ছিলেন। ওদের সঙ্গে দেখা করলাম, কুশল বিনিময় হল। আবার সেখান থেকে রওনা হলাম। আজকের অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে চা খেলাম। এক জায়গায় গুনাস (পাহাড়ী অশোক)-এর লাল-গোলাপী ফুলের অদ্ভুত শোভা ছিল। পাতা একেবারেই নেই, চোখে পড়ছিল শুধু ফুল আর ফুল। রাস্তা দুর্গম ছিল। কোথাও কোথাও এত সরু যে প্রাণ কেঁপে উঠতো। সেইদিন ছটা নাগাদ আমরা ছোক্‌সুমের গরম জলের ঝর্ণার কাছে পৌঁছে গেলাম। কাল নেপালের সীমা পার হওয়ার পর এখন পর্যন্ত নটি পুল পার হতে হয়েছিল। এখন আমরা ন-দশ হাজার ফিট ওপরের জায়গাতে ছিলাম। এত ঠাণ্ডা ছিল যে অভয়সিংহ গরম জলের কুণ্ডে স্নানের ইচ্ছে ছেড়ে দিল। ২৩ এপ্রিল আড়াইটার সময় আমরা ঞেনম্ পৌঁছে গেলাম। রাস্তায় বরফ খুব কম পেয়েছিলাম। এই সময় পাহাড়ী মানুষেরা সব নুন বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল। ঞেনম্-এ আসা এটা ছিল আমার তৃতীয়বার। এবার চারদিন এখানে থাকতে হল। প্রথমবার তো একটু সন্দেহ হয়েছিল, কারণ এক জোঙ্‌পোন্ (জোঙনুব) অন্য জোঙ্‌পোন (জোঙ্‌শর্)-এর দিকে ঠেলে দিতে চাইছিল। নেপালে প্রথম জোঙ্‌পোন্-এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। লোকে বলছিল, দ্বিতীয় জোঙ্‌পোন্-এর স্বভাব কড়া। আমার কাছে নিজের লেখা তিব্বতী বই আর লাসা এবং সাক্যার অনেক ফটো ছিল। এইসব দেখে সে বলল, 'এমনিতে তো আচারা (সাধু) ইত্যাদিকে আমরা উপরে যেতে দিই না, তবে আপনি ধর্মের জন্য যাচ্ছেন, এটা আমরা দুই জোঙ্‌পোন্ কথা বলে ঠিক করে নেব।' শুনে আমার ধড়ে প্রাণ এল। সন্ধেয় জোঙ্‌নুব-এর কাছ থেকে চাল আর মাংস উপহার এল। আমরা উপহার নিয়ে জোঙ্‌পোন্‌দের কাছে গেলাম। জোঙ্‌নুব্ আমাকে খচ্চর ভাড়া করে দেবে বলে কথা দিল।

আমি সঙ্গে টাকা নিয়ে যাইনি। টাকা শাহু ধনমানের ওখানে জমা রেখে দিয়েছিলাম। তিনি ঞেনম্-এর যে ব্যবসায়ীকে টাকা দেবার জন্য চিঠি লিখে দিয়েছিলেন সে ইতস্তত করতে থাকলো। আমি নিজের ভুলের জন্য আফশোশ করতে লাগলাম। দু-তিনশো টাকার নোট কি আর এমন ভারি হয়? যাই হোক, তিনিও পরে কিছু চিন্তা করলেন আর আমাকে একশ টাকার তিব্বতী মুদ্রা দিয়ে দিলেন। শিগর্চের ফটোগ্রাফার তেজরতন তার ভুটিয়া স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছিলেন, ফলে আমি রাস্তার সঙ্গীও পেয়ে গেলাম। পরদিন (২৭ এপ্রিল) আমি জোঙ্‌নুব্-এর ওখানে গেলাম। ওখানে তাঁর পরিবারে কিছু ছবি তুললাম। তিব্বতের মহিলারা যে কত নির্ভীক মন, সেটা বোঝা গেল জোঙ্‌নুব্-এর চাম্ (স্ত্রী) পুরুষের পোশাক পরে ছবি তোলাতে। এদিককার যাত্রা, এখানকার ঠাণ্ডা ও নতুন শিষ্টাচারগুলো জানার ব্যাপারে উপেক্ষা ও নিস্পৃহতা দেখে আমি অভয়সিংহকে বললাম,

'এখন তো আমরা তিব্বত অঞ্চলে পৌঁছেছি, সামনে আরো অনেক কষ্ট আছে। এখান থেকে নেপাল যাওয়া সহজ।' তিনি এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

২৮ এপ্রিল নটার সময় আমরা ঞেনম্ থেকে রওনা হলাম। আমরা ছজন ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে ছিলাম। আমি, অভয়সিংহ, তেজরত্ন, তাঁর স্ত্রী এবং আরো দুজন নেপালী। জোঙ্-এর ভৃত্যটিও ঘোড়ার পিঠে যাচ্ছিল, সঙ্গে একজন খচ্চরওয়ালা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আমার অনেক মালপত্র তো তাড়ু (ঘোড়ার পিঠে রাখা চামড়ার থলি)-তে ভরা ছিল। কাপড়-চোপড়ও ঘোড়ার পিঠেই ধরে গিয়েছিল। আরো জিনিসপত্রের জন্য দুজন লোক ছিল। আমার চড়বার জন্য একটি খচ্চর ও অভয়সিংহের জন্য একটি রোগা ঘোড়া পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম বিরতি-স্থল হল চাঙ্দোওমা-তে। জোঙ্শর্ও সদলবলে সেখানে পৌঁছল। পুরো গ্রামের লোকেরা এগিয়ে এসে ওকে আদর অভ্যর্থনা জানাল। আমরা যে ঘোড়াগুলো পেয়েছিলাম তার ভাড়া জোঙ্নুবকে দিয়েছিলাম। কিন্তু জোঙ্-এর লোক ধরে-বেঁধে বিনে পয়সায় ঘোড়া নিয়ে আমাকে দিচ্ছিল। পরদিন নতুন ঘোড়া আসতে দেরি হয়ে গেল, তাই দশটার পর রওনা হলাম। ঘোড়াগুলো একটু ভালো ছিল।

অভয়সিংহের ঘোড়া ছোটাতে ইচ্ছে হল, সে এগিয়ে গেল। ঘোড়াওলা খুব রেগে গেল। কিন্তু তাকে বোঝাবে কে? ঞেনম্ পর্যন্ত গিয়েই এটা বোঝা গিয়েছিল যে ও কিছু শেখে তো নিজে থেকে শিখবে, কাউকে গুরু মেনে নয়। সেই রাতটা আমরা থুলুঙ-তে থাকলাম। জায়গাটা ১৫ হাজার ফিটের চেয়ে কম উঁচু নয়। অভয়সিংহের সারা রাত ঘুম আসেনি। আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমি লাদাখে দ্বিতীয়বারের যাত্রায় দেখেছিলাম— একজন সেপাই-এর ওখানে পৌঁছনমাত্র নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। যতক্ষণে ওর ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা হল, ততক্ষণে সে মারা গেল। উচ্চতার জন্য যদি ফুসফুসের কষ্ট থেকে অভয়সিংহের এটা হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই বিপজ্জনক ব্যাপার। যাই হোক, সকাল পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেল।

পরদিন (৩০ এপ্রিল) আমরা থোঙ্লা পার হয়ে ৫ টাব সময় লঙ্কোর পৌঁছলাম। অভয়সিংহ প্রসিদ্ধ বৈদ্য হয়ে গেলেন। লোকজন তাঁর কাছে ওষুধ নিতে আসছিল। বাড়ির মালিকের সিফিলিশ (উপদংশ)-এর অসুখ ছিল। তাঁকে ওষুধ দেওয়া হল। সঙ্গীদের মধ্যে দুজনের মাথা ব্যথা হচ্ছিল। যদিও লঙ্কোরও ১৩ হাজার ফিটের চেয়ে কম উঁচু নয়, কিন্তু আমরা অত্যন্ত ঠাণ্ডা জায়গা হয়ে এসেছিলাম তাই গরম লাগছিল। লঙ্কোর থেকে আবার রওনা হলাম আর সাড়ে তিন ঘণ্টায় তিঙ্রী পৌঁছে গেলাম। জোঙ্পোন্-এর এইখানেই থাকার কথা ছিল, সেজন্য আমাদেবও এখানেই থেকে যেতে হল। এখন তিঙ্রীর মাঠের ঘাস হলুদ হয়ে গিয়েছিল। ক্যাঙ্ (জংলী গাধা)ও কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। যেখানে-সেখানে মাটি থেকে আপনা থেকেই জল বেরিয়ে আসছিল। ২ মে আমরা চা-কোর্ পৌঁছলাম। জোঙ্পোন্ এখানেও এসেছিল। আর মহাপণ্ডিত, ন্যায়চার্য খচ্চরওলা এবং খচ্চর সবাইকে এক ঘরে রেখে দেওয়া হল।

ফক (৩ মে) ছিল পরের বিরতি-স্থল। রাগ, কথা না শোনা আর ওখানকার ঢঙঢাঙ

শেখার ব্যাপারে অবহেলা এইসব অভয়সিংহের মধ্যে সব সময় ছিল। কোনো উপায় ছিল না। আমার মনে হল, সাক্যাতে রাখার চেয়ে তাঁকে শিগর্চে পাঠিয়ে দেওয়া ভালো। আর লোকজনও যাচ্ছিল, কাজেই অসুবিধে হবে না। রঘুবীরকে চিঠি দিয়ে দেব। তিনি তাঁর ব্যবস্থা করে দেবেন। পরদিন সন্ধেয় আমাদের ছোন্‌দু পৌছনোর কথা ছিল। গতবার নেপাল যাবার সময় আমি একটা ডাঁড়া (জোত) পার হয়েছিলাম। এবার আমরা পাহাড় পরিক্রমা করতে করতে নিচের দিকে নামছিলাম। অনেক জায়গাতে মাটি থেকে সোডা বেরিয়েছিল, যার জন্য ঘোড়ারও কাশি হচ্ছিল। সামনে আতাবুর বানানো বালির পাহাড় দেখা গেল। লোকে বলে, এই পিশাচ এক ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ মণ বালি উঠিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় রেখে দেয়। কয়েক লক্ষ মণ বালির টিলা আমি অবশ্যই দেখেছি। কিন্তু আতাবুকে দেখা গেল না। আজ ঝড় ছিল না, তা না হলে আমরাও আতাবুর খপ্পরে পড়তাম আর লক্ষ মণ বালি আমাদের ওপর এসে পড়ত। রাতে ছোন্‌দুতে থাকলাম।

সকালে (৫ মে) ঘোড়াদের এগিয়ে দিয়ে আমরা মব্‌জায় পৌছলাম। জানা গেল, কুশো ডোনির্‌লা সাক্যা গেছেন। তাঁর মা চা খাবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু সঙ্গীদের এগিয়ে চলে যাওয়ার ভয়ে আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। তিনটের সময় ডোঙ্‌লার জোতে পৌছলাম, আর সন্ধে পর্যন্ত লুগ্‌রাতে। একটি বড় বাড়ির কাছে ছজনের শোবার মতো একটা একেবারে ছোট কুঠরী পাওয়া গেল। আমি জাহিদান-এর যাত্রায় এর থেকে বেশি অসুবিধে ভোগ করেছিলাম। কাজেই এখানের অসুবিধেয় কিসের পরোয়া? এখন সাক্যা এক-দেড় ঘণ্টার রাস্তা ছিল। তেজরত্ন আর অন্যদের শিগর্চে যাবার ছিল। আমি অভয়সিংহকে বুঝিয়ে বললাম, 'না আমার দোষ, না আপনার দোষ। দু-এক সপ্তাহ নিরন্তর একসাথে থেকে চেষ্টা করেও যদি মানুষের মন না পাওয়া যায়, তাহলে বুঝতে হবে দুজনের স্বভাবে পার্থক্য আছে। এখন আর সঙ্গে থাকা শুধু কটুতার কারণ হবে। এমনিতে তো কয়েক মাস থাকার পর আমাকে তিব্বত থেকে চলে যেতে হবে। আর আপনাকে দু-তিন বছর থাকতে হবে। আমি রঘুবীরকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, ওখানে আপনার থাকবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আপনি চলে যান।' আমার কথায় কোনোরকম কটুতা বা ক্রোধের চিহ্ন ছিল না। আমি রঘুবীরকে চিঠি লিখে দিলাম। ভারতে পাঠাবার জন্য কত চিঠিই তো লিখে দিয়েছি। খাবার-দাবারের জিনিসগুলো তাঁকে দেবার সময় যখন আমি কিছু টাকা তাঁর হাতে দিতে গেলাম তখন তিনি হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। এখন পর্যন্ত আমি তাঁর একটি রূপকেই দেখেছিলাম, এরপর আমি আর তাঁকে শিগর্চে যাবার জন্য বলিনি। তিব্বতে যখনই দুজনকে একসাথে বেশিদিন থাকতে হয়েছে, তখনই আবার সেই অসুবিধে হয়েছে। আমি অভয়সিংহকে দোষ দিতে পারি না। বীণার তারের মতো মানুষের হৃদয়ে এমনি কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে, যেখানে মিলে যায় সেখান থেকে মিষ্টত্ব কখনও সরে যায় না। আর যেখানে মেলে না সেখানে মারামারি করেও তাকে মেলানো যায় না। দিনে-রাতে অজান্তে মানুষ পরিহাসে, রাগে, দুঃখে বুদ্ধিমানের মতো, বোকার মতো পাগলের মতো না জানি কত কিছুরই মতো

কথা বলে, কাজ করে। কিন্তু অন্য মানুষের মনে যদি সামান্যও ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায়, সহৃদয়তা না থাকে, তাহলে প্রত্যেক জায়গাতে তার সন্দেহ হতে থাকে।

৬ মে আমরা দুজন খুব সকালে সবার আগে বেরিয়ে গেলাম এবং দেড় ঘণ্টায় (সাড়ে সাতটায়) সাক্যা পৌঁছে গেলাম। রাস্তায় জল এখনও বরফ হয়েছিল। গাছে গাছে সবুজ কুঁড়ির মতো পাতা আসছিল। খেতে সবে লাঙল দেওয়া শুরু হচ্ছিল। ডোনির ছেন্‌পো খোলা মনে স্বাগত জানালেন। অচা দিকীলা সবচেয়ে ওপরের তলায় একটি ঘরে আমাদের বিশ্রামের জায়গা করে দিলেন।

সাক্যাতে—চাম্‌কুশো ছেরিঙ্‌ পল্‌মো সে-সময় একটা বিহারে পুজো ও ধ্যান করতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ডোনির্‌ ছেনপো, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী দিকীলা, শালা ডোনির্‌লা এবং তার স্ত্রী ছিলেন। ডোনির্‌লা-র ছোট্ট মেয়ে মারা গিয়েছিল এবং পরের প্রজন্মের জন্য ঘর আবার শূন্য ছিল। রান্না করার পুরনো লোক অনি এখনও ছিল। জানা গেল যে, জাপান থেকে পাঠানো চিত্রাবলী এখনও তাঁর কাছে এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু আমার চিঠি পৌঁছে গিয়েছিল যাতে চিত্রাবলীর উল্লেখ ছিল।

সাক্যার মোহান্তরাজ দগ্‌ছেন্‌ রিন্‌পোছে-র গত বছর মৃত্যু হয়েছিল, আর এখন ফুন্‌ছোগ্‌ প্রাসাদের লামার গদিতে বসার কথা ছিল। এখনও দেখাশোনার দায়িত্ব তারা (ডোল্‌মা) প্রাসাদের হাতেই ছিল। বিকেল চারটেয় তারাপ্রাসাদে গেলাম। কিছু এমনি জিনিসের সঙ্গে তিব্বতে সংস্কৃত বইয়ের তালিকা উপহার দিলাম। চা খেলাম। কিছুক্ষণ দুই ছেলের সঙ্গে কথা বললাম, আর তারপর বৃদ্ধা দামো, (মোহান্ত রানী) এবং তরুণী দামোর সঙ্গেও কুশল জিজ্ঞাসা হল। ফুন্‌ছোগ্‌ প্রাসাদের লামা এখন ল্‌হাখঙ্‌ছেন্‌মো-র মহাবিহারে গিয়েছিলেন। ওখানে গেলাম। লামা সেরকমই হাসিমুখে আন্তরিকতার সঙ্গে দেখা করলেন।

৬ মে থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাস সাক্যাতেই থাকতে হল। পরদিন দুই প্রাসাদ থেকেই চা, ছাতু ও মাংস উপঢৌকন এলো। সাধারণত দরবারী উপঢৌকন যেমন হয়—ব্যবহারের জিনিস খুবই কম ছিল। ছাতু পুরনো, পচা, খস্‌খসে, মাংস শুকনো ও পোকা ধরা, মাখনও খারাপ। মনে হয় দুনিয়ার সব দরবারেরই এই অবস্থা। প্রেরক নিজে তো এই জিনিসগুলো দেখে না। চাকর-বাকরেরা মনে করে, এই ছোট ছোট ব্যাপারে মহারাজের কাছে একজন মস্ত লোক কি করে নালিশ করবে? অতএব ভাল জিনিসগুলো নিজের কাছে রেখে পচা-গলা জিনিসগুলো কেন পাঠানো যাবে না? যাই হোক, আমার তো উপঢৌকনের দরকার ছিল না। ওদের প্রসন্নতাই আমার কাম্য ছিল। আর দুটি প্রাসাদ (ফোটাঙ) আমাকে সহায়তা দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমি দুপুরে ভোজন সেরে ফুন্‌ছোক্‌ লামার কাছে গেলাম। তাঁর বাইরের দুনিয়ার কথা শোনার ভীষণ ইচ্ছে ছিল, রাজনীতির জ্ঞানের জন্য নয়, কেবল মনোরঞ্জনের জন্য। জাপানের বিষয়ে কথা হল, চীনের বিষয়ে, তারপরে ভারতের বিষয়ে। রাশিয়ার কথা আমি বলি নি, সেখানকার কথা জানার জন্য তিনি তেমন উৎসুকও ছিলেন না। সেই সময় ভিক্ষুরা

কন্-জুর পড়ছিল। আর দেবতাদের আনা বিশাল স্তম্ভযুক্ত হলঘর কথক-ভিক্ষুতে ভরে ছিল। লামা দুবার আমাকে নিয়ে পাঠরত ভিক্ষুদের মধ্য দিয়ে ঘুরে এলেন। বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন, 'কোনো জিনিসের প্রয়োজন আছে? আমার প্রয়োজনগুলোর দায়িত্ব ডোনির্ছেন্পো নিয়ে নিয়েছিলেন। বইপত্র ছাড়া আর কিসের প্রয়োজনই-বা ছিল? ঙোরগুম্বার খেন্-পোও এখন এখানেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও দেখা করতে গেলাম। আনন্দের কথা এটাই যে, ভারত থেকে পাঠানো ছবি তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। গেশে ধর্মবর্ধনের বিষয়ে সবাই খুব জিজ্ঞেস করছিলেন।

৮ মে দুপুরের পর 'বার্তিকালংকার' (প্রজ্ঞাকর গুপ্ত কৃত 'প্রমাণবার্তিকভাষ্য')-এর বই এসে গেল। বিভূতিচন্দ্র ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভে কাগজে এর দেড় পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন। প্রথমবার যখন সাক্যাতে আমি এসেছিলাম তখনই অর্দ্ধেক পরিচ্ছেদ লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। এখন অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ পরিচ্ছেদ লেখার ছিল। যদিও পুরো বইটি (তিনটি পরিচ্ছেদ) ছিল না, তবে একেবারে না পাওয়ার থেকে অর্ধেক পাওয়াও মঙ্গলের। অভয়সিংহের এই অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, কারণ বইটি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর লিপিতে লেখা হয়েছিল। পাতাগুলো বড় এবং অক্ষর ছোট ছিল। সেজন্য একদিনে দু-পাতার বেশি লেখা আশা করতাম না। সেদিনই সর্দি হয়ে গেল। আর তিন-চার দিন পর্যন্ত চলতে থাকল। তবে ডাক্তার তো বাড়িতেই ছিলেন, দুধ-জল গরম করে খাওয়ানো হল। ১১ মে একটু জ্বরও এল। সেটাও সর্দির জন্যেই। ঋতুও প্রতিকূল ছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং আশেপাশের পাহাড়ে বরফ পড়েছিল। আমাদের ছাতের ওপরে তো বরফের কয়েকটি কণা শুধু পড়েছিল। মাথায় হাল্কা ছুঁচের মতো যখন-তখন ফুটে যেত। কিন্তু আমি আমার কলম আলগা করিনি—কাজ হল আসল জিনিস, জীবন তো চলমানই।

১৩ মে-র ঠাণ্ডার জন্য আমার হাত একটু ফেটে গিয়েছিল। টনসিলেও ব্যথা হতে লাগল। এখনও গাছে সবুজ পাতা গজায়নি। মাথায় ব্যথাটা তো কম-বেশি সব সময় হত। ১৯ তারিখে 'বার্তিকালংকার'-এর প্রাপ্য অংশটুকু লিখে শেষ করে ফেললাম। তারপর লিখে ফেলা পাতাগুলোকে আবার মেলানোর কাজ শুরু করলাম। যেহেতু ঙোরখেন্পোর এখন তাঁর মাঠে যাবার ছিল না, আমারও তাই ওখানে গিয়ে কোনো লাভ ছিল না।

আমার বন্ধু কুশো ডোনির্ছেন্পোর সঙ্গে ফুন্ছোগ্-প্রাসাদের নতুন মোহান্তরাজের বেশ ঝগড়া ছিল। কিন্তু আমার প্রতি দুজনেরই গভীর স্নেহ ছিল। দামো (মোহান্ত রানী) দু-একবার অবশ্যই ডোনির্ছেন্পো এবং তাঁর দুজন চাম্-এর বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন কিন্তু লামা কোনোদিন কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। আমি যখন যেতাম পাঁচ-ছয় ঘণ্টার আগে আর কোথায় ফিরতাম! যাবার সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হত, প্রতিহারী শ্রীগর্ভে নিয়ে যেত। যেখানে লামা এবং দামো বসে থাকতেন। আমার জন্যে একটি চেয়ার চলে আসত। আমি আগেই বলেছি, তিব্বতে সাক্যা লামার সম্মান দালাই লামা এবং টশী লামার মতো করা হয়। তাঁর সামনে সবাই খুব নিচের আসনে বসেন—ভিক্ষু হোন বা

গৃহীই হোন। কিন্তু আমার জন্য চেয়ার অবশ্যই আসত। আর লামার দুই জেচুন্মা (= ভট্টারিকা)ও চা আনানোর ব্যাপারে বা অন্য কোনো খাবার-দাবার আনতে তৎপর থাকতো। সাক্যার দুই প্রাসাদের কন্যাদের সম্মানার্থে জেচুন্মা বলা হয়। এই বংশকে এত পবিত্র ধরা হয় যে কেউ এই বংশের মেয়েদের বিয়ে করত না। গোড়ার দিকের মুঘল সম্রাটদের মতো কয়েক শতাব্দী ধরে এই বংশের মেয়েদের আজন্ম কুমারী থাকতে হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাদের চুল কেটে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে ভিক্ষুণী বানিয়ে দেওয়া হয়। মা-বাবা বেঁচে থাকা পর্যন্ত তো তারা ওঁদের সঙ্গে থাকে, তারপর কোনো ছোট প্রাসাদে আলাদা থাকতে আরম্ভ করে। এইরকম ছোট প্রাসাদ সাক্যাতে অনেক আছে। তারা চাকর-বাকরও পায়। খাওয়া-পরার দিক দিয়ে তাদের জীবন আরামের হয়। কিন্তু তাদের পক্ষে পুরুষের সংসর্গ পাওয়া মুশকিল। আমাদের লামার দুটি মেয়ে দশ-বারো বছরের ছিল। ডোনির্ছেন্পোর লামার সঙ্গে বনিবনা না হবার কারণ ছিল লামার ছোট ভাই। তিব্বতের রীতি অনুসারে রাজাই হোক বা ভিখিরি হোক, সব ভাইদের একটাই স্ত্রী হয়। দামো (মোহান্ত রানী) তাঁর দেওরকে সামলাতে পারেননি। সে নিজে অন্য একটি বিয়ে করেছে—এই বংশে নিজের মেয়ে দান করাকে তিব্বতের সব সামন্তরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন। বিয়ে করে সে আলাদা থাকতে শুরু করে। খরচ-খরচার অসুবিধে ছিল। সেই সময় সিংহাসনে তারাপ্রাসাদের লামা ছিলেন। তিনি ছোট ভাইকে কিছু জায়গীর দিয়ে দেন। বড়ভাই এবং বৌদি এটা পছন্দ করতেন না। সিংহাসনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকলো না। ডোনিরছেনপোও ছোট ভাই-এর পক্ষ নিয়েছিলেন, ফলে তাঁর সঙ্গেও মনোমালিন্য হয়ে গেল। ছোটভাই কয়েক বছর হল মারা গেছে। ওর দামো এখনও রয়েছেন, ঘরে কোনো সন্তান নেই। ডোনির্ছেন্পো নতুন মোহান্তরাজের শুধু ক্রোধটাই পেয়েছিলেন। তাঁর ভয় যে, সিংহাসনে বসতেই তাঁর পদ চলে যাবে।

সেদিন (২১ মে) মোহান্তরাজ বললেন, 'ভোর নিয়ে যাবার জন্য আমি ঘোড়া দেব। তিব্বতের সমস্ত সাক্যা সম্প্রদায়ের মঠের জন্য আমি পরিচয়পত্র দেব।' তিনি এটাও বললেন যে, সাক্যায় অনেক তালপাতার পুঁথি আছে সেগুলো ভালো করে খোঁজা উচিত। আমি আমার দেখা ছাদে গ্রন্থাগারগুলোর নাম বললাম। মোহান্তরাজ বললেন, 'একবার ল্হাখঙ্ছেন্মোর ছাদে ছগ্‌পে-ল্হাখঙ্ নামে ছোট গ্রন্থাগারটিও খুলিয়ে দেখো।' এখন তারাপ্রাসাদের তরফ থেকে ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। আমি সেদিন ফিরে এসে ডোনির্ছেন্পোকে বললাম। তিনি বললেন, 'আমি এর জন্য প্রাসাদে অনুরোধ জানাবো।'

২৫ মে-র স্মরণীয় দিনটি এল। তারাপ্রাসাদ থেকে খবর এল, 'ছগ্‌পে-ল্হাখঙ্-এর চাবি পাওয়া গেছে, আমাদের অফিসার সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত।' আমি দুপুরে 'ছগ্‌পেল্হাখঙ্ গেলাম। তার সোজা, লম্বা, ভীতিপ্রদ সিঁড়িগুলো দিয়ে ওঠার সময় আমার মনে খুব কমই আশা ছিল যে, ওখানে কোনো সংস্কৃত বই থাকতে পারে। ছাদের ওপরে পৌঁছে ডানদিকে ঘুরলাম। প্রথম কুঠরীটি বাইরে থেকে দেখে অত্যন্ত সাধারণ মনে হচ্ছিল। কয়েকশো বছরের পুরনো দরজা এবং চৌকাঠ দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিদ্রূপ করছে। ভিক্ষু অফিসার সিল ভাঙলেন, তালাতে জড়ানো কাপড়টা আলাদা

করলেন, চাবি ঘোরালেন, তালা খুলে গেল। দরজাটা পেছনের দিকে ঠেললেন। জানি না কত বছরের ধুলো জমা হয়ে ছিল। একবার এত ধুলো উড়লো যে ঘরটা যেন ধোঁয়ায় ভরে গেল। একটু অপেক্ষা করে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। মেঝেতেও পায়ের ছাপ পড়ার মতো ধুলো ছিল। ঘরের চারদিকে দেওয়ালের গায়ে কাঠের তিনতলা-চারতলা তাক করা ছিল, তার ওপরে কাপড়ে জড়ানো অথবা খোলা ও বাঁধা অবস্থায় কয়েক হাজার বই ছিল। এগুলোর মধ্যে সাত-আটশো বছরের পুরনো বই ছিল। এগুলো হল সেই সব বই যা তিব্বতের ঐতিহাসিক পণ্ডিতরা নিজের হাতে লিখেছিলেন বা পড়েছিলেন। তিব্বতী সাহিত্য ও ইতিহাসের জন্য এগুলো অমূল্য রত্ন। কিন্তু আমি তো আমার সময় আর শক্তি অনুসারেই কাজ করতে পারি। আমার প্রয়োজন ছিল সংস্কৃতে লেখা তালপাতার পুঁথিগুলো। এদিকে-ওদিকে হাত দেওয়ার পর তালপাতার পুঁথিতে হাত পড়ল। এগুলোতে কাপড় জড়ানো ছিল না। দুটো কাঠের পাটার মাঝে মোটা দড়ি দিয়ে এপার-ওপার ফুটো করে বাঁধা এই বইগুলো এক জায়গায় পাওয়া গেল। এক, দুই তিন, চার,·· কুড়িটি বই বেরিয়ে এল। কিছু আবার তিব্বতী পুঁথির মাঝে ছিল। আমি খুলে দেখতে শুরু করলাম। আমার আনন্দের সীমা থাকলো না, যখন দেখলাম যে বার্তিকালংকার (প্রমাণবার্তিকভাষ্য)-এর সম্পূর্ণটা এখানে আছে। কর্ণক গোমি কৃত সবৃত্তিটীকাও রয়েছে।—অর্থাৎ 'প্রমাণবার্তিক'-এর টীকা ও ভাষ্য! মহান দার্শনিক অসংগ-র গুরুত্বপূর্ণ বই 'যোগাচারভূমি'ও সেখানে ছিল। চান্দ্র ব্যাকরণের টীকাও দেখলাম। একটি বই তামিল অক্ষরে লেখা ছিল, অন্যটি সিংহলীতে। আমি 'বার্তিকালংকার ও 'স্ববৃত্তিটীকা' সঙ্গে নিয়ে চলে এলাম। এখন সাক্যাকে এক্ষুণি ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্ন কি করে আসে? যদিও আমার কাছে ক্যামেরা ও ফিল্ম ছিল, কিন্তু ওখানে ধোবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য আমি ফটোর ওপর ভরসা করতে পারছিলাম না। এখন শুধু লেখারই চিন্তা। অভয়সিংহের এখন অক্ষরের সঙ্গে একটু পরিচয় হয়েছিল, দ্বিতীয়ত, তিনি যে কখন দুর্বাসা হয়ে যাবেন তার কোনো ঠিক নেই। ২৬ তারিখে আমি 'স্ববৃত্তি' ও অভয় 'বার্তিকালংকার' লেখা শুরু করে দিলাম। দু-চার দিন পর অভয়সিংহও লেখার হাত বাড়িয়ে ফেলল। ১৫ জুন পর্যন্ত অভয় 'বার্তিকালংকার'-এর অর্ধেকটা লিখে ফেলল। অভয়সিংহের সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না দেখে আমি ভাবলাম তাকে টশী-ল্হুন্-পো পাঠিয়ে দেওয়া যাক। পরদিন (১৬ জুন) ঘোড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল, এবং সে সাক্যা থেকে রওনা হয়ে গেল। আমি রঘুবীর এবং অন্যান্য বন্ধুদের চিঠি লিখে দিলাম। ওখানে থাকার জন্য কয়েক মাসের খরচাও দিয়ে দিলাম। এও বলেছিলাম যে, ঙোর ও শলু হয়ে টশী-ল্হুন-পো আমাকে যেতেই হবে। তখন আমি আরো কিছু ব্যবস্থা করবো। অভয়সিংহ রাতে অনেক চিঠি লিখেছিল। আমি জানতাম যে এই চিঠিগুলোতে আমার নামে প্রচুর নালিশ করা হয়েছে। যাবার মুহূর্তে আমার ব্যবহারে সে বুঝল যে তাতে তিক্ততার লেশমাত্র নেই। আমার ভয় ছিল, সে হয়ত এই চিঠিগুলো পাঠাবে না। আমি বললাম, 'চিঠিগুলো আমাকে দিয়ে দাও, আমি এগুলো আমার কাছে রাখবো না। যখনই শিগর্চে বা গ্যান্চী যাওয়ার লোক পাওয়া যাবে, আমি তার হাত দিয়ে

ডাকে ফেলে দেব।' অভয়সিংহ ভাবলো—এ বিচিত্র লোক, এ নিশ্চয়ই চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেবে। ও সেখানেই সমস্ত চিঠি ছিঁড়ে ফেলল। আমি ভেবেছিলাম যে, চিঠি থেকে মানুষের আর একটা মুখও দেখতে পাওয়া যাবে। সেজন্যই আমি তো পাঠাতে চাইছিলাম। আমি মনে করি, মানুষের সাদা-কালো দুটো চেহারাই যদি দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে ভালো হয়। নাম ও সম্মান আমার কাছে এমন কোনো কঠিন জিনিস বলে মনে হয় না। কঠিন জিনিস হল সেই কাজ, যা নিজে তো হারিয়ে যায়ই, কিন্তু পরে যারা কাজ করে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে এক পা সামনে এগিয়ে দেয়।

১৭ জুন আমি 'স্ববৃত্তিটীকা' লিখে ফেললাম। এবার 'বার্তিকালংকারের' বাকি অর্দ্ধেকটা লিখতে হবে। ২০ জুন থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত সেটাও লিখে শেষ করলাম। তারপর লিখে ফেলা অংশ আবৃত্তি করতে লাগলাম। মোহান্তরাজের খুবই ইচ্ছে ছিল যে আমি ওঁর প্রাসাদে গিয়ে কয়েকদিন থাকি। সেজন্য ২ জুলাই আমি সেখানে চলে গেলাম এবং ২২ জুলাই পর্যন্ত সেখানেই থাকলাম। এবার সবচেয়ে বড় কাজ ছিল বইগুলোর তালিকা বানিয়ে ফেলা। তারাপ্রাসাদের বাগানে একটি বাংলো ছিল। বইগুলো সেখানে আনিয়ে দেওয়া হল। আমি সেখানে থেকে সারাদিন বইয়ের পিছনে দিতাম, তাদের তালিকা বানাতাম। ৩০ তারিখে তালিকার কাজ শেষ হল। সব মিলিয়ে ২৭টি বই ছিল। আর একবার আমি ছগ্‌পে-ল্‌হাখঙতে খুঁজে দেখতে গেলাম, কিন্তু সেখানে আর কোনো তালপাতার পুঁথি পাওয়া গেল না। 'কালচক্রতন্ত্র'-এর টীকা একটা কাগজে লেখা ছিল। আগের দিন দেখে ছিলাম, কিন্তু, সেটা ঐরকমই দেখতে হাজারটা অন্য বই-এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার আর খুঁজে পাওয়া গেল না। আর সব বইয়ের বাঁধন খুলে খুলে দেখা সহজ কাজ ছিল না।

তারাপ্রাসাদের বড় লামা বেচারা খুব সিধেসাধা মানুষ ছিলেন। তিনিও খুব আন্তরিক হয়ে দেখা করতেন। কিন্তু নিজের ভাব প্রকাশ করার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাঁর ছোট ভাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কাছে এসে বসে থাকতেন। কথাবার্তা হতো। তিনি খুবই বোঝাতে চেষ্টা করতেন, 'তিব্বতের বিপজ্জনক জোতগুলোর সব জায়গায় খুনি ডাকাত থাকে। আপনি এরকমভাবে যে দুটো-একটা লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান এটা ভাল নয়।' আমি বলতাম, 'এখনও পর্যন্ত তো এরকম কোনো ডাকাতকে পাইনি। আর এই ভয়টা করলে তো আমি তিব্বতে আসতে পারতাম না। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আমি যে কাজ করতে পেরেছি, তাতে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট। বাকি রইল মৃত্যু, সে তো আমি এবছর এখন মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি। আমার সে-সময় কেবল এইজন্যেই দুঃখ হতো যে, আমি ধর্মকীর্তির মহান গ্রন্থ 'প্রমাণবার্তিক'কে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে পারিনি।'

তারাপ্রাসাদের বৃদ্ধা দামো সব সময় পুজো-পাঠ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তবু তাঁরও এত স্নেহ ছিল যে তিনি প্রায়ই আমাকে ডেকে পাঠাতেন, তারপর তিব্বতের সবচেয়ে ভাল খাবার করাতেন। খম্‌, অমদো, লাদাখ, এমনকি নেপালেরও শুকনো তাজা ফল আর মেওয়া সামনে এগিয়ে দিতেন। মাখন দিয়ে তৈরি গুড়ের পাটালি খুব রুচি নিয়ে

খেতাম। এই জিনিসটা তিনি অবশ্যই টাটকা তৈরি করাতেন। তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত পরিমিত ছিল, তাই আমার কথাবার্তাও বেশি দূর পর্যন্ত আমি ছড়াতে পারতাম না। ছোট দামো মোহান্ত রানী লাসার এক বড় সামন্তের মেয়ে ছিলেন। তিনি বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন আর বোল-চালেও খুব চতুর। আমি ক্যামেরা নিয়ে যেতাম, তখন তিনি সেটা বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতেন, তার এক-একটা অংশকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। তিব্বতে সংকোচের ব্যাপারটা কম আর আমার সামনে তো তাঁর আরোই সংকোচ ছিল না। মনে হতো, ছোট স্বামীর প্রতি তাঁর বেশি ভালবাসা ছিল, কেননা আমি তাঁকে বেশির ভাগ সময় তাঁরই সঙ্গে দেখতাম। দামোর এখনও কোনো সন্তান ছিল না। তীব্বতীদের ধারণা অনুসারে সন্তানের ব্যাপারে তিনি নিরাশ হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু তিব্বতে বউ বাঁজা না হলে দ্বিতীয় বিয়ে করা এত সহজ নয়। তার জন্য স্ত্রী যতদিন না নিজে ইচ্ছে করে ততদিন চুপ করেই থাকতে হয়। কিন্তু সেখানে বংশের জন্য ছেলে বা মেয়ে থাকাটা খুব জরুরি ছিল, তা না হলে কয়েকশো বছর ধরে চলে আসা বংশ চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যেত।

'যোগাচারভূমি'ও একরকম সম্পূর্ণই ছিল। আর আঠ হাজার শ্লোকের এই মহাগ্রন্থ লিখবার এখন সময় ছিল না। তার জন্য এটার ছবি নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকলাম। সাক্যা ছাড়ার আগে আমি আবার ডোনির্ ছেন্‌পোর বাড়িতে চারদিনের (১৬-১৯ জুলাই) জন্য গেলাম। গুরিম্-ল্হাখঙ্‌কে আবার দেখলাম। কিন্তু ওখানে কোনো নতুন বই পেলাম না। পরদিন চাম্‌কুশোও এসে গেল। তিন মাসেরও বেশি তিনি এক বিহারে ধ্যান-পূজায় রত ছিলেন। ধ্যান-পূজার অর্থ সম্ভবত বংশে একটি সন্তানের প্রত্যাশা। সত্যিই তাঁর স্বামী এবং পিতৃকূল দুই-ই নিঃসন্তান ছিল। তিনি আগের মতোই আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি ছিলেন। আমার ভাল লাগল যে, সাক্যা ছাড়ার আগে চাম্‌কুশোর সঙ্গেও দেখাটা হয়ে গেল।

২০ জুলাই আমি আবার ফুন্‌ছোগ্ প্রাসাদে চলে এলাম। এবার ছিল ঙোর যাওয়ার প্রস্তুতি।

এবারের সাক্যা আসাটা খুব সফল হয়েছে। টাইফয়েডেব সময়েই শুধু আমার মুখে ধর্মকীতির নাম ছিল তা নয়, বরং ক্রেনম্ থেকে যাওয়ার পর আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে কেউ একজন তালপাতার পুস্তক আমার হাতে দিল, খোলার পর তার মধ্যে থেকে দিগ্‌নাগের 'প্রমাণসমুচ্চয়' এবং ধর্মকীর্তির গ্রন্থ বেরোল। দিগ্‌নাগেব গ্রন্থ 'প্রমাণসমুচ্চয়' আর 'ন্যায়মুখ' তো আমি পেলাম না কিন্তু ধর্মকীর্তির গ্রন্থ পাওয়ায় আশাতীত সফল হলাম। সম্পূর্ণ 'প্রমাণবার্তিক'-ই পাওয়া গেল না, সেই সঙ্গে একটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকর্তার নিজের বৃত্তি (স্ববৃত্তি) এবং তার ওপর কর্ণকগোমীব বিস্তৃত টীকাও পাওয়া গেল, যা আমি ওখানে বসে টুকে নিলাম। পরে স্ববৃত্তির খণ্ডিত অংশ তিব্বতী অনুবাদ আর টীকার সাহায্যে আবার সংস্কৃততে অনুবাদ করেছিলাম এবং এখন (সেপ্টেম্বর ১৯৪৪) এই দুটো পুস্তকাকারে ছাপা হয়ে গেছে। 'প্রমাণবার্তিক'-এর অবশিষ্ট তিনটি পরিচ্ছেদের ওপর প্রজ্ঞাকরগুপ্তের 'বার্তিকালংকার-বৃহদ্‌ভাষ্য'— খুবই অমূল্য গ্রন্থ। এটাও আমি সাক্যায়

পেয়েছিলাম। সবগুলোর কপিও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শালুতে যাওয়ার পর মনোরথ নন্দী কৃত 'প্রমাণবার্তিক'-এর একটা খুবই সুন্দর বৃত্তি পেলাম, সেটাও আমি কপি করলাম এবং পরে সম্পাদনা করে ছেপে দিলাম। 'বাদন্যায়' আমি আগেই সম্পাদনা করেছিলাম, এইভাবে 'প্রমাণবার্তিক' আর 'বাদন্যায়' ধর্মকীর্তির এই দুটো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। 'ন্যায়বিন্দু' আগেই পাওয়া গিয়েছিল। তিব্বতী অনুবাদ আর অর্চট (ধর্মাকার দত্ত)-এর টীকার সাহায্যে 'হেতুবিন্দু'ও সংস্কৃতে অনুবাদ করে নিয়েছিলাম। অর্চটের টীকা আর 'ন্যায়বিন্দু-পঞ্জিকা' (ধর্মোত্তর)-র ওপর দুর্বেক মিশ্রর টীকাগুলো ঙোর গুম্বাতে পাওয়া গিয়েছিল। ধর্মকীর্তির 'সম্বন্ধ-পরীক্ষা'ও সংস্কৃতে প্রস্তুত করে ফেলেছিলাম। এবার, ধর্মকীর্তির ন্যায়ের সাতটি গ্রন্থের মধ্যে 'সন্তানান্তরসিদ্ধ' এবং 'প্রমাণবিনিশ্চয়' এই দুটো গ্রন্থ শুধু তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া যায়, যেগুলোকে মূল বা তিব্বতী অনুবাদ থেকে সংস্কৃত করে নিয়ে কখনো প্রকাশিত করতে হবে।

ঙোর এবং শলুতে—২৩ জুলাই আমি সাক্যা থেকে বিদায় নিলাম। ফুন্‌ছোগ-প্রাসাদ তিনটি খচ্চর এবং তাদের একজন খুব দক্ষ পাচককে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিল। তারা প্রাসাদ পথের জন্য অনেক জিনিস পাঠিয়েছিল। মোহান্তরাজ আর দামো খুব আন্তরিকতাব সঙ্গে বিদায় দিলেন। এগারোটার সময় আমরা সাক্যা থেকে বেরোলাম। একটি মাদি খচ্চর খুব তাগড়া ছিল। সে দুবার পাচককে পিঠে থেকে ফেলে দিল। পথে সাক্যার কয়েকজন খচ্চরওলার সঙ্গে দেখা হল, তাদের কাছে সে মাদি খচ্চরটি বদলে নিল। যখন আমি এসেছিলাম তখন খেতে লাঙল চলছিল। এখন খেতে সবুজ-সবুজ যব-গমের গাছ দাঁড়িয়ে ছিল। সরষে গাছে ফুল হয়েছিল। এটা বর্ষার দিন ছিল। ন্যাড়া, রুক্ষ পাহাড়ের ওপর চারদিকে সবুজ- সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছিল। আটোলা তারপরে শোঙ্‌লা এই দুটো জোত পার হয়ে আমরা ডোক্‌পাদের গ্রাম—শোঙ্‌-চিক্‌গ্যপ-এ রাতে থাকলাম। আগের বছরের ঘরটিতেই থাকা হল। যদিও হাঁটতে হয়নি, তবু কোমরে খুব ব্যথা ছিল। আসলে আড়াই মাস ধরে বসে বসে কলমও তো চালাতে হয়েছিল।

পরের দিন (২৪ জুলাই) ছাতু-চা খেয়ে সাতটার সময় বেরিয়ে পড়লাম। তখন হাল্কা হাল্কা বৃষ্টি পড়ছিল। অনেকটা নেমে নদীর কিনারে কিনারে চলতে শুরু করলাম। সে-সময় নদীতে খুব জল বইছিল আর কোথাও কোথাও আমাদের জলের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছিল। এক জায়গায় খচ্চর বাক্সসমেত বসে পড়ল। তাড়াতাড়ি তাকে ওঠানো হল। আমার ভয় হচ্ছিল, জল হয়ত বাক্সের ভেতর ঢুকে গেছে! পরে দেখলাম সব জিনিসই ঠিকঠাক আছে। তারপর বড়ী নদীর তীরে এলাম। দুপুরে খাওয়ার জন্য এক জায়গায় একটুক্ষণ দাঁড়ালাম। এবার নদী পার হওয়ার সমস্যা। আগের বার গেশে আর আমি বর্ষার পরে এসেছিলাম। সেবারও জায়গা অনেক খুঁজে-পেতে তবে নদী পার হয়েছিলাম। এবার তো ছিল বর্ষার নদী। অনেক খোঁজ-টোজের পর জানলাম, নিচে শব্‌-এর পুল দিয়ে পার হওয়া যেতে পারে। তিব্বতের প্রথম যাত্রায় আমি সেই পুল দিয়েই পেরিয়ে ছিলাম। আমরা চাঙ্‌শো পৌঁছলাম। এখন অনেকটা বেলা ছিল কিন্তু খচ্চরের পিঠে মাল উঠিয়ে

চলার সময় বৃষ্টি হতে শুরু করল, তাই রাতে এখানেই থাকতে হল।

২৫ তারিখেও সাড়ে সাতটায় রওনা হওয়ার সময় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। ছারোঙ্‌-ছু (নদী)-তে জল আরও বেড়ে গিয়েছিল। দু-ঘণ্টা পর ক্যিদোতগ্‌পাতে পৌঁছলাম। আশা করেছিলাম যে এখানে চামড়ার নৌকা (কা) পাওয়া যাবে কিন্তু তার কোনো পাত্তা নেই। দুজন লোক আবার খচ্চরে চড়ে নদীর গভীরতা দেখতে গেল। কোনোরকমে ভয়ে ভয়ে আমরা ভালোয় ভালোয় নদীর ওপারে পৌঁছলাম। একটা বাক্সে একটু জল ঢুকে গিয়েছিল কিন্তু কোনো ক্ষতি হয়নি। আজ রাতে শব্‌ গ্রামে থাকলাম।

পরের দিন (২৬ জুলাই) যাওয়ার সময় একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল। দেড় ঘণ্টায় ছাচা-লা পার হলাম। সেই দিনই তাচো-লাও পার হয়ে সাড়ে পাঁচটায় ঙোর-গুম্বাতে পৌঁছে গেলাম। খঙ্‌সরে থাকার জন্য ভাল জায়গা পাওয়া গেল। ঙোরের বই এখন পাওয়া সম্ভব ছিল না, কেন না গুম্বার অফিসার ওখানে ছিল না, তাই প্রথমে শলু যাওয়া স্থির করা হল। কুছেন্‌ আর কুডিঙ্‌ দুজন লামার সঙ্গে দেখা হল। পরের দিন খাওয়া-দাওয়া করে দশটার সময় আমরা শলু রওনা হলাম। ঘুরে গেলে আমরা পাহাড়ে না উঠেও পৌঁছতে পারতাম কিন্তু আমরা সোজা রাস্তা ধরলাম। খাড়া চড়াই ছিল আর রাস্তাও ছিল পাকদণ্ডীর। প্রথমে ঙোলা পার হলাম। উৎরাইতে কিছু দূর পর্যন্ত রাস্তা এমন খারাপ ছিল যে, খচ্চরের বোঝা মানুষকে দিতে হয়েছিল। নিচে নদীর জলাভূমিতে আসার পর বৃষ্টি শুরু হল আর জল অজস্র ধারায় বয়ে যেতে লাগল। তীরের খেতগুলোকে নদী যাতে ভাসিয়ে না নিয়ে যায় তাই পাথরের বাঁধের ওপর সাদা রঙের অনেক শিলাপুত্রক রাখা হয়েছিল। লোকের বিশ্বাস যে ঐ শিলাপুত্রক জলদেবতাকে সামনে এগোতে দেবে না। শ্বালার ডাঁড়াও বেশ ভাল ছিল, চড়াই বেশি ছিল না। তারপর কগোঙলা নামে একটি ছোটমত ডাঁড়া পাওয়া গেল। এইভাবে তিনটে ডাঁড়া পেরিয়ে ৬ ঘণ্টা যাত্রা করার পর আমরা শলু বিহারে পৌঁছলাম। রিসুর লামা আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। থাকার জন্য একটা ভাল জায়গা পাওয়া গেল। ভারত এবং জাপান থেকে যেসব ছবি আমি তাঁকে পাঠিয়ে ছিলাম সেগুলো তিনি পেয়েছিলেন।

পরের দিন (২৮ জুলাই) নটার সময় আমরা এক মাইল হেঁটে রিফুগ্‌ পৌঁছলাম। এটি শলু বিহারের শাখাই শুধু নয়, একটি অভিন্ন অঙ্গও। মহাবিদ্বান বুতোন্‌ (১২৯০-১৩৬৪) আগে অনেক বছর সাক্যায় ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর অন্তিম সময় এখানে কাটিয়ে ছিলেন। এখানে তাঁর চৈত্য আছে। লালমন্দির তাঁরই বানানো, যার মধ্যে তাঁর মূর্তিও আছে। আমরা গ্রন্থাগারে গেলাম। একটা ছোটমত খুব অন্ধকার কুঠরী ছিল। পাশে আরও একটা কুঠরী ছিল যার দরজা তালা বন্ধ ছিল এবং তার ওপর ভুটান সরকারের সীলমোহর লাগানো ছিল। সরকারী অনুমতি ছাড়া ওটা খোলা যেত না কিন্তু রিসুর লামা বলে দিয়েছিলেন যে, ওর মধ্যে তালপুঁথি নেই। এরপর সমস্ত গ্রন্থাগার খুঁজতে শুরু করলাম। কাঠের র‍্যাকে হাতে লেখা অনেক পুঁথি ছিল কিন্তু সে-সব তিব্বতী ভাষার। একটা বাক্স খোলা হল, তার মধ্যে ৩৯ বাণ্ডিল তালপুঁথি পাওয়া গেল। এর মধ্যে মনোরথ নন্দীর 'প্রমাণবার্তিক বৃত্তি' এবং 'প্রমাণবার্তিক'-মূল'-এরও তিনটি পরিচ্ছেদ ছিল। আরও অনেক কাজের বই ছিল।

নেপাল থেকে আসার সময় তেজরত্নর সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি ফটো তুলে দেয়ার কথা বলেছিলেন। আমি ভাবলাম যে ওকে নিয়ে এসে কিছু বই-এর ফটো তুলিয়ে নিই।

পরের দিন (২৯ জুলাই) আমি শিগর্চে চলে গেলাম। ভারত থেকে আসা অনেক চিঠি পেলাম। সবচেয়ে দুঃখজনক খবর ছিল—পাটনা মিউজিয়ামের কিউরেটর মনোরঞ্জন ঘোষের মৃত্যু। আমার মনে পড়ছিল তাঁর সৌহার্দ্য আর সারল্য! তিব্বতী বস্তু সংগ্রহের জন্য তিনি কত আগ্রহ দেখাতেন এবং জিনিসগুলো পৌঁছলে কত খুশি হতেন।

আমি সাক্যাতে যত ছবি তুলেছিলাম তেজরত্ন সেগুলো ধুলো। 'যোগাচার-ভূমি'র তিনটি ফিল্ম ঠিকমত আসেনি। যোগাচারভূমি'কে ফেলে যেতে পারছিলাম না, তাই সাক্যার রাস্তাতেই ভারত ফিরতে হবে একটা স্থির করতে হল। খবর পেলাম, নেরীকাছাতে কিছু তালপুঁথি আছে। তিন-চার দিন অপেক্ষা করার পর একটি ঘোড়া পাওয়া গেল। ওই গুম্বার এক ঢাবাও এসেছিল। সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে কিছুটা হেঁটে, কিছুটা ঘোড়ায় চড়ে আমি গুম্বা পৌঁছলাম। এটা খুব পুরনো বিহার নয়। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে বর্তমান টশী লামার শিক্ষক য়োঙ্-জিন লামা এটা বানিয়ে ছিলেন। ওখানে কি আর সংস্কৃত পুস্তক থাকার ব্যাপারে আশা করা যেত? হ্যাঁ, ওখানে একটি তালপুঁথি অবশ্যই ছিল এবং সিংহলী হরফে 'পারাজিকা' (পালি) ছিল, যা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে লেখা হয়েছিল। আমি তিনটের সময় ঐ ঘোড়াতেই ফিরলাম। সামনে এবং পিছনে দুদিকেই বৃষ্টি হচ্ছিল—আমি ভেজা থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। ডোসুম্ হচ্ছে ব্রহ্মপুত্রের কিনারে একটি ঘাট যেখানে ল্হর্চে থেকে চামড়ার নৌকা আসে। ওখানে পৌঁছতেই ঘোড়ার মালিক এসে গেল। সে বলল, 'আমি ঘোড়াকে যেতে দেব না।' ঘোড়া ওখানেই ছেড়ে দিলাম। সাড়ে পাঁচটা বেজে গিয়েছিল। পথে অন্ধকার হওয়ার ভয় ছিল। আমি একলা ছিলাম। তিব্বতে লোকালয়ের বাইরে সব জায়গায় প্রাণের ভয় রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি হাঁটলাম। যদি তিব্বতী ভিক্ষুর বেশে থাকতাম তাহলে কেউ আমার দিকে তাকানোর সাহস করত না কিন্তু আমার শরীরে তো হলুদ চীবর ছিল। সামনে দুজন লোক, যারা বোধহয় কাছেই ভেড়া চরাচ্ছিল, আমার কাছে এল আর বলতে লাগল,'সৌদা! ছঙরিন্ (মদের দাম) দে।' তাদের গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল যে তারা ভিক্ষা চাইছে না। আমি টাকা দিয়ে তাদের কেন জানাব যে আমার কাছে টাকা আছে? আমি বললাম, 'আমার কাছে টাকা নেই।' ফের ওদের ধমকানোর সুরে ঐ কথা বললাম। আমি চীবরটা একটু সরিয়ে দিলাম—ক্যামেরার চামড়ার ফিতে পরিষ্কার দেখা গেল। ডানহাতও আমি বগলে ঢোকালাম। তাদের মুখের চেহারা পাল্টে গেল এবং পথ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। তারা কি করে বুঝবে যে ওটা পিস্তল নয়, ফটো তোলার ক্যামেরা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রোলিফেক্সটা সেদিন শক্তিশালী তাবিজের কাজ করেছিল। আমার কাছে কোনো হাতিয়ার ছিল না কিন্তু ওদের দুজনের কাছে তিব্বতী ছোরা ছিল। আমি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে অন্ধকার হওয়ার আগেই শিগর্চে পৌঁছে গেলাম।

ওখানে আসতেই অভয় সিংহ আর রঘুবীরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পরের দিন (৩ আগস্ট) আমি টশী-ল্হুন্-পো বিহারে সম্লো গেশের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের বড় বিদ্বান ছিলেন। কিন্তু ছিলেন পুরনো যুগের। সেদিন বা আগে কোনো এক

দিন কথাবার্তা হচ্ছিল, আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল যে, পৃথিবী গোল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার কথাটা ধরে নিলেন আর বলতে লাগলেন, 'তবে তো আপনি 'অভিধর্মকোষ' (বসুবন্ধু) আর 'বুদ্ধবচন' (ত্রিপিটক) মানেন না।' 'মানি না' বলে দিয়ে আমি নাস্তিক সাজি কেমন করবে? আমার মস্তিষ্কে খুব চাপ পড়ল। আমি খুব ভাল করে ভেবে উত্তর বের করলাম। আমি শুধোলাম, 'যে-সময় কুশীনারাতে ভগবান সাক্য মুনির পরিনির্বাণ হয়েছিল, সে-সময় ভূমিকম্প হয়েছিল কি না?'

'হয়েছিল।'

'সেই ভূমিকম্পে পৃথিবী পাঁচ-দশ আঙুল বা দশ-বিশ যোজন সরে ছিল?'

'যোজন নয়, সারা পৃথিবীও নয়, বরং দশ-সাহস্রী লোকধাতু (ব্রহ্মাণ্ড) মূল থেকে সরে গিয়েছিল।'

তখন আমি হেসে বললাম, 'গেশে রিন্‌পোছে! সাধারণ ভূমিকম্প হলেই জলের জায়গায় স্থল আর স্থলের জায়গায় জল হয়ে যায়, কত পাহাড় বসে যায়, কত দ্বীপ সমুদ্রে ঢুকে যায়, তাহলে সেই অসাধারণ ভূমিকম্প পৃথিবীতে অসাধারণ পরিবর্তন এনেছিল কি না?'

'পরিবর্তন আনবে না কেন?'

এবার আমি দুটো হাতের পিঠের দিকটাকে কচ্ছপের পিঠের রূপ দিয়ে বললাম, 'আগে পৃথিবী এই রকম অর্ধগোলাকার ছিল, সেই মহাভূমিকম্পের পর তা এইরকম গোল হয়ে গেছে।' বলে আমি দুটো হাত দিয়ে গোলাকৃতি করে দিলাম। বেচারা গেশে আর কি বলবেন? আমি বললাম. 'বুদ্ধের বচন ভুল নয়, কেননা তা পরিনির্বারণের সেই মহাভূমিকম্পের আগে বলা হয়েছিল। আচার্য বসবন্ধুর কথাও ভুল নয়, কেননা তিনি বুদ্ধবচনে যেমন দেখেছিলেন তেমনই লিখে দিয়েছিলেন।'

গেশে একটু ভেবে বললেন, 'সেই পৃথিবীর মধ্যিখানে শত-শত যোজন উঁচু সুমেরু পর্বত দাঁড়িয়ে ছিল, তার কি হল?'

আমি বললাম, 'পৃথিবী যখন কচ্ছপের পিঠের মত থেকে গোল হয়ে গেল, তখন বেচারা সুমেরু পর্বতের আর হদিশ কোথায়? সে তার পেটে চলে গেল। এখন যে পৃথিবী রয়েছে তাকে ওজন করা হয়ে গেছে, তার নকশা বানানো হয়ে গেছে। সেই নকশা দেখে উড়োজাহাজ যেদিকে ওড়ে, তার লোকেরা সেখানে পৌঁছে যায়। সেইজন্য সেই নক্সা ভুল নয়, তা অর্থক্রিয়া-সমর্থ।' বলে আমি ধর্মকীর্তির বাক্যও আবার বলে দিলাম। গেশে সামান্য চিন্তা করে বললেন, 'সুমেরু যদি রইল না, তাহলে দেবেন্দ্র শক্র এবং ত্রায়স্ত্রিংশ দেবতা কোথায় গেলেন?'

আমি মুখে কিছুটা খেদপ্রকাশ করে বললাম, 'গেশে রিন্‌পোছে! এটা খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু এ ধরনের ভূমিকম্পে এই রকম হয়েই থাকে। দু বছর আগের ভূমিকম্পে আমাদের একটা শহরের (মুঙ্গের) ২০ হাজার লোক মারা গিয়েছিল। গত বছরের ভূমিকম্পে অন্য একটা শহরের (কোয়েটা) ৫০ হাজার লোক মারা গেছে। দেবলোককে তার চেয়েও বেশি ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। রাতের শেষ প্রহরে ভূমিকম্প হয়েছিল না?'

'হ্যাঁ, শেষ প্রহরেই হয়েছিল।

আমি বললাম, 'বেচারা শক্র, তাঁর অপ্সরারা এবং সমস্ত দেবতারা রাতের দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত নাচছিলেন আর মদ্য পান করছিলেন, তারা ঠিক তখনি শুয়েছিলেন। প্রথম ঘুমটা খুব গাঢ় হয়, সেই সময়েই ভূমিকম্প হয়েছিল। কেউ জেগে ওঠারও সুযোগ পায় নি—সুমেরু সবাইকে নিয়ে পৃথিবীর গর্ভে ঢুকে গেল। ঘুম ভাঙলে তো ওরা হাওয়াতে উড়ে যেতে পারত, তাদের অনেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পারত। আফশোশ এটাই যে দেবলোক, দেবতা সবই পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল!'

রঘুবীর খুব খুশি হল, সম্‌লো গেশেও হেসে চুপ করে গেলেন।

সে সময় অম্‌দোর দিক থেকে নানারকম উল্টোপাল্টা খবর আসছিল। কেউ বলছিল, সমস্ত কনসু আর অমদো লালরা (বলশেভিক) নিয়ে নিয়েছে, এখন ওরা তিব্বতের দিকে আসছে। ফুন্‌ছোগ্‌ প্রাসাদের মোহান্তরাজ শুনেছিলেন যে খম্‌-এ লাল এসে পড়েছে। তাদের সেনাপতি হচ্ছে একজন স্ত্রীলোক, যার মুখের কোণ থেকে তিন আঙুল লম্বা দাঁত বেরিয়ে আছে। গুলিগোলা কোনো কিছুই তার কিছু করতে পারে না, সে বাচ্চাদের খেয়ে নেয়। কেউ আবার এটাও বলেছিল যে, সে পলদ্‌ন ল্‌হামো (শ্রীদেবী)—তিব্বতের সবথেকে বড় দেবী মা কালীর অবতার। লামারা এরকম খবরও ছড়াচ্ছিল যে লোবোন্‌ রিন্‌পোছে (পদ্মসম্ভব) ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে পৃথিবীতে একবার লালের রাজত্ব হবে এবং এখন সেটাই হচ্ছে। রঘুবীর বলছিল টশী-ল্‌হুন্‌-পোতে ভিক্ষুরাও বন্দুক চালানো শিখছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' রঘুবীর বলল, 'লালরা যদি আসে তো আমাদের গুম্বা ওরা ভেঙে ফেলবে, এটা ঢাবারা কি করে বরদাস্ত করে?'

আমি বললাম, 'দু-চার জনের বন্দুক শেখায় কিচ্ছু হয় না। তুমি ঠিক-ঠিকভাবে লোকজনকে ভরতি করো, ভাল করে ড্রিল-প্যারেড শেখাও, ওদের দিয়ে লক্ষ্যভেদ করাও, শিগর্চে আর আশপাশের লোকদেরও সেনা বানাও।'

রঘুবীর হাসতে হাসতে বলল, 'যাতে প্রথম ফাঁসিটা আমার গলাতেই পড়ে! কেননা ঢাবা আর পল্টন তো সব রোদে মাখনের মত গলে যাবে আর আমার নামই শুরু থেকে বিখ্যাত হয়ে থাকবে।'

আবার শলুতে (১৫ আগস্ট)—সম্‌লো গেশে তাঁর নিজের দুটো ঘোড়া দিলেন আর মানবাহাদুর সাহু তাঁর একটা। একটা ঘোড়ার ওপর ফটো তোলার জিনিসপত্র ছিল। রঘুবীর, তেজরত্ন, অভয় সিংহ আর আমি— এই চারজন দশটার সময় শলূর দিকে রওনা হলাম। একটা নদী যখন আমরা পার হচ্ছিলাম তখন ক্যামেরা নেওয়া ঘোড়াটা স্রোতের মাঝখানে বসে গেল। অভয় সিংহ বোধহয় তার ওপর ছিলেন। তাঁর পাজামা তো ভিজেই গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের ভয় হচ্ছিল যে ফটোর বাক্সের ভেতরে জল ঢুকে যায় নি তো! যাক গে, এক চুলের জন্য সেটা বেঁচে গিয়েছিল। শলূ পৌঁছলাম। রিফুগ্‌ থেকে সব বই এখানে আনা যায় না, তাই ঠিক হল যে আমরা রিফুগেই চলে যাব।

পরের দিন (৬ আগস্ট) আমরা রিফুগে চলে গেলাম আর ৮ দিন থেকে ওখানে ছবি

তুলতে লাগলাম। ছবি তুলতেন তেজরত্ন আর আমি বই-এর সূচি বানাতাম এবং মাঝখানে মাঝখানে পাতা লাগিয়ে ফটোর জন্য সাজিয়ে দিতাম। কলকাতা থেকে আনা অনেক প্লেট পুরনো বেরল, সেজন্য তাতে ছবি এল না। তেজরত্নের পুরনো প্লেটগুলো ভাল ছিল। মাঝে মাঝে জোর বৃষ্টিও হচ্ছিল ফলে ফটো তোলায় অসুবিধা ঘটছিল। আমি সূচি তৈরি করলাম। আগের বছর 'সদ্‌ধর্মপুন্ডরীক' আর 'কাশিকাপঞ্জিকা'-র তালপুঁথি দেখেছিলাম কিন্তু এবার তা চোখে পড়ল না। কলকাতা থেকে আনা সব প্লেট বেকার গেল। তেজরত্নের প্লেটগুলো থেকে কিছু ফটো পাওয়া গেল। এবারও ফটো তোলার কাজটা ঠিকমত হল না। আমর অনুতাপ হচ্ছিল যে, বই-এর ফটো তোলা আর ধোয়াতে কেন দু-এক মাস লাগাই নি। ১৩ আগস্ট তেজরত্ন শিগর্চে ফিরে গেলেন আর আমরা শলূ বিহারে ফিরে এলাম। এখানকার বইগুলোর মধ্যে 'মধ্যমকহৃদয়' (ভাব্য) 'বিগ্রহব্যাবর্তনী' (ন্যায়ার্জুন),'প্রমাণবার্তিকবৃত্তি' (মনোরথ নন্দী) আর 'ক্ষণভঙ্গাধ্যায়' (জ্ঞানশ্রী) তিন মাস আমার কাছে রাখার জন্য গুম্বার পাঁচজন 'পঞ্চ'ই অনুমতি দিলেন। গুম্বার লোকেরা ভাবছিল যে, এ খুব ধনী কোনো লামা, তাই তারা গুম্বার ভেতর চিত্রাংকনের জন্য রঙ, ছাতের জন্য কাপড়, মূর্তিকে পরানোর জন্য সোনা ইত্যাদি জিনিস দাবি করছিল। আমি যদি চার-ছ হাজার টাকা খরচ করতে পারতাম তাহলে ওরা খুব খুশি হতো আর আমি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তালপুঁথিগুলো নিয়ে আসতাম। কিন্তু টাকা কোথায়? আমি তো জবরদস্তি ঘুরে বেড়ানোর সাহস দেখাতাম। ছু-শিঙ্‌-শা[১]-এর লোকেরা টাকা ধার দেয়ার জন্য তৈরি ছিল কিন্তু আমি সেটুকু টাকাই নিতে পারি যা ফেরত দিতে আমার অসুবিধে হবে না।

গ্যান্‌চী তে (১৭ আগস্ট—৭ সেপ্টেম্বর)

১৬ আগস্ট আমরা তিনজন গ্যান্‌চীর দিকে রওনা হলাম। পরের দিন দশটায় গ্যান্‌চী পৌঁছলাম। পথে চা খাওয়ার জন্য নেসাতে থামতে হয়েছিল। খবর পাওয়া গেল যে এখানে একটা পুরনো মন্দির য়ুম-ল্‌হাখঙ (মাতৃমন্দির) আছে যেটা সম্রাট রল্‌পাচন্‌ (৮৭৭-৯০১) বানিয়েছেন বলে শোনা যায়। মাঠের মধ্যে এই মন্দিরটা নিশ্চয় পুরনো ঢঙের। মাঝখানে চর্তুমূর্তি বৈরোচন—সম্ভবত এটা আগের মূর্তি। পিছনের দিকে আছে য়ুম (মাতা) প্রজ্ঞাপারমিতা আর দশটি বুদ্ধের মূর্তি। কারিগরি সুন্দর আর শিল্পকলা সেই সময়েরই অনুরূপ। সামনে রয়েছে সম্রাট ঠীস্রোঙ (৮২৩)-এর তৈরি করা মন্দির যেখানে বৈরোচন, আট বোধিসত্ত্ব ইত্যাদির মূর্তি আছে। এটা ততটা সুন্দর না হলেও বেশ পুরনো। এই মন্দিরটা যদি সম্রাটের বানানো না হয়, তবু পুরনো অবশ্যই। সম্ভবত এটাও সেই সময়েই বানানো।

গ্যান্‌চীতে থাকার সময় আমি আর অভয় সিংহ বই-এর কপি করতে ব্যস্ত ছিলাম। 'প্রমাণবার্তিক' সম্বন্ধীয় সাহিত্যকর্মগুলো পাওয়ার ব্যাপারে আমি আগেই অভয় সিংহের

[১] ধর্মমান সাহুর দোকানের নাম।—স·ম·

সঙ্গে জয়সওয়ালজী আর ডক্টর শ্চেরবাৎস্কী (সোভিয়েত)—এর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। জয়সওয়ালজী এসোসিয়েট প্রেসকে এর খবর দিয়েছিলেন আর সেটা ভারতের কাগজে ছাপা হয়ে গিয়েছিল। ফটোগ্রাফির কিছু জিনিসপত্র দরকার ছিল। আমি তার জন্য গ্যান্চী থেকে তার এবং চিঠি পাঠিয়েছিলাম।

২ সেপ্টেম্বর তিনটে পার্শেল এল, তাতে ফটোগ্রাফির জিনিস আর লামাদের উপহার দেয়ার জন্য জিনিসপত্র ছিল। ৪ সেপ্টেম্বর ডক্টর শ্চেরবাৎস্কীর চিঠি এল। নতুন বই-এর খবর শুনে তাঁর খুব আনন্দ হয়েছিল। লিখেছিলেন, 'আমি ডক্টর বোস্ত্রীকোফ এর সঙ্গে ভারতে আসতে চাই।' এসব বই-এর গুরুত্ব কতটা তা তিনি ভাল করেই জানতেন। যেন প্লেটো আর অ্যারিস্টটলের মূলগ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেছে, কয়েক শতাব্দী ধরে অনুবাদ আর টীকার সাহায্যে গ্রীক দার্শনিকদের বিচার-বিশ্লেষণ অধ্যয়ন করা হচ্ছে, তারপর হঠাৎ মূলগ্রন্থ তার মূলভাষাতেই পাওয়া গেল। ২২ তারিখে আমি পুস্তকের হাতে লেখা কপি এবং অন্যান্য জিনিস ডাক মারফৎ জয়সওয়ালজীর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। এইসব বহুমূল্য জিনিস সঙ্গে নিয়ে ঘোরা আমি ঠিক মনে করি নি। তিব্বতে যেভাবে একলা-দোকলা আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তাতে যেকোনো সময় যে বড় রকমের বিপদে পড়তে পারতাম এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ঙোর-এ—৮ সেপ্টেম্বর আমরা গ্যান্চী থেকে শিগর্চে রওনা হলাম। এখন খেত কাটা হচ্ছিল। প্রথম রাত দোঙ্‌লে আর দ্বিতীয় রাত পেনাঙ্-এ থাকলাম। পেনাঙ্-এ খচ্চরের জন্য ঘাস পাওয়া গেল না। রাতে পোকামাকড় আমাদের অতিষ্ঠ করে মারল। ১০ সেপ্টেম্বর রঘুবীর আর আমি এগিয়ে শলূ বিহারে গেলাম। একটা বাদ দিয়ে সব বই ফিরিয়ে দিলাম। সেই দিনই তিনটে নাগাদ শিগর্চে পৌঁছে গেলাম। এখন পোইখঙ্, তানক্ আর ঙোর-এর বই দেখতে হবে কিন্তু তিব্বতে লোক আর ঘোড়া পাওয়া সহজ কাজ নয়।

১২ সেপ্টেম্বর ঙোর আসা-যাওয়ার জন্য ঘোড়া পেলাম। আমরা সেইদিনই সন্ধে নাগাদ ঙোর পৌঁছে গেলাম। কিন্তু জানা গেল যে বই দেবার অধিকার যার আছে, সে এখনো আসে নি। পরের দিন আমরা নতুন অধিকারীর কাছে গেলাম। সে বই দেখাতে রাজি ছিল কিন্তু চাবি তখনো পুরনো অধিকারীর হাতে ছিল। সে লামা গেনদেনুর কাছে চাবি দিয়ে গিয়েছিল, তবু এ বলল যে, পুরনো অধিকারী ছাড়া দরজা খোলা যাবে না। খঙ্সরের দুজন বড় লামাও চেষ্টা করলেন কিন্তু সে-পাজী রাজি হল না। শেষে ঠিক হল যে কুড়িঙ্ রিন্‌পোছে (খঙ্সরের বড় লামা) পুরনো অধিকারীর (ছন্‌জো) কাছে লোক পাঠাবে, যখন বই পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাবে তখন খবর পাঠাবে, তারপর আমরা আসব।

ঙোর থেকে নরথঙ্ গেলাম। ওখানে 'বোধগয়ামন্দির' আর দুটো ভারতীয় চিত্রপটের ফটো নিলাম। রাতে ওখানেই থেকে গেলাম এবং পরের দিন (১৪ সেপ্টেম্বর) ৩ ঘণ্টায় শিগর্চে পৌঁছে গেলাম। আমি এবার 'ক্ষণভঙ্গাধ্যায়' কপি করতে লেগে গেলাম আর রঘুবীর ও অভয় সিংহ পরের দিন (১৫ সেপ্টেম্বর) তানক্ গেলেন। ১৭ তারিখে ঙোর

থেকে লোক ডাকতে এল আর ১৮ সেপ্টেম্বর আমরা আবার ঙোর পৌঁছে গেলাম। সেই দিনই সীলমোহর ভাঙা হল এবং গ্রন্থাগারের তালপুঁথিগুলো দেখা হল। বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোষভাষ্য' সম্পূর্ণ পাওয়া গেল। 'তর্করহস্য' আর 'বাদরহস্য' নামে খণ্ডিত ন্যায়গ্রন্থ পাওয়া গেল। আমি বইগুলোর অনেক ফটো তুললাম। আগের বছর আমি 'সুভাষিত', 'প্রাতিমোক্ষ', 'বাদন্যায়'-এর পুঁথিগুলো দেখেছিলাম, এবার সেগুলো দেখা গেল না। খোঁজাখুঁজি করার পর সেগুলো আগের অধিকারীর ঘরে পাওয়া গেল। তিব্বতে বই কি রকম অরক্ষিত থাকে, সেটা এ থেকেই বোঝা যায়। চারদিন ঙোরে থেকে আমরা আবার শিগর্চে চলে এলাম। তেজরত্ন ফটো তুলেছিলেন, সেগুলো ওখানেই ধুয়ে দেখে নেয়া হয়েছিল, তাই ফটোর ওপর বিশ্বাস করা গিয়েছিল কিন্তু ফোকাস ততটা ভাল হয় নি। রঘুবীর আর অভয় সিংহ তানক থেকে ফিরে এলেন। ওখানে দু-তিনটে তালপাতার পুঁথি ছিল কিন্তু সেগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কলকাতা থেকে আরও পার্সেল এসেছিল। বাবু ব্রজমোহন বর্মা হাঁটা-চলা আর শরীরের দিক দিয়ে অক্ষম ছিলেন কিন্তু তিনি যদি তদারকী না করতেন তাহলে কলকাতা থেকে সময়মত জিনিসপত্র আসায় খুবই অসুবিধে হতো। বর্মাজী কষ্টকে তোয়াক্কা না করে বহু জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিতেন।

পোইখণ্ড যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এক তো ওখানে যাওয়ার জন্য ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছিল না, দ্বিতীয়ত তেজরত্ন ওখানে যেতে চাইছিলেন না। তাই আর ফটো তোলা সম্ভব ছিল না। তেজরত্নর সঙ্গে ফটোর দর ঠিক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন তিনি ইচ্ছেমত দাম চাইতে শুরু করলেন। এ ধরনের অসুবিধে হয়েই থাকে।

২৮ সেপ্টেম্বর আমি রঘুবীরের সঙ্গে টশী-ল্হুন্-পো বিহারে চলে এলাম আর চারদিন ওখানেই থাকলাম। প্রথম দিন সম্‌লো গেশের সঙ্গে সুমেরু আর ভূমিকম্পের ব্যাপারে কথা হল। পোকামাকড়ের জ্বালায় অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম। এবার আমি সাক্যা যাওয়ার জন্য তৈরি ছিলাম কিন্তু ঘোড়ার কোনো ব্যবস্থা হচ্ছিল না।

আবারো সাক্যাতে—অনেক কষ্ট করে শব্ গ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দুটো ঘোড়া পাওয়া গেল। জানস্করের এক ভিক্ষু শব্ পর্যন্ত যেতে রাজি হল। সাড়ে তিনটের সময় আমরা রওনা হলাম আর রাতে নরথঙ্-এ থেকে গেলাম। পরের দিন রাত চারটেতেই বেরিয়ে পড়লাম। সাতটা বাজতে বাজতে তালাজোতে পৌঁছলাম। এটা খুব ছোটমত ডাঁড়া কিন্তু বিপদে ভরা। প্রথম তিব্বত যাত্রায় আমি এই ডাঁড়া দিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিলাম। দুটোর সময় আমরা একটা গ্রামে পৌঁছলাম। ঘোড়াওলার পায়ে ব্যথা হতে শুরু করেছিল তাই ও ওখানেই থেকে গেল। কিন্তু আমরা দুজন সামনে এগিয়ে গেলাম। ছারোঙ্‌ছু নদী পার হলাম পুলের ওপর দিয়ে। তার পর একটুখানি ওপরের দিকে যেতেই চাঙ্‌গুবা গ্রাম এল। এখানে সাক্যার কুশো ডোনির্- ছেন্-পোর বাড়ি। যদিও আমি এখানে কখনো আসি নি আর এখানকার চাকর-বাকররাও আমাকে দেখেনি, তবু আমার সম্পর্কে ওরা শুনেছে তাই ঘনিষ্ঠতা হতে দেরি হল না। সে-সময় ফসল কাটা হচ্ছিল, লোকজন তাতেই লেগে ছিল।

ফলে লোক পাওয়া খুব সহজ ছিল না কিন্তু আমরা কুশো ডোনির্-ছেন্-পো-র বাড়িতে ছিলাম। চোলা সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। বাড়িটা খুবই সুন্দর আর বড়, তবে মালিক-মালকিন এখানে খুব কম আসত তাই মেরামত ইত্যাদির দিকে তেমন নজর দেয়া হতো না। একদিকে ছিল মালিক, সন্তান না থাকায় যার ঘর শূন্য, অন্যদিকে ছিল তার চোলা যার বউ এখনো যুবতী হলেও ৫ ছেলে আর ২ মেয়ে বর্তমান। ছেলে-মেয়েরা ফর্সা, সুন্দর, সাস্থ্যবান, যদিও তাদের মুখের ওপরে ময়লার একটা পুরু আস্তরণ জমে থাকত। সেদিনই সন্ধেতে পাশের কোনো স্ত্রীলোকের পেটে ব্যথা হয়েছিল। আমার কাছে ওষুধের জন্য এল। তিব্বতের মতো জায়গায় যাত্রার সময় চার-পাঁচ রকমের ওষুধ কাছে রাখা দরকার, যার মধ্যে টিনচার আয়োডিন, জোলাপ, পাচক লবণ, কুইনাইন হচ্ছে মুখ্য। আমি এক চামচ 'এনোসল্ট' দিলাম, একটু উপকার হল।

৪ অক্টোবর আচো ল্হগ্পা দুটো গাধা আর একটা ঘোড়া নিয়ে চলল। ঘোড়া আমার জন্য আর গাধা জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা সকাল ছ-টাতেই রওনা হয়ে গেলাম। পুলের সামনে এসে বাঁদিকের উপত্যকায় ঘুরে গেলাম। লাসা-নেপাল-ভারতের এটাই পুরনো রাস্তা। সামনে উপত্যকায় মাটি থেকে আপনা-আপনিই জল বের হচ্ছিল। অনেক জায়গায় মাটি পাঁকের মত হয়ে গেছে। অবাক কান্ড, যেসব খেত কদিন আগেও শুকনো ছিল, সেখানে এখন দোল খাচ্ছিল গমের গাছ আর জলের কেয়ারী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সাড়ে দশটার সময় জিলুঙ্ গ্রামে পৌঁছলাম। এটা বড় গ্রাম এবং আগে হয়ত আরও বড় ছিল। পুরনো ঘরের মাটির দেয়াল এখনো দাঁড়িয়ে ছিল। তিব্বতে যখন চীনের প্রভুত্ব ছিল সে-সময় চীনা অফিসারদের থাকার জন্য ঘর (গ্য খঙ্) বানানো হয়েছিল, এ-গ্রামেও সেরকম ঘর ছিল। সামনে বেশিটাই নির্জন, সুনসান, চওড়া উপত্যকা দিয়ে যেতে হল। পাঁচটার সময় আমরা ল্হা-এর ভিক্ষুণীদের মঠে পৌঁছলাম এবং বাইরের যাত্রীগৃহে উঠলাম। তিব্বতে ভিক্ষুণীদের মঠ কোথাও কোথাও খুবই দুর্গম ও নির্জন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়, এটা সে-রকমই জায়গা। ভিক্ষুদের মত সম্মান ভিক্ষুণীদের নেই, তাই তাদের জীবন অনেক বেশি কষ্টের। বিহারে তাদের জায়গীরও থাকে না। প্রসিদ্ধ মন্দিরও তাদের অধিকারে নেই। কিন্তু তবু তাদের বেঁচে থাকতে হয়। যেখানে পুরো ঘরের জন্য একটিমাত্র বউ আসতে পারে—পাঁচ-সাত ভাইয়ের একটিই পত্নী থাকে কিন্তু মেয়ের সংখ্যা ছেলের চেয়ে কম নয়, সেক্ষেত্রে ভিক্ষুণীদের সংখ্যা বেশি হওয়াটাই জরুরি মনে হয়। যদিও পুরুষরা ভিক্ষুণীদের সম্মান আর সহায়তা করার ব্যাপারে ততটা উদার হয় না, তবে স্ত্রীলোকরা অবশ্যই তাদের দিকে খেয়াল রাখে। এমন কোনো ঘর নেই যে ঘরের কোনো মেয়ে ভিক্ষুণী হয় নি। হয়ত সে ঘরেই থাকে কিন্তু কোনো গুরুস্থান (ভিক্ষুণী-বিহার) তার অবশ্যই রয়েছে।

পরদিন রাত আড়াইটের সময়ই রওনা হলাম, মাত্র দুজনে আর একদিনেই তিনটে বিপজ্জনক জোতের নির্জন রাস্তা দিয়ে! অচো ল্হক্পা (ভাই বুধ)-র যখন চিন্তা নেই, তখন আমারই-বা চিন্তা কিসের? একজন লোক যা করতে পারে তা আমিও কেন করতে পারব না? কঠিন চড়াই ছিল। ওঠা-নামা করে চারটের সময় ঠিমোলা জোতে পৌঁছলাম।

তারপর আবার নেমে পাঁচটার সময় ডোক্‌পাদের (পশুপালকদের) একটা গ্রাম পেলাম। এখনো সূর্যোদয় হয় নি। জায়গায় জায়গায় কালো চমরী গাই চরছিল। ওখানকার লোকেরা স্রেফ ছাতুটুকুর জন্যই একটু চাষ-আবাদ করে তা নইলে ওদের প্রধান জীবিকা ভেড়া আর চামরী গাই। একটা নালার মুখে অবস্থিত ডোক্‌পা-ঘরে আমরা চা খেলাম, তারপর সামনে চড়াই-এ উঠে দুপুরের আগেই পোছেন্‌-লা পৌঁছলাম। ওপরে অনেক দূর পর্যন্ত ঘাসে ঢাকা মাঠের মত মনে হচ্ছিল, এখন ঘাস হলুদ হয়ে এসেছে। এখানে খোলা ডাঁড়াতে আর খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার ভেড়া চরছিল। একদিকে কালো তাঁবু থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। পুরনো ইচ্ছা আবার জেগে উঠল— দুয়েক বছর আমিও যদি কখনো এভাবে কাটাতে পারতাম! কিন্তু এখন সে-জীবন অনেক দূরে!

আবার উৎরাই-এ নেমে আগেকার রাস্তায় এসে পড়লাম। আটোলা পার হলাম আর সাড়ে তিনটের সময় সাক্যা পৌঁছে গেলাম।

সাক্যাতে

কুশো ডোনির্‌-ছেন্‌-পো-এর বাড়িতে লাসা সরকারের দুজন অফিসার ছিলেন। তাঁরা জমির হিসেব করছিলেন। সরকার বোধ হয় মালগুজারী বাড়াতে চাইছিল। দু-একদিন পর অফিসাররা চলে গেলেন আর আমাকে আবার সেই পুরনো ঘরে যেতে হল। এবার সবথেকে জরুরি কাজ ছিল 'যোগাচারভূমি' কপি করা। দুই প্রাসাদের লামা সেই রকমই স্নেহ প্রদর্শন করছিলেন। ভালই হয়েছে যে আমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছি, কারণ এখন তাঁদের দু-সপ্তাহের জন্য এখান থেক কিছু দূরে তপ্তকুণ্ডে যাচ্ছিলেন। আমি 'যোগাচারভূমি' এনে তা কপি করার কাজে লেগে পড়লাম। আট-দশ হাজার শ্লোকের সমান এই গ্রন্থ। আমি পাঁচশোর মত শ্লোক রোজ লিখে নিতাম। কখনো কখনো কুশো ডোনির্‌-ছেন্‌-পো, চামকুশো আর দিকীলার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে সময় লেগে যেত, নইলে আমার সমস্ত সময় চলে যেত লিখতেই।

১৫ অক্টোবর ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গিয়েছিল। রাতের বেলা ঠাণ্ডায় মরে যেতে পারে বলে ফুলের টবও ঘরের ভেতরে রাখা হতে লাগল। ১৮ তারিখ থেকে তো দিনের বেলায় এবং ঘরের ভেতরেও ঠাণ্ডায় হাত জমে কাঁপতে লাগল। বৃষ্টি আর হাওয়া দুটোরই তীব্রতা বাড়ল। ২০ অক্টোবর পাশের পাহাড়ে বরফ পড়ল। এখন অবশ্যই তাড়াতাড়ি করার দরকার ছিল, কেননা রাস্তায় অনেক বরফ ঢাকা ডাঁড়া পেরোতে হতো যেগুলো বেশি বরফ পড়লে কয়েক হপ্তার জন্য দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে যায়। ২১ অক্টোবর 'যোগাচারভূমি' শেষ হল। এমনিতে বইটি সম্পূর্ণ রয়েছে তবে তাতে দুটি ভূমি— 'শ্রাবকভূমি' আর 'বোধিসত্ত্বভূমি' নেই। 'বোধিসত্ত্বভূমি' তো যাইহোক, জাপান থেকে ছাপা হয়ে গেছে। এবার আমার প্রচুর ফটো তোলার ছিল। দুই প্রাসাদের লামা আর তাঁদের পরিবারের ফটো তো তুলেই ছিলাম, সেই সঙ্গে ভারতীয় মূর্তিগুলোরও অনেক ফটো তুলেছিলাম আর সেগুলো ওখানেই

ধুয়েছিলাম। ফটো ধোয়া আর ডেভেলপ করার কৌশল কিছু কিছু জানা হয়ে গিয়েছিল। আমার কাজে চাম্‌কুশো অথবা দিকীলা সাহায্য করত। চাম্‌কুশোকে আমি মজা করে বলতাম, 'এখন আপনার চারটা মাস তপস্যা করার দরকার নেই, আমি যখন ভারতীয় বই আর মূর্তির ফটো তুলব আপনি তাতে সাহায্য করবেন।' প্রথমে তাঁর জাদুর মত মনে হতো যে কি করে ওই হলুদ আস্তরণের ওপর মানুষের চেহারা ফুটে ওঠে। তারপর ছবি ওঠানো সে দেখল। আমি জানালাম, 'ছবি তো সব দর্পণেই ফুটে ওঠে, শুধু ছবি ধরে রাখার উপকরণের অভাব।' আমি চাম্‌কুশোর একটা ফটো তুললাম তাঁর চাকরাণীর সঙ্গে। তারপর সেটা তাঁর সামনেই ডেভেলপ করে দেখালাম। ঘটনাচক্রে সে-ফটো ভাল উঠেছিল। তিনি ত্রিশ হাজার টাকা দামের মুক্তোর ধনুষাকার শিরোভূষণ ধারণ করেছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, 'বাঃ! ছীলিঙ্, (বিদেশী ইউরোপিয়ান) খুব বুদ্ধিমান তো!' আমি বললাম, 'বুদ্ধিমান না হলে কি দেবতাদের মত আকাশে উড়তে পারত।' এদিক দিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে গরমের সময় ইংরেজদের দল চামোলুঙমা (এভারেস্ট)-এ ওঠার জন্য যেত। ওদের সঙ্গে বহু কুলি খাবার-দাবার আর ওষুধের বাক্স বয়ে নিয়ে যেত। কখনো কখনো কোনো কোনো কুলি জিনিসপত্র নিয়ে উধাও হয়ে যেত। দুটো জিনিস চাম্‌কুশোর কাছেও এসেছিল। একটা ছিল কাঁচের বড় জারে শসা ইত্যাদির ভিনিগার দিয়ে বানানো আচার আর অন্যটা ছিল ছোটমত খুব সুন্দর একটা বাক্সে ইনজেকশন দেয়ার ওষুধ। ভিনিগারের আচারটা আমি খেয়ে দেখালাম, কিন্তু কারুরই খাওয়ার সাহস হল না। চাম্‌কুশো কাঁচের পাত্রটা চাইছিলেন, আচারের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। কুশো ডোনির-ছেন্-পো যখন জানতে পারলেন যে ইনজেকশন হচ্ছে হৃদয়রোগ আর বলশালী হওয়ার ওষুধ, তখন তিনি তাঁর রোগীদের ওপর ওগুলো প্রয়োগ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাতে ইনজেকশন দেয়ার সূঁচ ছিল না। আমি এটাও বলে দিয়েছিলাম যে ইনজেকশন দেয়ার সঠিক পদ্ধতি না জেনে ইনজেকশন দিলে তাতে বিপদ আছে।

শিতোগ্ প্রাসাদের গ্যগর লহাখণ্ড (ভারতীয় মন্দির)- এ পাঁচশ-র বেশি ধাতুর মূর্তি রয়েছে, যার মধ্যে দেড়শ ভারত থেকে গেছে। দু-ডজন তো খুবই সুন্দর—কয়েকটা ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত পুরনো। এখানেও বুদ্ধগয়া মন্দিরের পাথরের দুটো নমুনা আছে। আমি অনেক মূর্তির ফটো তুললাম এবং সেগুলো ওখানেই ধুলাম। কিছু ফটো পরিষ্কার ছিল।

অক্টোবরের শেষ নাগাদ শীত খুব বেড়ে গিয়েছিল। ফুন্‌ছোগ্ প্রাসাদের মোহান্ত-রানী পথের জন্য একটা উলের মাফলার আর খাবার নানারককম জিনিস দিয়েছিলেন। তারা প্রাসাদের ছোট ভাই, এ ভাবে বিপজ্জনক জোতে ঘোরার জন্য আমাকে আগে থেকেই অনেক বোঝাতেন। যাবার সময় তিনি নিজের চামড়ার পায়জামা দিলেন। আমি শিগর্চে থেকে পোস্তিনের একটা সলুকা (জ্যাকেট) বানিয়ে নিয়েছিলাম, তাই ঠাণ্ডা থেকে তো এবার নিশ্চিন্ত ছিলাম। কুশো ডোনির্-ছেন্-পোও রাস্তার পক্ষে উপযোগী কত জিনিস দিয়েছিলেন। তিনি সে-সময় খুব খুশি ছিলেন, কেননা তাঁর ছোট চাম্ দিকীলার মধ্যে বংশ রক্ষার চিহ্ন দেখা গিয়েছিল।

ভারতের দিকে

৩০ অক্টোবর আমি সাক্যা ছাড়লাম। চঙ্মা (বিরি)-র গাছে কদাচিৎ কোথাও শুকনো পাতা রয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ের সবুজাভা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে আবার নিজের সেই নগ্ন শুকনো রূপ ধারণ করে ছিল। এই বারে তারাপ্রাসাদ আমার জন্য তিনটে খচ্চর আর নিজের একজন লোক জয়ঙ্-কে দিয়েছিল। মব্জা পর্যন্ত চাম্কুশোর মাসতুতো ভাই লামা গ্যন্জেও সঙ্গে যাচ্ছিলেন। সেই দিনই আমরা মব্জা পৌছে গেলাম। জয়ঙ্ রাস্তা জানত না সেজন্য কুশো ডোনির্লা তারও একজন লোক সঙ্গে দিয়েছিল।

১ নভেম্বর মব্জা থেকে রওনা হলাম। পাচার রাস্তা ধরে শোঙ্পালা পাব হয়ে চিব্লুঙ্ উপত্যকায় চলে গেলাম। আর সেদিন রাতে শাদোঙ্ গ্রামে থাকলাম। পরের দিন (২ নভেম্বর) তোব্ডালা পেরিয়ে ছিকা গ্রামে জলযোগ করলাম। আমাদের বাঁ দিকে ছিল ঝিল, যার তীরে তোব্ড়া গ্রাম। সেটা তিব্বতের ভেতর কিন্তু জায়গীর সিকিমের রাজার। ছিকার সামনে তিঙ্রীর মত বিশাল ময়দান। এখানেও ঘাস আছে, কোথাও কোথাও বালির টিলা রয়েছে। সোয়া ৫ ঘণ্টা চলার পর আমরা এই ময়দান পেরতে সক্ষম হলাম। পথে কোনো বসতি ছিল না। সূর্যাস্তের সময় আমরা উঁচেশমা গ্রামে পৌছলাম—এই প্রদেশের নাম শমা।

এবার যদিও ময়দান ছিল না, তবু রাস্তা ছিল সমতল। দেড় ঘণ্টা চলার পর আমরা খম্বাজোঙ্-এর মযদানে পৌছলাম। রাতে পৌনে দু-ঘণ্টা হেঁটে আটটার সময় আমরা খম্বা গ্রামে পৌছলাম। এখন পুরো শীত ছিল—ঠাণ্ডার কথা আর কি বলব? চা-ছাতু খাওয়া হল। ঘোড়াকে ঘাস-দানা দেয়া হল। তিন ঘণ্টা বিশ্রামের পর আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। রাস্তায় কোথাও কোথাও ক্যাঙো (জংলী গাধা)-র দল দেখা গেল। কীরুলার চড়াই খুব কঠিন ছিল না। ডাঁড়া থেকে কিছুটা নামার পর ডোক্পাদের গ্রাম কীরু পেলাম। এখানে ১০, ১২টি ঘর আছে, তবে চমরী গাইয়ের পিঠে করে অন্য প্রান্ত কাঠ বয়ে আনার সুবিধে আছে, সেজন্য বাড়িগুলো ভালভাবে তৈরি হয়েছে। এভারেস্ট যাত্রীরা এই রাস্তা দিয়েই যায়। আমবা দুটো বাজতেই পৌছে গিয়েছিলাম। সামনে লাছেন্-এর বড় জোত ছিল। আর পরবর্তী লোকালয অনেকটা দূরে, তাই আজ এখানেই থেকে গেলাম। বরফের জন্য অনেকদিন ধরে রাস্তা বন্ধ হয়ে ছিল। আজ লাছেন্ থেকে লোক এল, জানলাম, বরফ বেশি নেই, যা আছে তা শক্ত হয়ে গেছে তাই বাস্তা খুলে গেছে।

ভারতে (১৯৩৬-৩৭)

সাক্যা থেকে আনা পিস্তল আমি কীরুতে রেখে এসেছিলাম, কেন না, ডাঁড়া পার হতেই আমি সেই দেশে পৌছে যাচ্ছি যেখানে আত্মরক্ষার জন্য পিস্তল বা বন্দুক হাতে রাখলে লোককে জেলের হাওয়া খেতে হয়। ৪ নভেম্বর ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমরা যখন গ্রাম

থেকে বের হলাম, তখন হিমালয়ের বরফ ঢাকা চুড়োগুলোকে সূর্যের কিরণ সোনালি করে তুলছিল। শীত খুব ছিল কিন্তু উল আর চামড়া জড়ানো শরীরের সে কি ক্ষতি করবে? দু ফার্লং যাওয়ার পর রাস্তায় বরফ চলে এল। চারদিকে বিস্তৃত হিমক্ষেত্র। ডানদিকে, দূরে ছিল হিমালয়ের শিখরের সারি। পৌনে দু ঘণ্টা চলার পর আমরা লাছেন্-জোতে পৌঁছলাম। চড়াই-এর চেয়ে উৎরাই একটু বেশি জোরাল ছিল কিন্তু অসুবিধে হয় নি। জোত থেকে একটু নিচে এসে তিব্বত এবং সিকিম রাজ্য—তিব্বত ও ইংরেজ সরকার তথা তিব্বত ও ভারতের সীমা পাওয়া গেল। দেড় ঘণ্টা চলার পর আমরা একটা ছোটমত ঝিল পেলাম। ঝিলের পর থেকে এবার রাস্তায় বরফ কম ছিল। গ্রাম ছেড়ে আসা ৪ ঘণ্টা হয়েছিল। পৌনে দশটা বাজছিল। সুতরাং চা-পানের কোনো ব্যবস্থা করা দরকার ছিল। রাস্তা থেকে ডানদিকে একটু ওপরে ইয়াকের কালো লোমের তাঁবু দেখা গেল। আমরা সেখানে চলে গেলাম। তাঁবুতে আগুনের কাছে বসলাম। জানতে পারলাম, এরা হচ্ছে লাছেনের চীপোন্ বঙ্‌গ্যল-এর ডোক্‌পা (পশুপালক)। শীতের দুটো মাস শুধু এরা কোনো এক জায়গায় থাকে, নইলে নিজেদের ভেড়া আর চমরি গাই নিয়ে দশ মাস নতুন-নতুন চারণক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ায়।

দু-ঘণ্টা বিশ্রামের পর আমরা আবার চললাম। সামনে নদীর স্রোত পেলাম। তিনটে পর্যন্ত রাস্তায় বরফ পড়ে থাকতে দেখা গেল। সামনে ছোটমত একটিমাত্র ঘর এল আর তারপরই সড়ক পেয়ে গেলাম। এই সময় মেঘের বিশাল বাহিনী জোতের দিকে উড়ে যাচ্ছিল। আমাদের ভাগ্য ভাল, ওখানে না-জানি কত বরফ পড়ত। আমরা মুশকিলে পড়ে যেতাম। চারটে থেকে ন্যাড়া পাহাড়ের জায়গায় ঝোপঝাড়ওলা পাহাড় দেখা যেতে লাগল। তারপর দেবদারু এল এবং এবার কুড়ি মাইল জুড়ে পাহাড়ের ওপরে দেবদারুই ছেয়ে ছিল। পাহাড়ের ওপরে ভূর্জপত্রের গাছও ছিল। পৌনে ছ-টার সময় আমরা যখন থঙ্‌গূ-এর ডাকবাংলোয় পৌঁছলাম তখন অন্ধকার হয়ে আসছিল। আমার কাছে ডাকবাংলোয় থাকার অনুমতিপত্র ছিল না, তবে চৌকিদার তার পাশের কুঠরীতে থাকার জায়গা করে দিল। এখন আমরা গ্যাংটক থেকে (মোটর পথে) ৬২ মাইল দূরে ছিলাম। আমাদের বাক্স বাইরে পড়ে ছিল। আমি সেটা ভেতরে রাখার জন্য বললাম তো চৌকিদার বলল, 'এখানে কোনো দুশ্চিন্তা নেই।' 'দুশ্চিন্তা' ছিল না—এটা ঠিক কথা। তিব্বতে যাত্রা করার সময় যেভাবে সবসময় প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত সজাগ রাখা প্রয়োজন হচ্ছিল এখন তার দরকার ছিল না, শীতও এখন তেমন বোধ হচ্ছিল না।

সিকিমে—সাড়ে পাঁচ মাস পর ব্যাকুল চোখ আবার গাছে ঢাকা পর্বত দেখতে পেল আর সে-গাছ ছিল দেবদারুর মত সুন্দরতম গাছ। ভোর পৌনে ছ-টার সময়ই আমরা রওনা হয়েছিলাম। আমি পোস্তিন খুলে ফেলেছিলাম তবু গরম লাগছিল। ৪ মাইল যাওয়ার পর ইয়াতুঙ গ্রাম পেলাম। লাছেন্-এর গ্রামবাসীরা গরমের সময় এখানে এসে থাকে আর আলু ফাফড়ের চাষ করে। এখন পুরো গ্রাম ছিল নির্জন। একটা ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে আমরা সেখানে গেলাম। ওখানে চীপোন পেগ্যল্ (পত্মরাজ)-এর ছেলে ছিল। সে চা, ভাত

আর মাংস বানালো। খেয়ে উঠে সোয়া দু ঘণ্টা বিশ্রাম করার পর আমরা আবার চললাম। ১ মাইল যাওয়ার পর খেয়াল হল যে ক্যামেরা ঘরে ফেলে এসেছি। ফিরে এলাম এবং দেখলাম তালা বন্ধ। জয়ঙ্কে ওপরে পাঠালাম। জানা গেল, ক্যামেরা ঘরে আছে এবং তরুণটি কাল নিজের সঙ্গে নিয়ে আসবে। দু-তিন মাইল চলার পর বেশ বড় বড় দেবদারু গাছ দেখা যেতে লাগল, তারপর বাঁশী (পাতলা বাঁশ)-ও দেখা যেতে লাগল। আজ ১৪ মাইল চলার পর লাছেন্ এল। 'এসো'-তে এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে চললাম। আমি জানালাম যে, সাক্যা-লামা চীপোন বঙ্গ্যল-এর জন্য একটি পরিচয়পত্র দিয়েছেন। ডাকবাংলোর কাছে যাওয়ার পর তিনি বললেন, 'আমার নামই বঙ্গ্যল।' তিনি বাংলোর সামনের এক তিব্বতী বুড়োকে ডাকলেন আর তাকে থাকার জন্য একটা কুঠরী দিতে বললেন। ঘরটা খারাপ ছিল না। এবার আলু-ভাতের মুলুক এসে গিয়েছিল, যদিও চাল এখানে হয় না। চিপোন ঝুড়িভর্তি আপেল পাঠালেন।

লাছেনে এখন আপেলের অনেক বাগান হয়েছে। ফিনল্যান্ডের এক মহিলা বহু বছর ধরে এখানে খ্রীস্টধর্মের প্রচার করছেন, তাঁর আপেল বাগান দেখে এখানকার লোকেরাও আপেল লাগাতে শুরু করে। এখন ছিল আপেল হওয়ার সময়। লাছেন্বাসীরা খচ্চর আর ঘোড়ার পিঠে করে আপেল নিচে নিয়ে যাচ্ছিল আর চাল কিনে নিয়ে আসছিল। গ্রামে কোনো ঘোড়া বা খচ্চর ছিল না। তৃতীয় দিনে (৭ নভেম্বর) সাক্যার লোকেরা ফিরে গেল। আমি সেই দিন গরম জলে, সাবান মেখে সকালে আর সন্ধেতে দুবার স্নান করলাম। মাসের পর মাস ধরে জমে থাকা ময়লা সেদিনই শরীর থেকে চলে গিয়েছিল কিনা তা বলতে পারি না। কাপড় ধোয়ালাম, তবে উকুন তখনো থেকে গিয়েছিল।

ঘোড়ার আশায় বসে থাকাটা ঠিক না, সে কতদিন পরে আসবে কে জানে। তার ওপর আপেলের বদলে আমার জিনিসপত্র নিয়ে যেতে চাইবে কিনা তাতেও সন্দেহ ছিল। চীপোন-ও ছিলেন নির্বিকার, তাই আমি নিজেই চেষ্টা শুরু করলাম। গৃহস্বামী নিজে ছিল ভোটিয়া। তবে সে বিয়ে করেছিল লাছেনের মেয়েকে। সে আমার খাওয়া-দাওয়া, স্নান-টানের কোনোরকম অসুবিধে হতে দেয়নি। সে বেচারা এদিকে-ওদিকে খোঁজটোজ করছিল কিন্তু কোনোদিক থেকেই কোনো আশা ছিল না। সে বলল, 'আমার কাছে দুটো গাধা আছে, আপনি চাইলে আমি সেগুলোকে পাঠাতে পারি।' বাক্স খুব ভারি ছিল না—সে উঠিয়ে দেখল, আর বলল যে গাধা নিয়ে যেতে পারবে। এরপরে দরকার একটা লোকের কিন্তু ওখানে কোনো লোকও পাওয়া যাচ্ছিল না। বুড়ো নিজেই ঘরের কাজ ফেলে যেতে পারছিল না। শেষে ও বলল, 'আমার মেয়ে মেতোক্ (ফুল) গাধার সঙ্গে যেতে পারে কিন্তু মালপত্র ওঠানো-নামানোর কাজে আপনাকে সাহায্য করতে হবে।' ওখানে বসে অপেক্ষা করার চেয়ে আমি যাওয়াই ভাল মনে করলাম।

৮ নভেম্বর চা খেয়ে সাড়ে সাতটার সময় আমরা চারটি প্রাণী লাছেন্ থেকে রওনা হলাম। চারটি প্রাণী ছিল—আমি, মেতোক্ (২০ বছরের স্বাস্থ্যবতী তরুণী) নোর্বু (মণি) আর ছেরিঙ্ (দীর্ঘায়ু)—নোর্বু আর ছেরিঙ্ আমাদের গাধাদের নাম। আমি ভাবছিলাম—কত বছর ধরে একটা সাধ ছিল যে গাধা-খচ্চর অথবা ভেড়ার পিঠে নিজের

সামান্য মাল চাপিয়ে তিব্বতে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াব। সময় কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ এত বেড়ে গেছে যে সেই সাধ পূর্ণ হওয়ার আশা চলে যেতে বসেছিল। কিন্তু এখন দু-চার দিনের জন্যে তো আমার গাধার পরিবার হয়েই গেছে। আমি ছিলাম সিদ্ধ 'গাধাপা'—৮৪ সিদ্ধের যুগে আমি যদি এভাবে কয়েক বছর স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতাম তাহলে লোকে আমাকে ঐ নামেই ডাকত। ওপরের দিকে যদি পাঁয়ে হেঁটে উঠতে হতো তাহলে তো এরকম স্বাচ্ছন্দ্য কল্পনাও করা যেত না। আমার হাত খালি ছিল। এক-আধ জায়গায় সামান্য চড়াই আসছিল, তা নইলে পুরোটাই ছিল শুধু উৎরাই আর উৎরাই। দেবদারু থেকে মৃদু সুগন্ধিত বাতাস আসছিল আর তারই ছায়াতে চলতে হচ্ছিল। হিমালয় সামনে রেখেছিল তার সুন্দরতম দৃশ্য। আমি হয়ত কাব্য করতে শুরু করতাম কিন্তু অনেক বছর আগে চেষ্টা করে দেখে নিয়েছিলাম যে আমার সেবা কবিতা-সুন্দরীর পছন্দ নয়, একজন বুদ্ধিমান লোকের মত আমি পুনরায় সেই পথে পা বাড়ানোর চেষ্টা করি নি।

লাছেন্ থেকে ৩ মাইল নিচে নামতে নামতে দেবদারু রাস্তার ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সামনে এগোনোর সাথে সাথে গরম বেশি বোধ হচ্ছিল। জলের ঝর্ণার অভাব কষ্ট এদিকে নেই, কাঠের সমস্যা। দুটো নাগাদ আমরা একটা ঝরনার কাছে পৌঁছলাম। দুজনে মিলে গাধার পিঠ থেকে মালপত্র নাগালাম; গাধা সবুজ ঘাসে চরতে লাগল। আমি শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুনের ব্যবস্থা করতে লাগলাম। মেতোক্ অ্যালুমিনিয়মের পাত্র নিয়ে ঝর্ণায় মাজতে আর জল ভরে আনতে গেল। হ্যাঁ, এখন আমরা তিব্বতে ছিলাম না। এখন এখানে এঁটো-কাটার বিচার ছিল, পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর ছিল। মেতোক্ যদিও ভোটিয়া বাবার মেয়ে তবু তার পুরো ২০ বছরের জীবন লাছেন্-এই কেটেছিল। সমতলের মত পরিষ্কার হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, তবে ভোটিয়া ধরন তার এখন ছিল না। লাছেনের লোকদের চোখে কিছুটা তিব্বতী ছাপ অবশ্যই থাকে তবে তাদের অনেক বেশি এল্‌মাবাসীদের মত মনে হয়—রঙ বেশি ফর্সা আর মুখ গোলাকার। যাক্‌গে, চা হল। এবার মিষ্টি চায়ের দেশ আরও একটু নিচে নেমে পাওয়া যাবে। আমরা নোনতা চা তৈরি করলাম আর পেয়ালাতেই মাখন ঢেলে তা পান করলাম। ছাতু খাওয়াও বন্ধ হয়েছিল। তার জায়গা নিয়েছিল চিঁড়ে।

আবার আমরা গাধার পিঠে মাল তুললাম আর নিচের দিকে চললাম। গাধা খুব পরিশ্রমী পশু এবং প্রায় ততটাই বোঝা নিয়ে চলে যতটা খচ্চর নেয়। হ্যাঁ, ওর গতি একটু ধীর। চড়াই হলে ও যেখানে-সেখানে বসেও পড়ে। কিন্তু আমাদের তো যাওয়ার ছিল নিচের দিকে। যখন আমরা চুঙথঙ-এ পৌঁছলাম তখনো দিনের আলো ঘণ্টাখানেক ছিল। এখানে ডাকঘরও আছে আর ডাকবাংলোও আছে। শিগর্চের পর খবরের কাগজ পাইনি। সভ্যতার ভেতর পা রাখতেই মানুষ কাগজ দেখার জন্য ছটফট করতে থাকে। আমি ডাকঘরে গেলাম। পোস্টমাস্টার খুব সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। আমি চিঠি লিখে সেখানে ফেলে দিলাম। ডাকবাংলোর সঙ্গে কয়েকটা ঘর ছিল, তারই মধ্যে একটাতে খাবার বানানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল। সন্ধেতে পোস্টমাস্টার স্বয়ং সেখানে এলেন আর শুধোলেন, 'কোনো অসুবিধে নেই তো?' মেতোক্ ভাত আর আলু-শাক রান্না করেছিল। তিব্বতের

সীমার কাছাকাছি গেলে—সে নেপাল হোক বা সিকিম অথবা গঙ্গোত্রী—সব জায়গায় ভাত আর আলুর তরকারি খুব ভাল খাবার মনে করা হয়। ওখানকার লোকে জিম্‌বূ (জংলী পেঁয়াজ)-কে মসলা হিসেবে ব্যবহার করে, তাতে খাবার খুবই সুস্বাদু লাগে। রাতে বেশি গরম বোধ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে এপ্রিল-মে-র রাতে বেনারসে রয়েছি—যদিও এটা ছিল নভেম্বর মাস। আসলে এখানে অতটা গরম ছিল না কিন্তু আমি যে ভীষণ ঠাণ্ডা জায়গা থেকে এসেছিলাম। যদি নিচের থেকে ওপরের দিকে যেতাম তাহলে এখানে খুব শীত লাগত।

পরের দিন (৯ নভেম্বর) সাড়ে পাঁচটায় একটু অন্ধকার থাকতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। একটু নিচে লোহার ঝুলন্ত পুল পেলাম। সেটা পার হয়ে আমরা সিকিম-পেট্রোল-পুলিশের চৌকির সামনে দিয়ে গেলাম। এখানে একজন হাবিলদার আর দু-জন সেপাই থাকে। যদি আমি নিচ থেকে আসতাম তাহলে এরা সিকিমের ইংরেজ অফিসারের অনুমতিপত্র ছাড়া আমাকে ওপরে যেতে দিত না। লাছেন্ আর লাছুঙ্ দুটো জোত পার হয়ে তিব্বতের রাস্তা এখানে পাওয়া যায়, আর নিচ থেকে যারা আসছে তাদের এই পুলই পার হতে হয়। চৌকিতে ফুল খুব সুন্দর ফুটেছিল। এখনো পাহাড় নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত জঙ্গলে ঢাকা ছিল, কিন্তু দেবদারুর চিহ্ন ছিল না। এদিককার গাছও ভারি লতা জড়িয়ে ছিল। এদের পাতা কলার পাতার মত বড় বড় আর এত ভারি যে অনেক গাছ তো বোঝার ভারে বেঁকে গিয়েছিল। আমি পালি গ্রন্থে পড়েছিলাম যে 'মালুবা' নামে একরকম লতা হয়, তারা বর্ষার জল এত শুষে নেয় যে, যে-গাছের ওপর তারা চড়ে থাক গা বোঝার ভারে ফেটে যায়। এরকম লতা দেখেই মালুবার কল্পনা হয় নি তো? এদিকে লিচপা (সিকিমের) লোকদের বসতি ছিল। এদের পোশাক তিব্বতীদের থেকে আলাদা, রঙও খুব হলদেটে ছিল। এক জায়গায় আমি চা খেলাম, ফের চললাম। একটা ঝুলন্ত পুল পার হয়ে নদীর বাঁ দিকে চলে এলাম। রাস্তা বেশির ভাগই চড়াই-এর ছিল—বড় বড় গাছ আর সবুজ মাঠের মধ্য দিয়ে। একটা ডাকবাংলো পেরোলাম। এদিকে বড় এলাচের অনেক বাগান ছিল। কোনো এক সময় ভারতের জন্য বড় এলাচ দিত নেপাল। কিন্তু গত মন্দায় (১৯২৯-৩২) এলাচের দাম খুব পড়ে গিয়েছিল। নেপাল এলাচ চাষে অবহেলা করল। এখনকার সিকিমের জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশি সংখ্যা হচ্ছে গোর্খাদের, যারা নেপাল থেকে এসে এখানে থেকে গেছে। তারা এখানেও এলাচের খেত করেছে। এলাচের পাতা হলুদ অথবা কচুর[১]-এর পাতার মত হয় আর এলাচগুলো মূলের কাছে ছোট ছোট সুতোতে লেগে থাকে।

গাধা যে খুব ধীরে-ধীরে চলছিল সেটা বোঝা যাবে এর থেকে যে, দুদিনে আমরা লাছেন্ থেকে মাত্র ২২ মাইল আসতে পেরেছিলাম। আজ পুল পার হওয়ার সময় ৩ কুড়ি ৭ (৬৭) বছরের এক ভোটিয়া ভিক্ষুণী এসে জুটল। সে বেচারিও ধীরে-ধীরেই চলতে পারে। আমিও ভাবলাম যে ৪-এর জায়গায় ৫ ভাল, তাই অনী (ভিক্ষুণী)-কেও সঙ্গে নিয়ে

---

[১] এক ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ (*Curcuma reclinata*)।—স-ম-

নিলাম। সুন্‌তম্ যখন আর আড়াই মাইল দূরে, তখনই গাধারা জবাব দিয়ে দিল। এখন মাত্র সাড়ে তিনটে বেজেছিল, তবে আজ চড়াই খুব ছিল তাই নোর্বু আর ছেরিঙ্ যদি বিশ্রাম করতে চাইছিল, তাতে কোনো দোষ ছিল না। এখানে সবুজ মাঠ ছিল, চরে বেড়ানোর জন্য ঘাস ছিল, কাছেই জলের ঝর্ণা ছিল, শুকনো কাঠ জঙ্গলে এমনিই পড়েছিল, খাওয়া-দাওয়ার জিনিস আমাদের সঙ্গে মজুত ছিল। তাই রাতে এখানেই থাকা ঠিক করলাম। হ্যাঁ, সে-সময় কেউ আমাদের বলে দেয়নি যে, এখানে চিতা রয়েছে যাদের কাছে নোর্বু আর ছেরিঙ্ রসগোল্লার চেয়ে মিষ্টি। যদি এটা জানতাম, তাহলে আমরা অবশ্যই নোর্বু আর ছেরিঙ্‌কে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরের গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে যেতাম। যাক্‌গে, ওদের ভাগ্য ভাল ছিল। আমরা সারারাত এমনিই ছেড়ে দিয়েছিলাম, কোনো চিতা ওদের কাছে আসেনি। এখন চা আর রান্নার জন্য আমরা তিনজন লোক ছিলাম। ৩ কুড়ি ৭ বছরের (জিজ্ঞেস করায় বুড়ি তাই বলেছিল) অনী এখনো হাত-পা চালাতে পারছিল। তার পিঠে এত জিনিস ছিল যে সেগুলো নিয়ে দু-মাইল হাঁটলেই আমি থপ্ করে বসে পড়তাম। এই জায়গায় আসার একটু আগে মিষ্টি চা আর ছঙ্-এর দোকান পেয়েছিলাম, আমরা ওখানে মিষ্টি চা খেলাম আর পয়সায় তিনখানা করে কমলালেবু কিনে নিলাম। অনীর সঙ্গে দলাই লামা আর ভুটানের অন্যান্য লামাদের সম্বন্ধে কথা হতে লাগল। সে ছিল সম্ভবত ল্‌হোখা প্রদেশের, সেখানেও কোনো ছেলে ছিল যাকে দলাই লামার অবতার বলা হচ্ছিল। অনী বলল, 'আমিও দর্শন করতে গিয়েছিলাম। এখন ছোট ছোট হাত, তিন বছরের রিন্‌পোছে (রত্ন-মহারাজ, মহাগুরু) তো বটেনই। আমার মাথায় তাঁর হাত রেখে তিনি আশীর্বাদ করলেন।' যতদিন দলাই লামার সমাপ্তি ঘোষিত না হচ্ছে ততদিন না-জানি কত ছোট-ছোট হাত এইভাবে আশীর্বাদ দিতে থাকবে। রাতে মেতোকের দাঁতে ব্যথা হল, আমি গরম জলে নুন ঢেলে কুলকুচো করার জন্য বললাম।

পরের দিন (১০ নভেম্বর) আমরা পাঁচটার সময় রওনা হলাম। ৪ মাইলের রাস্তা সাড়ে তিন ঘণ্টায় পেরোলাম আর মঙ্গন পৌঁছে গেলাম। মঙ্গন-বাজার সড়কের পাশেই। ন-দশটা দোকান রয়েছে যার মধ্যে দুটো পানের। এর অর্থ হল, ভারতীয় সভ্যতা এখানে পুরোদমে পৌঁছে গেছে। ছাতা (বলিয়া)-র বাবু রমাশংকরের দোকানে লসকরীপুরের (একমা) ছব্বুরাম ছিল গোমস্তা। ছাপরার ভাষা বলতেই পীত বসনের ভেদাভেদ ঘুচে যেতে লাগল, এখন সে ভাত না খাইয়ে এখান থেকে কি করে যেতে দেয়? ভাত হতে থাকল। আমি মেতোক্ আর অনীকে রান্না করে খেয়ে নিতে বলে এলাম।

সাপ্তাহিক 'বিশ্বামিত্র' পাওয়া গেল। দেশ-বিদেশের খবর পড়লাম। দুপুর নাগাদ আবার পাঁচজনের 'মরুযাত্রি দল' রওনা হল। আমাদের তো গরম বেশ ভোগাচ্ছিল আবার ছেরিঙ্, নোর্বু ঢিমে তালে চলছিল। একটা বড় ঝুলন্ত পুল এল, সেটা পেরিয়ে একটু এগিয়ে যাওয়ার পর লাছেনের খচ্চরওলাদের পেলাম। এক যুবক দু-তিনটে শুকনো পাতা আর কাগজ দিয়ে সিগারেট বানিয়ে মেতোক্‌কে টানতে দিল। এর চেয়েও বড় কাজ সে করেছিল—সে আমাদের জানিয়ে দিয়েছিল, 'এই জঙ্গলে চিতা ইত্যাদি রয়েছে, গাধাদের সাবধানে রাখবেন।' আমরা আরও কয়েক মাইল এগোতেই নোর্বু আর ছেরিঙ্‌কে এগিয়ে

নিয়ে যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ল। আশেপাশে অনেক শুকনো গাছ পড়ে ছিল। জলও ছিল কাছে, আর সামনে জংলী বাঁশের ডাঁই করা ছিল। জঙ্গল তো এমন ঘন ছিল যে, সন্ধের আগেই সেখানে অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল। মেতোকের জ্বরও এসে গিয়েছিল। এখানেই আমরা গাধার পিঠ থেকে মালপত্র নামালাম, মেতোক্ কোনো কাজ করতে পারছিল না। সে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। অনীকে আমি খাবার বানাতে বললাম আর আমি নিজে বাঁশের পাতা ছিঁড়তে লাগলাম। হাত কয়েক জায়গায় ছড়ে গেল ঠিকই তবে আমার দুই সাথীর খাবার বানানোর মত পাতা আমি পেড়ে নিলাম। চিতার হাত থেকেও বাঁচার ব্যবস্থা করা দরকার ছিল, আমি দু-জায়গায় বড় বড় কাঠ দিয়ে ভালমত আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। আগুনের কাছে জংলী-জানোয়ার আসে না এটা জানতাম। আমরা নিজেদের জিনিস তো একটু দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম, এবং নোর্বু আর ছেরিঙকে দুটো আগুনের মাঝখানে বেঁধে দিয়েছিলাম। অনী আর আমি একটু কিছু খেলাম, মেতোকের জ্বর ১০৪ ডিগ্রির চেয়ে কম ছিল না। কাল থেকেই আমি দেখছিলাম যে, ও ঝর্ণার ঠাণ্ডা জল খেয়ে যাচ্ছে। গরম লাগছে, তাই বরফের মত ঠাণ্ডা আর অতি মিষ্টি জল কে না খেতে চাইবে। আমি মেতোক্‌কে কতবার মানা করেছিলাম কিন্তু ও শোনেনি। সে-রাতে ও তো জ্বরে বেঁহুশ ছিল কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল গাধাগুলোর জন্য। অন্ধকার হয়ে গেল, এমন অন্ধকার যে জ্বলন্ত আগুন আর তার আশেপাশের এক-দেড় হাত জায়গা ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছিল না। অনেক কীটপতঙ্গের ঝংকার শোনা যেতে লাগল, তারপর রাত নিঝুম হয়ে গেল। যখন নটা কি দশটা বেজে গেছে তখন 'ক্যু' 'ক্যু' করে আওয়াজ কানে এল। অনী বলল, 'জিক্'.(চিতা বা তেন্দুয়া)। এবার আর কার ঘুম আসবে? কখনো আমার মনোযোগ চলে যাচ্ছিল জিক-এর আওয়াজের দিকে, আবার কখনো নোর্বু আর ছেরিঙের দিকে। কাঠ যেই পুড়ে যাচ্ছিল অমনি তাকে আগুনের ওপর ঠেলে দিচ্ছিলাম। আমার মনে ভয় নয়, বরঞ্চ উৎসাহ বেশি ছিল। মানুষ যখন তার বিপদে পড়া জীবনের প্রবলভাবে মুখোমুখি হয়, তখন তার মনে এক ধরনের উৎসাহ, এক ধরনের সাহস এসে যায়। সেটারই মাত্রা আরও বেড়ে যায় যখন তাকে একাই অনেক সঙ্গীর রক্ষার ভার নিজের ওপর নিতে হয়। রাতে একটু টুপটাপ বৃষ্টি হল। ভাগ্যি ভাল যে বেশি বৃষ্টি হল না, তা নইলে আগুন জ্বালিয়ে রাখা মুশকিল হতো।

১১ নভেম্বর চা খেয়ে রওনা হলাম। আকাশে এখনো মেঘ ছিল। মেতোকের এখন জ্বর ছিল না। নোর্বু আর ছেরিঙ্-ও তাজা হয়ে উঠেছিল। রাস্তা ভাল ছিল। জায়গায়-জায়গায় ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছিল। চারদিক থেকে পাখিদের কলরব শোনা যাচ্ছিল। দু ঘণ্টা চালর পর আমরা দিক্‌ছু পৌঁছে গেলাম। ন-দশটা দোকানের বেশ ভাল বাজার এটা। দোকানদারদের মধ্যে কিছু মারোয়াড়ী আর কিছু বিহারীও ছিল। মিষ্টি চায়ের দোকান ছিল। গাধাগুলোকে শঙদম্ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য নিয়েছিলাম কিন্তু দুপুরের পর মেতোকের আবার জ্বর এসে গেল। এগিয়ে যেতাম কি করে? গরমও খুব বেড়ে গিয়েছিল আর লাছেনের মত ঠাণ্ডা জায়গার লোককে আরও গরম জায়গায় নিয়ে যাওয়া ঠিক হতো না। আমি এদিক-ওদিক খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, গ্যাংটক-এর বাবু তোব্‌দন এখানে এসেছেন। তিনি শিক্ষিত

মানুষ। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি বললেন, 'এখান থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত ঘোড়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।' কিন্তু মেতোক্ অসুস্থ, তাকে ছেড়ে আমি কি করে যেতে পারতাম? মেতোকের পরিচিত লাছেনের একজন লোক এসে গেল। সে বলল, 'পরদিন সকালে আমি ফিরে আসবো তারপর মেতোক্‌কে ওপরে নিয়ে যাব।' মেতোকের জ্বরও সকালে ছেড়ে গেল। অনীকে আমি খাওয়া-দাওয়ার জন্য পয়সা দিয়ে দিলাম। মেতোক্ আশ্বাস দিল যে কোনো চিন্তা নেই, লোকটি নিশ্চয় আসবে।

গ্যাংটক এখান থেকে ১৩ মাইল। এক টাকা করে দুজন কুলি পাওয়া গেল মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য আর তিন টাকায় চড়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়া। সোয়া দশটার সময় বাবু তোব্‌দন-এর সঙ্গে আমি গ্যাংটকের উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রথমে সাড়ে আট মাইল চড়াই ছিল—পেলুঙ্‌লা জোত পার হলাম। আধ মাইল পর চায়ের দোকান ছিল, চা খেলাম। তারপর একটু এগোতেই গ্যাংটক দেখা যেতে লাগল। ডানদিকের পাহাড়ের ওপর ছিল সিকিমের মহারানীর মহল। আগের (১৯৩৪) তিব্বত যাত্রায় আমি যখন গ্যাংটক এসেছিলাম তখন মহারাজা আর মহারানীর সঙ্গে তাঁদের মহলেই দেখা হয়েছিল। দুজনে কতক্ষণ ধরে তিব্বতে আমার কাজ আর বৌদ্ধধর্ম নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন। আমি আমার লেখা তিব্বতী ভাষার প্রথম পুস্তক উপহার দিয়েছিলাম, মহারানী তখনই সেটা এক লামাকে দেখাতে গিয়েছিলেন, যিনি ওপর থেকে তাঁর গুম্বায় নেমে এসেছিলেন। সেই বছরও আমি মহারানীকে তাঁর ভাই রকসা কুশোর মহলে দেখেছিলাম, অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল। এখন শুনলাম মহারাজা-মহারানীর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং মহারানী এখন এই মহলে থাকেন। এটাও জানা গেল যে মহারানীর কোনো মেয়ে আছে, যাকে মহারাজা স্বীকার করেন না। তাঁর মত খাটলে তিনি অন্যান্য হিন্দু মহারাজাদের মত ব্যবহার করতেন নিজের রানীর সঙ্গে কিন্তু মহারানী ভুটানের মেয়ে, এক বড় জমিদারের মেয়ে, অনেক বুদ্ধি ধরেন। তিনি ইংরেজ সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং এখন ডাঁটের সঙ্গে গ্যাংটকে রয়েছেন।

আমি বাবু তোব্‌দনের ঘরে উঠলাম। ডাকঘরে কিছু চিঠি পেলাম তবে অনেক চিঠি তারা ফিরিয়ে দিয়েছে। হাইস্কুলের শিক্ষক দুই বিহারী বন্ধু—শ্রীব্রজনন্দন সিংহ আর সংস্কৃত-শিক্ষক মিশ্রজীর সঙ্গে আলাপ হল। গেশে ধর্মবর্ধন দার্জিলিঙে ছিলেন, তাঁকে শিলিগুড়িতে আসার জন্য তার করে দিয়েছিলাম। ১৪ নভেম্বর এগারোটার মোটরে রওনা হলাম। ১ ঘণ্টায় শিঙতাম্ পৌঁছে গেলাম। মেতোক্ যদি অসুস্থ না হতো তাহলে গাধা নিয়ে এখানে আসার কথা ছিল। সাতটার সময় শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলাম। ঘণ্টাখানেক পর গেশেও চলে এলেন। নটার সময় আমরা কলকাতা মেলে বসে পড়লাম।

পাটনা আর প্রয়াগে

১৫ নভেম্বর সকাল সাতটায় শেয়ালদা পৌঁছে গেলাম। ধাওলে, পণ্ডিত বেনারসীদাস চতুর্বেদী এবং বিমালনন্দ স্টেশনে ছিল। আমরা ওখান থেকে মহাবোধি সভায় গেলাম।

এই বারের অনুসন্ধানের বেশি প্রচার হয়েছিল খবরের কাগজে, এমনিতে তো প্রথম তিব্বত যাত্রা থেকে ফেরার পরই আমার কাজের গুরুত্ব স্বীকার করা হচ্ছিল। বক্তব্যের জন্য কাগজওলারা ছোটাছুটি করতে লগাল। আমি আমার অনুসন্ধানের গুরুত্ব বুঝতাম আর এটাও বুঝতাম যে, মানুষ যেই এর খোঁজ পাবে অমনি আমাকে বাজারে নিয়ে যাওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করা হবে। কিন্তু আমি এখন সেই অবস্থায় ছিলাম যখন তার কোনো তৃষ্ণা আমার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। সেই সঙ্গে এটাও জানতাম যে, আমি 'বাইসবী সদী' আর 'সাম্যবাদ হী ক্যোঁ?'-তে যে হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছি সেই মন এখনো আমার মধ্যে রয়েছে। এখন আমি খুব জোর করে নিজেকে গরিবদের জন্য লড়াই-এর ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে রেখেছিলাম, হয়ত বেশিদিন আমি এরকমটা করতে পারতাম না। ১৯২১-২২-এ যখন অসহযোগের খুব ক্ষমতা ছিল তখনও আমি আমার বন্ধু নারায়ণবাবুকে বলতাম, 'আপনার (কংগ্রেস) রাজ্যে জানি না কতবার আমাকে জেলে আসতে হবে।' আমি ভাল করে জানতাম যে আজ যারা আমাকে সম্মানিত করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, মানপত্রের পর মানপত্র দিচ্ছে তারাই কার্যক্ষেত্র আসার পর অপমানিত করার ব্যাপারে কিছু বাকি রাখবে না। আমার বক্তব্য এই নয় যে আমার প্রশংসকদের সবাই এইরকম। কয়েক জন তো শুধু এই আপশোশই করে যাচ্ছিল যে, আমি আমার ওই কাজ কেন চালিয়ে যাচ্ছি না। তারা হয়ত জানত না, এখন পর্যন্ত যত হাতে লেখা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ফটো তুলে বা কপি করে আমি এনেছি তা ছাপালে ৮০০ ফর্মার কম হবে না। ছাপানোর কথা তো আলাদা, ভালভাবে ধোয়ানোর অভাবে সে-সময় অনেক ফটো খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তবে সে-ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ছিল সেইসব লোকদের যাঁরা বিদ্বান আর বিদ্যানুরাগী, কিন্তু তাঁদের পয়সা ছিল না।

কলকাতায় আমি ৫ দিন (১৫-১৯ নভেম্বর) ছিলাম। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ, ডক্টর সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী প্রমুখ বিদ্বানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হল। হিন্দি সাহিত্যিকরা স্বাগত জানালেন। ক্ষীরোদবাবু (ক্ষীরোদকুমার রায়) দেখা করলেন আর তাঁর সঙ্গে একদিন বেহালা নিয়ে গেলেন। এটাই ছিল তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। তাঁর বিয়োগে একজন সহৃদয় বন্ধুর জন্য আমার আফশোশ হয় না, বরঞ্চ সবচেয়ে বেশি আফশোশ হয় এই জন্য যে, ক্ষীরোদবাবুর প্রতিভা নিজের অদৃশ্য সত্তার দেখানোর সুযোগ পায়নি। যখন জয়সওয়ালজী তাঁকে পাটনা মিউজিয়ামের কিউরেটর করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, তখন হঠাৎ বাঙালী-বিহারীর প্রশ্ন উঠল, যদি তিনি বিহারী হতেন, তখন কায়স্থ-ভূমিহারের প্রশ্ন উঠে যেত। একে তো আমরা এমনিতেই গোলাম, তার ওপর আমাদের গলাপচা সমাজ এমনই যে এখানে তাজা হাওয়ায় শ্বাস নেওয়ার সুযোগই মেলে না। ২০ নভেম্বর সকালেই আমি পাটনা পৌঁছে গেলাম আর ২১ এপ্রিল পর্যন্ত ৫ মাস পাটনায় থাকলাম। মাঝে কয়েক দিনের জন্য প্রয়াগ, বেনারস, বালিয়া, ছাপরা গিয়েছিলাম। একবারে এতদিন ধরে কখনো পাটনায় থাকিনি। জয়সওয়ালজীর সঙ্গে থাকার এটা যেমন সব থেকে লম্বা সময় ছিল, তেমনি শেষ সময়ও ছিল। ২২ নভেম্বর টাউনহলে কাশীবাসীরা মানপত্র প্রদান করলেন। ২৪ নভেম্বর ওখানেই প্রফেসর

পুণতাম্বেকরের সভাপতিত্বে আমাকে তিব্বত-যাত্রার ওপর বক্তৃতা দিতে হল। যাত্রার প্রসঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার উল্লেখ স্বাভাবিক ছিল। আমি ওখানে ইয়াকের মাংস খেয়েছিলাম। ইয়াক আর গরু একই জাতি। যাত্রার বর্ণনায় এরও প্রসঙ্গ এসে গেল। যাকগে, শ্রোতাদের মধ্যে কেউ এ ব্যাপারে আপত্তি করেনি। আপত্তি করার সুযোগ কোথায়, আমি তো যা ঘটেছিল শোনাচ্ছিলাম কিন্তু পরে বহু ধর্মধুরন্ধর এর বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল। কেউ কেউ তো বলছিল, 'খেয়েছে তো খেয়েছে, কিন্তু এখানে সেটা উল্লেখ করছে কেন?' এটা সঠিক যুক্তি বলে আমার মনে হয় নি।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিতে হল। এখানেও কারো নিন্দার কথা মনে না রেখেই আমি নিজের অনুভব আর ভাবনা নবযুবকদের সামনে উপস্থাপিত করলাম। ২৮-৩০ নভেম্বর সারনাথে বৌদ্ধদের বার্ষিক উৎসব ছিল, আমিও তাতে যোগদান করেছিলাম। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত সুখলালজী আর পণ্ডিত বালকৃষ্ণ মিশ্র-র সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হলাম। দুজনেই সংস্কৃত-দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। দুজনেই ভাল করে জানতেন যে সংস্কৃতের দর্শন, ব্রাহ্মণ হোক বা জৈন, ততদিন পর্যন্ত বুঝতে পারবে না যতদিন না তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বৌদ্ধদর্শন বোঝা যাবে। বৌদ্ধদর্শনের অধিকাংশ গ্রন্থ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এখন আবার সেগুলো পাওয়া গেল— এটা তাঁদের কাছে খুবই আনন্দের ব্যাপার। পণ্ডিত সুখলালজী তো শুধু দর্শনই নয়, অন্যান্য বিষয়েও খুব উদারপন্থী ছিলেন।

পয়লা ডিসেম্বর আমি পাটনা চলে এসেছিলাম। জয়সওয়ালজী এখন তাঁর অবসর সময়ের বেশির ভাগ চাইছিলেন ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের কাজে লাগাতে। তিনি খুব গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন যে, বেনারসে গিয়ে থাকি, একেবারে সাধারণভাবে আর সরল থেকে সরলতম জীবন নিয়ে। তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কেও লিখেছিলেন কিন্তু মানুষের মূল্য বেঁচে থাকতে সমাজ খুব কমই টের পায়।

১৫-১৭ ডিসেম্বর বালিয়াতে 'জেলা সাহিত্য সম্মেলন'-এর সভাপতি হয়ে আমাকে যেতে হল। আমি ভাষা আর সাহিত্য সম্বন্ধে আমার ভাবনা ব্যক্ত করলাম। সংস্কৃত কলেজে আমি তিব্বতে পাওয়া সংস্কৃত গ্রন্থের গুরুত্বের বিষয়ে সংস্কৃততে বক্তৃতা দিলাম। আনন্দজীও বললেন আর এইসব বই ছাপানোর ব্যাপারে আর্থিক অসুবিধার কথা উল্লেখ করলেন। এটা আমার একটু খারাপ লাগল। আমার উপস্থিতিতে এরকম বলা চাঁদা চাওয়ার মত মনে হচ্ছিল। বলিয়াতে মল্লী (ভোজপুরী) ভাষার মৌখিক সাহিত্য[১] সংগ্রহের জন্য একটা উপসমিতি বানানো হল। আমি ১৯৩২-এ মাতৃভাষার মৌখিক সাহিত্যকে রক্ষার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে ছিলাম। কিন্তু তখনো, মাতৃভাষাকে যে শিক্ষার মাধ্যম করা উচিত সে-গুরুত্ব বুঝতে পারিনি।

২০ ডিসেম্বর আমি পাটনা এলাম আর তখন থেকে একটানা ৪ মাস ওখানেই

[১] *মৌখিক সাহিত্য* বলতে লেখক এখানে গ্রামজীবনের সেই সাহিত্যের কথা বলতে চেয়েছেন যা লোকমুখে রয়েছে কিন্তু লিপিবদ্ধ হয়নি।—স·ম·

থাকলাম। এবার ২৬ ডিসেম্বর ব্রহ্মচারী বিজ্ঞানমার্তণ্ড পাটনা এলেন। জয়সওয়ালজী তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন আর সহায়তার জন্য কত তৎপর হয়েছিলেন তা আমি অন্যত্র লিখেছি। এ বছরের 'হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন'-এর সভাপতিত্ব করার জন্য আমার নামও রাখা হয়েছিল। বিহারে তো আমি আমার বন্ধুদের বলে দিয়েছিলাম যে আমি সম্মেলনের সময় ভারতে থাকব না, তাই আমার পক্ষে যেন সম্মতি না দেয় এবং তারা সম্মতি দেয় নি। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আমার নামে ভোট দিল। যদিও শ্রীযমুনালাল বাজাজ গান্ধিজীর আশীর্বাদ নিয়ে সভাপতি হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর চেলারা প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছিল, তবু খুব কষ্টে তিনি সাফল্য পেয়েছিলেন। আমি জানতাম না, নইলে আমি নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিতাম। পাটনায় বেশিদিন থাকতে হয়েছিল আবার আমার টনসিল ফুলে ওঠায় আরেকবার অপারেশন করে তা বের করার জন্য। ১৯৩৪ থেকেই আমি বছর-বছর এই অসুখ পুষে রেখেছিলাম। ১১ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত তো আগের বছরের মত চিকিৎসা হতে লাগল আর মাঝে অনেকদিন আমি হাসপাতালে থাকলাম। ডাক্তার হসনৈনের মত ছিল যে এটাকে বের করে দিতে হবে। কিন্তু অপারেশন ততক্ষণ করা যাবে না যতক্ষণ না টনসিলের জায়গাটা সেরে যাচ্ছে। সারানোর জন্য আমাকে পাটনায় থাকতে হয়েছিল।

জানুয়ারি (১৯৩৭)-এর শেষে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোতে শুরু করল। ৩ ফেব্রুয়ারি জানা গেল যে বিহারের বিধানসভাতে কংগ্রেসের ৯৫ জন গেছে। যদিও গত ১০ বছর ধরে আমি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে ছিলাম, তবু আমার সহানুভূতি ছিল কংগ্রেসের প্রতি। ১৯৩১-এ কিছুদিনের জন্য আমি অবশ্যই কিছুটা সক্রিয় অংশ নিয়েছিলাম। জয়সওয়ালজীর সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতি আর সাম্যবাদ নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হতো। ভোটের দিনগুলোতে ভোজপুরী আর মাগধীতে অনেক কবিতা আর গান বেরিয়েছিল, যাতে কৃষকদের সতর্কতার সঙ্গে নিজের ভালো বিবেচনা করে ভোট দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। আমি এরকম অনেক সংবাদ জড়ো করেছিলাম এবং জয়সওয়ালজীকে সেগুলো শোনাতাম। জয়সওয়ালজীর যখন জন্ম হয় তখন তাঁর বাবা খুব গরিব ছিলেন। কাকীমার অত্যাচারের জন্য তাঁর মাকে কয়েক বছর উপেক্ষিত হয়ে বাপের বাড়িতে দিন কাটাতে হয়েছিল। জয়সওয়ালজীর মামাবাড়িও খুব গরিব ছিল। অন্য বাচ্চাদের দেখাদেখি তিনিও যখন মিঠাই চাইতেন তখন তাঁকে ছোলার ছাতুতে গুড় মিশিয়ে ছোট ছোট গোল্লা বানিয়ে লাড্ডু বলে দেয়া হতো। জয়সওয়ালজী যখন পাকা সাহেবী ঠাটে থাকতেন, যখন ওখানে বেয়ারা-খানসামা খাবার তৈরি করে টেবিল সাজাত, তখনও তিনি গুড় মেশানো ছোলার ছাতুর লাড্ডুর কথা ভোলেননি এবং সেটা তিনি খুব রুচি করে খেতেন। একটি নতুন মহৎ আকাঙ্ক্ষা আর তার জন্য মেনে নেওয়া নতুন জীবন, তাঁর ছেলেবেলার সেই জীবনকে ভুলিয়ে দিতে চাইত কিন্তু জয়সওয়ালজী তা ভুলতে রাজি ছিলেন না। তাঁর মেজাজ ছিল কড়া। তিনি ভীষণ জেদী ছিলেন, যদিও আমার ব্যাপারে তাঁর এই মনোভাব কখনো প্রকাশ পায় নি। আমি একবার দেখেছিলাম, তাঁর নেপালী রাঁধুনী লছিমন রান্নায় কোনো ভুল করে ফেলেছিল। জয়সওয়ালজী খুব

রেগে গেলেন আর তাকে বকতে লাগলেন। সবাই জানত যে আজ সাহেব লছিমনের খোশামোদ করবে। তিনি শুধু চোখের জল ফেলতেই বাকি রাখলেন—নিজের ব্যবহারে তাঁর খুবই দুঃখ হয়েছিল। তিনি লছিমনকে ডেকে বললেন, 'দেখ লছিমন, আমি খুব অন্যায় করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।' তারপর তাকে কি-কি সব বখসিস-টখসিস দিলেন। শীতের দিনে রাত্রিবেলায় তিনি মেরজাই পরে নিতেন আর মাটিতে আসন বিছিয়ে বাবু হয়ে বসে যেতেন, তারপর তাঁর গল্প শুরু হয়ে যেত, যাতে ঝাড়ুদার জুমই থেকে শুরু করে সারা ঘরের চাকর-বাকর জড়ো হয়ে যেত। কখনো ভূতের গল্প শুরু হতো। তিনি কোনো গাছের ওপরে এক মস্ত ভূতের গল্প বলতেন। চাকরদের মধ্যে হয়ত কেউ আগেও এই গল্প শুনেছিল এবং অন্ধকার-টন্ধকারে কখনো ভয় পেয়েছিল, তাই তাদের মধ্যে কেউ নিজের চোখে দেখা ঘটনা বলতে শুরু করত আর সে-রাতে অনেকেরই চোখ খোলা মুশকিল হয়ে যেত। জুমইকে একদিন তিনি আকাশের এক সাদা দাড়িওলা পুরুষের কথা বলছিলেন। জুমই বলল, 'হ্যাঁ, দাদা! আমি দেখেছিলাম, রুপোর মত সাদা, লম্বা লম্বা দাড়ি, আগুনের মত দীপ্ত চেহারা··· ।' জয়সওয়ালজী খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ব্যস-ব্যস জুমই! তিনিই ছিলেন আল্লা মিয়া।' ভূতের ব্যাপারে তিনি ছেলেবেলা থেকেই খুব নির্ভীক ছিলেন। মির্জাপুরে ওঁদের ঘরের কাছে লোকে যোগ-মন্ত্র করে মিঠাই, ছাগল রেখে যেত। বালক কাশীপ্রসাদ মিঠাই হাতে নিয়ে নিতেন এবং ছাগলে চড়ে সেই রাতেই ছেলেদের দল জড়ো করতেন আর মিঠাই ভাগ করে খেতেন।

অ্যাসেম্বলির ভোটের ফলাফল বেরোলো। প্রত্যেক জায়গায় সরকারকে কংগ্রেস গো-হারান হারিয়েছিল। জয়সওয়ালজী আর আমি রাজনৈতিক আলোচনায় একে অন্যের পূবক হয়ে যেতাম। অক্সফোর্ডে পড়ার সময় তাঁর সাম্যবাদের হাওয়া লেগেছিল। তিনি এত বিপজ্জনক বলে গণ্য হয়েছিলেন যে, বিশ্বাস ছিল না, তিনি ভারতে থাকতে পারবেন। কিন্তু ধীরে-ধীরে সেই আগুন ছাই-এর নিচে চাপা পড়ে গেল। কিছুটা বিদ্যা-ব্যসন আর কিছুটা আরামের জীবন তাঁকে এরকম করতে বাধ্য করেছিল। তবুও নিজেকে চেপে রাখা তার পক্ষে খুব কঠিন ছিল। দশদিন ধরে তিনি গৌরাঙ্গ প্রভুর সামনে নম্রতা আর শিষ্টাচার দেখাতেন, কিন্তু কোনো অনুচিত কথা উঠলেই ফেটে পড়তেন। এরকম লোককে ইংরেজ প্রভু কি করে বিশ্বাস করবে? কংগ্রেসের ভোট আর সেই সময়ের জনপ্রিয় গানগুলো থেকে তাঁর বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, এখন সেই শক্তি ময়দানে আসছে যার মধ্যে বিপ্লব করার ক্ষমতা রয়েছে। তিনি 'মডার্ন রিভিউ' আর অন্যান্য পত্রিকায় সে-সময় কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল যে এবার পুরনো দুনিয়া থাকবে না। শোষিত, পীড়িত, মূক, শ্রমিক-জনতা জেগে উঠেছে। তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন, এজন্য বিহারের বড় জমিদাররা খুব রেগে গিয়েছিল। একজন বড় জমিদার নেতা তাকে হুমকি দিয়েছিল, 'আমরা আপনাকে বয়কট করব আর আপনাকে দিয়ে মামলা করাব না।' জয়সওয়ালজী এর কড়া জবাব দিয়েছিলেন। তারুণ্যে বপন করা বীজ তখন আবার ওপরে উঠে আসছিল।

ডক্টর শ্চেরবাৎস্কী-র কাছে আমি কিছু বই-এর বিবরণ পাঠিয়েছিলাম। ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর

চিঠি পেলাম। তিনি আমাকে রাশিয়া আসার জন্য লিখেছেন আর এটাও লিখেছেন, 'আমি ভিসা পাঠানোর জন্য সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে লেখাপড়া করে নিয়েছি।' দুদিন পর ডক্টর বোগীহারা (জাপান)-এর চিঠি এল। তিনি বইগুলোর প্রাপ্তিতে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এবং 'যোগাচারভূমি' সম্পাদনা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

ফেব্রুয়ারিতে রাত তিনটে-চারটে পর্যন্ত জেগে থাকা আমার কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। এই সময় 'প্রমাণবার্তিক'বৃত্তি' (কর্ণকগোমী) এবং অন্য একটি গ্রন্থ প্রেসে ছিল। সেগুলোর প্রুফ দেখতে হতো। এদিকে 'ইরান'-এর ওপর একটি বই লিখছিলাম। তিব্বতে পাওয়া বইগুলোর একটি সবিরণ সূচিপত্রও তৈরি করছিলাম। পাটনার ছাত্রদের কাছেও কখনো-কখনো লেকচার দিতে যেতে হতো।

এখন টনসিল ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ২০ মার্চ আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। ২২ তারিখ টনসিল কেটে বের করা হল। ডক্টর হসনৈন ছিলেন একজন সিদ্ধহস্ত শল্য-চিকিৎসক। যদিও টনসিল খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল তবু তিনি খুব সাফল্যের সঙ্গে অপারেশন করেছিলেন। ক্লোরোফর্ম শোঁকার পর আমার মনের কি যে অবস্থা হয়েছিল! তা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, এই শরীরে আত্মা বলে কিছু নেই। এখানে জীবাত্মার মত কোনো বস্তু নেই। একটা বেজে ৫ মিনিটে ক্লোরোফর্মের টুপি আমার মুখে রাখা হল। মনে হল পেটের মধ্যে কোনো জিনিস ঢোকান হচ্ছে। তারপর হৃৎপিণ্ড কাঁপতে শুরু করল। প্রথমে ধীরে-ধীরে, তারপর বেগে—তীব্র, তীব্রতর, তীব্রতম হয়ে গেল। মনে হচ্ছে এখন তা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল, কান কিছুক্ষণ পর্যন্ত সজাগ ছিল, তারপর কানে আসা শব্দগুলো বিকৃত হতে লাগল। শেষে মস্তিষ্কে শুধু চেতনা রয়ে গেল এবং একটু পরে তাও লোপ পেয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম যে, শরীবও একটি খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রের মত। অপারেশন চলল এক ঘণ্টা ধরে, আর আড়াইটের সময় (ক্লোরোফর্ম দেওয়ার ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট পর) আমার জ্ঞান ফিরল। ২৯ মার্চ আমি হাসপাতাল থেকে চলে এলাম।

১০ এপ্রিল আমি আর জয়সওয়ালজী ডক্টর বীরবল সাহনীর বক্তৃতা শুনতে সায়েন্স কলেজে গেলাম। ডক্টর সাহনী প্রাচীনকালের বনস্পতি সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠন-এর সাহায্যে একটি বক্তৃতা দিলেন। তাতে তিনি জানালেন যে কাশ্মীর উপত্যকায় এবং হিমালয়ের অন্য পারেও প্রাচীন পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। সে-সময় হিমালয় এতটা উঁচু ছিল না। খুব সম্ভব পুরাণের পাষাণধারী মানব হিমালয়ের এপার থেকে ওপারে যাতায়াত করত। বক্তৃতা শেষ হল। জয়সওয়ালজী কোনো পুরাণের উল্লেখ করে বললেন যে, একথা ওখানেও রয়েছে। আমি বললাম, 'মানুষের ভাষা সেই সময় বোধহয় এত উন্নত ছিল না যাতে করে তাদের নিজেদের যাত্রার বর্ণনা পরবর্তী প্রজন্মের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারত।' ডক্টর সাহনীও আমাদের সঙ্গে জয়সওয়ালজীর বাড়িতে খাওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, তিনিও আমার কথা সমর্থন করলেন।

অনেক বিদ্বান ব্যক্তি জয়সওয়ালজীকে জেদী বলতেন। কিন্তু তিনি জেদ সেইখানেই করতেন যেখানে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে নির্ধারিত করা তাঁর মতকে কেউ হাল্কা চালে

উড়িয়ে দিতে চাইত। ব্রাহ্মী লিপি পড়া, মূর্তির বিশেষ-সময় নির্ধারণ ইত্যাদি অনেক ব্যাপারে না-জানি কতবার আমি ভিন্নমত প্রকাশ করেছি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মেনে তো নিতেন না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করতে শুরু করতেন এবং জেনে যাওয়ার পর নিজের ভুল অকপটে স্বীকার করতেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ্ণ, আর চিন্তা করার সময় তাঁর মনে আশ্চর্য একাগ্রতা এসে যেত। একদিন তিনি চিত্তের একাগ্রতা নিয়ে খুব প্রশংসা করছিলেন। আমি বললাম, 'চিত্তের একাগ্রতা খুব ভাল জিনিস, কিন্তু কখনো কখনো খুব বিপজ্জনক জিনিস। ধরুন আপনি কোনো পুরনো শিলালিপি পড়ছেন, সেখানে কোনো অক্ষর একদম মুছে গেছে। মনের ওপর আপনি খুব চাপ দিচ্ছেন এবং তখন মনগড়া অক্ষর সেখানে পাথরের ওপর দেখতে পাচ্ছেন।' তিনি বললেন, 'ঠিক কথা।'

প্রথম যাত্রায় তিব্বত থেকে কন্-জুর আর তন্-জুর কিনে এনেছিলাম, যা পাটনায় রাখা ছিল। রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটি তাদের একটা কন্-জুর তন্‌জুর আনিয়ে দেবার জন্য আমার কাছে লিখেছিল। আমি লিখলাম, 'নরথঙ্-এর কন্-জুর তন্-জুর এখানে রয়েছে, আপনারা চাইলে তা নিতে পারেন। কিন্তু যদি সুপাঠ্য কন্-জুর তন্-জুর চান, তাহলে তেরগী থেকে আনাতে হবে, তাতে সময় লাগবে।' তাঁদের তাড়া ছিল, তাঁরা আমার কন্-জুর তন্-জুরই নিয়ে নিলেন। আমার এখন পাটনার জন্য সুপাঠ্য কন্-জুর তন্-জুর দরকার ছিল। আগের যাত্রায় খুব ভাল একটি কন্-জুর এনেছিলাম, কিন্তু পয়সা না থাকায় সেটা কলকাতা পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল। এবার শুনলাম যে ল্যাসাতে নতুন কন্-জুর তৈরি হয়েছে। আমি তা পাঠানোর জন্য লিখে দিলাম। সেটা সেই বছরই চলে এল। পরে (১৯৪০) তেরগীর কন্-জুরও চলে এল। এখন তিব্বতের বাইরে তিব্বতী সাহিত্যের এত ভাল সংগ্রহ আর কোথাও নেই, যা রাখা রয়েছে আমার সংগ্রহ করা বিহার রিসার্চ সোসাইটিতে।

ডক্টর শ্চেরবাৎস্কী আমাকে সোভিয়েতে আহ্বান করার জন্য চেষ্টা করছিলেন। যদি জুলাই-এর আগে আমাকে ভারত ছাড়তে হতো তাহলে ইউরোপ, যাত্রার সময় নেয়া পাসপোর্টই আমার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কোনো ঠিক ছিল না যে ততদিনে সোভিয়েত ভিসার খবর আসবে কি না। তাই জরুরি ছিল পাসপোর্টের মেয়াদ আরও ৫ বছর বাড়িয়ে দেয়া। আমি ১৭ এপ্রিল বিহার সরকারের কাছে এর জন্য দরখাস্ত দিয়ে দিয়েছিলাম। পরে সরকার জানতে চাওয়ায় জয়সওয়ালজী লিখে দিয়েছিলেন যে আমি কেবল অনুসন্ধান কার্যের জন্যই যাচ্ছি। রাশিয়া হচ্ছে বলশেভিকদের বিপজ্জনক জায়গা। ১৯৪০-এ মৈত্রীর সময়েও পাসপোর্ট দেয়ার অধিকার ভারত সরকার নিজের হাতে রেখেছে। তাহলে সেই সময়ের তো কথাই নেই। বিহার সরকার আমার দরখাস্ত ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিল। আমার প্রুফের কাজের জন্য আমি ২২ এপ্রিল প্রয়াগ গেলাম। ডক্টর বদ্রীনাথ প্রসাদ আর পণ্ডিত উদয়নারায়ণ ত্রিপাঠীর বাড়ি এখানেই। এই দুটোই ছিল আমার থাকার জায়গা। আমি ডক্টর বদ্রীনাথ প্রসাদের কাছে উঠেছিলাম। ২৩ তারিখে পণ্ডিত মোহনলাল নেহরু আমাকে একটা বক্তৃতা দেয়ার জন্য বললেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেখা করার জন্য ডাকলেন। বড় মানুষদের থেকে দূরে থাকাটা আমার খানিকটা স্বভাবের মত হয়ে গিয়েছিল। আগের বছরের কথা, ব্রহ্মচারী গোবিন্দ (জার্মান) আনন্দভবনে

উঠেছিলেন। একদিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমার সঙ্গে শিল্পী পণ্ডিত শম্ভুনাথ মিশ্রও গিয়েছিলেন। তিনি শ্রীমতীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন, আর আমাকে জিজ্ঞেস না করেই আমার নামও লিখে স্লিপ পাঠিয়ে দিলেন। তিনি দেখা করতে অস্বীকার করলেন। আমি যখন জানলাম তখন শম্ভুনাথের প্রতি অসন্তোষ দেখালাম, সেই সঙ্গে বিজয়লক্ষ্মীজীর এই আচরণে আমার খুব দুঃখ হল। জওহরলালের সঙ্গে দেখা করাতে আমার কোনো কাজ ছিল না, তাই আমি জওহরলালের ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে আমার অক্ষমতা পত্রবাহকের মারফত জানালাম। আমি সেইদিনের (২৩ এপ্রিল)ডায়েরিতে লিখেছিলাম যে, 'সন্ধেতে পণ্ডিত জওহরলালজীর পক্ষ থেকে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কাল সকাল দশটায় আমন্ত্রণ পাঠালেন। বিজয়লক্ষ্মীজীর নাম শুনে অনিচ্ছা হল। গত বছর শম্ভুনাথ মিশ্র ভুল করে নিজের সঙ্গে আমার নাম লিখে দেখা করার জন্য স্লিপ পাঠিয়েছিলেন। আমি তো ব্রহ্মচারী গোবিন্দর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উত্তরে তিনি দেখা করতে অস্বীকার করায় আমার আপশোশ হয়েছিল। আজ সেই ভাব জেগে উঠল। আমি কাল যেতে শুধু অস্বীকৃতিই জানালাম। জওহরলালজীর কথা ভেবেও সেদিকে যেতে অনিচ্ছা হচ্ছে। নামের অসারতা আমি ভীষণভাবে জেনেছি। কাল—অনন্ত সম্বৎসরের সমষ্টি—দু-হাজার বছরও আমাদের নাম বইতে পারে না।'

পরের দিন সন্ধেয় আবার পণ্ডিত জওহরলালজীর পত্র এল—'আপনার অবসর না হলে আমরা নিজে আসব।' অসুখ থেকে এখন এই সদ্য তিনি উঠেছিলেন সেজন্য আমার মনে হল তাঁকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়। পরের দিন আমি আনন্দভবন গেলাম। বেশির ভাগ কথা হতে লাগল তিব্বতযাত্রা সম্বন্ধে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তিব্বতে কি সায়েন্স সম্বন্ধে কোনো বইও পাওয়া গেছে?' আমি মনে করি আয়ুর্বেদ আর আয়ুর্বেদিক রসায়ন প্রাথমিক সায়েন্সের ব্যাপার, তাই আমি সেগুলোর নাম করছিলাম। এই সময় কৃপালানীজী মাঝখানে কথা বলে উঠলেন। তিনি বুঝি ভাবলেন হলুদ কাপড় পরা সাধু কি আল-ফাল বকছে। তিনি আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে, সায়েন্স কাকে বলে। ভাবলাম যে সেই রকমই কোনো জবাব দিই, কিন্তু কৃপালানীর সঙ্গে এই প্রথমবার মুখোমুখি হয়েছিলাম, তাই চুপ থাকলাম।

লাহুলে দ্বিতীয়বার—এখন সোভিয়েতের ভিসার কোনো খবর আসেনি। গরম পড়ে গিয়েছিল। গরমে আমি বেশ কয়েক বছর ধরে নিজের কাজের ব্যাপারে ঠাণ্ডা এলাকায় চলে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম এবার লাহুলই চলে যাই। ঠাকুর মঙ্গলচন্দ আর শিল্পী রোইরিকের নিমন্ত্রণও এসে গিয়েছিল। রাশিয়া সম্বন্ধে যতক্ষণ কিছু স্থির না হচ্ছে ততক্ষণ আমি দূরে যাওয়া পছন্দ করছিলাম না। আমি আর আনন্দজী লাহুলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। দিল্লী হয়ে লাহোর পৌছলাম। লাহোরে ৭ মে লাজপত রায় হলে 'তিব্বতে তিন বার' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে হল। ওখানে এক ভদ্রলোক আগা মুহম্মদআলী শাহ্-র সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন, 'আমার কাছে খুব পুরনো ভূর্জপত্রে লেখা কিছু বৌদ্ধ বই আছে, আপনি সেগুলো দেখুন।' পরের দিন আমি তাঁর ঘরে গেলাম। তাঁর কাছে ভূর্জপত্রে

লেখা দুটো আর কাগজে লেখা একটি—এই তিনটি বই এবং মাটির কিছু মুদ্রা ছিল। ২৫ ইঞ্চি লম্বা ৫ ইঞ্চি চওড়া দুশো পাতা (ভূর্জপত্র) ছিল 'মহাবস্তু'-র, লিপি ছিল শারদা। এটা ছিল 'মহাবস্তু' (বিনয়)-এর খণ্ডিত বই, বাকি দুটো বইও ছিল সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ের। তিনি জানালেন যে এই জিনিস তিনি কোনো কারিগরের কাছ থেকে পেয়েছেন। সেই লোকটি এগুলো লালকাফেরেদের প্রদেশ (চিতরাল আর আফগানিস্তানের মাঝে) থেকে এনেছিল। সেই জায়গায় পাথরের বড় বুদ্ধমূর্তি (ধ্যানস্থ) আছে। খননের পরে সেখান থেকে একটা মাটির কুসূল (শস্যাধার) বেরিয়েছিল। তার মধ্যেই তিনটে বই আর কিছু মাটির মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। গুণাঢ্য, অশ্বঘোষ ইত্যাদি কত বড় বড় চিন্তাবিদদের গ্রন্থ আজ আমরা পাচ্ছি না। তার মধ্যে অনেক বই চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু গিলগিট, কাফিরিস্তান, গোবি মরুভূমি আর তিব্বতের ভাণ্ডার তথা স্তূপগুলোতে আমাদের সাহিত্যের না-জানি কতই অমূল্য রত্ন এখনো লুকিয়ে রয়েছে! আগা মুহম্মদআলী কয়েকশো টাকায় বইগুলো দিতে রাজি ছিল, আমি দু-চার জায়গায় চিঠিও লিখে দিয়েছিলাম, কিন্তু জানি না কেউ সেই বইগুলো নিয়েছিল কি না।

লাহোর থেকে আমরা দুজন অমৃতসর পাঠানকোট হয়ে জোগিন্দরনগর পৌঁছলাম, তারপর মাণ্ডীর লরি পেলাম। রাস্তায় পাহাড়ের ঘোরালো চড়াইয়ে আনন্দজী এবং দু-একজন সহযাত্রীর বমি হল। এই রাতটা আমাদের মাণ্ডীতে থাকতে হল। পরের দিন কুলু (অখাড়া বাজার) পৌঁছে গেলাম। ঠাকুর মঙ্গলচন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি রাশিয়া যাওয়ার জন্য যেখান-সেখান থেকে ৭০০ টাকা জমা করেছিলাম। ৬০০ টাকা আমি এখানেই কুলুর সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা করে দিলাম। ১২ মে আনন্দজী আর আমি নগর গেলাম। কটরাই পর্যন্ত লরিতে গিয়ে নদী পার হলাম। দু-মাইল চড়াই-এর পর নগর পেলাম। এখানে শাঙরী-র রাজার মহল রয়েছে, যা এখন ডাকবাংলোয় পরিণত। গরমের সময় অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার এখানেই থাকেন—মিস্টার শটলওয়র্থ না-জানি কত গরম এখানে কাটিয়েছেন। কিছুটা দূরে এবং ওপরে উঠে আমরা উরুস্বতী পৌঁছলাম। প্রফেসর রোইরিক আর তাঁর দুই পুত্র জর্জ ওর স্বেতস্লাবের সঙ্গে দেখা হল। জর্জ ভোটিয়ার নাম-করা পণ্ডিত এবং তার ছোট ভাই ভাল শিল্পী। এখানে পুস্তকেরও ভাল সংগ্রহ রয়েছে। থাকার ইচ্ছে ছিল কিন্তু এখন তো আমাদের লাহুল যাওয়ার ছিল, তাই দু-দিন থেকে আমরা কুলু চলে এলাম।

নারায়ণ (জওসওয়াল-পুত্র)-এর চিঠি থেকে জানলাম যে জয়সওয়ালজীর ফোঁড়া হয়েছিল এবং সেটা অপারেশন করা হয়েছে। ২১ এপ্রিল আমি যখন পাটনা থেকে চলে আসি সেই সময় জয়সওয়ালজীর ঘাড়ে ছোট্ট মত ফুসকুড়ি হয়েছিল, তিনি তার ওপর জলপটি বাঁধছিলেন। আমি ধারণাই করতেই পারিনি যে সেই ফুসকুঁড়িটাই এই ফোঁড়ার রূপ ধারণ করেছে। চিঠিতে ভয়ের কোনো কথা ছিল না। আমরা ১৭ তারিখ পর্যন্ত কুলুতেই থাকলাম। সন্ধেয় নদী পেরিয়ে ওপরের দিকে আরও কিছুটা দূর পর্যন্ত আমরা দুজন হাঁটতে যেতাম। সে-সময় বগুগোশা (চেরী) ফল পেকে উঠেছিল। একদিন আমরা একটা বাগানে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে কিছু ফল কিনে খেতে চাইছিলাম কিন্তু বাগানের

পরের দিন (৭ জুন) আমি ঠাকুর মঙ্গলচন্দ আর আনন্দজীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কোলঙ্ থেকে তার করে দিলাম। ৮ জুন আমি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম—ঠাকুর মঙ্গলচন্দও সঙ্গে ছিলেন। রাস্তায় দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আমাদের বেরোতে বেরোতেই পাহাড় থেকে প্রচুর পাথর এসে পড়ল। ঘটনাচক্রে আমরা আগে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এই পাহাড়গুলোতে যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও বেশি বিপদ থাকে। মানবজাতি বিপদের মধ্যেই পালিত হয়ে বড় হয়েছে। গুন্দলা থেকে আমি একা ছিলাম। সাড়ে তিনটের সময় খোকসর পৌঁছলাম। পরের দিন (১০ জুন) খোকসরেই থাকতে হল। সারারাত আর সকাল নটা পর্যন্ত বৃষ্টি হতে লাগল। এখানে বৃষ্টি পড়ার মানে রটঙ্ জোতে বরফ পড়া। যতক্ষণ রাস্তা সম্বন্ধে ঠিক খবর না পাওয়া যায় ততক্ষণ আর এগোনো ঠিক নয়।

নগর-এ (১১-২৫ জুন)—পরের দিন সোয়া পাঁচটার সময় রওনা হলাম। চড়াই-এ একমাইলের চেয়েও কম ববফ থেকে গিয়েছিল। সোয়া দু-ঘণ্টায় জোতে পৌঁছে গেলাম। আঙিনায় প্রচুর বরফ ছিল। তিনটে নাগাদ মানালি পৌঁছে গেলাম। নারায়ণের চিঠি পেলাম—ঘা ঠিক হয়ে আসছে কিন্তু জ্বর এখনও আছে। উরুস্বতীর মোটর এসে গিয়েছিল। আধঘণ্টায় কাটরাই পৌঁছে গেলাম আর পাঁচটার সময় উরুস্বতীতে। দু-সপ্তাহ রোইরিক পরিবারের সঙ্গে থাকার সুযোগ পেলাম। বিপ্লবের আগে রোইরিক পরিবার রাশিয়ার এক ধনী জমিদার-পরিবার ছিল। বিপ্লবের কারণে অন্যান্য জমিদার আর পুঁজিপতিদের মত এদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং শিল্পী রোইরিক রাশিয়া থেকে চলে এসেছিলেন। বর্তমানে তাঁর পরিবার হচ্ছে আমেরিকান প্রজা। আজও তাঁর কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তি রয়েছে। আমি মনে করতাম সাদা-রাশিয়ানদের মত এঁরাও বুঝি সোভিয়েত-বিরোধী। কিন্তু আমার ধারণা ভুল হল। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি তাঁদের সেইরকমই ভালবাসা আছে। সেই সময় কিছু রাশিয়ান উড়াকু উত্তর মেরুর রাস্তায় আমেরিকা যাত্রা করেছিল। সারা পৃথিবী তাদের যাত্রাকে স্বাগত জানিয়েছিল। রোইরিক-পরিবারের আনন্দের কোনো সীমা ছিল না। বৃদ্ধা রোইরিক তো আরও মৃদু স্বভাবের, তিনি মূলত যোগ-ধ্যান নিয়েই থাকেন। যোগ-ধ্যানে আমার কোনো শ্রদ্ধা নেই কিন্তু আমি তাঁর মধুর ব্যবহারে অবশ্যই প্রভাবিত হয়ে ছিলাম। প্রফেসর রোইরিক ডাক্তার শ্চেরবাৎস্কীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। লেনিনগ্রাদে বৌদ্ধবিহার স্থাপন করার ব্যাপারে দুজনে খুব কাজ করেছিলেন। তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে আমি রাশিয়া যাব, তাই তাঁর পুরনো স্মৃতি সজীব হয়ে উঠেছিল।

এখানে থাকার সময় আমি জর্জের কাছে রুশ ভাষা পড়তাম। তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত, তাই তাঁর কাছে রুশভাষা পড়তে খুব ভাল লাগত। জর্জ একটি বৃহৎ তিব্বতী-কোষ তৈরি করেছিলেন। আমার নিজের ভোটিয়া-সংস্কৃত কোষে বহু নতুন শব্দ ছিল, তাই আমরা দুটো কোষ মিলিয়ে যেতাম আর তিনি বেশির ভাগ শব্দ নোট করে নিতেন। আমি লাইব্রেরির ঘরের কোঠায় থাকতাম যা পরিবারের বাংলো থেকে কয়েকশো

গজ ওপরে ছিল। এর চারধারে বড় বড় দেবদারুর ঘন জঙ্গল ছিল। দোতলা বাড়িটাও ছিল দেবদারুর কাঠ দিয়ে তৈরি। যেদিকে তাকাও সেদিকেই সূঁচের মত দেবদারুর সবুজ-সবুজ পাতা চোখে পড়ত আর নিঃশ্বাসে সবসময় দেবদারুর সুগন্ধ আসত। আমি দেবদারুর দেশে জন্মাইনি, তবু জানি না কেন তা আমার এত প্রিয় মনে হয়। আমি তাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মানদণ্ড মনে করি। এখানে আমি দেবদারুর জঙ্গলের একটা অঙ্গ হয়ে গিয়েছিলাম। দুপুরের খাওয়া ও পরে রুশভাষা পাঠ, কোষ মেলান এবং চা-পানের জন্য নিচে যেতাম, বাকি ২০ ঘন্টা এখানে, এই কোঠাঘরে। গ্রন্থাগারে ফ্রেঞ্চ আর ইংরেজির অনেক রকম বই ও গবেষণা-পত্রিকা ছিল। ওখানে পড়ায় খুব আনন্দ ছিল। চারদিকের জঙ্গলে প্রায় চিতা আসত। যদিও এই ঋতুতে নিচের দিকে তাদের দেখা যেত না। আগে চিতা মারলে পুরস্কার পাওয়া যেত এখন তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে চিতার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। বাগানের ফল খাওয়ার জন্য রাতে ভালুকও আসত।

জয়সওয়াল মৃত্যুশয্যায় —২৫ জুন ডক্টর শ্চের্‌বাৎস্কীর দুটো চিঠি এল, তাতে লিখেছিলেন, 'ভিসা কোনো ব্যাপার নয়, আসার সময় লিখলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' সেই দিনই চেত সিং-এর তার পেলাম—'condition unchanged, your presence required' (অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, আপনার থাকা জরুরি)

পরের দিন (২৬ জুন) ভোর-সাড়ে চারটের সময় নগর থেকে রওনা হলাম। পুল পার হয়ে মোটর ধরলাম। সাড়ে পাঁচটায় কুলু পৌঁছলাম, সেখান থেকে লরি পাওয়া গেল। চারটের সময় জোগিন্দর নগর পৌঁছলাম এবং লাহোর হয়ে ২৯ জুন ভোর পাঁচটায় পাটনা পৌঁছে গেলাম। ৩০ জুলাই পর্যন্ত এখানেই থাকতে হল। এই সময় হোমিওপ্যাথির ওষুধ চলছিল কিন্তু সেই সঙ্গে ইনসুলিন আর গ্লুকোজও দেওয়া হচ্ছিল। আগেকার অবস্থা তো আমি দেখিনি, বলছিলেন যে সারা শরীর আর মুখ ফুলে গিয়েছিল। ঘা এখনো বেশ বড় ছিল, ফোলা ছিল না। ঘা একটু সেরেছিল আর জ্বর ছিল একশ ডিগ্রি। কিন্তু এখন জয়সওয়ালজীকে সুস্থ-মস্তিষ্কে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাঁর মানসিক অবস্থা এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। মাঝে মাঝে স্মরণশক্তি গুলিয়ে যাচ্ছিল। পাসপোর্ট ৫ বছরের জন্য আবার নতুন করে চলে এসেছিল। পরের দিন (৩০ জুন) ইনসুলিন ইঞ্জেকশন খুব কষ্টে দেওয়া সম্ভব হল। ঘায়ে পুঁজ বেশি ছিল। মস্তিষ্ক অর্ধোন্মাদ অবস্থায় ছিল। কথা বলছিলেন বেশি। দুর্বলতা বেড়ে গিয়েছিল।

৭ জুলাই খবর পেলাম যে, কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গঠন করতে রাজি হয়েছে। জয়সওয়ালজী কতবার এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন এবং খবর শুনে তাঁর খুব আনন্দ হল। ৮ জুলাই লাদাখ থেকে চিঠি এল, গরমে ইয়ারকন্দ (চীনা তুর্কিস্তান)-এর মরুযাত্রিদল যাবে। পরের দিন (৯ জুলাই) ব্যোদোসান্ (জাপান)-এর চিঠি এল, তিনি জাপানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। এখন রাশিয়া, ইয়ারকন্দ, জাপান, আর তিব্বত চারটে জায়গা ছিল যেখানে আমি যেতে পারতাম। কিন্তু এখন তো অসুস্থ জয়সওয়ালজীকে দেখাশোনা করতে হবে। তাঁর কোনো উন্নতি হয় নি। তিনি সেইদিন না ঘা ধোয়ালেন, না ইঞ্জেকশন

নিলেন। সারাদিন একই কথা, 'আমাকে কংগ্রেসের শোভাযাত্রায় নিয়ে চল।' খদ্দরের পাঞ্জাবী-পায়জামা পরলেন আর জোর করে নিজের খাট উঠিয়ে বারান্দায় নিয়ে গেলেন।

সারাদিন সেখানেই পড়ে থাকলেন। একদিকে দুর্বলতা বাড়ছিল, অন্যদিকে তিনি কথা বলছিলেন প্রচুর। সেই মস্তিষ্ক, যা গাম্ভীর্য আর তীক্ষ্ণতায় অতুলনীয় ছিল, তা এখন ৫ বছরের বাচ্চার মত হয়ে গিয়েছিল। ওষুধ খেতেও রাজি হচ্ছিলেন না, ঘা-ও ধোয়াতে চাইছিলেন না। আমি তাঁর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে ১২ জুলাই লিখেছিলাম—'জয়সওয়াল বিদ্যায়, লেখায়-বলায় প্রাজ্ঞ ছিলেন। রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। এত সবের পরেও তিনি হাইকোর্টের জর্জ বা অন্য কোনো পদে কেন যান নি? কোনো সময়ে হয়ত তিনি কর্তৃপক্ষকে খুশি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু খোশামুদি তাঁর স্বভাবে ছিল না। আত্মসম্মানের মাত্রা ছিল খুব বেশি। মেজাজ তেজি ছিল। ভাল প্র্যাকটিস হওয়া সত্ত্বেও টাকা জমাতে পারেন নি, কারণ মিতব্যয়িতা জানতেনই না। সংসারে, সংসারের জিনিসপত্রে, ছেলেদের এবং বন্ধু-বান্ধবদের পেছনে চোখ মুঁদে খরচ করে গেছেন।'

এই দিনগুলোতে কলেজের ছাত্র আলীআসরফের সঙ্গে দেখা হল। অতীতে দু-বছর আমাদের একসঙ্গে জেলে থাকতে হয়েছিল। বাইরে একসঙ্গে কাজ করতে হত। আসরাফ 'সাম্যবাদ হী ক্যোঁ?' উর্দূতে অনুবাদ করতে শুরু করেছিল।

পণ্ডিত রামাবতার শর্মার দর্শন পেয়েছিলাম বেনারসে, আমার ছাত্রাবস্থায়। তারপর যখন আমি বিহারে রাজনৈতিক কাজ করতে থাকি, তখন তো বহুবার দেখা হয়েছিল। তিনি কতবার আমাকে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আসার জন্য বলতেন। অনুসন্ধান-ক্ষেত্রে এলাম আর শীতের সময় পাটনাতে থাকতে লাগলাম। কিন্তু যখন আমি প্রথমবার তিব্বত গিয়েছিলাম, সেই সময় (৩ এপ্রিল ১৯২৯) তাঁর দেহাবসান হয়ে যায়। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৭৭ সালে। তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন আমি তাঁর 'সংস্কৃতকোষ'-এর কথা যত্রতত্র শুনেছিলাম। ২১ জুলাই আমি তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। কোষ দেখেছিলাম। ৩০১ পৃষ্ঠাতে প্রায় ৬ হাজার শ্লোককে অকার-আদি ক্রমে তিনি এই কোষে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শ্লোকে উল্লিখিত শব্দের বিশদ বর্ণনা তিনি কয়েকটা খণ্ডে লিখেছিলেন। মুখবন্ধের শ্লোকটি হল—

শ্রীদেবনারায়ণ শর্মণ ঃ শ্রীগোবিন্দদেব্যাশ্চ মহামহিম্নো ঃ,
প্রণম্য পিত্রোশ্চরণাম্বুজাতে আচার্য গঙ্গাধরশাস্ত্রিণশ্চ।
রামেণ সারঙ্গভবোদ্ধবেন কাশ্যাং যদারব্ধি মহাভিধানম্,
সমাপিতং তত্ কিল বিশ্ববিদ্যাসর্বস্বমেতত্ কুসুমাখ্যপুর্যাম্।।[১]

[১] বংশাস্থবিল ছন্দে লিখিত এই শ্লোকটিতে গ্রন্থকার বলেছেন—মহামহিম শ্রীদেবনারায়ণ শর্মা এবং শ্রীগোবিন্দ দেবী—এই মাতা-পিতা এবং আচার্য গঙ্গাধর শাস্ত্রীর চরণকমলে প্রণাম করে রামাবতার শর্মা (রামসারঙ্গভব বংশীয়) কাশীতে যে মহাঅভিধান রচনা করতে আরম্ভ করেন, সেই বিশ্ববিদ্যাসর্বস্ব অভিধানটি কুসুমপুরীতে শেষ হয়।—স·ম·

—১৯৩৭—

পণ্ডিত রামাবতার শর্মার মধ্যে অপ্রতিম প্রতিভা ছিল। কিন্তু তাঁর মন কখনো স্থির হয়ে একটা কাজে লেগে থাকতে পারত না। তা না হলে তিনি কত গ্রন্থ রচনা করতে পারতেন। এটাই একটা গ্রন্থ, যার শ্লোকের অংশটা তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন, কিন্তু তা এখনো অপ্রকাশিত।

২৫ জুলাই জানা গেল যে, জয়সওয়ালজীর পিঠে আরো দুটো জায়গায় ফোঁড়া হয়ে গেছে। একটা ফোঁড়াই তো তাঁর জীবনকে সংকটে ফেলে দিয়েছিল, এখন আর কি আশা করার ছিল?

কাশ্যপজীর তার এসেছিল, তাই ৩০ জুলাই আমি সারনাথ গেলাম। এই সময় সারনাথে একটা হাইস্কুলের ব্যাপারে কথাবার্তা চলছিল। বেনারস সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যব্যবস্থারও পরিবর্তন করাটা দরকার ছিল। যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা সামলে নিয়েছিল। আমাকে প্রয়াগ হয়ে লক্ষ্ণৌ যেতে হয়েছিল। সেখানে শিক্ষামন্ত্রী পণ্ডিত প্যারেলালের সঙ্গে কথাবার্তা হল। তাঁর সঙ্গে দুটি সংস্থা সম্বন্ধে কথা বললাম। যুক্তপ্রদেশের অনেক পরিচিত লোক তখন লক্ষ্ণৌতে ছিল কিন্তু আমার তো পাটনা যাওয়ার দুশ্চিন্তা ছিল। ৪ আগস্ট বিকেল সাড়ে পাঁচটার গাড়িতে আমি রওনা হলাম আর পরের দিনই (৫ আগস্ট) ভোর পৌনে পাঁচটায় পাটনায় নামলাম। পাটনা জংশন থেকে জয়সওয়ালজীর বাড়ি খুবই কাছে। কুলি নিয়ে সেখানে পৌছলাম। কুলি বারান্দার বাইরে, বাঁশের শবাধার পড়ে আছে দেখে বলল, 'এখানে তো মড়ার খাট রয়েছে।' দেখেই বুকটা ধক্ করে উঠল। শেষ পর্যন্ত সেই চরম অশুভ ঘটনা ঘটলই! শুনলাম কাল (৪ আগস্ট) সন্ধে সোয়া ছ-টার সময় জয়সওয়ালজী দেহত্যাগ করেছেন। তিনটে কার্বাংকল জীবনটা শেষ করে দিল। সবাই বলছিল স্মৃতি শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। কিন্তু এ-স্মৃতি বোধহয় সেই স্মৃতি যা আমি দেখে গিয়েছিলাম। আমি ৫ আগস্ট নিজের হৃদয়োদ্‌গার প্রকাশ করে ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'হা মিত্র! হা বন্ধু! হা গুরু! এখন তুমি আর আমাকে বারণ করবে না, আমি তাই যা খুশি বললেও কে বাধা দেবে? হয়তো তুমি বলতে, 'আমিও তো আপনার কাছ থেকে শিখেছি।' কিন্তু তুমি জানো না, আমি তোমার কাছ থেকে কত শিখেছি। এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু! এই তো সময় হয়েছিল! এখনই তো এই অভাগা দেশের তোমার সেবার ভীষণ প্রয়োজন ছিল! আহ! সব আশা ছাইয়ে মিলিয়ে গেল!! জয়সওয়াল! ওঃ এরকম!! পৃথিবীর জন্য কিছু করতেই হবে, তোমার বহু স্নেহভাজন ছিল, আমিও তার মধ্যে একজন ছিলাম। অন্যের হৃদয় থেকে বিয়োগের দুঃখ সময় ঠিকই ক্ষীণ করতে থাকবে কিন্তু স্মৃতি তাকে দিনের পর দিন তাজা করে রাখবে। তোমার সেই সম্পূর্ণভাবে ভারতের ইতিহাস তৈরি করা আর সাম্যবাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা!! হা বঞ্চিত শ্রমিক বর্গ!! সহৃদয় মানব! নির্ভীক অপ্রতিম মনীষী! পৃথিবী তোমাকে যোগ্য মর্যাদা দেয় নি!!'

সাড়ে আটটায় শ্মশান-যাত্রা আরম্ভ হল, আমিও শবাধারে কাঁধ দিলাম। রাজেন্দ্রবাবু, কংগ্রেসমন্ত্রী ডাক্তার মহমুদ আর অনুগ্রহবাবু, হাইকোর্টের জর্জ এবং অনেক মন্ত্রী শ্মশান পর্যন্ত গেলেন। গঙ্গার তীরে চিতা জ্বালানো হল আর সাড়ে এগারোটা নাগাদ শরীর পুড়ে

ছাই হয়ে গেল। ছাই গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়া হল। আমার হৃদয় এখন শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

দু-তিন দিন ধরে আমি জয়সওয়ালজীর চিঠিগুলোর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বাছাই করার কাজে লেগেছিলাম। আমি তাঁর একটি জীবনী লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু সেই সময় এ-কাজ সম্ভব ছিল না।

৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাটনাতেই থাকলাম। ১৬ আগস্ট ডাক্তার শ্চেরবাৎস্কীর চিঠি এল। তাতে লেখা ছিল যে তেহরানে আমার ভিসা তৈরি আছে। এবার রাশিয়া যাওয়া নিশ্চিত হল। কুলু থেকে সেভিংস ব্যাংকের টাকা আনালাম। ৩০ আগস্ট এটাও জানা গেল যে, বিহার সরকার তিব্বত যাওয়ার জন্য ৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে। কিন্তু এখন তো আগে রাশিয়া ঘুরে আসা জরুরি। পাটনায় থাকাকালীন আমি 'গান্ধীবাদ ঔর সাম্যবাদ', 'দিমাগী গুলামী', 'জমিন্দারী প্রথা' ইত্যাদি অনেক লেখা লিখেছিলাম।

বেনারস হয়ে ৪ সেপ্টেম্বর প্রয়াগ পৌঁছলাম। এখানে কলেজের ছাত্ররা বক্তৃতা দেয়ার জন্য ধরে বসল। ৬ সেপ্টেম্বর প্রথম বক্তৃতা দিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে। জওহরলালের সভাপতিত্বে 'আমাদের দুর্বলতা'-র বিষয়ে আরও দুটো বক্তৃতা দিলাম।

আমার কাছে এখন সাত-আটশ টাকাই ছিল। প্রয়াগে আরো কিছু টাকার ব্যবস্থা হল, যার মধ্যে ১০০ টাকা জওহরলালজী দিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে টাকা নেওয়াটা আমার ঠিক মনে হচ্ছিল না কিন্তু অস্বীকারও করতে পারি নি। এগারোটার সময় দিল্লী পৌঁছলাম। নিজের কাছে রাখা টাকা দিয়ে টমাস কুকের থেকে ৬০ পাউন্ডের ট্রাভেলার্স চেক নিলাম। আমার ইরানের রাস্তায় যাওয়ার ছিল আর ইরান-কন্সল সে-সময় সিমলায় ছিল। আমি সেই রাতেই সিমলা রওনা হয়ে গেলাম। ১২ সেপ্টেম্বর সিমলা পৌঁছলাম। রায় বাহাদুর কাশীনাথ দীক্ষিত আর মিস্টার এন· সি· মেহতার ওখানে উঠলাম। বিপিনবাবু এসেম্বলির বৈঠকের জন্য সিমলা এসেছিলেন, তিনিও চেষ্টা করলেন এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ইরানের ভিসা পেয়ে গেলাম।

পরের দিন আমি দিল্লী পৌঁছলাম। এখন পর্যন্ত আমার কাছে মাত্র ৬০ পাউন্ড ছিল, পহলবী পৌঁছে যার মধ্যে ৪০ পাউন্ড মাত্র থেকে যেত। এ সম্বন্ধে আমি আমার মন্তব্য লিখেছিলাম—'চমৎকার! অন্ধকারে ঝাঁপ দেয়ার অভ্যেস তো আমার আছেই।' প্রয়াগ থেকে আরও কিছু টাকা চলে এল এবং আমি আরও ৪০ পাউন্ডের চেক নিয়ে নিলাম। এখন আমার কাছ একশ পাউন্ড আর একশ আশি টাকা ছিল।

১৭ তারিখে আমি দিল্লী থেকে প্রস্থান করলাম। ১৯ সেপ্টেম্বর ট্রেন দেড়টার সময় কোয়েটা পৌঁছল। হোটেলের খোঁজ-খবর করছিলাম, এমন সময় দুজন আর্যসমাজী ভদ্রলোক চলে এলেন। পণ্ডিত ইন্দ্র তাঁদের দিল্লী থেকে লিখে দিয়েছিলেন। আর্যসমাজে গেলাম। ভূমিকম্পে বিধ্বংস হওয়া কোয়েটাতে বসবাস শুরু হচ্ছিল। অনেক দোকান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শহরে এখনো জনবসতি তেমন গড়ে ওঠে নি। এখানে আশেপাশে অনেক বাগান আছে। জল মিষ্টি আর খুব ভাল। ইরানি কায়দায় ভূগর্ভস্থ নালাও কাটা হয়ে গেছে।

সে-সময় সপ্তাহে একটাই ট্রেন কোয়েটা থেকে নোকুণ্ডী যেত আর সেটাও সোমবারে।

২০ সেপ্টেম্বর আমাদের ট্রেন সকাল সাড়ে এগারোটায় রওনা হল। সাড়ে এগারো

টাকায় নোক্কুণ্ডীর ইন্টার-ক্লাশের টিকিট পাওয়া গেল। আমাদের কামরায় সর্দার রামসিং নামে অন্য এক ভদ্রলোকও ইরান ঘুরতে যাচ্ছিলেন। এই গাড়ি শুধু ভ্রমণকারীদের জন্যই ছিল না, সেই সঙ্গে পথে রেলকর্মীদের রসদ, বেতন আর জলও দিয়ে দিয়ে যেত। প্রত্যেক লাণ্ডী (কুলিদের ব্যারাক)-তে তাকে দাঁড়াতে হতো। দালবন্দীর আগের স্টেশন একশ মাইলের বেশি দূরে আর দালবন্দী থেকে পরের নোক্কুণ্ডী স্টেশনও একশ মাইলের ওপর। গাড়িও চলছিল ধীরে ধীরে। ২১ তারিখ দুপুর আড়াইটের সময় আমরা নোক্কুণ্ডী পৌঁছলাম। পাসপোর্ট দেখা হল। পঁচিশ টাকা দিয়ে পঁচিশ তুমান নিলাম। কিছু জিনিসপত্র কিনলাম। জাহিদানের ভাড়া ৬ টাকা দিয়ে লরিতে বসলাম। রাত দুটোয় একটা খালি লাণ্ডীতে শুয়ে পড়লাম। সকাল সাতটায় আবার রওনা হলাম। ইংরেজ সীমান্ত-চৌকি, কিলা-সফেদ যখন ৩ মাইল দূরে তখন পেট্রোল ফুরিয়ে গেল। লরি ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। হেঁটে চৌকি পৌঁছলাম। পাসপোর্ট নথিভুক্ত করা হল।

ইরানে দ্বিতীয়বার

কিলা-সফেদ থেকে মীরজাবা খুব দূর নয়। সমস্ত লরি ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গুমরগ (কাস্টম)-এর সামনে এবার জিনিসপত্র দেখাদেখি শুরু হল। আমার বই-এর ট্রাঙ্ক প্রথমে খোলা হল। বই দেখতেই অফিসারের ওপর তার প্রভাব পড়ল। জিজ্ঞেস করলে আমি জানালাম যে আমি লেখক এবং অধ্যাপক। এরপর তারা আমার জিনিসপত্র সাধারণভাবে দেখল, পাসপোর্টও তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিল। একজন ভারতীয় মুসলমান তীর্থযাত্রার জন্য গিয়েছিল। তার জিনিসপত্রের মধ্যে কয়েক সের মাংস, রুটি আর অন্যান্য খাবার জিনিস ছিল। বেচাবি শুনে এসেছিল যে ইরানে হারাম-হালালের কোনো ভেদাভেদ নেই, তাই খাওয়ার জিনিস এত এনেছিল যাতে তা খেয়েই দেশে ফিরে যেতে পারে। অফিসার হাসতে হাসতে বলল, 'দাদা, তাহলে মাটি আর জলও সঙ্গে করে আনলেন না কেন?'

তীর্থযাত্রীদের জিনিসপত্র দেখার সময় তারা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। ইরানি অফিসাররা জানে যে ভারতীয় তীর্থযাত্রী নিজের দেশে গিয়ে আমাদের শুধু নিন্দাই করবে, তাই তাদের ওরা কোনোরকম ভালবাসা দেখাতে চাইত না। মীরজাবায় একটি ভোজনালয়ও খুলে গিয়েছিল। মালিক ইরানি মহিলা একেবারে ইউরোপিয়ান পোশাকে ছিল। দু-বছর আগে আমি যে কালো চাদর দেখে গিয়েছিলাম, এখন স্ত্রীলোকরা তা খুলে ফেলে দিয়েছে। ৫ রিয়াল (প্রায় আট আনা) দিয়ে খেলাম। বিকেল তিনটেয় রওনা হলাম। রাস্তা আগের চেয়ে ভাল আর অনেক চওড়া ছিল। রাত দশটার সময় আমরা জাহিদানের গুমরগে পৌঁছলাম। পুলিশ খামোকা আমাদের জ্বালাতন করতে শুরু করল। সে আমাকে

বাক্স সঙ্গে নিয়ে যেতে দিতে চাইছিল না। সর্দার রামসিংহ ৫ রিয়াল তার হাতে গুঁজে দিল আর আমরা ছাড়া পেয়ে গেলাম। রেস্তোরাঁয় খেলাম এবং সর্দার রামসিংহের বন্ধু সর্দার মানসিংহের ওখানে উঠলাম।

গত দুবছরে জাহিদানে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। মফস্বল শহরের ভেতরকার রেললাইন তুলে দিয়েছিল। অনেক নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছিল। রাস্তা চওড়া করে দেয়া হয়েছিল। একটা ভাল রেস্তোরা ছিল যেখানে খেলোয়াড়দের জন্য দুটো বিলিয়ার্ডের টেবিল রাখা ছিল। মেয়েরা ছিল পুরোপুরি ইওরোপিয়ান পোশাকে এবং তারা রাস্তায় স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাদ্রাসার নাম এখন 'দবীরস্তান' হয়ে গিয়েছিল, কেননা মাদ্রাসা ছিল আরবী শব্দ। ইরানিরা নিজেদের ভাষার শব্দ রাখতে চায়। নজ্‌মিয়াঁ (কোতবালী)-এর নাম 'শহরবানী' হয়ে গিয়েছিল। সর্দার রণবীর সিংহকে এখানেই পেয়ে গেলাম। মালের জন্য তেহেরান থেকে এখানে এসেছিলেন। খবর পেলাম যে 'চাহেবাহার' একটা নতুন বন্দর হতে চলেছে আর আমেরিকান লোকরা সেমনানের খনিজ তেল পাইপ দিয়ে সেই বন্দরে নিয়ে যেতে চাইছে।

পরের দিন (২৪ সেপ্টেম্বর) ১৬ তুমান দিয়ে আমরা মশহদ-এর বাসে বসলাম। রামসিংহের অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়ার ছিল তবে আমাদের বাসে লক্ষ্ণৌ-এর হাদীহুসেন আর তার পরিবার যাচ্ছিল। বিকেল চারটেয় বাস ছাড়ল। রাস্তায় এক-আধ জায়গায় খাওয়া-দাওয়ার জন্য একটু সময় যা দাঁড়িয়েছিল নইলে টানা ছুটছিল। এই রকম কষ্টের ভ্রমণে ছোট ছোট বাচ্চাদের শরীর কি করে ঠিক থাকতে পারে? হাদীহুসেনের দুগ্ধপোষ্য শিশুকন্যা খুব অসুস্থ হয়ে গেল। পরের দিন (২৫ সেপ্টেম্বর) একটার সময় আমরা বিরজন্দ পৌঁছলাম। বাচ্চার অসুখ খুব বেড়ে গেল। ড্রাইভার ভালমানুষ ছিল, তা না হলে বাস নিয়ে কে এখানে দাঁড়াত? আমি ব্রিটিশ ভাইস-কন্‌সলের কাছে গেলাম। তিনি পাঠান ছিলেন এবং পেশাদার ডাক্তার। তিনি এসে দেখলেন আর ওষুধ দিলেন। সেদিন আমরা ওখানেই থেকে গেলাম।

পরের দিন (২৬ সেপ্টেম্বর) সাতটার সময় রওনা হলাম। রাস্তায় এক জায়গায় দুটো টায়ার ফেটে গেল। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্য কোনো টায়ার ছিল না। শেষে পিছনের চারটে চাকার মধ্যে দুটোর টায়ার সরিয়ে দেওয়া হল এবং সেগুলোকেই সামনে লাগিয়ে আমরা কোনো রকমে খিদরী গ্রামে পৌঁছলাম। আজ এখানেই থাকার ছিল, খুব মিষ্টি খরমুজা পাওয়া যাচ্ছিল, মুরগির মাংসও খুব সস্তা ছিল।

২৭ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ছ-টায় বাস আবার রওনা হল। দুটো চাকার জন্য টায়ার পাওয়া যাচ্ছিল না তাই চারটে চাকাতেই বাস চালানো হল। ভার হাল্কা করার জন্য তিনজন যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়া হল এবং পরে কোনো যাত্রী নেওয়া হল না। মেহনা একটা ভাল গ্রাম, বাস ওখানে একটু সময়ের জন্য দাঁড়াল। কাছেই দবীরস্তান (পাঠশালা) ছিল যেখানে একশ-র কাছাকাছি ছেলেমেয়ে পড়ত। আমরা অল্প সময় ওখানে থামলাম। হাদীহুসেনের ১০ বছরের মেয়ে বোরখা পরে ওখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। একটু পরেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা জড়ো হয়ে গেল। প্রথমে তারা বোরখার দিকে তাকাতে লাগল

তারপর দুহাত দিয়ে বোরখাকে ইশারা করে রাগাতে শুরু করল। বেচারি শাহাজাদী পালিয়ে এল। আমি হাদীহুসেনকে বললাম, 'ভাই! মেয়ের এই বোরখা লক্ষ্ণৌ-তেই ছেড়ে আসতে পারতেন। অন্তত এখানে তো এটা সরান, নইলে বেচারি কোথাও ঘুরতে ফিরতে পারবে না।'

সেই দিনই রাত আটটায় আমরা মশহদ পৌঁছে গেলাম। শুমরগ্-তে জিনিসপত্র ওলোট-পালট করে দেখা হল। এখানে তেহরান যাওয়ার বাস দাঁড়িয়ে ছিল। আমি আট তুমান ভাড়া দিলাম আর জিনিসপত্র তার ওপর তুলিয়ে নিলাম। রাত এগারোটার সময় খাওয়ার জন্য বাস এক জায়গায় একটু দাঁড়াল, তারপর সারা রাত চলতে থাকল। যদি পিঠে হেলান দেয়ার কিছু থাকত তাহলে অত কষ্ট হতো না। শব্জবার, শাহরুদ হয়ে দম্‌গান-তে রাত্তিরে থাকতে হল। আজ গোটা রাতটা শোয়ার সুযোগ পাওয়া গেল।

পরের দিন (২৯ সেপ্টেম্বর) রাস্তা ছিল উঁচু-নিচু। সেমনান্ এল। দু-বছরে তার চেহারা পালটে গেছে। এখানে খনিজ তেল বেরোয়, আমেরিকান কোম্পানির ব্যবসা আছে, আমেরিকান কায়দায় দারুণ বাড়ি হয়েছে, রাস্তাগুলো খুব সুন্দর করা হয়েছে, বিজলীর আলো এসে গেছে।

শহর থেকে দু-তিন মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর ডানদিকের প্রথম চাকাটা চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে চকিতে ছিটকে বেরিয়ে গেল। কপাল ভাল যে, এই ঘটনা পাহাড়ের ওপর ঘটে নি, নইলে যাত্রীদের মধ্যে খুব কমজনেরই প্রাণ বাঁচত। দুপুর তিনটের সময় আমরা রেললাইন পার হলাম। এই রেল তেহরান থেকে বন্দরে (কাস্পিয়ান) যায়। সামনে ফিরোজকুহ পেলাম। এরও চেহারা পালটে গেছে—বাজার নতুন, রাস্তা চওড়া। সাড়ে ছটার সময় মোটর খারাপ হয়ে গেল। রাত একটা পর্যন্ত চলল তার মেরামতি।

তেহরানে (৩০ সেপ্টেম্বর—৮ নভেম্বর)—পরের দিন ভোরে আলো ফুটতে না ফুটতেই আমরা তেহরানে ঢুকে গেলাম। আমার কাছে ইরানি মুদ্রা আর ছিল না। ভাড়ার আড়াই তুমান বাকি ছিল, আমি নিজের বিছানা রেখে গেলাম আর পরে চেক ভাঙিয়ে পয়সা দিয়ে তা নিয়ে গেলাম। সর্দার রণবীর সিংহ তাঁর লোককে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। তিনি 'মুসাফিরখানা-বতন'-এ রোজ ৬ রিয়াল হিসেবে একটা ঘর পাইয়ে দিলেন। জায়গা ভাল ছিল। হোটেলের মালিক পাঁচ-ছ বছর আগে বাকু থেকে পালিয়ে এসেছিল। পুরো পরিবার বুড়োকে দোষারোপ করছিল। ওরা বাকুতে ভালই ছিল কিন্তু বুড়োর মদ আর আফিমের তেমন সুবিধা ছিলনা। সেই সময় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য সারা দেশের মানুষই একটু অসুবিধেয় ছিল। বুড়ো তার বউ এবং পাঁচটি বাচ্চা নিয়ে ইরান পালিয়ে আসে। তার মধ্যে একটি পিঙ্গলকেশী কন্যাও ছিল। যদিও এরা তুর্কি কিন্তু রঙ এত বেশি সাদা যে দেখে রাশিয়ান মনে হয়। তুর্কিদের মতো এরা রুশী ভাষাও বলত। আমার রাশিয়া যাওয়ার ছিল তাই আমার আরামের দিকে ওরা খুব খেয়াল রাখত। এবার সোভিয়েত ভিসার খোঁজ-খবর নেওয়ার ছিল। আমি ভেবেছিলাম ভিসা এখানেই হবে কিন্তু প্রায় মাসখানেক ধরে দৌড়-ঝাঁপ আর তাগাদা দেওয়ার পর ৬ নভেম্বর ভিসা আসার খবর আমি পেলাম।

কাগজ উলটে-পালটে দেখে বুঝতে পারলাম যে, জুন মাসেই আমার ভিসা দিয়ে দেওয়ার জন্য তার এসেছিল। এই তার দেখেই আমার পাসপোর্টে ভিসা নথিভুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। আমি যখন ভিসা নিতে গেলাম, তখন দেখলাম ভিসা লিখে কেটে দেওয়া আছে। সেক্রেটারি জানাল, 'পরের তারে আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে মস্কো থেকে অনুমতি না আনিয়ে কাউকে ভিসা দেবে না, তাই এটা কাটতে হয়েছে।' আবার তার এবং লেখালেখি শুরু হল। শেষে ৬ নভেম্বর কন্‌সল-জেনারেল খবর দিলেন যে ভিসা এসে গেছে। আমি খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম। শুধু আমার অসুবিধেই আমি দেখেছিলাম, আমি কি জানতাম, সোভিয়েত সরকারকে কত অসুবিধের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। সাম্যবাদী সরকারকে উল্টে দেওয়া, লাল-বিপ্লবকে শেষ করে দেওয়ার জন্য ট্রট্‌সকী জার্মানি আর জাপানের ফ্যাসিস্ট সরকারের সঙ্গে একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল, সোভিয়েতের ভেতরের কিছু দেশদ্রোহী সেনাপতি আর রাজনীতিবিদ তাদের সঙ্গ দিয়েছিল। ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছিল এবং সোভিয়েত সরকার বিপ্লবের এই শত্রুদের বাছাই করতে শুরু করেছিল। এই সময় বহিরাগতদের তারা ততটা সুযোগ-সুবিধে দিতে পারছিল না।

পরের দিন সোভিয়েত দূতাবাসে লাল-বিপ্লবের বিংশতম বার্ষিকোৎসব পালন করার ছিল। আমার কাছেও নিমন্ত্রণ এল। আমি সন্ধেবেলা দূতাবাসে গেলাম। কন্‌সলের সেক্রেটারি সোভিয়েত-দূতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এক জায়গায় একটা লম্বা টেবিলের ওপর অনেক রকমের খাবার সাজিয়ে রাখা ছিল। উৎসব উপলক্ষে নাচ হবার ছিল। নাচের সময় খাবার চেয়ারে বসে বসে নয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে হয়—এই শিষ্টাচার আমি কি জানতাম? সেক্রেটারির সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি চার-পাঁচ গ্রাস খেলাম। বহু তরুণ আর সুন্দরীরা নাচার জন্য তৈরি ছিল। সেক্রেটারি আমাকেও কোনো সুন্দরীর সঙ্গে নাচার জন্য বললেন কিন্তু আমি জীবনে কখন নাচ শিখেছি যে মঞ্চে নামব? আমি কোনো রকমে বলে-কয়ে রেহাই পেলাম। কিছুক্ষণ বসে নাচ দেখতে লাগলাম। আটটি যুগল নেমেছিল আর বাজনার তালে দ্রুতগতিতে নাচছিল। তাদের মধ্যে আমার পরিচিত সেক্রেটারিও ছিলেন। সব ইউরোপীয় দূতাবাস থেকে নরনারীরা এসে নাচে অংশগ্রহণ করছিল। কিছুক্ষণ পর আমি ওখান থেকে উঠে চলে এলাম। বাইরে এসে বুঝতে পারলাম অন্য কারুর হ্যাট আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফিরে গেলাম কিন্তু অনেক খুঁজেও আমার হ্যাট-পরা লোককে পেলাম না। আমি যে হ্যাট পেয়েছিলাম তা আমার মাথার থেকে বড় ছিল।

৯ নভেম্বর আমি ভিসা পেয়ে গেলাম। ইনতুরিস্ত লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত জাহাজ আর রেলের টিকিটও দিয়ে দিয়েছিল।

আমি তেহরানে সোয়া এক মাসের বেশি থেকে গিয়েছিলাম। কাজ ছাড়া সময় কাটানো খুব মুশকিল। আমি কখনো হোটেলের মালিক দুই বড় ছেলের সঙ্গে গল্প করতাম, কখনো কয়েক ঘণ্টা শহরে ঘুরে বেড়াতাম। তেহরানে কুড়িটির বেশি সিনেমা হল ছিল। যেখানে জার্মান, ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান, মিশরীয় আর রাশিয়ান ফিল্ম দেখানো হতো। আমি প্রায় রোজ কোনো না কোনো ফিল্ম দেখতে চলে যেতাম। রাশিয়ান ফিল্ম আমার খুব ভাল

লাগত। একদিন 'ভল্‌গার মজদুর' ফিল্মটি দেখতে পেলাম। সবরকম দৃষ্টিকোণ থেকেই এটা ভাল ছিল। ভল্‌গা নদী, তার পাশের পর্বত আর জঙ্গলের বিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছিল। জেলেদের হোটেল আর তাদের নাচ খুবই স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করা হয়েছিল। এই চিত্রণ ছিল বিপ্লবের আগের সমাজের। জেনর আর জারের অফিসাররা তাদের জমকালো উর্দি পরে ক্ষমতা দেখাচ্ছিল, অন্যদিকে ছিল মজুরদের কঠোর জীবন। ইরানি ভিসার মেয়াদ পেরিয়ে যাচ্ছিল, তাই মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আমাকে অনেকদিন ঘুরতে হল। অফিসার অন্যের অসুবিধের কথা একটুও খেয়াল করত না। কাউকে ১৩ রিয়াল দিতে হবে সে দশ আর পাঁচ টাকার দুটো নোট দিত। অফিসার হুকুম করত, 'যাও, ভাঙিয়ে আনো।' কেউ তার দু-তিনজন বন্ধুর পাসপোর্ট ভিসা করাতে এনেছিল। হুকুম হল, 'যাও, তাদের হাতে পাসপোর্ট পাঠাও।' কেউ দেশ থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি (জাবাজ-খরুজ) চাইছিল। হুকুম হল, 'যাও, দুদিন বাদে এসো।' আমার একমাসের মেয়াদ বাড়ানোর ছিল, হুকুম হল, 'যাও, আর্জি লিখিয়ে আনো।'

আমাদের হোটেলেই মক্‌খড় (কেম্‌বলপুর)-এর এক সওদাগর হাফিজ সাহেব উঠেছিলেন। আমাদের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। আমি তো বাইরে রেঁস্তোরায় গিয়ে খাবার খেয়ে আসতাম কিন্তু হাফিজ সাহেব প্রায়ই নিজের স্টোভেই মাংসের তেবন বানিয়ে নিতেন। তিনি খুব উৎসাহ করে আমাকেও দলে নিতে শুরু করলেন। ৫ নভেম্বর ছিল রমজানের প্রথম দিন। গোটা হোটেলে হাফিজ সাহেবই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি রোজা রেখেছিলেন। কয়েকজন বসে কথা বলছিল। একজন বলল, 'ভাই, রমজান এসে গেল।' অন্যজন জবাব দিল, 'কিরমানশাহ যাচ্ছ, ওখানেই ছেড়ে এসো।' আমাদের হোটেলের মালকিন বলছিলেন, 'আরে বাবা, পুরুষ মানুষ রোজা রাখে তো রাখুক, কারণ তারা সত্তরটা হুর (অপ্সরা) পাবে কিন্তু মেয়েরা কেন রাখবে? উনসত্তর জন সতীন পাওয়ার জন্য?' এক ভদ্রলোক বলছিলেন, 'খোদার উচিত ছিল ত্রিশ রোজা বারো মাসে ভাগ করে দেওয়া আর দিনের বদলে রাতে রোজা রাখতে বলা।' আমি বললাম, 'ভাই, বুড়ো সেই সময় কবরের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।' দশ বছর আগেও রমজানের দিনগুলোতে সমস্ত হোটেল বন্ধ হয়ে যেত, দিনের বেলায় যদি কারু ঘরে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যেত, তাহলে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যেত আর মারত। কিন্তু আজ সব রেস্তোঁরা খোলা ছিল। আগের মতোই জমজমাট ছিল। বেচারি হাফিজের মুশকিল হয়েছিল। পালা করে সবাই এসে তাকে জিজ্ঞেস করছিল, 'হাফিজ! শুমা রোজা দারী। (হাফিজ! তুমি রোজা রেখেছ)?' সন্ধেয় হাফিজ আমাকে বললেন, 'ভাই, আমি কাল থেকে রোজা রাখব না।'

কিন্তু পরের দিন মালকিনের দ্বিতীয় ছেলে এল। সে হাফিজ সাহেবকে বলল, 'হাফিজ! আজ খুব ভোরে একজন সাদা দাড়িওলা লোক আমার হোটেলে এসেছিল, তার মুখমণ্ডল থেকে জ্যোতি ঝরে পড়ছিল, তার কাঁধে দুটো বড় বড় ডানা ছিল। সে ছিল রোজার হিসেব রক্ষক দেবদূত। প্রথম ঘরের দরজায় সে কড়া নাড়ল। দরজা খুললে শুধোল, তুমি রোজা রেখেছ? জবাবে 'না' শুনল। দ্বিতীয় দরজাও খটখট করল, সেখানেও জবাবে 'না' শুনল।

সাত-আটটা দরজায় খটখট করার পর সে নিজের রেজিস্টার বগল-দাবা করে ফিরে গেল। হাফিজ! তোমার তো রোজা নথিভুক্তই হয় নি। তুমি কি ছাই সত্তরটা হুর পাবে? রোজা রাখার ছিল তো প্রথম কামরায় থাকতে হতো।'

এদিক-ওদিক ঘুরতে-ফিরতে একদিন ফার্সির প্রফেসর আগা হুমাই-এর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। আপশোশ হচ্ছে, এই পরিচয় আগে হলে আরও ভালভাবে দিন কাটত। তিনি ছিলেন ইস্পাহানের বাসিন্দা আর কয়েক প্রজন্ম ধরে তাঁর বংশের লোকেরা বিদ্বান, মৌলবী হয়ে আসছেন। হুমাই ইংরেজি বা ফরাসি জানতেন না, তাই আমাকে ফার্সিতেই সব কিছু বলতে-পড়তে হতো। ১৮ তারিখে বিকেল সাড়ে চারটা থেকে রাত সোয়া নটা পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে ছিলাম। এই সময় তিনি আলবেরুনির বই 'তফ্হীম্' সম্পাদনা করছিলেন। কখনো ফার্সি ভাষা, কখনো ইরানের ইতিহাস আবার কখনো ইন্দো-ইরানি জাতিদের সম্বন্ধে কথা চলতে থাকল। ২০ অক্টোবরও পাঁচটা পর্যন্ত মজলিস চলে ছিল। তিনি জানালেন যে ইস্পাহানের কোনো পুলের পাথরের ওপর ব্রাহ্মী অক্ষর খোদাই করা আছে। একদিন বলছিলেন, 'আমরা সবাই তো ধর্মকে উঠিয়ে তাকের ওপর রেখে দিয়েছি, ভারতের অবস্থা কেমন?' আমি বললাম, 'ভাই, বেচারা ধর্মকে পুরো দুনিয়া থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, তারও তো কোথাও আশ্রয় মেলা দরকার?' তিনি 'দানিশকদা' (কলেজ)-তে পুরনো ফার্সি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ভাষাতত্ত্বের শিক্ষা তাঁর ছিল না কিন্তু আগ্রহ ছিল খুব। তাঁর কাছে শামসুল-উলমা আজাদের সে-বিষয়ে উর্দূর একটা বই ছিল। তাতে ব্যবহৃত আরবী-ফার্সি শব্দের সাহায্যে তিনি বোঝার চেষ্টা করতেন। তিনি বলছিলেন, 'এই বইয়ে আমাদের ভাষার ব্যাকরণ এখনো পর্যন্ত আরবী ব্যাকরণের ধাঁচে লেখা হচ্ছে। আমাদের ভাষার সঙ্গে আরবী ভাষার কোনো সম্বন্ধ নেই, সেজন্য এই পুরো ব্যাকরণটাই অসম্পূর্ণ।' আমি বললাম, 'আপনি যদি আপনার ব্যাকরণ সংস্কৃতের সাহায্য নিয়ে লেখেন তাহলে সেটা বেশি ভাল হবে।' অনেকদিন ধরে আমাদের বৈঠকে ব্যাকরণের গঠন নিয়ে তর্ক হতে থাকল। কখনো সুবন্ত নিয়ে, কখনো তিঙন্ত, কখনো কারক-এর প্রসঙ্গ আসত, আবার কখনো স্ত্রী-প্রত্যয়। কৃৎ প্রত্যয় আর তদ্ধিত প্রত্যয় ফার্সিতেও পাওয়া যায়। টাবন্ত স্ত্রী-প্রত্যয় তো খুব বেশি আছে, যেমন—হম-শীরা। আমি বললাম, 'এটা সংস্কৃতে সম-ক্ষীরা হবে।' আমি একদিন বললাম, ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিদের প্রথম বিভাজন যা হয়েছিল তাকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা শতম্ আর আর কেন্টম্ নামে উল্লেখ করেন। শতম্ পরিবার পরে দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়—একটি আর্য, অন্যটি স্লাব। স্লাব লোকেরা হল রাশিয়ান আর আর্য নামটা ভারতীয় এবং ইরানিরা নিজেদের জন্য সুরক্ষিত রাখল। সংস্কৃত আর স্লাব ভাষার মধ্যে যে একইরকম শব্দ বা ধাতু পাওয়া যায় তা ইরানি ভাষাতেও অবশ্যই থাকা উচিত। একদিন আমরা 'পীনা' ধাতু নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ফার্সি সাহিত্যের ভাষায় 'পীনা' শব্দ একেবারেই ব্যবহার হয় না। তারপর আমাদের মধ্যে কেউ 'পেয়ালা' শব্দটা বলল আর শেষে হুমাই লোরী বা অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষায় 'পীনা' শব্দের প্রয়োগ খুঁজে বের করল।

৯ নভেম্বর মোটরকারে করে পহলবী পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সাড়ে তেইশ তুমানে একটা

সিট পাওয়া গেল। ৫ মাইল যাওয়ার পর খেয়াল হল যে, চেক আমি সর্দার রঘুবীর সিংহর ওখানে ফেলে এসেছি। কার আবার পেছনে নিয়ে যাওয়া হল এবং চেক নিয়ে সাড়ে ছ-টার সময় আমরা তেহরান ছাড়লাম। পৌনে তিন ঘণ্টায় কজবীন পৌছলাম। খেতে এক ঘণ্টা লাগল। তারপর পাহাড় আর উপত্যকায় ওঠানামা করে রাত আড়াইটেয় রস্ত পৌছলাম। পাহাড় থেকে নেমে যেই গেলান পৌঁছলাম অমনি শীত কমে গেল। বস্তুত ঠাণ্ডার ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম কেননা চামড়ার পাতলুন, কোট আর ওভারকোট বানিয়ে নিয়ে ছিলাম, যা করতে ৩৫ তুমান খরচ হয়েছিল। চামড়ার মোজা এবং কান-ঢাকা টুপিও সঙ্গে ছিল। রাতে রস্ত-তে শুলাম। গত দুবছরে রস্ত-তেও অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। রাস্তা চওড়া হয়েছিল, অনেক বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছিল, ভালো মেহমানখানা (হোটেল) ছিল।

আজ (১০ নভেম্বর) সাড়ে আটটায় যখন আমরা রস্ত থেকে বেরোলাম, তখন আকাশে মেঘ ছেয়েছিল। খানা-খন্দ জলে ভর্তি ছিল, চারদিকে ছিল সবুজ ঘাস আর জঙ্গল। নদীতে জল বয়ে যাচ্ছিল। ধানের খেত কাটা হয়ে গিয়েছিল। বর্ষার আধিক্যের জন্য এখানকার ছাতগুলো কাঁচা মাটির হয় না। গেলান-প্রান্তের সমস্ত জমি উর্বর কিন্তু এখন সে-সব জায়গায় জনবসতি নেই। এখানকার চাল খুব বিখ্যাত। এক ঘণ্টায় আমরা পহলবী পৌছে গেলাম এবং দৈনিক ১৫ রিয়াল হিসাবে একটা ঘর নিয়ে গ্র্যাণ্ড-হোটেলে উঠলাম। দিল্লী থেকে পহলবী পর্যন্ত রেল আর মোটরের খরচ হয়েছিল একশ তিন টাকা। জানলাম জাহাজ পরের দিন ছাড়বে। সেই দিনই আমি ইন্‌তুরিস্তের কাছে গিয়ে টিকিট করার জন্য বলে এলাম।

সোভিয়েত দেশে দ্বিতীয়বার, ১৯৩৭-৩৮

আমি জাহাজের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট করেছিলাম। তাতে শোয়ার জন্য কাঠের তক্তা ছিল। আমি ছাড়া দুটো ইটালিয়ান দম্পতিও এই শ্রেণীতে যাচ্ছিল। অন্ধকার হওয়ার পর জাহাজ রওনা হয়েছিল। জাহাজ ছিল সোভিয়েতের। সমুদ্র ছিল শান্ত।

পরের দিন ১২ নভেম্বর কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তটের ন্যাড়া পাহাড় দেখা যেতে লাগল। সমুদ্র এত শান্ত ছিল যে, দেখলে হ্রদের মতো মনে হচ্ছিল। আমরা একটা পাহাড়ী দ্বীপের পাশ দিয়ে গেলাম। সেখানে জেলেদের কয়েকটা ঘর ছিল। এগারোটার সময় জাহাজ বাকু বন্দরের তটে গিয়ে লাগল। কাস্টম-এর অফিসার জিনিসপত্র দেখল, তালপুঁথির পাতা গুনে পাসপোর্টের ওপর লিখে দিল, যাতে দেশের বাইরে যাওয়ার সময় সেগুলোর জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি না হয়। সে হয়তো কোনো খবর পেয়ে গিয়েছিল।

জিজ্ঞেস করল, 'ভারত থেকে যে পণ্ডিত আসার কথা আপনিই কি তিনি?' আমি বললাম, 'সম্ভবত, কারণ আমি সোভিয়েত অকাদেমির আমন্ত্রণে যাচ্ছি।' মোটরকার আমার ইন্‌তুরিস্ত হোটেলে নিয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম সেই পুরনো সাতমহলা দোকানে যেতে হবে কিন্তু দেখলাম এটা একটা নতুন চারতলা প্রাসাদ। এটা মাত্র এক বছর আগেই তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে ছিয়াত্তরটা ঘর ছিল। প্রত্যেক ঘরে দুটো টেবিল, তিনটে চেয়ার, একটা আলমারি, একটা খাট আর একটা টেলিফোন ছিল। স্নানঘরও পাশেই ছিল, পরিচ্ছন্নতা আর আরাম দুই-এরই ভালো ব্যবস্থা ছিল। খাওয়ার ঘর খুব সুন্দর ছিল আর খাবার এত ভাল যে লোকে নিজেকে সংযত না করলে বদহজম হওয়ার ভয় ছিল। বিকেল পাঁচটায় মোটরে করে ঘুরতে বেরোলাম। দু-বছর আগে আমি যে বাকু দেখেছিলাম তার এখন অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। অনেক বড় বড় বাড়ি হয়েছিল। পার্ক উদ্যানও এখন বেশি মনোরম হয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল। এখন বাকুতে পশম-কাপড়েরও মিল খোলা হচ্ছিল।

মস্কোর পথে—পরের দিনই (১৩ নভেম্বর) আমি স্টেশনে গেলাম। পথপ্রদর্শক ৭ নম্বর কামরার ১৬ নম্বর সিটে আমাকে পৌঁছে দিল। আমার কামরায় আমি ছাড়া আর কোনো পরদেশী লোক ছিল না। আগের বার আমি রাত্তিরবেলায় এখান দিয়ে পেরিয়ে ছিলাম, তাই ভেবেছিলাম এই সমস্ত জায়গা আর পাহাড় হয়তো রুখা-সুখা, কিন্তু এখানে তো ছিল প্রচুর জঙ্গল এবং সবুজ মাঠ। পাহাড়ের ওপর অনেক গ্রাম গড়ে উঠেছিল। তবে হ্যাঁ, শীতের জন্য পাতাগুলো হলুদ হতে শুরু করেছিল। একটা কল্‌খোজ[১] (পঞ্চায়েতি চাষাবাদের গ্রাম)-এর আঙুর লতা হলুদ হয়ে গিয়েছিল। সন্ধেয় দরবন্দ (দ্বারবন্ধ) পৌঁছলাম। দরবন্দ সৈনিকদের কাছে ততটাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন ভারতের খৈবর। (বর্তমান লড়াইয়ে যখন জার্মানি ফ্যাসিস্ট ককেশাসের দিকে এগোচ্ছিল তখন তারা জানত যে বাকু পৌঁছনোর আগে তাদের দরবন্দের নিরাপত্তা-বেষ্টনীকে ভাঙতে হবে।) অন্ধকার হতে হতে আমরা ইজ্‌বরিবশ্‌-এর কাছ দিয়ে পেরোচ্ছিলাম। সেই সময় দেখলাম যে পাঁচ-ছ জায়গায় মাটি থেকে অগ্নিশিখা বেরিয়ে আসছে। আমি ভাবতে লাগলাম, এখানে কোনো হিন্দু নেই নইলে বলশেভিকদের বলতো—'তোমরা বাকুর জ্বালামাঈকে নিবিয়ে দিয়েছ। দেখ এখানে মা আবার এক নয় সাত মুখে বেরিয়ে এসেছে।'।

আমাদের কামরায় চারটা সিট লম্বালম্বিভাবে ওপর-নিচে আর দুটো সিট পাশে ওপর-নিচে ছিল। যাত্রী কফকাশী (ককেশিয়ান) ছিল। আমার সামনের সিটে তবারিশ আলী ছিলেন। খাবার সময় এল, তিনি শুয়োরের মাংস আর মদের বোতল বের করলেন। আমি ভাবলাম, মদ তো কোনো ব্যাপার নয়। এই শুয়োর কি করে খাবে। তিনি আমাকেও খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। যদিও আমার রুশী ভাষার জ্ঞানে আগের যাত্রায় কিছুটা

---

[১] কল্‌খোজ [Kŏlkhoź (-kŏz)/Russ. *kol (Lektivnoe) khoz (yaistvo)* collective farm রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যৌথ খামার।—স-ম-

বুদ্ধি অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু বই থেকে শব্দ খুঁজতে হতো। খাবার জন্য তো গাড়ি সঙ্গে ছিল আর আমার খাওয়ার খরচ রেল-ভাড়ায় ধরা ছিল, তাই আমি নম্রতাপূর্বক খাওয়ায় অসম্মতি জানালাম।

বাকু থেকে মস্কো তিনদিনের রাস্তা। পরের দিন (১৪ নভেম্বর) আমাদের ট্রেন রোস্তোফ-এর কাছে পৌঁছল। এদিকে পাতা-ঝরার মরশুম ছিল। সে-সময় বৃষ্টি বেশি হচ্ছিল। আকাশে মেঘ ঘনিয়ে ছিল। সোভিয়েত-খেত আর পঞ্চায়েতি চাষাবাদের বিশাল খেত দেখা যাচ্ছিল। স্টেশনে খনিজ তেলের কাদা গড়িয়ে পড়ছিল। প্রত্যেক জায়গায় নতুন নতুন অট্টালিকা উঠছিল। আমাদের গাড়িতে ইংরেজি-জানা কেউ ছিল না, তাই রাশিয়ান ভাষার মধ্যেই দিনরাত আমাকে থাকতে হচ্ছিল। লেনিনগ্রাদগামী একজন প্রৌঢ়া গায়িকা আর নটী ছিল, নোরা ইভানোভনা কুদরেসচেবা। তার বাবা রোমনী আর মা রুশী ছিল। রোমনী লোকরা আজ থেকে ছ-সাতশ বছর আগে ভারত থেকে পশ্চিমের দিকে চলে গিয়েছিল, ভারতে তারা যাযাবরদের মত ভ্রাম্যমান জীবনযাপন করত। রোমনীরা ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। নাচ-গানে তারা খুব কুশলী ছিল আর বহু বছরের রক্তের সহমিশ্রণ এবং ঠাণ্ডা এলাকায় থাকার দরুন তাদের গায়ের রঙ এখন বেশি ফর্সা। পণ্ডিতরা বলেন যে 'রোমনী' শব্দ ডোমনী বা ডোম থেকে এসেছে। নোরার বয়স ছিল তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ বছর, এখন বসন্তের সৌন্দর্য ছিল না কিন্তু শিশিরের চেহারা থেকে তা অনুমান করা যাচ্ছিল। আমি ভেবেছিলাম পৈতৃক ভাষার কিছু শব্দ সে জানে কিন্তু দেখলাম ছোটবেলা থেকে বাবা নয়, মায়ের ভাষাই সে শিখেছে। কথা বলার ব্যাপারে নোরা আমাকে খুব সাহায্য করত।

সন্ধেবেলায় খরকোফ্ পৌঁছলাম। বিশাল অট্টালিকা আর বড় বড় কাবখানার জন্য এটা সোভিয়েতের একটা প্রসিদ্ধ নগব। কয়েক বছর আগে এটা উকরেইন প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ছিল, কিন্তু এখন তা কিয়েফ-এ। খরকোফের জনসংখ্যা ১০ লাখ।

১৫ নভেম্বর সকালে আমি যখন জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম, দেখলাম চারদিকে দেবদারু আর ভূর্জপত্রের জঙ্গল। যত্রতত্র ছিল কল্‌খোজী গ্রাম আর তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ি। এখন বরফও দেখা যেতে লাগল। ভূমি সমতল ছিল না। রাত দশটায় গাড়ি মস্কো পৌঁছল। ইন্‌তুরিস্তের লোক নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল। লোকে যত খুশি জিনিসপত্র ভ্রমণের সময় সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল। তাই রেলকর্তৃপক্ষ এবার কড়াকড়ি করেছিল। আমার সঙ্গেও দেড় মণের বেশি জিনিস ছিল। আমাকেও আটকান হল কিন্তু ইন্‌তুরিস্তের লোক আমার পরিচয় দিল এবং আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম। মোটরে করে ইন্‌তুরিস্ত হোটেলে গেলাম।

পরেব দিন রাতে গাড়ি পাওয়া যাবে তাই সারাটা দিন ছিল আমার নিজস্ব। আমি পলিটেকনিক মিউজিয়াম দেখলাম। চাষবাস, বাগান-পরিচর্যা, পশুপালন, কারখানা আর বাড়ির কাজে ব্যবহৃত হয় এরকম সব যন্ত্র এবং দুটো পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সফলতার নমুনা সেখানে রাখা ছিল। পথপ্রদর্শক প্রতিটি জিনিস ঘুরিয়ে দেখাল। গোপালনের দৃশ্য একেবারে বাস্তব ছিল। দেখলে মনে হচ্ছিল হাজার গরু গোচারণ ভূমিতে চরছে। সেটা

সত্যি লাগছিল। পাশেই একটি সত্যিকারের জীবন্ত গরু জাব খাচ্ছিল আর কান-লেজ নাড়াচ্ছে। এছাড়া আঁকা গরুও ছিল কিন্তু তাদের এত ভাবনা-চিন্তা করে দূরে দূরে রাখা হয়েছিল যে সামনের গরুটির মত তাদেরও সত্যিকারের গরু মনে হচ্ছিল। বাগান এবং চারার ব্যাপারেও এই রকমই করা হয়েছিল। দু-ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আমি মিউজিয়াম দেখতে লাগলাম। আড়াইটের সময় আবার শহর দেখতে বেরোলাম। ক্রেমলিন বাইরে থেকে দেখলাম। লেনিনের সমাধি পাঁচটার সময় দর্শকদের জন্য খুলত। সেখানে দর্শকদের একটা লম্বা লাইন দাঁড়িয়েছিল। আমি ভাবলাম আবার কখনো দেখে নেব। বিশ্ববিদ্যালয় আর লেনিন গ্রন্থাগার দেখে সাংস্কৃতিক উদ্যানে গেলাম। অনেকগুলো নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। পাতাল রেলে একটু বেড়ালাম। অনেক রঙের মার্বেল পাথর এই স্টেশন বানাতে লেগেছে।

লেনিনগ্রাদে, ১৭ নভেম্বর-১৩ জানুয়ারি

১৬ নভেম্বর দশটার সময় আমাদের গাড়ি মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদের উদ্দেশে রওনা হল। আমার কামরায় সিবেরিয়া (ব্রেখনেউদিন্স্ক)-র এক ছাত্রী ছিল, সে মস্কোতে ডাক্তারী পড়ছিল এবং কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে লেনিনগ্রাদ যাচ্ছিল। সকাল নটা বেজে দশ মিনিটে গাড়ি লেনিনগ্রাদ পৌঁছল। রাস্তায় আমরা প্রচুর বরফ দেখেছিলাম। দেবদারু ছাড়া অন্য সব বৃক্ষ নিষ্পত্র তথা নগ্ন হয়ে গিয়েছিল। স্টেশনে ইন্‌তুরিস্তের মোটর এসেছিল। দশটার সময় 'হোতেল-য়ুরোপা' পৌঁছলাম। ৪৯ নম্বর কামরা আগে থেকেই ঠিকঠাক করে রাখা হয়েছিল। এই হোটেলটি লেনিনগ্রাদের বড় হোটেলগুলোর একটি। ঘরের ভেতরেই টেলিফোন ছিল। ডাক্তার শ্চেরবাৎস্কীর সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। জানলাম পায়ে আঘাত পাওয়ার জন্য তিনি এখন শয্যাশায়ী। সন্ধে সাতটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরোলম। খোঁজ নিয়ে দেখলাম ৭ নম্বর ট্রাম তাঁর ঘরের কাছ দিয়ে যায়। রাস্তায় গলি সম্বন্ধে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হল যিনি ডাক্তারের পরিচিত ছিলেন। আমি ওখানে পৌঁছে গেলাম। কড়া নাড়ার পর এক বৃদ্ধা দরজা খুলল। আমি নাম বললাম। সে আমাকে আচার্য শ্চেরবাৎস্কীর ঘরে নিয়ে গেল। ডাক্তাররা তাঁর পায়ে প্লাস্টার করে দিয়েছিলেন তাই ওঠাবসা করতে পারছিলেন না। আমি পৌঁছতেই তিনি সংস্কৃততে 'আসুন, এই আপনার আসন' বলে স্বাগত জানালেন। দু-ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা চলল। তিনি জানালেন, 'কাল থেকে আপনার কাছে রবিনোভিচ নামে একজন ছাত্র যাবে, সে সংস্কৃত পড়ছে আর ইংরেজি জানে। ইনস্টিটিউট (ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট)-এর মোটরশালায় (গ্যারেজে) বলা আছে, যখন দরকার হবে ওখান থেকে গাড়ি আনিয়ে নেবেন।' এও বললেন, 'জুন মাসে সমস্ত ব্যবস্থা করে এখান থেকে তার করা হয়েছিল। এখন অকাদেমিকে এ ব্যাপারে আবার বন্দোবস্ত করতে হবে।'

সে-সময় সোভিয়েত দেশে লোকে রবিবার ভুলে গিয়েছিল, তখন দিনের দরকার ছিল না, লোককে তারিখ ধরে কাজ করতে হতো প্রতি ষষ্ঠ দিন ছিল ছুটির দিন। মাসের

ছয়, বারো, আঠারো, চব্বিশ এবং শেষ তারিখ ছুটি থাকত। পরের ইনস্টিটিউট বন্ধ ছিল। রবিনোভিচ আমাকে হরমিতাজ মিউজিয়াম দেখাতে নিয়ে গেল। এই মিউজিয়ামটি ছিল জারের শারদ প্রাসাদের পাশে। শিল্পকলা আর অন্যান্য সামগ্রীর এত বেশি সংগ্রহ এখানে ছিল যে কেউ একদিনে তা দেখতে পারত না। আমি শুধু পূব-বিভাগ দেখব ঠিক করলাম। তুঙ্‌হুয়ান্ (মধ্য এশিয়া) থেকে প্রাপ্ত মূর্তি, ভিত্তিচিত্র, কাষ্ঠফলক, বস্ত্র এবং বাসন খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এক জায়গায় তুঙ্‌গুত এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক জিনিসগুলো একত্রিত করা হয়েছিল। এখানকার চিত্রপটের সঙ্গে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর তিব্বতী চিত্রপটের খুব মিল আছে। এক জায়গায় সোভিয়েত তুর্কিস্থানের খননে প্রাপ্ত জিনিস রাখা ছিল, যার মধ্যে যবন-বাহ্লীককলার জিনিসগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইরানের প্রাচীন শিল্পকলার যত ভাল নমুনা এই মিউজিয়ামে আছে তা পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবে না। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের অনেক জিনিস এখানে জমা ছিল।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর হূণদের কত জিনিস এখানে রাখা ছিল। মিশরীয় এবং অসুর সভ্যতাকে জানার জন্য ও এখানে অনেক জিনিস ছিল। জার বংশের অলংকার, ঘড়ি, লাঠি এবং অন্যান্য জিনিস আলাদা রাখা ছিল। আমরা সেই ঘরটিও দেখলাম যেখানে কেরেনস্কি-এর মন্ত্রীসভা রুশ বিপ্লবের সময় ধরা পড়েছিল। তারপর পণ্ডিত-ভোজনালয়ে গিয়ে খেলাম। এই ভোজনালয় আগে কোনো রাজকুমারের মহল ছিল, এখন তাকে বিদ্বান ব্যক্তিদের খাবার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। বিকেলে আমরা একটি বড় গির্জা 'কজান্‌কি সবোর' দেখতে গেলাম। আগে এখানে হাজার হাজার লোক খ্রীস্টের কাছে প্রার্থনা করতে আসত, তারপর লোকের শ্রদ্ধা কমতে শুরু করল, লোকে এক-এক করে সরে যেতে শুরু করল। কয়েক কোটি টাকার এই ইমারতকে যদি উপেক্ষা করা হতো, তাহলে তা কিছু দিনের মধ্যেই ভেঙে পড়ত। কিন্তু ওই গির্জা বাস্তুকলা, মূর্তিকলা এবং চিত্রকলার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত, সেজন্য এটিকে একটি মিউজিয়ামের রূপ দেওয়া হয়েছে। এর ঘরগুলোতে, ইহুদী, খ্রীস্ট, বৌদ্ধ এবং মুসলমান ধর্মের—সামগ্রীই শুধু নয়—ভূত, প্রেত, ওঝা-সখায় বিশ্বাসী আদিম জাতিদের ধর্মীয় ক্রমবিকাশকে বোঝার জন্যও অনেক জিনিস একত্রিত করা হয়েছে। আমি রোবিনোভিচ্‌কে বললাম, 'এমন কোনো গির্জায় নিয়ে চল যেখানে এখনো ভক্তরা আসে।' তখন সে পোল্‌স্কী সবোর (পোল্যান্ডবাসীদের গির্জা)-এ নিয়ে গেল। হাজারের বেশি লোক এই গির্জার বড় ঘরে বসতে পারে। তখন প্রার্থনার সময় ছিল। আমি দেখলাম এত বড় ঘরের এক কোণে ২১, ১২ জন বৃদ্ধা হাঁটু মুড়ে খ্রীস্টের প্রার্থনা করছিল। সম্ভবত এরাও পরিহাসের ভয়ে নিজেদের জোয়ান ছেলে-মেয়েদের চোখ বাঁচিয়ে এসেছে। আমি গির্জার পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি জানালেন, 'এখন কয়েক জন মাত্র ভক্ত থেকে গেছে। এটুকুও চাঁদা পাওয়া মুশকিল হয়ে গেছে যা দিয়ে কয়লা কিনে এই ঘরটাকে গরম রাখা যায়। যে দিন এই ঘর গরম করা বন্ধ হবে সেদিন এই বৃদ্ধরাও আসবে না।'

১৯ নভেম্বর রবীন আমাকে ইনস্টিটিউটে নিয়ে গেল। ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ স্ত্রুভের সঙ্গে সেদিন সাক্ষাৎ হল। আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিশাল পণ্ডিত ডক্টর বরান্নিকোফ

দেখা করলেন। তার সঙ্গে কথাবার্তা হতে লাগল। রোমনী ভাষার তিনি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি প্রেমসাগর রুশ ভাষাতে অনুবাদ করে প্রকাশিত করেছেন। এখন (১৯৪৪) তিনি তুলসীদাসের রামায়ণ-এর রুশী অনুবাদ সম্পূর্ণ করছিলেন। পাঁচটার সময় সুরীকোফ (মৃত্যু ১৯১২)-এর চিত্রের প্রদর্শনী দেখতে গেলাম। একটি চিত্র খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল। দুজন ঘোড়সওয়ার-বন্ধু কোনো জরুরি কাজে আলাদা-আলাদা বেরিয়েছিল। এক বন্ধু এবং তার ঘোড়া কোনো নির্জন জায়গায় গিয়ে মরে গেল। কয়েক বছর পর ওখানে লোকটির আর তার ঘোড়ার কিছু হাড়গোড় দেখে তার হৃদয় শোকে ভরে উঠল। এই ভাবটি শিল্পী সুরীকোফ খুব সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছিলেন।

সাতটার সময় আমরা একটি ঐতিহাসিক ফিল্ম 'পুগাচেফ' দেখতে গেলাম। এটি দু-আড়াইশো বছরের পুরনো ঘটনা। সে-সময় জারশাহী হুকুমতের অত্যাচারে কৃষকরা ত্রাহি-ত্রাহি করছিল। হাজার হাজার কৃষকের মত পুগাচেফও একটি জেলে বন্দী ছিল। সে একটু চিন্তা করল, তারপর জেল থেকে পালিয়ে ধীরে ধীরে যোদ্ধাদের একটি দল গঠন করল এবং নিজের এলাকা থেকে জারশাহী হুক্মতকে মেরে তাড়াল। অনেক বছর পর পুগাচেফ ধরা পড়ল, এবং কুড়ুল দিয়ে তাঁর মাথা কেটে দেওয়া হল। খুব সুন্দর ফিল্ম ছিল সেটি। আমাদের এখানে সিনেমা হলে নিচের দুটো শ্রেণীর দর্শকদের চোখ বিদ্ধ করার জন্য বসানো হয়, সোভিয়েত সিনেমা হলে সেই জায়গা খালি থাকে। প্রতিটি এলাকায় সিনেমা হল থাকা সত্ত্বেও দর্শকদের ভিড় লেগে থাকে।

২০ নভেম্বর আমি আচার্য শ্চের্বাৎস্কীর বাড়ি গেলাম। জানতে পারলাম মস্কোতে অকাদেমির অধিবেশন হতে চলেছে ডঃ স্ত্রুভে সেখানে যাচ্ছেন। আচার্য বললেন, 'কমরেড স্ট্যালিন এবং অন্য নেতাদেরও ওখানে পাওয়া যাবে। যেতে চাইলে যান।' কিন্তু আমি ভাবলাম, এখন তো কি জানি কতদিন আমাকে এখানে থাকতে হয়, পরে কখনো চলে যেতে পারি। সেজন্য গেলাম না। ২১ নভেম্বর থেকে আমি রোজ নিয়মিত ইনস্টিটিউট যেতে শুরু করলাম। সেখানে ইন্দো-তিব্বতী বিভাগে আমাকে চেয়ার-টেবিল দিয়ে দেওয়া হল। আমি ভোটিয়া অনুবাদ্ থেকে 'বার্তিকালংকার'-এর সংস্কৃত কপি মেলাতে লাগলাম। হোটেলে থাকা পছন্দ করছিলাম না, আমি চাইছিলাম এমন কোনো ঘরে থাকি, যেখানে সবসময় প্রতিবেশী থাকবে এবং আমার ভাষা শেখার সুবিধে হবে। কিন্তু সে-ব্যবস্থা এখন হওয়া সম্ভব ছিল না। আমাদের বিভাগের সেক্রেটারি লোলা (এলেনা) নারভের্তোব্না কোজেরোভস্কায়া-র শরীর ভাল ছিল না, তাই এখন সে ইনস্টিটিউটে আসছিল না। রবিন জানাল যে সে একটি ভোটিয়া-রুশী শব্দকোষ তৈরি করছে।

২৪ নভেম্বর আমি শ্রী দাউদআলী দত্তর কাছে গেলাম। দাউদআলী দত্তের ভারতীয় নাম ছিল প্রমথনাথ দত্ত। তিনি কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পর যে জোরদার আন্দোলন হয়েছিল এবং হাজার হাজার দেশভক্তকে ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই সময়ই তিনি ভারত থেকে পালিয়ে ছিলেন। পশ্চিমী দেশে বহু বছর ধরে ঘুরতে থাকেন। তুর্কীতে অনেক দিন থাকেন, তারপর ইরানে থাকেন। মুসলমানী দেশ

গুলোতে গিয়ে তিনি নিজের নাম দাউদঅলী রাখেন। যখন ইরানে ছিলেন, সেই মুরাদাবাদের সুফী অম্বাপ্রসাদ এবং পাঞ্জাবের সর্দার অজিত সিংহও সেখানে থাকতেন। সুফী শীরাজে একটি মাদ্রাসা খুলে রেখেছিলেন। গত যুদ্ধের সময় শীরাজের ভারতীয়দের ধরে ফেলা হয়, সুফী বুঝতে পেরেছিলেন শীরাজে ইংরেজরা আসবে। ইংরেজদের হাতে পড়ার ভয়ে তিনি বিষ খেয়ে প্রাণ দিয়ে দেন। দশ বছর হয়ে গিয়েছিল দত্ত মশাইয়ের ডান পায়ে চোট লাগা এবং এখন তিনি অক্ষম হয়ে গিয়েছিলেন। দত্তর স্ত্রী নোরা একজন রুশী মহিলা ছিলেন। তিনি ইংরেজি ভালো বলতে পারতেন। দত্ত মহাশয় হিন্দি, উর্দু, বাংলা, তিনটে ভাষাই ভাল জানতেন এবং লেনিনগ্রাদে তিনি এগুলোই পড়াতেন।

আমি যখন তেহরানে ছিলাম সে-সময় ভবিষ্যতের খরচের জন্য কিছু ইরানী মুদ্রার দরকার ছিল। যদিও বেসরকারী হিসেবে পাউন্ডের মূল্য বেশি ছিল কিন্তু ব্যাঙ্কে নিতে গেলে তা দেড়গুণ কম পাওয়া যেত। আমি ২০, ২৫ পাউন্ড ভাঙাতে যাচ্ছিলাম। এতে হাফিজ ইলাহীবখ্‌শ মুহম্মদ হাশিম—আমার মক্‌খড়বাসী বন্ধু বললেন 'আপনি টাকা ভাঙাবেন না, যত টাকার দরকার হবে, আমি দেব। ভারতে গিয়ে আমার বাড়িতে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।' আমি বললাম, 'টাকার ব্যাপারে কারোর ওপর এরকম বিশ্বাস করা উচিত নয়।' হাফিজ বললেন, 'আমার মন বিশ্বাস করতে বলছে।'

আমি বললাম, 'বলছে, তাহলে ভুল করছে, আপনি জানেনই যে আমি ধর্ম, ঈশ্বরকে মানি না, তবু এরকম লোকের ওপর আপনি কেন বিশ্বাস রাখবেন?'

হাফিজ বললেন, 'এই জন্য আমি আপনাকে আরও বিশ্বাস করি।'

যাক্ গে, হাফিজ সাহেব আমাকে টাকা দিয়ে দিলেন। আমি ২৬ নভেম্বর তাঁর কথা অনুযায়ী হাজী ফতেহমুহম্মদ পরাচা সাওল মক্‌খড়-শরীফ (জেলা কেম্বলপুর)-এর কাছে ২০ পাউন্ড পাঠিয়ে দিলাম।

আমি প্রায়ই হেঁটে ইনস্টিটিউট চলে যেতাম। ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গিয়েছিল এবং সূর্য তো মনে হচ্ছিল পুরো শীতের জন্য নিজের মুখ মেঘে ঢেকে নিয়েছিল।

২৮ নভেম্বর আমি ইনস্টিটিউট গেলাম। পথে চারদিকে ছিল শুধু বরফ আর বরফ। বড় রাস্তা থেকে তো বরফ কেটে সরানো হতো কিন্তু ছোটো রাস্তা আর বাগানে তা তেমনিই পড়ে থাকত। নরম বরফে পা ঘষে যেত এবং বেশি কঠিন হয়ে গেলে পা খুব পিছলে যেত। আমি সেদিন আসার সময় এক জায়গায় পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। সেদিন একটু একটু হিমবর্ষাও হচ্ছিল। ইনস্টিটিউটে আজ আমি আমাদের বিভাগের সেক্রেটারি লোলাকে দেখলাম। সে ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি, রুশী আর মোঙ্গল বলতে পারত। এজন্য কথা বলায় কোনো অসুবিধে ছিল না। সে বলল, 'আমার ইংরেজি খুব দুর্বল নইলে আমি রুশী পড়াতাম।' আমি বললাম, 'নহী তবারিশ। তুমি আমাকে ভালভাবে রুশী পড়াতে পার, কেননা মূলত রুশীকে তোমার নিজের মাধ্যম করতে হবে। আমি তোমাকে সংস্কৃত পড়াব আর তুমি আমাকে রুশী পড়াও।' দুজনে 'এবমস্তু' বললাম।

ডিসেম্বরের শুরুতে শীত খুব বেড়ে গিয়েছিল। আমি এতদিন তিব্বতী পশমের শাদা স্যুট পরে যেতাম কিন্তু এখন তা বাদেও চামড়ার ওভারকোটটা নিয়ে যেতে শুরু করলাম।

হাতে চামড়ার দস্তানা থাকত, ফলে শীত টের পেতাম না।

২ ডিসেম্বরের আমি দেখলাম যে, নেবা নদীর জল যেখানে-সেখানে জমে বরফ হয়ে গেছে। আজ থেকে আমি লোলাকে সংস্কৃত পড়াতে আরম্ভ করলাম। লোলা মোঙ্গল ও তিব্বতী ভাষা পড়েছিল। আচার্য শ্চেরবাৎস্কীর সে একজন যোগ্য ছাত্রী ছিল, কিন্তু সংস্কৃত পড়ার দিকে মনোযোগ দেয়নি। সে দেবনাগরী অক্ষর চিনত। আমি তাকে সংস্কৃত পড়াবার জন্য নিজেই পাঠক্রম তৈরি করলাম। এই পাঠক্রমে বেশি করে সেইসব ধাতু আর শব্দ রেখে ছিলাম, যা রুশ এবং সংস্কৃত ভাষায় সমানভাবে আছে। আজ তার প্রথম পাঠ হল।

৬ তারিখে দত্ত মশাইয়ের কাছে গেলাম। সেখানে তাঁর শ্যালিকা এবং শ্যালিকা-পুত্র—প্রায় সাড়ে ছ-বছরের স্বাস্থ্যবান ছেলে অরকাশা-র সঙ্গে আলাপ হল। নোরার দেওর তো আমি ছিলামই, এখন অরকাশার দ্য়া-দ্য়া (কাকা)ও হয়ে গেলাম।

যখন আমি দত্ত মশাইয়ের কাছে যেতাম, অরকাশা আমার সঙ্গ ছাড়ত না। এরকম একটি শিশুর সাহায্যে তিব্বতী ভাষায় আমাব দখল আমি আয়ত্ত করেছিলাম। আর এজন্যই আমি অরকাশাকে আমার গুরু করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার মা মাত্র একমাসের জন্য মস্কো থেকে বোনের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন।

৭ ডিসেম্বর দেখলাম যে, নেবা (নদী) সম্পূর্ণ জমে বরফ হয়ে গেছে। লেনিনগ্রাদ নেবা-র দুই তীরে অবস্থিত। হোটেল থেকে ইনস্টিট্যুটে যাবার সময়ে আমাকে প্রতিদিন নেবা পার হয়ে যেতে হত।

এই সময়ে সুপ্রিম সোভিয়েতের নির্বাচনের জম জমাট প্রস্তুতি চলছিল। বাড়ির সামনে সোভিয়েতের প্রথম সারির নেতা ও বহু স্থানীয় প্রার্থীদের বড় বড় ফটো লাগান ছিল। ট্রামে লাল-হলুদ আলো দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছিল। ১২ ডিসেম্বর ছিল ছুটির দিন, আজ পৃথিবীর এক-ষষ্ঠ অংশের লোকেবা তাদের দেশের সবচেয়ে বড় শাসনসভা সুপ্রিম সোভিয়েতের নির্বাচনে ভোট দিচ্ছিল। ভোটকেন্দ্রগুলোতে খুব ভিড় ছিল। কোথাও কোথাও পথের ধারে ধারে নির্বাচন বিষয়ে নেতাদের ফিল্‌ম্ দেখানো হচ্ছিল। রেডিও-র ব্রডকাস্টিং সমস্ত নগরবাসীদের শোনানোর জন্য কয়েক গজ অন্তর শব্দপ্রসারক যন্ত্র (লাউডস্পিকার) লাগানো ছিল। শহরে রাস্তা ধরে ১০ মাইল দূরে চলে যান—আপনার কানে তখনো বক্তৃতা পৌঁছতে থাকবে। ঐদিন যখন হোটেলে ফিরে এলাম তখন কানে এবং কানের পর্দায় ব্যথা হচ্ছিল। এতদিন পর্যন্ত আমি কানঢাকা টুপি ব্যবহার করিনি। পরের দিন থেকে মাথার টুপি ছেড়ে কানঢাকা টুপি ব্যবহার করতে লাগলাম।

১৫ ডিসেম্বর নির্বাচন উপলক্ষে সন্ধেবেলা শহরের জনসাধারণ শোভাযাত্রা বের করল। বেলা তিনটে থেকেই ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোথাও নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সৈনিকেরা পতাকা এবং নেতাদের ছবি নিয়ে যাচ্ছিল, কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিট্যুটের ছাত্রদের শোভাযাত্রা আবার কোথাও সাধারণ নাগরিকরা মিছিল করে যাচ্ছিল। লাল ফৌজের শোভাযাত্রা যেখানেই অল্পক্ষণের জন্য থামছিল, সেখানেই তারা নাচ শুরু করে দিচ্ছিল আর পাশে দাঁড়িয় থাকা কোনো সুন্দরীকে নাচে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালে তৎক্ষণাৎ নাচের জায়গায় ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। পৃথিবীর অন্য দেশে বড় ঘরের

মেয়েরা সৈনিকদের দেখলে ভয় পায় কিন্তু সোভিয়েতের লালফৌজ তো সে-ধরনের সৈনিক নয়। সৈনিকদের জীবন কলেজের ছাত্রদের মতোই, সেখানে তাদের লেখাপড়া শেখান হয়। সেই সঙ্গে সাম্যবাদের আদর্শ সোভিয়েত নাগরিকদের মনে এমনই অনুভূতির সৃষ্টি করেছে যাতে তারা নিজেদের দেশের সমস্ত স্তরের মানুষকে ঘরের লোক বলেই মনে করে।

১৯ ডিসেম্বর আমি লোলার জন্য সপ্তম পাঠ তৈরি করলাম। সে খুব মন দিয়ে পড়ছিল। ২৮ নভেম্বর যখন আমি প্রথম লোলাকে দেখলাম তখন আমার মনেও হয়নি যে, আমরা দুজন কোনো স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি করতে চলেছি। কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি আসছিলাম। একবার লোলা পথে কোথাও বরফের ওপর পড়ে গিয়েছিল। সে এসে আমাকে এ-খবর দিল। আমি একটি শ্লোকের অংশ তাকে পড়ে শোনালাম: 'কালে পয়োধরাণামপতিতয়া নৈব শক্যতে স্থাতুম্।'[১]

লোলা তার বিভাগের দুই সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ শিবায়েফ্ এবং কলিয়ানোফ্-কে এর অর্থ জিজ্ঞেস করল। আমি ব্যাখ্যা করে শ্লোকের মানে বুঝিয়ে দিলাম। লোলা হেসে ফেলল। শেষে ২২ ডিসেম্বর এল, যেদিন আমরা দুজন পরস্পরের হয়ে গেলাম। আমি লোলার বাড়িতে যেতাম, সেটা ছিল ইন্‌স্টিট্যুট থেকে অনেক দূরে—এক ঘণ্টার পথ। সেখানে কারখানার শ্রমিকরা থাকত, চারদিকে তাদেরই নতুন নতুন বাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এখনও আমি হোটেলে থাকতাম, কারণ অকাদেমি এখনও আমার ব্যাপারে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নেয়নি।

২৫ ডিসেম্বর—বড়দিনে লেনিনগ্রাদে কোনো আনন্দোল্লাস ছিল না, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর ছিল শিশুদিবস। ঐ দিন প্রত্যেক বাড়িতে দেবদারুর ডাল পোঁতা হয়েছিল, আর সেগুলো সাজানো হয়েছিল রঙ-বেরঙের আলো, মিষ্টান্ন আর খেলনা দিয়ে। আমি সেদিন দত্তভাইয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। অরকাশা খুব প্রস্তুতি নিয়ে ছিল। আশেপাশেরও কিছু লোক এসেছিল যাদের মধ্যে অরকাশার বয়সের একটি ছোট মেয়ে ছিল। সে কথা বলছিল খুব কম। অরকাশা সেদিন একটি বক্তৃতা শুনিয়েছিল আর সেই সঙ্গে বোধহয় পুশকিনের

[১] মূল শ্লোকটি এইরূপ :

কালে বারিধারা নামপতিতয়া
শৈব শক্যতে স্থাতুম্।
উৎকণ্ঠিতাসি তরলে
নহি নহি সখি পিচ্ছিলঃ পন্থাঃ ।।
(বর্ষাকালে পতিকে ছাড়া থাকতে
পারা যাচ্ছে না। হে চঞ্চলে!
উৎকণ্ঠিতা হয়েছ কি?
না, না সখী। পথ পিচ্ছিল।)

শ্লোকটির শ্লেষার্থ : বর্ষাকালে পিছলে না পড়ে থাকতে পারা যায় না—স-ম·

কোনো একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিল। পরের দিন (১ জানুয়ারি, ১৯৩৮) তো সারা সোভিয়েত দেশের মহোৎসবের দিন ছিল। ঐ দিন আচার্যের ছাত্রী জেনিয়া বিকোভা আমার পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। জেনিয়া সংস্কৃত পড়ত, এবং সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিল। সে ইংরেজি বলতে পারত। আমি লেনিনগ্রাদের বৌদ্ধবিহার দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। বিহার নগরের উপান্তে অবস্থিত। সেখানে পৌঁছতে ট্রামে দু ঘণ্টা লেগেছিল। বিহারটি ছিল তিব্বতী ধাঁচের, দেওয়াল পাথরের, সামনের দিকে সোনালি রঙের দুটি হরিণের মাঝখানে ধর্মচক্র বানানো ছিল। পথের ওপর প্রান্তে সামনেই একটি নদী বয়ে যাচ্ছে, তার ওপারে ছিল লেনিনগ্রাদের সাংস্কৃতিক উদ্যান। বিহার তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের কিছু আগে। আচার্য শ্চের্‌বাৎস্কী ছিলেন বিহার কমিটির প্রধান। মঙ্গোলিয়া থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আনতেন লামা ঙবঙ্ দোর্জে। লামা দোর্জে কয়েক বছর লাসায় ছিলেন। বেশ কিছুদিন তিনি রাশিয়া ও তিব্বতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন—এতে ভীত হয়ে কার্জন তিব্বতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইংরেজ ফৌজ লাসা পর্যন্ত গিয়েছিল। ঐ সময় দুর্জয়েফ-এর নামে ইংলণ্ডের বিদেশ বিভাগ ভয়ে কাঁপত। লাল বিপ্লব এল, তখন অন্য জায়গার মতো তাঁর প্রদেশ-বুর্‌য়তেও বিপ্লব-বিরোধীরা মোঙ্গলদের উত্তেজিত করতে চেয়েছিল, কিন্তু দুর্জয়েফ তাদের বুঝিয়ে দিলেন। আজ বুর্‌য়ত মোঙ্গল প্রজাতন্ত্র সোভিয়েতের মুক্ত পরিবেশে অনেক উন্নতি করেছে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম, কিন্তু সেই সময়ে তিনি বুর্‌য়ত গিয়েছিলেন। বিহার এখন বন্ধ ছিল। খ্রীস্টান গির্জাতে উপাসক-ভক্ত যখন দুর্লভ, তখন এখানকার অবস্থা জিজ্ঞাসা করে আর কি লাভ? বিহার এখন একটা মিউজিয়াম হয়ে গিয়েছিল, তবে শীতের সময়ে সেটা খুলত না। তাই আমরা সেটা ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম না। ওখান থেকে আমরা উদ্যানে গেলাম। কয়েকশ যুবক-যুবতী দুটো লম্বা কাঠের ওপরে পা রেখে হাতে লাঠি নিয়ে পিছলে-পিছলে দৌড়াচ্ছিল।

সেখান থেকে ফিরে আমরা রাশিয়ার সবচেয়ে বড় গির্জা দেখতে গেলাম। এ-গির্জাও বর্তমানে মিউজিয়াম। ভেতরে বড় বড় সুন্দর ছবি এবং যীশু ও সন্তদের মূর্তি রয়েছে। কাঁচের বিশাল দরজার গায়ে একটি সুন্দর ছবি দেখে আমি জেনিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কার ছবি?' সে আরেকজনের থেকে জেনে আমাকে জানাল, 'এটা যীশুর ছবি।' আমি একটু অবাক হলাম—যার পূর্বজরা ছ-সাতশ বছর ধরে খ্রীস্টের অনুগামী হয়ে রয়েছে, সে যীশুর ছবিও চিনতে পারল না!

ঐ দিন সন্ধেয় আচার্য শ্চের্‌বাৎস্কীর (জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬২) বাড়িতে রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল। লোলা আর আমি খেতে গেলাম। মদও রাখা ছিল, কিন্তু আমি তো মদ্যপান করি না—তাই লাল রঙের একটি পানীয় আনা হল। আচার্য বললেন, ' মদ নয়, এতে শুধু ভালো মদের রঙ আছে।' আমি মুখে দিতেই তেতো লাগল, আর সঙ্গেই সঙ্গেই আমি তা রেখে দিলাম। আচার্য বললেন, 'পান করো, এতে নেশা হয় না, আর এটা মদও নয়।' আমি বললাম 'এই অপরাধে কোনো আনন্দ নেই। যদি নেশার লোভ হতো তাহলে হয়ত এর তিক্তুতা আমি সহ্য করতে পারতাম—এই তিক্ত পানীয় গ্রহণ করা আমার কাছে

অর্থহীন মনে হচ্ছে।' সেখান থেকে লোলা আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল।

২ জানুয়ারি আমি শারদ প্রাসাদে বিপ্লব-সংগ্রহশালা দেখতে গেলাম। এখানে ১৯০৫-এর গণবিপ্লব সংক্রান্ত অনেক জিনিস রাখা আছে। ঐ সময়ে বিপ্লবীদের ওপর যে কি অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল তা বনজঙ্গল, কারাগার আর বন্দীদের প্রতিকৃতির মাধ্যমে দেখান হয়েছে। লেনিন এবং অন্যান্য নেতাদের জীবনের ঘটনাবলীর প্রদর্শনী ছিল।

লেনিনগ্রাদে প্রায়ই ফিল্‌ম্‌ দেখতে যেতাম। কখনো নাটক (অপেরা) এবং মূকনাটক (ব্যালে)ও দেখেছি।

ফেরার প্রস্তুতি—আমি আগেই লিখেছি যে, যখন আমি ভারতবর্ষ থেকে যাত্রা করছিলাম, সেই সময়ে বিহার সরকার তিব্বত অভিযানের জন্য ছ-হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল ডঃ **শ্চের্‌বাৎস্কীর** সঙ্গে থেকে বৌদ্ধ ন্যায়ের ওপর গ্রন্থ উদ্ধার করা, আর কয়েকটি গ্রন্থ ইউরোপীয় ভাষাতেও অনুবাদ করা। আমি একথাও বলেছি যে, আমি এমন একটি সময়ে সেখানে পৌছেছিলাম, যখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। সরকারের মনোযোগ ছিল ঐদিকেই। আমার সম্বন্ধে একটু সময় নিয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন কারণ প্রত্যেকটি বিদেশীর ব্যাপারে তাঁদের সতর্ক পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। এমনও সম্ভাবনা ছিল যে, রাজনৈতিক বিভাগের যে-সব ব্যক্তি আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ করার সুপারিশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আর তখন তাঁদের সুপারিশ আমার পক্ষে না গিয়ে বিপক্ষেই যেত। আমি এখন সোভিয়েতের জীবনকে কাছের থেকে দেখেছি—কত সংগ্রাম, কত আত্মদানের পরে তারা এই জীবন পেয়েছে। স্পেনে এই সময়ে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে সংগ্রাম চলছিল। চীনের কম্যুনিস্টরাও অত্যাচারিত হচ্ছিল। নিজের দেশে আমরা ভারতীয়েরাও দাসত্বের মধ্যে ছিলাম। এই সমস্ত কথা ভেবে মনে হতো, আমার বণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। স্পেন বা চীনেও যেতে পারতাম, কিন্তু জানতাম, ওখানে আমি ততটা উপযোগী হতে পারব না। আমার পক্ষে, আমার নিজের দেশই সবচেয়ে ভালো জায়গা। আমি ঠিক করলাম যে, ভারতে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার সক্রিয়ভাবে যোগদান করা উচিত।

প্রতিষ্ঠানে (ইন্‌স্টিট্যুটে) ষষ্ঠ দিনটি বাদ দিয়ে আমি প্রতিদিন চার-পাঁচ ঘণ্টা কাজ করতাম। নাটক, চলচ্চিত্র আর অন্য দর্শনীয় জিনিস দেখতে যেতাম, তারপরও রাজনৈতিক এবং সোভিয়েত-সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পড়ার প্রচুর সময় দিতাম। সোভিয়েত-বিপ্লব সম্বন্ধে একটি বই লিখতে হবে—এই চিন্তা প্রথম থেকেই ছিল এবং এজন্য আমি 'সোভিয়েত ভূমি'[১] বইটির উপকরণ সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম।

[১] দেশ-দর্শন সংক্রান্ত এই গ্রন্থটি লেখা শেষ হয় ১৯৩৮ সালে। দুখণ্ডে প্রকাশিত। প্রকাশক কিতাব মহল।—স·ম·

অকাদেমির কর্তৃপক্ষ বড় মন্থরগতিতে তাঁদের সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি ভাবছিলাম যে, যদি ভারতে ফিরতেই হয় তাহলে তাড়াতাড়ি ফেরা উচিত, যাতে আমি পুরো একবছর প্রস্তুতি নিয়ে তিব্বত যেতে পারি। এই কারণে দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্য আমি চাপ দিচ্ছিলাম। কিন্তু অকাদেমির কর্তৃপক্ষ আবার আমার রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ভালোভাবে অনুসন্ধান না করে আমার থাকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিলেন না। অবশেষে আমি ভারতে ফিরে যাবার কথা বললাম। এতে লোলারই সবচেয়ে বেশি কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক ছিল, আমরা মাত্র দেড় মাস একসঙ্গে ছিলাম। এখন ভারতে ফিরেই আমার তিব্বত যাওয়ার ছিল, তাই লোলাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা কি করে ভাবতে পারতাম?-তবে আমার মন তার কাছে পড়ে ছিল। এটা আমি লেনিনগ্রাদে থাকার সময়ে যত না অনুভব করেছিলাম, সেখান থেকে দূরে চলে যেতে যেতে ক্রমশ তার চেয়ে বেশি অনুভব করছিলাম।

শেষ পর্যন্ত এল বিদায়ের দিন—১৩ জানুয়ারি। লোলার পরে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছিল ডঃ শ্চেরবাৎস্কীর। আমার প্রতি তাঁর খুব স্নেহ জন্মে গিয়েছিল। কয়েক বছর ধরেই আমাদের মধ্যে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল কিন্তু এই দু-মাসের একসঙ্গে থাকা আমাদের পরস্পরকে বড় কাছে করে দিয়েছিল। ১৩ জানুয়ারি লেনিনগ্রাদ ছেড়ে যাবার সময়ে মনেই হচ্ছিল না যে, আচার্যের সঙ্গে আর দেখা হবে না। জয়সওয়ালের মতোই তাঁকে আমি এক অতি সহৃদয় বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম, আর আমার ছাত্রী লোলা এবং পুত্র ইগোর-এর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় স্নেহ আমাকে তাঁর আরো বেশি আত্মীয় করে তুলেছিল।

সব বন্ধুদের কাছেই বিদায় নিয়ে এলাম। নোরা বৌদি পথের জন্য যা প্রয়োজনীয় তা সংগ্রহ করার কাজে সাহায্য করলেন। শেষে রবীন ও লোলার সঙ্গে আমি স্টেশনে পৌঁছলাম। বারোটা বেজে ৪০ মিনিটে আমার ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল। এখনও দেরি ছিল, রবীনকে আমি বিদায় জানালাম। লোলা আর আমি অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সোভিয়েতের যে-সম্বন্ধ, তাতে এমন আশা ছিল না যে, আমরা শিগ্‌গির এবং সহজে মিলিত হতে পারব। কিন্তু প্রেম এই বাধার পরোয়া করে নি। মাঝরাত কেটে গেল, গাড়ির ইঞ্জিনে সন্‌সন্‌ শব্দ হতে লাগল, আমাদের বুকে যেন কাঁটা ি.ৎতে লাগল। বিদায়ের সময় হল। করুণাবিগলিত চোখে লোলা বিদায় নিল। গাড়ি ছেড়ে দিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল।

পরের দিন (১৪ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে এগারোটার সময়ে ট্রেন মস্কো পৌঁছল। স্টেশনে ইন্‌তুরিস্ত-এর কোনো লোকের দেখা পেলাম না। মালবাহককে বলাতে সে নিউ মস্কো হোটেল পর্যন্ত যেতে রাজি হল কিন্তু ঐ হোটেলের ঠিকানা তার জানা ছিল না। আমি বললাম, 'যদি ক্রেমলিন পর্যন্ত পথ তোমার জানা থাকে, তাহলে তার পরের রাস্তা আমি জানি।' ক্রেমলিন কোন মস্কোবাসীরই-বা অজানা হতে পারে? আমরা ভূগর্ভ রেলে অনেক দূর গেলাম, তারপর ক্রেমলিনের সামনে লাল ময়দান থেকে সেতুতে নদী পার হলাম। ৫,৭ মিনিট আমি এদিক-ওদিক চক্কর দিলাম, কিন্তু ওখানে কোনো হোটেলের পাত্তা পেলাম না। কাছাকাছি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করায় পথের খোঁজ পাওয়া গেল, যেটা

আমার এই পথের সমান্তরাল, কিন্তু পিছনের দিকে ছিল। আমি হোটেল পৌঁছে গেলাম। আমার বেশ ভালো মনে ছিল যে দু মাস আগে যখন আমি এদিক দিয়ে গিয়েছিলাম তখন সেতুওলা পথেই কিছু দূরে গিয়ে নিউ মস্কো হোটেল পেয়েছিলাম। হোটেলের পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল যে আগের সেতু ভেঙে গিয়েছে এবং আজ আমি যে-সেতু দিয়ে এসেছি তা নতুন সেতু। আমি দেখলাম যে ঐ সময়েও সেতুর প্রান্তে বেড়ার কাছে নির্মাণের কাজ চলছে। জানুয়ারির শীত, ভেজা সিমেন্ট জমে বরফ হয়ে যাচ্ছিল, তাই ভাপের সাহায্য বায়ুমণ্ডল গরম রেখে জোড়া লাগানোর কাজ করছিল।

ঐ সময়ে সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশন (পার্লামেন্ট) চলছিল। নির্বাচনের পরে এটা ছিল প্রথম অধিবেশন। শুধু সদস্যরাই আসেন নি, ভারতের চেয়ে সাতগুণ বড় এই দেশের দূরতম প্রান্ত থেকে অনেক দর্শকও এসেছিলেন। মস্কোর সমস্ত হোটেল পরিপূর্ণ ছিল। মালপত্র এক জায়গায় রেখে আমি চেয়ারে বসে রইলাম। এখন আমি আফগানিস্তানের পথে যেতে চাইছিলাম। আমার আগে ধারণা ছিল যে, তাসখন্দ কিংবা মধ্য এশিয়ার অন্য কোনো শহরে আফগান কন্‌সল্ থাকবে, কিন্তু জানা গেল যে, সেখানে কোনো কন্‌সল্ নেই। বেলা তিনটের সময়ে কন্‌সলের কাছে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। পরের দিন যখন গেলাম তখন তিনি পরশুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা বললেম কিন্তু আমি একটু চেঁচামেচি করলাম এবং সেদিনই ভিসা পাওয়া গেল।

প্রথম দিনের অবসর সময়টা আমি লাল ময়দান এবং অন্যান্য জায়গা দেখে কাটালাম। রাতে শোওয়ার প্রশ্ন, কিন্তু বাস্তবিকই কোনো ঘর খালি ছিল না। ও বেচারারা করবেই-বা কি? এর চেয়ে অকাদেমির অতিথিশালায় গেলে ভালো হত। কিন্তু আমি এই অসুবিধার কথা কি জানতাম? জানলে তো কোনো বন্ধুর চিঠি নিয়ে আসতাম। যাই হোক, সাড়ে আটটার সময়ে ৭১৭ নম্বরের ছোট্ট একটি ঘর খালি হল, আর সেখানেই রাতে শোবার জায়গা পেলাম।

পরের দিন (১৫ তারিখ) স্তালিনাগ্রাদের ডাকগাড়ি পৌনে এগারোটার সময়ে ছাড়ার কথা ছিল। আমি দিনের বেলাটা এদিক-ওদিক বেড়িয়ে কাটালাম। মস্কোর পথগুলোকে চওড়া করা হচ্ছিল। পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাড়ি 'সোভিয়েত প্রাসাদ'-এর নির্মাণের কাজ চলছিল।

রাত পৌনে এগারোটায় আমার গাড়ি ছেড়েছিল। এই ট্রেন মস্কো থেকে শুধু তেরমিজ-ই নয়, আরও এক দিনের দূরত্বে তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্তালিনগ্রাদ পর্যন্ত যেত। গাড়ি তখন পুরো ভর্তি থাকত। তবে এই দূরপাল্লার গাড়িগুলোর ভর্তি থাকার মানে শুধু এই যে, কোনো সিট খালি থাকত না, টিকিট পাওয়া গেলে লোকে পুরো সিট পেয়ে যেত। আমার ছিল গদিওলা সিটের কামরা।

পরের দিন (১৬ জানুয়ারি) উঁচু-নিচু জমি আসতে লাগল। পাহাড়ের চারদিকে শুধু সাদা বরফ আর বরফ চোখে পড়ছিল। অনেক গ্রাম পাওয়া গেল। বাড়ির ছাতের ওপর বরফ পড়েছিল। যত্রতত্র দেবদারু আর ভূর্জপত্রের গাছ দেখা যাচ্ছিল। গ্রামের বাড়িগুলো ছোট কিন্তু পরিচ্ছন্ন ছিল। বাড়িগুলোর চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল—শীতের জন্য

বাড়িগুলো গরম রাখা হয়েছিল। আমার ট্রেনের সঙ্গে রান্নার কামরাও ছিল। আমি ঐদিন সেখানে খেতে গেলাম। আমার টেবিলেই আমার সামনে দুজন কাজাক কৃষক খেতে বসেছিল। পরিবেশিকা প্লেটে মাংস আর কাঁটা-চামচ রেখে গেল। বেচারি কাজাকরা সবসময় হাত দিয়ে খেতে অভ্যস্ত, চামচ দিয়ে যেই মাংস ওঠাতে যাচ্ছিল, তখনই তা প্লেটের বাইরে পড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। দু-তিনবারের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তারা ভাবছিল, কিভাবে খাওয়া যায়। দুজনেই নিজেদের অঞ্চলের কোনো সংসদ সদস্যের (দেপূতাত্) সাথে প্রথম অধিবেশন দেখতে এসেছিল, সেই সঙ্গে কমরেড স্তালিনের দর্শনলাভও তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এখন তারা মস্কো থেকে বাড়ি ফিরছিল। পরিবেশিকা তাদের অসুবিধেটা বুঝতে পারল। সে তাদের কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়াল। সে নিজের মাতৃভাষা রাশিয়ান ছাড়া আর কোনো ভাষা জানত না, তাই কথা বলে এদের বোঝাতে পারছিল না। ছোট বাচ্চাদের যেমন কলম ধরিয়ে লিখতে শেখানো হয়, তেমন করেই সে কাজাক যাত্রীদের হাত ধরে চামচ দিয়ে মাংস তোলা শেখাতে লাগল। যদিও শিক্ষক এবং ছাত্রদের বয়স প্রায় সমান ছিল, তাহলেও পরিবেশিকার চোখে ছিল মাতৃত্বের দীপ্তি। আমার ঐ সময়ে মনে পড়ল এগারো বছর আগেকার কথা, যখন আমি প্রথম ছুরি-কাঁটা হাতে নিয়েছিলাম। আমি প্রথম সিংহলে যাচ্ছিলাম। মাদ্রাজ মেলে খাবার-কামরায় খেতে গিয়েছিলাম। ছুরি-কাঁটা ধরতে জানতাম না। যখন প্লেটের বাইরে খাবার পড়ে যাচ্ছিল, পরিবেশক অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে আমাকে বলেছিল, 'থাক, হাত দিয়ে খাও।' আমি তখন লজ্জায় মরে গিয়েছিলাম।[১] আর এখানে এখন শুধু এই তরুণীকে নয়, কাছাকাছি বসে থাকা অন্য লোকদের দিকেও তাকাচ্ছিলাম—তারা কেউই চামচ ব্যবহারে অনভিজ্ঞতাকে ঘৃণার বিষয় বলে ভাবছিল না। যেন সোভিয়েত নাগরিকরা অনভিজ্ঞ ভাইদের অভিজ্ঞ করে তোলা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। তাছাড়া পরিবেশিকা ছিল শ্বেতাঙ্গিনী, আর যারা খেতে বসেছিল তারা কৃষ্ণাঙ্গ। মাত্র ২০ বছর আগে বর্ণভেদের সমস্যা রুশদেশেও আজকের ভারতের মতোই ছিল।

খাবার-কামরায় আমাকে দিনে দুবার খেতে যেতে হত। পরিবেশিকার সঙ্গে আমার এতই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল যে সপ্তম দিনে যখন তেরমিজ-এ আমি ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছিলাম, সে চিরপরিচিত বন্ধুর মতো আমাকে বিদায় জানাল। তৃতীয় দিনে তেরমিজ স্টেশনে আমার মালপত্র আনতে গিয়েছিলাম। ট্রেনও সেই সময়ে স্তালিনগ্রাদ থেকে ফিরে এসেছিল। আমাকে স্টেশনে দেখতে পেয়ে পরিবেশিকা ছুটে এসে করমর্দন করল। বস্তুত সোভিয়েত দেশে ২০ কোটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ঠিক তেমন নয়, যেমনটা অন্য দেশের নাগরিকদের মধ্যে দেখা যায়। আমি একথা বলছি না যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে একটি পরিবারের মানুষের মতো সম্পর্ক পুরোপুরি গড়ে উঠেছে, কিন্তু তা অনেকটাই যে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

---

[১] লেখক এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন এই খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে। দ্রষ্টব্য,—*লংকার উদ্দেশে যাত্রা,* ১৯২৭ পৃষ্ঠা ২।—স·ম·

১৭ জানুয়ারি সকালে আমাদের ট্রেন পার্বত্য মালভূমি অতিক্রম করছিল। এখানেও চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ দেখা যাচ্ছিল, তবে তা কম পুরু ছিল। কোথাও কোথাও দেখা গেল গোবরের গোল গোল ঘুঁটে রাখা আছে। গমের ডাঁটি আর শুকনো ঘাস স্তূপ করে গ্রামগুলোতে রাখা ছিল। কোনো কোনো স্তূপের ওপরে খড়ের ছাউনিও ছিল। বেশির ভাগ বাড়িতেই খড়ের চাল ছিল। গ্রামের আশপাশে গাছ ছিল, কিন্তু এখন সেগুলোর পাতা ঝরে গিয়েছিল। জঙ্গল ছিল কম। নদীনালা সব জমে গিয়েছিল। কুয়ো থেকে জল তোলার চাকা ছিল, যেমন আমাদের কুয়োতে থাকে। দুপুরের পরে ওরেন্‌বুর্গ শহর এল। [ট্রেন থেকে][1] নেমে স্টেশনের বাইরে গেলাম। কয়েক লক্ষ জনবসতির এটা একটা বড় শহর। এখানে রুশী ছাড়াও মঙ্গোল মুখাকৃতির অনেক তাতার স্ত্রী-পুরুষও দেখা গেল। তাতার মেয়েদের মধ্যে এখনও অনেকে পাজামা পরেছিল।

১৮ জানুয়ারি সকালে মধ্য এশিয়ার প্রান্তরে এসে পৌছলাম। নটায় (মস্কো-সময়) আমাদের ট্রেন পাহাড় দিয়ে যাচ্ছিল। কাজাকদের বাড়িগুলো ছোট ছোট আর সেগুলোর ছাদ ছিল মাটির, ঠিক যেমন লক্ষ্মৌর গ্রামগুলোতে দেখা যায়। মাটির ছাতের শুরু ওরেন্‌বুর্গ থেকে। সমস্ত মধ্য এশিয়া আর আফগানিস্তান হয়ে তা উত্তর ভারতে লক্ষ্মৌ পর্যন্ত চলে এসেছে। সেখানে মাঠে ছোট ছোট ঘাস গজিয়ে ছিল, দু-কুঁজওলা উট আর ভেড়া চরে বেড়াচ্ছিল। খেত খুব কম পাওয়া যাচ্ছিল। বেলা বারোটায় (মস্কো-সময়) আমরা চেল্‌কর পৌছলাম। এখানে স্টেশন বেশ বড়। কেরোসিন তেলের অনেক ট্যাঙ্ক আছে। রেল-সড়কের দু-দিকে শহর গড়ে উঠেছে। রুশী আর কাজাক শিশুরা একসঙ্গে খেলা করছিল। এখানে রেল লাইনের ধারে তারের পরিবর্তে কাঠের টুকরো দিয়ে বেড়া লাগান ছিল। মাটিতে এখনো পাতলা বরফ পড়ে ছিল। ভূমি প্রায় সমতল মাঠের মতো ছিল, মনে হচ্ছিল এ-বুঝি মরুভূমি। সামনে এক জায়গায় হলুদ মাটির জমি দেখা গেল। এখানে স্টেশনমাস্টার ছিলেন কাজাক, লালসেনাদের অনেকেও কাজাকজাতীয় ছিল। তাসখন্দ থেকে মস্কো যাওয়ার বিমান আকাশে উড়ে যাচ্ছিল।

১৯ জানুয়ারি সকালে আমরা সির (সৈহূঁ) নদীর উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। মধ্য এশিয়ার দুটো বড় নদীর (আমু আর সির) মধ্যে এটি একটি। উপত্যকা পর্বতশূন্য। কজল্‌ওর্দ স্টেশনের কাছে কোথাও কোথাও বরফের রেশ দেখা যাচ্ছিল। এটা বেশ সমৃদ্ধ বসতি। বেশির ভাগ বাড়ি একতলা। গাড়িতে ঘোড়া আর উট দুরকমই জোতা ছিল। সামনে কয়েক মাইল দু-হাত উঁচু শরবনের জঙ্গল চলে গিয়েছিল। স্টেশনে কাজাক তরুণীরা চুল ছেঁটে ইউরোপীয় পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওদের দেখে কি আর বোঝা যেত যে, ওরা সেই দেশের মেয়ে—যেখানে কুড়ি বছর আগে সম্পূর্ণ বোরখাবন্দী অবস্থায় মেয়েরা ঘর থেকে বের হত। এদিকে কয়েকশো মাইল জুড়ে সমতল হলুদ মাটির জমি আছে। শরবন দেখে মনে হচ্ছিলে যে এই ভূমিকে খেতে পরিণত করা যায়—দরকার শুধু

[1] মূলগ্রন্থে তৃতীয় বন্ধনীভুক্ত এই শব্দ নেই। বাক্যের অস্পষ্টতা দূর করার জন্য পরেও কোথাও কোথাও প্রয়োজনীয় শব্দ উক্ত বন্ধনীর ভেতরে ব্যবহৃত হয়েছে।—স.ম.

খালের। আর সেজন্য গঙ্গার মতো দীর্ঘ সির নদী তো আছেই। মধ্য এশিয়ার হাজার-হাজার মাইল বিস্তৃত এই শূন্য ও পরিত্যক্ত প্রান্তর দেখে কখনও কখনও আমার মনে হত যে যদি এখানে ৫, ১০ লক্ষ ভারতীয়কে এনে বসবাস করানো যেত তাহলে কত ভালো হত। কখনও-বা মনে হত আমাদের পঁচিশ লক্ষ মানুষ, যাদের ক্রীতদাসের জীবনযাপন করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশাস, ফিজি, গায়না প্রভৃতি দেশে যেতে হয়েছে, তারা যদি মধ্য এশিয়াতে যেত তাহলে আজ সেখানে একটি ভারত-সোভিয়েত সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র থাকত। আবার মনে হত যে, অলস লোকেরাই [অন্যের] তৈরি খাবার খাওয়ার লোভ করে।

রাতে (মস্কো-সময় দুটোয়) দূর থেকে তাসখন্দের বৈদ্যুতিক আলো দেখা যেতে লাগল। তাসখন্দ খুব বড় শহর এবং তা দ্রুতবেগে আরও বেড়ে চলেছে। সোভিয়েতে সুতি কাপড়ের কলের এটা প্রধান কেন্দ্র। স্টেশন বেশ বড়, কিন্তু দেখতে তেমন ভালো নয় যেমন আমি সোভিয়েতের পশ্চিম প্রান্তে দেখে ছিলাম।

২০ তারিখ সকালে আমরা পাহাড়ি পথ ধরে যাচ্ছিলাম। এই পাহাড়গুলো ছোট ছোট এবং ন্যাড়া ছিল। পুবদিকে দেখা যাচ্ছিল হিমালয়ের পশ্চিম শৃঙ্খলায় পামিরের তুষারাচ্ছন্ন পর্বত। জীক্ একটি কলখোজ সংবলিত গ্রাম। এখানে পঞ্চাশটি ট্র্যাক্টর এবং খোলা লরি দেখতে পেলাম। এখন এগুলো মেরামত হচ্ছে। বাড়ি সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মেয়েদের কারুরই ঘোমটা ছিল না। কোনো কোনো বৃদ্ধার পরণে পাজামা ছিল। উজবেক তরুণদের কব্জিতে ঘড়িও বাঁধা আছে দেখলাম। কয়েকটি শিশু খালি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমাদের এক সহযাত্রী ওদের বলছিলেন, 'অতা (বাবা)-কে বলো গলোস (জুতো) কিনে দিতে।' বোধহয় এখানকার 'অতা'রা 'গলোস'কে এত প্রয়োজনীয় মনে করেন না।

এদিকে বরফ ছিল না। নদীতে জল বয়ে যাচ্ছিল। বাগানে ফলবান গাছ ছিল। পান আর সফেদা গাছ অনেক ছিল। খেতের জমি ছিল অসমতল। দুপুরে আমাদের গাড়ি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। (মস্কো-সময় এগারোটায়) ক্রোপৎকিন্ কল্‌খোজের বড় গ্রামে পৌঁছলাম। আমরা শুনেছিলাম যে বলশেভিকরা কেবল নিজেদের পার্টির বীরদেরই সম্মান করে, কিন্তু এখানে দেখলাম একটি বড় গ্রামে গড়ে উঠেছে প্রসিদ্ধ নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী প্রিন্স ক্রোপৎকিনের নামে। নৈরাজ্যবাদীরা বলশেভিকদের বিরোধী।

এই গ্রামের বাড়িগুলো খুব সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। স্টেশনের কাছে কেরোসিন তেলের গুদাম ছিল। পঞ্চায়েত ঘরের বারান্দায় বেশ কয়েকজন উজ্‌বেক পঞ্চায়েত সদস্য আলোচনা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন রুগী চেহারার লোকও নজরে এল।

একটার সময় সমরখন্দ পৌঁছলাম। শহরে পৌঁছবার অনেক আগেই বাগান আরম্ভ হয়েছে [দেখলাম]। এখানকার আপেল, আঙুর, আঁজির ইত্যাদি ফল কাবুলের চেয়েও ভালো হয়ে থাকে, কিন্তু এখন ফল তো দূরের কথা, গাছে পাতাও ছিল না। এখানকার মাটির দেওয়াল আর ছাতওলা বাড়ি কিছুটা তিব্বতের মতো মনে হল। ইরানেও মাটির ছাত আছে, কিন্তু সেখানে কাঁচা ইঁট জুড়ে সেগুলোকে গম্বুজের ধাঁচে বানানো হয়, কিন্তু এখানে তা সমতল। গাড়ি থেকে নেমে আমি স্টেশনের বাইরে গেলাম। সামনেই

এবড়ো-খেবড়ো পাথরের বেদির ওপর লেনিনের আবক্ষ মূর্তি। শহর বেশ লম্বা-চওড়া। দোতলা বাড়ি কম দেখলাম। পুরনো বাড়িও আছে অনেক। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ৮০ জন লোককে গুনলাম, তাদের মধ্যে মাত্র তিনজনের দাড়ি ছিল, তাদেরও একজনের মুখেই ঠিক-ঠিক ইস্‌লামী দাড়ি ছিল। একটিও পর্দানশীন মেয়ে ওখানে চোখে পড়ল না। যদিও ফলের সময় ছিল না, তবু আঙুর কিছু বিক্রি হচ্ছিল। সেগুলো খুব মিষ্টি ছিল।

২১ জানুয়ারি খুব ভোরে আশেপাশে নগ্ন পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। এখন আমাদের গাড়ি উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্র পার করে তুর্কমানিস্তানে ঢুকে পড়েছিল। পাহাড়গুলোর মাঝে তিব্বতের মতো সমতলভূমিও ছিল। জায়গায়-জায়গায় ঘাস গজিয়ে ছিল আর বেশ কয়েক জায়গায় তুর্কমানদের[১] তাঁবু ছিল। তুর্কমান মেয়েদের মাথায় খাড়া টুকরির মতো পাঁচ সেরের পাগড়ি বাঁধা ছিল। এদের মুখ চ্যাপটা, বড় আর কুশ্রী, পুরুষরা খুব দীর্ঘকায়। দূরে ছিল বক্ষু (আমু) নদীর বিস্তৃত উপত্যকা। একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেন পার হল। সুড়ঙ্গের মুখে ফৌজি চৌকি ছিল। সামনে ডানদিকে বক্ষু নদী বয়ে যাচ্ছিল। এদিককার গ্রামগুলোতে এখনও দাড়ি, পুরনো পোশাক, পুরনো প্রথা যথেষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সাড়ে নটায় (মস্কো-সময়) ট্রেন তেরমিজ স্টেশনে পৌঁছল।

তেরমিজে (২১-২৫ জানুয়ারি)

শহর থেকে ৫ মাইল দূরে স্টেশন। ট্রেন অবশ্য যাবে আরো দূরে—স্তালিনগ্রাদ (দুশাম্বে) পর্যন্ত। সাতদিনের পরিচিত বন্ধু ও পরিবেশিকাদের 'পুনর্দর্শনায়' বলে বিদায় জানালাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে আমার দুটো বাক্স এই ট্রেনে আসেনি। সঙ্গে সামান্য মালপত্র ছিল—এগুলো স্টেশনে মাল-জমা দেবার ঘরে রেখে এলাম। স্টেশনে উজবেকজাতীয় লোক ছাড়াও কয়েকজন তাজিকও ছিল। তাজিকদের মুখ মোঙ্গল ধাঁচের নয়, তাই চেনা সহজ ছিল। আমি মহম্মদোফের (তাজিক) সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি বললেন, 'চলুন, আমাদের কল্‌খোজ-এর ধরনের চা-দোকানে চা খেয়ে নিন।' গ্রামবাসীদের প্রায়ই শহরে আসতে হয়, তাই সুবিধের জন্য গ্রামের তরফ থেকে শহরেও নিজেদের চায়ের দোকান (রেস্তোরাঁ) খোলা তাদের পক্ষে মোটেই অসুবিধের ছিল না। কারণ গ্রামগুলোতে জমির মতোই চায়ের দোকানও যৌথ মালিকানাভুক্ত এবং সকলের অধীন। যখন গ্রামবাসীরা সিনেমা দেখতে বা অন্য কোনো কাজে শহরে আসে, তখন তারা নিজেদের চায়ের দোকানেই থাকে। তাদের মনে হতো যেন একই বাড়ির আপন ভাইয়ের কাছে আর এক ভাই শহরে গেছে। চা-দোকান খুবই সাদা-মাটা ছিল। মাটির দেওয়াল আর মাটির ছাত। চেয়ার-টেবিল ছিল না। দেওয়ালের ধারে ধারে উঁচু পাটাতন বানানো ছিল, তার ওপর ছিল মাদুর বিছানো। লোকেরা ওখানেই বসে চা খেতে খেতে গল্প করছিল। মধ্য এশিয়াতে

---

[১] তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, পারস্য এবং রাশিয়ার যে কোনো তুর্কি উপজাতিভুক্ত মানুষ।—স.ম.

আমাদের দেশের মতো দুধ-চিনি দেওয়া চা পান করার চল নেই, আবার রুশদেশের মতো লেবু-চিনি মেশানো চা-ও পান করে না কেউ। এ-ধরনের চা জাপানেও খাওয়া হয়, তবে সেখানে পেয়ালা ছোট ছোট হয়। এখানে প্রতিটি লোককে পুরো 'চাইনেক' (চায়ের পাত্র) আর পেয়ালা না দিয়ে, চীনামাটির বাটি দেওয়া হয়। এই হাল্‌কা আর তেতো জল লোকেরা ঘটি ঘটি কিভাবে খায়? সেখানে তন্দুরী রুটিও ছিল, আমি তাই খেলাম। মহম্মদ শহরে যাওয়ার রাস্তায় আমাকে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'আপনি যদি কোনোদিন আসেন তাহলে আমাদের গ্রামে নিয়ে যাব।'

আমি হেঁটেই শহরে পৌঁছলাম। প্রথমে পাসপোর্ট নিরীক্ষণের কার্যালয়ে গেলাম। সেখানে এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন এক আধা-রুশী (ইউরেশিয়ান) মহিলা। একসময়ে হয়তো ইনি আমাদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মতোই ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নিজেকে তেমনটা ভাবতেন না। মধ্য এশিয়াতে অনেক রুশী পাদ্রী নিজেদের ধর্ম প্রচার করত, আর সেখানে লক্ষ লক্ষ খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ছিল, যাঁরা বিপ্লবের পরে মরার আগে সোভিয়েতের সমর্থক হয়েছিল। মহিলা খুবই ভদ্রভাবে কথা বললেন। আমার পাসপোর্ট রেখে দিলেন। থাকবার জন্য কাছেই একটি 'গস্তিনিত্‌সা' (অতিথিশালা)-র সন্ধান দিলেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, এখানে একটি আফগান সরাইখানা আছে। আমি ভেবে দেখলাম, আফগান সরাইখানাতে থাকাই ভালো। ওখানে আফগানদের সঙ্গে দেখা হবে। আফগানিস্তান হয়ে যেতে হবে, তারা নিজেদের দেশ সম্বন্ধে কিছু জানাবে। আমি আফগান-সরাইয়ে চলে গেলাম। এটা আগে শাক-সব্‌জির হাট বসার জায়গা ছিল, এখানে-ওখানে কয়েকটি ঘর বানানো হয়েছিল। একটি শ্রীহীন বাড়ি ছিল, সেটাকেই আফগান সরাই বলা হতো। কখনো এটি কোনো আফগানের সম্পত্তি ছিল। চৌকিদার ছিল উজ্‌বেক, সে উজবেকী তুর্কী আর তাজিকী (ফার্সি) বলতে পারত। সে একটি বড় কামরায় খাটিয়া দিয়ে দিল। আমি আবার শহরের দিকে বের হলাম। অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা ছিল, আর কাদাও ছিল সেঁখানে। বাড়িগুলো ছিল ছোট ছোট—তাদের মধ্যে অনেকগুলো পাকা। স্টেশনের কাছ থেকে রেলপথ বক্ষু নদীর তট পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু এই পথে কেবল মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। শহরে রুশীদের সংখ্যাই ছিল বেশি, তাদের পরেই উজবেক আর তুর্কমান ও তাজিকেরা। একটি বাড়ির ওপরে ১৮৯৯ লেখা ছিল, অর্থাৎ এটি আজ থেকে ৩৯ বছর আগে বানানো হয়েছিল। স্টেশনের দিকে বেশ কয়েকটি আপেলের বাগান ছিল। শীতকালের লাহোরের মতোই এখানের আবহাওয়া। কোথাও বরফ ছিল না, আব জলও জমে যেত না।

পরের দিন (২২ জানুয়ারি) দুপুরের পরে বেড়াতে বের হলাম। অনেক নতুন বাড়ি তৈরি হতে দেখলাম। একটি স্কুল পেলাম। দোতলা পাকা বাড়ি। দেখার জন্য ভেতরে গেলাম। মেঝে কাঠের পাটাতনের, কিন্তু পালিশ ছিল না। দরজার কড়া নাড়াতে এক রুশী বৃদ্ধা এলেন। [স্কুল] দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি ঘরগুলো খুলে খুলে দেখাতে লাগলেন। আজ লেনিনের মৃত্যুদিবস, স্কুল বন্ধ ছিল। বাড়ির ওপরে অন্যান্য জায়গার মতোই কালো বর্ডার দেওয়া লাল পতাকা ছিল। বৃদ্ধা আমাকে এক উজবেক ভূগোল-শিক্ষকের কাছে নিয়ে গেলেন। শিক্ষক মশাই ছাত্র-ছাত্রীদের ফটো তোলা

শেখাচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে তিনি আলাপ জুড়ে দিলেন। ঠিক সেই সময়ে ওখানে পায়োনির্‌কা বা মেয়ে-স্কাউটদের দুটো ডেপুটেশন এল। তারা 'ইন্দুস্‌' (ভারতীয়) এসেছেন জেনে বলল, 'আমরা কয়েকজন পায়োনিয়র কিশোর-কিশোরী এখানে একটি শোভাযাত্রার প্রস্তুতি করছি। আপনার সম্বন্ধে শুনলাম, আপনি এসে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি ভাষণ দিন।' আমি বললাম, 'ভাষণ দেবার মতো রুশ ভাষা তো আমি জানি না।' তারা বলল, 'আপনি তাজিকীতে বলুন, আমাদের এক তাজিক সহ্‌পাঠী তা রুশ ভাষায় অনুবাদ করে দেবে।' তারা আমাকে একটি বড় ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে বেঞ্চির ওপর অনেক পায়োনিয়ার কিশোর-কিশোরী এবং শিক্ষিকারাও বসে ছিলেন। একটি টেবিলের পাশে দুটি চেয়ার রাখা হল। পিছনের দেওয়ালে এশিয়ার মানচিত্র টাঙানো ছিল। পাশের চেয়ারে বছর দশেক বয়সের একটি তাজিক বালক বসেছিল, সে দোভাষীর কাজ করছিল। প্রথমে তারা আমার যাত্রাপথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করল। আমি মান্‌চিত্রে তা দেখিয়ে দিলাম। তারপর ভারতবর্ষের পায়োনীয়ারদের সম্বন্ধে জানতে চাইল। আমি বললাম 'ভারতবর্ষে খুব কম ছেলেই স্কুলে যেতে পারে, আর তাদের মধ্যেও খুবই অল্প সংখ্যক পায়োনিয়ার (স্কাউট) হতে পারে। তারা জিজ্ঞেস করল, 'ছেলে-মেয়েরা কি করে?' আমি বললাম, 'কাজ করে।' একটি ন-বছর বয়সের রুশী বালক নিজের বুকের ওপর হাত রেখে প্রশ্ন করল, 'আমার মতো ছেলে কি করে?' আমি উত্তর দিলাম, 'তোমার মতো ছেলেবা গরু চরায়, অন্যের বাচ্চাদের দেখাশোনা করে, কিংবা অন্য কোনো কাজ করে অন্নের সংস্থান করে।' তাদের মুখগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যে, তারা আমার কথা বিশ্বাস করছে না। আমি প্রশ্ন করলাম, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি ক্যাপিট্যালিস্ট (পুঁজিপতি) দেখেছ?' সবাই বলল 'না।' কেবল একটি ছেলে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি দেখেছি।' সব ছেলেমেয়েরা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় দেখেছ?' সে জবাব দিল, 'সিনেমায়।' আমি বললাম, 'আমাদের দেশে ক্যাপিট্যালিস্টদেবই শাসন চলছে, এজন্য অধিকাংশ শিশুরা না পারে স্কুলে যেতে, না হতে পারে পায়োনিয়ার।' এই ছেলেমেয়েরা ক্যাপিট্যালিস্ট দেখে নি বটে, তবে ক্যাপিট্যালিস্টদের অনেক কাহিনী শুনেছে। ক্যাপিট্যালিস্টদের বিষয়ে তাদের ধারণা আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদেব পিশাচ বা দানবদের সম্বন্ধে ধারণার মতো। আমার কথায় তাদের বিশ্বাস হল। নিজেদের দেশে সাদা (পুঁজিবাদী) আর লাল (সাম্যবাদী) ফৌজের মধ্যে সংঘর্ষের কথা তো তারা শুনেই ছিল। স্পেনে সেই সময়ে জনতার ওপর সাদাদের অত্যাচারের খবরও তাদের জানা ছিল। তারা প্রশ্ন করল, 'সাদা আর লালের মধ্যে লড়াইয়ে আপনি কাদের পক্ষে?' আমি বললাম, 'লাল ফৌজের পক্ষে।' তারা আমার কাছে ভারতীয় মুদ্রা দেখতে চাইল। আমার কাছে ইংরেজি মুদ্রা ছিল, আমি সেগুলো ওদের হাতে দিলাম। এক এক করে সবাই তা দেখল। তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি স্কুল থেকে বের হলাম।

শহরের বাইরে গেলাম। রাস্তা থেকে একটু দূরে একটি গ্রাম দেখতে পেলাম। সেখানে গেলাম। এটি একটি কল্‌খোজ গ্রাম। নাম 'কল্‌খোজ-বৈনুল্‌মলল্‌' (অন্তর্দেশীয় পঞ্চায়তী গ্রাম)। কল্‌খোজের অফিসে গেলাম। সেখানে রেডিও আর বৈদ্যুতিক আলো ছিল।

কোনো তাজিক না থাকায় আমি তাদের আমার কথা বোঝাতে পারলাম না। ট্র্যাক্টর আর চাষের অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেখলাম, গ্রামের স্কুল দেখলাম। এই গ্রামে কোনো উজ্‌বেক পরিবার ছিল।

সমস্ত মধ্য এশিয়া জুড়ে কার্পাসের চাষ হয়। গম এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য আসে কাছাকাছি প্রজাতন্ত্রগুলো থেকে। খেতে লাঙল দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, লোকেরা কার্পাস তুলো বোনার ব্যবস্থা করছিল। প্রচুর সংখ্যায় স্ত্রী-পুরুষ খাল পরিষ্কার করার কাজ করছিল। এখানে জ্বালানি হিসেবে কার্পাসের ডাঁটি ব্যবহার করা হয়। বাড়িগুলো সবই কাঁচা ছিল, তবে জানালায় কাঁচ লাগানো ছিল। না কারুর পরণে ছেঁড়া জামা ছিল, না ছিল কারুর শুকনো মুখ। ব্রিগাদীর (শ্রমিকদের সর্দার)-এর কার্যালয়ে গেলাম। উঠোনে বেশ কয়েকজন [কাজের] পরিকল্পনা করছিলেন। দোরগোড়ায় কুকুর বাঁধা ছিল। ব্রিগাদীর বাইরে এসে এমনই জোরে আমার করমর্দন করলেন যে হাতে ব্যথা হয়ে গেল। আমরা দুজনে কেউ কারুর ভাষা জানতাম না, তাই আলাপ করতে পারিনি।

২৩ জানুয়ারি আমি স্টেশনে গেলাম। মহম্মদোফের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের গ্রাম কলখোজ্-নমুমার উদ্দেশে রওনা হল। আমরা পাকদণ্ডীর পথে গেলাম। এটা ২০০ পরিবারের গ্রাম, এদের মধ্যে কয়েক ঘর তাজিকও আছে। এই গ্রাম গড়ে উঠেছিল ১০ বছর আগে, যে-সময়ে বক্ষু নদীর খাল এদিকে কাটা হয়েছিল। এদের কাছে দু-হাজার একর খেত আছে। একটি ট্র্যাক্টর এবং দুটো খোলা লরিও গ্রামের সম্পত্তি। প্রয়োজন হলে মেশিন-ট্র্যাক্টর-স্টেশন থেকে আরো ট্র্যাক্টর আসে। ঐ সময়ে খেতে একটি ট্র্যাক্টর চলছিল, এক রুশী ছিল তার চালক। মহম্মদ আমার পরিচয় দিতেই ড্রাইভার এসে আমার করমর্দন করল। স্কুলে গেলাম। সেখানে ৩৫টি বালিকা এবং ৫৩ জন বালক পড়ছিল। শিক্ষক ছিলেন দুজন। শিক্ষার মাধ্যম ছিল উজ্‌বেকী ভাষা। লিপি করা হয়েছিল রোমান। আমাদের দেশের মতো এখানে দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত ক্লাস হয় না। পড়ার সময় হল সকাল আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত, আবার বিকেল দুটো থেকে ছ-টা পর্যন্ত। তবে সব ছেলেমেয়েদেরই আট ঘণ্টা পড়তে হয় না। প্রধান শিক্ষক আমাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর বাড়ি ছিল স্কুলের পিছনের দিকে। বাড়িটি কাঁচা কিন্তু পরিচ্ছন্ন। ভেতরে একটি টেবিল এবং দু-তিনটি চেয়ার ছিল। দেওয়ালে ঝুলছিল নেতাদের ছবি। আমরা চেয়ারে বসলাম। শিক্ষক মশাই প্লেটে 'কুল্‌চা' এনে রাখলেন। কিছুক্ষণ পরে লালচে মুখ আর হলদে চুলের এক স্বাস্থ্যবতী তরুণী চায়ের পাত্র নিয়ে এলেন। 'ইনি আমার স্ত্রী' বলে শিক্ষক মশাই পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্ত্রী ছিলেন রুশ-জাতীয়া, তাই কথা বলা সহজতর ছিল। সোভিয়েতে এশীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে এ-ধরনের বিয়ে অনেক হচ্ছে, এতই বেশি হচ্ছে যে, এই শতাব্দীর শেষে হয়তো সমস্ত জাতি মিশ্র হয়ে যাবে।

চা খেয়ে আবার বের হলাম। গ্রামের চা-দোকান মকতব (স্কুল)-এর লাগোয়া। এখানেও বসার জন্য দেওয়ালের গায়ে পাটাতন ছিল। তার ওপর কয়েকটি একতারা রাখা ছিল। রাতের নাচ-গানের প্রস্তুতি চলছিল।

এরপর আমরা গেলাম ক্লুব (ক্লাব)-এ। ক্লাব গ্রামজীবনের একটা বড় কেন্দ্র। এই

ক্লাবের হলঘরে পাঁচশ লোক বসতে পারে। এ-ছাড়া আরও পাঁচটি ঘর ছিল, যেগুলো গ্রন্থাগার ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। গ্রামে প্রতি সপ্তাহে চলচ্চিত্র আসে। তা দেখানোর সময়ে বড় হলটি সিনেমা-হলে রূপান্তরিত হয়। এখানেই সভা হয়, লেকচার আর নাটক হয়। এখনও ক্লাব-ঘরের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় নি। দেওয়ালগুলোতে পাকা ইটের গাঁথুনি থাকলেও হলের ছাত পেটানো এখনও বাকি। ছুতোর দরজা তৈরি করছিল। আস্তাবলে গেলাম। এখানে ৬০টি ঘোড়া ছিল, এই সময়ে চরতে গিয়েছিল। আস্তাবল কিন্তু বেশ পরিষ্কার ছিল। প্রতিটি ঘোড়ার সাজ তার পিছনের দেওয়ালে পরিপাটিভাবে টাঙানো ছিল। গোয়ালঘরে ১০০টি গরু ছিল। এগুলো ছাড়াও লোকেদের নিজস্ব কিছু গরু-ভেড়া-মুর্গি ছিল। প্রত্যেক পরিবারের বাড়ির পিছনের দিকে অল্প-অল্প জমি ছিল তরী-তরকারির চাষের জন্য, বাকি সমস্ত জমির মালিকানা ছিল যৌথ। নারী-পুরুষদের দল নিয়ে ব্রিগেড গড়া হয়েছিল। প্রত্যেক লোকের কাজ হাজিরা-খাতায় লেখা থাকত। এখন তো চাষবাসের কাজ ছিল না। খেতে কাজ করার সময়ে শিশুশালা গড়ে ওঠে, যেখানে কয়েকটি মেয়ে শিশুদের দেখাশোনার কাজ করে। এই গ্রামে শুধু মিশরীয় কার্পাসের চাষ হয়। গত মাসে ৮ লাখ রুবলের (প্রায় চার লাখ টাকা) কার্পাস বিক্রি হয়েছিল, আর প্রতিটি পরিবারের আয় হয়েছিল তিন থেকে পাঁচ হাজার রুবল। এই গ্রামে খরবুজা, তরমুজ আর কাঁচা তরকারির জন্যও আলাদা খেত আছে।

যখন আমরা গ্রন্থাগার (সেখানে অনেক খবরের কাগজ ছিল) ইত্যাদি দেখে স্কুলের কাছে পৌঁছলাম, সেখানে পাঁচজন উৎফুল্ল সাইকেল-আরোহী এসে পড়ল। তাদের মধ্যে চারজন শিক্ষক আর একজন ডাক্তার—চারজন উজ্‌বেক আর একজন রুশী। বর্ণভেদ-জাতিভেদের চিন্তার লেশও ছিল না এদের ভেতরে। মহম্মদের সঙ্গে যখন আমি ফিরে আসছিলাম তখন পুবদিকে একটি নীল গম্বুজওলা উঁচু বাড়ি দেখতে পেলাম। আমি বলাতে মহম্মদ আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। দেখলাম গম্বুজের নীল ইটগুলো কোথাও কোথাও খসে পড়ছে। কাঠের ভারা লাগিয়ে ঐ সময়ে মেরামতের কাজ চলছিল। মহম্মদ জানাল যে, এই কাজ গ্রামের পক্ষ থেকে নয়, পুরাতত্ত্ববিভাগের পক্ষ থেক করা হচ্ছে। আমি ভেতরে গিয়ে দেখলাম। উঠোনে হাজার হাজার কবর ছিল। গম্বুজের ভেতরে কয়েকটি পাকা এবং সুন্দর কবর ছিল। মহম্মদ বলল যে এটি সুলতানুস্‌সাদাত্‌-এর তীর্থক্ষেত্র। বিপ্লবের আগে এটা সমস্ত মধ্য এশিয়ার লোকের তীর্থ ছিল। অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো কুঁড়েঘরগুলো দেখিয়ে সে বলল, 'আগে এখানে অনেক মুজাওয়র (পাণ্ডা) বাস করত, সুখে-দুঃখে লোকেরা সুল্‌তানুস্‌সাদাত্‌-এর কাছে মানত করত আর পাণ্ডাদের খুব রোজগার হতো। সে-সময়ে যদি আপনি আসতেন তাহলে গম্বুজের ভেতরের কক্ষে অনেক জরি আর রেশমের চাদর দেখতে পেতেন। এ জায়গাটা সুগন্ধী ধূপের ধোঁয়ায় ভরে থাকত আর দর্শনের জন্য ভিড় লেগেই থাকত। আর আজ দেখছেন তো, শুধু আমরা দুজনেই দর্শক!' অনেক বছর ধরে কবর জীর্ণদশাগ্রস্ত, কোথাও-কোথাও পাথর আর চুন খসে পড়ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম,'ঐ মোল্লা মুজাওয়র গেল কোথায়?'

মহম্মদ জানাল, 'আমরা ওদের বিদায় দিয়েছি।' 'কোথায়?' আমি জানতে চাইলাম।

উত্তরে মহম্মদ বলল, 'নরকে, আবার কোথায়? যখন আমরা আমির (নবাব) আর সর্দারদের (জায়গীরদার) সঙ্গে সংগ্রাম করছি, তখন এই মোল্লারা ফতোয়া দিত 'তোমারা আল্লার সঙ্গে লড়ছে।' আমরা তাও মেনে নিলাম আর ভাবলাম, আল্লা যদি আমিরের সঙ্গেই থাকেন, তাহলে তো দুজনকে এক সঙ্গেই শেষ করে দেওয়া যায়। আমাদের লড়াইয়ে আমরা সফল হলাম আর এখন আমির, আল্লা, মোল্লাকে আপনি আমু নদীর ওপারে পাবেন।' আমি প্রশ্ন করলাম, 'রফিক মহম্মদোফ! তুমি কি ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব কর না?' সহজ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মহম্মদ উত্তর দিল, 'আমি কাজ করতে পারি পড়তে পারি, সবার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল জানি। খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান জানি, আমার আর কি দরকার?'

আমরা ওখান থেকে স্টেশনে 'ফিরে যাচ্ছিলাম। সে-সময়ে কয়েকজন মহিলা আসছিলেন। তাদের মধ্যে কারুর-কারুর পরণে কুর্তা-পাজামা ছিল, আর ঘোমটাও ছিল। আমি মহম্মদকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের কি কেউ নমাজ পড়ে?' মহম্মদ উত্তরে বলল, 'চার বছর আগে কয়েকজন রোজা পালন করত, কিন্তু এখন কেউ রোজা মানে না। দু-চারজন নামাজ পড়ে, কিন্তু তারা বাড়ির ভেতরেই পড়ে।' আমি প্রশ্ন করলাম, 'বাড়ির বাইরে মসজিদে কেন পড়ে না?' জবাব পেলাম, 'ওঠা-বসা করতে দেখে তরুণ-তরুণীরা ঠাট্টা করে।'

২৪ জানুয়ারি আমি আবার শহরে বেড়াতে বের হলাম। কারখানার দিকে গেলাম, ওখানে শিশুগৃহ দেখলাম। পরিচ্ছন্ন পাকা বাড়ি। ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করবার জন্য ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা ছিল। শোবার ঘাট রাখা ছিল। ধাই, খেলনা সব জিনিসই ছিল। একটি ক্লুব্-এ গেলাম। সেখানে বেশ কয়েকটি ঘর ছিল, আর ছিল দুশোটি চেয়ারের একটি হলঘর। আজ 'পুগাচেফ ফিল্ম্' দেখানোর কথা। দুই তরুণ এবং এক তরুণী বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন লিখছিল।

হাট দেখতে গেলাম। এখানে মুলো, বীট, গাজর, কপি, আলু ইত্যাদি তরী-তরকারি বিক্রি হচ্ছিল। এই সব সবজী খোলা জায়গায় বিক্রি হচ্ছিল। স্থানীয় কল্‌খোজগুলোর কৃষকরাই বিক্রেতা। কয়েকটি দোকানও ছিল, এগুলোতে বড় বড় পাঁউরুটি ছুরিতে কেটে কেটে বিক্রি হচ্ছিল। রুটি খুব সস্তা ছিল। একটি ক্ষৌরালয়ও ছিল। আমি চুল কাটালাম, তিন রুবল (প্রায় দেড় টাকা) দিতে হল। আফগান সরাইয়ের কয়েকজন আফগান বণিক আমার কামরাতেই উঠেছিল। তারা সঙ্গে করে মাংস এনেছিল। দু-একদিনে মাংস ফুরিয়ে গেল, তখন তারা চৌকিদারকে বলল, 'আমাদের জন্য ভেড়ার ভালো মাংস নিয়ে এস।' চৌকিদার বলল, 'হ্যাঁ সাহেব, আমি **কল্‌খোজ** থেকে মাংস নিয়ে আসব।' আমি পরে চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভালো মাংসের মানে বুঝলে?' উত্তরে সে বলল, 'হ্যাঁ, তার মানে হল জবাই করা মাংস। পশুদের ঘষে ঘষে কেটে হত্যা করে যে-মাংস বানানো হয় তাকেই ভালো মনে করে। এখানে পশুকে ঘষে-ঘষে কাটতে কে রাজি হবে? মাংস তো সেই একই, আমি 'কল্‌খোজ' বলে দিলাম, এরা মনে করছে যে গ্রামে ভেড়া জবাই করা হয়।'

—১৯৩৮—

একদিন আমি বেড়িয়ে সরাইখানার দিক দিয়ে ফিরছিলাম। দেখলাম যে রাস্তায় অনেক স্ত্রী-পুরুষ হাসিমুখে সরাইয়ের গেটের ভেতরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কাছে এসে দেখলাম যে দুই তরুণ, একজন রুশী ও অপরজন উবেক, একে অন্যের কাঁধে হাত দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে গান গাইতে গাইতে আসছে। এরা একটু বেশি মদ্যপান করে ফেলেছিল, তাই একজনের কথা যদি পুবদিকে যাচ্ছিল তো আরেকজনের যাচ্ছিল পশ্চিমে। সবাই এতে মজা পাচ্ছিল। ওদের দেখে আমার মনে অন্য এক ভাবনা এল—'এদের মধ্যে একজন কালো আর একজন ফর্সা। কিন্তু এখন কালো-সাদায় এখানে আর কোনো তফাৎ নেই।'

বক্ষু নদীর ধারে আফগানিস্তান থেকে আসা অনেক তুলোর বস্তা পড়েছিল, সেখানেও আমি দেখলাম—বহু কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ মহিলারা ফাটা বস্তা সেলাই করছিল। যে নৌকোতে আমি আমু নদী পার হলাম তাতে ১২ জন খালাসির মধ্যে ১০ জনই রুশী। সকলে একসঙ্গে মাল বহন করছিল, আর যখন নৌকা চলতে লাগল তখন তারা একসঙ্গে বসেই রুটি আর চা খাচ্ছিল। সোভিয়েত দেশে এমন দৃশ্য খুবই সাধারণ।

পাসপোর্টের প্রস্তুতিতে দেরি দেখে আমি গস্তনিৎসায় (পান্থশালায়) চলে গেলাম। এখানে আলাদা ঘর পেলাম না, এক রুশী ইঞ্জিনিয়রের কামরায় আমি জায়গা পেলাম। ২৬ তারিখে যাত্রার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমার কাছে রুশী মুদ্রা সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুরুশ্‌কী (ঘোড়ার গাড়ি)-এর জন্য নদীতীর পর্যন্ত ২০ রুবল দিতে হবে। টাকার জন্য ব্যাঙ্ক খোলা ইত্যাদি ব্যাপারে অপেক্ষা করতে হতো। আমি ইঞ্জিনিয়ারকে আমার ঘড়ি দিয়ে দিলাম। তাঁর কথা শুনে মনে হয়েছিল যে তাঁর একটি ঘড়ি দরকার। তিনি দাম দিতে গেলেন, আমি তাঁর কাছে ঐ টাকা থেকে মাত্র ২০ রুবল নিলাম। তিনি অবাক হচ্ছিলেন। আমি বললাম, 'আমু নদীর ওপারে তো আমি একটিও রুব্‌ল নিয়ে যেতে পারব না, তাই বেশি নিয়ে কি হবে?'

২৬ জানুয়ারি দশটার সময় মালপত্র নিয়ে আমি একটি ঘোড়ার গাড়িতে ঘাটের দিকে রওনা হলাম। পথে কিছু ফাঁকা প্রান্তর পেলাম, তারপর গ্রাম আর খেত দেখা গেল। একটু এগিয়ে যেতে পুলিশ আমার পথ আটকাল। পাসপোর্ট দেখানোর পরে সে আমাকে কন্ট্রোলারের কাছে নিয়ে গেল। কাগজপত্র দেখিয়ে আমি আবার নদীতীরে পৌঁছলাম। চিনি, লোহা, কাপড়, চীনামাটির বাসন ইত্যাদি জিনিস সোভিয়েত থেকে আফগানিস্তানে যায়, যার পরিবর্তে আফগানিস্তান উল, চামড়া, কাপড় আর শুকনো ফল পাঠায়। ঘাটে আমার বাক্সগুলো খুলে প্রতিটি জিনিস মন দিয়ে পরীক্ষা করা হল। কাগজপত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ হল। কন্ট্রোলারকে ডাকা হল। তিনি খবরের কাগজের কার্টিং আর খোলা বাজারে বিক্রয়যোগ্য ফটোগুলো দিতে চাইছিলেন না। আমি বোঝালাম যে, ভারতে ফিরে আমাকে সাভিয়েত দেশ সম্বন্ধে একটি বই লিখতে হবে। যাই হোক, অবশেষে তিনি সব জিনিস ফেরৎ দিলেন। দুটোর পরে মোটরবোট ছাড়ল। সেখানে যাত্রী আমি একাই ছিলাম, আর ছিল মাল, মাল নামাবার লোক এবং খালাসী নাবিক। বক্ষু—যাকে অক্‌শাস আর আমু নদীও বলা হয়—গঙ্গার চেয়ে কম চওড়া ও গভীর নয়। এটা সোভিয়েত আর

—১৯৩৮—

আফগানিস্তানের সীমা। মোটরবোটে নদী পার করতে এক ঘণ্টা লাগল। ওপারে পৌঁছবার পর আফগান অফিসার প্রথমে আমাকে নৌকাতেই বসিয়ে রাখলেন।

আফগানিস্তানে, ১৯৩৮

২৬ জানুয়ারি—৮ ফেব্রুয়ারি

মালপত্র নিচে নামানো হল। অফিসার ওপর-ওপর দেখলেন। আফগান (পাঠান) বেশির ভাগই অতিথিবৎসল হয়। তিনি চা খাওয়ালেন আর সেখানে থেকে যেতে বললেন। এরা নদীর ধারে কর্দমাক্ত ভূমিতে তাঁবু খাটিয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁদের কষ্ট দিতে চাইলাম না। বরং বললাম যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি মজারশরীফ পৌঁছে যেতে চাই। তিনি বললেন 'আমি মজার থেকে টাঙ্গা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য টেলিফোন করে দিচ্ছি, আর এখান থেকে [আপনার] সঙ্গে সেপাই পাঠিয়ে দেব—অস্‌করখানাতে আপনি টাঙ্গা পেয়ে যাবেন।' ২৫ আফগানীর (সাড়ে বারো টাকা) বিনিময়ে আমি দুটো ঘোড়া ভাড়া করলাম। একটি ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপালাম, অন্য ঘোড়ায় চড়ে আমি সেপাইয়ের সঙ্গে চললাম। সে-সময় সূর্যাস্ত হচ্ছিল। বক্ষু নদীতীরের জলাভূমি মুঁজ[১] ঘাসের জঙ্গলে ভরা ছিল। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়েই রাস্তা ছিল। চাইলে নদীতীর পর্যন্ত মোটরগাড়ি পাওয়া যেত, কিন্তু তা ব্যয়সাপেক্ষ হতো। দু মাইল চলার পরে একটি সেনাদলের ঘাঁটিতে পৌঁছলাম। সঙ্গে আসা সেপাই ওখানে চিঠি দিল। এখানেও থাকার জন্য লোকে মুঁজ ঘাসের ঝুপড়ি বানিয়েছিল। ঝুপড়িতে আমাকে বসিয়ে খুব সমাদরে খাওয়ানো হল। খাবার যতই সাদাসিধে হোক না কেন তার সঙ্গে ভালোবাসা আর অভ্যর্থনা মিশে থাকলে তা বড়ই মধুর হয়ে ওঠে। বক্ষু-তীর থেকে খাইবার পর্যন্ত পাঠানদের সঙ্গে ছিলাম, প্রতিটি স্থানে তাদের অকৃত্রিম স্নেহ-সৌজন্যের পরিচয় পেয়েছি। সোভিয়েত দেশেও স্নেহ ও সৌজন্য আছে, কিন্তু সে তো আর এক জগৎ।

খাওয়ার পরে দুজন সশস্ত্র অশ্বারোহীকে আমার সঙ্গে দেওয়া হল আর রাত দেড়টা-দুটোর সময়ে আমি আবার রওনা হলাম। এত রাতেও উটের মিছিল বক্ষুতটের দিকে যাচ্ছিল। পথে যাতে কোনো বিপদে না পড়ি সেজন্যই সশস্ত্র প্রহরা দরকার বলে মনে করা হয়েছিল। পাঁচ মাইল চলার পরে অস্‌করখানা এল। এটি একটি ছোটমতন দুর্গ। টাঙ্গা এসে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। অফিসার নতুন দুজন অশ্বারোহীকে সঙ্গে দিলেন। আমার টাঙ্গা সামনের পথে রওনা হল। অর্ধেক রাত পার হলে আমরা শার্গির্দ-এ ফৌজী চৌকিতে পৌঁছলাম। এখানে ফোন আসেনি, তাই এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা গেল না। রাতে আমি

---

[১]. নল, শর, খাগড়া, কিংবা বেণু-ঘাস।—স·ম·

—১৯৩৮—

ওখানেই একটি ঘরে শুয়ে পড়লাম। সকালে (২৭ জানুয়ারি) শাগির্দ থেকে রওনা হলাম। একসময়ে শাগির্দ বর্ধিষ্ণু জনবসতি ছিল কিন্তু এখন জনশূন্য হয়ে গেছে। কাছে না আছে পাহাড় না বন, তবে পশুচারণের ভালো জায়গা আছে।

এটাই পুরনো বাহ্লীক দেশ। রাস্তাগুলো কাঁচা কিন্তু খারাপ ছিল না। দূর থেকে সমাধির তীর্থকেন্দ্রের নীল গম্বুজ দেখা যাচ্ছিল। প্রথমে বিমানবন্দর পেলাম, কিন্তু বর্তমানে তা পরিত্যক্ত, কারণ আমানুল্লার শাসন শেষ হওয়ার পর কাবুল থেকে তাসখন্দ উড়োজাহাজ যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এর পরে একটি মাটির কেল্লা দেখা গেল, এর পাশেই বসেছিল পশুহাট। গুমরগে গেলাম, মালপত্র ওখানেই রেখে যেতে হল আর সরকারি হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা করে সেখানে আমাকে পাঠানো হল। বলখ, মজারশরীফ আর ঐবক পর্যন্ত উজবেকদের প্রদেশ। সেই উজবেক, যারা বক্ষু নদীর ওপারে উজবেকিস্তানে বাস করে। অর্থাৎ তাসখন্দ্ থেকে ঐবক পর্যন্ত সমস্ত স্থানে উজবেক জাতিরই বসবাস। সোভিয়েত দেশের তুর্কমান ও তাজিক জাতিগোষ্ঠীরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের আত্মীয়-স্বজন থেকে আলাদা করে দিয়ে কাবুলেব অধীনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আফগানিস্তানের ভেতরে বসবাসকারী এই সব লোকেরা জানে যে, নদীর ওপারে তাদের ভাইয়েরা এক নতুন স্বর্গ রচনা করতে ব্যস্ত, আর অনেকাংশে তাদের জীবন এক স্বর্গীয় জীবনের মতো হয়ে গেছে। যদিও অন্য সব সরকারের মতো আফগান সরকারও চেষ্টা করে যাতে ওখানকার তাজিক, উজবেক আর তুর্কমান অধিবাসীরা নিজেদের সোভিয়েত-নিবাসী ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারে। কিন্তু তাদের আমু নদীর তীর পর্যন্ত তো যেতেই হয়, আর সেখান থেকে অনেক মাইল জুড়ে বলতী তেরমিজের বৈদ্যুতিক আলো তারা দেখতে পায়। কখনও কখনও লুকিয়ে আসা-যাওয়া করা লোকেদের কাছ থেকে তারা আরও খবর পায়। সোভিয়েত কন্সলের দপ্তর ও দূতাবাসেও তাদের ভাইরা অফিসার হয়ে আসে, তাদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের মাঝে সোভিয়েতের এই প্রজাতন্ত্রগুলো শুধু নিজেদের সৈন্যবাহিনী রাখার অধিকারই পায় নি, তার সঙ্গে পেয়েছে অন্য দেশে তাঁদের রাষ্ট্রদূত পাঠানোর অধিকার। যখন উজবেক, তুর্কমান আর তাজিক প্রজাতন্ত্র আফগানিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইবে, তখন তাতে আপত্তি জানানো কঠিন হবে। হিন্দুকুশ পর্যন্ত সোভিয়েতসীমা বিস্তার ততটাই স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক ছিল পোল্যাণ্ডের দিকে তার কার্জন লাইন পর্যন্ত বিস্তার। যদিও আফগানিস্তানের তাজিক, উজবেক আর তুর্কমানদের 'বলশেভিকরা ধর্মদ্বেষী' বলে খুব উত্তেজিত করা হয়, কিন্তু আমি নিজে কয়েকজন তাজিক ও উজবেকীকে বলতে শুনেছি, 'এ-সব কথা মিথ্যা, একদিন আমাদের ভাইদের সঙ্গে মিলনেই আমাদের কল্যাণ নিহিত।'

'মজার' বেশ সুন্দর একটি বর্ধিষ্ণু জনবসতি। এটি আফগানিস্তান-তুর্কিস্তানের বাণিজ্যকেন্দ্র। আগে এখানে অনেক ভারতীয় দোকান ছিল, কিন্তু এখন আফগান সরকার বিদেশী ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করছিল না। অনেক বৃত্তি সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়ীদের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। দুপুরের

—১৯৩৮—

পরে টাঙ্গা করে বল্‌খ্‌ দেখতে গেলাম। বল্‌খ্‌ এখান থেকে ৬ ক্রোর (ক্রোশ) দূরে। ১৫ আফগানী (প্রায় ৪ টাকা) আসা-যাওয়ার টাঙ্গা ভাড়া। ঘোড়াদের বিষয়ে আর কি বলব! বাহ্লীকে কিছুক্ষণ থাকলাম। প্রাচীনকাল থেকেই বাহ্লীকের ঘোড়া বিখ্যাত। এখানে টাঙ্গায় একটিই ঘোড়া জোতা হয়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘোড়াও চলে। রাস্তা ছিল কাঁচা। পথে 'তখ্‌তাপুল' নামে একটি মাটির কেল্লা পেলাম। এখন এটা জনহীন। এর পরে দূরবিস্তৃত বল্‌খ্‌-নগরের ধ্বংসাবশেষ। হাজার বছর আগে এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরগুলোর মধ্যে গণ্য হতো, আজও এটি 'মাদরে-শহর' নামে অভিহিত। কিন্তু এখন কেবল এখানে-সেখানে ছোট-ছোট গ্রাম পড়ে রয়েছে। হজরত অকসা-র সমাধি খুবই পবিত্র বলে মনে করা হয়। এর আশেপাশে হাজার হাজার কবর আছে। আমার সহযাত্রী তাজিক আমাকে বলছিল যে, হজরত অক্‌সা-র ছায়াতে যার কবর গড়ে ওঠে, তাকে নরকের আগুন দগ্ধ করতে পারে না। আফগান সরকার বল্‌খে শহর না বানিয়ে একটি ছোট-খাটো জনবসতি নির্মাণ করতে ইচ্ছুক। বড় মসজিদের সামান্য অংশ মেরামত করা হয়েছে। তার সামনে গোলাকার বাগান তৈরি হয়েছে। একদিকে অনেক নতুন দোকান বসেছে। এই সব দোকান মজার থেকে যে-সব ইহুদীদের নিয়ে আসা হয়েছে তারাই খুলেছে। চাহিদা অনুযায়ী জিনিসপত্র বিক্রি করলেই বড় বড় শহর গড়ে ওঠে! বল্‌খের ভাগ্য তখনই ফিরবে যখন এখানকার উজবেকরা তাদের বক্ষুপারের ভাইদের সাথে মিলিত হবে।

বাড়ি তৈরি করার জন্য এখানে ইট পোড়াবার দরকার হয় না। মাটির নিচে পুরনো ঘর-বাড়ির এত ইট জমা করা আছে যে হাজার হাজার বাড়ি তৈরি হতে পারে। এক জায়গায় ইট বের করা হচ্ছিল। আমি গিয়ে দেখলাম যে ওখানে সাড়ে তিন হাত চওড়া দেওয়াল ছিল, আর এক-একটি ইট ১৫ ইঞ্চি লম্বা ১৫ ইঞ্চি চওড়া ও ৩ ইঞ্চি পুরু। আজই আমার পা মুচকে গিয়েছিল, তাই বেশি হাঁটতে পারছিলাম না। টাঙ্গা ছোট নদীর সেতু পার হচ্ছিল, সেতুর ওপরে কয়েকটি কাঠের টুকরো রাখা ছিল। ঘোড়ার পা তাতে আটকে গেল। 'চড়াৎ' শব্দ হল আর সে সেখানেই পড়ে গেল। আমি তো ভাবলাম যে, হাড় ভেঙে গেছে! কিন্তু টাঙ্গাওলা ঘোড়া খুলে তাকে দৌড় করাতে লাগল। দ্বিতীয় ঘোড়াটিকে জুতে কয়েক মাইল ছোটাবার পর তার খুঁড়িয়ে চলা বন্ধ হল।

পরের দিন (২৮ জানুয়ারি) জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম হুব্‌লির (কর্ণাটক) ক্যাপ্টেন প্রভাকর এখানে চিকিৎসক। তাঁর কাছে গেলাম। খুবই সমাদরে তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। কুড়ি মাস ধরে তিনি এখানে আছেন। আগে আই· এম· এস· ডাক্তার ছিলেন, পেনশন নিয়ে তিনি দু-বছরের মেয়াদে আফগান সরকারের চাকরি নিয়েছেন। ধর্মে তিনি খ্রীস্টান ছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে গেলে ভারতীয়রা নিজেদের হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান পরিচয় ভুলে যায় এবং নিজেদের ভারতীয় বলেই মনে করে। যদি কোনো দুর্ভাগা এরকম না মনে করে, তাহলে সেখানকার লোকেরা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাদের একথা বুঝিয়ে দেয়।

২৯ জানুয়ারি আমি বল্‌দিয়া (মিউনিসিপ্যালিটি)-র মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। এখানে প্রাচীন মুদ্রার ভালো সংগ্রহ আছে। গ্রীক আর কুশান যুগের রুপো, সোনা ও তামার

—১৯৩৮—

এক হাজারের বেশি মুদ্রা আছে। বেশির ভাগ মুদ্রাই এখান থেকে ৩ ক্রোশ দক্ষিণে শহরবানে পাওয়া গেছে। গান্ধারশিল্পের অনেক চুনাপাথরের মূর্তিও আছে। কয়েকটি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক আছে, যার মধ্যে একটি হাজার বছরের বেশি পুরনো।

শুমরগ (শুল্ক দফতর) আমার দুটো বাক্সের ওপর মোহর লাগিয়ে দিল এবং এই সম্বন্ধে কাবুলে তারবার্তাও পাঠিয়ে দিল। মজার শরিফ থেকে কাবুলে নিয়মিত লরি যাতায়াত করে। ৬০ আফগানি (১৫ টাকা) দিয়ে কাবুল যাওয়ার লরিতে ড্রাইভারের পাশের সিট পাওয়া গেল। টাকার হিসেবে পেশোয়ার থেকে ২০ টাকায় মজারশরিফ পৌছান যায় আর ২৫ টাকা দিলে সোভিয়েত সীমানার ভেতর চলে যাওয়া যায়।

আমার লরির মালিক জরিফ খান দেখা গেল খুবই ভালো মানুষ। কাবুল পর্যন্ত সে আমাকে তার সঙ্গেই খেতে বাধ্য করল। আমাকে সে এক পয়সাও খরচ করতে দিল না। দুপুরের পরে আমরা মজার থেকে রওনা হলাম। কোতল-ঐবক (ঐবক জোত) একটি ছোট ডাঁড়া, সেটা পার হয়ে সেদিন রাত কাটালাম ঐবকের সরাইয়ে। এখন আমরা হজারা জনগোষ্ঠীর অঞ্চলে এসে গিয়েছিলাম। হজারা মোঙ্গল হল চেঙ্গিস খাঁর অঞ্চলের মোঙ্গল। শুধু আফগানিস্তানে এরাই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, বাকি সবাই সুন্নি।

পরের দিন (৩০ জানুয়ারি) দশটার সময় রওনা হলাম। কোতল-রোবা পর্যন্ত বেশ উঁচু জমি। এখানে ওপরে বরফ ছিল। আমি লরিতে বেশ কয়েকটি তাবিজ বাঁধা আছে দেখলাম। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'এখনই সামনে আপনি দেখবেন রাস্তা খুবই বিপজ্জনক। আমি বড় বড় পীরের তাবিজ নিয়েছি, এগুলো না থাকলে না জানি গাড়ি কতবার উলটে যেত!' সেই সময় আমার মহম্মদোফের কথা মনে এল। সে বলেছিল যে, সুলতানুস্‌সাদাতের তীর্থে গাধাদের জন্যও তাবিজ পাওয়া যেত।

সামনে উৎরাই পার হয়ে সমতল ভূমিতে পৌছলাম। এ-হল গোরীর অঞ্চল, যেখানে ভারত-বিজেতা সুলতান শাহাবুদ্দিনের জন্ম হয়েছিল। এখানে শালিধানের খেত ছিল প্রচুর। অনেক রাতে আমরা দোশী পৌছলাম আর রাতে এখানেই থেকে গেলাম।

৩১ জানুয়ারি চা-পান করে রওনা হলাম। সমস্ত ভূমিই ছিল পার্বত্য। কয়েকটি চড়াই পেলাম। এদিকে অনেক খেত আর বাগান ছিল ন্যাড়া আর তার ওপরে বরফ ছিল না। সেদিন রাতে আমরা বল্‌বলাতে থাকলাম। পরের দিন (১ ফেব্রুয়ারি) ভোরেই রওনা হলাম। একটু এগিয়েই বল্‌বলার দুর্গে পৌছলাম। দুর্গের একটু আগেই বামিয়ানের পথ আলাদা হয়েছে। বামিয়ান দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখন তো জিনিসপত্র নিয়ে আগে কাবুল যাওয়া দরকার ছিল। কাবুল থেকে আসার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু এর মধ্যে বরফ পড়ায় আসার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুর্গের পরে চড়াই ছিল আর বরফের লরির চাকা পিছনে যাচ্ছিল। সকলেই নেমে গেল। খুবই কষ্টেসৃষ্টে লরি এগোল। একটি ছোট কোতল পার হয়ে কিছুদূর গিয়ে হিন্দুকুশের সবচেয়ে বড় ডাঁড়া 'কোতল শক্কর' পৌছলাম। এখানে চারদিকে ছিল শুধু বরফ আর বরফ। সামনে পেতে লাগালাম উৎরাই আর বরফ। সন্ধের অনেক আগে আমরা চারদী-গুর্বন পৌছলাম। গুর্বন নদীর ধারে চারদী বেশ বড় বসতি, এখানে দোকানও অনেক আছে। এক দেশী হোটেলে আশ্রয় নিলাম। খবর পেলাম যে,

—১৯৩৮—

এখানে মাটির ছোট ঝুড়িতে বন্ধ করে রাখা তাজা আঙুর পাওয়া যায়। জরিফ খানকে জানতে না দিয়ে দু-তিন সের আঙুর কিনে আনালাম। খাবার জন্য এখানেই আমি নিজের টাকা খরচ করতে পারলাম।

রাত থেকেই বরফ পড়া শুরু হয়েছিল। পরের দিন (২ ফেব্রুয়ারি) যখন আমরা রওনা হলাম তখনও বরফ পড়ছিল। গুর্বন নদীর ধারা বয়ে চলেছিল, কিন্তু তটভূমিতে সাদা বরফের পাড় জমেছিল। এক জায়গায় গাধা নিয়ে একজন লরি থেকে মাত্র চার আঙুল দূরত্বে দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভার তাকে সরে যেতে বলায় সে জবাব দিল, 'বরৌ, খুদা খৈর কুনী' (যাও, ঈশ্বর মঙ্গল করবেন)। এগিয়ে গিয়ে শাগির্দের বড় বসতিতে পৌঁছলাম। এখানে বড় দুর্গ আছে। গুর্বন নদীতীর ছেড়ে দিয়ে আমরা ডানদিকে ঘুরলাম। এবার মতকের মফস্বল শহর এল। 'মতকতা অতক' (মতক থেকে অটক) পাঠানদের দেশকে বলা হয়। এবার ছিল কোহদামন কপিশার বিস্তৃত উপত্যকা। আড়াই হাজার বছর ধরে আঙুরের জন্য কপিশা বিখ্যাত। চাহারেকার এখানকার বড় মফস্বল শহর। সমস্ত কপিশা বরফে ঢাকা ছিল। ছাতের ওপর লম্বা লম্বা ছিদ্রযুক্ত খাড়া দেওয়াল দেখে আমার প্রথমে মনে হয়েছিল যে, এগুলো বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করার জন্য। কিন্তু একদিকে আলাদা একটা ছোট দেওয়াল তো এর উপযুক্ত ছিল না। জরিফ খান জানাল যে, এগুলো আঙুরের গুচ্ছ শুকোনোর জন্য।

চাহারেকারে স্বর্ণকারের বহু বাড়ি দেখে মনে হল যে, পাঠানরা অলংকার খুব পছন্দ করে। রাস্তা থেকে বাঁদিকে ঘুরে একটি পোড়া বাড়ি দেখতে পেলাম। আমার সঙ্গী জানাল যে, এটাই বচ্চা-সক্কার বাড়ি। বাচ্চা-সক্কা তাজিক ছিল। সমস্ত কোহদামন তাজিকদের। এখান থেকে বদখ্‌শাঁ হয়ে তাজিকিস্তান পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল তাজিক উপজাতিদের এলাকা। তাজিকরা লেখা-পড়ায় বেশ বুদ্ধিমান এবং লড়াইয়ে বাহাদুর। যখন সপ্তম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় আরবরা এসে পড়েছিল, তখন তাজিকরা তাদের অবস্থা কাহিল করে দিয়েছিল। আজ ১৪ লক্ষ তাজিক উপজাতির নিজেদের একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র আছে। শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, সৈন্যদল—সব বিভাগেই তারা খুব দ্রুত উন্নতি করছে, আর তাদের প্রগতি কোহদামনের তাজিকদের প্রলুব্ধ করে তুলছে।

দুটোর সময়ে কপিশা পার হয়ে আমরা একটি ছোট কোতলে পৌঁছলাম—এর একদিকে ছিল কপিশা, আর অন্যদিকে কুভা (কাবুল)। বস্তুত এই কোতল পাঠান আর তাজিক অঞ্চলের সীমারেখায় অবস্থিত।

কাবুল উপত্যকাতেও চারদিকে বরফ দেখা যাচ্ছিল। গাছগুলোতে পাতা ছিল না। প্রথমে বালাবাগ এল, তারপরে আমরা কাবুল শহরে প্রবেশ করলাম। বাস আমাদের হোটেল-কাবুল-এর সামনে নিয়ে গেল। এটা সরকারি হোটেল ছিল। থাকার জন্য একটি ঘর পাওয়া গেল।

কাবুলে (৩-৭ ফেব্রুয়ারি)—শুল্ক দফ্‌তরে গেলাম, বাক্স খুলে দেখালাম। এই কাজ সেরে অকাদেমি-আফগানে (আফগান-পরিষদ) পৌঁছলাম। এখানে এক ভারতীয় ভাই ইয়াকুব

—১৯৩৮—

হাসান খাঁর সঙ্গে দেখা হল। ২৩ বছর আগেকার কথা। যে-সময়ে জার্মানির সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ চলছিল, তখন লাহোরের কলেজের কয়েকজন ছাত্র দেশ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। তারা চেয়েছিল বাইরে গিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য উদ্যোগী হতে। ইয়াকুব হাসান এই তরুণদেরই একজন ছিলেন। এখনও তাঁর হৃদয়ে দেশভক্তির আগুন জ্বলছিল। কিন্তু এখন তাঁর বেশিরভাগ সময় তিনি সাহিত্য-কর্মে ব্যয় করছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে বড় আনন্দ হল। পাঁচ ঘণ্টা আমি ওখানেই থাকলাম। অকাদেমি পশ্‌তো[১] সাহিত্যের জন্য অনেক কাজ করছে। তার একটি নতুন ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হচ্ছিল, অনেকগুলো গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। কাবুলের পাঠানেরা অনেক শতাব্দী ধরে ফার্সি ভাষাকে ব্যবহার করে যাচ্ছে। কাবুলের পথে-ঘাটে ফার্সি ভাষা পশ্‌তো-র মতোই ব্যবহার করা হয়। আগে পাঠানেরা নিজেদের মাতৃভাষাকে গ্রাম্য মনে করে উপেক্ষা করত—কিন্তু এখন তাদের মধ্যে জাতীয়তার চেতনা জেগে উঠেছে, তাই তারা পশ্‌তো ভাষাকেই সবার ওপরে রাখতে চায়। আমার কাবুলে থাকার সময়ে ইয়াকুব হাসান নিয়মিত চার-পাঁচ ঘণ্টা আমার সঙ্গে থাকতেন। পশ্‌তো ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে, এ-বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হতো। তিনি হাজার হাজার শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন আর আমার কাছে সেগুলো সংস্কৃত প্রতিশব্দ জানতে চাইতেন। যদিও পশ্‌তোর ওপর ইরানিরও প্রভাব আছে, কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে এ-ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। 'বারি'কে 'বাল', 'আপ'কে 'ওবা', 'তোয়'কে 'তোয়'ই .বলা হয়, এরকমভাবেই 'গিরিশা'কে 'গরসৈ, 'অপ্‌শা'কে 'ওসৈ' বলার মধ্যে বৈদিক শব্দগুলোর সঙ্গে এ-ভাষার ঘনিষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। 'সরবন্ত' পশ্‌তো ভাষায় 'সড়বন'।

৪ ফেব্রুয়ারি বরফ পড়া আরম্ভ হল। এজন্য দু-একদিনের মধ্যে পেশোয়ার যাবার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ সামনে জোতগুলোতে বরফ বেশি থাকায় যাওয়া অসম্ভব ছিল। ৫ ফেব্রুয়ারি ফরাসি দূতাবাসে মঁশিয়ে মোনিয়ে-র সঙ্গে দেখা হল। কপিশা উপত্যকায় একসময়ে বড় শহর ছিল, এর ধ্বংসাবশেষের নাম 'বগরাম'। মাত্র কিছুদিন আগে ফরাসি পণ্ডিতেরা এখানে খননকার্য করেছিলেন, যার ফলে অনেক ঐতিহাসিক বস্তু পাওয়া গিয়েছিল। মোনিয়ে এই খননকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি খননের কয়েকটি ফটো দেখালেন। তারপর আমার সঙ্গে তিনি কাবুল-মিউজিয়ামে গেলেন। মিউজিয়াম দারুলআমানে অবস্থিত। আমানুল্লা এখানে নতুন শহর পত্তন করতে চেয়েছিলন, কিন্তু পত্তনের আগেই ধর্মান্ধরা তাঁকে কাবুলের সিংহাসন ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। মিউজিয়ামটি নূতন। বচ্চা-সক্কার শাসনকালে কিছু মূর্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবু এখানকার সংগ্রহ খুব ভালো। হড্ডা থেকে পাওয়া একটি মৈত্রেয় মূর্তির দুপাশে আফগান এবং শক পরিচ্ছদের সুন্দর চিত্ররূপ দেওয়া ছিল। আমি ইতিহাস বিভাগের পণ্ডিত আহমদ আলি খাঁ-কে ঐ মূর্তি দেখিয়ে বললাম, 'দেখুন, পাঠানরা দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকেও সালোয়ার

[১] ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রচলিত আর্যভাষা। বর্তমানে মূলত আফগানিস্তানে এবং পাকিস্তানের কিয়দংশে এইভাষার অধিক প্রচলন।—স·ম·

পরত।' সালোয়ার আজও আমরা দেখি। কিন্তু এটি যেরকম গোল ঢেউ-খেলানো সুন্দর কুঁচি-দেওয়া সালোয়ার, সেরকম সালোয়ার আহ্‌মদ আলিও দেখেননি। তিনি লাফিয়ে উঠলেন।

স্যাহর্গির্দ-শাগির্দ (কপিশা) থেকে পাওয়া মাটির সুন্দর রঙিন মূর্তিগুলো দেখলাম। সেগুলোর রঙ এখনও তাজা মনে হচ্ছিল। মেয়েদের কেশবিন্যাসের অনেক বৈচিত্র্য ছিল। মোনিয়ে বলছিলেন যে, প্যারিসের মেয়েরা যদি এই কেশবিন্যাসের পরিচয় পায় তাহলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। বেগ্রাম [থেকে পাওয়া] নিদর্শনে হাতির দাঁতের ওপর সাঁচি আর ভরহুতের মতো অনেক স্তূপের সুন্দর ছবি উৎকীর্ণ ছিল। ওখান থেকেই গঙ্গা-যমুনার সুন্দর কাঠের মূর্তি পাওয়া গেছে। পাণিনির সময়ে (খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে) কপিশার সুরা আর আঙুর খুব বিখ্যাত ছিল। ওখান থেকে কাঁচের তৈরি বেশ চমৎকার পানপাত্র পাওয়া গেছে। এখানকার প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদের কত জিনিসই যে আমি মিউজিয়ামে দেখলাম! কাবুলে ৪০০টি পরিবার বাস করে, তাদের ২২টি মন্দির আছে।

হিন্দুরা নিজেদের বাড়িতে পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলে। কাবুল ছাড়াও চারিকার, বেগ্রাম, কন্ধার, গজনি ও জলালাবাদেও হিন্দুবসতি আছে। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ (সারস্বত, মোহিয়াল), ক্ষত্রিয়, অরোড়া, বৈশ্য (উত্তরধর্মী, দক্ষিণী, স্বর্ণকার ইত্যাদি) জাতি আছে। হিন্দুরা বেশির ভাগই দোকানদারি করে। তারা নিজেরা মাহমুদ গজনীর সময়ে এসেছে বলে জানায়। তারা নিজেদের কয়েকটি তীর্থ গড়ে তুলেছে। 'দর্রা শক্কর' হয়ে গেছে 'শংকর' আর সেখানকার ঝিল মানস-সরোবর। সরায়খোজার কাছে কলায়গন্নরে আছেন জটাশংকর, লোগরের কাছে বাণগঙ্গা। তাশকুর্গান আর ঐবক-এর কাছে কবলানী গ্রামের 'চেক্-আব' এখন শিবের ঝর্ণা। আজ ছিল বসন্ত পঞ্চমী, আমরা আশামাঈ-এর মন্দিরে গেলাম। হারমোনিয়ম, সেতার ও তবলা নিয়ে দুজন 'বিনয়পত্রিকা' (তুলসীদাস)-র পদ গেয়ে শোনাচ্ছিলেন।

৬ ফেব্রুয়ারি রোদ দেখা দিয়েছিল আর বরফ গলতে শুরু করেছিল। রাস্তা কাদায় ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। পথ-চলা সহজ ছিল না। আমরা শহরের ভেতরে চক ও বাজার দেখতে গেলাম। ওখানকার আঁকা-বাঁকা গলিগুলো দেখে বেনারসের কথা মনে পড়ছিল। যদিও এখন আর লাল পাগড়ির বিধান নেই তবু অনেক হিন্দু মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধে। অনেক হিন্দু মহিলাই হলদে বোরখা ব্যবহার করে। বাগবানকুচায় 'জোগিয়াঁদাথাওঁ' বা 'বড্ডাথাওঁ' কাবুলের সবচেয়ে বড় হিন্দুমঠ। বলা হয় যে, এখানে গোরখনাথের শিষ্য বীররতননাথ এসেছিলেন, তিনি প্রাঙ্গণের শুকনো গাছগুলোকে সবুজ করে দিয়েছিলেন। এই মঠের মোহান্ত পেশোয়ারে থাকেন, আশামাঈ-এর মোহান্ত রাঘবদাসও পেশোয়ারে থাকেন। আগে সাধুরা এখানে আসা-যাওয়া করতেন কিন্তু যখন পাসপোর্ট নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ল, তখন থেকে সাধুদের আসা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি কাবুলে দুটো ফিল্‌ম্ দেখলাম, দুটোই মার্কিন। ওগুলোতে ফ্যাশন আর নব্য আলোকের ছড়াছাড়ি ছিল। দর্শক ছিল খুবই কম। আমি আমার সঙ্গীকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, 'যখন ভারতীয় ছবি আসে তখন দর্শকদের ভিড় লেগে থাকে কিন্তু

আমাদের [সিনেমা হলের] মালিক আমানুল্লার পতনের পরে খোলাখুলি কিছু না করলেও ভেতরে-ভেতরে ইউরোপিয়ান পোশাক আর ভাবধারার প্রচার করতে চান।' তিনি একথাও বললেন, 'যদিও আমানুল্লার সময়ের মতো এখন মেয়েরা মুখ খোলা রেখে বাইরে ঘুরে বেড়ায় না, তবে বাড়ির ভেতর তারা পর্দা মানে না এবং ইউরোপীয় পোশাক পরে।'

কাবুল থেকে যাত্রা—৮ ফেব্রুয়ারি ৫ টাকা দিয়ে পেশোয়ারের লরিতে ড্রাইভারের পাশে বসার জায়গা পাওয়া গেল। কাবুল থেকে পেশোয়ার ১৯১ মাইল। একটার সময় আমাদের গাড়ি রওনা হল। দর্রা[১]-কাবুলখুর্দ (৭৫০০ ফিট) একটি ছোট জোত। কাবুল-উপত্যকা পার হলাম, সমানে বরফ পেতে লাগলাম। বরফের ওপর উটেদের চলা কঠিন ছিল। তাদের পা পিছলে যাচ্ছিল। সামনের দর্রা-জগদলক (৮২০০ ফিট) খুব বড় জোত। চড়াই অনেক দূর পর্যন্ত ছিল, তাই ততটা কঠিন ছিল না। একবার এই উপত্যকাতে ইংরেজ সেনাদের অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। জগদলক থেকে নিচে নামা বেশ কঠিন। অনেক দূর পর্যন্ত আমরা শুধু বরফ আর বরফ পেলাম, তারপর বরফ শেষ হল। পাহাড়ের ওপর যেখানে-সেখানে মুঁজ দেখা যাচ্ছিল, এই সেই মুঁজবান পাহাড় নয় তো? আটটার সময়ে এক জায়গায় খাওয়ার জন্য থামলাম। রাত এগারোটার সময়ে জলালাবাদে (২৯৬.২ ফিট) পৌঁছলাম। এখানকার গাছের পাতা সবুজ ছিল। গরম লাগছিল। আরো ২২ মাইল গিয়ে রাত দুটোয় আমরা দক্কা পৌঁছলাম এবং রাতে এখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

দক্কাতে আবার লরির মালপত্র খুলে দেখা হল। অনেকক্ষণ থাকতে হল। তারপর পাসপোর্ট অফিসারের কাছে গেলাম। পাসপোর্টের কাজ তো তিনি তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলেন, কিন্তু তিনি যখন জানলেন যে আমি ইতিহাস আর পুরাতত্ত্বের ছাত্র, তখন তাঁর প্রশ্ন আর শেষ হতে চায় না, আর ওদিকে লরিওলার দেরি হয়ে যাচ্ছিল।

নটার সময়ে সেখান থেকে ছুটি পেয়ে আরও ৯ মাইল এগিয়ে আমরা তোরখম পৌঁছলাম। এখানে কয়েকজন আফগান পুলিশ ছিল। অফিসার পাসপোর্টের ব্যাপারে রেজিস্টারে লিখলেন, ছাপ দিয়ে সই করে দিলেন। কয়েক পা এগিয়েই একটি গেট ছিল—এটিই ছিল ব্রিটিশ-ভারত ও আফগানিস্তানের সীমানা। গেট খুলে গেল আর আমাদের লরি এখন ভাঙাচোরা রাস্তা ছেড়ে নিচের রাস্তায় চলে ব্রিটিশ শুল্ক অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেরানি পাসপোর্টের বিবরণ রেজিস্টারে লিখে নিল, এরপর আমরা তরুণ অফিসার সাদুল্লা খাঁর কাছে গেলাম। তিনিও আমার ভ্রমণ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলেন। তাঁর জিজ্ঞেস আরও বেড়ে গেল, যখন তিনি জানলেন, যে আমি বৌদ্ধ শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তিনি বললেন, 'আমাদের মর্দানে অনেক বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া যাচ্ছে, আপনি অবশ্যই একবার সেখানে আসুন।'

দেড় ঘণ্টা পরে আমাদের লরি আবার যাত্রা করল। পেশোয়ার ওখান থেকে মাত্র ৪৯ মাইল। ৪ মাইল সামান্য চড়াইয়ের পরে লণ্ডিখানা পৌঁছলাম। রেলপথ এই জায়গা পর্যন্ত

[১] দর্রা (ফার্সি—'দর') শব্দটির অর্থ উপত্যকা বা পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ।—স·ম

এসেছে। এর পর আমরা খাইবার গিরিপথে প্রবেশ করলাম আর চড়াইয়ে উঠতে উঠতে লণ্ডিকোতলের জোতে পৌঁছে গেলাম। ১৯২৬ সালে আমি একবার এই জায়গা পর্যন্ত এসেছিলাম। পথ সব জায়গাতে ভালো। মাঝে মাঝে ফৌজী মোর্চা রয়েছে। পথে পাঠানদের অনেক গ্রাম পেলাম, তারা লাঠির মতোই বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জমরুদে আবার ড্রাইভারের কাগজপত্র দেখা হল। এবার সামনেই ছিল পেশোয়ারের পুরো সবুজ উপত্যকা। শিকারপুরীদের ধর্মশালার খবর পেলাম, নিজের মালপত্র নিয়ে আমি সেখানেই চলে গেলাম।

ভারতে, ১৯৩৮

আমি আগেই জানিয়েছি যে, সোভিয়েত দেশ থেকে এত তাড়াতাড়ি আমার ফিরে আসার মুখ্য কারণ ছিল—বইয়ের খোঁজে এবং ফটোর জন্য তিব্বতে যাওয়া। আমি এখন আর ভিক্ষুর বেশে থাকতে চাইছিলাম না, যদিও তিব্বত যাবার জন্য সেটা খুবই জরুরি ছিল, তা নইলে ওখানকার গুম্বাগুলোর 'অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রন্থাগারগুলো' খোলা সহজ হতো না। এইজন্য পেশোয়ারে এসে কোট-প্যান্ট খুলে আমাকে হলুদ কাপড় পরতে হয়েছিল।

পরের দিন (১০ ফেব্রুয়ারি) আমি ট্রেন ধরলাম। এই ট্রেন সাহারানপুর পর্যন্ত যায়। ১১ ফেব্রুয়ারি দুপুরবেলায় আমি সাহারানপুরে নামলাম। স্টেশনের কাছেই একটি হোটেলে থাকলাম। শহরে বেড়াতে-বেড়াতে পণ্ডিত কন্‌হাইয়ালাল মিশ্র 'প্রভাকর'-এর সঙ্গে দেখা হল। ঐ দিনই গাড়িতে এলাহাবাদ রওনা হলাম। ১৩ তারিখের দুপুরে প্রয়াগে ডক্টর বদরীনাথ প্রসাদের কাছে পৌঁছে গেলাম। কিছু প্রুফ এখনও লা-জার্নাল প্রেসে ছিল, তাই তিন-চার দিন থাকারও দরকার ছিল।

১৬ তারিখে সারনাথ গেলাম। গেশের সঙ্গে দেখা হল। এখানে তিনি কয়েকমাস শহরে ডঃ রোইরিকের সঙ্গে ছিলেন আর তাঁর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাঁকেও তিব্বত যেতে হবে —এটা জানিয়ে রাখলাম। এবার পাটনায় গিয়ে খোঁজ নেওয়ার ছিল যে, যাবার ব্যাপারে কি কি কাজ হয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি পাটনায় পৌঁছলাম। জানলাম যে সিকিমের পোলিটিক্যাল এজেন্টের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তিনি দরখাস্ত ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভারত সরকার সেইসব জায়গার নাম জানতে চেয়েছি যেখানে-যেখানে আমার যাওয়া দরকার ছিল।

পাটনা থেকে নাম পাঠিয়ে দেওয়া হল আর ভারত সরকার তিব্বত সরকারকে চিঠি পাঠাল। ওখানকার লোকেরা জানত না কিন্তু আমি তো জানতাম যে, তিব্বত সরকারের

কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কত দেরি হয়। আমি সে-অপেক্ষায় থাকতে চাইছিলাম না। এ-ব্যবস্থা তো আমার সাহস ও বুদ্ধি দিয়ে করার ছিল। কিন্তু তিব্বত যাবার আগে জরুরি ছিল সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে আমার বই লিখে রাখা। এর জন্য আমি বেছে নিলাম সবচেয়ে নির্জন ও মনোরম স্থান সারনাথকে।

পাটনাতে এ-খবরও পেলাম যে, মোটর দুর্ঘটনায় অনুগ্রহবাবু গুরুতর আহত হয়েছেন। ঐ মোটর দুর্ঘটনাতেই হাজারিবাগ জেলে আমার সঙ্গী ও বন্ধু পারসনাথ ত্রিপাঠী মারা গেছেন জেনে খুবই দুঃখিত হলাম।

২৮ ফেব্রুয়ারি আমি নালন্দা ও রাজগীরে গেলাম। ২ মার্চ আবার বেনারসে এলাম। বর্মী-ধর্মশালায় গ্রন্থ রচনার কাজের শুরু হল। প্রেমচন্দজীর গ্রামের শ্রীগুরুপ্রসাদ বিশ্বকর্মা সাহিত্যরত্নকে লেখানোর জন্য পেয়ে গেলাম। তাঁর হাতের লেখা ছিল পরিষ্কার আর লেখনীও চলত দ্রুত। ৩ মার্চ লেখা আরম্ভ হল। মাঝে ৩ দিন (৭-৯ মার্চ) লক্ষ্ণৌ যেতে হয়েছিল, তারপর ১৩, ১৪ তারিখে আরো দুদিন চিরৌডা (পাটনা)-র গ্রন্থাগারের বার্ষিক উৎসবে যেতে হল। এ ছাড়া টানা ৮ এপ্রিল পর্যন্ত লেখা চলল। পুরো বইটা একমাসের মধ্যে লেখা হয়ে গেল। রায় কৃষ্ণদাস সেটা 'নাগরী-প্রচারিণী সভা'র পক্ষ থেকে প্রকাশ করতে চাইলেন, আমি রাজি হয়ে গেলাম।

বস্তুত, অসহযোগ আন্দোলনের সময় (১৯২১-২২) থেকেই আমার মনে হতো যে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রগতি ততদিন সম্ভব হবে না যতদিন না জনসাধারণ সচেতনভাবে এতে জড়িয়ে পড়ে। এজন্য আমি ছাপরা জেলায় সবসময় ওখানকার স্থানীয় ভাষাতেই বক্তৃতা করতাম। বিগত অ্যাসেম্বলি-নির্বাচনে আমি লোকসংগীতের গুরুত্ব লক্ষ করেছিলাম এবং তার প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলাম। সোভিয়েত দেশে আমি লোকনৃত্য দেখেছি। ওখানকার মহান নর্তকদের নৃত্যকলা দেখে আমার ছোটবেলায় দেখা অহীর[১] নাচের কথা মনে হতো। সারনাথে জিজ্ঞেসবাদ করে জানতে পারলাম যে, এখনও এখানে কিছু লোক আছে যারা অহীর নাচ জানে। আমি সেই নাচের আয়োজন করলাম। কিন্তু ২৮ মার্চ বেনারসে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেঁধে গেল, সে-সময়ে নাচ আর কে দেখত! ২৩ মার্চ বাবু মৈথিলীশরণ গুপ্ত, শ্রীরায়কৃষ্ণ দাস, পণ্ডিত রামনারায়ণ মিশ্র এবং বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত এলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। বাবু মৈথিলীশরণের অভিযোগ ছিল যে, আমি আমার রচনায় মাঝে মাঝে এমন নিষ্ঠুর আঘাত করি যার ফলে অনেক শ্রদ্ধালু হিন্দু-হৃদয় নিদারুণ পীড়া অনুভব করে। বাবু শিবপ্রসাদ যখন নিজের মোটরগাড়িতে বেনারস ফিরছিলেন, সেই সময়েই চৌখণ্ডী স্তূপের কয়েকজন হিন্দু তিনজন মুসলমানকে মারছিল। তিনি তাদের মধ্যে একজনের প্রাণরক্ষা করতে না

---

[১] ***আহীর*** [আভীর (সংস্কৃত) > আহীর (প্রাকৃত), অহীর (হিন্দি, মারাঠী)] বা ***অহীর*** শব্দের অর্থ গোপ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রামবাসীদের মধ্যেও এই নাচের বিশেষ প্রচলন রয়েছে। যদিও এই অঞ্চলে এই নাচের মূল আকর্ষণ হল এর গান। নাচ এবং গানে গ্রামের ছেলে-ছোকরা-বুড়ো ছাড়া মেয়েদের কোনো **ভূমিকা**। নেই।—স·ম·

পারলেও, দুজন বেঁচে গেল। পুলিশ ধর-পাকড় শুরু করল, গ্রামে-গঞ্জে এত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল যে লোকে দিশাহারা হয়ে গেল। ওখানকার সমস্ত পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হল। ২৪ মার্চ কোনো স্ত্রীলোক ঘরের বাইরে বের হল না। খেতে কাটা-ফসল পড়েছিল, তা তুলে নিয়ে গোলাঘরে রেখে দেওয়ার কেউ ছিল না। থানাতে গরু-মোষ ভুসি আর জল ছাড়াই বাঁধা ছিল। পরের দিন কাশ্যপজী খবর পেয়ে পশুদের জল আর ভুসি দেবার ব্যবস্থা করলেন। স্কুল থেকে ছাত্রদের নিয়ে ফসল গোলাঘরে তোলালেন আর সেই সঙ্গে গ্রামের আবর্জনা পরিষ্কার করালেন। মেয়েদের সাহস জোগালেন, গ্রামের পাহারায় থাকলেন সারা রাত।

বই [লেখা] শেষ হল। ১১ এপ্রিল আমি প্রয়াগ গিয়ে বইখানি লা-জার্নাল প্রেসে কম্পোজ করার জন্য দিয়ে এলাম। আবার পাটনা গেলাম। সেখানে আমার তিব্বত যাবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। সনাঠী গ্রামে 'মুজফ্‌ফরপুর জেলা সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, আমাকে তার সভাপতি করা হয়েছিল। ১৭ এপ্রিল সেখানে পৌঁছলাম। তারপর মুজফ্‌ফরপুর ফিরে গেশের সঙ্গে শিলিগুড়ি রওনা হলাম। শিলিগুড়িতে সাড়ে নটার সময়ে মোটরগাড়ি ধরলাম আর আড়াই ঘণ্টায় কালিম্পং পৌঁছে গেলাম। সোভিয়েত দেশ থেকে ফেরার পরে সরকার আমার বিষয়ে খুবই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের জায়গাগুলোতে সরকারের লোক খুব পেছনে লেগে থাকত। কালিম্পঙে আমি পৌঁছবার এক ঘণ্টা পরেই পুলিশের লোক সেখানে এসে গেল এবং জানতে চাইল মুজফ্‌ফরপুর থেকে যাঁর আসার কথা তিনি এসেছেন কিনা। আমি জানিয়ে দিলাম যে, এসে গেছেন। সারনাথেও আমি দেখতাম, গোয়েন্দা বিভাগের এক ব্যক্তি প্রায় ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকত। এ মোটেই ভালো লক্ষণ ছিল না, কারণ পুলিশই সরকারের চোখ-কান, আর আমাকে তিব্বত যাবার জন্য পোলিটিক্যাল এজেন্টের কাছ থেকে পারমিট নিতে হতো।

তিব্বতে চতুর্থবার, ১৯৩৮

গ্যাংটকে—২৩ এপ্রিল আমি গ্যাংটক পৌঁছলাম। মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি রায়সাহেব বর্মক কাজীর সঙ্গে প্রথম যাত্রায় পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। আমার সামান্য যা মালপত্র ছিল তা তাঁর বাড়িতে রেখে দিলাম। কাজী সাহেব এখন বাড়িতে ছিলেন না কিন্তু তাঁর কাছে আমি খবর পাঠিয়ে ছিলাম। তারপর ব্রজনন্দনবাবুর সঙ্গে দেখা করে পলিটিক্যাল এজেন্টের সহায়ক সোনম্ কাজীর কাছে গেলাম। তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন, 'কাল সাহেবকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে খবর দেব।'

আমি ফিরে এসে বর্মক কাজীর বাড়ি গেলাম। শুনলাম তিনি আমার জিনিসপত্র

ব্রজনন্দনবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর জন্য আমার দুঃখ করার কোনো দরকার ছিল না, পুলিশ যেভাবে তৎপরতা দেখাচ্ছিল তা থেকে তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে, এ কোনো বিপজ্জনক লোক। ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করা লোককে বিপদে ফেলা ঠিক নয়। এসব ছাড়াও তিনি ছিলেন দেশীয় রাজ্যের একজন কর্মচারী। যেখানে আইন-কানুনের কোনো কাজ ছিল না। ইংরেজ শাসক বলতে হয় তাই বলে দেয় যে, এখানকার সব কাজ তো রাজার হাতে। আসলে রাজার স্বেচ্ছাচারের আড়ালে তারা নিজেরা স্বেচ্ছাচার চালায়। দেশী এস্টেটের রাজার তো আরও মুশকিল, তারা তো ছিল ইংরেজ রেজিমেন্টের হাতের পুতুল। ব্যভিচার-দুরাচার যতই করে যাক না কেন, এ ব্যাপারে মানুষ থেকে সে পশু হয়ে গেলেও কোনো প্রশ্ন উঠত না, কিন্তু যেখানে সে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের বিরুদ্ধে সামান্যও কোনো কথা বলে সেখানে আদালত-কাছারি সাক্ষী-সবুদেরও দরকার হয় না, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজা সাহেবকে রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়। এরপরে বেচারা বর্ষক কাজীকে দোষী ভাবা ঠিক নয়। আমি ব্রজনন্দনবাবুর কাছে গেলাম। চাইছিলাম যে জিনিসপত্র নিয়ে কোনো মন্দির বা ধর্মশালায় উঠব। ব্রজনন্দনবাবু বললেন, 'আমি অন্য জায়গায় যেতে দেব না।' আমি বললাম, 'এটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। আপনি রাজ্যের স্কুলের কর্মচারী।' তিনি বললেন, 'আপনার চলে যাওয়া আমার পক্ষে ভীষণ অপমানের হবে। আমি আর কোনো যশের কাজ তো করি নি, কোনোরকমে পেট চালাচ্ছি। আপনি আমার মন আর আত্মসম্মানের কথা ভেবে আমাকে বিপদেই পড়তে দিন। আমি নিরুপায়।'

তাঁর ঘরের সামনেই ছিল থানা, থানার একজন লোক সব সময় আমাকে দেখতে থাকত। আমার নিজের জন্যে তো কোনো চিন্তা ছিল না, কিন্তু বন্ধুর কথা ভেবে অবশ্যই একটু খারাপ লাগত।

পরের দিন (২৪ এপ্রিল) বাবু সোনম্ কাজীর চিঠি এল আর আমি সাড়ে ছটার সময়েই পলিটিক্যাল এজেন্টের কাছে চলে গেলাম। মিস্টার গোর্ড এমনিতে মিশুকে লোক তো ছিলেন না, তবে আমি আমার কাজ সম্বন্ধে জানালাম। তিনি এটাও জানতেন যে, বিহার সরকার আর ভারত সরকার এ ব্যাপারে লেখালেখি করছে, তৎকালীন বিহার গভর্নর আমার তিব্বত-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের খুব প্রশংসা করেছিলেন, সেটা সোসাইটির জার্নালে ছাপা হয়েছিল। আমি সেটাও তাঁর হাতে দিলাম। ১০, ১৫ মিনিটেই আমার কাজ হয়ে গেল। তিনি পারমিট দিতে আদেশ দিলেন। ফিরে আসার পর দেখলাম পুলিশের চেহারা একেবারে বদলে গেছে।

পরের দিন (২৫ এপ্রিল) পারমিট এসে গেল আর সেই দিনই সন্ধেয় আমি কালিম্পঙে চলে এলাম।

কলকাতা থেকে ফটোগ্রাফির জিনিসপত্র আনার ছিল। তাই ২৭-২৯ এপ্রিল ওখানেই কাটল। পয়লা মে আমি শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পঙের উদ্দেশে রওনা হলাম। ৮ মাইল যাওয়ার পর, ইরানে যেমন হয়েছিল সেই রকম, মোটরের একটা চাকা সোজা বেরিয়ে গেল। এখানেও বাঁচোয়া এই যে, পাহাড়ে পৌঁছনোর আগেই এই দুর্ঘটনা ঘটল।

কালিম্পং থেকে গেশে আর অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে আমি ৪ মে রওনা হয়েছিলাম এবং ৬

মাস পর ৩ অক্টোবর গ্যাংটকে ফিরেছিলাম। এটা আমার চতুর্থ তিব্বত-যাত্রা ছিল। এতে আমি অনেক প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম। তিব্বত সরকার সমস্ত পুরনো গ্রন্থাগারে তাদের লাগানো সীলমোহর ভেঙে জিনিসপত্র দেখানোর আজ্ঞা দিয়ে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে চড়ে যাওয়া এবং মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিটি জায়গায় আমাকে ৩টি ঘোড়া ও ৩টি গাধা দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, আর কাজও হয়েছিল অনেক। যত কাজের প্রস্তুতি আমার কাছে ছিল তত কাজ হয়নি। এই পুরো যাত্রায় যত ঝামেলা আর মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হল তা লিখে বই আরও বড় করার দরকার নেই। কিন্তু এরকম যাত্রার আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল আর আমি দেখেছিলাম যে, তার জন্য ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে দোষ দেওয়া বৃথা। দোষ ছিল, সঠিক ব্যবস্থাগুলোর একত্রিত না হওয়ার। আমি যদি আরও চার-পাঁচটা কথা খেয়াল রাখতে পারতাম, তাহলে যাত্রা আরও সফল হতো। প্রথম কথা হচ্ছে, তিব্বতে সুকুমার লোককে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যে লোক শহুরে আরামের জীবনে মানুষ হয়েছে তাকে যদি সাহসীও মনে হয়, তবু সে থাকতে পারবে না, কেননা শহরের সাহস আর গ্রামের সাহসে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আর তিব্বত-যাত্রায় তো তার চেয়েও শতগুণ সাহস দরকার হয়। যে মানুষ হিমালয়-পারের এই দুরূহ জায়গাগুলোতেও তার আগের জীবনের পুরো বাতাবরণ নিয়ে যেতে চায়, তাকে অবশ্যই অসন্তুষ্ট হতে হবে। দ্বিতীয় কথাটা হল, যে যাবে হয় তাকে আগে থেকেই এমন কোনো স্থায়ী জীবিকায় যুক্ত থাকতে হবে যাতে সে অযোগ্য হয়ে পড়লে তার স্থায়ী ক্ষতির ভয় থাকবে অথবা সে-ও সেই পথের ফকির এবং কাজের গুরুত্ব ততটাই অনুভব করে যতটা করেন আপনি। তৃতীয় কথা হল, সমাজের অনুশাসন মেলে চলা। যদি একজন লোক অনুশাসনকে অবহেলা করতে শুরু করে এবং তা সংশোধন করার চেষ্টা না করে তাহলে সেই রোগ অন্যের মধ্যেও না ছড়িয়ে থাকে না। চতুর্থ কথা, তিব্বতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে মানুষ আর মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য খচ্চর-ঘোড়া পাওয়া ততটা সহজ নয়। আমি শুধু প্রথম যাত্রায় দুটো খচ্চর কিনেছিলাম আর সে-সময় কোনো অসুবিধে হয় নি, কেন না ধর্মকীর্তি খচ্চরগুলোকে সামলাতেন, আমিও দেখাশোনা করতাম। সেটা এই জন্য সম্ভব ছিল যে তখন এত লেখা বা ফটো তোলার কাজ ছিল না। আর আমি ঙোর্-এর মতো জায়গায় যাই নি, যেখানে দাম দিলেও ঘাস-ভুসি পাওয়া যায় না। যদি তাদের আপনি চরতে ছেড়ে দেন এবং তারা কারো খেতের কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে তাদের ঠ্যাং না ভেঙে ছাড়বে না। সমতলের সহিস এখানে কাজে লাগে না, কেননা তারা না ভাষা বুঝবে আর না তারা লোকজনের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা করে কাজ করতে পারবে। নিজের খচ্চর না নিলে ভাড়ার খচ্চরের জন্য কখনো কখনো কয়েক হপ্তা এক জায়গাতে থেমে থাকতে হবে। এর ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচার একটাই উপায় হচ্ছে, আপনি পুজো-উপহারে ওখানকার বড়-মানুষদের প্রচুর টাকা ঘুষ দিতে পারেন. যে-কাজের জন্য আপনার কাছে পাঁচ-সাত হাজার নয়, আরো বেশি টাকা থাকা দরকার। পঞ্চম কথা—সঙ্গীর অন্যান্য ব্যাপারে রুচি ততটাই থাকা দরকার যতটা এই কাজ করতে গিয়ে অন্যান্য ব্যাপারে আপনার রুচি রয়েছে। নইলে সে নিজের কাজেও সময় দিতে থাকবে আর মূল কাজে ফাঁকি পড়বে।

—১৯৩৮—

যাক্‌গে, কলকাতা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আমরা কালিম্পং পৌঁছলাম আর ৪ মে দশটার সময় তিব্বত রওনা হলাম। মানুষ এবং বোঝা বওয়ার জন্য ভাড়ায় খচ্চর পাওয়া গিয়েছিল। ৭ তারিখে আমরা লিঙতম্ থেকে সামনে এগোলাম, খাড়া চড়াই এল। অধিকাংশ রাস্তা খাড়া পাথর জুড়ে জুড়ে, বানানো হয়েছিল, খচ্চরের পা ফসকে গেলে বাঁচার আসা থাকত না। আমাদের খচ্চরওলার একটি খচ্চর পড়ে গিয়েছিল আর তার এমন চোট লেগেছিল যে, আমরা যখন ওখান থেকে এগোলাম তখন মনে হয়েছিল বাঁচার আশা নেই। খচ্চরওলা তাকে ওখানেই ফেলে রেখে চলল।

৯ মে নথঙ্ থেকে আমরা সকালেই বেরিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ উৎরাই-এর পর চড়াই শুরু হল। ওপরে চারদিকে বরফ ছিল, একদিকে ছিল একটা সরোবর। লোকে বলছিল ওর মধ্যে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সব দেখা যায়। সামনে এল ২৪ হাজার ৩০০ ফিট উঁচু জালেপ্-লার ডাঁড়া। আকাশে মেঘ ছুটছিল কিন্তু সেদিন তুষারপাত হল না। উৎরাই ধরে নামার পথে আমরা সেদিন রিন্‌ছেনগঙ-এ পেঁছলাম। জালেপ-লাই হচ্ছে তিব্বতের সীমা—এটা আমি জানিয়েছি। ১১ মে আমি ফরী পৌঁছে গেলাম। দ্বিতীয় দিন আমার জ্বর এল। পরের দিনও তা ১০৩ ডিগ্রি পর্যন্ত থাকল। জ্বর ছাড়ার জন্য এখানে অপেক্ষা করতে পারছিলাম না, কেন না এখানে থাকলে দ্রুত : জ্বর ছাড়ার আশা ততটা ছিল না—যতটা আশা ছিল সমতলের কোথাও এবং কোনো গরম জায়গায়।।য়গায়। ১৫ মে ডুলি[১] ভাড়া করা হল এবং আমি আমার সঙ্গীদের সাথে গ্যানচী রওনা হলাম। ডুলিতে শরীর খুব দুলছিল, যার ফলে ক্লান্তিবোধও হচ্ছিল আর খিদে তো একেবারেই পাচ্ছিল না। ২১ মে আমরা গ্যানচী পৌঁছলাম। তিন-চার দিন এখানেই বিশ্রাম করতে হল তারপর শরীর সুস্থ হয়ে গেল। লাসা থেকে আমাদের জন্য কেনা তিনটি খচ্চর চলে এল আর তিব্বতী সরকারের চিঠিও। এই চিঠি অনুসারে আমরা এখন ৩টি গাধা এবং ৩টি ঘোড়া নির্দিষ্ট ভাড়ায় নিতে পারতাম। এই প্রথাকে 'তঊ' বলা হয়। এটা এক ধরনের বিনে পয়সার কাজ। এক গ্রামের তঊ সামনে কোন গ্রামে বদলে যাবে এটা কয়েকশ বছর আগে থেকেই স্থির হয়ে রয়েছে। বদলানোর গ্রামকে বলা হয় 'সচী'। সচী কাছেও হয়, দূরেও হয়। নতুন ঘোড়া-গাধা জমা করতে একটু সময় লাগে, যদি সচী খুব কাছে হয় তাহলে এক দিনের রাস্তা দু-তিন দিন লেগে যায়।

শলু (২৭ মে—২৮ জুন)—২৭ তারিখে আমরা শলু পৌঁছে গেলাম। ২৮ তারিখে' গ্রন্থাগার খোলা হল। প্রথম বছর যে সমস্ত বই পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে থেকে দু-তিনটে বই উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নতুন বইও পাওয়া গেল। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জ্ঞানশ্রীর লেখা বারোটি রচনা আছে। 'যোগাচারভূমি'র খণ্ডিত অধ্যায়টিও এখানে পাওয়া গেল। হাতে লেখা তিব্বতী গ্রন্থগুলোতে ছগ-লোচবার জীবনী

---

[১] মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দটি 'দণ্ডী', যার অর্থ দুটো দণ্ডের ওপরে বসানো ঢাকা দেওয়া চেয়ার। এক্ষেত্রে ডুলি। পাহাড়ের ওপরে মানুষ বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।—স.ম.

—১৯৩৮—

পেলাম। এই বিদ্বান ১২২০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারতে গিয়েছিলেন এবং নালন্দায় রাহুলশ্রীভদ্রের কাছে ছিলেন। তিনি লিখছেন যে গরলোক (তুর্কী)-রা নালন্দাকে নষ্ট করে দিয়েছিল, তবু কিছু বাড়ি অবশিষ্ট ছিল। গরলোকের হাকিম উড়ন্তপুরী (বিহার-শরীফ)-তে থাকত। তিরহুতকে সে 'তীর্থের দেশ' বলেছে। জানা যায়, ওখানে ব্রাহ্মণদের প্রভাব খুব বেশি ছিল। শহর প্রধান বিহারের দেয়ালে নেপালী কলমে আঁকা সুন্দর চিত্র রয়েছে। কিছু চিত্র অত্যন্ত সুন্দর। শিল্পী নিজের নাম লিখেছে 'ছিম্‌পা সোনম্‌ বুম।'

১৯ জুন আমরা শিগর্চে চলে গেলাম। সামনে যাওয়ার জন্য সরকারের চিঠি কাছে থাকলেও শিগর্চের জোঙ্‌পোনের চিঠি নেওয়ার ছিল। তার মানে আরও দু-তিন থাকা। যাই হোক, ওখান থেকে আমরা ২৭ তারিখে পোইখঙ্‌ পৌঁছলাম এবং ২ জুলাই পর্যন্ত ওখানেই থাকলাম। ওখানকার বই আর চিত্রপটের অনেকগুলো ফটো তুললাম। তারপর শিগর্চে ফিরে এলাম। ৫ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত বেকার বসে থাকতে হল, কেন না যাকে মালপত্র নেবার জন্য গ্যান্‌চী পাঠিয়ে ছিলাম সে ওখানেই বসে ছিল। ১৪ জুলাই আমি মধ্য তিব্বতের অধিকাংশ মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে লিখেছিলাম—'তিব্বতের মানুষ না জংলী, না সভ্য। জল খাওয়ার মতো মিথ্যে বলতে অভ্যস্ত। বড় থেকে ছোট পর্যন্ত সবাই এই রকম। কিন্তু একথা তিব্বতী উপজাতি অম্‌দো খম্‌বা আর লাদাখিদের সম্বন্ধে বলা যায় না। কৃতজ্ঞতা আর বিনয়ের অভাব রয়েছে তাদের মধ্যে। প্রকৃত বন্ধু পাওয়া প্রায় অসম্ভব, সাহসী নয়, প্রতারিত করে মারতে পারে—তাও সামনে থেকে নয়। কাজে অলস। উদ্যোগ আর সাহসের কাজে এদের তেমন মন নেই। বিহারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ার ব্যাপারেও এরা পিছিয়ে রয়েছে। সুপারিশ, আত্মীয়তা এবং অন্যান্য কারণের জন্য এরা মঠের বা সরকারী উচ্চপদে পৌঁছতেই পারে, তাহলে চেষ্টা আর পরিশ্রমের কি দরকার? এই সমস্ত বদগুণ এদের মধ্যে এল কোথা থেকে? এর জন্য দায়ী এখানকার লামারা এবং ধর্ম। লামা, মঠ, আর বড়লোকদের জায়গীর উঠে যাক। শিক্ষার সর্বজনীন প্রচার হোক তাহলে এই লোকেরা খুব তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে পারবে। কিন্তু এ সব তো সাম্যবাদই করতে পারে। তিব্বতের রাজনৈতিক যন্ত্র পরিবর্তন করতেই সময় লাগবে, নইলে বাকি সামাজিক, আর্থিক কাঠামো বদলাতে তাদের অসুবিধে হবে না। তিব্বতে না আছে জাতপাতের ঝগড়া আর না ধর্মের পারস্পরিক সংঘর্ষ। ওখানে যা কিছু বিভেদ রয়েছে তা ধনী আর নির্ধনের।'

ঙোর্‌ (৩১ জুলাই—১৫ আগস্ট)—ঙোরে এবার খচ্চরদের খাবার এবং জ্বালানির অসুবিধে হলো। কেউ পাথর মেরে মেরে আমাদের দুটো খচ্চরের পা খোঁড়া করে দিয়েছিল। ভাগ্যিস চোট বেশি লাগেনি। খাবারের অসুবিধের জন্যে আমরা ওদের শিগর্চে পাঠিয়ে দিলাম।

নরথঙ্‌ (১৬-২৮ আগস্ট)—১৬ আগস্ট আমরা নরথঙ্‌ চলে গেলাম আর এক গৃহস্থের

বাড়িতে উঠলাম। আগের দিন প্রচুর শিলাবৃষ্টি হয়েছিল। তন্ত্রমন্ত্র-সাধক লামা তা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শিলাবৃষ্টির দেবতার ওপর তার কোনো প্রভাব পড়েনি। উঁচু পাহাড় থেকে শিলা এবং জলের প্রবল ধারা নেমে এল। আমাদের বাড়ি থেকে দেড়-দু ফার্লং ওপরে অবস্থিত নালা দুটো ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, যার ডানদিকের ধারার বাঁদিকের তটে ছিল আমাদের বাড়ি। বাড়ির লোকেরা ত্রাহি ত্রাহি করছিল আর ভগবানকে ডাকছিল। জলস্রোত যদি আমাদের দিকের নালায় আসতো, তাহলে ঐ বাড়ি গলে শুকনো কাগজের মত বয়ে চলে যেত। আমি দৃঢ় হয়ে ওখানেই থেকে গেলাম—বাড়ির লোকেরা সেইজন্যে খুব সাহস পেল। আমি বললাম, 'আমার কাছে এইসব ভারতীয় ধর্মপুস্তক আছে। এটা কখনই হতে পারে না যে ভগবান এই বাড়িটিকে ধ্বংস করবেন।' এবং সত্যিই জলোচ্ছ্বাস ডানদিকের নালার রাস্তা নিল না। নরথঙে কোনো তালপাতার পুঁথি ছিল না। তবে এখানে কিছু বড় বড় ভারতীয় চিত্রপট ছিল, যেগুলোর ফটো নেওয়া হল। স্লেট পাথরের ওপর ৮৪ সিদ্ধের মূর্তি খোদাই করা ছিল। সেগুলোরও ফটো নেওয়া হল। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের নমুনার ছাঁচ প্লাস্টার অব প্যারিসে তোলা হল। এইসব করার পর সাক্যার উদ্দেশে রওনা হলাম এবং শোঙ্‌লা হয়ে ১ সেপ্টেম্বর সাক্যায় পৌঁছলাম।

সাক্যায় (১-১৫ সেপ্টেম্বর)—পয়লা সেপ্টেম্বর দুপুরে আমরা সাক্যায় ফুনছোগ্‌ প্রাসাদে পৌঁছলাম। কুশো ডোনির্‌ ছেন্‌-পোর ওখানে থাকলে বেশি আরামে থাকা যেত কিন্তু ফটো তোলার জন্যে আমাদের এখানে আসতে হতো সেইজন্যে আমরা ওখানে গেলাম না। ফুনছোগ্‌ প্রাসাদের লামা এখন সাক্যার মোহান্ত। অনেক বছর পর এই প্রাসাদের হাতে প্রভুত্ব এসেছিল। তাই ঘরগুলোর নতুন করে মেরামত, নতুন ঘর নির্মাণ এবং নতুন জিনিস তৈরি করান ইত্যাদি কাজে লামার মন অস্থির ছিল। অনেক ছুতোর, স্বর্ণকার এবং চিত্রকর কাজ করছিল। সব ঘরগুলোই এদের দিয়ে ভরে গিয়েছিল। লামা বিশেষ স্নেহের সঙ্গে আমাদের স্বাগত জানালেন কিন্তু আমাদের থাকার ব্যবস্থা কোন ঘরে হবে এই ব্যাপারে তিনি অসুবিধেয় পড়লেন। সাধারণ একটা ঘর খালি করান হলো এবং আমরা সেই ঘরে জায়গা পেলাম। এখানে দু-সপ্তাহ ধরে বইগুলোর ফটো তুললাম, কাজে খুব ঢিল পড়ছিল। কুশো ডোনির্‌-ছেন্‌-পো মব্‌জা গিয়েছিলেন। চামকুশো এখানেই ছিলেন এবং ১৩ সেপ্টেম্বর যখন আমি ওখানে গেলাম, তখন কেন আমি ওখানে উঠলাম না বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। আমি আমার অসুবিধের কথা তাঁকে বললাম। ১৫ তারিখ ডোনির্‌-ছেন্‌-পো এসে যাওয়ায় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী দিকীলা এবং পৌনে দু-বছরের নামহীন কন্যাও এসে গিয়েছিল। ভ্রাম্যমান অপরিচিত লোকের কাছে ছোট বাচ্চা আসবে কেন? যদিও চামকুশো ওকে আমার কাছে আনার জন্যে অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু সে কাঁদতে আরম্ভ করল। মেয়েটি ছিল অত্যন্ত সুন্দরী এবং ডোনির্‌-ছেন্‌-পো বলছিলেন যে সে খুবই সমঝদার। বৃদ্ধ বয়সে নিজের একমাত্র কন্যার প্রতি পক্ষপাতিত্ব খুবই স্বাভাবিক। আমি বললাম, 'আপনি যদি একে

লেখাপড়া শেখান তাহলে বিদূষী হবে।' তিনি বললেন, 'আমাদের বাড়িতে তো এই একটিমাত্র সন্তান, একে আমরা নিশ্চয়ই পড়াব।' আমি আগের যাত্রার সময় লিখেছিলাম যে ডোনির্-ছেন্-পো এবং নতুন মোহান্তরাজের মধ্যে আগে থেকেই মনকষাকষি ছিল। ডোনির্-ছেন্-পো এর জন্যে খুবই দুঃখিত ছিলেন। চাঙ্‌গুয়ায় তাঁর প্রচুর জায়গাজমি ছিল। মব্‌জাতেও অনেক সম্পত্তি ছিল। এখন তিনি ৬০ বছরেরও বেশি বয়সের বৃদ্ধ। তিনি এখন এস্টেটের কাজ ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতে চাইছিলেন। কিন্তু নতুন মোহান্ত তাঁকে তা করতে দিলে তবে তো। বলছিলেন, 'আমার না যাবার স্বাধীনতা আছে আর না কোনো কাজও পাচ্ছি।' আমি ভারতে আসতে বলায় তিনি খুব করুণ স্বরে বললেন, 'আমার ভারতের তীর্থস্থান দর্শন করার বড়ই ইচ্ছে কিন্তু ছুটি পাচ্ছি কোথায়?'

১৬ সেপ্টেম্বর সাক্যা থেকে আমার বিদায় নেবার ছিল। প্রথমে মোহান্তরাজের কাছে বিদায় নিলাম, পরে তারাপ্রাসাদের দুই ভাই-এর কাছে গেলাম। তারাপ্রাসাদও আশার আলোয় ঝলমলে হতে চলেছে দেখে আমি খুব খুশি হলাম। আগে দামোর কোনো সন্তান ছিল না। সে নিজেই নিজের বোনকে সতীন করেছে এবং ঐ নববধূ এখন আসন্ন প্রসবা। পরে কুশো ডোনির্ ছেন্-পোর বাড়ি গেলাম। আবার যে তিব্বত আসতে পারবো সে আশা খুবই কম ছিল, কেননা প্রথমত, এবারে ফিরে গিয়ে আমার রাজনীতিতে প্রবেশ করার ছিল, সেই কারণে ভারতে ইংরেজ শাসন থাকতে কে আমাকে এদিকে আসতে অনুমতি দিত? দ্বিতীয়ত, আমার সঙ্গে এতগুলো বই-এর ফটো নিয়ে যাচ্ছি যেগুলোর সম্পাদনা এবং প্রকাশ করতে দশ-পনের বছর দরকার ছিল। যদি তিব্বত আবার আসা হয়, তাহলে ডোনির্-ছেন্-পো যে তত দিন বেঁচে থাকবেন তার সম্ভাবনাও খুব কম ছিল। সেইজন্যে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। চামকুশো এবং দিকীলা এখন শারীরিক সুস্থ ছিল। তার কন্যাও তো মাত্র পৌনে দু-বছরের। যদি আবার আসা হয় তো এদের সঙ্গেই দেখা হবার সম্ভাবনা রইল। দেখা-সাক্ষাৎ করার পর তিনটের সময় সাক্যা থেকে রওনা হলাম।

জীবন বিপদে—দ্বিতীয় দিন মব্‌জা পৌঁছলাম। তউয়ের রাস্তা ডোঙ্‌লা হয়ে অন্য একটি লা (জোত) থেকে অনেক ঘুরপথে ছিল। কুশো ডোনিলা একদিন তাঁর নিজের বাড়িতে রাখলেন এবং ১৯ সেপ্টেম্বর আমরা সেখান থেকে রওনা হলাম। ২২ তারিখে আমরা যখন ডোব্‌থা লা পার হয়ে নিচে নামছিলাম তখন রাস্তায় কয়েকটা তাঁবু খাটান রয়েছে দেখলাম। কাছেই কয়েকটা ঘোড়া চরছিল। আমরা তো আগেই ছেগা গ্রামে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু আমাদের আরো সঙ্গীরা একটু পিছিয়ে পড়েছিল। তাঁবুর একটি লোক তাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। আমরা এটাকে একটা সাধারণ ব্যাপার ভাবলাম। গাধা এবং বলদের ওপর চাপিয়ে জিনিসপত্র আগেই রওনা করে দেওয়া হলো এবং আমরা চা খেয়ে সাড়ে সাতটার সময় রওনা হলাম। এগিয়ে গিয়ে খুব বিস্তৃত নির্জন প্রান্তর পেলাম। ষোল-সতের মাইল পর্যন্ত কোনো গ্রাম ছিল না। তিন মাইল চলার পর কয়েকজন গাধার মালিকদের সঙ্গে দেখা হল। ওরা বলল, 'সামনের খালে ডাকাতরা

রয়েছে, খুব সজাগ হয়ে যাবেন। ওরা আমাদের ছাতু, মাংস, ছঙ্ আর গাধাদের পিঠের গদি ছিনিয়ে নিয়েছে।' আমাদের তিনজন সঙ্গী মাইলখানেক পেছনে ধীরে-সুস্থে আসছিল। আমার সঙ্গে সাক্যা থেকে আসা লোকটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাচ্ছিল। আমাদের দুজনের কাছে একটাই পিস্তল ছিল এবং আমার সাথী পিস্তল চালাতে জানত না। আমি পিস্তলের কাঠের খাপ থেকে পিস্তলটি নিজের হাতে নিলাম। পিস্তলের খাপ ওর কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো, যাতে ডাকাতরা ভাবে যে আমাদের দুজনের কাছেই পিস্তল আছে। সাথীর কাছে লম্বা তিব্বতী তলোয়ারও ছিল। আমার ভয় করছিল ডাকাতরা পাছে আমাদের মালপত্তর কেড়ে না নেয়—এই মালপত্তরের সঙ্গে মাসখানেক ধরে তোলা ফটোগুলো ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি সামনে এগোলাম। কিছুটা আরো এগোলে এক ঘেসেড়ের সঙ্গে দেখা হল। সেও বলল, 'সামনে ডাকু আছে, সজাগ হয়ে যেও।' একটা ছোট্ট নদী পেরিয়ে যাবার পর একটা বালির ঢিপি এলো। ওখান থেকে এগোলে ডাকাতদের তাঁবু রাস্তার কাছেই পাওয়া গেল। ওদের আটটা ঘোড়া সেখানে চরছিল। আমি পিস্তল হাতে সামলিয়ে রেখে হাঁটছিলাম। ডাকাতদের মধ্যে থেকে একজন আমাদের কাছে এলো। সে আমার সঙ্গীর কোমরে লম্বা তলোয়ার এবং আমার হাতে পিস্তল দেখলো। কোথা থেকে আসছে জিজ্ঞেস করায় আমার সাথী বলল, 'সাক্যা থেকে আসছি।' ওরা আমাদের ওখানেই ছেড়ে চলে গেল। আরো দুটো বালির ঢিপি পাওয়া গেল এবং গাধাওলাদের দূর দিয়ে যেতে দেখলাম। আমি ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের কাছে গেলাম। ওরা বলল, 'আমাদেরও একজন লোক জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। আমরা বলে দিয়েছি যে সাক্যার মোহান্তের জিনিস আছে। আমরা আগে আগে যাচ্ছি।' ভালো হলো যে আমরাও সাক্যার নামই নিয়েছিলাম। ডাকাতরা মালপত্তরে হাত দেয়নি। পিছনে থাকা তিনজন সঙ্গীর কাছে দুটো পিস্তল ছিল কিন্তু জানি না ওরা ডাকাতদের বিষয়ে জেনেছে কিনা। আমি আমার সঙ্গীদের গাধাদের সঙ্গে যেতে বলে দিলাম এবং হাতে পিস্তল নিয়ে খচ্চরকে পিছনের দিকে ঘোরালাম। ঢিপির কাছে এসে তার আড়ালে পিস্তল সামলিয়ে খুবই উৎসুকতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম যে, কোনো আওয়াজ পাওয়া মাত্র আমি ডাকাতদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। কিন্তু আমার ভুল হচ্ছিল। আমি যে ঢিপির আড়ালে ছিলাম সেখান থেকে একশো গজ দূরে আরেকটা ঢিপি ছিল, সেটার পর ডাকাতদের আস্তানা ছিল। সেখানে যদি কিছু ঘটতোও আমার কাছে কোনো আওয়াজই আসতে পারত না। আমি এটা জানতাম না। আমি তো ভাবছিলাম যে আজকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে হবে। যত বেশি বিপদ ছিল তত বেশি আমার হৃদয়ে নির্ভরতা এবং উৎসাহ ছিল। সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুতগতিতে হচ্ছিল। কিছুক্ষণ বাদে সঙ্গী এল। গেশে বললেন, 'জিজ্ঞেস করায় আমি বলে দিয়েছি সাক্যার লামার লোকেরা সবাই আরো পিছনে আসছে।'

আমরা কিছুক্ষণ চলার পর তঙ্গরা গ্রামে সাড়ে বারোটায় পৌঁছলাম। ছেগা থেকে আসা গাধাওলারা নিজেদের গ্রামে ফিরে গেল কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদে দেখলাম যে ওরা আবার ওখানেই ফিরে এল। ওরা বলল, 'গ্রাম থেকে এক মাইল দূরে নদীর ধারে

ডাকাতরা রয়েছে। আমরা ভয় পেলাম যদি ওরা আমাদের ঘোড়া এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কেড়ে নেয়, তাই আমরা ফিরে এলাম।' গোয়া (মোড়ল) এই কথা শুনলো। বন্দুকধারী-ঘোড়সওয়ার ডাকাতদের জন্য ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। রাত্তিরে সমস্ত গ্রাম সজাগ হয়ে জেগে রইল। চেনে বেঁধে রাখা পুরো গ্রামের বড় বড় কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হল। আমরা নিজেদের পিস্তল যত্ন করে রেখে ছাতের ওপর শুলাম—নিজেদের মধ্যে পাহারা দেওয়া ভাগ করে নিলাম। ঐ রাত্তিরে কি ঘুম আসতে পারতো?

পরের দিন (২৪ সেপ্টেম্বর) শুনলাম যে ডাকাতদের ঘোড়া তঙ্‌গরার খেতে চরছিল। ভয়ের চোটে কেউ কিছু বলতে গেল না। আমরা গ্রাম থেকে আরো কিছু লোক নিলাম এবং সাড়ে দশটায় খম্বায় জোঙ্‌ পৌছলাম। আমাদের সামনে ভারতে ফেরার দুটো রাস্তা ছিল—একটা তো ঘুর পথে ফরী হয়ে কালিম্পং পৌছবার, দ্বিতীয়টা ছিল লাছেন যাবার রাস্তা—যা দিয়ে আমরা একদিনেই তিব্বতের সীমা পার করতে পারতাম। ডাকাতরা এখনও আমাদের অনুসরণ করছিল তাই জন্যে আমরা ফরীর রাস্তার চিন্তা ছেড়ে দিলাম। খম্বায় দুজন জোঙ্‌পোনের সঙ্গেই দেখা করলাম। সরকারী চিঠিটা তাঁরা রেখে দিলেন। রেডিঙ্‌ লামার চিঠিটা আমার নামে ছিল। সেটা দেখার পর তাঁদের ওপর বিশেষ প্রভাব পড়লো। নিজেদের বাড়িতেই খাওয়ালেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত গল্পস্বল্প হতে থাকল। তিনি কিরু গ্রামের লোকেদের আমাদের য়াথঙ্‌ পর্যন্ত 'তউ' দেবার জন্যে লিখেছিলেন। দুঘণ্টা চলার পর আমরা কিরু পৌছলাম। ওখানে লাছেন-এরও কিছু ঘোড়াওলা এসেছিল। ওদের কাছ থেকে জানা গেল যে ডাকাতরা ওপরের পাহাড়ের দিকে এসেছে। গেশের বক্তব্য ছিল যে ওরা এখনও আমাদের অনুসরণ করছে। এটাও জানা গেল যে ওদের কাছে তলোয়ার ছাড়া কেবল তিনটে পলতের বন্দুক আছে। পলতের বন্দুক যদিও বা দূর অব্দি মারতে পাবে, কিন্তু আট ঘোড়ার পিস্তলের সামনে ওদের সাহস হতো না। ২৫ সেপ্টেম্বর মালবাহী ইয়াকগুলোর আসতে দেরি হল এবং সেইজন্যে আমরা দুটোর পর রওনা হলাম। লাছেন জোত পার হবার সময় বর্ষা অথবা বরফের সম্মুখীন হতে হয় নি—কিন্তু হাওয়া খুব জোরে চলছিল এবং সবাইর খুব শীত করছিল। কয়েক মাইল নিচে নেবে আমরা রাত্তিরে ডোঙ্‌গুকেতে রয়ে গেলাম। কিন্তু মালপত্তর ওখান অব্দি পৌছতে পারেনি। ২৬ সেপ্টেম্বর চা খেযে তৈরি হতে হতে মালপত্তরও পৌছে গেল এবং সেইদিনই আমরা য়াথঙ পৌছে গেলাম। চীপোন্‌ বঙ্‌গ্যালের ছেলের বাড়িতে উঠলাম। গৃহপতি খচ্চরগুলো কিনে নেবার কথা বলল। তিনটে খচ্চরের জন্যে সাড়ে তিনশো টাকা দামটা কম। কিন্তু প্রথম যাত্রার সময় দুটো খচ্চরকে নিয়ে আমার শিক্ষা হয়েছিল। আমি ফরীতে যে দামে বিক্রি করতে পারতাম কালিম্পঙে তার চাইতে অনেক কম দাম পেলাম এবং হয়রানি আলাদা। গৃহপতি সাড়ে তিনশো টাকা দাম এবং অতিরিক্ত আমাদের তিনটে এবং ওর চারটে খচ্চরকে গ্যাংটক পর্যন্ত পাঠিয়ে দেবার কথা বলল। আমরা তাতে রাজি হয়ে গেলাম।

২৮ তারিখ আমরা লাছেন পৌছে গেলাম। জানতে পারলাম যে ফিনল্যান্ডবাসী বৃদ্ধা ধর্মোপদেশিকা তাঁর বাংলোয় আছেন। আমরাও তাঁর কাছে গেলাম। বেচারি বৃদ্ধা তিরিশ

বছর আগে বিশেষ উৎসাহ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে এই পাহাড়ে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্যে এসেছিলেন। বিশেষ সফলতা তিনি পাননি কিন্তু লাছেনের অধিবাসীদের কিছু সেবা নিশ্চয়ই করেছিলেন। এখন তিনি খুবই বৃদ্ধা ছিলেন। কানেও খুব কম শুনতেন। যেকোনো সময় মারা গেলে তারপরে কে কাজ চালাবে এ কথা ভেবে নিজের দেশ থেকে একটি তরুণীকে এনেছিলেন। প্রথমে তো তিনি খ্রীস্টধর্মের ওপর লম্বা লেকচার দিলেন, পরে তরুণীটির পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, 'এ গান জানে।' আমাদের অনুরোধে তরুণীটি বাদ্যযন্ত্র হাতে তুলে জিজ্ঞেস করলো, 'কি শোনাব?' আমি বললাম, 'ফিনল্যান্ডের কোনো নিজস্ব গান শোনান।' ও দু-তিনটে গান শোনাল। তারপর আমি ফিনল্যাণ্ডের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলাম। বৃদ্ধা এবং তরুণী দুজনেই [নিজের দেশের] প্রশংসা করতে ক্লান্ত হচ্ছিল না। বৃদ্ধা বললেন, 'আগে আমাদের দেশ রাশিয়ার গোলাম ছিল কিন্তু এখন স্বাধীন। দেশকে স্বাধীন এবং সুখী দেখে আমার যা আনন্দ হয়েছে তা বলে বোঝাতে পারব না।' আমি বললাম, 'আমরা ভারতীয়রা সেটা ভালো করে বুঝতে পারি, কেননা গোলামী যে কত তিক্ত হয় তা আমরা জানি।' রাশিয়ার বিষয়ে তরুণী বলছিল, 'ওখানের লোকেরা খুব গরিব। লাখে লাখে লোক অনাহারে মারা যায়।' আমি বললাম, 'আপনি এটা অন্যের কাছ থেকে শোনা কথা বলছেন। আজ থেকে আট মাসে আগে আমি সেখানেই ছিলাম এবং আমি সেখানে কাউকে গরিব অথবা ক্ষুধার্ত দেখিনি।' বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে বললাম, 'আপনাকে কষ্ট দেবার জন্যে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা ঈশ্বর মানি না।' বৃদ্ধা খুব আঘাত পেলেন। তিনি বললেন, 'আমি বড় দুঃখ পেলাম। আমি ঈশ্বরের আলো পেয়েছিলাম সেইজন্যে ফিনল্যাণ্ড থেকে এখানে আসি। আপনাকেও ঈশ্বর যেন আলো দেন।' তরুণী আমার কথা শুনে আশ্চর্য হয়নি। তার নতুন যুগের হাওয়া লেগেছিল। সে বলল 'বৃদ্ধ লোকেরা আজকের কোনো খবরই জানেন না।'

১৯ সেপ্টেম্বর আমরা লাছেন থেকে রওনা হলাম। ২ অক্টোবর গ্যাংটক চলে এলাম। আমরা যদি ফরী যেতাম তাহলে পিস্তল সেখানেই রেখে আসতাম। খম্বাজোঙ্-এ পিস্তল কাউকে দিতে পারতাম না, সেইজন্যে গ্যাংটক পর্যন্ত নিজের সঙ্গে নিয়ে এলাম এবং এটা ছিল অস্ত্রের আইন-বিরুদ্ধ। আমি পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরকে একটা চিঠি লিখলাম এবং একটা একজন পলিটিকল অফিসাবকে আর এই বলে পিস্তলটা আমি পুলিশের হাতে দিলাম যেন সেটা গ্যানচীতে শ্রীধর্মমান সাহুর দোকান ছু-শিঙ্-শাতে দিয়ে দেওয়া হয়। ৪ অক্টোবর মোটরে করে শিলিগুড়ি এলাম এবং পরের দিন রেলপথে কলকাতা পৌঁছে গেলাম।

ষষ্ঠ পর্ব

কৃষক-মজুরদের জন্য

১৯৩৮-১৯৪২

পরিস্থিতির অধ্যয়ন

কলকাতায় আমাকে দশদিন থাকতে হল। প্রথম দিনই পত্রিকার সংবাদদাতাদের বলেছিলাম যে আমি এখন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিতে যাচ্ছি। আমি এগারো বছর রাজনীতির ক্ষেত্রের বাইরে ছিলাম। ভালোই হয়েছে যে আমি অধ্যয়ন, অনুসন্ধান এবং পর্যটনে এতটা সময় দিয়ে আমার একটা বড় ইচ্ছা পূর্ণ করেছি। আমি আগেও রাজনীতিতে নিজের মনের কষ্ট দূর করতে এসেছিলাম—দারিদ্র এবং অপমানকে আমি প্রচণ্ড অভিশাপ ভাবতাম। অসহযোগের সময়েও আমি যে স্বশাসনের কথা কল্পনা করতাম তা কালোবাজারী শেঠ বা বাবুদের শাসন ছিল না। সে-শাসন ছিল কৃষকদের এবং মজদুরদের, কেননা তাহলেই দারিদ্র এবং অপমানের হাত থেকে জনতা মুক্ত হতে পারতো। এখন তো দেশ-বিদেশ দেখার পর আরও বেশি পীড়া অনুভব করছিলাম। আমি ভারতের মত দারিদ্র আর কোথাও দেখিনি। মার্ক্সবাদের অধ্যয়ন আমাকে বলে দিল যে, বিপ্লব করার হাত হল এই মজদুর-কৃষক। তার কারণ ওদেরই সবরকম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় এবং ওদের কাছে লড়াই করে হারাবার কোনো সম্পত্তি নেই। কিন্তু এসব থাকা সত্ত্বেও যতদিন না ওরা নিজেদের একটা বলিষ্ঠ সংগঠন তৈরি করতে পারে ততদিন বিপ্লব করার শক্তি ওদের মধ্যে আসতে পারে না। ওদের সংগঠন তখনই শক্তিশালী হতে পারে যখন দিনের পর দিন নিজের পাওয়া কষ্ট লাঘবের জন্যে তারা লড়াই করে। ওদের এই লড়াই চালনা করার জন্য একটা সৈন্যসঞ্চালক গোষ্ঠী দরকার এবং এই গোষ্ঠী এমন হওয়া দরকার যার সদস্যরা যেন দূরদর্শী হয়, সব কিছু ত্যাগের জন্যে তৈরি থাকে এবং যাদের কোনো প্রলোভনই নিজের দিকে টেনে না নেয়। রাশিয়ার মজদুর ও কৃষকদের বিপ্লব এখানকার বলশেভিক পার্টি-কমিউনিস্ট পার্টি কৃষকদের লড়াইয়ের চালনা করছিল বলে সফল হয়েছিল। আমি জানতাম যে ভারতেও সাম্যবাদী আছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি ওদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাইনি। কোনো পথ আমার নিজের পথ হবে সেটা ২১ বছর আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত বিপ্লবের সংবাদ আমাকে একটা নতুন দৃষ্টি দিয়েছিল। সেটাই পরে আমাকে মার্ক্সবাদী করে এবং আমি সাম্যবাদের প্রশংসাকারী হই। কলকাতায় আমি কোনো কমিউনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। কমিউনিস্ট পার্টি সে-সময় নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু তাহলেও আমি সোমনাথ লাহিড়ীর খবর পেলাম। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন,

'বিহারে এখনও আমাদের পার্টি তৈরি হয় নি। সেখানে আমাদের সঙ্গীরা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করছে। আপনিও ওদের সঙ্গে কাজ করুন।' কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির প্রতি আমার কিছুটা রাগ হয়েছিল। আমি যখন শিগর্চেতে ছিলাম সেই সময় 'জনতা'-র একটা সংখ্যা পেয়েছিলাম যাতে মাসানীর একটা প্রবন্ধ বেরিয়ে ছিল। সেই লেখায় সোভিয়েতের বিষয়ে ভালো-মন্দ বলা হয়েছিল। সোভিয়েত আমার কাছে সাম্যবাদের একটা সাকার রূপ ছিল। সোভিয়েতের নিন্দা করে যে নিজেকে সাম্যবাদী অথবা সমাজবাদী বলে তাকে আমি প্রতারক অথবা মূর্খ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতাম না। লাহিড়ী বললেন, 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে সকলেই মসানীর মত নয়।'

আমি ১৬ অক্টোবর পাটনা চলে এলাম। তিব্বত থেকে আনা জিনিসের দেখাশোনা করলাম এবং আয়-ব্যয়ের হিসেব সোসাইটির হাতে দিলাম। এখানেই জানলাম যে ছাপরায় রাজেন্দ্র কলেজ স্থাপিত হয়েছে। ২৩ তারিখ আমি ছাপরা পৌছলাম। পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিবেদীর বাড়ি সর্বদাই নিজের বাড়ির মত। এবারেও সেখানেই উঠলাম। পরের দিন রাজেন্দ্র কলেজ দেখতে গেলাম, যার অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ দেখে আমার খুবই আনন্দ হল। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী সত্যাগ্রহের সময় থেকেই আমার পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে বাবু নারায়ণ প্রসাদ গোরয়াকোঠীতে নিজেদের পরিবারের কয়েকটি ঘরের খেত মিলিয়ে যৌথ চাষাবাদ (পঞ্চায়তী খেতী) শুরু করেছেন। আমরা ভাবতাম যে বর্তমান শাসনব্যবস্থায় যৌথ চাষাবাদ সম্ভব নয়। কিন্তু আমি এটাও জানতাম যে এই প্রকার ব্যবস্থাতেই সায়েন্সের বহু কিছু আবিষ্কারের ব্যবহার হতে পারে। ২৭ তারিখ আমি ছাপরা থেকে গোরয়াকোঠীর জন্যে রওনা হলাম। রাস্তায় জামোতে ডাক্তার সিয়াবরশরণজীর বাড়িতে নামতে হল এবং পরে গোরয়াকোঠী পৌছলাম।

নারায়ণবাবু বাড়িতেই ছিলেন। তিনি নিজের খেতগুলো দেখালেন এবং নিজের পরিকল্পনা বললেন, 'এই যৌথ চাষাবাদে চারটি পরিবার (২৯ জন) সামিল হয়েছিল এবং ওদের কাছে ৯৭ বিঘা (প্রায় ৬৫ একর) জমি ছিল। চাষ মাত্র দশ মাস আগে শুরু হয়েছিল কিন্তু এরই মধ্যে লোকেরা লাভের ব্যাপার বুঝতে পেরেছিল। আমি 'পঞ্চায়তী খেতীকা এক প্রয়াস' এই শিরোনামে একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখলাম। ২ নভেম্বর অব্দি মহারাজগঞ্জ, অতরসন, একমা, বরেজা, মাঁঝি ইত্যাদি গ্রামে ঘুরলাম এবং ওখানকার রাজনৈতিক অবস্থার অধ্যয়ন করতে লাগলাম। বেনারস, প্রয়াগও গেলাম এবং ওখানকার ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিলাম। জয়সওয়ালজীর মৃত্যুর পর খুবই ইচ্ছা ছিল যে তাঁর একটা জীবনী লিখে ফেলি। তাঁর কাগজপত্র থেকে আমি অনেক ব্যাপার নোট করেছিলাম। এইবার পাটনাতেও কিছু রসদ জোগাড় করেছিলাম। সেই ব্যাপারেই ২৪ নভেম্বর আমি মির্জাপুর গেলাম, ওখানে জয়সওয়াল পরিবার, জয়ওয়ালের ছোটবেলাকার শিক্ষক নাউ গুরু এবং অন্যান্য পরিচিতদের জিজ্ঞেস করে অনেক কথা সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু ২৯ তারিখ গয়া থেকে পাটনা যাবার সময় চামড়ার ব্যাগে রাখা

এই পুরো সামগ্রী রেল গাড়িতেই পড়ে রয়ে গেল। আবার সেইরকম পরিশ্রম করার উৎসাহ আমার আর থাকল না।

২৫ নভেম্বর ডালমিয়া নগরের মজদুরদের অবস্থা দেখতে গেলাম। রাস্তার কাছেই মেথরদের ঝুপড়ি ছিল। ঝুপড়ি বলাও ঠিক হবে না, কেননা ৪ হাত লম্বা ৩ হাত চওড়া বাঁখারির ওপর টিন, তালপাতা কিংবা বাঁখারির ছোটছোট ছাদ ছিল, বর্ষায় জল সেগুলো খুব কমই আটকাতে পারতো। ঘরের মেঝেও খুব নিচু ছিল। আমি একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'বর্ষার সময় কোথায় থাক?' স্ত্রীলোকটি বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, 'খাটের ওপর বাবু।' হয়ত ওর প্রতিবেশীর কাছে খাটও নেই সেজন্যে ওর খাট আছে বলে গর্ব ছিল। বর্ষাকালে সত্যিই ওখানে জল ভরে যেত, তাই খাট ছাড়া বসার জায়গা কোথায়? এরা ধর্মমূর্তি দেশভক্ত শেঠেব শহরের মেথর ছিল। যেসব গরিবদের রোজগার থেকে কোটি কোটি টাকা লাভ হয় তাদের এই অবস্থা। ডালমিয়া নগরের বাবুদের একটা ক্লাব আছে। সাহিত্যিক রচনা এবং অনুসন্ধানের জন্যে আমার নাম ক্লাবের সদস্যরা জানতো। ওরা সন্ধের সময় মানপত্র দেবার আয়োজন করল। এইজন্য ওরা অন্য এক জায়গায় সভা করতে চাইছিল কিন্তু শেঠজী বিশেষ উদারতা দেখিয়ে বলল, 'নিজেদেরই অঙ্গনের মধ্যে মানপত্র দাও, আমিও উপস্থিত থাকবো।' মানপত্র দেওয়া হল। আমি ইরান এবং তিব্বতেব কথা কিছু কিছু বললাম। লোকেরা রাশিয়ার কথা কিছু বলতে বললে আমি চুপ করে ছিলাম কিন্তু ওরা দু-তিনবার এ কথার পুনরুক্তি করলে শেঠজী বলল, 'এখানে রাশিয়ার বিষয়ে কিছু বলবেন না।' আমি ওখানে কিছু বললাম না। তবে হ্যাঁ, পরে ফ্যাক্টরিব মজদুরদের সভা হল সেখানে রাশিয়ার কথা বললাম। গয়া জেলার তরুণ কৃষকদের দেও-তে শিক্ষণ শিবির চলছিল। সেখানে আমারও কিছু বক্তব্য রাখার ছিল। ডালমিয়া নগর থেকে আমি সেখানে চলে গেলাম।

কৃষক সম্মেলন—সে-বছর বিহার প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন ওইনীতে (দারভাঙ্গা) হচ্ছিল। আমিও সেখানে গেলাম। শ্রী কার্যানন্দ শর্মা সভাপতি ছিলেন। অহযোগের সময় থেকে আমরা দুজনে একে অপরকে জানতাম। কার্যানন্দজী খুবই দরিদ্রাবস্থায় পড়াশোনা করেছিলেন। কলেজে পড়ছিলেন সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল এবং তিনি কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৮ বছর ধরে একইভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে থাকলেন। স্বাধীনতার অর্থ তিনি বুঝতেন দারিদ্র এবং অপমানের সমাপ্তি কিন্তু ক্রমশ তার নিজের উপলব্ধি তাঁকে জানিয়ে দিল যে নিরাকার স্বাধীনতা দিয়ে কোনো কাজ হবে না, কৃষকদের বাস্তব অসুবিধেগুলো দূর করতে হবে। তিনি কৃষকদের জন্যে অনেক লড়াই লড়েছিলেন। আজ ৩০ হাজার কৃষক তাদের বীর সভাপতির বক্তৃতা বিশেষ শ্রদ্ধা এবং উৎসাহের সঙ্গে শুনছিল। আমি আমার বক্তৃতা ছাপরার ভাষায় (মল্লিকা) দিয়েছিলাম। যদিও সেখানকার কৃষকদের ভাষা মৈথিলী কিন্তু ওরা হিন্দির চাইতে মল্লিকা বেশি বোঝে। ওইনী থেকে পুসা ৬ মাইল দূরে। ৪ ডিসেম্বর কয়েকজনের সঙ্গে আমি ওখানকার ফার্ম (কৃষি) দেখতে গেলাম। ভূমিকম্পের পর

—১৯৩৮—

এখানকার অনেকগুলো সংস্থা দিল্লী চলে গেছে কিন্তু যা কিছু দেখলাম তা থেকে বুঝলাম যে এখানকার যাবতীয় সায়েন্স সম্পর্কিত গবেষণা কৃষকদের জন্যে নয়, কেবল কাগজে ছেপে ছেপে সরকারের বাহবা পাবার জন্যে।

আমি এও জানতে পারলাম যে যারা 'কৃষকদের জয়' ধ্বনি দিয়ে কৃষকদের ভোট পেয়েছে, তারা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের জায়গায় পৌছে কিছু বলতে গেলে জমিদারদের অসুবিধের ওপরেই লেকচার দিতে আরম্ভ করে। ওইনী থেকে আমি জীরাদেঈ (৫-৬ ডিসেম্বর) গেলাম। রাজেন্দ্রবাবু এখন বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেশ-বিদেশের রাজনীতি এবং বিশেষ করে কৃষকদের সমস্যার ওপর কথা হতে থাকল। আমি এও বললাম যে, সরকারী ফার্মের দ্বারা নতুন প্রক্রিয়ার চাষের বিষয়ে অতটা প্রচার হতে পারে না, যতটা যৌথ চাষের মাধ্যমে প্রক্রিয়াগুলোর বেশি করে ব্যবহারে হবে। ওখান থেকে লক্ষ্ণৌ, গোরখপুর, প্রয়াগ ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে ২৯ ডিসেম্বর মুজফ্‌ফরপুর পৌছোই। ঐ সময় প্রাদেশিক কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বার্ষিক অধিবেশন চলছিল। বিহারের প্রতিটি জেলার কর্মকর্তারা এসেছিলেন। ঐ সময় এও দেখলাম যে আমার বক্তৃতাগুলোর নোট নেবার জন্যে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আলাদা করে এসেছেন। রাজনৈতি কর্মকর্তাদের পক্ষে এটা ভয়ের নয়, সম্মানের ব্যাপার ছিল। জয়প্রকাশবাবু এবং অন্য সাথীরা আমাকে পার্টির সদস্য হবার জন্যে বললেন। আমি মাসানীর প্রবন্ধের কথা তুলে বললাম, 'আপনাদের পার্টি যদি সোভিয়েতবিরোধী নীতি রাখে, তাহলে আমি তার সঙ্গে কি করে যুক্ত হতে পারি?' তাঁরা বললেন যে সেটা মাসানীর নিজস্ব চিন্তাধারা, তার জন্যে পার্টি দায়ী নয়। আমি মেম্বার হয়ে গেলাম। সেই সময় হরিনগরের (চম্পারন) চিনি মিলগুলোতে হরতাল চলছিল। আমি ২২ তারিখ সেখানে পৌছলাম। হরিনগর মিল কংগ্রেসী পুঁজিপতিদের কিন্তু ওখানের হরতাল দেখে মনে হল যে, দেশে স্বাধীনতার জন্যে যারা লড়াই করছে তারা কৃষকদের পিষে ফেলতে কারুর চাইতে কম নয়। মিল মালিক এবং বড় চাকুরেরা মজদুরদের দাসের চাইতে কিছু বেশি মনে করত না। ছোট ছোট ব্যাপারে জরিমানা করা, চাকরি থেকে বার করে দেওয়া সাধারণ ব্যাপার ছিল। উপরন্তু মজুরিও খুব কম ছিল। মনে হয় দুনিয়ার অন্য কোনো জায়গায় পুঁজিপতিরা এত বেশি লাভ করে না। ভারতের চিনির মিলগুলো তিন-চার বছরের মধ্যে এত বেশি মুনাফা করল যে কারখানাতে লাগানো সমস্ত পুঁজি লাভ হিসেবে বেরিয়ে এল। এটা পুঁজিবাদী প্রথাতেও রোজগার নয়, সরাসরি লুট করা।

যেসব মজদুরদের হাড়ভাঙা খাটুনি থেকে পুঁজিপতিরা এত লাভ করে তাদের ওপর এরা একটুও নজর দেয় না। হরিনগর মিলের মজদুরদের অনেকগুলো অভিযোগ ছিল। যখন ছ-মাস বন্ধ থাকার পর আখ পেষাইয়ের সময় ঘনিয়ে এল এবং যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা হতে লাগলো সেই সময় মিল-মালিকরা খুবই অত্যাচার করল। ৭ অক্টোবর (১৯৩৮) ৩০০ জন মজদুরের মধ্যে ২০ জন ছাড়া বাকি সবাই হরতাল করল। ওদের দাবি ছিল—(১) মজদুরিতে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি অর্থাৎ সাড়ে তিন আনার জায়গায় ছ আনা মজুরি দেওয়া হোক। (২) মজদুরদের বাসস্থানে আলো এবং সাফাই করার ব্যবস্থা

করা হোক। (৩) বিবাহিত মজদুরদের জন্য স্ত্রীলোক থাকবার উপযুক্ত কোয়ার্টার দেওয়া হোক। (৪) মিল-মালিক মজদুর সভাকে স্বীকৃতি দিক। (৫) কোনো মজদুরকে বরখাস্ত অথবা নিয়োগ করার হলে সেটা নিজেদের ইচ্ছেমত না করে নির্ধারণ করার অধিকার মালিক এবং মজদুরদের এক সম্মিলিত সভার ওপর থাকুক। হরতাল ২০ অক্টোবর অব্দি চললো। মিল-মালিকদের পক্ষে এটা একটা বড় লোকসানের ব্যাপার ছিল। কেননা মেশিন পরিষ্কার করে যদি চালান না হয় তাহলে আখ পেষাইয়ের কাজ হবে কেমন করে? ১৮ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত মিলের ভেতরেই জেলা কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির সভার বৈঠক হতে থাকল—মিলের ভেতরে সভা হওয়া আশ্চর্যের কথা নয়, শেষমেশ মিল-মালিকও তো কংগ্রেসী ছিল। কার্যনির্বাহী কমিটি মজদুরদের আশ্বাস দিল এবং মজদুররা এক সপ্তাহের জন্যে হরতাল স্থগিত রাখল। পেষাইয়ের মরশুম এসে গেল এবং মিলের ১২০০ জন মজদুর কাজ করতে লেগে গেল। মজদুররা কংগ্রেসী নেতাদের চিঠি এবং তার দিল কিন্তু জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করা হল না। ১৫ দিন অপেক্ষা করার পর ৫ নভেম্বর আবার হরতালের জন্যে মজদুররা আল্টিমেটাম দিয়ে দিল। সেইদিনই জেলার বড় কংগ্রেসী নেতা এলেন। তিনি মজদুরদের ধমকালেন যে, যদি হরতাল করা হয় তাহলে সবাইকে বার করে দেওয়া হবে এবং নতুন মজদুর বহাল করা হবে। ৯ নভেম্বর মজদুররা আবার হরতাল শুরু করে দিল। ১৪ নভেম্বর নেতা এসে সিদ্ধান্ত শোনাল যে মজুরি সাড়ে তিন আনার জায়গায় চার আনা পাওয়া যাবে। অন্যান্য ব্যাপারের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। কিন্তু মজদুর এইটুকুতে কি করে সন্তুষ্ট হতে পারত। হরতাল চলতে থাকল। মজদুররা ধর্না দেওয়া শুরু করল। পুলিশ ধরপাকড় করছিল না বলে কংগ্রেসী নেতারা তাদের হিজড়ে বলছিল এবং ধমকাচ্ছিল। পুলিশ লোকেদের গ্রেফতার করা শুরু করল। মিলে সেপাই এবং ঘোড়সওয়ার-পুলিশ খুব মারধোর করল, ওদের ওপর ঘোড়া দৌড় করাল এবং ঠাণ্ডা জল ঢালল। জনার্দিন প্রসাদকে তো এত মেরেছিল যে সে দশদিন পর্যন্ত কথা বলতে পারেনি। এখন পর্যন্ত (২২ ডিসেম্বর) ১৬৮ জন মজদুরকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট কয়েকটি ছেলের হাতে বেত্রাঘাত করাল।

এই সব শুনে আমার খুব আশ্চর্য লাগলো। যে-জনতা কংগ্রেসকে এত বড় করল সেই কংগ্রেসী-রাজ্যের জনতার ওপরেই এই সব ঘটছিল! তারা কি কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার কাছেএই আশা করেছিল? সব চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ কথা এটাই ছিল যে এখন আমাদের দেশ ছিল ইংরেজের গোলাম। কংগ্রেসীরা কি জানতো না, যে-জনতার ওপর এত অত্যাচার করা হচ্ছে তাদেরই বলের ওপর নির্ভর করে তাদের বিদেশীদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কংগ্রেসী নেতাদের কাছ থেকে আমার এরূপ আশা ছিল না।

রাঁচী সাহিত্য সম্মেলন (২৭-৩০ ডিসেম্বর)—সেই বছর প্রাদেশিক হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন রাঁচীতে হচ্ছিল, আমিই তার সভাপতি মনোনীত হয়েছিলাম। ২৬ ডিসেম্বর আমি রাঁচী পৌঁছলাম। রাঁচী আমি এই প্রথমবার এলাম। পাহাড়ী জায়গা সবুজে ভরা

ছিল। জানি না গরমকালে কেমন লাগে। আমার বক্তৃতায় আমি জনসাধারণের ভাষা এবং লোক সঙ্গীতের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলাম। হিন্দি উর্দু মিশিয়ে একটা কৃত্রিম ভাষার (হিন্দুস্তানী) বিপক্ষে বলেছিলাম, আমি একেবারেই বুঝতে পারছিলাম না যে কি করে ইকবাল এবং পন্ত-এর কাব্যিক সাহিত্যকে এক বলা যায়। আমি মনে করতাম যে হিন্দি এবং উর্দুকে নিজ নিজ জায়গায় রাখা উচিত।

৩০ তারিখ আমরা কাঁকে দেখতে গেলাম। মুরগি পালন আমি খুব লাভজনক ব্যাপার মনে করতাম, তাই সেখানের মুরগি পালন কেন্দ্র বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম। পাগলা গারদ দেখতে গেলাম। একজন পাগল বলছিল, 'দেখুন, আমি কাজ করি কিন্তু মজুরি পাই না। আমি থোড়াই কয়েদী? অথচ আমাকে বিয়ে করতে দেওয়া হচ্ছে না।' পাগলটি খুব বিপজ্জনক ছিল না।

কৃষক সত্যাগ্রহ, ১৯৩৯

পয়লা জানুয়ারি (১৯৩৯) সকালে আমি নাগার্জুনজীর সঙ্গে পাটনা পৌঁছলাম এবং দ্বিতীয় দিন ছাপরা যাবার জন্যে রওনা হলাম। জেলাব সব কৃষক কর্মকর্তারা এসেছিলেন। সেখানে কৃষকদের অবস্থা জানার সুযোগ পেলাম। অমবারীর কৃষকরা বলল, 'আমাদের খেত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা এদিক-ওদিক অনেক দৌড়াদৌড়ি করলাম। কংগ্রেস নেতাদের কাছেও গেলাম কিন্তু কেউই শুনল না।' ৫ জানুয়ারি সিওয়ানে ট্রেন থেকে নেমে আমি অমবারী পৌঁছলাম। জানতে পারলাম যে সত্যিই অনেক কৃষকের খেত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এও জানলাম যে ঝগড়া হরী-বেগারী[১] থেকে শুরু হয়েছে। সত্যযুগ থেকেই ব্যবস্থা চলে আসছিল যে কৃষক নিজের লাঙল-বলদ দিয়ে মালিকের খেত চাষ করার পর তা নিজের খেতে নিয়ে যেতে পারে। রামধারী মাহাতো নিজের খেত চাষ করছিল। জমিদার (শু· বাবু) বলল, 'লাঙল আমার খেতে নিয়ে চলো।' রামধারী বলেছিল, 'এই জমিটা চাষ করার পরে বাবু আমি আপনার খেতে যাব।' বাবু লাঠি দিয়ে তিন ঘা দিল। পুলিশও চাষীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিল। অন্য চাষীদের এই ব্যাপারটা খাবাপ লাগলো। পুলিশের রিপোর্ট পড়ে ম্যাজিস্ট্রেট চাষীদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা জারি করল। সমস্ত ব্যাপারটাই এক তরফা ছিল এবং এইসব

[১] কৃষকেব লাঙল-গরু দিয়ে জমিদারেব খেত চষে দেওয়াব শোষণমূলক প্রথা। এই প্রথা অনুযায়ী চাষী নিজের খেত বাদ দিয়ে আগে জমিদাবেব খেত প্রস্তুত করে দিত এবং তার জন্য তাকে কোনো পাবিশ্রমিক দেওয়া হতো না।—স ম

কংগ্রেসী মন্ত্রীদের রাজত্বে হচ্ছিল।

আমি পরের দিন (৬ জানুয়ারি) পাশের গ্রাম জয়জোরীর দিকে যাচ্ছিলাম। অমবারী প্রাইমারি স্কুলের ছাত্ররা আমাকে গালাগালি করলো। ওদের শিক্ষক জমিদারের ওখানে চাকরিও করতো, কাজেই বিশ্বস্ততা তো দেখানোর দরকার ছিলই। রাত্তিরে আমি জয়জোরীতে থাকলাম। ওখানকার কৃষকদের ওপরেও জমিদারের অনেক বছর ধরে জুলুম চলছে। খেতে একদানা ধান উৎপন্ন না হলেও মালগুজারি-জরিমানা সব মালিকের কাছে কিন্তু পৌঁছান চাই। কৃষক কতদিন পর্যন্ত ধার করে মালগুজারি দিত? যখন দিতে অসমর্থ হল জমিদার তখন খেত নিলাম করিয়ে নিল। খেত হারিয়ে কৃষক কতদিন বাঁচতে পারে? শেষকালে ওরা ঠিক করল, 'যা হয় হোক আমরা খেত হাতছাড়া হতে দেব না।' জমিদার সব কিছু করে দেখল কিন্তু গ্রামের এক-আধজন ছাড়া সব কৃষকদেরই এক পথ। সে ওদের কিছুই অনিষ্ট করতে পারল না। কয়েক বছর ধরে লড়াই করতে থাকার জন্যে আমি দেখলাম যে, জয়জোরীর কৃষকদের মধ্যে প্রাণ আছে। মোহন ভগত এবং অন্য অনেক কৃষক কেবল নিজের স্বার্থটা দেখছিল না।

পরের দিন (৭ জানুয়ারি) আমরা সিওয়ানের জন্যে রওনা হলাম। কিছুদূর যাবার পর সুলতানপুর গ্রাম পড়লো। এখানে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মেরই কৃষকরা থাকে। আমি একজন মুসলমান কৃষকের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করি, 'তোমার গ্রামে কত চাষের জমি আর কত ঘর চাষী আছে?'

কৃষক বলল, 'পাঁচশো বিঘা (৩০০ একর থেকে কিছু বেশি) চাষের জমি এবং ৫০০ পরিবার আছে—হিন্দু মুসলমান মিলিয়ে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের মালিক কে?'

কৃষক বলল, 'আমাদের মালিক ডাঃ মঃ সাহেব।'

আমি বললাম, 'তাহলে তো তোমাদের ভাগ্য ভালো—কংগ্রেসের এত বড় এক নেতা তোমাদের মালিক।'

কৃষক বলল, 'ভাগ্য ভালো! সমস্ত চাষীই দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত। একবারের মালগুজারি বাকি পড়লে মেরে গায়ের চামড়া খুলে নেয়। হরী-বেগারী এবং জরিমানার অত্যাচারে প্রাণ যায়। মালিকের নিজের ৭৫ বিঘের বকাস্ত (নিজস্ব খেত) আছে এবং সেটার চাষকরা বপন করা সব আমাদের নিজেদের লাঙল ও বলদ দিয়ে করতে হয়।'

এই ছিল কংগ্রেসী সরকারের এক মন্ত্রী এবং সম্ভবত অন্য মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক ভালো!

সেদিন আমরা সিওয়ান পৌঁছে গেলাম। পরের দিন সিওয়ানের ইংরেজ এস· ডি· ও·-র কাছে গিয়ে আমি অমবারীর কৃষকদের অসুবিধের কথা জানালাম। তিনি বললেন, 'আমি সবে নতুন এসেছি, আমি সেখানে গিয়ে তদন্ত করব।' কিন্তু তিনি কোনোদিনই তদন্ত করতে গেলেন না। তদন্ত করার দরকারও ছিল না, কেন না, জমিদার (চ) ও যে বাবুর সঙ্গে ঝগড়া ছিল, সে ছিল সরকারের খয়ের খাঁ, অনেক বছর ধরে অবৈতনিক সি· আই· ডি· (গুপ্তচর)-র কাজ করছিল। সরকার তাকে উপাধিও দিয়েছিল। তার কাছে

অনেক বড় বড় ইংরেজ হাকিমের প্রশংসাপত্র ছিল। তার এক-একটি কথা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ব্রহ্মবাক্য ছিল।

ছাপরায় সবচেয়ে বড় জমিদারি হচ্ছে হাথুয়ার মহারাজা বাহাদুরের। পুরো কুয়াড়ী পরগনাটা তার। যখন আমি অসহযোগ এবং পরেও কংগ্রেসের কাজ করতাম তখন কুয়াড়ীতে আমাকে খুব যেতে হতো। আমি এখানকার কৃষকদের অনেক রকম অসুবিধের কথা শুনেছিলাম। আমার কুয়াড়ী যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এবার শুধু মীরগঞ্জকে দূর থেকে দেখেই সন্তুষ্ট হতে হল। মীরগঞ্জ বাজার এখন খুব বড় হয়ে গিয়েছিল। সেখানে একটি চিনিকল চালু হয়ে গিয়েছিল। থাবা থেকে সিধবলিয়ার বেলে এই প্রথম চড়লাম। রতনসরায় স্টেশনে নেমে বরৌলী গেলাম, সেখানে একটি সভাতে ভাষণ দিলাম। তারপর বাত্তিরে পথে এক জায়গায় থেকে গোরয়াকুঠী পৌঁছলাম আর চারদিন সেখানেই থাকলাম। সেখানে হাই স্কুলের ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিলাম এবং পঞ্চায়েতী চাষ দেখলাম। ছিতৌলীর কৃষকরা তাদের অসুবিধের কথা বলল। ৩১ জানুয়ারি ছিতৌলী পৌঁছলাম। ওখানকার জমিদার আসরফী সাহুর সঙ্গে দেখা করলাম। সে বলল, 'আমি কোনো লোককে খেত দিই নি, আমি নিজের খেত নিজে চাষ করি।' আসরফী সাহুকে একজন ধর্মপ্রাণ পুরুষ মনে করা হতো। সে একটি মন্দির বানিয়ে সংস্কৃত পাঠশালাও খুলে রেখেছিল। পূজা-পাঠ, ব্রত-উপবাসেও উৎসাহ ছিল, কিন্তু সে বলছিল একেবারে মিথ্যা কথা। ৪৮৯ বিঘে জমির জন্য ওখানে তার কাছে হাল-গরু কোথায়? যখন আসরফী সাহু এক নীলকর সাহেবের কাছ থেকে এই জমি আর কুঠি কিনেছিল, সে-সময় অনেক প্রজা খেতে চাষ করত। তাদের কাছ থেকে সাহু জমি নিয়ে নিয়েছে। গ্রামের প্রজাদের চাষ করতে দিয়ে তা নিয়ে নেয়া মুশকিল, এই জন্য ১৪ ঘর লোককে অন্য গ্রাম থেকে এনে বসিয়েছে। জরিপে (সার্ভে) যখন এই লোকেদের নাম নথিভুক্ত হয়ে গেল তখন সে তাদের ইস্তফা দিতে বাধ্য করল। বেচারা গরিব কৃষক, লাখপতি জমিদারের সঙ্গে কিভাবে লড়বে? পুলিশ তার কথা মানত। আদালতের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য সে জলের মত টাকা খরচ করতে পারত। যাক্‌গে, এতদিন পর্যন্ত সে ইচ্ছেমত কৃষকদের মনোমত মালগুজারিতে খেতে চাষ করতে দিত কিন্তু এখন সে তাতে ও রাজি ছিল না।

সেই দিনই ছাপরা পৌঁছলাম। পরের দিন কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করলাম। তার কাছে আমি কৃষকদের কষ্টের কথা বললাম। কালেক্টর বলল, 'আমি তো আইনের কাছে বাঁধা, যদি কৃষকদের জন্য কিছু করতে হয় তো কংগ্রেস সরকারকে তা করতে হবে, তবু আমি অমবারী সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করব।'

১৭ জানুয়ারি আমি পাটনায় ছিলাম। আমি চাইতাম যে পঞ্চায়েতী কৃষিকাজে সরকার উৎসাহ দিক, যাতে নতুন ধরনের কৃষিকাজ দেখে অন্য কৃষকরাও তা গ্রহণ করে। ডাক্তার মাহমুদের সঙ্গে আগেই কথাবার্তা হয়েছিল। পার্লামেন্টারি সেক্রেটারিবাবু শারঙ্গ ধরের সঙ্গে কথা হল, তারপর তাঁর পরামর্শ অনুসারে কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টর মিস্টার শেঠীর কাছে পৌঁছলাম। তিনি প্রথমে এই ধরনের কথা শুরু করলেন, 'ধরো, যে

—১৯৩৯—

কাজটা বিশেষজ্ঞদের, তাতে সাধারণ লোকের হাত দেয়ার অধিকার তো নেই?' তিনি বলছিলেন, 'হাজার-দু-হাজার একর জমির কৃষকদের যদি একত্র করো, তখন আমরা নিজেদের জ্ঞান আর পদ্ধতি খরচ করব।' আমি বললাম, 'তাহলে তো ন-মণ তেলও পুড়বে না আর রাধাও নাচবে না। আপনার পঞ্চাশ-একশ একর জমিওলা পঞ্চায়েতী কৃষকদের সাহায্য করা উচিত। তাদের সাফল্য দেখে অন্যরাও অনুকরণ করবে।' যাক্‌গে, তিনি 'হ্যাঁ-হ্যাঁ' করলেন আর খরচের পরিকল্পনা বানিয়ে দিতে বললেন। আমি কুয়ো, চাকা এবং আরও কিছু জিনিসের জন্য টাকার হিসাব দিয়ে দিলাম।

সে-সময় মুঙ্গের আর গয়া জেলায় কৃষকদের জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছিল। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা কায়েম হওয়ায় জমিদারদের ভয় হয়ে গিয়েছিল যে, যেসব খেতগুলো তারা কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং যেগুলোতে এখনও কৃষকরা চাষ করছে, তার ওপর কৃষকদের অধিকার জন্মে যাবে, কেননা কংগ্রেস সরকার তাদের স্বেচ্ছাচার চলতে দেবে না। এই জন্য সারা বিহারে বহুবছর ধরে কৃষকদের চাষ করা খেতগুলো জমিদাররা মুক্ত করে নিতে শুরু করল। কৃষকরা বিরোধিতা করছিল এবং নিজের খেত ছাড়তে চাইছিল না, এটাই ছিল সংঘর্ষের কারণ। শ্রীকার্যানন্দজীর কাছ থেকে আমি বঢ়েয়াটালের কৃষকদের দুর্দশার কথা শুনে নিয়েছিলাম। আর এখন তা আমি নিজে দেখতে চাইছিলাম।

বঢ়েয়াটালে—২০ জানুয়ারি আমি লক্ষ্মীসরায় চিত্তরঞ্জন আশ্রমে গেলাম। ওখানে সে-সময় কৃষক-কর্মকর্তাদের শিক্ষণ-শিবির চলছিল এবং একজন তরুণকর্মী অনিল মিত্র খুব তৎপর হয়ে কাজ করছিলেন। পরের দিন (২১ জানুয়ারি) কার্যানন্দজীব সঙ্গে আমি পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। পথে রজৌনাতে পালবংশের রাজা সুরপালের সময়ের (১০৭৫-৭৭) একটি বৌদ্ধমূর্তি দেখলাম। অন্য একটি মূর্তির পাদদেশে কোনো পালবংশীয় রাজার ত্রয়োদশ বছরের শিলালেখ ছিল। হরোহর নদীতে নৌকা প্রস্তুত ছিল। আমরা নৌকায় করে রেপুরা গেলাম। নদী থেকে একটু হেঁটে গিয়ে গ্রাম। একটি বাগানে সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ৫ হাজারের বেশি লোক জমা হয়েছিল যার মধ্যে তিন-চারশো মহিলা ছিল। কয়েকশো বছর ধরে এই কৃষকদের ওপর অত্যাচার হয়ে আসছিল। ওরা এটাকে ভাগ্যের ফের মনে করত, কিন্তু এখন তারা তাদের ভাগ্যকে নিজের হাতে বানাতে প্রস্তুত ছিল। বঢ়েয়াটাল চল্লিশটি গ্রামের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র। এখানকার জমি নিচু, সেজন্য পুরো বর্ষাকাল তা একটা ছোটোখাটো সমুদ্রের রূপ ধারণ করে, যার মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম দ্বীপের মত মনে হয়। বর্ষা শেষ হতেই জল বেরিয়ে যায়। কিন্তু হাজার গ্রামের নোংরা-পচা জিনিস নিজের ভেতরে ঘেঁটে ওখানে পুরু, কালো মাটির আস্তরণ রেখে যায়, ফলে রবিশস্যের জন্য জমি বেশি উর্বর হয়ে যায়। জল বেরোতেই কৃষকরা হাল নিয়ে গিয়ে বীজ বুনে দেয় আর তারপর লাখ লাখ একর জমিতে সবুজ ফসল ঢেউ তুলতে থাকে। বঢ়েয়াটালের জমিতে বরাবর এই গ্রামের কৃষকরা লাঙল দিত। জমিদার তাদের কাছ থেকে যত খুশি শস্য ও খড় নিয়ে নিত আর

কৃষকদের এত শস্য উৎপন্ন করেও অভুক্ত থাকতে হতো। এখন যখন কৃষক জেগে উঠেছিল, তখন জমিদার সব রকমের অত্যাচার করতে নেমে এল। তাদের লেঠেলরা কৃষকদের মাথা ভাঙলো, মেয়েদের বেইজ্জত করলো। পুলিশ শয়ে শয়ে লোককে জেলে পাঠালো। কিন্তু এবার জেলের ভয় তাদের মন থেকে চলে গিয়েছিল। সেদিন মেয়েরা তাদের মাগধী ভাষায় গান করছিল, 'চল চল মা, যারা জেলে যাবে গো।'[১] মেয়েরাও জেলে যেতে ভয় পাচ্ছিল না।

পরের দিন (২২ জানুয়ারি) রেপুরা থেকে রওনা হয়ে আমরা মেহরামচক গ্রামে পৌঁছলাম। যেদিকে গ্রামবাসীদের বেরনোর পথ ছিল, পুলিশ সেদিকেই ডেরা বেঁধেছিল। শান্তিরক্ষা এবং জমিদারদের লুটপাটকে রক্ষা করার জন্য পুলিশের বড় দল টালে (বঢ়েয়াটালে) পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ডেরা বাঁধার সময় এটুকু খেয়াল রাখা তো তাদের উচিত ছিল যে, যেদিকে মেয়েরা রাত-বিরেতে যায় সেই জায়গাটা ছেড়ে দিই। এটা পরিষ্কার ছিল যে কংগ্রেসী সরকার জমিদারদের পক্ষ নিয়েছিল। এটা খুব দরিদ্র গ্রাম। ৫ ব্যক্তির এক পরিবারের ঘর আমি দেখতে গেলাম। তিন হাতের দেয়ালের ওপর বানানো খড়ের ঝুপড়ি। ঘরটি ভেতর থেকে ৮ ফুট লম্বা আর ৫ ফুট চওড়া। বাইরে একটি খড়ের বারান্দা ছিল। এতেই তারা দিন কাটাত। ২১ ব্যক্তির এক পরিবারের কাছে এরকম তিনটি ঘর ছিল। এটাকে কি মনুষ্যজীবন বলা যায়? একটা ঘরে দেখলাম, জমিদার ঘরের লোকদের বের করে দিয়েছে এবং তাতে খড় ভরে রেখেছে। সব রকমের দারিদ্র আর অসহায়তা। ভুখা হলেও এখন তাদের ভেতর থেকে ভয় চলে গিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখে আমার মনে খুব আনন্দ হল। আমি বললাম, 'বিপ্লব, তোমাকে স্বাগত জানাই।'

রথোড়ায়—২৩ জানুয়ারি কার্যানন্দজীর সঙ্গে রথোড়া দেখতে যাচ্ছিলাম। গয়ার কৃষক-নেতা পণ্ডিত যদুনন্দন শর্মার সঙ্গে কৃষকদের সংঘর্ষে সহায়তা করার অপরাধে মোকদ্দমা চলছিল। হাজার হাজার কৃষক তাদের বীরনেতাকে দেখার জন্য গয়া যেতে প্রস্তুত ছিল। সেই ভিড়ে আর কে টিকিট কাটে আর কেই-বা জেলে যেতে ভয় পায়? রেলের লোকেরা আড়াই ঘণ্টা পরে ট্রেন ছাড়ল, এতেও তাদের সাহস ছিল না তারপর তারা আমাদের দুজনকেও সঙ্গে যাওয়ার জন্য বলল। কাশীচক স্টেশনে এখনও পঞ্চাশজন লোক ছিল। অনেকে কাছারির সময় পেরিয়ে গেছে ভেবে ফিরে গিয়েছিল। আমরা লরিতে করে রথোড়া গেলাম। সশস্ত্র পুলিশ গ্রামের বাইরে ছিল। গ্রামের লোকেদের সব রকমের দারিদ্র ছিল। কত ছাউনিতে অনেক বছর খড় পড়েনি। এই গ্রামে উঁচু জাতের কৃষক বেশি থাকত আর জমিদারও সেই বড় জাতের ছিল। এক-এক করে তারা কৃষকদের সব খেত নিলাম করিয়ে নিয়েছে। এখন কৃষকদের কাছে রোজগারের

---

[১] মূলগ্রন্থে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষার গানের কলিটি— *'চলু চলু মাতা! জেহলকে জবৈয়ারে!'*—স.ম.

দুটিই মাত্র উপায় ছিল, গরুর গাড়িতে মাল তোলা অথবা মেয়ের জন্ম দিয়ে তাকে নিজের জাতের মধ্যে বেচে দেওয়া। এত দারিদ্র ছিল কিন্তু ওখানকার স্ত্রী-পুরুষদের রঙ আর শরীর যা দেখলাম তা থেকে সৌন্দর্যের ঝলক বেরিয়ে আসছিল। জমিদারদের প্রতি পুলিশ আর সরকারী অফিসাররা উদারহস্ত ছিল, কেননা তারা নিজেদের পাক্কা ইংরেজভক্ত প্রমাণ করেছিল। কংগ্রেস মন্ত্রীদের চারজনের মধ্যে তিনজন স্বয়ং জমিদার ছিল আর চতুর্থজন জমিদার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তাহলে তাদের আর কেন কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি থাকবে? কিন্তু কৃষকদের মধ্যে এখন আশ্চর্য রকমের একতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তারা নিজেদের অধিকারের জন্য এক সঙ্গে লড়াই করতে, এক সঙ্গে জেলে যেতে, মার খেতে প্রস্তুত ছিল। মেয়েরা আমাদের দেখে 'চলু চলু সখিয়া, জেহলকে জবৈয়া গে' গাইছিল। আমি সেখানে একটি বক্তৃতা দিলাম।

২৪ জানুয়ারি সকালে আমি পাটনায় ছিলাম। ওখানে খবর পেলাম যে করনৌতী (হাজীপুর)-এর ঘরের চাকরানীরা হরতাল করেছে। আমাদের দেশে এই একটাই পচন একটু আছে—যে-গ্রামে বড় বড় জমিদাররা থাকে সেখানকার স্ত্রীলোকদের ইজ্জত খুবই কষ্টে রক্ষা পায়। জমিদারদের নিজেদের সম্মানের পর্দাটিও ছিল পাতলা মসলিন কাপড়ের মতো। সাধারণ স্ত্রীলোকদের ওপর তো তাও থাকতে পায় না। তাছাড়া কয়েকশো বছর ধরে তারা কয়েকটি জাতকে তাদের খাওয়াস—গৃহসেবক বানিয়ে রেখেছে। এই সব ঘরের পুরুষ ও মেয়েরা সারা জীবন বাবুদের বাড়িতে সেবা করার জন্য জন্মেছে। এদের অবস্থা দাস-দাসীদের চেয়ে ভাল নয়। মালিকের এঁটো ভাতে তারা পেট চালায়, ছেড়ে দেয়া কাপড় দিয়ে শরীর ঢাকে। মাসে আট আনা বা বারো আনা তাদের বেতন মেলে, আর কাজের জন্য রাতের প্রথম প্রহর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। মেয়ের বিয়ে হলে যেমন মোটর, হাতি, সোনা-রূপার পণ দেয়া হয়, সেই রকম খাওয়াসিন[১]ও পণের সঙ্গে দেয়া হয়। এটা কি দাসপ্রথার চেয়ে কিছু কম? করনৌতীতে ঘরের চাকরানীদের হরতাল জানিয়ে দিল যে রাজর্ষি আর ব্রহ্মর্ষিদের ভারতবর্ষ কাঁপতে শুরু করেছে।

সে দিন রাতেই আমি ছাপরা গেলাম। মঢ়ৌরাতে চিনি, মদ আর লোহার একটি বড় ফ্যাক্টরি আছে। লজেন্স-চকোলেটের কারখানাও রয়েছে, কারখানার মালিক ইংরেজ। যদিও সে ইংলন্ডে নিজের মজুরদের রোজ চার টাকা করে মজুরি দিতে রাজি কিন্তু ভারতের মজুরদের সে চার আনা ঠেকাতে চায়। মজুররা অনেক অভিযোগ করেছে, মালিকের কাছে তারা বার বার দরখাস্ত দিয়েছে কিন্তু কে শুনছে? কংগ্রেসীরা এখন হয়ে গিয়েছিল মিল-মালিকদের আপন ভাই, যেমন আমরা হরিনগরে দেখেছিলাম। কিন্তু মঢ়ৌরার মালিক ভারতীয় ছিল না, ইংরেজ শেঠ ছিল, সেজন্য তারা মজুরদের প্রতি তাদের দয়া দেখাতে চাইল। জেলা কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি ছিলেন একজন বড়

[১] জমিদারের ঔরসে জাত বেওয়ারিশ সন্তান। সমাজের চোখে এরা ঘৃণ্য ও হীন, সেজন্যে এদের বিয়ে ইত্যাদি তাদের নিজেদের *সমাজের* মধ্যেই হয়ে থাকে।—স.ম.

জমিদার। জেলার বিভিন্ন জায়গায় কৃষকদের ওপর জুলুম চলছিল। জমিদার তাদের খেতগুলো জবরদস্তি নিয়ে নিচ্ছিল। কৃষকরা দৌড়ে দৌড়ে জেলা কংগ্রেসের কাছে যেত কিন্তু সভাপতি মশাই কেন সেদিকে মনোযোগ দেবেন? তাঁর জমিদারিতেও তো একই জিনিস হচ্ছিল। যাক্‌গে, ইংরেজ শেঠের কারখানা হওয়ার জন্য কংগ্রেসী নেতারা এখানে মজদুরদের সমিতি গড়েছিল। ১ ডিসেম্বর জেলা সভাপতি মজদুরদের নিয়ে সভা ডাকলেন এবং লিখিতভাবে তাদের দাবি মালিকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে এটাও লিখে দিলেন যে, ১৯ তারিখ বারোটার মধ্যে দাবি পূরণ করে দেয়া হোক। কিন্তু মিল-মালিক এই ধরনের চিঠিতে থোড়াই দাবি পূরণ করে? ২০ তারিখে চিঠি লেখা হল যে যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বোঝাপড়া না হয় তো মজদুররা হরতাল করে দেবে। ২১ জানুয়ারি মজদুরদের সাধারণ সভা ডেকে ২৩ জানুয়ারি থেকে ধর্মঘট করার চিঠি লিখে দেয়া হল। এসব কংগ্রেসের নেতা করছিলেন। মজদুর তাঁর কথায় বিশ্বাস করে লড়াইর জন্য তৈরি ছিল। কংগ্রেসীরা কতবার ধর্মঘট স্থগিত করে দিয়েছিল। ২২ তারিখে আবার তারা ধর্মঘট স্থগিত করার জন্য লিখল। মজদুররা বুঝে গেল যে তারা চায় না মজদুররা নিজেদের হকের জন্য লড়ুক। তারা খুব নিরাশ হল। তারা আমাদের সঙ্গীদের কাছে দৌড়ে গেল। ২৩ তারিখে এসে বিশ্বনাথ শ্রমিক মজদুরদের পক্ষ নিল, তাতে কংগ্রেসী নেতারা হুমকি দিল এবং ২৪ তারিখে তারা ফতোয়া জারি করল যে মজদুরদের নেতা গুণ্ডা। এবার পুলিশ কেন ঠোকরাবে না? তারা ৩১ জন লোককে গ্রেপ্তার করল। এই কাজের জন্য আমি ২৫ জানুয়ারি মঢৌরা পৌঁছলাম। মজদুররা অটল ছিল। বাজারের লোকেরা সামান্য সামান্য খাদ্যসামগ্রী দিয়ে ধর্মঘটীদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। আমি মজদুরদের সভায় বক্তৃতাও দিলাম।

২৬ জানুয়ারি শোনপুরে স্বাধীনতা দিবস পালন করার ছিল। আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সাত বছর পর একজন রাজনৈতিক কর্মকর্তা হিসেবে আমি সেখানে গেলাম। দুটোর সময় একটি বড় শোভাযাত্রা বের করা হল আর পাঁচটার সময়ে স্বরাজ-আশ্রমে রাষ্ট্রীয়পতাকা উত্তোলনের পর আমি বক্তৃতা দিলাম। আমি দেখলাম লোকের মধ্যে আগের চেয়ে বেশি সচেতনতা রয়েছে। তারা সামাজিক আর ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কথা শুনতে তৈরি ছিল। আমাকে একটি অভিনন্দন পত্র দেয়া হল, কিন্তু অভিনন্দন পত্র রাখার জন্য আমার কাছে না ছিল জায়গা, না ইচ্ছে। বারাবংকী, লক্ষ্মীসরায় ইত্যাদি জায়গার অভিনন্দন পত্রের মত এই অভিনন্দন পত্রটিও আমি ওখানেই ছেড়ে এলাম।

সে-সময় আমি দেখছিলাম যে, সব জায়গায় কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে। তারা জমিদারদের জুলুম বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না কিন্তু তাদের সংঘটিত এবং সচেতন করে তোলার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি মনে করতাম যে, কৃষকরা নিজেদের মধ্যে থেকে নেতা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কিভাবে? এর জবাব আমি এখনও দিতে পারছিলাম না।

হাথুয়া-রাজে—এবার আমি হাথুয়া রাজের কুয়াড়ী পরগনায় যাওয়া স্থির করে ফেলেছিলাম। এ খবর রাজবাসীরা যখন পেল তখন খুব ঘাবড়ে গেল। তারা আমার কাছে একজন ভদ্রলোককে পাঠাল। তিনি বললেন, 'শুধু এক তরফা কথা শুনবেন না, আমাদের কথাও শোনার কষ্টটুকু করুন।' আমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ২৯ তারিখে খবর পেলাম যে মঢ়ৌরাতে দুজন সাথী শিববচন সিংহ আর শ্রমিক বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। ৩১ তারিখে আরও ১৫ জন গ্রেপ্তার হল—মঢ়ৌবার ৬০ জন এই সময় জেলে ছিল। সেদিন ছাপরায় জানতে পারলাম যে কংগ্রেসের দুই নেতা মজদুরদের না জিজ্ঞেস করে মালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সই করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে আমি লিখেছিলাম—'এটা কি ঘুমন্ত অবস্থায় আঘাত করা নয়? কিন্তু এটা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়, যারা শ্রমজীবী শ্রেণীর সঙ্গে এগিয়ে যেতে রাজি নয় তারা নিজেদের নেতৃত্বের জন্য সব কিছু করতে পারে।'

আমি দেখছিলাম যে, আমাদের কৃষক-মজদুরদের পক্ষে হিন্দি বোঝাটা সহজ নয়, যদি তাদের মাতৃভাষায় লেখা ও বলা হয় তাহলে ভালভাবে বুঝতে পারে। এজন্য আমি ভাবলাম ছাপরার ভাষা ভোজপুরী (মল্লিকা)-তে একটা সাপ্তাহিক বের করা দরকার, যার দাম থাকবে মাত্র এক পয়সা। আমি কিছু টাকার ব্যবস্থাও করলাম, প্রেসও ঠিক হয়ে গেল। ১৫০০ কপি বিক্রি হয়ে গেলে ঘাটতি হবে না এটাও জানা ছিল। আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে 'কিসান মজুর' বের করার জন্য দরখাস্ত করে দিলাম। কিন্তু ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট জানত যে শ্রমিকদের ভাষায় কাগজ বের করা খুব বিপজ্জনক ব্যাপার, সেই সঙ্গে সে এটাও জানত যে কংগ্রেস সরকার সেটা পছন্দ করবে না। এ জন্য কয়েক মাস পর্যন্ত সে এ ব্যাপারে কিছু ভাবলই না। যখন আমি জেলে পৌঁছে গেলাম তখন পাঁচশ টাকা জামানত দেয়ার কথা লিখে পাঠাল।

এক থেকে নয় ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ন-দিন আমি কুয়াড়ী পরগনায় অনেক কৃষক সভায় ভাষণ দিলাম। প্রথম দিন মীরগঞ্জে সভা হল। প্রায় তিন হাজার লোক একত্রিত হয়েছিল। নাগার্জুনজীও আমার সঙ্গে ছিলেন। চিনি মিলের অফিসাররাও কিছু বলার জন্য বলল এবং আমি তাদের ওখানেও গেলাম। পরের দিন লারপুরে পাঁচ হাজার কৃষকের মাঝে বলতে হলো। জানতে পারলাম হাথুয়া-রাজ তার এক ইন্সপেক্টরকে আমাদের প্রতিটি সভায় যাওয়ার জন্য নিযুক্ত করে দিয়েছে। সেদিন রাতে আমরা দীওয়ান-পরসাতে থাকলাম। এখানকার অনেক তরুণ কংগ্রেসের প্রথম আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। আমিও প্রায়ই এখানে আসতাম। লোকে গ্রাম-সংশোধক পঞ্চায়েত চালু করেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া সংশোধন কি হতে পারে? তার ওপর এই লোকেরা খুব জাঁকজমকপূর্ণ বার্ষিকোৎসব করে ফেলেছিল আর এখন ধারে ডুবে ছিল। পরের দিন ৩ ফেব্রুয়ারি 'ভোরে' ৮ হাজার কৃষকের সামনে বলতে হল। লোকের মধ্যে জাগরণ দেখছিলাম—বস্তুত শ্রমিকরা যখন একটুও বুঝতে পারে যে তাদের অসুবিধের কথা শোনার জন্য পৃথিবী প্রস্তুত রয়েছে, তখন অসফলতা তাদের নিরুৎসাহ করতে পারে না। ক্ষুধার্ত পীড়িত জনতাকে রোজকার অনেক কষ্ট সূঁচের মত বিঁধতে থাকে

এজন্য সংঘর্ষ থেকে তারা পিছিয়ে থাকতে পারে না। কৃষকদের অসুবিধে আমি নোট করলাম এবং তাদের অভিযোগগুলো সংগ্রহ করার জন্য পাঁচ জনের কমিটি বানিয়ে দেয়া হল। পরের দিন ৪ ফেব্রুয়ারি মাঁড়র ঘাটে সভা হল। কটয়া আর ভোরে-র থানা হচ্ছে গোখপুরের সীমায়। বহু বছর ধরে এখানে দারোগার স্বেচ্ছাচারের রাজত্ব চলে আসছিল। জেলার প্রতিটি দারোগা চাইত তার বদলি এই থানাতে হয়ে যাক। কেন না এই থানায় সোনা ঝরত। নিজেদের রোজগারের জন্য দারোগারা 'ধারা ১১০'[১]-এ কয়েকশো লোকের নাম লিখে রেখেছিল, তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছিল। যে কোনো লোককে ধারা ১১০ লাগিয়ে দেয়ার হুমকি দিলেই সে গয়না, জমি বিক্রি করে দারোগাকে পুজো করতে প্রস্তুত হয়ে যেত। কংগ্রেসী সরকারেও তার কোনো পরিবর্তন হয় নি। এখনও দারোগা লোককে পেটাত। এখনও তাদের কাছ থেকে টাকা মুড়ত। (৫ ফেব্রুয়ারি) দু-হাজার জনতার সামনে বক্তৃতা দিলাম। পরের দিন ৬ ফেব্রুয়ারি রাজাপুর গেলাম। মোহান্তজী, যিনি আনন্দজীকে শিষ্য বানাতে চেয়েছিলেন, এখনও জীবিত ছিলেন। তিনি মহাজনের কাছ থেকে ১৩০০ টাকা ধার নিয়ে ছিলেন। মহাজন ৩১০০ টাকার ডিক্রি করিয়েছিল। ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন। যখন কর্জ নিতে হয়, খরচ করতে হয় তখন মোহান্তরা বলে, 'মালিক আমি।' যখন সম্পত্তি বিক্রি করতে শুরু করে তখন বলে, 'সম্পত্তি মঠের, ঠাকুরজীর।'

আরও এক-আধটা সভায় বক্তৃতা দিতে ৭ ফেব্রুয়ারি সাসামুসা পৌঁছলাম। সেখানে চিনিকলের পাশে সভা হল। এখানেও কংগ্রেসী নেতারা সস্তায় মজুরদের নেতা হওয়ার জন্য গুরুত্ব না দিয়ে কাজ করেছিল। কলের মালিকদের সামান্য ভয় দেখাল, ধমকালো কিন্তু ধর্মঘটে পড়ার ইচ্ছা ছিল না। কলের মালিকরা মাসে ৮ টাকা মজুরি মেনে নিল এবং নেতারা মনে করল তাদের কাজ শেষ।

এখানেই একজন ৬০ বছরের বুড়ো এল। সে জন্মজাত অভিনেতা ছিল। নিজের পোশাকেই সে শাশুড়ি, বউ আর ছেলের জীবনকে হুবহু বাস্তবের মত নকল করে দেখিয়ে ছিল। অন্য সমাজ হলে সে একজন উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী হয়ে যেত কিন্তু এখানে যত্রতত্র নিজের অভিনয় দেখিয়ে কোনো রকমে পেট চালাচ্ছিল। তার বয়স সম্ভবত ৬০ বছর। সাসামুসা মিলে দেখলাম একটি পাকা মসজিদ বানানো হয়েছে। ধর্মের শিক্ষা দেওয়ার জন্য মৌলবী রাখা হয়েছে। ডালমিয়া নগরেও আমি জৈন আর হিন্দু মন্দির দেখেছিলাম। শেঠ অনেক লোককে বেতন দিয়ে রেখেছিল হরি-কীর্তন করার জন্য। এই মিল-মালিক কত বড় ধর্মাত্মা? ধর্মের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে কিন্তু মজুরদের পেটের খাবার আর শরীরের কাপড়টুকুর জন্য বেতন দেয় না কেন? সম্ভবত

[১] যদি কোনো ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের এলাকায় চুরি, রাহাজানি, প্রতারণা, জালিয়াতি ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ করে অথবা সমাজের পক্ষে ক্ষতিরকারক আচরণ করে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে সৎ আচরণের জন্য তিন বছরের মুচলেকা দিতে বাধ্য করতে পারেন। লক্ষণীয়, ইংরেজ আমলে বিদেশী শাসকরা এই ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৭ থেকে ১১০ ধারার সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাধারণ অপরাধীদের মতোই হয়রান করতো, তাদের মনোবল ভেঙে দেবার জন্য।—স· ম·

সেই সময় ছাপরায় সবচেয়ে কম মজুরি দেয়া হতো সাসামুসার মিলে। যদি তারা আট টাকা থেকে ১২ টাকা মজুরি করে দিত তাহলে মাসে চার পাঁচ হাজার টাকা দিতে হতো। এর চেয়ে বেশ ভাল ছিল যে দু-একশো টাকা ধর্মের জন্য খরচ করা হোক আর মোহান্ত মৌলবীরা শেঠের জয়জয়কার করুক।

সেমরাবাজারের (কুচায়কোট) সভায় বক্তৃতা দিয়ে ন-টার সময় গোপালগঞ্জ গেলাম। এখানে হাথুয়া-রাজের প্রধান ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা বলা স্থির হয়েছিল। দু-ঘণ্টা ধরে কথা চলল। আমি রাজের আমলাদের ঘুষ-টুষ আর অত্যাচার সম্বন্ধে বললাম। জানালাম যে জলনিকাশী পথের সারাই বর্ষা থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে কৃষকদের ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কৃষকদের কাছ থেকে যে জমি নিয়ে নেয়া হয়েছে না তারা তার দাম পেয়েছে, আর না মালগুজারি কম করা হয়েছে। ভোরে গ্রাম থেকেও এইভাবেই নেয়া জমি ছিল, যার মধ্যে কয়েক মাইল লম্বা নালা কাটা হয়েছিল। সেটা এখন মেরামত না করা অবস্থায় ছিল। কিন্তু তার কিনারে শিশু গাছ লাগানো হয়েছিল। আমি ভেবে রেখেছিলাম যে হাথুয়ারাজে সত্যাগ্রহ এই গাছের ওপরই করতে হবে। ঘটনা একটু অন্যরকম ঘটে গেল। যে কারণে সত্যাগ্রহ এখানে না করে অমবারীতে করতে হল। আমি জানতাম যে অমবারীর একজন ছোট জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করার চাইতে হাথুয়ার মহারাজ-বাহাদুরের সঙ্গে লড়াই করলে কৃষকদের বেশি ভাল হতো। যাকগে হাথুয়া এক চুলের জন্য বেঁচে গেল। ম্যানেজার সাহেব হিসেব দিয়ে বললেন, আমাদের কাছে যা অবশিষ্ট থাকে তাই দিয়ে কৃষকদের জন্য কিছু কাজ করতে রাজি।'

সিধৌলিয়ায় বিড়লার চিনি-মিল রয়েছে। সেখানে মজদুরদের একটি সভা হল। তারপর আমরা ছিতৌলী (১২ ফেব্রুয়ারি) গেলাম। আসরফী সাহু কৃষকদের সর্বনাশ করার জন্য তৈরি ছিল। ৬ হাজার কৃষক সভায় এসেছিল—হিন্দু-মুসলমান সব। সত্যাগ্রহ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। আমি দুদিন ওখানেই থাকলাম। ষাটটির বেশি পরিবার সত্যাগ্রহী হিসেবে নিজেদের নাম লেখাল। সত্যাগ্রহ আশ্রম চালু হল। সাহু দেখল ব্যাপার গণ্ডগোলের। সে তার লোক পাঠিয়ে জানাল—'অর্ধেক খেত রায়তদের পাইয়ে দাও আর অর্ধেক আমাদের কাছে থাক।' আমি বললাম, 'পাইয়ে দেওয়া না, দেওয়া অত সহজ নয়। জমিদারের পক্ষ থেকে একজন আর কৃষকদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি হোক, দুজন মিলে তৃতীয় একজনকে নির্বাচন করুক। এই তিনজন লোকের ফয়শালা দু-পক্ষ যদি মঞ্জুর করে তাহলে বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে।' ভগবানের বড় ভক্ত আসরফী সাহু তা মঞ্জুর করে কাগজে দস্তখতও করে দিল কিন্তু পরে প্রমাণ হল যে ফয়শালা মেনে নেয়ার জন্য সে একাজ করে নি।

১৪ ফেব্রুয়ারি আমি ছাপরাতে ছিলাম। জানা গেল মঢ়ৌরা মিলের ঝগড়ার ফয়শালা করার জন্য একটি পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে যাতে মজদুররা তাদের প্রতিনিধি বেছেছে আমাকে, অন্যজন মিল-মালিকের, আর কালেক্টর মিস্টার কেম্প সরকারের প্রতিনিধি।

সে-সময় পরসাদী (পরসা থানা)-তেও জমিদার কৃষকদেরকে খেত থেকে উৎখাত করতে চাইছিল। এজন্য কৃষকদের সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি নিতে হল। ১৬ ফেব্রুয়ারি আমার

পরসাতেই পৌঁছনোর ছিল। ১৫ তারিখে আমি রায়পুর আর মঠিয়ায় বক্তৃতা দিতে গেলাম। পথে কদনাতে দু-একরের একটা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পেলাম। সেটা রাস্তার ধারে ছিল। সেখানে কয়েকশো বছর ধরে 'ঢেলহওয়া বাবা'কে ঢেলা মারতে মারতে স্তূপ হয়ে গিয়েছিল। হতে পারে এই ঢুহা (স্তূপ)-এর ভেতর বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে। ব্রাহ্মণরা বিহারে প্রায় বুদ্ধকে ঢেলহওয়া বাবা বানিয়ে দিয়েছে এবং সেই হাতই ঢেলা ছুড়তে পারে যে-হাত কখনো বুদ্ধের পুজো করতো। কাছে শিবালয়ে আগে কত কালো পাথরের ভাঙা মূর্তি ছিল, সেগুলো মাত্র কয়েক বছর আগে ওখানকার সাধু তুলে গঙ্গায় ফেলা করিয়েছিল। তার মধ্যে হয়ত না-জানি কত ঐতিহাসিক সামগ্রী ছিল। পরসাদীর সভাতে দু-হাজার লোক জমা হয়েছিল। জমিদার এবং অধিকাংশ কৃষক একই আহীর জাতির লোক ছিল, কিন্তু জাতি এক হলে কি আর শ্রেণীস্বার্থও এক হতে পারে? জমিদার খেত মুক্ত করে নিতে চাইছিল কিন্তু কৃষকরা অনাহারে মরতে রাজি ছিল না।

হিলসাতে—অন্নপূর্ণা গ্রন্থাগারের বার্ষিকোৎসবের জন্য হিলসার তরুণরা আমাকে ডেকেছিল। ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধেতে আমি সেখানে পৌঁছলাম। হিলসা মনে হয় মগধ (পাটনা জেলা)-এর কোনো পুরনো স্থান। পরের দিন সকালে আমি তার পুরনো চিহ্নগুলো দেখতে বেরোলাম। প্রথমে জমন-জতীর সমাধিতে গেলাম। এটি একটি মুসলমান ফকিরের দরগা। বর্তমান ইমারতটি শের শাহ বানিয়েছিলেন। কিন্তু স্থানটি তার চেয়ে অনেক পুরনো। জমন-জতী মনে হয় যবন (মুসলমান) যতী[১] থেকে হয়েছে। জমন-জতী সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি গৌসপাক-এর ভাগ্নে এবং শাহমদার (মকনপুর)-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল বাগদাদে। বোন খোদার কাছে মিনতি করেছিল যে গৌসপাককে দেয়ার জন্য তার যেন একটা ছেলে হয়। কিন্তু ছেলে জন্মানোর পর তার [ছেলের প্রতি] লোভ হতে শুরু করে। খোদা তখন তাকে ছিনিয়ে নেয়। মা 'হায় কি হল' বলে চেঁচাতে থাকে, তখন ভাই (গৌসপাক) মৃত বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'বয়া বাবা জানেমন (আয় বাবা প্রাণ আমার)!' বাচ্চা বেঁচে উঠে গৌসপাকের কাছে চলে এল। বক্তা জানালেন যে 'জানেমন' থেকেই 'জমন' শব্দ এসেছে। জমন-জতী নেংটি পরা সাধু ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নি এবং (বৌদ্ধ সাধুদের মত) পীত বসন পরতেন। যখন তিনি হিলসাতে এলেন তখন এখানে এক ভিক্ষু থাকত। দুজনই ফকির ছিলেন। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ আর সুফী দর্শন একই ভাবনার দুটি রূপ ছিল এজন্য জমন-জতী বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। ভিক্ষু মারা যাবার পর জমন-জতীই তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ-বিহারকে মুসলমান সাধুদের মঠ বলা হতে লাগল। পরেও অনেকে গদিতে অবিবাহিত ভিক্ষুরূপে ছিল। তারপর বিবাহ করতে শুরু করে। এখন সেটি একটি শ্রীহীন দরগা, যার দর্শন করার জন্য লোকে কখনো কখনো আসে। হিলসা হচ্ছে পাটনা (পাটলীপুত্র) থেকে বিহার শরিফ

[১] কঠোর তপস্বী বা যোগী।—স.ম.

(উড়ন্তপুরী), নালন্দা আর রাজগীরের পুরনো পথের ওপর। এজন্য সে নিজের ভেতর না-জানি কত ঐতিহাসিক সামগ্রী লুকিয়ে রেখেছে।

অমবারী সত্যাগ্রহ (২৪ ফেব্রুয়ারি) ২০ ফেব্রুয়ারি ছাপরা এসে জানা গেল যে অমবারীতে আমার নামে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে অর্থাৎ আমার সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। সেখানে যাওয়ার অর্থ ছিল—জেলের সাজা। আমি আগেই বলেছি যে সত্যাগ্রহের স্থান আমি ঠিক করেছিলাম অমবারীতে নয়, হাথুয়া-রাজে। কিন্তু এখন ১৪৪-কে আমি সরকারের চ্যালেঞ্জ মনে করলাম। সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই ঠিক হল যে ১৪৪ ভাঙা হোক. অমবারীতে সত্যাগ্রহ করা হোক। আমি সিওয়ানে নেমে জৈজোরী গেলাম। চারদিন আশেপাশের গ্রামে সত্যাগ্রহের প্রচার করে পঞ্চম দিনে সত্যাগ্রহ করা স্থির হল। আমার সঙ্গে নাগার্জুনজী এবং অন্য এক তরুণ জলীল ছিল। হিন্দুর ঘরে মুসলমানদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে খুব ঝামেলা হতো, সেজন্য জলীলের নাম আমি প্রতাপ সিংহ রেখে দিলাম। আমরা জৈজোরী, নদিয়াঁব, দেবপুর, হরিনাথপুর-এ সভা করে নিখতী পৌছলাম। নিখতীও কোনো প্রাচীন স্থান। হরিনাথপুরে আমি একটি কুয়োতে চুনাপাথরের একটি গুপ্তকালীন মূর্তির টুকরো দেখেছি এবং নিখতীতে কালো পাথরের মুখলিঙ্গ। নিখতী থেকে রঘুনাথপুর গেলাম। দারোগা জানাল ১৪৪ ধারা জারি হয় নি। কিন্তু সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল তাই গাড়ি থামানো সম্ভব ছিল না।

আঁদরে ২৩ তারিখে সভা হল। দেশভক্ত মজহরুল হকের পুত্র হুসেন মজহর সভাপতি ছিল। ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পুলিশ আর সিওয়ানের ম্যাজিস্ট্রেট (এস· ডি· ও·) নিজেদের মোটরে বসে বক্তৃতা শুনতে লাগল। সেই রাতটা আমরা জৈজোরীতে থাকলাম। জানা গেল, জমিদার আমাকে পিষিয়ে দেওয়ার জন্য তার দুটো হাতিকে প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যেখান-সেখান থেকে কয়েকশো লাঠিয়াল আনা হয়েছিল। মৃত্যুকে ভয় পাওয়া আমার কাছে মরার চেয়েও খারাপ ছিল।

পরের দিন (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল আটটার সময় জলখাবার খেয়ে আমরা অমবারীর উদ্দেশে রওনা হলাম। গ্রামের কাছে দুটো হাতি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর তাদের পিছনে ছিল কয়েকশো লাঠিধারী মানুষ। লালজী ভগতের সেবাথানে শয়ে শয়ে কৃষক জমা হয়ে গিয়েছিল। আমরা স্থির করেছিলাম যে দশজন করে লোক এবং একজন করে নায়কের পাঁচটি দল পর্যায়ক্রমে সত্যাগ্রহের জন্য যাবে। সত্যাগ্রহ ছিল—এক কৃষকের খেতে আখ কাটা। জমিদার এই খেতটি তার বলত। দারোগা খুব চিন্তিত ছিল। তাকে বললাম ঠিক দশটার সময়ে এগারো জন 'অমুকের' খেতে আখ কাটতে যাব।

দশটার সময় আমরা এগারো জন কাস্তে নিয়ে খেতে পৌছে গেলাম। মদ খাইয়ে মত্ত করে দেয়া দুটো হাতিই কাছে দাঁড়িয়েছিল। লাঠিধারীদের মধ্যে কয়েকজনকে তো জমিদার ভাড়া করে এনেছিল, কিছু লোককে আশপাশের অন্যান্য জমিদাররা দিয়েছিল আর কিছুকে বোঝানো হয়েছিল যে কুর্মী একজন রাজপুত ভাইকে বেইজ্জত করছে,

—১৯৩৯—

জাতের ডাকে যোগদান করা দরকার। কিন্তু শেষোক্ত প্রোপাগাণ্ডা যে কার্যকরী হয় নি তা বোঝা যাচ্ছিল, কেন না সকালের চার-পাঁচশো লাঠিয়ালের মধ্যে অনেকেই খেতে আসে নি। যদিও অমবারীতে বহু সশস্ত্র পুলিশ এসে গিয়েছিল কিন্তু ইনস্পেক্টর তাদের ৩ ফার্লং দূরে একটা বাগানেই আটকে রেখেছিল। খেতে শুধু দুজন দারোগা, একজন সেপাই আর দুজন চৌকিদার এসেছিল। ইনস্পেক্টর ভাল করেই জানত যে জমিদার খুন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবু হাতি আর লাঠিয়ালদের খেতে জড়ো হতে দেওয়া এবং সেপাইদের না পাঠানোর অভিপ্রায় যে কি তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল। আমরা খেতে পৌঁছতেই জমিদার পরিবারের দুজন লোক লাঠিয়ালদের লাঠি চালাতে উস্কানি দিচ্ছিল কিন্তু কেউ এগোতে চাইছিল না। সম্ভবত আমার গায়ে যে হলুদ বস্ত্র ছিল তার জন্যই তাদের হাত তোলার সাহস হচ্ছিল না অথবা তারা মনে করেছিল যে এখানে লাঠি চালায় এমন কেউ নেই। এগারো জন অস্ত্রহীন মানুষ হাতে কাস্তে নিয়ে আখ কাটতে এল। আমি দুটো আখ কাটলাম, দারোগা আমাকে গ্রেপ্তার করল। এই ভাবে বাকিদেরও গ্রেপ্তার করা হল। আমি পিছন দিকে মাথা ঘোরালাম, দেখলাম জমিদারের মাহুত কুরবান হাতি থেকে নামল। আমি যেই অন্যদিকে মুখ ঘোরালাম সেই সময়েই মাথার বাঁদিকে জোরে লাঠি লাগল। আমি কোনো ব্যথা অনুভব করলাম না, শুধু দেখলাম যে মাথা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। দারোগা দ্বিতীয় লাঠিটা লাগতে দিল না। সেখান থেকে আমাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল। দারোগা কুরবানকে গ্রেপ্তার করে নিয়েছিল কিন্তু জমিদার বলায় ইনস্পেক্টর তাকে ছেড়ে দিল। সেদিন ৫২ জন গ্রেপ্তার হল কিন্তু পুলিশ ২৮ জনকে ছেড়ে দিল। সন্ধেবেলা ১৫ জনকে মোটরে তুলে সিওয়ানে রওনা হল। পথে পেচ্ছাব করার জন্য গাড়ি থামাতে বললাম কিন্তু পুলিশ নিষেধ করল। বুঝতে পারলাম দেড় বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে আমরা কতটা এগিয়েছি।

জেলে (২৪ ফেব্রুয়ারি—১০ মে)—রাতে সিওয়ানের জেলে আমাদের বন্দী করে দেয়া হল। শীতের দিন ছিল। আমাদের নোংরা কম্বল দিল গায়ে নিতে, পোকামাকড় রাতে ঘুমোতে দিল না। কিন্তু স্বেচ্ছায় এর চেয়েও নোংরা কম্বল আর এর চেয়েও মারাত্মক পোকামাকড়ের কামড় আমি কতবার সহ্য করেছি।

পরের দিন (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে দরজা খুলল। আমরা হাত-মুখ ধুলাম। নুন দিয়ে ফোটানো ফেনভাত খেতে পেলাম। তারপর খেতে দিল সাড়ে তিন ছটাক আটার রুটি। কৃষকদের আর সাড়ে তিন ছটাকে কি হবে কিন্তু মন্ত্রীরা তো এখন জেল ভুলে গিয়েছিল তাই এদিকে খেয়াল করার দরকার কি? নাগার্জুন, জলীল, মজহর, বাসুদেব নারায়ণ, মহারাজ পাণ্ডে আর অমবারীর কত কৃষক এখন জেলে ছিল।

তৃতীয় দিন (২৬ ফেব্রুয়ারি) আমাদের ছাপরা জেলে পাঠাতে লাগল। কেন না সিওয়ানের জেল খুব ছোটো। প্রথমে আমাদের দলের নজন লোকের সঙ্গে আমাকে পাঠানো হল। আমার সঙ্গীদের হাতে হাতকড়া পরানো হল। আমি সেপাইদের বললাম, 'হয় আমার হাতে হাতকড়া পরাও, নইলে সবাইকে হাতকড়া ছাড়া যেতে দাও।'

সেপাইরা হাতকড়া খুলে দিল আর দড়ি দিয়ে ঘিরে আমাদের স্টেশনে নিয়ে গেল। সারাটা পথ আমরা ধ্বনি দিলাম, 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ', 'কৃষকরাজ কায়েম হোক, 'শ্রমিকরাজ কায়েম হোক,' 'জমিদারি প্রথা নিপাত যাক', 'যে খাটবে সেই খাবে, তাতে যা হবার তাই হবে'। সিওয়ানের নাগরিকদের কাছে এটা একেবারে নতুন ব্যাপার ছিল। এরকম নয় যে তারা রাহুলবাবাকে ফাটা মাথায়, দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে দেখছিল, বরং তারা খেয়াল করছিল যে, এই সবকিছু গান্ধীবাবার রাজ্যে হচ্ছে। পথে আমি খবরের কাগজের জন্য একটি বক্তব্য লিখে দিলাম। দশটার সময় ছাপরা পৌঁছলাম। পায়ে হেঁটেই জেলে নিয়ে গেল। প্রোপাগাণ্ডার জন্য এই পায়ে হেঁটে যাওয়া খুবই ভাল ছিল। বোধহয় এক সপ্তাহও লাগল না। অমবারীর সত্যাগ্রহে আমার মাথা ফাটার খবর প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে গেল।

সেদিন অমবারীতে আমি খুব জোর দেয়ায় খোজবা থেকে ডাক্তার ডাকা হল এবং মাথায় সাধারণ পটি বেঁধে দেয়া হল। সিওয়ানের ডাক্তাররা ক্ষত দেখার প্রয়োজন মনে করলেন না। আজ তৃতীয় দিনে এখানে ছাপরা জেলের ডাক্তার স্পিরিট দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে পটি বেঁধে দিলেন। ডাক্তার হাসপাতালে থাকার এবং বিশেষ খাবার খাওয়ার কথা বললেন কিন্তু আমি রাজি হলাম না। চারটের সময় কালেক্টর এলেন। তিনি মিটমাটের আলোচনা করলেন। আমি নিরপেক্ষ পঞ্চায়েতের হাতে বিবাদ মীমাংসার ভার দিতে বললাম, তিনি চন্দ্রেশ্বর বাবুর সঙ্গে কথা বলে জবাব দেবেন কথা দিয়ে গেলেন।

খবরের কাগজে সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। জেলার বাইরের নেতারাও আসতে শুরু করেছিল। শিববচন সিংহ আর অন্য অনেক সাথীরা অমবারী পৌঁছে গিয়েছিল এবং সত্যাগ্রহ চালিত করছিল। জেল সম্বন্ধে আমি ২৭ ফেব্রুয়ারি লিখেছিলাম— 'জেলে ঠিকাদাররা খারাপ জিনিসপত্র দেয়, খাবার কম দেয়া হয়, তরকারি ডালও বাজে। হাসপাতালে না মেঝে পরিষ্কার, না কাপড় পরিষ্কার। জিনিসপত্রও অগোছাল। কোনো কম্পাউন্ডারও নেই।'

২৮ ফেব্রুয়ারি কালেক্টর আবার এলেন। প্রস্তাব রাখলেন বিববাদের মীমাংসার জন্য তিনজন লোকের পঞ্চায়েত তৈরি করা হোক—যার মধ্যে একজন কৃষক প্রতিনিধি, একজন জমিদার প্রতিনিধি এবং একজন সরকারি প্রতিনিধি থাকবে। কালেক্টর তিনজন ডেপুটি কালেক্টরের নামও জানালেন যাদের মধ্যে একজনকে নেয়া যায়। তিনি এটাও জানালেন, 'একজন কানুনগোকে[১] অমবারী পাঠাচ্ছি। সে কৃষকদের চাষাবাদের হিসেব

[১] প্রত্যেক পরগনায় নিযুক্ত একজন হিসেব-রক্ষক। *কানুনগো* শব্দটি ফারসী ও আরবীর মিলিত রূপ। *কানুন* অর্থে আইন এবং *গোয়া* অর্থে যিনি বলতে সক্ষম। স্বাভাবিকভাবেই এই পদাধিকারী ব্যক্তিরা আইন ও স্থানীয় ভূমি বিষয়ে অভিজ্ঞ হতেন। মুঘল আমলের শেষ পর্বে এঁরা প্রত্যেক প্রদেশে রাজস্ব-বিষয়ে সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব করতেন। প্রাদেশিক রাজস্বের চালানে কানুগোর স্বাক্ষর না থাকলে দিল্লীর রাজকোষে সেই অর্থ জমা পড়তো না। সেজন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কানুনগোকে নানাভাবে তুষ্ট রাখতেন। পরবর্তীকালে এই পদটি তুলে দেওয়া হলেও ১৮১৬ সালে ইংরেজ আমলে আবার তাকে আনা হয়। (তথ্যসূত্র : *ভূমি রাজস্ব ও জরীপ।* টোডরমল)—স.ম.

তৈরি করে আনবে।'

অমবারীর কৃষকরা দমে নি এবং আশেপাশের অন্যান্য কৃষকরা তাদের সাহায্যের জন্য তৈরি ছিল। তারা হাজার হাজার সংখ্যায় জেলে আসত যদি না পুলিশ গ্রেপ্তার করা বন্ধ করে দিত। সেখানে সত্যাগ্রহ-আশ্রমে অনেক স্বেচ্ছাসেবক থাকত যাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিকটবর্তী লোকেরা করত। স্বেচ্ছাসেবকরা হাটে গেলে শাকসবজিওলারা তাদের কাঁচা তরকারি দিত। কৃষকদের বোঝানোর দরকার ছিল না যে এটা তাদেব নিজস্ব লড়াই। ৬ মার্চ ডায়েরিতে আমি লিখেছিলাম—'হোলি উপলক্ষে (আজ) পুয়াপুড়ি পেলাম। ঘি বিলানো হচ্ছিল আমাদের জন্য। কয়েদীবা চায় যে স্বদেশীবা জেলে আসতে থাকুক। জেলের কয়েদীরা এখানকার স্টাফদের (অফিসারদের) কাছ থেকে কি শিখবে যাদের তারা নিজেদের চেয়েও খারাপ মনে করে। যতদিন মানুষের জগতে শোষকদের সুখের বাঁশি বাজানোর সুযোগ রয়েছে ততদিন জগত থেকে অসততা কি করে দূর হবে?'

৮ মার্চ কালেক্টর জানাল যে জমিদার মিটমাট কবতে রাজি নয়।

এটা তো ছুতো ছিল। সে আর কি করে কালেক্টরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেত? ৯ মার্চ আমি জেলখানার ইনস্পেক্টর-জেনারেলের কাছে নিজের রেডিও আনাবার অনুমতি চাইলাম। ১১ মার্চ কৃষক কয়েদীদের অসুবিধে জানিয়ে কয়েকটা দাবি রাখলাম, যা কাপড়, বিছানা, পড়া-লেখার জিনিস এবং খবরের কাগজ ইত্যাদির সুবিধের ব্যাপারে ছিল। তাতে লিখে দেয়া হয়েছিল যে আমরা এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব, যদি ১৮ মার্চেব বারোটা পর্যন্ত আমাদের দাবির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয় তাহলে আমবা ৫ জন (আমি, বাসুদেব নারায়ণ, মজহর, জলীল আর নাগার্জুন) আমরণ অনশন করব। পরের দিন সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, 'আপনাদের দাবিতে যেসব ব্যাপারের সংকেত রয়েছে সেগুলো করার জন্য আমরা প্রস্তুত।'

১৪ মার্চ আমি 'তুমহারী ক্ষয়'[১] পুস্তিকা লিখতে শুরু করি। আচার্য শ্চেরবাৎস্কীর পত্র এল, যাতে লেখা ছিল লোলার একটি সুস্থ-সুন্দর পুত্র হয়েছে। পুত্রের জন্মে আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক, কারণ পুত্রই মানুষের পুনর্জন্ম এবং পরলোক। পত্রের সঙ্গে ফটোও ছিল।

মিটমাটের কথাবার্তার জন্য অমবারীর সত্যাগ্রহ স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। তা ১৩ মার্চ আবার করে শুরু হল। কিন্তু পুলিশ লোককে গ্রেপ্তার করতে চাইছিল না।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। আমি এই জন্য রেডিও চাইছিলাম। আর সেটাও কাগজে পড়ার পর যে বিহার সরকার জেলে রেডিও লাগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পরে সরকার এই কথাটি নিয়ে প্রচার করালো যে, আমি নাকি জেলকে আরামগৃহ বানাতে চাইছি। ১৭ মার্চ খবর পেলাম, হিটলার প্রাগ (চেকোশ্লোভাকিয়া) নিয়ে নিয়েছে। আমি ভাবতে লাগলাম—দেখা যাক, পরের পদক্ষেপ রাশিয়ার দিকে যায় না ইংলন্ডের দিকে। সেদিন এটাও জানা গেল যে, পুলিশের লোক যে-কৃষকরা সত্যাগ্রহ করছে

---

[১] রাজনীতি-সাম্যবাদ বিষয়ক গ্রন্থ। ১৯৪৭ সালে লিখিত। *কিতাব মহল* থেকে প্রকাশিত।—স·ম·

শুধু তাদের নয়, কর্মকর্তাদেরও ধরছে। রোজ আঠারো-কুড়ি জন সত্যাগ্রহ করতে যায়। কর্মকর্তাদের রেখে বাকিদের পুলিশ সন্ধেবেলায় ছেড়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে একজন এসেম্বলি মেম্বার সেদিন আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী দাবিগুলো নিয়ে ভাবার জন্য সময় চাইছেন। আপনারা অনশন-ধর্মঘটের সংকল্প ত্যাগ করুন।' আমি বললাম, 'আমি আমার চারজন সাথীকে উপবাস না করার জন্য রাজি করিয়েছি। আমিও ধর্মঘট কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখতে প্রস্তুত। কিন্তু সরকার কৃষক কয়েদীদের রাজনৈতিক বন্দী বলে স্বীকৃতি দিক।' কংগ্রেস মন্ত্রীসভা তাদের শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কথাটি মেনে নেয়নি। সারা পৃথিবী আশ্চর্য হবে যে এই কৃষকরা চোর ডাকাত ছিল না। এরা তাদের অধিকারের জন্য সেই রকমই লড়াই করেছিল এবং জেলে এসেছিল যেমন কংগ্রেসী সত্যাগ্রহীরা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করার জন্য জেলে যেত। সে-সময় যারা রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বিশেষ সুবিধের দিকে জোর দিয়েছিল এখন তারাই কৃষক-সত্যাগ্রহীদের রাজনৈতিক বন্দী না—চোর-ডাকাত বলে মানতে প্রস্তুত ছিল। এতে আশ্চর্য হওয়ার প্রয়োজন নেই, মন্ত্রী স্বয়ং ছিলেন জমিদার, কৃষক আন্দোলনের জন্য তিনি বিব্রত হচ্ছিলেন, তিনি নিজের শ্রেণীশত্রুদের সঙ্গে আর কি করে ন্যায় করতেন?

প্রথম অনশন-ধর্মঘট (১৮-২২ মার্চ)—আমি আগে যেমন লিখেছি, আমার অন্য সাথীরা মেনে নিল এবং ১৮ মার্চ দুপুর থেকে আমি একা অনশন-ধর্মঘট (উপবাস) শুরু করে দিলাম। সেদিনও কয়েকজন কংগ্রেস নেতা এলেন এবং উপবাস না করার জন্য বলতে লাগলেন। পরের দিন (১৯ মার্চ) একজন এম· এল· এ· বন্ধু এলেন। তিনিও উপবাস স্থগিত করার জন্য বললেন। আমি তাকে বলে দিলাম, 'এখন এ ব্যাপারে এত মনোযোগ দেয়ার চেয়ে যে জন্য উপবাস করা হচ্ছে তা মেনে নেবার চেষ্টা করলেই ভাল হবে।'

২০ তারিখ উপবাসের তৃতীয় দিন ছিল। ওজন ১৮৪ পাউণ্ডের জায়গায় ১৭৫ পাউণ্ড হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ দিনে নয় পাউণ্ড ঘাটতি। এবার আমাকে সেলে পৌঁছে দেয়া হল। আমার পাশের সেলে একজন ফাঁসির আসামী ছিল। আজ 'তুমহারী ক্ষয়' পুস্তিকা লিখে শেষ করে ফেললাম। চতুর্থ দিনে ওজন মাত্র আধ পাউণ্ড কমেছিল। ২১ মার্চ শরীর একটু দুর্বল বোধ হচ্ছিল। সোডা মেশানো জল আমাকে দেয়া হচ্ছিল। খিদে মরে গিয়েছিল। পড়তে ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। ২২ মার্চ উপবাসের পঞ্চম দিন ছিল। ইনস্পেক্টর জেনারেলের চিঠি নিয়ে কোনো একজন ভদ্রলোক এলেন। তাতে লেখা ছিল, 'এখনকার মত আমরা সমস্ত দাবি মেনে নিচ্ছি।' তিনি ফোনে এই অনুমতিও দিয়ে দিলেন যে আমাদের সব সাথীকে স্পেশ্যাল ক্লাস ২-তে রাখা হবে এবং আমরা রেডিও আনাতে পারব। সেই দিন দুপুরেই আমি উপবাস ভঙ্গ করলাম। অমবারী সম্বন্ধে জানা গেল যে, ওখানে সভাগুলোতে পনের-কুড়ি হাজার কৃষক জমা হয়, লোকে দিনে দুবার খেতে সত্যাগ্রহ করতে যায়—সকালে স্ত্রীলোক এবং বালকরা আর তিনটের সময় পুরুষরা। ২৩ মার্চ আমি আমার সাথীদের মাঝে চলে এলাম।

—১৯৩৯—

কয়েকদিন থেকে আমার মনে হচ্ছিল যে, রাজনৈতিক প্রগতি আর ভবিষ্যতের কাজ সম্বন্ধে একটা উপন্যাস লিখি। এখন পর্যন্ত আমি শুধু 'বাইসবী সদী'-ই উপন্যাসের ঢঙে লিখেছিলাম, 'সতমীকে বচ্চে'[1] ইত্যাদি কয়েকটি গল্প লিখেছিলাম, কয়েকটি ইংরেজি উপন্যাসের ভারতীয়করণের সঙ্গে হিন্দি অনুবাদও করেছিলাম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো মৌলিক উপন্যাস লিখি নি। ২৫ মার্চ থেকে আমি 'জীনেকে লিয়ে'[2] উপন্যাস লিখতে শুরু করলাম। আমি বলে যেতাম আর নাগার্জুনজী লিখে যেতেন।

২৮ মার্চ খবর পাওয়া গেল যে অমরাবীতে সত্যাগ্রহীদের মারা হয়েছে এবং কিছু লোকের গুরুতরভাবে আঘাত লেগেছে।

২৯ মার্চ শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মহমুদ এলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'চলুন, জেল থেকে বেরিয়ে পঞ্চায়েতী কৃষিকাজ দেখাশোনা করি।' আমি বললাম, 'এখন তো কৃষকদের কাছে খেতই নেই। আগে নিজের খেত থাকতে হবে তো?'

হাতে হাতকড়া—আমার মোকদ্দমা ছিল সিওয়ানের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। আমার ওপর আর আমার সাথীদের ওপর ৩৭৯ ধারায় চুরির অপরাধ দেয়া হয়েছিল। আমাদের তারিখ ছিল ৩১ মার্চ। সেদিন দুপুরের পর জেলের দরজায় দুটো ফটকের মাঝখানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। পুলিশ-সেপাই আমার হাতে হাতকড়া লাগাতে থাকল। জেলের একজন অফিসার বললেন, 'হাতকড়া ছাড়াই নিয়ে যাও।' তাতে পুলিশের লোকেরা ওয়ারেন্ট দেখিয়ে বলল, 'হাতকড়া লাগানোর জন্য এখানে লেখা আছে।' আমি সেই দিনের ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'আজ ইচ্ছাপূর্বক হাতকড়া লাগানো হল, ওয়ারেন্টে বিশেষ করে লিখে দেয়া হয়েছিল হাতকড়া পরানোর জন্য। ভাল, এই সাধও মিটল।' ট্রেনে ধূপনাথের সঙ্গে দেখা হল এবং আরও কত বন্ধুর দেখা পেলাম। মনে হল, জেলার কৃষকদের চেতনা এসে গেছে। তারা জমিদারের সামনে দমে যেতে রাজি নয়।

পরের দিন (১ এপ্রিল) দুটোর সময় আমাদের কাছারি নিয়ে যাওয়া হল। চন্দেশ্বর সিংহের লোকেরা সাক্ষী দিল যে বহুরিয়া (জমিদার গিন্নি)-র খেত কাটার জন্য রাহুলজী দশজন লোক নিয়ে গিয়েছিলেন। কুরবান বাধা দিল, রাহুল তাঁর কাস্তে দিয়ে তার ওপর আঘাত করলেন এবং তার হাত কেটে গেল। সে আত্মরক্ষার জন্য বটগাছের ডাল চালাল।

আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করলেন তখন আমি বললাম, 'খেত বহুরিয়ার এবং আমরা বে-আইনিভাবে ভিড় করেছিলাম—এই কথাটা আমি অস্বীকার করছি। কিন্তু খেত কাটার কথা আমি মানছি।' অন্য সাথীদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, 'আমরা জানি না, বাবা জানেন।' আমাদের পরবর্তী তারিখ পড়ল ১৪ এপ্রিল।

পরের দিন (২ এপ্রিল) দুপুরের গাড়িতে আমরা ছাপরা রওনা হলাম। হাতকড়া

---

[1] পরবর্তী সময়ে (১৯৩৫) লেখক এই নামে স্বতন্ত্র একটি গল্পগ্রন্থও লেখেন এবং এটাই লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ, যা *কিতাব মহল* থেকে প্রকাশিত হয়।—স·ম·

[2] লেখকের প্রথম উপন্যাস। ১৯৪০ সালে লিখিত। *কিতাব মহল* থেকে প্রকাশিত।—স·ম·

আবার পরানো হল। ওয়ারেন্ট আমি দেখলাম, তাতে লেখা ছিল—'Supplied 5 pairs of handcuffs' (৫ জোড়া হাতকড়া দেয়া হয়েছে)। এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, অফিসার জেনে-শুনে অপমান করার জন্য হাতকড়া পরাচ্ছে। কিন্তু আমার তো তাতে কোনো অপমান বোধ হচ্ছিল না। যখন আমি ছাপরা স্টেশনে নামলাম তখন কোনো বন্ধু হাতকড়া সহ আমার ফটো তুলে নিল। সেটা খবরের কাগজে ছাপা হল। বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার প্রতি লোকে আক্ষেপ প্রকাশ করল। তারপরে সরকার ছাপাল যে আমি যেচে হাতকড়া পরেছিলাম—যা আদ্যান্ত মিথ্যা কথা।

মঢ়ৌরা ফ্যাক্টরির বিবাদের মীমাংসা করানোর জন্য তিন পঞ্চ-এর পঞ্চায়েত ছিল, যাতে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে প্রথমে মিস্টার পিল্লে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ৩ এপ্রিল তিনজন পঞ্চেরই মঢ়ৌরাতে একত্র হওয়ার ছিল। পুলিশ আমাকে জেল থেকে নিয়ে চললো, কিন্তু যেতে যেতে ট্রেন ছেড়ে গেল। সন্ধেয় যাওয়ার ছিল কিন্তু আবার তার এসে গেল যে মিস্টার পিল্লে কাল আসছেন না।

৬ এপ্রিল কয়েকজন ফাঁসির আসামী মুক্তি পেল। সোনপুরের শক্তিশালী জমিদার একজন লোককে খুন করিয়েছিল যাতে চারজন লোকের ফাঁসির সাজা হয়েছিল, কিন্তু মালিক পরিষ্কার বেঁচে গিয়েছিল। জেলের ফটক থেকে বেরোনোর সময় তার মোসাহেবরা খুব জয়ধ্বনি দিল। এটা আমার খুব খারাপ লাগল। তারই কথায় চারজন লোক ফাঁসিতে চড়তে যাচ্ছিল, এ কথাটা তো তার মনে করা উচিত ছিল। যদি তাদের কাছেও মোকদ্দমা লড়ার জন্য সেরকম টাকা থাকত তাহলে খুব সম্ভব তাদের ফাঁসির সাজা হতো না।

আমাদের সত্যাগ্রহী সাথীদের মধ্যে অধিকাংশ অশিক্ষিত কৃষক, কিছু অল্প শিক্ষিত আর কিছু বেশি শিক্ষিত লোক ছিল। সকলেই গ্রামবাসী তবু তাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। আমি ভাবতাম শিক্ষিতরা অশিক্ষিতের সঙ্গে কেন চলতে পারে না? বস্তুত এগারো জন লোকের সাঁইত্রিশ জন লোক থেকে আলাদা থাকার দরকারটা কি? এটাও ঠিক যে, জেলে বেকার থাকাটাও ঝগড়ার একটা কারণ। আমি ৯ তারিখে ডায়েরিতে লিখেছি—'শিক্ষিত সাথীরা আমার প্রতি খুব বিরক্ত। কারণ এই যে, আমি অশিক্ষিত সাথীদের কেন দাবিয়ে রাখি না? কিন্তু শিক্ষিতদের কি অশিক্ষিতদের সঙ্গে থাকাটা অসম্ভব? কিছু অসুবিধে অবশ্যই রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল যে শিক্ষিত (স্বয়ং) একটি পৃথক শ্রেণী হয়ে যায়।' আমাদের শিক্ষিতদের ব্যবহার বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু তারা ভুলভ্রান্তিগুলোকে দূর করতে পারেনি।

'ভুলভ্রান্তি বেশির ভাগ ছিল অসত্য ব্যাপার নিয়ে।' ১৮ এপ্রিল ডায়েরিতে লিখেছিলাম— 'শিক্ষিত কেন সাধারণ জনতার কাছে বিশ্বাসের পাত্র হতে পারে না, শেষমেশ তারাও তো তাদেরই একজন? তারা ওদের পরোয়া করে না।' পরের দিন লিখেছিলাম—'নেতৃত্বের ঈর্ষাই ঝগড়ার প্রধান কারণ।' আমি এটা বলছি না যে অশিক্ষিত কৃষকদের কোনো দোষ ছিল না, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা এক সঙ্গে থাকলে লোকে নগ্ন হয়ে পড়ে, এজন্য ধামাচাপা দিয়ে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা অর্থহীন। এই কথাটা

—১৯৩৯—

আমাদের শিক্ষিতরা মানতে রাজি ছিল না।

আমার অনশন ধর্মঘট কংগ্রেসী সরকারকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সময় দেবার জন্য স্থগিত ছিল। তা আবার শুরু করার ছিল। ১৩ এপ্রিল আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনশন ধর্মঘটের খবর পাঠিয়ে দিলাম। সেদিন পাটনা থেকে আসা এক বন্ধু খবর দিল যে, কৃষক কয়েদীদের দাবি সরকার মানবে না এবং উপবাস করলে আমাকে জেল থেকে ছেড়ে দেবে। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কাছে আমি এমন কি দাবি করেছি যা তারা নিজেরাই রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য করত না—যদি তারা আমার মত জেলে থাকত?

১৪ এপ্রিল শ্রীবাসুদেব নারায়ণ এবং অন্য সাতজন সাথী সিওয়ানে এলেন। তাঁদের এক বছর করে কড়া সাজা হল। সেই দিনই আমাকেও সিওয়ান নিয়ে গেল, আবার আমার হাতে হাতকড়া পরানো হল, আর সাধারণ নয়—সশস্ত্র পুলিশ আমার সঙ্গে চলল। সিওয়ান স্টেশনে নামলাম, লোকের ভিড় বাড়তে লাগল আর হাজার হাজার লোক পিছনে পিছনে জেল পর্যন্ত গেল।

সাজা এবং অনশন ধর্মঘট—১৫ এপ্রিল জেলের ভেতরেই আমাদের মামলা চলল। মি· ব্রাইসন তো ছিলেন একজন নতুন আই·সি·এস· ইংরেজ, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি স্বেচ্ছাচারিতাটা ভালরকম শিখে গেছেন। তিনি এমনভাবে আদালত বসালেন, যাতে আমাকে সবসময় দাঁড়িয়েই থাকতে হয়। হয়ত ভেবেছিলেন, এই অপমানের দ্বারা তিনি আমাকে হতাশ করতে পারবেন। কিন্তু মান-অপমানকে আমি অনেক আগেই ফেলে এসেছি। তবে হ্যাঁ, ব্রাইসন নিশ্চয় মানসিক শান্তি পেয়েছিলেন। তিনি একজন পরম ইংরেজভক্ত অবৈতনিক গোয়েন্দা পুলিশ অফিসারকে এই কাজের জন্য সম্মানও করছিলেন। আমি বিরোধিতা করতে আদালতের কাজে কোনো ভূমিকা নিইনি।

আমার বিরুদ্ধে পাঁচজন ছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল রঘুনাথপুরের দারোগা, জংবাহাদুর সিংহ। জংবাহাদুর সিংহ দুটো কথা সম্পূর্ণ মিথ্যে বলেছিল। একটা হল যে, গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই আমার মাথায় চোট লেগেছিল, এবং অন্যটি হল, কুরবানেরও চোট লেগেছিল। প্রথম মিথ্যেটা সে এইজন্যে বলেছিল, যেহেতু সরকারী হেফাজতে কোনো ব্যক্তি থাকলে তার সমস্ত দায়িত্ব সরকারী অফিসারের। মাথা ফাটার মানে হল, অফিসার অসাবধানতা দেখিয়েছিল। এইভাবে নিজেকে বাঁচাবার জন্য একটা মিথ্যা তো সে বলেইছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মিথ্যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তার গুপ্তচর-জমিদারকে সাহায্য করতে চাওয়া। তার বলার মানে ছিল যে আমি শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ করি নি, বরং কাস্তেকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছি। প্রথম দিনের শুনানির সময় আমি লক্ষ করেছিলাম যে, কুরবানের হাতে পটি বাঁধা ছিল। জমিদার নিশ্চয়ই ওর হাত জখম করেছিল। তা হলে কি পুলিশও আমার মামলাতে পুরো আগ্রহ দেখাচ্ছিল? শুধু পুলিশ কেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং সিওয়ানের ম্যাজিস্ট্রেটও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

সম্ভবত তাঁরা ভেবেছিলেন যে, এই রাশিয়া-ফেরত বলশেভিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নানা গোলযোগ সৃষ্টি করছে, অতএব তাকে দাবিয়ে রাখা এবং ইংরেজ-ভক্ত জমিদারকে সাহায্য করা তাদের কর্তব্য। আমার কড়া সাজা হল, ১৪৩ ধারায় (বেআইনি জমায়েতে অংশ নেওয়ার জন্য) এবং ৩৭৯ ধারায় (আখ চুরির অপরাধে), প্রতি দফায় ছ-মাসের সাজা এবং ২০ টাকা জরিমানা। জরিমানা দিতে না পারলে আরো তিন মাসের সাজা। এটা ছিল আমার তৃতীয় হাজত বাসের সাজা। তাও আবার চুরির অপরাধে! আর সশ্রম সাজা! চমৎকার!

পরের দিন (১৬ এপ্রিল) পুলিশ আমাকে নিয়ে চলল ছাপরার দিকে। ওরা আমার হাতে হাতকড়া পরাতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। দুটো হাতে হাতকড়া পড়ে গেল। ঐ দিনই আমরা ছাপরা জেলে চলে গেলাম। এবার গ্রেপ্তার হয়ে জেলে ঢুকে আমি হাফ-হাতা কুর্তা ও হাফপ্যান্ট পরা শুরু করেছিলাম। কিন্তু এখনও পীতবস্ত্র আমার কাছে ছিল। ১৭ এপ্রিল আমি পরার জন্যে কয়েদীর পোশাক পেলাম। ঐ দিন আমি লিখেছিলাম—'যাক, ধর্মের সংগে আর নামমাত্র সম্বন্ধও রইল না।' আর এ কথাও লিখেছিলাম—'মিস্টার ক্যাম্প্ কালেক্টর তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে। সমস্ত পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগ নিযুক্ত হয়েছে। জেলার সব জমিদারদের সংগে এখানেই মোকাবিলা চলছে।' এখন আমাদের প্রত্যেকের মাথা পিছু ১০ সের করে গম পেষাই করার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। আমরা চাকী ইত্যাদিও দেখে এসেছিলাম।

পুলিশী তদন্ত—কংগ্রেস মন্ত্রীরাও এই ধরনের দমন-নীতির জন্য প্রস্তুত ছিল, যেমন প্রস্তুত ছিল সারনের (ছাপরা) ইংরেজ-অফিসার। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না, ওরা শ্রেণী স্বার্থেই এটা করছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন হয়নি, কৃষকের শক্তিকে দমন করার এই চেষ্টাকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বলা যেত না। কিন্তু সংবাদপত্রগুলোতে আমার মাথা ফাটানো, হাতে হাতকড়া লাগানো ও অন্যান্য অপমানজনক খবর ছাপা হয়েছিল। সাংবাদিকরা বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে ধিক্কার দিচ্ছিল, যার ফলে সরকারের কিছুটা ধামাচাপা দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। সরকার এই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দিলেন পুলিসের ইন্সপেক্টর-জেনারেল অলখকুমার সিংহের ওপর। একজন সাধারণ কনস্টেবলের পক্ষে প্রমোশন পেতে পেতে একেবারে ইন্সপেক্টর জেনারেল হয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই একটি অসাধারণ ঘটনা। অলখবাবুর কিছু বিশেষ যোগ্যতা যে ছিল সেটা অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কেননা শুধুমাত্র সাধারণ যোগ্যতা তাকে এত উঁচুতে পৌঁছে দিতে পারত না। তার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা ছিল এই যে, সে তার শরীর ও আত্মা ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। কাজেই এরকম একজন লোক যদি তদন্ত করতে আসে, তাহলে তার থেকে কি আশা করা যায়? সে আমার আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, আমি সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দিলাম।

ঐ দিনই সাতটার সময় আমাকে জেল থেকে সিওয়ানের দিকে নিয়ে চলল। আমার সংগে দুজন পুলিশ ও একজন দারোগা ছিল।

—১৯৩৯—

পরদিন (২১ এপ্রিল) পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ এবং কালেক্টর সকলে অমবারী এসে পৌছল। রামযশ সিংহের গোয়ালের দরজায় আমি গেলাম। সেখানে বললাম যে, এই জায়গাতেই আমি সত্যাগ্রহ শুরু হওয়ার ২ ঘণ্টা আগে দারোগাকে জানিয়েছিলাম। এরপর আমরা এখান থেকে দশটার সময়ে গেলাম রোশন ভগতের খেতে। রোশন ভগতের খেতে পৌছে আমি ঘটনাস্থলটিকে দেখালাম। দারোগা জংবাহাদুর আমাকে জেরা করতে শুরু করল। ও যত কথা বলে চলল তার কিছুই ইন্সপেক্টর জেনারেল নোট করছিল না, কেবল আমার কথাগুলো কেটে-ছেঁটে লেখাচ্ছিল। দারোগা জংবাহাদুর সিং ও পুলিশ ইন্সপেক্টর বিক্রমাজিৎ সিংহ আমাকে চার ঘণ্টা ধরে জেরা করেছিল। সমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে এই তদন্ত আসল ব্যাপারকে চাপা দেওয়ার জন্যই চলছিল। আশেপাশের গ্রামে খবর পৌছে গিয়েছিল এবং দলে দলে লোক ওখানে জমা হচ্ছিল। ঐ দিনই আমরা সিওয়ানে ফিরে এলাম।

বিকেল সাড়ে চারটের সময় আবার তদন্ত শুরু হল। ওখানে ইন্সপেক্টর জেনারেল, পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ইংরেজ), কালেক্টর (ইংরেজ), বিক্রমাজিৎ সিংহ (ইন্সপেক্টর), স্টেনোগ্রাফার ও আমি সব শুদ্ধ ছয়জন উপস্থিত ছিলাম। ওখানেও আমি লক্ষ করছিলাম যে, ইন্সপেক্টর জেনারেল আমার সব কথা লেখাচ্ছিল না এবং যা লেখাচ্ছিল তাও কাটছাঁট করে। আমি এর প্রতিবাদ করলে ইন্সপেক্টর জেনারেল (অলখবাবু) চিড়বিড়িয়ে উঠল। আমি তাকে স্পষ্ট বলে দিলাম, 'আমি তোমাকে আমার ঈশ্বর মনে করছি না। তুমি নিজেকে আমার ভাগ্যবিধাতা মনে করে ভুল করছো। তুমি কোন কাজের যোগ্য লোক সেটা নিজের মনকে প্রশ্ন করো।' ইন্সপেক্টর-জেনারেলের মেজাজ কিছুটা ঠাণ্ডা হল। সে বলল, 'আমার বয়সের কথাটাও একটু মনে রাখো।' আমি বললাম, 'আমারও বয়স ৪৬ বছর। আমাদের বয়সের বোধ হয় খুব বেশি তফাৎ নেই।'

আরো কিছুক্ষণ লেখালিখি চলল, তারপর আমি ছুটি পেলাম। আর সেই রাতেই আমি ছাপরা চলে গেলাম।

জেলখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই দারোগা আমাকে নিয়ে গেল শহরের থানায়। এই দারোগা মানুষ হিসেবে ভদ্র ছিলেন। আমি হাফ প্যান্ট ও হাফ শার্ট পরে চেয়ারে বসেছিলাম। লোকজন আর কি করে জানবে যে, এ একজন চুরির দায়ে অভিযুক্ত আসামী বসে রয়েছে। ওরা আমাকেই দারোগা মনে করে সেলাম করছিল। জল খাবার খেয়ে দারোগা আমাকে থানায় রেখে চলে গেলেন।

এবার অমবারী সত্যাগ্রহের জন্য যখন আমি পাটনা থেকে এসেছিলাম, কখন সাদা (লেগহর্ন) মুরগির ডিম সঙ্গে এনেছিলাম, এই উদ্দেশ্যে যে, সেগুলো তা দেবার পর বাচ্চা হবে, তখন একটি পোলট্রি করা যাবে। পোলট্রির জায়গাও বাছা ছিল এবং শহরের সবচেয়ে মান্য দেবতার নামে পোলট্রির নাম রাখার কথা ছিল, 'ধর্মনাথ মুরগিভবন'। সত্যাগ্রহের পর পোলট্রির পরিকল্পনা তো মাঝামাঝি অবস্থায় থেকে গেল। ২২ এপ্রিল জানা গেল বারোটি ডিমের মধ্যে মাত্র চারটি ফুটে ছানা হয়েছে। ডিমগুলো কয়েকদিন তা

না দেওয়া অবস্থায় ছিল, তার ফলেই এটা হয়েছিল। মুরগি-পালক দুটো ছানা নিজে নিয়েছিলেন এবং দুটো আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। একজন আন্দোলনকারী এ-কাজ কেমন করে করতে পারত? ২২ এপ্রিল আমি প্রধানমন্ত্রীকে তারবার্তায় জানালাম যে, আমাদের দাবি না মেটানো হলে ১ মে থেকে আমাকে অনশন ধর্মঘট করতে হবে।

পরের দিন (২৩ এপ্রিল) বাবু মথুরা প্রসাদ এলেন। তাঁর সংগে চাষী-কয়েদীদের দাবি নিয়ে কথাবার্তা হল। তারই মধ্যে পুলিশের হাবিলদার এল আমার আঙুলের ছাপ নিতে। চুরির দায়ে অভিযুক্ত কয়েদিদের আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়। আমি চুরির দায়ে অভিযুক্ত ছিলামই। আমি বললাম, 'আমার কোনো আপত্তি নেই। একটা কেন আমার পাঁচ আঙুলেরই ছাপ নিন।' মথুরাবাবু বারণ করে দিলেন, আঙুলের ছাপ নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট আই·জি-র করা জেরার কাগজপত্র নিয়ে এল আমার সই-এর জন্য। আমি 'Distorted and many points left out' (বিকৃত এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বাদ দেওয়া হয়েছে)। লিখে সই করলাম। পার্লামেন্টারি সেক্রেটারিবাবু কৃষ্ণবল্লভ সহায়ও আমাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করলেন। কালেক্টর চিঠি দিয়েছিল যে সরকার কুরবানের বিরুদ্ধে মামলা চালু করতে চায়। সন্ধেয় কৃষ্ণবল্লভবাবু ও মথুরাবাবু আবার আমাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করলেন, যার থেকে জানা গেল যে, কংগ্রেস সরকার চাষী কয়েদীদের রাজনৈতিক বন্দী বলে স্বীকার করতে রাজি নয়। ভবিষ্যতের মানুষরা হয়ত এটা পড়ে অবাক হবেন যে, এই কৃষক বন্দীরাও তাদের অধিকারের জন্যই তেমনি লড়াই করছিল ঠিক যেমন ভাবে একদিন কংগ্রেসী বন্দীরা লড়াই করেছিল। তাহলে কৃষকদের দ্বারা নির্বাচিত কংগ্রেস সরকার কেন উচিত দাবি মানতে রাজি হননি? কিন্তু এটা একটা সামান্য ব্যাপার—কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তার বিরোধীকে সুবিধে দিতে কখনোই রাজি হয় না। জমিদার-মন্ত্রীরা ভেবেছিল যে এরকম করলে তাদের নিজেদের হাতেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারা হত।

২৭ এপ্রিল ডঃ শ্চেরবাৎস্কীর চিঠি এল। এটা ১৭ মার্চে লেখা, সঙ্গে একটি শিশুর এবং লোলারও ছবি ছিল।

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে বাসুদেব নারায়ণ, মাজহার, জলিল ও নাগার্জুনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী বানানো হয়েছিল। ৩০ এপ্রিল হাজারীবাগে পাঠানোর কথা ছিল, কিন্তু আমি পরদিন থেকেই অনশন ধর্মঘট শুরু করবো বলে তারা যেতে অস্বীকার করল। ফলে তাদের ওখানেই রেখে দেওয়া হল।

১০ দিনের (১-১০ মে) উপবাস—নিজের প্রকৃত দাবি আদায়ের কোনো উপায় দেখতে না পেলে বন্দীকে অনশন ধর্মঘট করতে হয়। আমার অনশন ধর্মঘট আমি কোনো হাল্কা মনোভাব নিয়ে শুরু করিনি, আমি তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলাম। সরকারকে সুযোগ দেওয়ার জন্য একবার কিছুদিনের জন্য অনশন করে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু সরকার একতিল নড়েনি। কংগ্রেসী জমিদাররা কতটা জলে রয়েছে, সেটা যে শুধু আমারই জানা ছিল তাই নয়, অন্য সকলের কাছেও তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আমি ১ মে

থেকে অনশন শুরু করেছিলাম এবং ১০ দিন তা বজায় ছিল—যখন আমাকে জেল থেকে বের করে দেওয়া হল তখন অনশন ভঙ্গ হয়েছিল। সেই সময় আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা ছিল নিম্ন-প্রকার—

দিন	ওজন (পাউণ্ড)	নাড়ির গতি	হৃদস্পন্দন	তাপমাত্রা	বিশেষ কিছু
১	১৭৪	...	...	...	...
২	...	...	...	...	দুর্বলতা
৩	...	...	...	...	দুর্বলতা নেই, খিদে মরে গেছে
৪	...	৬৪	১৮	১০২° জ্বর	দুর্বলতা, কাঁপুনি
৫	১৬৮	৬৬	১৬	...	চটপটে ভাব
৬	১৬৪	...	...	...	দুর্বলতা নেই
৭	১৬০	...	...	...	উঠলে বসার ক্ষমতা আছে, অন্ত্রে মোচড়
৮	১৫৮	৭২	১৮	৯৫·৪°	...
৯	১৫৯*	...	...	...	...
১০	১৫৬	৭৪	২০	...	...

* সম্ভবত এই ওজনটি ত্রুটিপূর্ণ। ১৫৮ পাউণ্ড অপেক্ষা কম হওয়াই স্বাভাবিক।—স·ম·

অনশন করার সময় আমি বন্ধুদের বলে দিয়েছিলাম সাতদিন না কেটে গেলে কেউ যেন অনশন আরম্ভ না করে। পরের দিন পাটনা থেকে টেলিফোন এল যে, আমাকে হাজারীবাগে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আমি যেতে অসম্মত হই। চতুর্থ দিনে জেল কর্তৃপক্ষ আমাকেজোর করে নাকের ভেতর দিয়ে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সে সফল হতে পারেনি। আমার খুব যন্ত্রণা হয় এবং দুপুরের পর ১০২° জ্বর চলে আসে। মাথায় ও শরীরে ব্যথা শুরু হয়। কালেক্টর জেলে এসেছিল। আমি জানতে পারি যে আমাকে হাতকড়া পরানোর ব্যাপারটি নিয়ে তদন্ত চলছে। পঞ্চম দিনে জেল বিভাগের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি কৃষ্ণবল্লভবাবু এলেন। দাবির বিষয়ে কথাবার্তা হল। তিনি বললেন, 'অনশন বন্ধ করুন। সরকার দাবির ব্যাপারে আলোচনা করছেন।' আমি বললাম, 'আমি এত তাড়াতাড়ি মরব না। আপনারা দাবি মেনে নিয়ে অনশন বন্ধের চেষ্টা করুন।'

—১৯৩৯—

আজ থেকে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। তৃতীয় দিন পর্যন্ত আমি তো 'জীনে কে লিয়ে' নিয়ম করে লিখিয়েছিলাম। সকাল সাতটা পর্যন্ত বইটা আমি একটুখানি লিখিয়ে ছিলাম। আমার ওঠা-বসা-চলাফেরার জন্য কোনো একজনের সাহায্যের দরকার হচ্ছিল। চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে এসেছিল। পেটে একটু ব্যথা ছিল, কিন্তু খিদে ছিল না। ঐ দিনই জেল বিভাগের আই·জি· মিস্টার অংগর এলেন। তিনি আমায় দুধ-বার্লি খেতে বললেন এবং অনুরোধ করলেন আমি যেন নিজের প্রাণটা না দিই। আমি বললাম, 'আমি প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত। জুয়োতে আমি জীবনকে বাজি রেখেছি।'

জেলের বাইরে—৮ মে খবর পেলাম যে স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা রোজ সকাল-সন্ধে আমার ব্যাপারে মিছিল বার করছে ও কংগ্রেস সরকার বেইজ্জত হচ্ছে। দশ দিনের মাথায় (১০ মে) রাতে গেট পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার জন্য ডাকা হল। আমি কারও সাহায্য নিলাম না, নিজে নিজেই হেঁটে গেলাম। কালেক্টর এসেছিলেন। তিনি বললেন, 'বিহার সরকার আপনাকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে।' এরপর তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে গাড়িতে করে হাসপাতালে ছেড়ে দিয়ে গেলেন। ২৪২ ঘণ্টার পর আমি অনশন ভঙ্গ করলাম। আমাদের দাবি পূরণ করা হয় নি, কিন্তু আমি জানতাম যে, কৃষকদের জন্য আমায় বহুবার জেলে আসতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো মীমাংসা হয়, ততক্ষণ জেলে আমার কিছুই খাওয়া চলবে না।

পরদিন আমি পণ্ডিত গোরখনাথ ত্রিদেবীর বাড়ি গেলাম। ডাঃ সিয়াবরশরণ নিজের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি দেখা করতে এলেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। ১৬ মে তাঁর গাড়িতে আমি জামো-বাজার চলে গেলাম। এটি একটি গ্রাম এবং নির্জন জায়গা। ডাঃ সিয়াবর একজন সফল ডাক্তার। শুধু সফলই নন, তিনি সহৃদয়ও—কেবল আমার কাছে না সব গ্রামবাসীদের কাছেই। পরদিন (১৭ মে) স্বামী সহজানন্দ ও পণ্ডিত যদুনন্দন শর্মার সিওয়ানে আসার কথা ছিল। বিরজা (ব্রজবিহারী মিশ্র) অমবারীতে খুবই তৎপরতার সঙ্গে নির্ভীকভাবে কাজ করেছিল। একবার কৃষকদের খোঁড়া একটা কুয়ো পুলিশ মাটি দিয়ে বুজিয়ে ফেলতে চেয়েছিল, বিরজা কুয়োর ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন মাটি ঢালা বন্ধ করতে হয়। পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র তাঁর এই সবচেয়ে ছোট ছেলেটিকে পড়াশুনো শেখাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বিরজা পড়াশুনো করেনি। তবু সে হৃদয়বান ছিল, সাহসী ছিল, নির্ভীক ছিল। বিরজা আমাকে সিওয়ান যাওয়ার কথা বলতে এসেছিল। ডাঃ সিয়াবরশরণ তাঁর গাড়ি ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিরাট সভা হয়েছিল, যাতে অমবারী থেকে ১৪ মাইল হেঁটে ৩০০ পুরুষ ও একশোর বেশি চাষী মেয়ে এসেছিল। সিওয়ানের লোকজন তাদের খাওয়া-দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করেছিল। এখানেই সর্বপ্রথম আমি যদুনন্দন শর্মার ভাষণ শুনতে পেয়েছিলাম। তাঁর পোশাক চাষীর মতো ছিল, এবং ভাষাও ছিল সেইরকম। তিনি এমন একটা বাক্যও বলতেন না যা কৃষকরা বুঝত না। তাঁর পোশাক ও কথাবার্তা থেকে কেউ বলতে পারত না যে তিনি হিন্দু ইউনিভার্সিটির একজন গ্রাজুয়েট। মনে হতো, চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজিও

বুঝি তিনি পড়েননি। ঐ দিনই আমি জামো ফিরেছিলাম। ডাঃ সিয়াবর মূলত শস্যবর্জিত ভোজনের আয়োজন করেছিলেন। শুধু দুপুরেই ভাত বা রুটি পাওয়া যেত। তা নইলে ডিম, মাছ, পায়রা, মুরগি, ঘুঘু বা পাঁঠার মাংসই ছিল প্রধান খাদ্য। এর সঙ্গে সবুজ শসা জাতীয় কিছু জিনিসও ছিল। বড় তাড়াতাড়ি আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছিল।

২১ মে 'জীনেকে লিয়ে'র অবশিষ্ট অংশটা লিখে শেষ করলাম। লোকজন সমানে আসা-যাওয়া করত আর পুলিশও জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছিল। জামোতে আমি ৯ দিনের বেশি থাকতে পারি নি, এর জন্য ডাঃ সিয়াবরের খুবই আফশোশ ছিল। শরীরে বল যখন ফিরে এল, তখন আর বিশ্রাম কি করে নেওয়া যায়? ২৪ তারিখ থেকে আমি আবার কাজ শুরু করলাম। ২৫ তারিখ অমবারীতে ৮,১০ হাজার জনতার এক বিশাল সভা হল, যাদের মধ্যে পাঁচ-ছশ মহিলা ছিল। ওদের দেখে মনে হয়েছিল যে, কৃষকদের কাছে অটুট শক্তি রয়েছে, ওরা অপরাজেয়। মেয়েরা নতুন ধরনের গান গাইছিল যার মধ্যে কৃষকের দুঃখ ও অত্যাচারের কথা ছিল।

২৬ মে মৈরবা গেলাম। হরিরাম ব্রহ্ম কোনো রাজার অত্যাচারের জন্য পেটে ছুরি ঢুকিয়ে মরেছিল। আজ সেই রাজার দুর্গ ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু হরিরাম ব্রহ্মের স্থান এক তীর্থে পরিণত হয়েছে, যেখানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ দর্শন করতে আসে। বার-চোদ্দ বছর হল যমুনা ভগত নামে এক নিরক্ষর কিন্তু সাধু স্বভাবের কুমোর ওখানে বড় কঠোর পণ শুরু করেছিলেন। যাত্রীদের থাকবার এবং স্নান ও হাত মুখ ধোয়ার খুব অসুবিধে হতো। যমুনা ভগত পণ করেছিলেন যে, ওখানে একটি পুকুর ও ধর্মশালা বানাতে হবে। ওঁর না ছিল বিদ্যা, না ছিল ধন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিহারে যে দেশভক্তির বন্যা এসেছিল, তাতে যমুনা ভগতও প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তাঁর উৎসাহ দেখে লোকজন দু-এক পয়সা দিতে শুরু করে। আজ ওখানে বাঁধানো পুকুর হয়েছে, একটি ধর্মশালাও আছে। যমুনা ভগতের গ্রাম গংপলিয়া ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। তিনি নিজে থাকতেন সাধুর মতো, যদিও তাঁর ঘরে বড় পরিবার ছিল। পরিবারের সবাই মাটির বাসন বানাতো আর কয়েক পুরুষ থেকে জমিদারের কাছ থেকে বিঘা কয়েক জমি নিয়ে চাষ করে আসছিল। বিহারে সাধারণত যেটা দেখা যায়, সার্ভে (জরিপ)-এর সময় জমিদার মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে দেয়, 'কি করবে নিজের নাম কৃষক হিসেবে লিখিয়ে? ছেড়ে দাও, আজ পর্যন্ত যেমন চাষ করে এসেছ তেমনি চাষ করে যাও।' সে মালগুজারি[১]-র রসিদও দিত না এবং গত বছর সে খেত কেড়ে নিয়েছে। যমুনা ভগতের পরিবারের লোকজন অনাহারে মরতে লাগল। যমুনা ভগত খুবই পুরনো ও সৎ কংগ্রেসী। রাজেন্দ্রবাবুর ঘর (জীরাদেই)-এর কাছাকাছি-ই শুধু থাকতেন না, তাঁর সঙ্গে ভাল পরিচয়ও ছিল। কংগ্রেসের যখন কাজ পড়ত, তখনই

[১]· সরকারের প্রাপ্য মালজমির খাজনা। এটি ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি মোটামুটিভাবে গ্রামভিত্তিক প্রজাসত্ত্বের মতো। একসময় মধ্যপ্রদেশেও মালগুজারির পদ্ধতি প্রচলিত ছিল—স·ম·

—১৯৩৯—

যমুনা ভগত হরিরামধাম ছেড়ে সেখানে পৌঁছে যেতেন। দুর্ভাগ্যবশত জমিদার ছিল কায়স্থ, স্বজাতির ব্যাপার। সেই জন্য ন্যায় করা সহজ কাজ ছিল না। জেলার শেষ সীমা পর্যন্ত সব কংগ্রেসী নেতাদের কাছে তিনি ছুটোছুটি করতে থাকলেন, কিন্তু কেউ তাঁর আর্জি শুনল না। একদিন লাল জামা পরা দশজন কৃষক স্বেচ্ছাসেবী গংপলিয়া পৌঁছে গেল। জমিদারবাবু ঘাবড়ে গেল এবং সে সমঝোতা করার কথা শুরু করল। সমঝোতা হয়েছিল কিনা—সে কথা আলাদা।

রাজেন্দ্র কলেজে ছাত্র ও প্রিন্সিপালের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। প্রিন্সিপাল হাজারী যোগ্য ও সজ্জন ছিলেন কিন্তু তিনি জানতেন না আজকের তরুণদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত। তিনি অনেক ছাত্রকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্র কলেজ এতদিনে বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। অনেকে ভাবতে শুরু করেছিল যে অন্য প্রান্তের একজন সিন্ধীকে এত বড় চাকরি দেওয়া ঠিক হয় নি। এটা আমাদেরই কোনো স্বজাতিকে দেওয়া উচিত। তারা ছাত্রদের আরও বেশি উসকে দিয়েছিল। আমি ২৯ মে ছাপরায় ছিলাম। কলেজের ছাত্ররা কথাবার্তা বলল। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বোঝা গেল যে, কলেজকে বাঁচাতে হলে প্রিন্সিপাল হাজারীকে সরানো ছাড়া কোনো রাস্তা নেই।

১০ জুন প্রিন্সিপাল হাজারী রাজেন্দ্র কলেজ ছেড়ে দিলেন। আমি যদি এর মধ্যে না থাকতাম তাহলে তিনি এত সহজে তাঁর জায়গা ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তাঁর বিদায়ের সময় মনে হচ্ছিল যে প্রিন্সিপাল হাজারীর সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। যদিও সেটা তাঁর নিজেরও কিছু ভুলের জন্যে হয়েছিল। সব ধনতান্ত্রিক দেশেই যেখানে অর্থ এবং অধিকারের প্রশ্ন দেখা দেয়, সেখানেই সততা এবং ন্যায়কে তাকে তুলে রাখা হয়। ভারতবর্ষে এটা আরো বীভৎস রূপ ধারণ করে। যদি কোনো উচ্চ পদে বা উচ্চ সংস্থায় কোনো ব্রাহ্মণ পৌঁছে যায়, তখন সে সেখানে ব্রাহ্মণদের ঢোকানোর চেষ্টা করে। যদি রাজপুত হয় তাহলে রাজপুতদের, যদি কায়স্থ হয় তাহলে কায়স্থদের এবং যদি ভূমিহার হয় তাহলে ভূমিহারদের। কোনো কলেজ বা সরকারী বিভাগ কায়স্থতে ভর্তি রয়েছে দেখলে কত লোক গালি দিতে শুরু করে, বলে, 'দ্যাখ, ঐ কায়স্থ কি বেইমান। এ কেবল নিজের ভাই-ভাইপোদের দিকেই খেয়াল রাখে।' ও কখনও একথা ভাবে না যে এই রকম পরিস্থিতিতে ও নিজে কি করত। যতদিন জাতপাত থাকবে ততদিন এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। এটাও খুব স্বাভাবিক যে, মানুষ তার নিজের রক্তের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের কষ্টটাই প্রথমে অনুভব করে এবং তা দূর করার চেষ্টা করে। আমার ছাপরার কিছু বন্ধুরা বলত, 'রাজেন্দ্র কলেজকে কায়স্থরা পুরোপুরি নিজেদের সম্পত্তি করে নিতে চায়। ওরা আপনাকে ব্যবহার করতে চায় ওদের লাভের জন্যই।' আমিও কলেজ কমিটির মেম্বার ছিলাম। যখন নতুন প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করার সময় এল, আমি মনোরঞ্জনবাবুর নাম পেশ করলাম। মনোরঞ্জনবাবু প্রথমে আসতে চাইছিলেন না, কিন্তু আমি যখন তাঁকে জোর দিয়ে বললাম, তিনি আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলেন। নিযুক্তির সময় যখন আমি মনোরঞ্জনবাবুর নাম প্রস্তাব করলাম, তখন বিরোধীদের শক্তি অনেক কমে গেল। মনোরঞ্জবাবু প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হলেন। আমার অনেক বন্ধু নালিশ করেই যেতে

লাগলেন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাঁরা একথা বলতে পারেননি যে, আমি কোনো জাতের পক্ষ নিয়েছি। এর পরও আমার বন্ধুরা যখন বলেন কায়স্থরা কায়স্থদের পক্ষ নিচ্ছে, আমি তাদের বলি, 'আগে বিবাহসূত্রে কায়স্থদের মেয়ে নাও বা তাদেরকে ছেলে দাও, তারপর এইসব কথা বল। যতক্ষণ এই জাতপাত আছে ততক্ষণ সুযোগ ও অধিকার না পেয়ে থাকলেই মানুষ সৎ থাকতে পারে।'

ছাব্বিশটা বছর ধরে আমি এই জেলায় প্রথমে 'রামউদারবাবা' ও পরে 'রাহুলবাবা' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছি। এখন আমি সাধারণ বেশভূষা ছেড়ে দিয়ে বেশির ভাগ সময় হাফপ্যাণ্ট-জামা পরতাম। মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতারা আমাকে নিয়ে খুব বিরক্ত ছিলেন, কেননা আমার জন্য জনতার কাছে তাঁদের বদনাম হচ্ছিল। যদিও সে কথা ভুল। বদনাম এই জন্য হচ্ছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্মদাতা (ভোটদাতা)-র পক্ষ না নিয়ে নিজেদের জমিদারবন্ধুদের পক্ষ গ্রহণ করছিলেন। রাশিয়ায় আমার স্ত্রী আছে এ কথাও তাঁদের জানা ছিল। তাঁরা এসব নিয়ে খুব খুশি ছিলেন। তাঁরা চিঠিপত্রের ফটো নিয়েছিলেন। আমার স্ত্রী ও বাচ্চাদের ফটোর কপি বানিয়েছিলেন। খবরের কাগজে আমার বিরুদ্ধে তাঁরা খবর ছাপাচ্ছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, এই ভাবে জনতার সামনে আমরা রাহুল যে ভ্রষ্ট তা প্রমাণ করব। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা প্রথম থেকেই এসব কথা জানত। আমি মন্ত্রীসভার এই উৎসাহী প্রয়াসকে শুধু কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখতাম। তাঁদের এই ছেলেমানুষীতে আমার হাসিই পেত। তাঁরা ভাবতেন যে শ্রমিকরা রাহুলজীর পোশাকে বা সাধুতায় মুগ্ধ। কিন্তু তাঁরা এটা জানতেন না যে শ্রমিকদের জীবিকার ব্যাপারে যে সততার সঙ্গে লড়বে ওরা তাকেই ভালবাসবে। আমি যখন সত্যাগ্রহ উপলক্ষে অমবারী গিয়েছিলাম, তখন জলিলকে প্রতাপসিংহ বানিয়ে রাখতে হয়েছিল। আমরা ৬০-৭০ জন সত্যাগ্রহী ছাপরা জেলে ছিলাম, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কৃষক। আমি এবং আমার শিক্ষিত বন্ধু তথা কৃষক মজদুর এবং জলিল আমরা এক সাথেই খাওয়া-দাওয়া করতাম। হিন্দু ও মুসলমানদের একটাই রুটি হওয়া উচিত—আমরা এরকম লেকচার একদিনও দিই নি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কৃষকরা একে অপরের হাতের রুটি কেড়ে খেতে অভ্যস্থ হয়ে গেল। এরপর যখন ছিতৌলী সত্যাগ্রহের জন্য যেতে হল, ইব্রাহিম এবং অন্যান্য কর্মীদের নাম আমি বদলাই নি। পাঁচ-সাত জনের জন্য বারে বারে থালা নিয়ে কে খাবে? আমরা একটি থালাতে ডাল রাখতাম আর একটিতে রুটি এবং সবাই বসে খেয়ে নিতাম। এ নিয়ে কৃষকদের বিব্রত অবস্থায় পড়তে হতো না। একটি ঘরে না পারলে ওরা দশটা ঘর থেকে একটু-একটু করে খাবার জমা করে নিয়ে আসত। জমিদার এই ব্যাপারটিকে বিধর্মী ইত্যাদি বলে বদনাম করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কৃষকদের একটাই জবাব ছিল, 'আমরা তাঁর কাছ থেকে কোনো ধর্ম নিচ্ছি না। আমরা শুধু খেতের ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাই, আর রাহুলবাবা তো নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন।' কংগ্রেস সরকারের বিরোধী প্রপাগাণ্ডার কিছু প্রভাব জমিদারকে বাদ দিলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ওপরে পড়তে পারত, কিন্তু ওরা তো নিজেরাই নপুংসক।

কংগ্রেসের পুরনো কর্মকর্তাদের মধ্যে বার্ধক্যের ছাপ পুরো দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু

যুবকদের মধ্যে তৎপরতা ছিল। আমি ৭ জুন লিখেছিলাম—'নতুন প্রজন্মের ওপরেই আশা রাখা উচিত। যখন আমরা দেশের বৈষম্যের কথা ভাবি তখন নিরাশই হয়ে পড়ি, যখন বন্যার জলরাশির ক্ষমতা দেখি তখন নৈরাশ্যের কোনো কারণ টের পাই না।'

সরযূতে (ঘাঘরা) বন্যার ফলে কয়েক বছর ধরে এদিককার কয়েকটি থানার লোকজন ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। সরকারের নজর এদিকে ছিল না। কংগ্রেসী সরকার কানে তেল ঢেলে বসেছিল। যখনই চেঁচামেচি হতো, তখন দু-চার হাজার টাকার মাটি এখানে-সেখানে রেখে দেওয়া হতো আর বলা হতো যে এদিকে সরকারের দৃষ্টি আছে। এই নিয়ে ১৮ জুন একটা বড় প্রদর্শনী করা হয়েছিল। গুঠনী ও রঘুনাথপুরের মতো দূরবর্তী থানার কৃষকরা পায়ে হেঁটে এসেছিল। তেরটি থানার লোক ছাপরা পৌঁছেছিল। বর্ষা শুরু হয়েছিল, তাই লোকজন খেত বোনার কাজে লেগে পড়েছিল, না হলে তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যেত। শহরবাসীদের পর্যন্ত এই মিছিল দেখে এত উৎসাহ হয়েছিল যে রায়বাহাদুর বীরেন্দ্র চক্রবর্তীর মতো রাজভক্ত ও কয়েকশো লোককে আম ও চিঁড়ে খেতে দিয়েছিলেন। কালেক্টর ভয়ের চোটে বাংলো ছেড়ে পালিয়েছিল, আর সেখানে পঞ্চাশটা ফৌজী পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল।

ছিতৌলীর সত্যাগ্রহ (জুন ১৯৩৯)—প্রদর্শনী থেকে ছুটি পাওয়ার পর দিনই ছিতৌলীর কৃষকরা ছুটে-ছুটে এসেছিল। ভেবে ছিলাম জমিদার বুঝি খেত চাষ করতে দিচ্ছে না। যে কৃষক আষাঢ়ে চাষ করতে পারবে না, তার বেঁচে থাকার কি আশা থাকতে পারে? ঐ দিনই (১৯ জুন) ইব্রাহিম, রামভবন, অখিলানন্দের সঙ্গে ছিতৌলীর দিকে রওনা হয়ে গেলাম। পরের দিন নটার সময়ে আমরা সত্যাগ্রহীদের ঝুপড়িতে পৌঁছে গেলাম। এখানকার কৃষকরা ছিল খুবই গরিব, তা সত্ত্বেও ওরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। আমি বললাম, 'আমি এমন কিছু খাব না, যা তোমরা রোজ খাও না। যাও, যার ঘরে যেরকম খাবার হয়েছে, তাই একটু একটু করে নিয়ে এস।' সেদিন ওদের ঘরগুলো থেকে যে খাবার এসেছিল তা হল 'চীনা'[১]-র ভাত, মহুয়ার লাটা[২]—শুধু লাটাও ছিল, আবার ভাজা ভুট্টা গুড়ো করে তাতেও মেশানো ছিল। সাথে পুকুর পাড়ের কলমী শাক ছিল। আমি ঐ খাবার খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঐ খাবার মানুষের ৩০ দিন খাওয়ার মতো জিনিস ছিল। ওটা ছিল এমনই খাদ্য যা শুধু ভারতের গরিবরাই খেয়ে ধৈর্য রাখতে পারে।

তিনটের পর আমরা সভার জায়গাতে গেলাম। আসরফি সাহুর লাঠিয়াল জায়গা ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি বললাম, 'কি, আসরফি সাহু এত দূর নেমে গেছে!' তারপর এক

---

[১] এক ধরনের মোটা চাল—স·ম·

[২] একশ্রেণীর দরিদ্র মানুষের খাদ্য। সাধারণত ভুট্টা, মহুয়া (মহুল) ইত্যাদি ভেজে ঢেঁকিতে কোটা হয়। পরে গুড় দিয়ে ফুটিয়ে নেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও (পুরুলিয়া) গ্রামবাসীরা এখনো এই লাটা খেয়ে থাকে এবং তাই নিয়ে বাঁদর নাচের প্রসিদ্ধ গান—'ঝর্‌ঝটা মহুলা লাটা। দেখ তামাশা দেখ তামাশা ...'।—স·ম·

লাঠিয়ালকে ধরে সাহুর বাড়ির দিকে নিয়ে চললাম। অবশ্যই এটা বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল, কিন্তু এরকম সময়ে বিপদের ভয় আমার একেবারেই থাকে না। আসরফি সাহুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি ধর্মাত্মা হয়ে উঠছেন, মন্দির তৈরি করেছেন, অনেক পুজো পাঠ করেন, আপনি কি লড়াই ঝগড়াও করতে চান?' ও মিষ্টি মিষ্টি কথায় নিজের মাধুর্য বিস্তার করতে শুরু করল। সেই সময় কিছু হৈচৈ হয়েছিল। এসে দেখি যে, আসরফি সাহুর ছেলে জগন্নাথ বন্দুক নিয়ে পৌছে গেছে। বহু লোক বর্শা, তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মধ্যে ঢুকে গেলাম। আমি ওদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললাম, 'হিজড়ের দল! তোমাদের যদি একটুও ক্ষমতা থাকে তাহলে তলোয়ার আর বর্শা আমার ওপর চালাও, আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি!' সবাই ওখান থেকে চলে গেল। আমি এদকি-ওদিক আমার দুজন নিখোঁজ সাক্ষীদের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম। জানা গেল যে, ওরা মার খেয়ে পড়ে ছিল, ওদেরকে আমাদের লোকজন ঝুপড়িতে নিয়ে গেছে। রামভাওয়ানের ওপর চার আর অখিলানন্দের (১৮ বছরের যুবক) ওপরে আট লাঠি পড়েছিল। অখিলানন্দের বাম করতলের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। রাতে ডাঃ সিয়াবর এলেন, তিনি পটি বাঁধলেন। ঐ রাতেই আহত দুজনকে গরুর গাড়িতে সিওয়ান রওনা করে দিই। পরের দুদিন (২১-২২ জুন) কৃষকরা খেতে লাঙল দেওয়া ও বোনার কাজ করতে থাকল। বসন্তপুরের ছোট-বড় দুজন দারোগা এল। আসরফি সাহু ওদের খুবই সেবা করেছিল। জমিদারের আর হিম্মত হয় নি যে কৃষকদেরকে আবার বিরক্ত করে।

দু-বছরের সাজা—তৃতীয় দিনেও খেতে হাল চলছিল। নটার সময় বড় দারোগা গণেশনারায়ণ এল। সে লোক দেখানোর জন্য আসরফি সাহুর কিছু লোকজনকে জিজ্ঞেসবাদ করল। কিছু লোককে সে গাড়িতে বসাল আর আমাকেও এই কথা বলে সঙ্গে নিয়ে নিল যে এরা বড় জুলুম করেছে। সাড়ে দশটায় আমরা সিওয়ান থানায় পৌছলাম। ওখানকার এক মুসলমান দারোগা আমার জন্য খাবার বানিয়েছিল। তার ঘরে আমি চান করে খাবার খেলাম। আমার এটা জানা ছিল না যে আমাকে ওখানে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। একটার সময় আমি আমার একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তখন দেখলাম ছোট দারোগা আমার সঙ্গে আছে। দেড়টার সময় মিঃ ব্রাইসনের আদালতে আমাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। এরপর আর কি সন্দেহ থাকতে পারে? বেআইনি জমায়েত করে অন্যের জমি দখল করার অপরাধে (ধারা ১১৭) মামলা চালান হল। আমি কোনো সাক্ষীকে জেরা করি নি। আর কৃষকদের জমি জোতা ও বোনার কাজে সাহায্য করার অপরাধ স্বীকার করেছিলাম। সাড়ে তিনটের সময়ে সাঁজা শোনান হল—৯ মাসের সশ্রম কারাবাস, ৩০ টাকা জরিমানা—অনাদায়ে আরো ৩ মাসের সশ্রম কারবাস। ছাড়া পাবার পর একবছরের জন্য হাজার টাকার দুটো জামানত। ছটার সময় সিওয়ান স্টেশনে পৌছলাম। রাতে ভটনীর গাড়িতে চড়ে দুজন সেপাই আমাকে নিয়ে চলল। আগেরবার হাতকড়া পরানোর ফলে যে বদনাম হয়েছিল তার জন্যে পুলিশ আমার হাতে হাতকড়া পরায় নি। ছাপরা-পাটনার রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলে লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে

পড়ত, তাই সরকার আমাকে যুক্তপ্রদেশ (ভটনী, মউ, বেনারস মোগলসরাই)-এর রাস্তা ধরে হাজারীবাগে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করল। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত আজমগড় জেলায় যাব না। আমি ট্রেন থেকে নামি নি, জানলা দিয়ে বাইরে তাকাইওনি, তবু ২৩ জুন আমাকে মউয়ের (আজমগড়) পথে যেতেই হল। সকালে বেনারস ছাউনিতে নামলাম। যদি জানা থাকত যে ঐ গাড়িতে গেলে গয়ায় কয়েক ঘন্টা পড়ে থাকতে হবে, তাহলে আমি সকাল ছটার বেনারসের গাড়ি ধরতাম না। সেপাই দুজন ভাল মানুষ ছিল। ওরা গঙ্গাস্নান করতে চাইছিল। কিন্তু করতে পারে নি। জলখাবারের সময় ওরা কিছু আনতে চাইছিল। আমি বলে দিলাম যে আদালতের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমার অনশন শুরু হয়েছে। আমি খাব না। ওরা বলছিল, 'আপনি না খেলে আমরা কি করে খাই?' অনেক বলে-কয়ে ওদের রাজি করালাম। সোন-ইস্টব্যাঙ্ক-এ আমরা নেমে গেলাম এবং দু-ঘন্টারও বেশি অপেক্ষার পর তুফান এক্সপ্রেস পেলাম। বিকেল পাঁচটায় হাজারীবাগ রোড (সরিয়া) পৌছলাম।

হাজারীবাগ জেলে দ্বিতীয়বার—একটা ট্যাক্সিতে আমরা বসলাম। ট্যাক্সিওলা কিছুটা দূর গিয়ে ফিরে এল, ও বদমায়েসি করতে লাগল। সেপাইদের কাছে আমি কয়েদী না, বরঞ্চ একজন অফিসার ছিলাম। আমি ট্যাক্সিওলাকে থানায় নিয়ে গেলাম, ওর নামধাম লিখে নেওয়া হল। এরপর আর একটা বাসে আমরা হাজারীবাগ রওনা হলাম। রাত দশটায় জেলে পৌছলাম। ওখানে আগেই খবর চলে এসেছিল। রাতে অফিসেই খাটিয়া পেতে দেওয়া হল। খাবারের ব্যাপার তো আমার ছিল না। এবার আমাকে ১৭ দিন পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট করতে হয়েছিল, এই সময় আমার শারীরিক অবস্থা ছিল এই রকম—

দিন	ওজন	নাড়ি	হৃদস্পন্দন	তাপমাত্রা	বিশেষ মন্তব্য
১	...	...	...	...	..
২	...	...	...	...	...
৩	১৭৪	...	...	...	খিদে মরে গেছে
৪	১৭২	...	...	...	
৫	১৬৮	...	...	...	একটু দুর্বলতা, রক্তচাপ হ্রাস
৬	১৬৬	...	...	...	...
৭	১৬৫	...	..	...	...
৮	১৬৪	...	...	...	গলায় ব্যথা
৯	...	৬৬	১৭	...	...
১০	১৬১	...	...	...	দুর্বলতা কাঁপুনি, বুকে ব্যথা, চুলকানি
১১	১৬০।।।	...	...	...	নিরুৎসাহ, ঘুম ঘুম ভাব
১২	১৬০।।	৬৪	২০	৯৬·২	দমবন্ধ, বুকের ডানদিকে ব্যথা, নিদ্রাহীনতা, মুখ তেঁতো

১৩	১৬০	৬৪	২২	৯৬·২	মাথায় যন্ত্রণা, ঝিমুনি, গভীর ঘুমের অভাব, পেচ্ছাবে অ্যাসিটোন, দুর্বলতা, মাথা ঝিমঝিম, দমবন্ধ ভাব।
১৪	১৫৯	৬৮	১৮	৯৬·৮	মাথায় বেশি ঝিমঝিম ভাব, বুকে ব্যথা, চুলকানি অ্যাসিটোন, পেটে অস্বস্তি, নিদ্রাহীনতা
১৫	১৫৮	৬২	১৮	৯৬·৪	দমবন্ধ, বুকে ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম, অ্যাসিটোন
১৬	১৫৭	৬২	২১	৯৬	...
১৭	১৫৬	৬৭	১৮	...	আটটায় অনশন ভঙ্গ

পরদিন (২৫ জুন) সকালে আমি ভেতরের এক নম্বর ওয়ার্ডে, উঠোনে, সঙ্গীদের কাছে গেলাম। নাগার্জুন জলিল, মজহর সবাই এখানেই ছিল। সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেব এলেন, অনশন ভঙ্গ করার ব্যাপারে খুব লেকচার দিতে লাগলেন। তাঁর বোধহয় জানা ছিল না যে, আমি তাঁর চেয়ে অনেক ভাল লেকচার দিতে পারি। চোদ্দ বছর পর আমার হাজারীবাগ জেলে আসার সুযোগ হয়েছিল। সেবারও দু-বছরের সাজা নিয়ে এসেছিলাম, আর এবারও দু বছরের। আমি জামানত দিতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেবার আমি আমার জেলে থাক পুরো সময়টা গভীর অধ্যয়নে কাটিয়ে ছিলাম। এখানেই আমি 'বাইশবী সদী'[১] এবং ষোলটি অন্যান্য বই লিখি, যার মধ্যে অনেকগুলো প্রেসে যাওয়ার আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

পরদিন (২৬ জুন) সুপারিন্টেনডেন্ট আবার তাঁর উপদেশ শোনালেন। ডাক্তারদের এই নির্দেশ আমি মানতে রাজি ছিলাম যে, পেটের ভেতর যতটা সম্ভব বেশি জল যাওয়া দরকার, যাতে অন্ত্র খারাপ না হয়। পঞ্চম দিন (২৭ জুন) আমি সোডা আর জল ছাড়া অন্য কিছু ওষুধ খেতে অস্বীকার করি। আবার নাক দিয়ে জবরদস্তি দুধ ঢোকানোর প্রস্তুতি চলছিল। সেজন্য ষষ্ঠ দিন (২৮ জুন) আমি প্রধানমন্ত্রীকে তার পাঠালাম যে, জবরদস্তি খাওয়ানোর চেষ্টা বন্ধ করা হোক, কারণ আমার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি শান্তিতে মরতে চাই।

বই পড়া তো দ্বাদশ দিন পর্যন্ত চলেছিল। আর আমি ৮, ১০ ঘণ্টা ধরে পড়তাম। সপ্তম দিন পর্যন্ত বসতে বা দাঁড়াতে সাহায্যের দরকার হয় নি। তবে হ্যাঁ, খুব বেশি চলাফেরা করতে আমি পারতাম না। অষ্টম দিন (৩০ জুন) কার্যানন্দজী আর অনিল মিত্র এক বছর করে সাজা নিয়ে এসে গেল। ঐ দিন গলায় কিছুটা ব্যথা ছিল। আমি এখন হাসপাতালে ছিলাম। পরদিন এই দু-বন্ধুও অনশন শুরু করে দিল। আমি জেনে গিয়েছিলাম যে ওষুধ দেওয়ার হলে ডাক্তাররা শক্তিবর্ধক কিছু দিয়ে দেয়, তাই আমি কেবল বিশুদ্ধ জল নিতাম আর তাতে নিজের হাতে সোডা ঢালতাম।

একাদশ দিনে আমি ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'ওজন ১৬০।। পাউণ্ড, দুর্বল বোধ

[১] রাজনীতি তথা সাম্যবাদ বিষয়ক লেখকের প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৯২৩ সালে লেখা। গ্রন্থটি *কিতাব মহল* থেকে প্রকাশিত হয়।

—১৯৩৯—

হচ্ছে, উৎসাহ কম। ঝিমুনি বেশি। দুপুরেও শুয়ে ছিলাম। শরীরে কোথাও ব্যথা নেই। চুলকানি বেশি। মনে হচ্ছে, গভর্নমেন্ট ঠিক করেছে—দাবি উপেক্ষা করো, অবস্থা খারাপ হলে ছেড়ে দাও···। রাত নটা পর্যন্ত পড়তে থাকলাম। এবারে শক্তি খুব ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছিল। আগের বার অষ্টম দিন থেকে পড়াশুনো বন্ধ হয়েছিল। এবার আজকেও পড়াশোনায় দশ ঘন্টা সময় দিতে অসুবিধে নেই। শরীর একটু কাঁপছে।' পনের দিনের মাথায় (৭ জুলাই) আমার ওজন ২২ পাউণ্ড কমে গেল। শ্বাস নেওয়ার সময় দমবন্ধ হওয়ার অনুভূতি হচ্ছিল। বুকে ব্যথা খুব, মাথাতে ঝিমঝিম ভাব এবং পেচ্ছাবে অ্যাসিটোন ছিল বেশি। ঐ দিন দশটার সময় মিস্টার অংগর (ইন্‌সপেক্টর-জেনারেল) এলেন। আমি বললাম, 'আমরা দুজন পুরনো বন্ধু, বিশেষ কিছু বলা বা শোনার দরকার নেই।' সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেব বললেন, 'অনশন ভঙ্গ করুন, তাহলে সরকার আপনার কথা শুনবে।' আমি বললাম, 'যদি আমি বাচ্চা হতাম তাহলে পাশের (নাবালকদের) জেলে পাঠানো হতো।

৮ জুলাই থেকে কার্যানিন্দজী এবং অনিলকে জোর করে দুধ খাওয়ানো হতে লাগল। আমাকে জোর করে খাওয়ানো হয় নি, এজন্য আমার কংগ্রেস সরকারের কাছে ঋণী থাকা উচিত। ১৬ দিনের দিনও আমি বারান্দায় ২ ঘন্টা চেয়ারে বসে ছিলাম। এবার অনশনের ১৭-তম দিন। সকালেই সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেব এসে খবর দিলেন, 'সরকার আপনাকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে।' আমি বললাম, 'ভাল কথা, আমাকে বাইরে নিয়ে চলুন, দেখি সরকার কতদিন পর্যন্ত এই খেলা খেলতে থাকে।'

৩৮০ ঘন্টা অনশনের পর ঐ দিন আমি সুপারিন্টেনডেন্টের বাংলোতে আনারাসের রস খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করলাম। দুপুরের পর তিনি আমাকে হাজারীবাগের হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন। আমি চারদিন সেখানে থাকলাম। ১২ জুলাই আমি সাধারণ খাবার পেলাম। প্রথমবার উপবাসসের পর খুব খিদে হয়েছিল, কিন্তু এবারে খিদে টের পাচ্ছিলাম না। ১৪ জুলাই পাটনা পৌঁছলাম। কৃষক সভার অফিসে জানা গেল যে বিহারের প্রতিটি জেলায় কৃষকরা স্থির করেছে নিজের জমি হাতছাড়া হতে দেবে না। শুধু গয়া জেলাতেই পঞ্চাশটারও বেশি গ্রামে সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেছে।

বোম্বাইয়ের দিকে—আমার ইচ্ছা ছিল যে, আবার পাঁচ-সাত দিন ডাক্তার সিয়াবরশরণের কাছে গিয়ে থাকি, কিন্তু এই মুহূর্তে বোম্বাই থেকে খবর এল ওখানকার ভারতীয় বিদ্যাভবন 'বার্তিকালংকার' ছাপাতে চায়। এখন আমার শরীর এতটা ভালো ছিল না যে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে পারি। সেজন্য ভাবলাম এই সময়টা এই কাজে লাগিয়ে দেওয়া যাক। বেনারস-প্রয়াগ হয়ে ২১ তারিখ রাতে বোম্বাই পৌঁছলাম। পরিচিত কারুর খোঁজ করতে পারিনি, তাই একটি হোটেলে গিয়ে উঠলাম। পরের দিন খোঁজ-খবর করে আঁধেরী গেলাম। পণ্ডিত জয়চন্দ্র বিদ্যালংকারের সঙ্গে দেখা হল। তিনিই প্রকাশের ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু করেছিলেন। মাঝে তিনদিন জ্বর এল। ভবনের কর্মকর্তারা পৃষ্ঠা প্রতি আড়াই টাকা পারিশ্রমিক দিতে রাজি বলে লিখে জানিয়েছিল। এখন ওরা দরাদরি শুরু

করল। আমি বললাম, 'বিনা পয়সায় লেখা দিতে রাজি আছি, কিন্তু দর কষাকষি করতে আসি নি।' প্রকাশের ব্যবস্থা হল না। আমি ৩০ জুলাই বোম্বাই থেকে রওনা হলাম। প্রয়াগ, সারনাথ হয়ে ২ তারিখ বেনারস পৌঁছলাম। রামকৃষ্ণ দাসজী বুকে জড়িয়ে ধরলেন—পতিতের অভ্যর্থনা! পরের দিন (৩ আগস্ট) আমি ছাপরা পৌঁছে গেলাম।

৯ আগস্ট 'প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল'-এর বৈঠক পাটনায় হল। আমিও ওখানে গিয়েছিলাম। আমার প্রথমবার জেলে যাওযার পর পণ্ডিত বাঁকেবিহারী মিশ্র অধ্যাপনা ছেড়ে কৃষকদের মধ্যে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি খুব অনুকূল সময়ে কাজে লেগে পড়েছিলেন। ছিতৌলীর কৃষকদের বিবাদ-মীমাংসার জন্য যে কমিটি হয়েছিল, তিনি তার প্রতিনিধি ছিলেন। জানা গেল যে পঞ্চায়েত দুশো বিঘের ওপর জমি কৃষকদের দিয়েছে। ছিতৌলী এবং যমুনা ভগত সম্বন্ধে দুটো লেখা লিখেছিলাম 'জনতা'র জন্য।

১৫ আগস্ট আমলোরী গ্রামে (সিওয়ান) **কৃষকসভা** ছিল। এখনকার জমিদার বিদ্যা সিংহের অত্যাচার এবং **অবহেলায়** আশেপাশের দশটি গ্রামের কারো কাছে কোনো জমিই ছিল না। তার এমনই দাপট ছিল যে, রাস্তার পথিকদেরও জরিমানা না নিয়ে সে নিস্তার দিত না। টাকায় ৫ সের ঘি-ই শুধু রায়তদের কাছ থেকে নেওয়া হতো না, কৃষকদের টাকায় হাতিও কেনা হয়েছিল। 'হরী-বেগারী' আর অন্যান্য অনেক বেআইনী কর আদায় সত্যযুগের মতো এখনও চলে আসছিল। অমবারী ও ছিতৌলীর সত্যাগ্রহ্ অনেক জায়গায় নির্যাতিত কৃষকদের উত্তেজিত করেছিল। এখনকার সভায় আট হাজারেরও বেশি কৃষক একত্রিত হয়েছিল। বিদ্যা সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করানো হল। সভায় গণ্ডগোল পাকানোর জন্য একটি নির্লজ্জ মহিলাকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু একলা আর কি করতে পারে? সভা খুব ভালভাবেই হল। সভা শেষ হলে আমরা স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম, গ্রামের সামনে কিছুটা এগোতেই একটা ইট এসে পড়ল আমার পাশে। ঘুরে তাকাতেই একটি যুবককে (পরে জানা গেল সে বিদ্যা সিংহের শ্যালক) দেখা গেল। ওকে ধরা হল আর এক-আধটা থাপ্পড় লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। আমরা স্টেশনের দিকে চলে গেলাম। ওখানে বিদ্যা সিংহের অনেক লোকজন লাঠি-সোটা নিয়ে এসেছিল। কৃষকরাও তাদের লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক বলা-কওয়ার পরও ওরা ওখান থেকে চলে যেতে রাজি হল না যতক্ষণ না আমাদের গাড়ি রওনা হল। আমি মারামারি পছন্দ করতাম না, কিন্তু হিংস্র জমিদারদের কে রুখতে পারত? এই অবস্থায় কৃষকদের লাঠি সরিয়ে রাখতে বললে সেটা অহিংসার নয়, বরং কাপুরুষতার প্রচার হতো। আমি এ-ধরনের কাপুরুষতা অপছন্দ করতাম। জমিদারদের লোকেরা তারপর গাঁয়ের কৃষকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর ওদের খুব মারধোর করে। গরিবদের উপকার করতে আসা কংগ্রেসমন্ত্রী চুপ ছিল। বিদ্যা সিংহ বড়ই ধর্মাত্মা ছিল, সে এক সিদ্ধপুরুষ 'কাচ্চা বাবা'র জন্য বাংলো বানিয়ে দিয়েছিল, ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছিল। এতে এতই ধর্ম হবে যে, বারোটি গ্রামের লোকের ওপর অত্যাচার করার ফলে যত পাপ হচ্ছিল সে-সব ধুয়ে যাবে। পাঠকরা হয়ত ভাবতে পারেন যে আমি এই অত্যাচারীদের সম্ভবত হাজার বছরের জন্য অমর করে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস হয় না যে এই বই কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে। যদি

থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরাধিকারীরা এর থেকে অনেক কথাই জানতে পারবে। অত্যাচারীদের অমর হওয়ার কথা দূরে থাক, তাদের তো কেউ জানবেও না। তাদের আপন বংশজও তাদের পূর্বপুরুষদের নাম মুখে আনতে লজ্জা পাবে।

১৬ আগস্ট আমি ছিতৌলী গেলাম। বৃষ্টি হচ্ছিল, তাসত্ত্বেও দু হাজার কৃষক জমা হয়েছিল। লোকজনের মধ্যে খুব উদ্দীপনা ছিল। আসরফি সাহু এখনও পঞ্চায়েতের রায় মানতে রাজি ছিল না। সে দেওয়ানী মামলা লড়তে চাইছিল।

কুরবানের ওপরে সরকার মোকদ্দমা চালিয়েছিল, আমি তাতে সাক্ষী দিতে গেলাম। আমি ভাবছিলাম, কুরবানের কি দোষ! লাঠি সে চালায় নি, তার মালিক চালিয়েছিল। তাহলে তাকে জেলের যন্ত্রণা দিয়ে লাভ কি।

২৯ আগস্ট ছিল মোকদ্দমার তারিখ। আমি ঐ দিন আদালতে গিয়ে দরখাস্ত দিলাম যে কুরবানকে ছেড়ে দেওয়া হোক, আমি চাই না তার ওপর মোকদ্দমা চলুক। লোকজন তো বেশ আশ্চর্য হল। আমার কাছে এটা আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হয় নি। অবশেষে কুরবানকে ছেড়ে দিতে হল।

আর এক নতুন জীবনের আরম্ভ, ১৯৩৯-৪০

পয়লা সেপ্টেম্বর রেডিও থেকে জানা গেল যে, জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করেছে। ৩ সেপ্টেম্বর দুপুর এগারোটায় ইংল্যান্ডও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করে দিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এখন আমার বেশি দিন জেলের বাইরে থাকার কোনো আশা ছিল না, সেজন্য কোনো স্থায়ী প্রোগ্রামও সামনে রাখা যাচ্ছিল না। ১৬, ১৭ ডিসেম্বরে প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের বৈঠক পাটনায় হল। দুশো জন কর্মী একত্রিত হয়েছিল। আমরা আগামী দিনের প্রোগ্রাম কিছুটা স্থির করলাম, একথা মনে রেখে যে, কংগ্রেস এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে কিছু ফায়দা তুলবে। ১৭ তারিখেই রেডিও মারফৎ জানা গেল, সেদিন সকাল ছ-টায় লাল ফৌজ ইউক্রেন ও বেলোরুশিয়ায় তাদের হারানো মাটি দখল করতে সামনে পা বাড়িয়েছে। পরদিন একথাও জানা গেল যে, লাল ফৌজ ৯০ মাইল এগিয়ে এসেছে এবং তৃতীয় দিনে ওরা নিজেদের সমগ্র ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করেছে।

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কমিটি ও কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক ছিল। সেখানে ভারতের কম্যুনিস্টদেরও একত্রিত হবার কথা ছিল। কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনি ছিল, কিন্তু কংগ্রেস সরকারের আমলে কড়াকড়ি কমে গিয়েছিল। আমিও তাতে সম্মিলিত হওয়ার জন্য ওয়ার্ধা পৌঁছলাম। সুনীল মুখার্জি আর আমি দুজনেই পাটনা থেকে একসঙ্গে গেলাম। গোপীচন্দের ধর্মশালায় উঠেছিলাম। একটি হোটেলে যখন আমরা

খেতে ঢুকছি সে-সময় হোটেলের লোকটি বলল, 'এটা ডেঢ় (চামার)-এর হোটেল।' আমি বললাম, 'আমিও তোমার স্বজাতি।' ওখানেই ভোজন করলাম।

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা ইংরেজদের সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য ঝুঁকে ছিল, কিন্তু বামপন্থীরা গণসংঘর্ষ চাইছিল। শেষমেশ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ঐ সামান্য প্রস্তাবও স্বীকার করেনি যা পেয়ে দক্ষিণপন্থীরা আপোষ করতে রাজি ছিল। ১৯৩৮-এ তিব্বত' থেকে ফেরার পর কলকাতায় মহাদেব সাহার চেষ্টায় মুজাফ্ফর আহ্মেদ. বঙ্কিম মুখার্জী, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, বনেন সেন, আবদুল হালিম-এর মতো ভারতের বিশিষ্ট কম্যুনিস্টদের সংগে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বহু বছর ধরে যে পার্টিকে আমি ভালো ভেবেছিলাম আর যে বিষয়ে অনেক বই পড়েছিলাম, তাকে ওয়ার্ধায় নিজের চোখের সামনে দেখলাম। লোকের সংখ্যা ৩০-এর বেশি ছিল না। ওর মধ্যে পাঞ্জাবি, মারাঠি, মাদ্রাজি, বাঙালি, যুক্তপ্রদেশের সব প্রধান কম্যুনিস্টরা একত্রিত হয়েছিল। আমাদের অঞ্চলে (বিহার) পার্টি গড়ে ওঠেনি, তাহলেও আমরা দুজন পার্টির সদস্য ছিলাম। ভারতের ও তার বাইরের কিছু কম্যুনিস্টের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছিলাম। সেখানে আবদুল মোমিন ইত্যাদি বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট নেতাদের সঙ্গে আমি নিজের পক্ষ থেকে মিলিত হয়েছিলাম, আর এখানে মিলিত হচ্ছিলাম পার্টির পক্ষ থেকে। আমি ওদের দেখলাম। দোষগুণকে আমি আদর্শের দৃষ্টিতে নয়, ব্যবহারের দৃষ্টিতে দেখি। এখানে সম্মিলিত কম্যুনিস্টদের দেখে আমি খুব আনন্দ ও উৎসাহ পেয়েছিলাম। না সেখানে দেশের ভেদাভেদ ছিল, না ছিল ধর্মের। ওরা সবাই আপন ভাই-এর মতো ছিল, বিনা সঙ্কোচে নিজের ভাবনা পরস্পরের সামনে রাখতে পারত। সারা রাত্তির রাষ্ট্রীয় এবং অন্তর্রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলল। এটা ছিল প্রথম দিন। হতে পারে যে নতুন জিনিসের দর্শন খুব মধুর হয় কিন্তু পরেও আমি ঐ রকমই •পেয়েছি। জীবনের বহু দীর্ঘ সময় আমি সাধু, মহাত্মা তথা বিদ্বানদের মধ্যে কাটিয়েছি, যারা কিনা কঠোর ব্যক্তিবাদী হয়ে থাকেন। নিজের ব্যক্তিগত রুচি ও পক্ষপাতিত্বের জন্য তাঁরা সমগ্র সমাজ ও ভবিষ্যতকে ছারখার করতেও রাজি হয়ে যান। এঁদের সংসর্গের প্রভাব আমার ওপরে কতটা পড়েছিল এটা আমি নিজেই ঠিকমত বলতে পারি না। তবে একথা নিশ্চিত যে, আমি ব্যক্তির আলাদা-আলাদা জীবনের চেয়ে মানুষের সামূহিক জীবন সর্বদাই বেশি পছন্দ করেছি। রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু কবার পর আমি তো আরো জানতে পারছিলাম যে, এক দানা ছোলা ভাঁড়কে ভেঙে ফেলতে পারে না। বিপ্লবকে সঞ্চালিত করার জন্য ভয়ংকর সেনা হওয়া আবশ্যক। আমি কম্যুনিস্ট পার্টিকে সেই চেহারায় পেয়েছিলাম। স্তালিনের এই কথাটা আমার খুব সত্য মনে হয়—'মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় সম্মান আর হতে পারে না যে সে এই সেনাবাহিনী (পার্টির)-র সদস্য। কোনো একজনকে যদি পার্টির লোক করে নেওয়া হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় পদবী তার হতে পারে না। (নেত্ নিচেভো ব্বীশে, কাক্ চেস্ত প্রিনাদ্লেজ্হাত্ ক এতোই আর্মিই। নেত্ নিচেভো ব্বীশে, কাক্ জ্বানিয়ে চ্লেন পার্তিই) এখানে সেই জীবন ছিল, যা দেখে মানুষ নিজের পার্টির জন্য, নিজের পার্টির বন্ধুদের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে। এখানে সে এমন

সংগঠন দেখতে পায় যাতে সে বিশ্বাস করতে পারে যে, যে-আদর্শের জন্য আমি নিজের প্রাণ দিচ্ছি তা সম্পূর্ণ করতে চিরতরুণ থাকার জন্য এক সৈন্য মজুত আছে।

ওয়ার্ধা থেকে ফেরার পথে ১৬ তারিখ বেনারসে পৌঁছলাম। সে-সময় ওখানে 'হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন'-এর সভা হচ্ছিল। হিন্দি-হিন্দুস্তানি[১]-এর ঝগড়া সামনে ছিল। অনেক লোক হিন্দুস্তানির বিরোধিতা করছিল। আমিও বিরোধী ছিলাম, তবে হিন্দু সংস্কৃতি বা হিন্দু ধর্মের জন্য বিরোধী ছিলাম না। বরং দুটো বিস্তৃত ও সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে ওঠা সাহিত্যকে একটি নকল ভাষার মাধ্যমে এক করার প্রচেষ্টা আমার একেবারে ছেলেমানুষী মনে হয়েছিল। আমি আগেই লিখেছি যে হিন্দুস্তানির পক্ষপাতীরা যদি একবার পন্ত এবং ইকবাল -এর কবিতাগুলো পাশাপাশি রেখে একটু বোঝবার চেষ্টা করেন, তাহলে দেখা যাবে যে এই দুজনকে বোঝার জন্য এই অপরিপক্ক হিন্দুস্তানি দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আমার মনে হয় দাড়ি আর টিকিকে মেলালে ভাষা-সমস্যার সমাধান করা যাবে না, তাদের শিকড়ের সঙ্গে মেলাতে পারলেই আমরা সমাধান করতে পারব। এই 'শিকড়' হল আমাদের মাতৃভাষা, যাকে গ্রাম্য অ-সাহিত্যিক বলে অবহেলা করা হয়। হিন্দি আর উর্দূওলারা যাতে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে, মনোভাবকে বোঝাতে পারে তার জন্য আমি অবশ্যই চাইতাম যে হিন্দি-পড়া ছাত্রদের তাদেরই বর্ণমালায় উর্দূরও দু-চারটি পাঠ দেওয়া হোক এবং উর্দূ-পড়া ছাত্রদের বেলায়ও ঠিক সেইরকম করা হোক। আমিও সেখানে ৪-৫ মিনিট বললাম। আমার অনেক সাহিত্যিক বন্ধু আমাকে কুর্তা ও ধুতি পরা অবস্থায় দেখেছিল।

১৮ অক্টোবর ছাপরা পৌঁছলাম। সেখানে লোলার চিঠি পেলাম। আমি ছেলের নাম 'অগ্নি' (রাশিয়ান 'ওগোন') লিখে পাঠিয়েছিলাম। লোলা চিঠিতে আফশোশ করেছিল, 'ছেলের নাম ইগর রেখে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ঐ নাম আমি ভবিষ্যতের জন্য সুরক্ষিত রাখছি।' এটাও জানা গেল যে ইগোরের জন্ম ৫ সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) লেনিনগ্রাদে, সে আট মাসের শিশু। প্রথমে খুব দুর্বল ছিল, কিন্তু এগারো মাসের যে ফটো আমার কাছে এসেছিল তাতে খুব হৃষ্টপুষ্ট দেখা গেল। সব মায়েদের মতো লোলাও তার বাচ্চার গুণের অতিশয়োক্তি করেছিল যে, ও খুব সুন্দর, খুব স্বাস্থ্যবান, খুব গম্ভীর, একটুও কাঁদে না ইত্যাদি। আমি একবার এই ব্যাপারে একটু ঠাট্টা করেছিলাম। ও তখন লিখল, 'নিজের চোখে যদি দেখতে তবে বুঝতে পারতে।'

পার্টি মেম্বার—কয়েকটি ব্যাপারের জন্য বিহারে এখনো কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠেনি। তার একটা প্রধান কারণ ছিল যে, পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থা জয়প্রকাশবাবুর সঙ্গে বিবাদ করতে চায়নি। তাদের নীতি ছিল, সমস্ত বামপন্থী ও সমাজবাদীদের একতা কায়েম থাকুক। কিন্তু যেমন-যেমন পার্টির মেম্বার ও তাদের প্রভাব বাড়ছিল, তেমনি-তেমনি সমাজবাদী

---

[১] *হিন্দুস্তানি* মূলত এলাহাবাদ অঞ্চলে প্রচলিত কথ্যভাষা। এই ভাষা হিন্দি ও উর্দূর সংমিশ্রণে গঠিত, তবে উর্দূর প্রাধান্য রয়েছে।—স·ম·

কংগ্রেস নেতারা ভয় পেতে শুরু করেছিল। অবশেষে বিহারেও পার্টি গড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হল। ১৯ অক্টোবর হল সেই স্মরণীয় দিন, যেদিন **মুঙ্গেরে** বিহারের কম্যুনিস্ট পার্টি স্থাপিত হল। আমি আর এক বন্ধুর সংগে সেখানে পৌছলাম। অন্যান্য জেলা থেকেও অনেক বন্ধুরা এসেছিল। সব মিলিয়ে ১৬,১৭ জন তরুণ ছিল। কমরেড ভরদ্বাজ পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে এই কাজের জন্য এসেছিলেন। তিনি দুদিন (১৯, ২০ অক্টোবর) পার্টির কর্মপন্থা ও নীতির বিষয়ে বোঝালেন। ওয়ার্ধাতেও আমি ভাল বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু এখানে আরও কাছ থেকে তাঁর বক্তৃতা শোনার সুযোগ পাওয়া গেল। সব তরুণের মধ্যেই উৎসাহ ছিল। অনুশাসনহীন ভিড়ের সেনাপতি হওয়ার চেয়ে অনুশাসনবদ্ধ সেনার একজন সাধারণ সৈনিক হওয়া অনেক ভাল, কারণ সেখানে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি। গোয়েন্দা পুলিশ পুরোপুরি সজাগ ছিল। ২০ তারিখে আমরা **মুঙ্গের** থেকে নিজের নিজের জায়গায় ফিরলাম। ২৪ অক্টোবর খবর পাওয়া গেল যে ৩০ তারিখে কংগ্রেস **মন্ত্রীসভা** ইস্তফা দিতে চলেছে, কারণ যুদ্ধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও গভর্নর **মন্ত্রীসভাকে** জিজ্ঞেস না করেই যা চাইছে করে ফেলছে। কংগ্রেস এই অপমানজনক পরিস্থিতিতে থাকতে চায় না।

কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে যে কোনো মুহূর্তে ওয়ারেন্ট বেরোতে পারত। যদিও সরকারের এটা প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না যে অমুক লোক বেআইনি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বার। তবে ওদের কাছে খুব বড় হাতিয়ার ছিল 'ভারত রক্ষা আইন'। ওরা বিনা মোকদ্দমায় যাকে খুশি তাকে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত জেলে নজরবন্দী রাখতে পারত। বন্ধুরা পরামর্শ দিল আমি যেন কিছুদিনের জন্য অন্তর্ধান করি।

অন্তর্ধানের দু-মাস—চব্বিশ ঘণ্টা আমার পিছনে গোয়েন্দা পুলিশ লেগে থাকত। কংগ্রেস সরকারের আমলেও গোয়েন্দা বিভাগ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। তখনও সরকারী গুপ্তচর আমার সঙ্গে ঘুরত, এখন তো কথাই নেই। স্টেশন থেকে সোজা গেলে তো গোয়েন্দা আমার পিছু নিত। গোরখপুরগামী ট্রেন রাতে 'ছাপরা কাছারি' স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল, এক বন্ধু 'তহসীল দেওরিয়া'র একটা টিকিট এনে দিল আর আমি রাত্তিরবেলা পোশাক পাল্টে প্ল্যাটফর্মের অন্যদিক থেকে গাড়িতে উঠে বসে পড়লাম। দেওরিয়ায় আমি এক অদেখা বন্ধুর কাছে গেলাম। সেখানে প্রায় দু-সপ্তাহ থাকি। আমি লুকিয়ে থাকছিলাম, তবু আস্তে আস্তে অনেকে জানতে পারে ও আমার কাছে আসতে থাকে। এখানে আমার আর বেশি দিন থাকা সম্ভব ছিল না।

মলাও-এ—কয়েক শতাব্দী আগে আমার প্রথম পূর্বপুরুষ (গয়াধর) মলাও থেকে হেঁটে চকর-পানপুর এসেছিলেন। এর কয়েক প্রজন্ম পর ওঁদের মধ্যে একজন (ইচ্ছা পাণ্ডে) কনৈলায় বসবাস শুরু করে। মলাও সম্বন্ধে যখন-তখন আমি অনেক কিছু শুনতাম। ইতিহাস-প্রেমের তাগিদে আমার ইচ্ছে হতো কোনোদিন মলাও গিয়ে দেখে আসি। এক বন্ধুকে নিয়ে আমি মলাও রওনা হলাম। গোরখপুর পর্যন্ত রেলে গেলাম, তারপর ওখান

—১৯৩৯—

থেকে এক্কা ও মোটরে করে মলাও-এর কাছে নামলাম। একটা ছোট স্রোত পার হওয়ার আগে জিনিসপত্রগুলো পাশের একটি গ্রামে রাখলাম। আমি আপাতত মলাও একবার দেখেই ফিরে আসতে চাইছিলাম। সেই ভেবে জিনিসপত্র নিজের সঙ্গে নিয়ে যাইনি। বরেজার (সারন) আমার একজন পরিচিত মলাও-এ বহুদিন পোস্টমাস্টার ছিলেন। তিনি পণ্ডিত শিবপূজন পাণ্ডের কাছে থাকতেন। আমার সম্বন্ধে অনেক আগে মলাও-এর আত্মীয়রা কিছু জানতেন। ওখানে আমি গেলাম শ্রীশৈলেশকুমারের বাড়ি। সে মলাও-এর এক অতি সম্পন্ন জমিদার। কিন্তু জমিদার বলে নয় আমি আত্মীয়তার সম্পর্কে ওখানে গিয়েছিলাম। বাড়ির মালিক কেউ ছিল না, কিন্তু নাম জানতে পেরেই চাকরবাকরেরা খুব সম্মান করে বৈঠকখানায় বসাল। শৈলেশ ও তার ভাই অন্য কোনো গ্রামে গিয়েছিল, তাদের কাছে লোক পাঠানো হল। খাবার সময় হয়েছিল। আমি ওখানেই খাবার এনে দিতে বললাম। শৈলেশের ঠাকুমা—যাকে আমি তখনো জানতাম না যে আমার বৌদি হবেন—আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'আমাদের আত্মীয় হয়ে বাইরে কি করে খাবার খাবে?' তিনি বোধহয় জানতেন না যে আমি জাতি-ধর্ম সব ত্যাগ করেছিলাম। হ্যাঁ, পূর্বপুরুষের রক্তকে অস্বীকার করি নি। যাইহোক, আমি ঘরে গিয়েই খেলাম। কিছুক্ষণ পরে শৈলেশও চলে এল। এখন আর তাড়াতাড়ি ফেরার প্রশ্নই ছিল না। আমার মালপত্রও আনিয়ে নেওয়া হল।

সারা গ্রামের লোক জানতে পারল যে তাদের কুলের রক্ত মাংসের সম্পর্কিত একজন মানুষ গ্রামে এসেছে, যার খুব খ্যাতি আছে। আমি ভাবলাম, এই সুযোগটাকে পুরো কাজে লাগানো উচিত। আমি ইতিহাসের মালমশলা জমা করতে লেগে গেলাম। কোঠাঘরে থাকার বন্দোবস্ত ছিল। মলাও-এর লোকরা তাদের পূর্বপুরুষের 'ধর্ম'কে অনেক ক্ষেত্রেই কায়েম রেখেছে, এমন পথভ্রষ্ট খুব কম আছে যারা মাছ-মাংস খায় না। শৈলেশের ঘরে তো রোজই মাছ-মাংস হতো। শীতের দিন ছিল। এই সময় সাইবেরিয়ার পাখিরাও আসত মলাও-এর পুকুরগুলোতে আর রোজ তাদের শিকার হতো। রান্নার ব্যাপারে আমার একটাই অভিযোগ হতে পারত, সেটা হল ঘি আর মশলা সম্বন্ধে,যার জন্য সুপাচ্য মাংস হয়ে উঠত দুষ্পাচ্য। কিন্তু এটা তো সারা ভারতবর্ষের রোগ। আমার খাবার এখন কোঠাঘরেই চলে আসত। টেবিলে খাওয়ার সময় দেখেছি শৈলেশ ও অন্যান্যরাও সামিল হতো। আমি বারণ করি কিভাবে? লোলার কথা ওরা জানত, ওরা দেখেছিল আমার না আছে টিকি না পৈতে, তবু যদি ওদের আপত্তি না থাকে তাহলে আমার কিছু বলাটা অভদ্রতা হতো। অবশ্য বুড়ি ঠাকুমা কি ভাবতেন, তা আমি বলতে পারি না। বোধহয় আমার ব্যাপারে সব কথা তাঁর জানা ছিল না। এটাও হতে পারে যে আত্মীয়ের প্রতি স্নেহের পাল্লা ভারি ছিল। হ্যাঁ, আমি যখন তাঁকে মলাও-এর রীতি-রেওয়াজ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বলতে লাগলেন যে কিভাবে মলকবীর বাবার জন্য প্রতি পুত্রের জন্ম উপলক্ষে একটি কচি প্রাণী (শুয়োর-ছানা) চড়াতে হয়, বিয়ে-থার ব্যাপারে কি কি আচার পালন করা হয়। এই সময় তাঁর বয়স ষাটের ওপর হওয়া সত্ত্বেও তিনি একটুখানি ঘোমটা দিয়ে থাকতেন। শৈলেশ বলেও ছিল যে, এখানে ঘোমটার কি

দরকার। ঘোমটার বহর একটু কমল, হয়ত সেটুকুও থাকত না যদি জানতেন যে আমি তাঁর একজন ছোট্ট দেওর। আমি মলাও-এ এই ক-দিন আত্মীয়ের পুরো স্নেহ পেয়েছি।

ছেলেবেলায় আমি অহীর নৃত্য দেখেছিলাম। কিন্তু তার গুরুত্বকে আমি লেনিনগ্রাদে ওখানকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নাচ দেখার আগে পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। সেটা দেখার পর হঠাৎ বাল্যস্মৃতি জেগে ওঠে আর আমার মন বলে ওঠে, 'আমাদের ওখানেও এক শ্রেষ্ঠ নৃত্য আছে।' ভারতে এসে ছাপরায় আমি এই নৃত্য দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু মনে হল যে আমাদের লোকজন এটাকে 'সভ্যতা'-র কলঙ্ক ভেবেছিল এবং গত পঁচিশ বছরে এটা সে-জায়গা থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। কোনো **নিপুণ** মূর্তিশিল্পীর অপূর্ব মূর্তি ভেঙে গেলে একজন শিল্পপ্রেমীর মনে যেমন দুঃখ হয়, আমার মনে তার চেয়ে কম দুঃখ হয়নি। সারনাথে আমি ব্যবস্থা করেছিলাম আর চাইছিলাম বেনারসের কিছু শিক্ষিত ভদ্র পুরুষও যেন তা দেখে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তা হতে দেয় নি ।

এই নৃত্য বিশেষ করে শুধু অহীর সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল। আমি ছেলেবেলায় দেখেছিলাম যে, কিভাবে পুরুষ-নারী দুই এতে অংশ নেয়। কনৈলায় জগমোহন সম্পর্কে আমার ভাই ছিল। জগমোহনের বিয়ে ছিল, দরজায় চামাররা মাদল বাজাচ্ছিল আর গ্রামের কত তরুণ অহীর, হয়ত **ভর**[1]-তরুণও নাচছিল। জগমোহনের মা কোনো কাজে দরজার বাইরে বেরিয়েছিলেন। দেওররা ঠাট্টা করতে লাগল যে, ঐ বুড়ি আর কি নাচবে! সে-সময় তিনি বুড়ি ছিলেন না, স্বাস্থ্যবতী প্রৌঢ়া ছিলেন। তিনি দেওরদের ইয়ার্কি কি করে চুপচাপ হজম করেন? আখড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি দেওরদের পাল্টা জবাব দিলেন, 'যার হিম্মৎ আছে সে এসে আমার সঙ্গে নাচুক। এসো, দু-একজন দেওর।' এই নাচ কিন্তু আঙুল, চোখ আর পা-কে হাল্কা-হাল্কাভাবে কাঁপানোর নাচ ছিল না, এটা ছিল অহীরদের বীরনৃত্য, যাতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গের চর্বি পিষ্ট হয় আর আধঘণ্টার মধ্যেই ঘাম ছুটতে থাকে। কাকীর সামনে অনেকে নাচল বটে কিন্তু সবাই হার মেনে বসে পড়ল। তিনি সগর্বে তাকিয়ে আখড়া থেকে চলে গেলেন।

আমি তিরিশ বছর আগের এই স্মৃতির সঙ্গে লেনিনগ্রাদের নৃত্যের তুলনা করেছিলাম। কিন্তু স্মৃতির ওপরে পুরোপুরি বিশ্বাস করা চলে না। আমি শৈলেশের কাছে অহীর নৃত্য দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। এখনও ওখান থেকে এই নৃত্য সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি, তবে মেয়েরা তাতে অংশগ্রহণ করা ছেড়ে দিয়েছিল। এই পাপে দোষী ছিল ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কায়স্থ ও বেনিয়ারা, যারা স্ত্রী-পুরুষের একসঙ্গে নাচা অভদ্র আর অপমানজনক—এই দৃষ্টিতে দেখত। যে কলা উনিশ শতক পর্যন্ত ভালোভাবে রক্ষিত হয়ে এসেছে, যে কলা বিশ শতকে জগতের সামনে গর্বের সঙ্গে পেশ করা যেত, যে কলা একুশ শতকে ভারতের সব নরনারীর প্রিয় কলা, প্রিয় ব্যায়াম হতে পারত, তাকে আমাদের এই অযোগ্য সভ্যতা বিশ শতকে এসে গলা টিপে খতম করতে চেয়েছে। শৈলেশ প্রথমে গ্রামেরই এক ভর-যুবককে ডাকল। পৌষ-মাঘ মাসের ঠাণ্ডা পড়ছিল, তার ওপর মাঝরাত। এই যুবকটি

---

[1] নিম্নবর্ণের হিন্দু।—স·ম·

তেমন কোনো পাকা নর্তক ছিল না, কিন্তু ও যখন নাচতে শুরু করল, তখন এক ঘণ্টার মধ্যেই সারা শরীরে তার ঘাম ঝরতে লাগল। আমি ভাবলাম, আমার বাল্যস্মৃতি তাহলে আমাকে প্রতারিত করেনি। বলল, 'আমি পেলমেন-এর পদ্ধতি অনুসারে ব্যায়াম করি, কিন্তু ওতেও কোমরের চর্বি গলানোর এমন ভাল উপায় নেই যেমন আছে এই নৃত্যে।'

কয়েকদিন পরে শৈলেশ অহীর নৃত্যের জন্য কয়েকজন যুবককে একত্রিত করতে সফল হয়েছিল। ওদের দেখে আমি পুরোপুরি বুঝতে পারলাম যে, আমার স্মৃতি ভ্রান্ত নয়।

মলাও রাপ্তী (অচিরবতী) নদীর ধারে ঐ একই প্রদেশে অবস্থিত যেখানে বুদ্ধের সময় মল্লদের প্রজাতন্ত্র ছিল। সেই সময়ও ওখানে হয়ত মল্লগ্রাম (মলাও) ছিল। মল্লদের মতোই ওখানকার মানুষও সর্বদা লড়াই-ঝগড়া নিয়ে থাকার লোক ছিল। মহাভারতে এদের (সাংকৃত্যায়নদের) **ব্রহ্মক্ষত্র**[1] বলা হয়েছে। শুধু মলাও গ্রামেই নয়, কনৈলাতেও লড়াই-দ্বন্দ্বের প্রবৃত্তি দেখা যায়। বুদ্ধের সময় 'মল্লগ্রাম' কোনখানে ছিল, এ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। এখনও আশেপাশে তার তিনটি ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তারই মধ্যে কোথাও হয়ত ছিল। কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষের খনন কখনও হয়নি।

হপ্তাখানেক বা তার বেশি আমি মলাও-এ কাটালাম। ওখান থেকে আমার রওনা হবার আগেই শৈলেশের কাকা শ্রীদ্বীপনারায়ণ পাণ্ডেও এসে পড়লেন। মলাও থেকে আমার জৌনপুর জেলায় কোনো একটা বার্ষিক অধিবেশনে যাওয়ার ছিল। আমি আগেই ওটাতে সম্মত হয়েছিলাম, সেইজন্য এখন প্রত্যাখ্যান করা মুশকিল ছিল। কম্যুনিস্টরা বেশি গ্রেপ্তার হচ্ছিল না, সেইজন্য প্রকাশ্যে থাকলে কোনো ক্ষতি নেই বলেই মনে হচ্ছিল। গ্রামের নাম আমার মনে নেই, কিন্তু সেটা স্টেশন থেকে কিছু দূরে ছিল। আমি ওখানে একাই হেঁটে চলে গেলাম। হয়ত ব্যবস্থাপক ও অন্যান্যদেরও একটু খারাপ লেগেছিল এত নামকরা সভাপতিকে এইভাবে আসতে দেখে। খারাপ লাগারই কথা, কারণ উৎসব প্রদর্শনীর জন্যই করা হয়।

ওখান থেকে আমি জৌনপুরে গেলাম এবং কোনোরকমে লুকিয়ে রাতে এলাহাবাদ পৌঁছে গেলাম। আমি সেখানে দু-তিনটে জায়গায় পুরোপুরি লুকিয়ে ছিলাম। এই সময়টা আমি 'সোভিয়েতসঙ্ঘ-সাম্যবাদীপার্টি-**ইতিহাস**'[2]-এর হিন্দি অনুবাদ করার কাজে লাগিয়েছিলাম। অনুবাদ খুব তাড়াতাড়ি হয়েছিল, আমি সেটা দ্বিতীয়বার দেখতে পারিনি এবং তার যে অংশটা প্রকাশকরা ছাপিয়েছিল তাতে কম্পোজিটরদের ভুলগুলোকেও যতটা সম্ভব বেশি রেখে দেওয়া হয়েছিল, এইসব কারণে পুরো কাজটাই মাটি হয়ে গেল।

কৃষক সম্মেলনের সভাপতি—পয়লা জানুয়ারি আমি মঢ়ৌরাতে ছিলাম। এখনও মঢ়ৌরার মজদুরদের ঝগড়ার পঞ্চায়েত কোনো ফয়সালা করেনি।

---

[1] মনুর মতে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় থেকে সবর্ণা স্ত্রীতে মল্লদের জন্ম। পরাশরের মতে এদের পিতা কুন্দকার ও মাতা তন্তুবায়ী।—স.ম.

[2] সোভিয়েত কম্যুনিস্টপার্টি কা ইতিহাস নামে গ্রন্থটি *প্রয়াগ* প্রকাশন-সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। রচনাকাল ১৯৩৯।—স.ম.

—১৯৪০—

৪ জানুয়ারি বন্ধু পুরণচন্দ্র যোশী ও ভরদ্বাজ ছাপরায় এল। এই সময় স্বামী সহজানন্দজী ছাপরাতেই ছিলেন। যোশী ও ভরদ্বাজ বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল। এমনিতে স্বামীজী সর্বদাই বেদান্ত, বৈরাগ্য, অতএব ব্যক্তিবাদের চক্করে থাকতেন, কিন্তু যখনই তিনি মানুষের দুঃখময় জীবনের সংস্পর্শে পড়তেন তখন সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসতেন এবং সব শক্তি দিয়ে পীড়িত কৃষকদের জন্য কাজ করতেন। কিন্তু যেই তাঁর প্রবৃত্তি বাইরে থেকে সরে অন্তর্মুখী হয়ে পড়ত, অমনি তিনি সব ভুলে যেতেন এবং একজন ব্যক্তিবাদী রূপে দেখা দিতেন। রোদ ও ছায়ার মতো তাঁর জীবন বরাবর এই দুই রূপেই দেখা যেত। এ সত্ত্বেও তাঁর নির্ভীকতা, নিরলসতা আর সততা নিয়ে কে সন্দেহ করতে পারত? যোশী-ভরদ্বাজ দুদিন ধরে তাঁর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও অন্তর্রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করল। ওরা কোনো সভার জন্য আসে নি, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতেও চাইছিল না। যদিও আমি গোরখনাথ ত্রিবেদীকে বলে দিয়েছিলাম যে, তাঁর বাড়িতে কোন দুজন ব্যক্তি এসেছে। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে, তিনি ওদের ব্যক্তিত্ব ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন কিনা। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মুখ্য সচিব যোশী ও ভারতীয় কম্যুনিস্টদের চার প্রধান নেতার মধ্যে একজন ভরদ্বাজ সামনে উপস্থিত ছিল, কিন্তু ওদের মুখের চারদিকে কোনো প্রভামণ্ডল ছিল না যাতে লোক ওদের চিনতে পারত। জনতা যদিও প্রভামণ্ডলের খপ্পরেই পড়ে যায়, তাহলেও জনতার লড়াইকে তারাই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে যারা প্রভামণ্ডলহীন এবং যারা যুদ্ধের পরিখায় জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে পারে।

বসন্তপুর থানায় 'বালা' একটা ছোট্ট গ্রাম। ওখানেও জমিদাররা কৃষকদের জমি কেড়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু ওরা সফল হয়নি। তখন গুণ্ডা জমা করে তলোয়ার-বর্শা দিয়ে মেরেছিল, যাতে তিনজন কৃষক মারা গিয়েছিল।

৯ জানুয়ারি আমি বালায় গেলাম। ওখানে আমি দেখলাম, তিন-তিনটে মানুষ মারা যাবার পরও না তারা ভীত হয়েছিল, আর না তাদের উৎসাহ কমে গিয়েছিল। তারা বুঝতে পারছিল যে, রক্তবীজের মতো তাদের কেউ উচ্ছেদ করতে পারবে না। তারা নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির একটু একটু ঝলক দেখেছিল আর তাতে আত্মবিশ্বাস তাদের বেড়ে গিয়েছিল। সন্ধেয় একটা বড় সভা হল, যেখানে আশেপাশের কয়েকটা গ্রামের কৃষকরা জমায়েত হয়েছিল।

১৪ জানুয়ারি পাটনায় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বৈঠক ছিল। তখন আমাকেই সভাপতি করা হয়েছিল। আমার কিছু বন্ধু ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েতের যুদ্ধের নিন্দা করেছিল। ২৯ জানুয়ারি আবার দ্বিতীয় বৈঠক হল, সেখানেও বহু লোক ঐভাবে সোভিয়েতের নিন্দা করছিল, যেমন করছিল ইংল্যান্ডের ট্যরি[১] আর ওদের সংবাদপত্র। আমার অবাক লেগেছিল যে, এরা কি ধরনের সোস্যালিস্ট (সমাজবাদী) যারা এটুকুও বুঝতে পারে না যে সোভিয়েতের নিন্দা করা মানে ইংরেজ ট্যরিদের ও ফিনিশ[২] কৃষক-মজুরদের প্রাণের শত্রু ম্যানারহাইমের হাতের পুতুল হওয়া। যাক, পার্টি সোভিয়েত নীতির সমর্থনে প্রস্তাব পাশ করেছিল।

—১৯৪০—

২৫ জানুয়ারি বাকরপুরে (মুজফ্‌ফরপুর) 'সুলোচনা গ্রন্থাগার'-এর উদ্‌ঘাটন করার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছিল। দু-হাজার লোক সভায় এসেছিল। আমার ভাষণের নোট নেওয়ার জন্য সরকারী স্টেনো ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন। দ্বিতীয় দিন (২৬ জানুয়ারি) সোনপুরে খুব ধুমধামের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস[৩] পালন করা হল। ওখানেও স্টেনো-সরকারী অফিসার হাজির ছিলেন। ২৮-এ পানাপুর দিওরার কৃষকদের কাছে ভাষণ দিলাম। ২৮-এ আবার বাঢ়-এর ছাত্র সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে ভাষণ দিলাম। এখানেও স্টেনো উপস্থিত ছিলেন। বাঢ়-এ দুটো মানপত্র পাওয়া গেল, যেগুলো আমি ওখানেই দিয়ে দিলাম। ভাষণ আর উৎসাহ লক্ষ করে জনা চারেক কৃষক নিজেদের মধ্যে মতামত ব্যক্ত করল, 'কংগ্রেস-ফংগ্রেস কিছু নয়, আসল কাজ করার দল হল কৃষকসভা আর আর্যসমাজ।'—লাঠি হাতে ব্যবস্থাপক ছাত্রদের ওরা আর্যসমাজী ভেবেছিল। ৩০, ৩১ জানুয়ারি মঢ়ৌরার মজুরদের বিবাদের ফয়সালার জন্য পঞ্চায়েত বসেছিল। ছাপরার কালেক্টর মিস্টার কেম্প সভাপতি ছিলেন। আমি আর কোম্পানির এক প্রতিনিধি ছিলাম এর সদস্য। প্রথম দিন কোম্পানির প্রতিনিধি মঞ্জুর করল যে ওরা বারোটা নতুন বাড়ি বানিয়ে দেবে আর পুরনো বাড়িগুলো সারাবে। দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে চার আনার জায়গায় কম করে ছয় আনা দৈনিক মজুরি স্বীকার করেছিল, এবং এটাও মেনে নিয়েছিল যে বেশি মুনাফা হলে মজুরদের বোনাস দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া মজুরদের মজুরিও বৃদ্ধি করা হয়েছিল। পালা-পার্বণের দিনে শ্রমিকদের ছুটি মঞ্জুর করা হল। রেজিস্ট্রি করার পর মজদুর-সভাকে স্বীকৃতি দেবার কথাও ঠিক হল। মজুরদের ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করারও কিছু প্রস্তাব মানা হয়েছিল। মঢ়ৌরার চিনি কলের মালিকরাও অনেকগুলো প্রস্তাব মেনে নেয় আর কম পক্ষে সাড়ে পাঁচ আনা বেতন স্বীকার করে। এই ধরনের সমঝোতায় অংশগ্রহণ করার এটা ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। পরের দিন জানতে পারলাম যে চিনি কলের মজুররা আমাদের সমঝোতার সঙ্গে একমত নয়, এই জন্য চিনি কলের মালিকদের সমঝোতার শর্ত মেনে নেওয়ার আগে এটা আমি জরুরি মনে করলাম যে, প্রথমে শ্রমিকদের ডেকে ওদের সামনে শর্তগুলো রাখা হোক। চিনি কলের লোকদের সম্মতি পেতে একটু দেরি হয়েছিল। এটা একটা মস্ত বোঝা ছিল, যা এক বছর ধরে ঝুলছিল। যদিও বোঝা হাল্কা হয়ে গেল, কিন্তু আমি দেখলাম যে, মজুরদের সংগঠন মজবুত নয়। আর যতক্ষণ না সংগঠন মজবুত হচ্ছে ততক্ষণ জয়ের ফল স্থায়ী হতে পারে না। সংগঠন করার সময় যে আমি পাব সে-আশা বড়ই কম ছিল।

৪ ফেব্রুয়ারি আমি রহিমপুর (খাগড়িয়া) মুঙ্গের কৃষক সম্মেলনে গেলাম। ওখানে চলে

---

[১] ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় চার্লস-এর শাসনকালে ইঅর্কের ডিউকের (অর্থাৎ দ্বিতীয় জেমস-এর) সমর্থক দল।—স-ম-

[২] ফিনল্যান্ড ও তার সন্নিহিত দেশ সম্বন্ধীয়—স-ম-

[৩] ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে লাহোর-কংগ্রেসে 'পূর্ণ স্বরাজ' (Complete Independence of the Country) ঘোষিত হওয়ার পর থেকে এই দিনটিই (২৬ জানুয়ারি) 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে পালিত হতো। ১৯৫০ থেকে এই দিনটি 'প্রজাতন্ত্র দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। —স-ম-

গিয়ে বেগুসরাইয়ে রাতে থাকলাম। ওখানে জোর গুজব উড়ছিল যে রাহুলজীকে গ্রেপ্তার করার জন্য পনের জন ফৌজী পুলিশ এসেছে, কিন্তু অশান্তির ভয়ে ওরা গ্রেপ্তার করে নি।

আমি এবারকার প্রাদেশিক কৃষক সভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম, তার জন্য একটা ভাষণ লেখার ছিল। নির্জনতার কথা ভেবে আমি রাজগীর চলে আসি। ১৯১৯-এ আমি যে রাজগীরকে দেখেছিলাম, তার থেকে এখন অনেক আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এখানে অনেক বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছিল আর লোকও আসছিল খুব। এমনিতে রাজগীর তো একটা ভাল স্যানিটোরিয়াম হওয়ার যোগ্য। ১০, ১৫ লাখ টাকা ঢেলে এখানে দু-হাজার ঘর বানানো যেতে পারে। নল দিয়ে গরম কুণ্ডের জল স্নানাগারে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে স্বাস্থ্য বা ঋতু পরিবর্তনের জন্য আগত ব্যক্তিরা আরামে থাকতে পারে। কিন্তু সে-দিন এখনও অনেক দূরে!

ওখান থেকে আমি সাসারাম (১৩ মার্চ) গেলাম। পুকুরের ভেতরে পাথরের সেই বিশাল ইমারত আছে যেখানে শের শাহ ঘুমিয়ে আছে। আকবর যে উদার রাজনীতি ও বিশাল ব্যবস্থাকে তাঁর শাসনে কাজে লাগিয়ে ছিল, তার সূত্রপাত করেছিল শের শাহ। কথিত আছে, শের শাহের পুরো শরীর নয় শুধু একটা আঙুলকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

শহরের বাইরে চন্দন শহীদের পাহাড়ে গেলাম। এখানেই একটা প্রাকৃতিক গুহার মধ্যে পাথরের গায়ে অশোকের লিপি খোদাই করা আছে। এখান থেকে আমি দরিগাঁও গেলাম। গাঁয়ের জমিদার রংগবাহাদুর সিংহ সামন্তযুগের সামন্তদের মতো কৃষকদেরকে শাসন করত। গরিব কৃষকরা ত্রাহি-ত্রাহি করছিল। এখানেও আমার ভাষণের নোট নিতে স্টেনো ও ডেপুটি সাহেব পৌঁছেছিলেন। ডেপুটি সাহেবের খুব অসুবিধে হয়েছিল, কারণ তাঁকে ধানখেতের মধ্যে দৌড়তে হয়েছিল।

১৪ ফেব্রুয়ারি পাটনায় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বৈঠক হল। বিহারে কম্যুনিস্টদের বাড়তে দেখে নেতারা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল, আর পার্টি থেকে কম্যুনিস্টদের তাড়ানোর জন্য উদ্ধত হয়েছিল। ওরা মনজর রিজবী-কে সাফাই দেওয়ার সুযোগও দিল না এবং পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দিল। আমাকে এখনি তাড়ানোর ব্যাপারে ইতস্তত করছিল।

পরদিন (১৫ ফেব্রুয়ারি) প্রদেশ কংগ্রেসের পদাধিকারীদের নির্বাচন ছিল। আমি আশ্চর্য হয়ে শুনলাম যে আমিও রামগড় কংগ্রেসের জন্য প্রতিনিধি, অতএব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। আমি ছাপরায় বন্ধুদের অনুরোধে প্রতিনিধি হবার প্রার্থী খাড়া হয়েছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে এই শর্ত দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হয় তাহলে আমি আমার নাম প্রত্যাহার করে নেব। প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হল আর আমিও নাম প্রত্যাহার করে নিলাম। কিন্তু আজ শুনলাম যে আমি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছি। খবর পেলাম, কংগ্রেস নেতারা ডাক্তার মহমুদকে প্রতিনিধি করতে চাইছিল। তাঁর বিরুদ্ধে পণ্ডিত মাণিকচন্দ খাড়া হয়েছিলেন আর তিনি নিজের নাম প্রত্যাহার করতে রাজি হলেন এই শর্তে যে, আমাকে কোনো এক জায়গা থেকে যেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করা হয়। এইভাবে আবেদনপত্রে হস্তাক্ষর পর্যন্ত না থাকা সত্ত্বেও আমাকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির রাজনীতি অনেক নিচে নেমে এসেছিল। সেখানে

কায়স্থ আর ভূমিহারদের দলবাজি চলছিল। সৎ বা অসৎ যেমনভাবেই হোক নিজের নিজের গোষ্ঠীর বেশি প্রতিনিধি পাঠানোর চেষ্টা ছিল। শ্রীকৃষ্ণবাবুর পাল্লা ভারি ছিল আর মথুরাবাবু, কৃষ্ণবল্লভ সহায়, বৃন্দাবাবুর মতো কর্মঠ কংগ্রেসীরাও কার্যনির্বাহী কমিটির মধ্যে থাকেননি—এ ছিল রাজেন্দ্রবাবুর হার।

ছাপরায় যখন আমি ছিলাম, তখন রোজ সন্ধেয় কাছারী স্টেশনে এক মুসলমানের চায়ের দোকানে চা খেতে যেতাম। যদিও আমার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, তবু এটা একটা প্রদর্শনীর মতো হয়ে গিয়েছিল, কারণ কাছারীর অধিকাংশ উকিল-মোক্তার শহরের এই অংশে থাকত আর সন্ধেবেলা বেড়ানোর জন্য প্ল্যাটফর্ম ছাড়া কোনো জায়গা ছিল না। কখনও কখনও অন্য বন্ধুও জুটে যেত, যেমন বাবু বাচ্চুবিহারী উকিল। বাকি লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ মনে করত যে, এই লোকটার কোনো লাজ-লজ্জা নেই। অর্থাৎ যদি লুকিয়ে মুসলমানের চা খেতাম, তাহলে আমাকে ভাল লোক বলা হতো। কিন্তু কেউ কেউ আমার নির্ভীকতার প্রশংসাও করত। একদিন ওখানে চা খাচ্ছিলাম। কিছু পথিক ওখানে খাবার খেতে এসেছিল। ওরা জিজ্ঞেস করল, 'কিসের মাংস আছে?' হোটেলওলা বলল, 'খাসির।' খাসির মাংসের দাম বেশি, বেচারা কৃষকদের কাছে অত পয়সা কোথায়? ওরা বলল, 'বড়খাসি (গো-মাংস) নেই?' হোটেলওলা বলল, 'না ভাই, আমার এখানে নানা ধরনের বাবুরা চা খেতে আসে, দু-পয়সা কমই লাভ করব, কিন্তু বড়খাসি কেন বানাব?' আমি ভাবলাম, হিন্দু কৃষকরা বেকুব, যদি ওরা মুসলমানদের এখানে খাবার খেত, তাহলে বিনা জবরদস্তিতেই মুসলমানদের হৃদয়ে ওদের জন্য চিন্তা আসত। কিন্তু ওরা তো চলেছিল লাঠির জোরে গোরক্ষা করতে। আমি নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, আমার এসব কোনো চিন্তা ছিল না। বকরীদ-এর দিন যদি ছাপরায় থাকতাম, তাহলে আসরফের কাকা আলী সাহেবের ওখানে ওর প্রসাদ অবশ্যই খেতে হতো।

চব্বিশ-পঁচিশ ফেব্রুয়ারি মতিহারীতে কৃষক সম্মেলন ছিল। আমি ছিলাম সভাপতি। স্বামী সহজানন্দজী, জয়প্রকাশ, নরেন্দ্রদেব এবং ডাক্তার আহ্‌মেদ-এর ভাষণ হল। ইউ·পি-তে তো আগে থেকেই কংগ্রেস-সোস্যালিস্টরা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ঝগড়া করছিল, বিহার বাকি ছিল। কম্যুনিস্টরা সংখ্যায় অল্প ছিল, কিন্তু তাদের বোধ, সততা আর কঠিন অনুশাসনের মধ্যে থাকার কথা ওরা জানত। ওরা এটাও জানত যে, সমাজবাদী বিপ্লব যারা চায় তারা কম্যুনিস্টদের দিকেই ঝুঁকবে। নেতৃত্ব বিপদগ্রস্ত বুঝতে পেরে ওরা নানা প্রান্ত থেকে আগত কৃষক কর্মীদের বোঝাবার কাজে লেগেছিল। পাশের জেলা ছাপরা, ওখান থেকে পঞ্চাশ-ষাট জন কৃষককর্মী এসেছিল। নিজের কর্মকর্তাদের মধ্যে বসা, ওদের কথাবার্তা শোনা আর ওদেরই একজন হয়ে থাকা আমি বেশি পছন্দ করতাম। আমাকে অনেকক্ষণ ওখানে বসতে দেখে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট নেতাদের খুব অসাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছিল। ওরা ভেবেছিল আমি কৃষকদের কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছি। আমি ওখানে কোনো পার্টির নাম পর্যন্ত করিনি। আমার এরকম সন্দেহ হতেই আমি ওদের জন্য সরে গিয়ে জায়গা খালি করে দিলাম। এরপর নেতারা গিয়ে যে-রকম মগজ-ধোলাই করেছিল তাতে লাভের জায়গায় ক্ষতিই হয়েছিল বেশি। যুবকরা খুব

অসন্তুষ্ট ছিল, ওরা বুঝতে পারছিল না যে, যে-কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা একদিকে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে একতার কথা উচ্চারণ করতেও রাজি নয়, তারাই আবার অন্য দিকে গান্ধীবাদের ধ্বজা ধরে ভারতবর্ষে কৃষক-মজুর-রাজ কায়েম করতে চাইছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি আমি অমরপুরের (জেলা ভাগলপুর) কৃষক সম্মেলনে গেলাম। ১৫ হাজারের মতো জনতা ছিল। জনতার খুব উৎসাহ ছিল। আর তার চেয়েও যে-ব্যাপারটা আমাকে খুশি করেছিল তা হল যে, তরুণ কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। মধ্যিখানে খাবার জিনিস জমা করে দশ-বারো জন লোকের একসাথে খাওয়া শারীরিক স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে ভাল নাই-বা হোক, কিন্তু সেটা মানসিক স্বাস্থ্যের মস্ত পরিচয় ছিল। গ্রামের কৃষকরাও সেটা দেখে রেগে যেত না, খুশিই হতো। ওরা বুঝত যে কম্যুনিস্টদের মধ্যে না হিন্দু-মুসলমানের কোনো তফাৎ আছে, না ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার আছে।

পরের দিন ছিল ভাগলপুরে সভা। আমি ঐ দিন দুপুরে পৌছেছিলাম, তখন ময়দানে তিন হাজারের বেশি লোক জমে ছিল। কলকাতায় বেঙ্গল কংগ্রেস কর্মীদের সম্মেলন ছিল। আমাকে তার সভাপতি হবার জন্য বলা হল, কিন্তু আমি তো উন্নাও কৃষক সম্মেলনের সভাপতি হতে আগেই রাজি হয়েছিলাম, তাই ওখানে আমার অসম্মতি জানিয়ে লিখে দিলাম।

২ মার্চ পচরুখীর (ছাপরা) চিনিমিলের মজদুরদের কষ্ট দেখতে গেলাম। এটা ছিল গান্ধীভক্ত সারাভাই (আহমেদাবাদের)-এর মিল, কিন্তু এখানকার মজুরদের এটুকু সুবিধেও ছিল না যা ছিল মঢ়ৌরার ইংরেজ মিলের মজুরদের। মজুবদেব মজুরি ছিল আড়াই আনা, তিন আনা। মঢ়ৌরায় পঞ্চায়েত বসিয়ে আলোচনা মীমাংসা করার সময় মিল কর্তৃপক্ষ বলেছিল, 'ভারতীয় মিলগুলোতে সবচেয়ে বেশি যা মজুরি দেওয়া হয়, আমাদেবও তাই দিতে বলুন।' কিন্তু আমি তা মঞ্জুর করিনি। আমি বুঝেছিলাম যে, বিড়লা আব সারাভাই-এর মিলগুলোতে মজুরদের রক্ত আরও বেশি করে শোষণ করা হয়। মজুরদের অবস্থা জানার পর একটা ছোট সভায় ভাষণ দিয়ে আমি ওখান থেকে প্রয়াগ হয়ে উন্নাও রওনা হলাম।

পৌনে দুটোর সময় উন্নাও পৌছে গিয়েছিলাম। কিন্তু কর্মকর্তারা শুধু শুধু পৌনে তিন ঘণ্টা আটকে রেখেছিল। সভা ছিল ওখান থেকে সতের মাইল দূরে, শফীপুরে। ছটার সময় যখন ওখানে পৌছলাম ততক্ষণে অনেক লোক বিরক্ত হয়ে চলে গিয়েছিল। তবুও আমি ভাষণ দিলাম। সরকারী স্টেনো উপস্থিত ছিল আর ঘটনাচক্রে সে-যুবক ছিল বছওয়ালের (আজমগড়) বাসিন্দা। দুদিন থাকার পর ৭ মার্চ আমি প্রয়াগ চলে এসেছিলাম।

এ বছরের জন্য আমি অখিল ভারতীয় কৃষক সম্মেলন এবং সভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। অন্ধ্রপ্রদেশের পলাশা গ্রামে সম্মেলন হবার কথা ছিল। আমি ভাবলাম প্রয়াগে থেকে ভাষণ তৈরি করে নিই। ওখানে ডাক্তার আহ্‌মদের কাছে ছিলাম। আমার ওপরে পুলিশের খুব কড়া নজর ছিল, এই জন্য আমার পুরনো অরাজনৈতিক বন্ধুদের কাছে থেকে ওদের বিপদে ফেলতে চাইনি। আর আহ্‌মদ এবং হাজরা তো আমার বন্ধু ছিল।

ওদের ওখানেও প্রতি দশ দিন পনের দিন বাদে বাদে পুলিশী তল্লাসী করা হতো। আহ্‌মদ আর হাজরার ত্যাগ ছিল খুবই উঁচু মানের। ওরা সব রকম আরামের মধ্যে বড় হয়েছিল এবং আরামে জীবন কাটানোর সব সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও ওরা এই কণ্টকিত রাস্তা ধরেছিল, এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র[১] লিখেছি। বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন এক আদর্শবাদী বন্ধুর সাথে থাকলে মানুষ নরকের দুঃখও ভুলে যায়, তার মৃত্যুর মুহূর্তও সুখের মুহূর্তে পরিণত হয়ে যায়। ভাষণ তৈরি করতে কমরেড আহ্‌মদও খুব সাহায্য করেছিল। ঐ দিন শ্রীসজ্জাদ জহীর তার নববধূ রজিয়ার সাথে এসেছিল। সঙ্কোচ দূরের কথা, নববধূ প্রথমেই বাণ-বর্ষণ শুরু করে দিল, 'শুনেছি আপনি নাকি উর্দূর বিরোধী?' আমি বললাম, 'আপনি কোথায় শুনলেন?' সে জানাল, 'পাটনায় লোকজন বলছে।' আমি বললাম, 'আমি উর্দূর বিরোধী নই। আমি তো যার যা মাতৃভাষা সেই মাতৃভাষায় পড়া-লেখা করা, পুরো উন্নতি করার পক্ষপাতী। তবে হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই এটার বিরোধী যে লোকজন 'হিন্দুস্তানী' নামে এক তৃতীয় ভাষা গড়বার প্রয়াস করছে। আমি তো এটাও বলি যে উর্দূওলাদের স্বেচ্ছায় কিছু হিন্দিও শেখা উচিত।' রজিয়া খানিকটা শান্ত হল। আমি খুশি হয়েছিলাম যে সজ্জাদ জহীর এক সমঝদার ও শিক্ষিত সাথীকে বউ রূপে পেয়েছিল।

১১ তারিখে তিনটে বাড়িতে তল্লাসী নেওয়া হল। আর সেই সঙ্গে হর্ষদেব মালবীয়কে গ্রেপ্তার করা হল। এও জানা গেল যে, সজ্জাদের নামেও ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। এখন আমারও যে প্রস্তুত থাকা উচিত, এটা ছিল তারই পূর্বাভাষ। পরের দিন আমি ভাষণ প্রায় শেষ করলাম। ১৫ তারিখে আমার প্রয়াগের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ডক্টর বদরীনাথ প্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, 'আবার কবে দেখা হবে?' আমি বললাম, 'লড়াই-এর পরে।' সন্ধেয় ফিরে আহ্‌মদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম। অন্ধকার হয়ে আসছিল। এমন সময় পাঁচ-সাতজন সাদা পোশাকের লোকের সঙ্গে দারোগা সাহেব এসে হাজির হল আর আমাকে গ্রেপ্তারের খবর দিয়ে বাড়ির তল্লাসী নেওয়া শুরু করল। সাড়ে সাতটায় কর্নেলগঞ্জ থানায় নিয়ে গেল। ওখানে কাগজপত্র দেখানো হল। আমাকে ভারতরক্ষা আইন, ধারা ২৬, উপনিয়ম ১-এর ষষ্ঠ বাক্য অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। নটার পর আমাকে মলাকা জেলে পৌঁছে দেওয়া হল।

জেলে উনত্রিশ মাস

হাজারীবাগ জেল (১৯৪০)

আমার ওয়ারেন্ট ভারত সরকার বিহারে পাঠিয়েছিল। যদি আমি বিহারে থাকতাম তাহলে চারদিন আগেই গ্রেপ্তার হতাম। যাইহোক, এখন কম্যুনিস্টদের ওপরে সোজাসুজি আঘাত

[১] দেখুন 'নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা'

চলছিল আর বড় বড় কম্যুনিস্টদের ধরে জেলে বন্ধ করার কাজ ভারত সরকার নিজের হাতে নিয়েছিল। প্রাদেশিক সরকার নয়, ভারত সরকারের কয়েদী হওয়া কিছুটা গৌরবের বিষয় ছিল। কোথায় চুরির দায়ে কয়েদী হয়ে আসা আর কোথায় রাজবন্দী হওয়া—এটা নিশ্চয়ই সম্মানের জিনিস বলে মনে করা হতো। জেলে হর্ষদেব আর আমি দুজনই রাজনৈতিক বন্দী ছিলাম। এতদিন পর্যন্ত আমার বিহারের জেল সম্পর্কেই অভিজ্ঞতা ছিল। এবার নিজের জন্মস্থানের জেলেরও অভিজ্ঞতা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মলাকা জেলে আমি বারোদিনের বেশি থাকতে পারি নি। বিহারের ছোট থেকে বড় সব জেলেরই ঘরগুলোর মেঝে পাকা, কিন্তু এখানে মেঝে ছিল কাঁচা। বাড়িও মনে হচ্ছিল আকবর বাদশার কেল্লার আমলের। যেসব সেলে (নির্জন প্রকোষ্ঠ) দিনের বেলাতেও অন্ধকার থাকে, সেখানে মশার বাসা কেন হবে না? রাতে মশা খুব কামড়েছিল। পরের দিন ওজন নেওয়া হল। ওজন ১৮৮ পাউন্ড অর্থাৎ ২০০ পাউণ্ড থেকে মাত্র বারো কম। অফিসে বাবার নাম আর আঙুলের ছাপ দিতে বলা হল। আমি পরিষ্কার অসম্মতি জানালাম। জেলার সাহেব খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী বানানো হয়েছে বলে তাঁর আফশোশ ছিল। কিন্তু আমার বাপ-ঠাকুর্দ্দার অবস্থা দেখলে আমার তো তৃতীয় শ্রেণীরও নিচে থাকা উচিত। আমি নিজে তো কোনো সম্পত্তি সঞ্চয় করি নি, আর জেলে মানুষের সম্পত্তি দেখেই প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়। আমি মনে করি যে, *সম্পত্তিওলারা সবাই শোষক, দুর্বৃত্ত বা নিষ্কর্মা হয়। কিন্তু সরকার তো এটা* মানত না—ডাকাতদের রাজত্বে ডাকাতি একটা রাজকীয় পেশা বলে মানা হয়। জেলার সাহেব বললেন, 'আপনি এর জন্য সরকারের কাছে দরখাস্ত করুন।' আমি বললাম, 'আমার এই শ্রেণীতে থাকাই ভাল। হ্যাঁ, পড়াশুনোর সুবিধে নিশ্চয়ই থাকা দরকার। আমাকে যদি বলা-কওয়া করতে হয় তো শুধু এই জন্য করব।' আমাদের খাবার জন্য পাওয়া যেত যব-ছোলার কালো রুটি, তাতে ভুসি বেশি থাকত। ডালে কাঠি আর ভুসি ভরা থাকত আর শাকের নামে ঘাস সেদ্ধ দেওয়া হতো। আমি দেখলাম, যুক্তপ্রদেশ এই ব্যাপারে বিহার থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, আমি তো ওখানে ১৯২১-২২ সালেই এ-রকম খাবার খেয়েছিলাম। হ্যাঁ, কংগ্রেস মিনিস্ট্রি এখানের জেলগুলোতে বিড়ি আর তামাক দেবার হুকুম দিয়েছিল, সেগুলো এখনও পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু বিড়ির জায়গায় পাওয়া যাচ্ছিল পাকানো পাতা আর সুরতী (তামাক)-র জায়গায় গাছের ছাল। আমরা দুজন ছিলাম, তাই নিজেদের মধ্যে নানা বিষয় আলোচনা করতাম এবং যেসব বই পাওয়া যেত সেগুলো পড়তামও। আমি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বিষয়ে ২৫ মার্চ (১৯৪০)-এর ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় হয় তাহলে বহু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকাকে 'মুসলিমিস্তান' রূপে স্বতন্ত্র হবার অনুমতি কেন দেওয়া হবে না? ভাষার ব্যাপারে, শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেটাকেই শিক্ষা ও ব্যবহারের মাধ্যম করা উচিত।'

২৭ তারিখ সাড়ে চারটার সময় খবর পাওয়া গেল যে, আমাকে হাজারীবাগ জেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশ এসেছে। পর্দানসীন বধূদের শ্বশুরবাড়ির লোক নিয়ে যেতে

এসেছে শুনলে যেমন লাগে আমারও সেরকম লাগছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে তৈরি হতে বলা হল, কিন্তু ওখানে তৈরি হওয়ার কি ছিল? আমি হর্ষদেবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, রেল পুলিশের লরিতে বসলাম, বড় স্টেশনে গেলাম আর সাড়ে ছটায় পাঞ্জাব মেলে রওনা হয়ে গেলাম। পুলিশদের মধ্যে দুজন সাধারণ সেপাই ও একজন 'জমাদার' বা ছোট দারোগা ছিল। কৃষকের সত্যাগ্রহ এবং অনশন-ধর্মঘটের ফলে এটা কি করে হতে পারে যে, বিহারের কোনো পুলিশ বা সেপাই আমাকে চিনবে না? সেপাইরা নিজেরাও যেহেতু কৃষকদের ছেলে, তাই পেটের দায়ে তাদের যা-ই করতে হোক না কেন, তাদের সহানুভূতি কিন্তু সব সময় আমাদেরই দিকে থাকত। ওদের পরিবারের লোকরাও জমিদারদের দ্বারা অত্যাচারিত ছিল, আমাদের আন্দোলনের ফলে ওরাও সাহস পেয়েছিল। কৃষক-মজুরদের আন্দোলন শাসকবর্গের পক্ষে সত্যিই খুব বিপজ্জনক জিনিস। আসলে কৃষক মজুরের ছেলেদের বাহুবল দিয়েই ওরা দুনিয়াকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। কৃষক সংঘর্ষ যতই বাড়বে ততই শাসকবর্গকে এই সেপাইদের থেকে, যারা তাদের হাত-পা, শঙ্কিত হয়ে থাকতে হবে। আমার সঙ্গের তিনজন পুলিশই ভদ্র, ভালমানুষ ছিল। আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিয়ে গেল। রাতে দু-তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমনোর সুযোগ পাওয়া গেল না। সোয়া আট ঘণ্টা সফরের পর পৌনে তিনটের সময় আমাদের গাড়ি হাজারীবাগ রোড পৌছল। ওখানে পুলিশ আগে থেকেই মোটরগাড়ি নিয়ে তৈরি ছিল। আগের থেকে কত তফাৎ! আগের যাত্রায় কত কষ্টে জেলে যাওয়ার জন্য মোটর পাওয়া গিয়েছিল, আর আজ সব জিনিস ঘড়ির কাঁটার মতো চলছিল। ভোর পাঁচটায় আমরা জেলে পৌছলাম। ফটক দিয়ে ঢোকবার সময় অন্ধকার ছিল। আবার আমাকে এক নম্বর ওয়ার্ডের সেই ব্যারাকেই রাখা হল। আলি আস্‌রফও নজরবন্দী ছিল। সেও ছিল কম্যুনিস্ট। কিন্তু আমাদের দুজনকে এক জায়গায় রাখা হয়নি। মন্‌জর আর অনিল তো সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী ছিল, এজন্য ওদের আলাদাই রাখতে হতো।

৫ এপ্রিল লোলার চিঠি এল। এটা ও ৯ জানুয়ারি লিখেছিল। ডক্টর শ্চের্‌বাৎস্কীর চিঠি আরও কিছু পরে পেয়েছিলাম। তিনি লিখেছিলেন, 'আমাদেরকে আবার দেখার জন্য তুমি কি এখানে আসার কথা ভাবছো?' লোলার চিঠিতে জেনেছিলাম, 'আচার্য শ্চের্‌বাৎস্কী চান যে তুমি এখানে চলে এসো আর তোমার সাহায্যে তিব্বতী ভাষার একটা ব্যাকরণ আর তিব্বতী-রুশী শব্দকোষ লেখা হোক। আমার সব ইচ্ছা তোমার সাথেই আছে। আমি তোমায় আমাদের ইগরকে দেখাতে চাই। তোমার পক্ষে কি লেনিনগ্রাদ আসা সম্ভব? ইগর সুস্থ আছে, এবছর ঠাণ্ডায় ও অসুস্থ হয় নি। ও বড় হয়ে গেছে, সাহায্য ছাড়াই সে দৌড়নো শুরু করেছে আর কথাও বলে। এখন ওর ছ-টা দাঁত হয়েছে। ওর প্রথম কথা ছিল, 'পাপা' (বাবা)। আমার লেখার টেবিলে তোমার ফটো আছে। ইগর জানে যে এই আমার পাপা।'

৪ মার্চের চিঠিতে ও লিখেছিল, 'আজকাল ও বড় অদ্ভুত আর মজার বাচ্চা হয়েছে। নার্স ওকে মুরগি এবং মুরগির ছানার ছবি দেখিয়ে বলেছিল, এটা 'মামা' আর এগুলো বাচ্চা। সন্ধেয় (বাড়ি ফিরে) আমি ডেকে বললাম 'মামার কাছে এসো, মামা কই?' ও ছবিটা উঠিয়ে নিয়ে এল আর মুরগির ছবি দেখিয়ে বলতে শুরু করল 'এটা মামা'। যখন

তুমি ইগরকে দেখবে আর ও তার ছোট ছোট হাতে তোমার গলা জড়িয়ে ধরবে, তখন তুমি বুঝবে যে পুত্র লাভ হওয়া কি মহৎ আনন্দ, তখন তুমি আর কখনও বলবে না যে আমি ওর প্রশংসার কথা বাড়িয়ে বলছি।...

'ইগর খুবই গম্ভীর স্বভাবের, কিন্তু কখনো-কখনো ও খুশিতে পাগল হয়ে ওঠে। তখন ওকে সামলান মুশকিল হয়। কখনো কখনো সকালে আমাকে কাজে যেতে দেয় না। ও আমার লইংগে (স্কার্ট)-এর কোণা ধরে কাঁদতে থাকে। সারাক্ষণ আমার কোলে বসে থাকে যতক্ষণ না ওকে খাটে শুইয়ে দিই। গত দু-বছর আমি কোনো সিনেমা বা নাটক দেখতে যাই নি। ইগর অল্পই কথা বলে। ও খালি 'পাপা', 'মামা', 'নার্স', 'বাবা', ঠাকুমা, 'দে', 'খোল', 'এক-দুই' ব্যাস এইটুকুই বলে। ওর গানের খুব শখ। রেডিও-র আওয়াজ কানে এলেই ও চেঁচানো ছেড়ে দিয়ে শুনতে থাকে।'

আমাদের ওয়ার্ডে খুব কড়াকড়ি ছিল। আগে পাহারাদার হাসপাতাল, অফিস বা গুদামে চলে যেত, কিন্তু এখন তাকে সেপাইয়ের সঙ্গে যেতে হতো। আমার আর আস্‌রফ দুজনের ওয়ার্ডেই একজন সেপাইয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের দুজনকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখা হয়েছিল যাতে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ তৈরি হতে না পারে। কিন্তু সেপাইরা মিলে সে-কাজটি ভালভাবেই করতে পারত। সেপাইরা আমাকে ভাল করে জানত। ওরা কৃষকের ছেলে। ওরা আমার জন্য কোনো কাজ করা সৌভাগ্য মনে করত।

ওখানে না পড়ার জন্য বই ছিল, না কথা বলার কোনো মানুষ। সারা সময় বেকার যাচ্ছে দেখে আমি ভাবলাম, নিজের জীবন-যাত্রাই লিখে ফেলি। ১৬ এপ্রিল আমি তা লিখতে শুরু করি আর মাঝখানে দু-চারদিন বাদ দিয়ে ১৪ জুন পর্যন্ত টানা লিখে যাই। ১৯২৬-২৭ পর্যন্ত তো কোনো অসুবিধা হয় নি, কিন্তু তারপরে আমি ডায়েরি লিখে যেতাম, তাই এটা লিখতে মন বসতো না। কিছুদিন বাদে লেখা ছাড়তে হল।

এখন কম্যুনিস্টদের বেশি করে আসার কথা ছিল। সবাইকে আলাদা আলাদা ওয়ার্ডে রাখা সম্ভব ছিল না, এইজন্য ৬ মে আস্‌রফও আমার কাছে চলে গেল। এখন কথাবার্তা বলার সুবিধেই হল।

১২ মে খবর পাওয়া গেল যে, চেম্বারলেনের জায়গায় চার্চিল ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। ১৫ মে পড়লাম যে, এমরী ভারতের মন্ত্রী হয়েছে। আমি ভাবলাম, মিলেছে দুই দুষ্ট/ এক অন্ধ এক কুষ্ঠ।'[১] এখন ভারতের জন্য এরা কি করবে, তা বোঝার জন্য বেশি মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না।

ধীরে ধীরে বিনোদ, বিশ্বনাথ মাথুর, সুনীল ইত্যাদি কত তরুণ এসে পড়ল। আমাদের দল বড় হল আর দলবদ্ধ জীবনের আনন্দও আমরা পেতে লাগলাম। গরম ছিল খুব। রাতে ঘরের ভেতর শুতে বেশ কষ্ট হতো, যদিও আমরা মশারি পেয়ে ছিলাম, তাই মশার ভয়

[১] মূল গ্রন্থে আছে, 'খুব মিলী জোড়ী, এক অন্ধা এক কোঢ়ী' (ভাল জুটি হয়েছে—একজন অন্ধ আরেকজন কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত)।—স.ম.

ছিল না। অনেক লেখালেখির পর ৪ জুন থেকে বাইরে, আকাশের নিচে শোওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। আমাদের খাবার বানানো ও অন্যান্য কাজের জন্য সাধারণ কয়েদী ছিল। আমরা রোজ তো তাকে আমাদের খাবার খাওয়াতে পারতাম না, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে একটা ভোজ হয়ে যেত। ভোজে মালপোয়া, পোলাও, মাংস ও অন্যান্য নানা রকমের খাবার হতো আর ঐ দিন রাজনৈতিক বন্দী এবং ওয়ার্ডের সাধারণ বন্দীরা একসঙ্গে সবাই বসে খাবার খেত। ঝাড়ুদারদের সঙ্গে খাবার খেতে একটু আপত্তি উঠত, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ওদের সঙ্গে বসে পড়ত।

১৪ জুন সুনীল আমাদের শোনাল বাংলায় কিভাবে রাজনৈতিক তরুণদেরকে অত্যাচার করা হতো। শুনলেই লোম খাড়া হয়ে ওঠে। আঙুলে ছুঁচ ফোটানো হতো। ত্রিশ ভোল্টের বিদ্যুত শরীরে লাগিয়ে দেওয়া হতো। হাতের ওপরে খাটের পায়া রেখে তার ওপরে লোক উঠে বসত। লাথি, ঘুসি, থাপ্পড়ের তো কোনো হিসেব ছিল না আর গালি-গালাজ নোংরার চেয়েও নোংরা। অবাক লাগত, এটা কি কোনো সভ্য-শাসনের কথা?

এখানে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে আমরা তাকে বয়কট করেছিলাম। সে যখন আসত কেউ তার সঙ্গে কথা বলত না বা খাট ছেড়ে উঠত না। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডেপুটি কমিশনারের কাছে নালিশ করেছিল। আমরাও তার অভদ্র ব্যবহারের বিষয়ে লিখে পাঠিয়ে দিলাম। অনুসন্ধানের জন্য ডেপুটি কমিশনার এলেন। তিনি আমাকে চিনে ফেললেন। যখন তিনি আই· সি· এস-এর জন্য লণ্ডনে গিয়েছিলেন, তখন আমি ওখানেই ছিলাম। তিনি গাওয়ার স্ট্রিটে আমাদের সাক্ষাতের কথা মনে করিয়ে দিলেন। আমার আশ্চর্য লেগেছিল যে, মাত্র আট বছরের মধ্যেই তাঁর সব চুল সাদা কি করে হয়ে গেল! যাইহোক, অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমরা কি আর আশা করতে পারতাম? যারা আমাদের শত্রু ভাবে তারাই যদি বিচারক হয়ে বসে, তাহলে ন্যায়ের আশা কি করা যায়?

২৪ জুনে জানা গেল যে, ফ্রান্স হিটলারের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছে। যদিও আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কট্টোর বিরোধী ছিলাম, তবু জার্মানির অন্তিম বিজয় কখনই বাঞ্ছনীয় মনে করতাম না।

আমি ১৯২৩—২৫-এর হাজারীবাগ জেল দেখেছিলাম। ঐ সময় জেলে জিনিসপত্র লুট হয়ে যাচ্ছিল। এখনও তাই দেখছিলাম। বড় জমাদার ছিলেন ফৌজের লোক, সিধেসাধা, কিন্তু দরকার মতো কড়াও ছিলেন। একদিন দেখি সব কাঁঠাল পেড়ে নিয়ে গেলেন। আমি বললাম, 'জমাদার সাহেব! কিছু ফল তো রেখে দেওয়া যেত।' জবাব পেলাম, 'কি রাখব, সব তো পেড়ে নিয়ে চালান হয় বাংলোয়, আর কোথায়-কোথায় না ভেট পাঠানো হয়। আমি ভেবেছিলাম একদিন কয়েদীদের খুব করে তরকারি খাওয়াব!' আম, কাঁঠাল, শাক, তরকারি, মাংস, দুধ, দই সব জিনিসের বেলাতেই ঐ একই কথা! নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত সমস্ত জেলবিভাগ একই রঙে রাঙানো ছিল। আমি 'জীবন-যাত্রা'র কাজটাকে তো একটা জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম। বন্ধুরা এসে পড়েছিল, তাই কখনও ব্যাডমিণ্টনও **খেলতাম**। ক্যারামে মাথুর আর রতনের মতো আঙুলের জাদু তো ছিল না, কিন্তু মাঝারি গোছের খেলোয়াড় ছিলাম। সন্ধে হলে তাসখেলাতেও সামিল

হতাম। তবে ব্রিজে ভীষণ ঘৃণা ছিল। বস্তুত, যত রকম তাসের খেলা হতে পারে আমি সব শিখতাম।

সোভিয়েত ফিনল্যান্ডের দিকে নিজেকে শক্তশালী করে রেখেছিল। বাল্টিক তটের তিন রাজ্য—এস্টোনিয়া, লাটাভিয়া, লিথুয়ানিয়া সোভিয়েতসঙ্ঘে সামিল হয়েছিল। পোল্যান্ড ও রুমানিয়ার দখলে নিজস্ব অংশও সোভিয়েত ফেরত নিয়েছিল। এইভাবে পশ্চিমে সোভিয়েত্ তার স্থিতিকে যথেষ্ট মজবুত করে নিয়েছিল। কিন্তু জাপান নিজেকে 'তীসমার খাঁ'[১] মনে করছিল। ১১ জুলাই-এর খবরের কাগজে পড়লাম যে মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে জাপান সোভিয়েতের সঙ্গে বিবাদ শুরু করেছে। পরের দিন খবর পাওয়া গেল, দুর্বলের বউ মনে করে জাপান বহির্মোঙ্গলিয়ার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। নোমন্হান-এ মোঙ্গলরা তীর-ধনুক দিয়ে নয়, মোটর আর ট্যাঙ্কের সাহায্যে জাপানের মোকাবিলা করেছিল। জাপান বিশ্রী রকম মার দিয়েছিল এবং সন্ধির জন্য তাকে নাক মলতে হয়েছিল।

১৯ জুলাই খবর পাওয়া গেল যে ইংল্যান্ডের ওপরে প্রচণ্ড বিমান হামলার দরুন ধনী লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। একজন শ্রমিক সদস্য পার্লামেন্টে বলেছে, 'সরকারের আটকানো উচিত যাতে ধনীরা নিজের ছেলেমেয়েকে বাইরে না পাঠায়।' তার এটা বলা ভুল হয়েছিল, ইংল্যান্ড ধনীদের জন্য, শ্রমিকরাও ধনীদের জন্য, এটাই ভগবানের ব্যবস্থা। এর বিপক্ষে যাওয়া ভাল নয়।

আমি এই সময় ভাবছিলাম, হিন্দিতে এমন একটা বই লিখি যাতে সাম্যবাদকে বোঝা সহজ হবে। এটা বুঝতে হলে সায়েন্স, দর্শন, সমাজশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি অনেক বিষয়ে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকা দরকার। আমি এর জন্য বই পড়া ও নোট নেওয়া শুরু করলাম।

২৭ জুলাই বিহার গভর্নরের পরামর্শ-মন্ত্রী মিস্টার রাসেল জেল দেখতে এসেছিলেন। আমি এক মাস আগেই ব্যারাক ছেড়ে সেলে (নির্জন প্রকোষ্ঠ) চলে এসেছিলাম। এখানে বন্ধুদের দেখে তিনি আমার কাছেও এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে আমার কিছু বলার আছে কিনা। আমি বললাম, 'বন্ধুরা নিশ্চয় দাবি পেশ করেছে ?' তিনি বললেন 'হ্যাঁ, অনেক।' আমি বলে দিলাম, 'তার থেকে বেশি আমি আলাদা করে কিছু বলতে চাই না।'

জেলে অনেক সময় ছিল। তাই আমি চাইছিলাম যে তিব্বত থেকে আনা ফটো এবং চিত্রাবলীর সাহায্য কিছু বই সম্পাদনা করি। আমি এর জন্য 'বিহার রিসার্চ সোসাইটি'-কে লিখেছিলাম। কিন্তু ওরা সেগুলো পাঠাতে অস্বীকার করেছিল। আমি নিজের এই গবেষণার কাজ করতে পারি নি বলে আমার আফশোশ নেই, কারণ আমি এই ২৯ মাস সময়ে ছটা বই আর আটটা নাটক লিখেছি। সেইজন্য আমার এই সময়টা নিরর্থক হয়েছে বলে মনে করি না। কিন্তু এ-ব্যাপারে নিশ্চয়ই আফশোশ হয় যে, সরকার আমার খাঁটি গবেষণামূলক কাজের জন্যও সুযোগ দেয় নি।

অক্টোবরে লোলার ১ জুলাই-এ লেখা চিঠি পেলাম। এলাহাবাদে গ্রেপ্তারের পরে আমি

[১] যে প্রকৃত শক্তিশালী নয় অথচ শক্তির দম্ভ করে।—স·ম·

যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, তা ও পেয়েছিল। ও লিখেছিল, 'এটা খুবই চিন্তার কথা যে তুমি আবার জেলে গিয়েছ। আমার ভয় হচ্ছে এটা তোমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে।' ও কোনোরকমে খুঁজে পেতে 'অতি প্রাণপ্রিয়' বলে আমাকে সংস্কৃতে সম্বোধন করেছিল। ডাক্তার শ্চেরবাৎস্কী তাঁর ১১ জুলাই-এর চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমার অতিপ্রিয় রাহুল (My dearest Rahula), অবশেষে আমি তোমার 'সোভিয়েতভূমি' দেখলাম। আমি খুব খুশি হলাম। আমি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে তা পড়েছি। তোমার বই খুব যোগ্যতার সঙ্গে লেখা হয়েছে। খুব ভাল হবে যদি রুশ ভাষায় অনুবাদ করা যায়।'

১৯ নভেম্বর জানা গেল, বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রীরা সত্যাগ্রহ করতে চলেছে। জেলে নতুন ধরনের ব্যবস্থা শুরু হল। সর্দার অর্জুন সিংহ জেলার হয়ে এলেন। ছাপরা থেকেই সর্দার অর্জুন সিংহ আমার পরিচিত ছিলেন। কয়েকদিন পরেই কংগ্রেস নেতারা জেলে আসতে শুরু করল, কিন্তু আমাদের থেকে আলাদা করে ওদের রাখা হয়েছিল। ডিসেম্বরে আমাকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরল। যা কখনও ছেড়ে যায়, কখন এসে পড়ে। কিছু কিছু গুঞ্জন শুরু হয়েছিল যে, আমাদের সবাইকে দেওলীতে পাঠানো হবে। ২৩ ডিসেম্বরে জেল থেকে আমাদের খবর দেওয়া হলো যে ২৭ রাজবন্দীদের মধ্যে ১১ জনকে মতিহারীতে পাঠানো হবে। আমি দেওলী ক্যাম্পের গড়ে ওঠা নিয়ে খবরের কাগজে আগেই পড়েছিলাম আর এটাও পড়েছিলাম যে ওখানে কিছু লোক ইতিমধ্যেই গিয়েছে। এইজন্য বিশ্বাস হয় নি যে মতিহারীতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে। প্রথমে যদিও ১১ জন লোকের যাওয়ার খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যাওয়ার সময় ধনরাজবাবুকেও টেনে নেওয়া হল—জেল কর্তৃপক্ষ ওর জন্য খুব উদ্বিগ্ন হয়ে থাকত।

দেওলী ক্যাম্পে (১৯৪১)

২৪ ডিসেম্বর একটার পর আমরা আমাদের সাথীদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ১২ জনের মধ্যে কয়েকজনের নাম ছিল—সুনীল মুখার্জি, আলি আসরফ, কিশোরীপ্রসন্ন সিংহ, বিশ্বনাথ মাথুর। আমাদের সঙ্গে ছিল একজন দারোগা, একজন হাবিলদার আর আটজন সশস্ত্র সেপাই। ৯ মাস পরে আমরা জেলের চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে ছিলাম, তাই লরিতে চড়ে যেতে যেতে, বিস্তৃত মাঠ, শহর আর গ্রামের ঘরবাড়ি, স্ত্রী-বাচ্চা দেখে নতুন জিনিস বলে মনে হচ্ছিল। হাজারীবাগ রোডে এসে রাত আটটায় আমরা তুফান এক্সপ্রেস পেলাম। আসানসোল থেকে ইন্টার ক্লাশের একটি খালি কামরা আমাদের জন্য রিজার্ভ হয়ে এসেছিল। ওটায় চড়া তো দূরের কথা, কোনো যাত্রী আমাদের কামরার কাছেও আসতে পারছিল না। শোবার জন্য অনেক জায়গা ছিল। কানপুরে সকাল আটটায় পৌছলাম। ওখানেই জলখাবার খেলাম আর তিনটের পর দিল্লী পৌছলাম। ওখানে স্টেশনে গোয়েন্দা বিভাগের অনেক লোক এসে পৌছেছিল। কোটার গাড়ি সাতটার পরে পাওয়ার কথা ছিল। ওখানে অন্ধকার থাকতেই আমরা পৌছে গিয়েছিলাম। এক ইন্সপেক্টর

—১৯৪১—

নেত্রপাল সিংহ আমাদের জন্য লরি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। চা খেয়ে ন-টার সময় আমরা রওনা হলাম। কোটা শহরের বাইরে-বাইরেই বেরিয়ে গেলাম। কেল্লা একপাশে পড়ে রইল। এরপর বূঁদী শহর এল। পাহাড়ের ওপরে তার পুরনো মহল দেখলাম। রাস্তা ছিল পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। সামনে, অনেক দূর পর্যন্ত গ্রাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। কোথাও কোথাও ছিল পাথুরে জমি। মাটি দেখে মনে হচ্ছিল, বর্ষার জল অনায়াসেই বড় বড় সরোবরে জমা করা যায়। তারপর এই পতিত জমিকে লকলকে খেত আর সবুজ বাগানে পরিণত করা যেতে পারে। যেখানে-সেখানে আখ মাড়াইয়ের পাথরের চাকা পড়েছিল—সেইরকম যেমন আমি পন্দ্‌হা আর কনৈলায় দেখেছিলাম। দেওলীর মফস্বল শহর থেকে বেরিয়ে বারোটার সময় আমরা ক্যাম্পে পৌঁছলাম। কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ক্যাম্প ঘেরা ছিল। প্রথমে তল্লাসীখানায় নিয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে অনেক মালপত্র ছিল। নিজেদেরই লরি থেকে সব নামিয়ে রাখতে হল। তল্লাসী নেওয়া হল। সমস্ত বই আর খাতা রেখে নিল। আমার কাছে খাঁকি আর খাদির কিছু হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট ছিল, সাথীদের কারও কারও কাছে টুপিও ছিল, সব রেখে নেওয়া হল। আবার জিনিসপত্র আমাদেরই লরিতে ওঠাতে হল। লরি দু-নম্বর ফটকে এসে পৌঁছল। ক্যাম্পের বাইরে কাঁটাতারে ঘেরা ওয়ার্ডকে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে লোকজন বাইরে থেকে দেখতে না পায়। পাহারা ছিল সবটাই গাড়োয়ালী পল্টনের। ক্যাম্পের বাইরে অল্প দূরে অনেক মাচা বাঁধা ছিল, যার ওপর সেপাইরা বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। ফটক খুলল, আমরা নিজেদের মালপত্র নামিয়ে ভেতরে ঢোকালাম। আগে থেকেই যেস্ব সাথীরা ওখানে ছিল, তারা মাল নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। এই ক্যাম্পে দুটো ব্যারাক ছিল। প্রত্যেক ব্যারাকে চারটে ঘর আর কোণায় চারটে কুঠরী ছিল। ব্যারাকগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। নিচে পাথরের মেঝে, বাইরে বারান্দা, দেওয়াল পাথরের, কিন্তু ছাত ছিল টিনের। গরমের দিনে কি রকম কষ্ট হবে তা একটু একটু অনুমান করা যাচ্ছিল। কয়েকটি কামরাতে আমাদের ভাগ করে দেওয়া হল। আমার জায়গা সেই কামরাতেই হল, যাতে ঘাটে, আয়ংগার, ধন্বন্তরী আর বাবা করমসিংহ ধূত ছিল। আমরা নতুন জায়গায় এসেছিলাম, কিন্তু যেখানে আমাদের মতো সচেতন বিপ্লবী বন্ধুরা মজুত হয়েছে সেখানে মানুষ অপরিচিত থাকে না। হ্যাঁ, এটা বোঝা গিয়েছিল যে, বিহারে আমরা ছিলাম প্রথম শ্রেণীর কয়েদী, কিন্তু এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর। এখন মাত্র ছ-আনা হিসাবে রোজ খাবার পাওয়া যাবে, সপ্তাহে মাত্র একটা চিঠি পেতে পারি আর দুটো লিখতে পারি।

আমাদের ক্যাম্পে (নম্বর ২) দুটো ব্যারাক ছিল, যাতে প্রায় একশ মত নজরবন্দী থাকত। দু-ডজন ছাড়া বাকি সবাই পাঞ্জাবী আর ওদের মধ্যেও শিখ ছিল বেশি। বাবা করমসিংহ ধূতের মতন দু-ডজন তো এমন ছিল যারা বহু বছর আমেরিকা বা রাশিয়ায় কাটিয়েছে। খাওয়ার জন্য একটা রান্নাঘর ও একটা খাবার ঘর ছিল। টিন দিয়ে ঢাকা একটা স্নানের ঘরও ছিল। ক্যাম্পে বিজলী বাতি এবং কলের জলের ব্যবস্থা ছিল। পায়খানাও খুব খারাপ ছিল না। ক্যাম্পের ভেতরেই ভলিবল খেলার দুটো কোর্ট ছিল। পাঠানদের আলাদা খাবার ঘর ছিল। বাকি প্রায় ৯০ জন লোক একই খাবার ঘরে খাওয়া-দাওয়া করত। রান্না

করার জন্য বহু পাঞ্জাবী কয়েদীদের রাখা হয়েছিল। পাঞ্জাবী খাবার ভারতীয় খাবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পুষ্টিদায়ক আর আমার পক্ষে তো সুস্বাদুও বটে। সন্ধেবেলা রোজ মাংস রান্না হতো, আর ধন্বন্তরী, ঘাটের মত কিছু অভাগা ছিল যারা মাংস খেত না। দুবার চা আর দুবার খাবার পাওয়া যেত। খাবার ব্যবস্থার জন্য প্রতি সপ্তাহে আমরা একটি কমিটি নির্বাচিত করতাম। দেওলী ক্যাম্পে পাহারা দেবার কাজ তো ছিল পল্টনের সেপাইদের হাতে, বাকি সমস্ত ব্যবস্থা করত গোয়েন্দা পুলিশ—হাসপাতালের কম্পাউন্ডার পর্যন্ত গোয়েন্দা পুলিশের লোক ছিল। এর পরেও এখানে বেশি করে পাঞ্জাব পুলিশওলারা ছিল। পাঞ্জাবে ওডায়ারের আমল থেকে (১৯১৯) আজ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হয়নি। ওখানে ইংরেজ অফিসারদের ঐ রকমই স্বেচ্ছাচারিতা ছিল, আর ওদের আদরের পুলিশ জুলুম করার ব্যাপারে সবার নাক কাটতে পারত। সকাল দশটা বাজতেই ইন্সপেক্টর বন্তা সিংহ আমাদের হাজিরা নিতে আসত, আর ভেতরের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া ঘর বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাত নটায় আবার হাজিরা নিতে উপস্থিত হতো। হাজিরার সময় আমাদের নিজের নিজের খাটের পাশে দাঁড়াতে হতো। দেওলী ক্যাম্পের বাদশা ছিল এক বুড়ো ফৌজী মেজর, যে আমাদের সামনেই কর্নেল হয়ে গেল। ওর নিচে ছিল একজন হাফ-গোরা ম্যাকার্ডি, বাকি সবাই ছিল ভারতীয়।

আমাদের কামরায় দশটা খাট ছিল। আমার পাশে ছিল বাবা করমসিং-এর খাট। রাতে আমরা নিজেদের ব্যারাকে পরস্পরের ঘরে যেতে পারতাম। কিন্তু ব্যারাকের চারপাশ কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ছিল, যার ফটক খুলত সকালে। তখন আবার আমাদের ক্যাম্পের দুটো ব্যারাকের লোকেরা দেখা-সাক্ষাত থেকে আলাদা হয়ে যেত। দেওলী ক্যাম্পের বড় ডাক্তার ছিল আস্ত গাধা। তার মেডিকেল সায়েন্সের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবে গোয়েন্দার কাজ ভাল করতে পারত আর লোকজনের তল্লাসী নেবার ব্যাপারেও নিজের অসম্মান টের পেত না। ছোট ডাক্তার ছিল খুব ভাল মানুষ। আমি তো হাজারীবাগে থাকতেই ম্যালেরিয়ার খপ্পরে পড়েছিলাম, আর সেটা এখানেও আমার সঙ্গে এসেছিল। বরং বলা চলে যে তার প্রকোপ এখানে একটু বেশিই ছিল। এখানে এসে আবার আমার জ্বরও আসতে লাগল। ৩ জানুয়ারি আমাকে হাসাপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতাল ছিল খুব দূরে। আপনার যদি ১০৪° জ্বর হয়, যদি বেহুঁশ না হয়ে যান, তাহলেও নিজের লেপ, জিনিসপত্র আপনাকে মাথায় করে নিয়ে যেতে হতো। রুগী হাসপাতালে হয়ত পৌঁছে যেত, কিন্তু তার পথ্যের বন্দোবস্ত হতো তিনদিন পরে—তিনদিন পর্যন্ত তাকে নিজের ক্যাম্পের রান্নাঘর থেকে খাবার আনাতে হতো। রুগীর চেয়েও হিসেব-নিকেশের চিন্তা বেশি জরুরি মনে করা হতো। হাবিলদার খবর দিত অফিসকে। অফিস এবার ক্যাম্পে বিবরণ দিত যে খরচ পাঠানো হয়নি। এরপরে হাসপাতালের হিসেব খাতায় লেখা, ঠিকাদারকে খবর দেওয়া আর তার সঙ্গে সঙ্গে কত অফিসারের সই, তবে কোনোরকমে দুধ বা অন্য কিছু পাওয়া যেত। সন্নিপাত বা নিউমোনিয়ায় খাবার কোনো প্রয়োজন নেই, তার চেয়ে ছোট অসুখ হলে ক্যাম্পের ডাল-রুটি খেতে হতো, তাতে রুগীর পরের দিন সন্নিপাতই হয়ে যাক না কেন। ডাক্তারের কোনো চিন্তাই ছিল না। হাসপাতালকে লোকে

বলত 'কালাপানী'। রোগ রুগীর কাজ থেকে পালানোর আগে হাসপাতাল থেকে পালাতে চাইত। ছোট ডাক্তার কখনো কখনো আসত, কিন্তু যদ্দূর জানি তাকেও নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, আমাদের মতো জানোয়ারদের জন্য যেন যতটা সম্ভব কম খরচ করা হয়। আমি অনেক কষ্টে ওখানে দুটো রাত ছিলাম এবং তৃতীয় রাতে ব্যারাকে ফিরে এসেছিলাম। দেওলী ক্যাম্পে চার-পাঁচটা পার্টির রাজবন্দীরা ছিল, কিন্তু সবচেয়ে ছিল বেশি কম্যুনিস্ট। ওখানে ছিল মাদ্রাজের ঘাটে আর আয়েংগার, বোম্বাই থেকে ডাঙ্গে, রণদিভে, মিরাজকর, বাটলিওয়ালা, পাঞ্জাবের সোহন সিংহ জোশ, বাবা সোহন সিংহ ভকনা, বাবা বসাখা সিংহ, বেদী, সাগর, ধন্বন্তরী, যুক্তপ্রদেশের ডাক্তার আহ্‌মেদ, ভরদ্বাজ, অজয় ঘোষ, ডাক্তার আসরফ, হর্ষদেব, ইউসুফ, মহমুদুজ্জফর আর বিহার থেকে আমরা এক ডজন। এছাড়া কিছু সীমান্তপ্রদেশের পাঠানও ছিল। কিন্তু বেচারিদের রাজনীতির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ ছিল না। পাঞ্জাব পুলিশ এক পেশাদার ডাকাতকে পর্যন্ত ঘুষ নিয়ে রাজবন্দী করে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

আগেই বলেছি যে, আমাদের ক্যাম্পে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা ছিল পাঞ্জাবী ভাইদের। আমাদের দিন কাটত খুব ভালভাবে। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুরা আমাকে ভারতীয় দর্শন বিষয়ে লেকচার দিতে বলল। এক মাসেরও ওপর রোজ দেড় ঘণ্টা করে আমি ভারতীয় দর্শন নিয়ে লেকচার দিয়ে গেছি। যেখানে ছাত্রদের জ্ঞানের স্তর একরকমের নয় আর সকলের আকর্ষণ ঐ বিষয়ের দিকে নেই, সেখানে দর্শনের মত নিরস বিষয়ে লেকচার দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু কোনরকমে আমি নিজের কাজটা শেষ করেছিলাম। ছাত্রদের সংখ্যা দেখে মনে হয়েছিল, আমি ব্যর্থ হইনি। এই লেকচারগুলো পরে আমাকে 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন' লিখতে খুব সাহায্য করেছিল।

সংঘর্ষের সূত্রপাত—বিহার তার সব রাজবন্দীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করে পাঠিয়েছিল, আর যুক্তপ্রদেশের সরকার পাঠিয়েছিল প্রথম শ্রেণীর করে। পাঞ্জাব মাত্র কয়েকজন এসেম্বলি মেম্বার আর অন্যান্যদের প্রথম শ্রেণীতে পাঠিয়েছিল, তা না হলে বাকি সবাই ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দী যে ক্যাম্পে থাকত তাকে ১ নম্বর ক্যাম্প বলা হতো। আমাদের দেওলী ছেড়ে আসার কিছু আগে একটা তিন নম্বর ক্যাম্পও খুলে গিয়েছিল। প্রথম ক্যাম্পে কিছু লেখাপড়া জানা লোক ছিল, সুপারিন্টেন্ডেন্ট সেখানে গেলে তারা উঠে দাঁড়ায় নি, এতে সাহেব রেগে আগুন হয়েছিল! এমনিতে আগে থেকেই রাজবন্দীদের হাসপাতাল, খাবার জিনিস ইত্যাদি ব্যাপারে অসুবিধে ছিল, এবং ঝগড়াঝাঁটির পুরো সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখন তো মেজরসাহেবও ব্যক্তিগতভাবে রুষ্ট হয়েছিল। মেজর ১৭ তারিখে হুকুম টাঙিয়ে দিল যে, মিটিং করা চলবে না, ড্রিল করা বন্ধ করতে হবে। ২৫ জানুয়ারি আজমীঢ়ের চীফ্ কমিশনার এল—আমাদের সব থেকে বড় অফিসার সে-ই ছিল। লাইফ বয় সাবানের ব্যাপারে আমি বললাম যে, মাত্রায় কম হলেও স্নানের জন্য কোনো একটা ভাল সাবান অন্তত আমাদের চাই। সে বলল, 'আমিও ঐ সাবান লাগাই।' বিহার থেকে হুকুম এসেছিল আমাদের কাপড় ফিরিয়ে দিতে অথচ এখানে

এখনও আমাদের কাপড় পাওয়া যায়নি। কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে আমরা তাহলে উলঙ্গ থাকি? হাসপাতালে জুলুম আর বেপরোয়া ভাবের তো কোনো সীমা নেই। আমার প্রায় জ্বর আসত আর মাসে দু-তিনবার হাসপাতাল যেতে হতো। ২৭ মার্চে যখন গেলাম ডাক্তার বলল, 'ইনজেকশন্ দেব।' বলে দুধের ইনজেকশন দিতে যাচ্ছিল। ৫ এপ্রিলে জ্বর খুব বেশি হল। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হল। কিন্তু তার কিসের মাথাব্যথা? সূর্যাস্তের সময় জ্বর ১০৩° ডিগ্রির বেশি হয়ে গেল। সেপাইরা কতবার যে খবর দিল, কিন্তু ডাক্তার এল না। এবার বেহুঁশ হবার মত হল। ডাক্তারকে খবর দেওয়াও ছিল মুশকিল, কারণ সেপাইদের আমার সাথে কথা বলতে কঠিন নিষেধ ছিল। দু-চারজন সেপাই-এর কয়েদ হয়ে যাওয়ার পর ওরা আরো ভয় পেয়েছিল। সাড়ে নটায় যখন বন্তা সিংহ হাজিরা নিতে এল, তখন ওকে বন্ধুরা খুব হয়রান করেছিল। বন্তা সিংহ গিয়ে ডাক্তারকে পাঠায়। তখনও বড় ডাক্তার আসে নি, ছোট ডাক্তার নিজেই অসুস্থ ছিল, কিন্তু সে উঠে এল। পরের দিন (৬ এপ্রিল) আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। আগে থেকেই হাসপাতালে লোকের ভিড় ছিল। সেদিনটা আমি ওখানে ছিলাম। ৭ এপ্রিল সকালে বড় ডাক্তার এল এবং আমাকে হাসপাতাল থেকে যাবার হুকুম শোনাল। আমি দুপুরেই যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার সঙ্গে যাওয়ার কোনো সেপাই পাওয়া গেল না। দেড়টা থেকে জ্বর বাড়তে লাগল, শরীরে ঠাণ্ডা আর কাঁপুনি হতে লাগল। জ্বর চারটের সময় ১০৪ ডিগ্রিতে পৌছল। কম্পাউন্ডারকে বলার পরও সে আসতে রাজি হল না লাল মত কি একটা জল পাঠিয়ে দিল। মাথা ফেটে যাচ্ছিল। সে একটা পুরিয়া পাঠিয়ে দিল। এই ছিল একটা সভ্য সরকারের হাসপাতালের ব্যবস্থা। মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে এটা কম কিসে? লোক-দেখানি হাসপাতাল আর ডাক্তার অবশ্যই ছিল, আসলে গোয়েন্দার লোককে কম্পাউন্ডার বানিয়ে রাখা হয়েছিল। রুগীদের খবর দেওয়ার সময় পুরো খেয়াল রাখা হতো যাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের ৬ আনা ও প্রথম শ্রেণীর কয়েদীদের ১২ আনার বেশি খাবার না দেওয়া হয়। চারটের সময় কম্পাউন্ডার এল। খুব জ্বর ছিল। চোখ বুজে আসছিল, মাথা ফেটে যাচ্ছিল। এবার হাসপাতাল-কর্মীদের হুঁশ হল। ডাক্তার এসে বলল, 'এটা আমার জানা ছিল না।' এবার জ্বর নামানোর উপায় শুরু হল। প্রথমে ঠাণ্ডা জলের পট্টি মাথায় রাখা হল, পরে মাথাও ভেজান হল। বালতিতে পাইপ লাগিয়ে জল ঢালা আরম্ভ হল। অনেক পরে বরফের থলি এল। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছিল আর জ্বরও বোধহয় ছাড়তে শুরু করেছিল। সেদিন এত বেশি জ্বর এসেছিল অথচ মাত্র একদিন হাসপাতালে রেখে ডাক্তার ছুটি দিয়ে দিল। এই রকমই অবস্থা ছিল। আমাদের প্রাণ নিয়ে সরকারের যখন কোনো চিন্তা ছিল না, তখন এই গুপ্তচরদেরই বা কিসের চিন্তা? হাসপাতালের ব্যবস্থাদি কেমন ছিল সেটা এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে।

অফিসাররা বুঝে গিয়েছিল যে, আমরা বেশি দিন এই অত্যাচার সহ্য করতে পারব না। আমরা আমাদের দাবিগুলোও লিখে পাঠিয়েছিলাম। ১৪ এপ্রিল জানা গেল যে মেজর আমাদের দাবির ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে দিল্লী চলে গিয়েছে। এমন গুজবও হাওয়ায় উড়ছিল যে, আমাদের নিজের নিজের প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে আর এই ক্যাম্পে

ইটালিয়ান যুদ্ধবন্দীরা আসবে। দেওলীর মত এমন গরম আর ম্যালেরিয়ায় ভরা জায়গায় ইংরেজ তার শত্রুবন্দীদের কি করে আনতে পারত? যদি আনত তাহলে কি ইংরেজবন্দীদের সাথেও ইটালিতে এইরকমই ব্যবহার করা হতো না? কিন্তু প্রদেশে ফেরত পাঠানো ইত্যাদি কথা ভুল প্রমাণিত হল যখন ১৭ এপ্রিলে ডাঙ্গে, রণদিভে আর বাটলীওয়ালাকে ক্যাম্প থেকে বের করে কোনো অজ্ঞাত জায়গায় পাঠানো হল। ২৬ এপ্রিল রাজেন্দ্র সিংহ আর বাবা ভগবান সিংহের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। রাজেন্দ্র সিংহের ১০৫ ডিগ্রি জ্বর ছিল, পায়খানায় রক্ত আসছিল। কুড়িবার বমি হয়েছিল। সে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। অবস্থা ছিল গুরুতর। বারোটার সময় ডাক্তারকে খবর দেওয়া হল। ডেকে আনার কত চেষ্টাই করা হল, কিন্তু সে তিনটের আগে এল না। রাজবন্দীদের প্রাণের কোনো চিন্তা তার ছিল না। বস্তুত, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ইতর মনের এই ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা অফিসার ছিল ক্যাম্পের অধ্যক্ষ। আর বড় ডাক্তার ছিল একেবারেই পাষাণ। আমরা আর কতদিন সহ্য করতাম? জেল-কর্তৃপক্ষেরও সব জানা হয়ে গিয়েছিল। ওরা ধমক দিতে শুরু করল, 'অনশন ধর্মঘট করলে মোকদ্দমা চালানো হবে।' কি ধরনের শিশুসুলভ কথা! বিনা মোকদ্দমাতেই আমরা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কয়েদ ছিলাম। তাতে যদি দু-এক বছর নির্দিষ্ট হয়ে যায় অসুবিধে কোথায়? আমাদের কারাবাসের তো কোনো সীমাই ছিল না যে, সাজা দিয়ে ওটা আরো দু-পা বাড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, সাজা হলে একটা লাভ সঙ্গে সঙ্গে হতো যে আমাদের দেওলী থেকে সরিয়ে কোনো আলাদা জায়গায় রাখতে হতো। এই সময় দেওলীর টেম্পারেচার থাকত ১১৯ ডিগ্রি।

২৭ এপ্রিল আমাদের দাবিগুলোর ব্যাপারে যাচাই করতে চীফ কমিশনার (আজমীঢ়) এল। দুই ক্যাম্পের প্রতিনিধিদের ডাকা হয়েছিল। সে বলেছিল, 'আপনাদের দাবিগুলোর সম্বন্ধে সরকার বিবেচনা করছে, অনশন-ধর্মঘট করবেন না।' জুতোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে বলেছিল, 'এটা তো মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ্‌ও অপ্রয়োজনীয় মনে করেন।'

যদিও আমাদের ব্যারাকের টিনের ছাতের ওপর খাপরাও লাগানো হয়েছিল, কিন্তু দেওলীতে ১১৯-১২০ ডিগ্রি গরম ছিল। সকালে দু-তিন ঘণ্টা বাদ দিয়ে সারাটা দিন ও কিছুটা রাত অব্দি জ্বলন্ত ভাটা থেকে বেরোন হাওয়ার মত লু বইত। ২৭ এপ্রিল এই গরম নিবারণের জন্য একটা করে এক পয়সার হাত পাখা দেওয়া হল, কয়েকটা তো সেইদিনই নষ্ট হয়ে গেল। ক্যাম্পের ধারে ধারে মাচাগুলোর সেন্ট্রি নটার পর থেকে সারা রাত জোরে চেঁচাত—'নম্বর থিরী আলিজহেল', যার মানে হল, 'নাম্বার থ্রি অল ইজ ওয়েল।' 'সব আচ্ছা হ্যায়'-এর জায়গায় 'সব নরক হ্যায়' বললে দেওলী ক্যাম্পের বাস্তব অবস্থা বোঝান যেত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'কামরার ভেতরে তো রাতদিন নরকের আগুন ধকধক করে জ্বলছে।' ঘরের ভেতরে সকালেও আঁচ বেরিয়ে আসত। পরের দিন স্বপ্ন দেখলাম—চুনের ভাটা গরম করে খালি করা হয়েছে আর আমরা তার মধ্যে বসে আছি। তারপর দেখি আমি শ্যাওলা ভরা নদীতে সাঁতার কাটছি।

৩০ এপ্রিলে ক্যাম্পের বোর্ডে নোটিশ টাঙান হল যে, আমাদের প্রতি বছর দুটোর জায়গায় চারটে কুর্তা, চারটে পাজামা বা ধুতি, দুটো গামছা, দুটো বেনিয়ান আর এক

জোড়া দেশী জুতো দেওয়া হবে। গায়ে দেবার জন্য দুটো করে চাদরও পাওয়া যাবে, আর এইভাবে আমাদের দাবিও মোটামুটি পূরণ হয়ে গেল। কিন্তু খাবার এবং প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণী হটিয়ে স্রেফ একটাই শ্রেণী রাখার দাবির ব্যাপারে কিছুই হয়নি। আমরা সবাই মিলে স্থির করলাম যে আগামী সপ্তাহে অনশন ধর্মঘট করা হবে।

জেলের রাজবন্দীরা কংগ্রেস সরকার বা গোরা সরকার দুইয়ের কাছেই রাজবন্দীদের মধ্যে শ্রেণীভেদ অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী উঠিয়ে দেওয়ার দাবি বরাবর করে এসেছে। অন্য অনেক দাবি মঞ্জুর হলেও শ্রেণীভেদ উঠিয়ে দেওয়ার কথা সরকার কখনোই মেনে নেয়নি। আমি কৃষক রাজবন্দীদের মধ্যে শ্রেণীভেদ হটানোর দাবি পেশ করেছিলাম, কিন্তু কংগ্রেস সরকার তাতে একতিল নড়েনি। ওপর থেকে বলা হত যে, এটা খরচের প্রশ্ন। অথবা, সাধারণ গরিব ঘর থেকে আসা বন্দীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এত আরামের মানে হল ওদের জেলে আসার নিমন্ত্রণ দেওয়া। কিন্তু কোন মানব সন্তান কবে এত সস্তায় নিজের স্বাধীনতা বেচতে পেরেছে? আসল কথা হল, সরকার স্বয়ং শ্রেণীভেদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে নিজের রাজ্যের কোনো প্রদেশেই খাওয়া-পরার সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে দিতে চায়নি। ৬ মে নোটিশ লাগানো হল যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জন্য ৬ আনার জায়গায় ৯ আনা হিসেবে খাবার দেওয়া হবে। এখনও আমাদের অনেক অভিযোগ ছিল, তবু আমরা অনশন-ধর্মঘট কিছুদিন পর্যন্ত স্থগিত রাখলাম। ১৩ তারিখে জানা গেল যে মেজর আমাদের দাবির ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে চীফ-কমিশনারের কাছে আবু গিয়েছে। ১৬ মে জানতে পারলাম যে রোববার বাদে অন্যান্য দিন দুটো ক্যাম্পের রাজবন্দীরা সকালে ১ ঘণ্টা (ছটা থেকে সাতটা) আর সন্ধেয় দেড় ঘণ্টা (সাড়ে পাঁচটা থেকে সাতটা) পর্যন্ত মেলামেশা করতে পারে।

২৮ মে হাসপাতালে যুক্তপ্রদেশের রাজবন্দী বেণীমাধব রায়ের সঙ্গে অন্য একজন রাজবন্দী গিয়েছিল। হাসপাতালে নার্সের কাজে যুক্ত লোকেরা বেণীমাধবের বন্ধুকে অপমান করেছিল। সেও এর জবাব দিয়েছিল, এর জন্য তার নির্জন বাসের সাজা হয়। আমাদের বন্ধুরা এর বিরোধিতা করেছিল। আরও জানা গেল যে, অফিসার ওকে পাগল সাজিয়ে আলাদা রাখতে চায়। হাসপাতালের অসুস্থ বন্ধুরা যখন বিরোধিতা করল, তখন পঞ্চাশ-ষাট জন সৈন্য নিয়ে ম্যাকার্ডি ওখানে পৌঁছল। সে ঐ তরুণকে জবরদস্তি নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তখন হাসপাতালের অসুস্থ বন্ধুরা রায়কে ঘিরে বসে পড়ে। জবরদস্তি করলে নিশ্চয়ই দু-একটি প্রাণ যেত। যাইহোক, ম্যাকার্ডি ওখান থেকে সরে গিয়েছিল। সিভিল সার্জেনকে **আজমীঢ়ে** তার করা হল, সে এল। সে রায়কে **আজমীঢ়ে** নিয়ে গেল। রাজেন্দ্রর নাড়ি দেখল। সুনীল আর অন্য একজন বন্ধু অত্যন্ত অসুস্থ ছিল কিন্তু তাদের দিকে তাকালো না পর্যন্ত। আমাদের ক্যাম্প-কমিটি তার সঙ্গে কথা বলতে চাইল, কিন্তু সে একটা কথা পর্যন্ত বলল না। শেষে ৩০ মে সাড়ে নয়টায় আমরা ৪০ ঘণ্টার মেয়াদে কর্তাদের আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম—যদি বড় ডাক্তারকে না হটানো হয়, আর গুরুতর রকমের অসুস্থদের **আজমীঢ়** হাসপাতালে না পাঠানো হয়, তাহলে আমরা অনশন ধর্মঘট করব। ৩১ মে খবর পাওয়া গেল যে বড় ডাক্তারের বদলির হুকুম তারযোগে এসেছে।

—১৯৪১—

এটাও জানা গেল যে মেজর সিভিল সার্জেনকে নিয়ে রুগীদের দেখতে আসছে। ১ জুন রাত আটটায় আমাদের ক্যাম্পের নেতা ঘাটে আর ধন্বন্তরীকে বক্তা সিংহ ডেকে নিয়ে গেল। সিভিল সার্জেন এসে পড়েছিল। সিভিল সার্জেন বলল, 'সুনীল, রাজেন্দ্র সিংহ ইত্যাদি গুরুতরভাবে অসুস্থদের কাল এখান থেকে **আজমীঢ়** নিয়ে যাওয়া হবে, এর জন্য হাসপাতালের মোটরও এসে গেছে, বড় ডাক্তার যাচ্ছে, ভারত সরকারকে তার করা হয়েছে যাতে অন্য ডাক্তারকে পাঠানো হয়। যতদিন না তিনি আসেন, ততদিন আমি (সিভিল সার্জেন) প্রতি সপ্তাহে রোগীদের দেখতে এখানে আসব।' এটাও জানা গেল যে, আমাদের বন্ধু বেণীমাধব রায়কে পাগল না বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে **আজমীঢ়** থেকে ফিরে এসেছে। সে একথাও বলল, 'আমরা এই শর্তে বেণীমাধব রায়কে দেখাতে পারি যে আপনারা অনশন-ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করবেন।' রাতে আমরা মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম এবং স্থির করলাম যে আমাদের দুটো দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে অতএব অনশন করার দরকার নেই। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির বাইরের রাজবন্দীরা আরও কিছু দাবি জুড়ে দেয় আর অনশন ধর্মঘট জারি রাখে, কিন্তু কিছুদিন পরে নিজে থেকেই তা ছেড়ে দিতে হয়। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা এক শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যের মত সংগঠিত ছিল। কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হলে সবাই মিলে সেই বিষয়ে পুরো আলোচনা করা হতো, গরম গরম তর্ক হতো, কিন্তু একবার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে কেউ সেটা একবিন্দু নড়চড় করত না। ওদের এগিয়ে যাওয়াও একসাথে হতো, পিছিয়ে যাওয়াও একসাথে। দেওলী ক্যাম্পে কম্যুনিস্টরা ছিল দুই-তৃতীয়াংশ, কিন্তু শুধু এই কারণে নয়, বরং ওদের শৃঙ্খলাবদ্ধতার কারণেও কর্তারা কম্যুনিস্টদের কথা সহজে অবহেলা করতে পারত না। ওদের মধ্যে নেতৃত্বের জন্য ভুখা কেউ ছিল না। যাকে ক্যাম্পের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলার কাজ দেওয়া হতো, সেই শুধু তাদের সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু অন্য পার্টির বেলায় এরকমটা ছিল না, সেখানে সব লোকই নেতা হতে চাইত।

সামাজিক জীবন—আগেই বলেছি যে রান্না ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য প্রতি সপ্তাহে আমাদের 'রসুই-কমিটি' নির্বাচন করা হতো। খাবার-দাবারের জিনিসপত্র ঠিকাদারের কাছ থেকে কেনা, টাকা-পয়সার হিসেব রাখা, খাবার তৈরি করে খাওয়ানো ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব ছিল কমিটির। ঐ সময় দেওলীতে দুধ টাকায় ৮ সের আর মাংস ৪ সের বিক্রি হতো। আটা ইত্যাদিও হাজারীবাগ থেকে সস্তা ছিল, কিন্তু তরি-তরকারি দুর্মূল্য আর দুর্লভ ছিল, ঐসব **আজমীঢ়** থেকে আনাতে হতো। আমরা নিজেদের ক্যাম্পে সরষে শাক লাগিয়ে ছিলাম, আর তার থেকে প্রচুর শাক এসে যেত। অন্য যেসব জিনিস নিজেদের পয়সায় আনাতে হতো তার জন্য সপ্তাহে একদিন অর্ডার দিতে হতো আর ঠিকাদারের লোক সোমবার সোমবার দিয়ে যেত। হাজারীবাগে আমাদের কাপড় কাচার খুব অসুবিধে ছিল, কিন্তু এখানে বাইরের **ধোপা** কাপড় নিয়ে যেত এবং এতে কোনো ঝামেলা ছিল না। হাজারীবাগে আমাদের রোজ বারোটা সিগারেট পাওনা ছিল। আমি ওখানে একটু একটু সিগারেট খাওয়া শিখেছিলাম। এখানে এসে দেখলাম যে আয়েংগার

একটা ফার্সি আর শেরগুল একটা পাঠানী হুঁকো রেখেছে। আমি হুঁকো-ক্লাবেরও মেম্বার হয়েছিলাম, কিন্তু আমার মাথা-গরম বেশি দিন পর্যন্ত থাকে নি। আমি নিজের বন্ধুদের কাছ থেকে বেনারস, কলকাতা ও আরো কত জায়গা থেকে ভাল তামাক আনিয়ে ছিলাম, কিন্তু তিন-চার মাস পরে হুঁকোতেও বিরক্তি ধরে গেল, আর আমি ওটা ছেড়ে দিলাম। শুরুতে পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে ঐ বড় জমায়েতের মধ্যে লেখার জন্য একাগ্রতা পাওয়া যেত না, সেজন্য গল্পসল্প, হাসিঠাট্টা, নাটক-প্রহসনেই অনেকটা সময় চলে যেত। আমাদের বন্ধুরা বরাবর রোজ তিন-চার ঘণ্টা ক্লাশ নিত, সেখানে রাষ্ট্রীয় ও অন্তঃরাষ্ট্রীয় সাম্যবাদ তথা পার্টি সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া হতো। গ্রীষ্মের পর বন্দীরা পড়াতে বেশি সময় দিতে লাগল।

কমিটিগুলোর বিষয়ে কতরকম কার্টুনও বেরিয়েছিল। কার্টুনের ভাবনা জোগাতাম আমি আর আঁকত অন্য কেউ। রান্নাঘরের দেওয়ালে যখন কার্টুন সাঁটা হতো, তখন সবাই সেটা খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখত। একটা কমিটিতে বাবা শেরসিং এবং ঠাকুর বরিয়াম সিং-এর মত তিনমণ করে ওজনের মোটা মোটা সাথী এসে গেল আর তার মধ্যে রোগা-পাতলা আসরফও ছিল। কার্টুনে দুজন মোটা ভুঁড়িওলাকে বসানো হল আর ওদের সামনে থালা ভর্তি করে খাবার রাখা হল। আসরফকে তিন বছরের বাচ্চা বানিয়ে উলঙ্গ করে ওদের সামনে বসিয়ে দেওয়া হল। বক্তব্য এটাই দেখান হয়েছিল যে, বেচারা শিশুটি রুটির টুকরোটাও পাচ্ছে না, ও কাঁদছে আর এদিকে দুই ভোজনবীর নিজেদের কাজ করে চলেছে। বাবা শেরসিং ছিলেন শৌখীন। তিনি ১৯১৪-১৫ সালের লাহোর রাজবন্দীদের মধ্যে আজন্ম কালাপানীর সাজা পেয়েছিলেন এবং জীবনের বড় অংশ কালাপানী আর অন্যান্য জায়গায় কাটিয়েছিলেন। তিনি কার্টুন দেখে খুব হেসেছিলেন। ঠাকুর বরিয়াম সিং-এর ওটা মিঠে-কড়া লেগেছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি আমার কাছে অভিযোগ করতে আরম্ভ করলেন। আমি বলেছিলাম, 'ঠাকুর সাহেব, আপনি এখন নওজোয়ান। ওজন কম করুন আর ঘিয়ের টিন ছাড়ুন।' ঠাকুর সাহেবের কাছে প্রতি মাসে বা দুমাসে বাড়ি থেকে এক পিপে ঘি চলে আসত। তিনি বললেন, 'আচ্ছা আমি ঘি ছেড়ে দিচ্ছি।' আমি সারা ক্যাম্পে খবর দিয়ে দিলাম যে ঠাকুর বরিয়াম সিং ঘি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। ঠাকুর সাহেব বাকি ঘি বোধহয় মিষ্টি তৈরি করে অন্যদের খাইয়ে দিলেন। কিন্তু ঠাকুর সাহেবের প্রতিজ্ঞা বেশিদিন পর্যন্ত টেকেনি। তিনি বলতে লাগলেন, 'ছেলেবেলা থেকে ঘি খেয়ে আসছি, ওটা ছাড়া খাবার পানসে পানসে লাগে।'

যখন আমাদের খাওয়ার জন্য ৬ আনার জায়গায় ৯ আনা পাওনা হল, তখন পরামর্শ শুরু হল যে রান্না করা খাবারের জন্য কত পয়সা দেওয়া যায় আর কত দুধ-টুধের জন্য। পাঞ্জাবীদের কাছে দুধ ইত্যাদির পাল্লাই সব সময় ভারি হয়। ঠিক হল যে, পাঁচ আনা দুধের জন্য আর তিন আনা রান্নাঘরের জন্য দেওয়া হবে। আমি খুব চাপ দিয়েছিলাম যে রান্নাঘরের খরচ আরো দু-এক আনা বাড়িয়ে দেওয়া হোক কিন্তু একথা শোনার লোক সেখানে কোথায়? একথাও সত্যি যে আমাদের পাঞ্জাবী বন্ধুরা গ্লাশে বা লোটায় দুধ খাওয়ার লোক ছিল না, ওরা বালতি করে দুধ খেত। পাঁচ আনায় মাত্র আড়াই সের দুধ পাওয়া যেত, এতে ওদের কি হতো? আমি বলতাম, 'পাঞ্জাবীদের সামনে বালতিতে চুন

খুলে রেখে দিলেও ওরা একবার মুখ না লাগিয়ে পারবে না।' আমার পক্ষে তো পাঁচ আনাও খরচ করা কঠিন। শুধু দুধ এক কাপও আমি খেতে পারি না। ঘি থেকেও আমি যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চাই। হ্যাঁ, মাংসে আমার আকর্ষণ অবশ্যই ছিল আর ওটা তো রান্নাঘরে রোজই পাওয়া যেত।

বন্দীরা সবাই মিলে নিজের নিজের ক্লাব খুলেছিল। হরনাম সিং 'চমক', আমি আর মাক্‌খন সিং তরসিক্কা 'ফল-ক্লাব' বানিয়েছিলাম। আমরা খাওয়ার জন্য মরশুম অনুযায়ী ফল আনাতাম। তরসিক্কা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ত আর তাকে হাসপাতালে যেতে হতো। আমি ওর নাম রেখেছিলাম 'বীমার'—পাঞ্জাবী উচ্চারণ 'বমার'। ধীরে ধীরে সাবা ক্যাম্পের লোক তাকে 'বমার' বলা শুরু করল। প্রথমে তো ওর খারাপ লাগে নি, কিন্তু পরে যখন সব জায়গায় লোকে ওকে 'বমার','বমার' বলে ডাকা শুরু করল, তখন ওর খারাপ লাগতে থাকল। ও আমাকে বলল, 'আমাকে আর বমার বলে ডেকো না।' আমি বললাম, 'এবমস্তু।' আমি অন্যান্য সাথীদেরও বললাম, 'তোমরা আর তরসিক্কাকে বমার বোল না' কিন্তু সেখানে একথা কে মানবে? তারা বলতে লাগল, 'আপনি বমার না বলবেন না বলুন, কিন্তু আমরা তো বমারই বলব।' সবচেয়ে বড় ক্লাব ছিল, পণ্ডিত রামকিষণ, সুনীল, মাথুর, আসরফ ইত্যাদির। পরে আমি এই ক্লাবের নাম রেখে দিলাম 'ফাঁকিবাজ ক্লাব', যে নামের জন্য ওদের খুব খ্যাতি হয়েছিল। পণ্ডিত রামকিষণ আর শেহরগুল কোণার একটা কুঠরীতে থাকতেন। ওখানে আমরা দুধ জমা করে রাখতাম। দরজা খুলে বন্ধ করার অভ্যেস তো আমাদের ভারতীয়দের নেই। তিনদিন ধরে বেড়াল এসে দুধ খেয়ে যাচ্ছিল। এখন তাঁরা দুধ রাখা বন্ধ করে দিলেন। একদিন রাতে দেখি যে বেড়াল কুঠরীর দবজার কাছে চক্কর দিচ্ছে। আমি সাথীদের বললাম, 'পণ্ডিত রামকিষণ পাহারা দেবার জন্য একটা বেড়াল পুষেছেন।' অমনি লোকজনও বলতে শুরু করে দিল, 'পণ্ডিত পাহারা দেবার জন্য বেড়াল পুষেছেন।' পণ্ডিত রামকিষণের ক্লাবে চা খুব চলত। লোকজন চা খেয়ে নিজের পাত্র ওখানেই রেখে আসত। আবার যখন চারটেতে চা খাবার সময় হতো, তখন পাত্রগুলো ধোওয়ার ধুম পড়ে যেত। তার মধ্যে বেশিরভাগ লোক এমন ছিল যারা হাত লাগিয়ে কাজ করা পছন্দ করত না। সে ক্ষেত্রে 'ফাঁকিবাজ ক্লাব' মুখ থেকে বেরোন মাত্রই সারা ক্যাম্পে তা বিখ্যাত হবে না কেন? বাবা করম সিং ধূত, কমরেড কিশোরীপ্রসন্ন সিং আর দয়ানন্দদের দলের একটা ক্লাব ছিল যার নাম আমি 'ছোলাবেগুন ক্লাব' রেখেছিলাম। এই ক্লাবে সন্ধেবেলায় ভেজানো ছোলা রোজ সকালে খাওয়া হতো, বেগুন জোড় মেলাবার জন্য জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে নাম হল 'ছোলা-বেগুন-ক্লাব'। এরপর আবার দয়ানন্দ ঘি-এর পিপে (টিন) দেখিয়ে বেড়াত, এটা জানাতে যে, ওদের ওখানে ঘি-ও খাওয়া হয়। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ওদের ওখানে ঘি-ও খাওয়া হয়। এক চামচে তিন জন খায়, তারপরও ঘি বেড়ে যাচ্ছে।' লোকজন জিজ্ঞেস করে, 'ঘি বেড়ে যাচ্ছে কি করে?' আমি বললাম, 'ওদের পিপেতে ঘি-এর ফোয়ারা ফুটে বেরিয়েছে।' সাথীরা চেঁচাতে লাগল, 'ছোলাবেগুন-ক্লাবে পিপে থেকে ঘিয়ের ফোয়ারা বেরিয়েছে!'

বাবা করমসিং ধূত যৌবনেই মজদুরী করতে আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন, ওখানে

—১৯৪১—

অনেক বছর ছিলেন। এরপর সোভিয়েত রাশিয়ায় যান এবং ওখানেও বহু বছর কাটান। ভারতে আসার পর তাঁকে কয়েক বছর জেলের মধ্যে রাখা হয়। এখনো আবার তিনি জেলের ভেতরে। তাঁর খাট ছিল আমার পাশে। আমরা দুজন প্রতিবেশী ছিলাম। তাঁর বয়স ছিল সত্তর বছরের কাছাকাছি। চুল, দাড়ি সব শণের মত সাদা, কিন্তু এখনও তিনি রাত চারটেয় উঠে জোর ডন-বৈঠক করতেন। অন্যদেরও ডন-বৈঠক করবার জন্য খুব বোঝাতেন। তাঁর শরীরে ব্যায়ামের সুফল পরিষ্কার দেখা যেত, কিন্তু আমরা অত পরিশ্রম করতে রাজি ছিলাম না। মাথুর আর রক্ষীপাল সিং ইত্যাদি তো রাজি হয়ে গেল। কিন্তু বাবা ঘড়ির কাঁটার মত চারটের সময় উঠে পড়তেন আর যুবকদের ব্যায়াম করার জন্য ওঠাতেন। এক সপ্তাহ কি দশদিন পর্যন্ত তো কোনোরকমে কসরৎ চলল, তারপর সবাই নানা বাহানা শুরু করল এবং বাবা আখড়ায় একলাই থেকে গেলেন। বাবা ধূত খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। ধোপা কাপড় ছিঁড়ে ফেলবে এই ভয়ে তিনি নিজেই কাপড় কেচে নিতেন। মুলতান জেলে যখন তিনি রাজবন্দী ছিলেন তখন একটা খুবই সুন্দর রঙিন খেস্ (বিছানার চাদর) বানিয়েছিলেন। আট-ন বছর আগে ঐ খেস্ বানানো হয়েছিল আর এখনও দেখলে মনে হতো খেস্টা গতকালই তৈরি হয়ে এসেছে। এমন সুন্দর খেস রোজ-রোজ পাতা কারুরই পছন্দ করার কথা নয়। আমি বললাম, 'বাবা, অনেক লোকের নজর আছে এই খেস্টার ওপরে।' বাবা ওটা বিছানার নিচ থেকে বার করে বাক্সে রেখে দিলেন। এবার এক ষড়যন্ত্র করা হল। আমি হালুয়া বানিয়েছিলাম, ফল-ক্লাবের তরফ থেকে এক ডজন লোকের নিমন্ত্রণ হল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কিছু লোক রহস্যটা জানত, কিছু লোক জানত না। আমি অতিথিদের বলে দিয়েছিলাম, 'ভাই, আজ সুন্দর-সুন্দর জামা-কাপড় পরে আসা চাই।' নয়না সিং খুব বড় একটা সাদা পাগড়ী বেঁধেছিল। যোগীন্দর সিং রেশমী ফেটি বেঁধেছিল। 'চমক', আমি আর 'বমার' অবশ্য নিজের ক্লাবেরই লোক। 'চমক'-এর কুঠরীই ছিল আমাদের ক্লাবঘর। কুঠরীতে গদী বিছানো হয়েছিল। বাবা ধূতের খেস্টা বাক্সের ভেতর থেকে বের করা হল এবং তাকে গদীর ওপরে বিছিয়ে দেওয়া হল। ওপর থেকে একটা চাদর পাতা হল। অতিথিরা হালুয়া খেতে লাগল, বাবা ধূত তো প্রথমে রাজি হননি, শেষে যাইহোক কোনোভাবে রাজি হয়েছিলেন। তিনিও হালুয়া খাচ্ছিলেন। এই মুহূর্তে, পরিকল্পিত সময়ের আগেই কেউ চাদরটা খেস্-এর ওপর থেকে সরিয়ে দেয়, বাবা ধূত দেখে ফেলেন। তাঁর মুখের দৃষ্টি বদলে গেল আর তাতেই দক্ষযজ্ঞ-বিধ্বংস-লীলা শুরু হয়ে গেল। নয়না সিং একদিকে পালাল, যোগীন্দর সিং আরেকদিকে। বাবা আমার ওপরে খুব রেগে গেলেন, কিন্তু আমরা দুজন তো রাতে পাশাপাশি শুতাম। বাবা দু-তিন দিন গম্ভীর মূর্তি ধারণ করলেন, অবশ্য মন তার কোমলই ছিল, তাই পরে কোমল হয়ে এল। যদিও খেস্-কাণ্ডের প্রধান নেতা ছিলাম আমি, আমি খুবই নিষ্পাপ হয়ে বাবাকে বোঝালাম, 'বাবা, আমার তো কিছু অপরাধ আছে কিন্তু আপনি যতটা ভাবছেন ততটা নয়। দেখলেন না নয়না সিং কতবড় পাগড়ী বেঁধে এসেছিল, আর যোগীন্দর সিং-কে কি কখনও ক্যাম্পে রেশমী ফেটি বাঁধা দেখা গিয়েছে?' 'চমক' আমার হাতে-পায়ে ধরেছিল, তাই আমি তার নাম করিনি। বাবা বুঝে নিয়েছিলেন যে, নয়না সিং

—১৯৪১—

আর যোগীন্দর সিং ছিল এই ষড়যন্ত্রের আসল নায়ক।

মাথুর আর আসরফ 'ফাঁকিবাজ ক্লাব' থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ওরা ঠিক করেছিল যে দুবেলা দুধ খেয়ে নেবে। দুজনেই ছিল খুব পড়ুয়া। বেচারারা দুধ এনে জানলার ওপরে রেখে দিত একটু ঠাণ্ডা করে খাবে বলে, কিন্তু পড়ায় এমনভাবে ডুবে থাকত যে দুধের কথা মন থেকে মুছে যেত আর ঠাণ্ডা হলে তা কে খায়? এর জন্য দুধ আট ঘণ্টা ধরে তেমনিই পড়ে থাকত। আমি বন্ধুদের দেখিয়ে বললাম, 'আমাদের কামরায় দুধের ভিনিগার বানানো হয়।' সবাই মাথুর আর আসরফকে বলতে লাগল, 'ভাই, ভিনিগার তৈরি হয়ে গেলে আমাদেরও একটু দিও।' ক্যাম্পে দুধ থেকে ভিনিগার করা লোকদের নিয়েও খুব আলোচনা হতে থাকল।

চন্দ্রমা সিং বিহারের এক বীর তরুণ। উগ্রপন্থী হবার পর ও নিজের বীরত্বের অদ্ভুত পরিচয় দিয়েছিল আর এক চুলের জন্য ফাঁসি থেকে বেঁচে গিয়েছিল। সম্প্রতি চন্দ্রমার বিয়ে হয়েছিল হাজীপুরের কাছে, বিয়ের অল্পদিন পরেই ওকে গ্রেপ্তার করে হাজারীবাগে পাঠানো হয়েছিল। জেলের মধ্যে আমোদ-প্রমোদের সুযোগ খুবই সীমিত। খোঁজ-খবর নিয়ে চন্দ্রমার বউ-এর সঙ্গে সবাই বৌদি সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলল। নাম কারোরই জানা ছিল না। আমি বলে দিলাম মুনিয়া আর ঐ নামেই সে বিখ্যাত হয়ে গেল। হাজীপুরে কমলালেবু আর কলা খুব ভাল জাতের ও বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যখন সবাই একযোগে মুনিয়া বলতে লাগল **তখন চন্দ্রমা আপত্তি করবে না কেন?** ? মুনিয়ার পরে হাজীপুর আর হাজীপুরের পরে কমলা বললেই চন্দ্রমা বোন রেগে যেত। তবে অন্যান্য বেকুবদের মত মন থেকে নয়, কিছুটা ওপর ওপর। একবার চন্দ্রমার দলকে রান্নাঘরের ব্যবস্থাপনার জন্য নির্বাচিত করা হয়। দলের কয়েকজন কাজে ঢিলা দিয়েছিল, চন্দ্রমার ওপরে হয়ত কাজ বেশি পড়েছিল, এইজন্য ও অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কার্টুন বানিয়ে দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া হল। দলের অন্য সবাইকে কি রকম বানানো হয়েছিল আমার মনে নেই। চন্দ্রমাকে একটা গরুর গাড়িতে বসিয়ে দেওয়া হল, যার ওপরে কুমড়ো, লাউ ইত্যাদি তরকারি রাখা ছিল। চন্দ্রমা রেগে প্রায় রান্নাঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। ওর সামনে একটা কমলালেবুর গাছ ছিল, যাতে দুটো কমলা ঝুলছিল। চন্দ্রমা বেচারির খুব খারাপ লাগল। সমস্ত ক্যাম্প গিয়ে কার্টুনকে দেখল। আর যখন এক নম্বর ক্যাম্পে খবর গেল, তখন সেখান থেকেও সেটা দেখার জন্য দাবি এল। হাজীপুর এবং কমলালেবু সমস্ত ক্যাম্পে বিখ্যাত হয়ে গেল।

খেলার মাঠে, যেখানে আমরা সকাল বিকেল বেড়াতে বা খেলতে যেতাম, দুটো ক্যাম্পের বন্ধুরা একসঙ্গে মিলিত হতাম। কখনও কখনও সেখানে কবি-সম্মেলনও হতো। এটা 'কমলালেবু কার্টুন'-এর আগের কথা। সেদিন কবিতাপাঠ হওয়ার কথা ছিল। আমরা যখন ওখানে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, সেই সময় আমাদের 'ফল ক্লাব'-এর কলা এসে গেল। আমি কলা নিয়ে নিলাম। রাস্তায় খেতে খেতে যাবার সময় চন্দ্রমা বোন আমার কাছ থেকে চাইলো। ওকেও একটা কি দুটো কলা দিলাম। সম্ভবত খাওয়ার সময় না পাওয়ায় সে কলাগুলোকে পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিল। নরেন্দ্র নিজের কবিতা

পড়ছিল, তাতে কোনো উপমা ছিল অথবা এমনিই 'হাজীপুরের কমলালেবু'র কথা বলল। চন্দ্রমা ভাবল যে এই সময় চুপ করে থাকা ভীরুতার লক্ষণ হবে। সে পকেট থেকে কলা বার করে দেখিয়ে বললে, 'হাজীপুরে কলাও হয়'। এখনও পর্যন্ত এক নম্বর ক্যাম্পের লোকেদের কমলালেবু এবং হাজীপুরের রহস্যের ব্যাপার জানা ছিল না। সবার খুব জানার ইচ্ছে হলো এবং আমাদের ক্যাম্পের লোকেরা তাদের জিজ্ঞাসার পুরো উত্তর পেতে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করলো। চন্দ্রমাকে সবাই বোঝাল এবং সে নিজেও দেখলে যে, এখন কেউ কমলালেবুর অভিবাদন করছে না বরং পুরো ক্যাম্প তারই বিষয় আলোচনা করছে। জানি না কে ওকে বুঝিয়েছে বা হয়ত চন্দ্রমা নিজেই বুঝে নিয়েছে—রাহুলজী জেনেশুনে সেইদিন আমাকে কলা দিয়েছিল যাতে আমি উত্তেজিত হয়ে সবার সামনে সভায় কলা নিয়ে কথা বলি। এটা একেবারে ভুল ধারণা ছিল। আমি অবশ্য এটুকু জানতাম যে নরেন্দ্র কবিতা পড়বে এবং তাতে কমলালেবুর উল্লেখ থাকতে পারে। কিন্তু সেদিন সেই সময় ঘটনাচক্রে কলা এসে গিয়েছিল। চন্দ্রমা চাওয়াতে আমি ওকে কলা দিয়েছিলাম। খাওয়া-না-খাওয়া সেটা ওর ব্যাপার ছিল। আমাদের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতা হতো কিন্তু তা ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে, যার জন্য কটুতা সেখানে স্থান পেত না।

হাজারীবাগ আসার পর একদিন আরও ভালো রসিকতা হলো। চন্দ্রশেখরের নতুন নতুন বিয়ে হয়েছিল। ওর মতো বিপ্লবী তরুণের জন্য জেল ছিল দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়ি। শকুন্তলা (চন্দ্রশেখরের স্ত্রী) সে-সময় হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে সম্ভবত বি·এ· পড়ছিল। তরুণদের চিঠির মাধ্যমে নিজের প্রেম নিবেদনের অধিকার আছে। কিন্তু তখন রাজিয়ার মত শকুন্তলারও এম·এ· পাশ পতির কমিউনিস্ট পার্টির কণ্টকাকীর্ণ পথ বেছে নেওয়া পছন্দ ছিল না। ওর বাবা প্রবীণ কংগ্রেসী ছিলেন এবং না-জানি কতবার জেল গিয়েছিলেন। তবে তা গান্ধীজীর পথ অনুসরণ করে। কখনও ছ-মাস কি বছরখানেকের জন্য জেল ঘুরে আসা অত খারাপ ছিল না কিন্তু কমিউনিস্টদের তো কোনো ঠিক ছিল না যে কবে কোন সাজা তাদের হয়। সেও রজিয়ার মত ঠিক করেছিল যে, নিজেকে অথবা কমিউনিস্ট পার্টিকে দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে। চন্দ্রশেখর মৃদু হেসে দিত এবং হয়তো বলতো, 'কমিউনিস্ট পার্টি তোমার সতীন নয়, সে আমার মা।' পরে তো শকুন্তলাও পার্টির মেয়ে হয়ে গেল। একদিন চন্দ্রশেখর রাতের চাঁদনী এবং আরো কি-কি সব উপমা দিয়ে কাব্যময় এক লম্বা চিঠি লিখেছিল। বন্ধুরা লম্বা চিঠিটা লেখার সময় দেখে নিয়েছিল। চন্দ্রশেখর চিঠিটা নিজের হাতে করে অফিসে দিয়ে আসে। কেউ সে-চিঠিটাতে চন্দ্রশেখর আরও কিছু যোগ করতে চায় বলে নিয়ে আসে। রাত্তিরে নাটক হল এবং তার শেষে মাথুর ঘোষণা করল, 'আমি একটা মেসমেরিজমের খেলা দেখাব এবং আত্মাকে ডেকে এনে অনেক আজব কথা জিজ্ঞেস করব।' আমরা সবাই উৎসুকতার সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। সে ওঝা-সখাদের মন্ত্র পড়ে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একজন বন্ধুকে 'অজ্ঞান করল।' তারপর পর্দার আড়াল থেকে আত্মাটি চন্দ্রশেখরের পুরো চিঠিটা পড়ে ফেলল। চন্দ্রশেখরের খুব আশ্চর্য লাগলো এবং অন্যেরা

খুব উপভোগ করল। চন্দ্রশেখরও তাতে যোগ দিল।

সোভিয়েতের ওপর হিটলারের আক্রমণ—কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই খবরের কাগজগুলো গুজব ছাপতে লাগলো যে, হিটলার সোভিয়েতের ওপর আক্রমণ করতে চাইছে। যদিও আমরা বুঝতাম যে নাৎসীবাদ এবং সাম্যবাদের পরস্পরের মধ্যে মৌলিক শত্রুতা আছে এবং বিবাদ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রথমে বিশ্বাস হতো না যে ইংল্যাণ্ড এবং তার সমর্থক আমেরিকার শক্তিকে খর্ব না করে হিটলাব এই রকম কিছু একটা করবে। ২০ জুন প্রচারিত রেডিওর খবরে শুনলাম যে, রুমানিয়া সোভিয়েতের কাছ থেকে কোনো একটা শহর ফেরৎ চেয়েছে। সেদিন আমি লিখেছিলাম—'যদি খবরটা সত্যি হয়, তাহলে এতে জার্মানির ইশারা থাকতে পারে।' খবরের কাগজ এটাও লিখেছিল যে দুদিনের মধ্যেই সমস্ত জার্মান সেনা চালনা করা হবে। এই বিষয় লিখেছিলাম—'এই চালনা সোভিয়েত ছাড়া কার বিরুদ্ধে হতে পারে? তবে কি জার্মানি একই সঙ্গে ইংল্যান্ড ও সোভিয়েত দু দেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? পিপীলিকার ডানা উঠেছে!' ২১ জুন খবরে পড়লাম, জার্মানি ফিনল্যান্ডে তাদের সৈন্য পাঠিয়েছে এবং সোভিয়েতের পশ্চিম দিকে জার্মান সেনা মোতায়েন রয়েছে। পাঁচটি ক্ষেত্রে দুই সেনার মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে—সংঘর্ষের খবর নিশ্চয়ই মিথ্যা।রোববার রাতে এসে রেডিওর খবর শোনাল। আজ তিনটের সময় জার্মান সেনা সোভিয়েতের ওপর হামলা করেছে। আমি তখনই বুঝতে পারলাম যে সাম্যবাদের ওপর ফ্যাসীবাদের আক্রমণ শুরু হয়েছে। পৃথিবীর সাম্যবাদী এবং মজদুর কিষাণদের কর্তব্য সাম্যবাদ রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামা—এটা বুঝতে আমার সময় লাগল না। লড়াই তো এখন দুটো পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে থাকল না। পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে সাম্যবাদ শেষ হয়ে যাওয়া মানে হল কয়েকশো বছর কৃষক-মজদুর রাজ্যের স্বপ্ন পরিত্যাগ করা। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। সকলে এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। সেইদিন রাত্তিরেই আমি পার্টির সদস্যদের বললাম, 'এখন আর যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের আগেকাব মনোভাব থাকতে পারে না। হিটলার এখন আর আমাদের শত্রুর শত্রু নয়। বরঞ্চ সে আমাদেরই শত্রু।' তিন-চারজন পার্টি সদস্যদের সঙ্গে এই বিষয় কথা হল, কিন্তু আমি দেখলাম ওদের চিন্তাধারা আমার থেকে একেবারে বিপরীত। ওরা ভাবছিল যে, ওদিকে লাল সেনা হিটলারের সঙ্গে লড়াই করতে থাকবে আর এদিকে আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আগেকার মতো চালিয়ে যাব। পরের দু-একদিন এই বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বললাম কিন্তু তারা কেউই শুনতে রাজি ছিল না। আমি তখন এই বিষয়ে আলোচনা করা ছেড়ে দিলাম। এখন হিটলারের সৈন্যের এগোবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হতাশা বেড়ে যাচ্ছিল, রাত্তিরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আসছিল না। সেই সময় আমার ইচ্ছে হচ্ছিল রাতদিনের বেশি সময় যেন ঘুমিয়ে কাটাতে পারি। আমার কখনই মনে হচ্ছিল না যে হিটলার সোভিয়েতকে জয় করতে পারবে। আমি সোভিয়েত বাহিনীর বিষয়ে পড়েছিলাম, সোভিয়েত সেনা দেখেছিলাম, এবং

—১৯৪১—

সেইসঙ্গে সোভিয়েতের ঐ সাধারণ নাগরিকদের দেখেছিলাম যারা বেঁচে থাকতে নিজেদের স্বর্গরাজ্য নাৎসীদের কবলে যেতে দেবে না। সর্বপ্রথম আমি যখন লাল বিপ্লবের খবর পেয়েছিলাম এবং গত যুদ্ধের বিষয়ে কিছু কিছু শুনেছিলাম তখন অন্যদের মতো আমারও মনে হচ্ছিল যে, বলশেভিকের বিজয় তাদের পৌরুষের চাইতেও ঘটনাচক্র বেশি সাহায্য করেছিল। কিন্তু যখন অক্টোবরের বিপ্লব, চোদ্দটি রাজ্যের একসঙ্গে বলশেভিকের ওপর হামলা এবং শ্বেত জেনারেলদের দ্বারা দুনিয়ার পুঁজিবাদীদের সোভিয়েতের ওপর হামলা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন করলাম, তখন বুঝলাম যে সোভিয়েত রাষ্ট্র ঘটনাচক্রে নয় জনতার পৌরুষ, পার্টির সংগঠন, বুদ্ধি, আত্মত্যাগ এবং হিম্মতের জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেইজন্য কখনো আমাকে পুরোপুরি নিরাশ হতে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু নাৎসীদের এগিয়ে যাবার খবর আমায় নিশ্চয় ব্যাকুল করছিল। যখন লেলিনগ্রাদের ওপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চলছিল আমি তা অবিচলিতভাবে দেখেছিলাম। সেখানে আমি যেন লোলা ও ইগরকে দেখতে পাচ্ছিলাম এবং ওদের মতো কত মা ও শিশু আমার চোখের সামনে ভাসছিল। ২৬ জুন লোলার ২৩ এপ্রিলের এবং ডাঃ শ্চের্‌বাৎস্কীর ২২ এপ্রিলের লেখা চিঠি পেলাম। যুদ্ধ শুরু হবার দুমাস আগে এই চিঠি দুটো লেখা হয়েছিল। আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলছিল। আমি ভাবছিলাম, লেলিনগ্রাদের ওপর বোমা বর্ষণের বিষয়। ২৮ জুন পড়লাম—লেলিনগ্রাদ জ্বলছে। ৭ জুলাইয়ের ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'আমার চিন্তা দূর হচ্ছে না, রাত্তিরে ঘুম ভাঙলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসতে চায় না।'

৫ জানুয়ারি, ১৯৪১-এর চিঠিতে লোলা লিখেছিল,'ইগর খুবই চালাক, উৎসাহী এবং সুন্দর শিশু, কিন্তু আগেও আমি লিখেছিলাম যে, সে খুবই কম কথা বলে। কয়েকদিনে তার শব্দ-ভাণ্ডারে কিছু শব্দ বেড়েছে—বেড়াল, কুকুর, বই, রুটি, মাখন, দেশলাই এবং আরো কিছু। তুমি এই থেকে বুঝতে পারবে যে ভাষায় এখনও তার প্রবাহ আসেনি। সে অত্যন্ত একগুঁয়ে জেদী বাচ্চা, তার জন্য বোধহয় আমিও দায়ী। সকালে সাড়ে সাতটায় আমি বাড়ি থেকে বেরোই এবং ফিরি রাত্তির আটটায়। ঠিক রাত্তির দশটায় তাকে ঘুম পাড়ানো হয়, সেজন্য সে মোটে দু-ঘণ্টা আমার কাছে থাকে। পুরো দিন থাকে তার নার্সের কাছে। নার্স মহিলাটি খুব ভালো। সে বেশ ভালোভাবে দেখাশোনা করে। আমি তখন খুব খুশি হই, যখন বাড়ি ফিরে আসি আর ইগর তার ছোট ছোট হাত আমার গলায় দিয়ে 'মা-মা মা-মা' বলে চেঁচায় এবং আমার স্লিপার এনে দেয়। তখন থেকে আমরা আলাদা হয়ে থাকি না। নিজের কোলে ওকে বসিয়েই আমি খাবার ও চা তৈরি করি। এতে যে আমার সুবিধে হয় তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমার ছেলে আমার কাছ-ছাড়া হতে চায় না এবং ওর ইচ্ছেকে আমি মেনে নিতে বাধ্য হই। আমি ওর স্বভাব ও শিক্ষার ব্যাপারে নজর রাখতে গিয়ে কঠিন হতে পারি না। এই কদিনে ও আরও বেশি বিগড়ে গেছে। ও একলা শুতে চায় না। আর বলে, 'যতক্ষণ না তুমি শোবে ততক্ষণ আমি শোব না।' কিন্তু আমি বালিশের ওপর মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ি এবং বাড়ির কাজকর্ম ঐ রকমই পড়ে থাকে। সেইজন্য দশটার সময় ওর যাবতীয় খেলনা

ওকে দিয়ে দিই। ইগর দেরি করে বারোটা নাগাদ ঘুমোয়। এটা খুবই খারাপ। এর থেকে তুমি বুঝতে পারবে তোমার এখানে থাকাটা কত জরুরি। তোমার নিজের ছোট বাচ্চাকে সামলানোর কাজ নিজের হাতে নেওয়া উচিত।' এই লাইনগুলো পড়ার সময় আমার লেলিনগ্রাদের ওপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের কথা মনে পড়ছিল।

২৪ মে-র চিঠিতে লোলা লিখেছে, 'আমার প্রিয় রাহুল! আমি আজ নিজেকে এক ভাগ্যবতী নারী বলে মনে করি। সকাল ছটার সময় তোমার তার পেলাম। আমার ছোট্ট সোনার ফটো তুমি কি পেয়েছো? তোমার ওকে কেমন লাগছে? তোমার সঙ্গে ওর কি কোনো সাদৃশ্য আছে? ওকে কি হিন্দুর মতো দেখতে লাগে? ইগর খুবই চালাক খুবই বুদ্ধিমান ছেলে। ওব স্মরণ শক্তিও প্রখর। ওর স্বভাব খুবই কোমল ও মধুর। আজকাল আমার পেটের ব্যথাটা খুবই বেড়েছে। গরম বোতল নিয়ে যখন আমি শুয়ে পড়ি তখন ইগর দৌড়ে আমার কাছে চলে আসে। ও আমার গলা জড়িয়ে থাকে, চুমু খায়। আর আমার ব্যথার কথা জানার পরে দুঃখিত হয়ে পড়ে। ইগর কিন্তু খুবই দুষ্টু। নার্স ওকে 'বিগড়ু' বলে ডাকে। একটুক্ষণের জন্যেও ওকে একলা ছাড়া যায় না। এই শীতের মরশুমে ও হাতের কাছে যা কিছু জিনিস পেয়েছে সেগুলো না ভেঙে ছাড়েনি। ও আমার হজ্‌মী-চুরণ ফেলে দেয় এবং সেন্টও উড়িয়ে দেয়। গতকাল ও কফির পাত্র ভেঙে দিয়েছে। কফি এবং মোরব্বা ফেলে দিয়েছে। আর লাথি মেরে পাত্রটা ভেঙে দিয়েছে। বোঝাই যায় যে এই ভাঙাচোরায় সে এক অদ্ভুত আনন্দ পায়। গত সপ্তাহে আমি যখন বাড়ি ফিরলাম, দেখলাম যে ইগরকে খাবার টেবিলের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। সেদিন ও একটা প্লেট ভেঙেছিল। বেড়ালটাকেও খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল, কেননা সে খাবার খেয়ে নিয়েছিল। এবং একটা পেয়ালা ভেঙেছিল। প্রথমে আমার নার্সের ওপর রাগ হয়েছিল। কিন্তু পরে ওর শাস্তি দেওয়াটাকে মেনে নিয়েছিলাম। গত সপ্তাহে আমি ও ইগর দত্তর কাছে গিয়েছিলাম। দত্ত মশাই ইগরকে খুব পছন্দ করেছেন। তিনি বলছিলেন, 'ইগর পুরোপুরি হিন্দু (ভারতীয়)।' যখন জার্মানি মস্কো ও লেলিনগ্রাদের নিকট পৌঁছে আক্রমণ করছিল তখন (২ আগস্ট) আমি এই সবই পড়ছিলাম। কিয়েফের তখন ভীষণ সংকট ছিল। ৭ আগস্ট আমি লিখেছিলাম—'ভীষণ পরীক্ষার সময়। হয় পৃথিবীর ওপর নিজের বিজয়ের চাপ সৃষ্টি করে লালসেনা সাম্যবাদকে সফল করবে, নয়ত মানবতা আবার কিছুদিনের জন্য অন্ধকার গহ্বরে পড়বে।' নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত যতদিন না দেখা গেল পাশা পাল্টাচ্ছে, ততদিন অব্দি চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ছিল। রস্তোফকে লালসেনা আবার ছিনিয়ে নিয়েছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মস্কোর ঘাঁটি থেকে জার্মান সেনাবাহিনীকে পিছু হটতে হয়েছে।

পঠন-পাঠন—পুরো গরমকাল ম্যালেরিয়া ও গরমের জন্য পড়াশোনা খুব কম হচ্ছিল—লেখালিখি তো সম্ভবই ছিল না। 'চমক' তার ঘর আমার জিম্মায় করে দিল। আমি কেবল শোবার জন্য আমার খাটে যেতাম, বাকি সময় ঐ ঘরটায় বসে লিখতাম।

দেওলীতে রাজবন্দীর সংখ্যা দুশোরও বেশি ছিল—তার মধ্যে বেশিরভাগই সুশিক্ষিত। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর যা কিছু বই পাচ্ছিলাম, পড়ছিলাম ও নোট করে যাচ্ছিলাম। কিছু বই আজমীঢ়ের পাবলিক লাইব্রেরি থেকে এসেছিল এবং আমি কিছু বাইরে থেকে আনিয়ে ছিলাম। পড়ে পড়ে আমি নোট করে যাচ্ছিলাম—বাড়তে বাড়তে সেই নোট প্রায় দু-হাজার পাতার হয়ে গেল। আমি বস্তুবাদ অথবা মার্কসবাদের বিষয়ে একটা বই লিখতে চাইছিলাম। ইংরেজিতে কয়েক হাজার বই আছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে যারা কেবল হিন্দি জানে তাদের জন্য মার্কসবাদের মৌলিক সিদ্ধান্ত বোঝবার জন্য বই-এর খুব অভাব। এটা খুব ভাবাতো হাজারীবাগে ছ-মাস এবং দেওলীতে সাত মাস—তেব মাস অধ্যয়ন করার পর ৩০ জুলাই (১৯৪১) আমি বই লিখতে আরম্ভ করি। প্রথমে এই ভেবে লেখা শুরু করে ছিলাম যে একটাই বই হবে। বই-এর নামও রেখেছিলাম 'বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ'। কিন্তু পরে বুঝলাম যে, দু-হাজার পাতার একটা বই লেখা ঠিক হবে না। আলাদা আলাদা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা বই-এর নাম দেওয়া যেতে পারে। ২৭ আগস্ট (২৯ দিনে) 'বিশ্বকী রূপরেখা' শেষ হল। ৯ সেপ্টেম্বর আমি 'মানবসমাজ' (সেই সময় 'বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ-এর দ্বিতীয় খণ্ড) আরম্ভ করি এবং ১৪ অক্টোবর সেটাও শেষ হল। ১৬ অক্টোবর 'দর্শন দিগ্‌দর্শন' -এ হাত দিই এবং ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত কেবল যবন (গ্রীক) এবং ইউরোপীয় দর্শনই লেখা শেষ করতে পেরেছিলাম—অনশনের চতুর্থ দিন হওয়ায় লেখা বন্ধ করতে হয়। অনশনব্রত শেষ হওয়ার পর পুরো নভেম্বর ধর্মকীর্তির 'স্ববৃত্তি' (প্রমাণবার্তিক)-এর খণ্ডিত অংশকে তিব্বতী অনুবাদ থেকে সংস্কৃতে করে যাচ্ছিলাম। তারপর ২০ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত 'দর্শন দিগ্‌দর্শন'-এ ভারতীয় দর্শনের অংশে কয়েকটি অধ্যায় লিখলাম। এইভাবে দেওলীতে থাকার শেষ পাঁচ মাস লেখা নিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করলাম। সময় সময় আমাকে আমার সঙ্গীসাথীদের সাথে সামাজিক জীবনযাত্রায় মিলিত হতে হচ্ছিল এবং তাতে আমি কারুর চাইতে পিছিয়ে থাকছিলাম না। রান্নাঘরের ব্যবস্থাপকদের মধ্যেও ছিলাম, কিন্তু পরে বন্ধুরা আমাকে সেই কাজ থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল। প্রথমে ক্যাম্পে ডাক্তার আস্‌রফ, ডাক্তার আহমদ ইত্যাদি আরও কয়েকজন তরুণ সাথী ছিল, যাদের কলমে জোর ছিল। আমি কয়েকবারই তাদের কিছু লেখার জন্য, কিছু গ্রন্থ অনুবাদ করার জন্য বলি। কিন্তু কিছু হয়নি। আমাদের কোনো নিজের ঘর ছিল না। এক একটি ঘরে দশ-বারোজন করে থাকতো। তার ওপর সমবয়স্ক এবং তরুণদের সংখ্যাই ছিল বেশি। ক্লাশে যাবার জন্য আমরা সবাই বাধ্য ছিলাম তাই সেই সময় খেলাধুলোর কোনো কথা বলা যেত না। নিজের নিজের পছন্দমত কিছু বই তারা পড়তো। ফোনোগ্রাফও কখনো কখনো বাজানো হতো। আমিও একটা ফোনোগ্রাফ আনিয়ে নিয়েছিলাম, যাতে আমার ক্যাম্পের সাথীরা আনন্দ পাচ্ছিল। আমিও কাজ থেকে ছুটি পেলে ওটাকে নিজেও বাজাতাম। আমার অন্য বন্ধুদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, এই আবহাওয়ায় বই লেখার মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে পারে না। প্রথম প্রথম আমিও এই ধারণার শিকার হয়ে পড়ছিলাম কিন্তু আমার লেখার দরকার

ছিল, সেইজন্য আমার মনকে আমি বোঝালাম—'হে মন! তোমার হাসি-খেলা-ইয়ার্কির জন্য আমি পুরো সময় দিতে রাজি আছি। কিন্তু তুমি কমসে-কম কিছু সময় লেখার জন্য দিতে রাজি হও।' সাধারণত আমি কুড়ি পৃষ্ঠা (স্কুলের খাতার) রোজ লিখতাম। রোববার কেবল দশ পৃষ্ঠা লিখতাম। যখনি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা লেখা শেষ হয়ে যেত, আমি কলম রেখে দিতাম। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে মিশতাম, বাজনা বাজাতাম বা অন্য কিছু করতাম। আমি দিনে চল্লিশ-পঞ্চাশ পৃষ্ঠা লেখার চেষ্টা করতাম না, সেইজন্যে আমি যে কথা রাখছি তা আমার মন বুঝেছিল।

অনশন ধর্মঘট (২৩ অক্টোবর—৭ নভেম্বর)—আমরা একবার কয়েক ঘণ্টার জন্যে অনশন করেছিলাম। বড় ডাক্তারের বদলী হয়ে যাওয়ায় সেটা তুলে নেওয়া হয়। আমাদের দাবি ভারত সরকারের কাছে পৌঁছেছিল। পোশাক এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সুবিধে হল কিন্তু অনেক অসুবিধে রয়েই গেল। সেইজন্যে আন্দোলন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। বাংলার গোয়েন্দারা কেউ এখানে ছিল না কিন্তু পাঞ্জাবের গোয়েন্দারা বাংলার চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না। একদিন (১৬ জানুয়ারি) বন্ধু মক্‌খন সিং আফ্রিকান লাহোর-কেল্লার নির্যাতনের কথা বর্ণনা করছিল। সেই শুনে সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। ওকে কেল্লার ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রথমে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা হয়েছিল। ভালো ভালো খাবারের ব্যবস্থা ছিল। অফিসাররা পাহারাদারদের গালাগালি দিয়ে বলল, 'বদমাশ! এক সম্ভ্রান্ত বাবুর সঙ্গে তুই এইরকম ব্যবহার করিস?' কিন্তু যখন দেখলে যে ওর কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না তখন অফিসার নিজেই মা-বোন তুলে নোংরা নোংরা গালাগালি দেওয়া শুরু করল। ধমকানো হল এই বলে, 'যদি সব কথা না বলো তাহলে তোমার বোনকে এখানে সামনে এনে…।' (একজনের সঙ্গে এমন করাও হয়েছিল। অভাগিনী নারী তার প্রিয়জনের প্রাণ বাঁচাতে ওখানে গিয়েছিল।) তারপর হাঁটু এবং অন্য জায়গায়— যেখানে ব্যথা বেশি লাগে—আঘাত করা হতো, শরীরের লোম এবং চুল একটি একটি করে উপড়ান হতো, কয়েক রাত্তির ঘুমোতে দেওয়া হতো না। আমার বন্ধুকে সপ্তাহখানেক ঘুমাতে দেওয়া হয়নি। লোকটা ঘুমিয়ে পড়লেই ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেওয়া হতো। এটা অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। আরো একটা এমন ব্যাপার করা হয়েছিল, যা লিখতেও লজ্জা করে। বিংশ শতাব্দীর এই রকম ঘটনা শোনাও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আমরা দেওলীতে এইসব পাঞ্জাবী পুলিশ অফিসারদের আওতায় ছিলাম।

২১ জুলাই কেন্দ্রীয় অ্যাসেম্বলি-এর সদস্য শ্রী এন· এম· যোশী আমাদের অসুবিধেগুলোর তদন্ত করার জন্যে দেওলী ক্যাম্পের ভেতরে এলেন। সরকার খুব ভাল করেই জানত যে, এরা বাক্‌যোদ্ধা নয়, কর্মযোদ্ধা এবং এদের জীবন পণ করতেও সময় লাগবে না। সেইজন্যে সরকার মঞ্জুর করেছিল যে, যোশী সাহেব গিয়ে ওদের অসুবিধেগুলো জেনে আসুক। আমরা আমাদের অসুবিধের কথা জানালাম। তিনি ক্যাম্প ঘুরে দেখলেন, আমার বিষয় কেউ বিশেষভাবে ওঁকে বলেছিল। আমাকে জিজ্ঞেস করায়

বললাম, 'আমারও একই রকম অসুবিধে আছে, তার সঙ্গে আমি লেখার এবং গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে চাই কিন্তু আমার এই অরাজনৈতিক কাজের জন্যেও সরকার কোনো সুবিধে দিতে রাজি নয়।' এর পর এইটুকুই হল যে সপ্তাহে একদিন আমাকে তিব্বত থেকে আনা তালপত্রগুলো ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পড়ার জন্যে অফিসে যাবার অনুমতি দেওয়া হল। আমি ওখানে গিয়ে দেখলাম যে আমার শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি উধাও হয়ে গেছে। জিনিসের তালিকা তৈরির কোনো নিয়ম ছিল না সেইজন্যে অফিসের লোকেরা ইচ্ছেমত জিনিস আত্মসাৎ করে নিত।

ভারতে যখন (১৯২৯) কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন হয়নি, তখন কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন লোকেরা বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশে কাজ শুরু করেছিল। পার্টি সংগঠিত হবার পর তাতে সব প্রদেশই মিলিত হয়েছিল কিন্তু পাঞ্জাবের প্রাচীন কমিউনিস্টরা 'কিরতী (শ্রমিক) পার্টি' নামে এখনও নিজ সংগঠন বজায় রেখেছিল। এদের মধ্যে বড বড় আত্মত্যাগী, যথা বাবা সোহনসিং ভকনা, বাবা কেহর সিং, বাবা শের সিং-এর মত বৃদ্ধরা ছিলেন, যাঁরা নিজেদের পুরো যৌবন উৎসর্গ করেছেন দেশের কাজে এবং আজও প্রায় সত্তর বছর বয়সেও তাঁদের যুবকদের মত গভীর আবেগ ছিল। বাবা সোহন সিং-এর কোমর ঝুঁকে গিয়েছিল কিন্তু এখনও ১৮ বছরের তরুণদের মত উৎসাহের সঙ্গে ক্লাসে যেতেন। নতুন বিষয় অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে শিখতেন। এর আগেও পার্টি কিরতির সদস্যদের মিলিত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তা সফল হয়নি। কিন্তু এখন সরকার সারা ভারতের বিশিষ্ট কমিউনিস্টদের একজায়গায় করে দিয়েছিল, তাই তাদের কাজ সুগম হয়ে গিয়েছিল। সাত মাসের চেষ্টার পর আমরা সফল হলাম। কিরতি দল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিত হল। ২২ আগস্ট এই উপলক্ষে একটা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হল, যাতে সবাই খুব আনন্দ করেছিল। এতদিনে তৃতীয় ক্যাম্পটাও ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তিনটি ক্যাম্পেরই সাথীরা খেলার মাঠে জমা হল। সেখানেও খুব আনন্দ করা হল। বক্তব্য রাখা হল। ছ-ফুটের বাবা কেহর সিং সাদামাটা ভাষায় নিজের হৃদয়াবেগ প্রকাশ করলেন, 'প্রথম যখন আমি স্বাধীনতার জন্য পতাকা হাতে তুলি তখন কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না, যদি থাকতো তা হলে আমরা অসফল হতাম না। এখন আমাদের পার্টি রয়েছে। এখন আমাদের এরই জন্যে বাঁচা এবং এরই হুকুমে মরা। হুকুম দিক, বুড়ো হয়েও আমরা পার্টি যুবকদের চাইতে পিছিয়ে পড়ে থাকব না।'

২৩ সেপ্টেম্বর পণ্ডিত উদয়নারায়ণ তিওয়ারীর চিঠি এল এবং জানতে পারলাম যে ডাক্তার অবধ উপাধ্যায় মারা গেছেন। দুঃখের কথা আর কি বলার আছে? ওঁর ওপর দেশের খুব আশা ছিল কিন্তু যা করার জন্যে তিনি তৈরি হচ্ছিলেন তা শেষ করতে পারলেন না। যাঁরা চলে গেলেন তাঁদের জন্যে দুঃখ করে আর কি হবে, আমাদের দুঃখ আমাদের নিজেদের জন্যে।

১০ অক্টোবর অনশনের আল্টিমেটাম সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমরা দশমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম কিন্তু সরকার নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে রইল। এই ব্যাপারে আমরা লিখেছিলাম, যদি ২২ তারিখের মধ্যে আমাদের দাবিগুলোর কোনো

সন্তোষজনক জবাব না আসে, তাহলে আমরা তার জন্য যেকোনো পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হব। পরের দিন সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলল যে, সময় যা দেওয়া হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। আমাদের মুখপাত্র বলেছে, সরকারকে যত সময়ই দেওয়া হোক না কেন তা পর্যাপ্ত হবে না। আমরা চাইছিলাম যে অন্য পার্টির লোকেদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আন্দোলন শুরু করা হোক কিন্তু তারা এ ব্যাপারে রাজি হল না। শেষে আমরা ১৫৬ জন মিলে জীবনপণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল যে সমস্ত পার্টি মেম্বারদের হরতালে যোগ দেওয়া আবশ্যিক না করা হোক, কিন্তু কেউই পিছিয়ে থাকতে রাজি ছিল না। সেইজন্যে প্রত্যেক পার্টি মেম্বারকে হরতালে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। আমাদের দুদিন পর ১২ অক্টোবর অন্য পার্টিও আলটিমেটাম দিল।

১৯ অক্টোবর সুপারিন্টেন্ডেন্ট নোটিশ লাগিয়ে দিল যে যোশীর রিপোর্ট ১৬ তারিখে সরকারের কাছে পৌঁছেছে। সরকার তার ওপর বিবেচনা করছে। এই ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গেও কথা বলতে হবে এবং সেইজন্যে আরো কিছু সময় দিতে হবে। তাড়াতাড়ির দরকার নেই। এইরূপ পরিস্থিতিতে চাপ সৃষ্টি করতে সরকার খুব ভালোভাবেই জানত। ২০ অক্টোবর দিল্লীর 'স্টেটস্‌ম্যান' অফিসে আসতেই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাতে জয়প্রকাশ বাবুর পুরো চিঠি ছাপা হয়েছিল। জয়প্রকাশ বাবুর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি এক লম্বা চিঠি বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে তাঁর স্ত্রীর হাতে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার তা ধরে ফেলে। আমরা এই ব্যাপারটা জানতাম না। পরে এও জানা গেল যে ক্যাম্পের ভেতর এসেছিল এমন একজন দর্জি বা অন্য কোনো লোকের হাতে তিনি এই চিঠি দিয়েছিলেন, যেটা সে সি· আই· ডি· অফিসারকে দিয়ে দেয়। সি· আইডি· অফিসার তাকে চিঠিটা ফেরত দিয়ে দিতে বলেছিল। দু-চারদিন পর সেই লোকটা নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে চিঠিটা ফেরত দিয়েছিল। এই ব্যাপারটা কতখানি সত্যি কতখানি মিথ্যে তা আমি বলতে পারব না। মোদ্দা কথা, একটা বড় চিঠি সি· আই· ডি·-রা ধরে ফেলেছিল এবং আমাদের অনশন শুরু হবার দুদিন আগে সেটা স্টেটস্‌ম্যানে ছাপা হয়েছিল। তাতে রাজবন্দীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বীকার করেছিলেন যে আমাদের অসুবিধেগুলো এত বেশি নয় যে তার জন্যে অনশন করতে হবে—সরকার তো কয়েকটি ব্যাপারে সুবিধেও করে দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা একটা বড় মারাত্মক অস্ত্র ছিল। সরকার ভেবেছিল যে এই চিঠিটা ছাপিয়ে আমাদের অনশন করার পরিকল্পনাটি মাটি করে দেবে এবং দেশের লোকেদের বুঝিয়ে দেবে যে রাজবন্দীদের দাবিগুলো যুক্তিযুক্ত নয়, ওরা মিছিমিছি সরকারকে ব্যতিব্যাস্ত করতে চায়। আমরা তখনই নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করলাম। আমাদের ক্যাম্পবাসীদের বক্তব্য হল যে, আমাদের সংকল্পে দৃঢ় থাকা উচিত। আমি বললাম, 'এই চিঠিটা অবশ্যই আমাদের প্রচুর অনিষ্ট করেছে কিন্তু সরকার যা চাইছে তা হবে না। জনগণের সহানুভূতি আমাদের ওপর থাকবে এবং দুটো-একটা প্রাণ দিয়েও এই চিঠির প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে।' এই চিঠিটা যেভাবে লেখা হয়েছিল তা কোনো বিপ্লবী লিখতে পারে

না। কমিউনিস্ট তো শত্রু ছিল—কিন্তু নিজের পার্টির অনেক রহস্যই ঐ চিঠিতেই খোলাখুলিভাবে লেখা হয়েছিল।

সাথী জয়প্রকাশ এবং অন্যান্যরা একদিন আগেই (২২ অক্টোবর) অনশন-ধর্মঘট শুরু করল। আমরা আমাদের নির্ধারিত দিনে অনশন শুরু করি। সরকার অনেক ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছিল। প্রথম দিনই আগ্রার ডাক্তার ফুলচন্দ শর্মা এসে গিয়েছিলেন। আমি তো আগেও দুবার অনশন করেছিলাম সেইজন্যে পনের-কুড়ি দিন অনশন করা আমার পক্ষে কোনো ব্যাপারই ছিল না কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেরই শারীরিক দুর্বলতা ছিল। কিশোর ভাই এমনি একজন ছিলেন। আসরফও খুব দুর্বল ছিল আর বাবা সোহন সিং-এর মতো বৃদ্ধও ছিলেন। বাবা বসাখা সিংকে আমি দু-হাত জোড় করে অনশনে যোগ না দিতে রাজি করিয়ে ছিলাম। তাঁর যে কেবল বার্দ্ধক্যজনিত দুর্বলতা ছিল তাই নয়, তিনি একজন যক্ষার রুগীও ছিলেন। বাবা দশ-বারো দিন কোনোরকমে নিজেকে বিরত রাখতে পেরেছিলেন কিন্তু পরে বিরত থাকা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। যখন তিনি নিজের চোখের সামনে যুবকদের ক্লিষ্ট হয়ে যেতে দেখলেন তখন সব কথা ভুলে গেলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি চাইছিলেন যে তাঁর এই নব সংকল্পে যেন তাঁর সাথীদের কষ্ট না হয় এবং সেইজন্যে গোপনে গোপনে এক ভয়ানক পদক্ষেপ নিলেন। বাবা বসাখা সিং একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। ভগবানের প্রতি তাঁর অসীম ভক্তি ছিল কিন্তু সেইসঙ্গে কর্মীদের জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকতেন। দেওলীর সেবক কয়েদীরা এই ভক্তের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিল। বাবা রাঁধুনীকে ডেকে বললেন, 'আমি একটা কথা বলব, তুমি কি সেটা মানবে?'

'নিশ্চয়ই বাবা, আপনার কথা কি আমি অবহেলা করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই মানবে?'

'নিশ্চয়ই বাবা।'

'নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই।'

তিন বার বলানোর পর বাবা তাকে বললেন, 'আমার খাবার জিনিস রোজ নিয়ে নিও আর সেগুলো কাউকে না বলে সিন্দুকে লুকিয়ে রেখে দিও। খবরদার! কাউকে বলবে না।'

বেচারা ঐ সাধারণ কয়েদীর পক্ষে বাবার কথা বেদবাক্য ছিল। সে তার অন্যথা করে কেমন করে? বাবার অনশন চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত চলতে থাকল। একদিন শরীর তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল—তিনি পড়ে গেলেন। ঘটনাচক্রে অনশনের অবসান হল কিন্তু বাবার সংকল্পের কথা জেনে সঙ্গীরা থ হয়ে গেল। সবাই ক্ষুণ্ণ মনে অভিযোগ করে বলল, 'বাবা আপনি বড় নিষ্ঠুর সংকল্প নিয়েছিলেন।' বাবা বললেন, 'কি করি, আমি আমার হৃদয়ের বেদনা সহ্য করতে পারছিলাম না।'

হ্যাঁ, ২৩ অক্টোবর তো অনশন শুরু হল, পার্টি কেবল সোডা কিম্বা নুন দিয়ে জল খাবার অনুমতি দিয়েছিল। সেদিন আমার খিদে পাইনি। নতুন অনশনকারীদের

দু-একদিন খিদে পায়। আমি খাওয়া ছাড়া অন্যান্য কাজ আগের মতই করলাম। কিছু সঙ্গীদের মাথা ব্যথা করছিল। ঘাটে ক্যাম্পের সবাইকার চাইতে দুর্বল এবং ওজনে কম ছিলেন। তাঁর হার্টেরও অসুখ ছিল। ঘাটে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পিতৃস্থানীয়দের মধ্যে একজন ছিলেন। আমরা প্রথমে তাঁকেই হারাতে যাচ্ছিলাম বলে খুব বিষণ্ণ ছিলাম। সুনীল, আয়েংগারের মত বিড়ি-তামাক খাইয়েদের বিড়ি-তামাক খেতে মানা করে দেওয়া হয়েছিল। ওরা এটাকে কোনো অসুবিধে বলেই গ্রাহ্য করল না। দ্বিতীয় দিন (২৪ অক্টোবর) ঘাটের অবস্থার অবনতি হল এবং তাঁকে ডাক্তার হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। চন্দ্রমার খুব জ্বর ছিল সেইজন্যে ওকে জোর করে হাসপাতালে পাঠান হল। তৃতীয় দিনে আমার নিজেকে অল্প একটু দুর্বল মনে হচ্ছিল। কিশোরী এবং আসরফের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। চতুর্থ দিন (২৬ অক্টোবর) আমি ২২ পাতা লিখে ইউরোপীয় দর্শন শেষ করলাম এবং তারপর লেখা ছেড়ে দিলাম। সেইদিন চারজনকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমার দুর্বলতা ছিল কিন্তু আর কোনো অসুবিধে ছিল না। সেইদিন চীফ্ কমিশনার এসেছিল। সে আমাদের প্রতিনিধিদের ডাকল কিন্তু তারা যেতে অস্বীকার করল। পঞ্চমদিন পর্যন্ত আমাদের ক্যাম্পের ১৭ জন হাসপাতাল চলে গিয়েছিল। আজ গতকালের চাইতে কিছু বেশি দুর্বল লাগছিল।

চতুর্থ বা পঞ্চম দিনের কথা। ভোর হয়ে আসছিল। লোকেরা তো দুর্বল ছিলই—সকাল সকাল নিজের নিজের খাটের ওপর শুয়ে কিংবা বসে ছিল। এই সময় জানি না 'বমার'-এর কি হল সে গ্রামোফোনের ওপর এমন একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিল যা থেকে জোরে কর্কশ গলায় 'পানী কা তূ বুলবুলা তেরা কৌন টেকাণা'[১] গান হতে লাগল। চারদিক থেকে সবাই হৈ হৈ করে ওঠায় 'বমার' নিমেষে রেকর্ডটা উঠিয়ে নিল। আমি বাড়িতে খাটে শুয়েছিলাম। বাবা শের সিং নিজের খাটে থেকে জিজ্ঞেস করলেন 'এই গান কে বাজাচ্ছে' আমি বললাম, 'বাবা! সাডা (আমাদের) বমার।' সবাই তখন ইয়ার্কি করতে লাগল, 'বমার তো এখন থেকেই, তেরা কৌন টেকাণা—গান শুরু করে দিয়েছে।'

ষষ্ঠদিন আগের দিনের চাইতেও দুর্বলতা একটু বাড়লো। কমিশনার এক নম্বর ক্যাম্পে গিয়ে বলল, 'আপনারা তাড়াতাড়ি করেছেন, সরকারকে সময় দেন নি। সরকার যোশীর সুপারিশের ওপর বিবেচনা করছে। আপনাদের ন্যূনতম দাবিগুলো কি? তিনজন সরকারী এবং তিনজন বেসরকারী মেম্বারের যদি একটি কমিটি গঠন করা যায় তাহলে কি তাদের কথা মেনে নেবেন? যোশীর সুপারিশকে কি আপনারা মেনে নেবেন?' আমাদের সাথীরা জানাল, 'আমাদের ন্যূনতম দাবি বলে আর এখন কিছু নেই, তবে সরকার নিজের দৃষ্টিভঙ্গী জানালে আমরা তা বিবেচনা করে দেখব—কমিটি করা ফালতু। আমরা তার ওপর বিশ্বাস করে অনশন প্রত্যাহার করব না। যোশীর প্রতিটি সুপারিশ আমরা মানব না।' সপ্তম দিনে আমার ওজন ১৫৭ পাউন্ড হয়ে গিয়েছিল।

[১] গানের এই পংক্তিটির বাংলা ভাষ্য, 'গানের বুদ্‌বুদ্‌ তুই,তোর কী মুরোদ?'—স·ম·

জেলে আসার সময় ১৮২ পাউন্ডের চাইতে বেশি ছিল।

আমাদের ক্যাম্পের কুড়িজন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। কিশোরী এবং আয়েংগার খুবই দুর্বল ছিল। কিন্তু তাদের অদ্ভুত সাহস ছিল। এখনও পর্যন্ত সংকল্পে স্থির ছিল। অষ্টম দিনে সেই সব স্বাস্থ্যবান লোকেরা ছিল যাদের দৃঢ়তা ছিল। আমার এবং আরো কয়েকজন সঙ্গীর অনশনের অভিজ্ঞতা ছিল। আমি দেখলাম যে জলে নুন মিশিয়ে খেলে পেট পরিষ্কার হয়। আমি এই ব্যাপারটা অন্যদেরও বললাম এবং এটা খুব কাজের হল। নুন কিংবা সোডা দিয়ে বেশি জল খাওয়া যাতে অন্ত্র শুকিয়ে না যায় এবং পেট পরিষ্কার রাখা এই দুটো কথা মনে রাখলে শরীর কখনই অসুস্থ হয় না। মরে যাওয়া খারাপ নয় কিন্তু চিররুগী হয়ে থাকা অথবা অথর্ব হয়ে থাকা খুবই খারাপ। ৩১ অক্টোবরের খবরের কাগজে পড়লাম যে ভারত সরকারের হোম-মেম্বার অ্যাসেম্বলি অধিবেশনে হুঙ্কার দিয়ে বলেছে, 'এটা রাজনৈতিক হরতাল, সরকার এটাকে মানবে না। হ্যাঁ, যাতে কেউ মারা না যায় আমরা তার চেষ্টা করব।' আমরা সরকারের সামনে নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছিলাম না। আমরা চাইছিলাম মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার। দশ দিনের দিন (১ নভেম্বর) মুখের স্বাদ খারাপ লাগছিল এবং তাড়াতাড়ি দাঁড়ালে মাথা ঘুরে যাচ্ছিল। আজ চারদিন পর নুনের জোলাপ নিলাম। সন্ধেবেলায় পেটে একটু একটু ব্যথা হচ্ছিল। আমাদের ক্যাম্পে তিনজনকে আজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো, কিন্তু সব পার্টিমেম্বাররা দৃঢ় হয়েছিল। এগার দিনের দিন আমি 'বিশ্বকে রূপরেখা'-এর ৬০ পাতা আবার পড়লাম এবং সংশোধন করলাম। আজ দুজনকে ধরে জবরদস্তি নাক দিয়ে দুধ খাওয়ানো হল। বারো দিনের দিন (৩ নভেম্বর) আমাদের গোটা ক্যাম্পকে জোর করে নাক দিয়ে দুধ খাওয়ানো হল। কিন্তু পুরো কুস্তি হচ্ছিল। দশ-বারোজন লোক এসে জাপটে ধরতো তারপর মিনিট কয়েক ধস্তাধস্তির পর খাটের ওপর শোয়াত। দুপুরে পর্যন্ত ভাড়া করা মজদূর এনে তাদের দিয়ে ধরাধরির কাজটা করানো হল। কিন্তু পৌনে চারটে থেকে গাড়বালী সৈন্যদের এই কাজে ব্যবহার করা হল। আগের দুটো হরতালে আমাকে নাক দিয়ে দুধ খাওয়ানো হয়নি কিন্তু এবার এখানে জোর করে খাওয়ানো হল। পেট গুড়গুড় করতে লাগল। ১৩ দিনের দিন ১৫ ছটাক দুধ গেলান হল। সবাই নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু ওখানে এক-একজনকে বারো জন মিলে জাপটিয়ে ধরছিল। ১৪ দিনের দিন ধস্তাধস্তিতে আমার একজায়গায় কেটে গেল। আজ কিন্তু খুব কুস্তি হল। সব চাইতে বলিষ্ঠ সেপাইটিকে আমি মাটিতে চিৎ করে ফেললাম। তখন সবাই পিঁপড়ের মত লেপ্টে গেল। আজ খাটে শুয়ে ফেলতে ওদের অনেক সময় লাগল। ১৬ দিনের দিন (৬ নভেম্বর) সেপাইদের ধরবার কাজে ব্যবহার না করে আট আনা দৈনিকে নতুন ঠিকেদারের মজদুর আনানো হল। পেটে দুধ পড়ায় লোকেদের শরীরে কিছু বেশি শক্তি ছিল সেইজন্যে কুস্তি বেশিক্ষণের জন্য চলতো। আজ প্রথমবার দুধ খাওয়াতেই একটা বেজে গেল। সন্ধেবেলায় জানা গেল যে যোশী সাহেব এসেছেন। তিনি তিনটে ক্যাম্পের কমিটির সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বললেন এবং বললেন, 'আপনারা হরতাল উঠিয়ে নিন, এই ব্যাপারটা আমরা হাতে নিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস

গভর্নমেন্ট কিছু করবে।' তাঁর কথা থেকে বোঝা গেল যে সরকার আমাদের সবাইকে নিজের নিজের প্রদেশে পাঠিয়ে দিয়ে মুক্তি পেতে চাইছে। সরকার জানে আমলাতান্ত্রিক প্রাদেশিক সরকার কোনো মতেই আমাদের দাবিগুলো মেনে নেবে না। প্রদেশে ফিরিয়ে দেওয়া এবং সমষ্টিগত থেকে শ্রেণীবিভাগের বিরোধিতা পাঞ্জাব সরকার সবচাইতে বেশি করছিল।

১৬ দিনের দিনও (৭ নভেম্বর) আমি 'বিশ্ব কে রূপরেখা' সংশোধন করতে থাকলাম। আজ আমাদের তিনটে ক্যাম্পেরই প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে যোশী বিশ্বাস জাগালো যে সবকার আমাদের দ্বিতীয় দফার দাবিগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই নিশ্চয়ই পূরণ করে দেবে। প্রথমত শ্রেণী বিভাগ করা মুশকিল এবং তার চাইতেও মুশকিল প্রদেশগুলোতে পাঠান। ভারত সরকার প্রদেশে পাঠানোর বিরুদ্ধে নয় কিন্তু পাঞ্জাব সরকার এই ব্যাপারে কঠোরভাবে বিরোধ করছে, তবু এই বিষয়ে কথাবার্তা চলছে। আমাদের সঙ্গীরা একথা আমাদের এসে বলল। তিনটে ক্যাম্পেরই কার্যনির্বাহী কমিটি বিবেচনা করে হরতাল ভাঙাব পক্ষে রায় দিল। বিকেল তিনটের সময় তিনটে ক্যাম্পের সাথীরা খেলার মাঠে জড়ো হল। ডাঙ্গে, রণদিভে, বাটলীওয়ালাকে কয়েকমাস আগেই ক্যাম্প থেকে অন্য জায়গায় সবিয়ে দেওয়া হযেছিল। প্রথমে তাঁদের আজমীঢ় জেলে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে দূরে এককোণে নতুন বাংলো বানানো হল এবং তাঁদের সেখানে এনে রাখা হয়েছিল। আজ তাঁদেরও মাঠে আনা হল। হরতাল ভাঙা হবে কি হবে না এর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে সাথীরা বক্তৃতা দিল। শেষে উনচল্লিশের বিরুদ্ধে একশো কুড়ি জন কার্যনির্বাহীদের প্রস্তাবকে সমর্থন জানাল। অন্য পার্টির সদস্যরা কুড়ি জনের বিরুদ্ধে চল্লিশ জনের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পেয়ে হরতাল জারি রাখার সিদ্ধান্ত নিল। রাত্তির এগারোটার সময় দুধ এলো এবং আমাদের ১৬০ জন সঙ্গী দুধ খেয়ে অনশন ভাঙলো।

পরের দিন (৮ নভেম্বর) পার্টি বহির্ভূতদের মধ্যে থেকে ১৬ জনকে অনশন থেকে সরে আসতে দেখা গেল। ৪০ জনের চাইতে কিছু বেশি লোক এখনও পর্যন্ত সংকল্পে অটল ছিল। সেইদিন সন্ধেবেলায় পাতলা মুগডাল পাওয়া গেল এবং রাত্তিরে সাবুদানা। আমাদের দেখাশোনা করার জন্যে ডাক্তাররা যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই ভাল ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচাইতে ভদ্র ডাক্তারটিকে এক নির্দলীয় রাজবন্দী জুতা-প্রহার করেছিল। আজকেও একজন হাতে জুতা তুলেছিল। এটা খুবই খারাপ। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে এই ডাক্তার কি ধারণা নিয়ে যাবেন? হরতাল শেষ হবার দ্বিতীয় দিনে জানা গেল যে ডাঙ্গে এবং রণদিভেও সোভিয়েতের ওপর হিটলারের আক্রমণকে আমারই মত করে বুঝেছেন এবং এখন তো এই নিয়ে রীতিমত বিচার-বিনিময় হতে লাগল। সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে ফ্যাসিস্টদের হারান আমাদের যে এখনকার কর্তব্য এই চিন্তাধারায় সব সাথী ধীরে ধীরে এক হয়ে গেল। ১ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে আমি লিখেছিলাম—'আমেরিকা এবং জাপানের মধ্যে যেকোনো সময় যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।' ৮ ডিসেম্বর রেডিওর খবর থেকে জানা গেল যে, আজ প্রত্যূষে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। এও জানা গেল যে সিঙ্গাপুর,

ফিলিপাইন এবং হনুলুলুর ওপর জাপান বিমান-আক্রমণ করেছে। পার্লহারবারের ওপর আক্রমণ করে তারা ওকলাহামা নামক ২৯ হাজার টনের আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজকে বিধ্বস্ত করেছে। এখন যুদ্ধের আগুন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। আগের যুদ্ধটাও এত বিরাট আকারের ছিল না। সোভিয়েতের পক্ষে এর চাইতে আর বড় সুযোগ কি হতে পারে? কোথায় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশ চব্বিশ বছর ধরে তার ওপর আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হচ্ছিল আর এখন নিজেদের স্বার্থ তাদের দুভাগে ভাগ করে দিল। বাল্ডবিন এবং চেম্বারলেন ইতালি, জাপান এবং জার্মানির ফ্যাসিস্টদের পিঠ চাপড়ে সাহায্য দিয়ে বলশেভিকের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রাজি করিয়ে ছিল। ওদের সব কূটনীতিই বিফলে গেল। এখন কেবল লানসেনারই ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকাকেও এখন সোভিয়েতের সঙ্গ দিতে হচ্ছে। জাপান সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। টোকিও, ইয়াকোহামা ইত্যাদি শহর বিধ্বস্থ হবার আশঙ্কা ছিল—সোভিয়েত বিমান ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই জাপানি শহরগুলোর ওপর বোমা বর্ষণ করে ফিরে আসতে পারত। ৯ ডিসেম্বর জানা গেল যে, আগের দিন পাঁচ ঘণ্টা লড়াইয়ের পর থাই (শ্যাম) সৈন্য জাপানি শর্ত মেনে নিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে। এখন জাপান ভারতের দিকে এগোচ্ছে। ১০ ডিসেম্বর খবর পাওয়া গেল, ইংরেজদের দুটো যুদ্ধ-মহাপোতকে সিঙ্গাপুরের (প্রিন্স অব ওয়েলস্ এবং রিপলস্) কাছে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। খবরটা খরাপ।

অবিরত গুজব শোনা যাচ্ছিল যে আমাদের শীঘ্রই নিজেদের প্রদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আবার কবে এতজন সাথী একসঙ্গে মিলিত হবে সেইজন্যে আমি বেশিরভাগ সময়ই আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কাটাচ্ছিলাম। দ্বিতীয় সপ্তাহে বাবা হরনাম সিং কসৈলের ব্যবস্থাপক মণ্ডল পাকশালার দায়িত্বে ছিল। তাদের মধ্যে থেকে কেউ পাচককে বলল, 'মাংসে শালগমের পাতা দিয়ে রান্না করলে খুব ভাল হয়।' এখন পর্যন্ত সরষের শাক দিয়ে মাংস রান্না করা হতো। শালগমের পাতা যে মাংসের স্বাদ নষ্ট করে দেবে সে কি করে জানবে—এটা একটা নতুন ব্যাপার ছিল। পাচক নরম-নরম দেখে পাতা জোগাড় করছিল। মন্ত্রণা দাতা বলল, 'এক-আধটা পাতা গাছের জন্যেও রেখে দেবেন তা না হলে গাছ শুকিয়ে যাবে।' এক-আধটা পাতা মানে দু-চারটে, তাও আবার মাঝের নতুন এবং মোলায়েমগুলো। যার মানে করা হল—শক্ত শক্ত পাতা দিও। পাচক মশাই প্রচুর পাতা তুললো। ওগুলো মাংসের সঙ্গে দিয়ে সেদ্ধ করা হতে লাগলো। বাবা কসৈল ভাবল, 'এক বাটি (কৌলী)-র কম মাংস দিলে সাথীরা গালাগাল দেয়—বাটি ভরে ভরে মাংস পরিবেশন করা উচিত।' মাংস প্রায় রান্না হয়ে গিয়েছিল, এই সময় বাবা কসৈল তাতে দু-বালতি জল ঢেলে দিল। এরপর মাংসের স্বাদের কথা আর কি বলব? একবাটি মাংস ঠিকই পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু কেউই আধবাটি মাংসও খেতে রাজি ছিল না। মন্ত্রণাদাতার কথা এবং অন্য রহস্য জানার পর কয়েকদিন পর্যন্ত এই নিয়ে প্রচুর রসিকতা হতে থাকল। অনেকেই প্রস্তাব দিলে যে আগামী সপ্তাহেও বাবা কসৈলের ব্যবস্থাপক মণ্ডলীই থাকুক।

১৪ ডিসেম্বর সাথীদের খুব আনন্দ হল যখন শোনা গেল যে, জার্মান ফ্যাসিস্টদের মস্কোর রণাঙ্গনে ভীষণভাবে হার হয়েছে এবং ওরা পিছনে হটছে। ১৮ ডিসেম্বর জানা গেল, ভারতীয় পার্টির যুদ্ধনীতি বদলে গেছে। এখন জন-স্বাতন্ত্র্য যারা চায় তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ফ্যাসিস্টদের সমস্ত শক্তি দিয়ে যত তাড়াতাড়ি হোক পরাভূত করা।

২২ ডিসেম্বর থেকে দেওলী ক্যাম্পের রাজবন্দীদের সরানো হতে লাগল—বোম্বের সাথীরা নিজেদের প্রদেশের জন্যে রওনা হল। ২৮ ডিসেম্বর আমরা বিহারের বারোজন সাথীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাম্পের বাইরে এলাম। এক বছর দু-দিন (২৬ ডিসেম্বর ১৯৪০—২৭ ডিসেম্বর ১৯৪১) আমাদের দেওলী ক্যাম্পে থাকতে হয়েছিল। গড়বালী সৈনিক এবং একজন সি· আই· ডি·-এর লোক আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিল। কোটায় কামরা রিজার্ভ ছিল। দিল্লীতে অন্য কামরা পাওয়া গেল। ৩০ ডিসেম্বর বারোটার পর আমরা হাজারীবাগ রোড পৌঁছাই আর ঐদিনই বিকাল সোয়া চারটের সময় হাজারীবাগ জেলে। সর্দার অর্জুন সিং এখনও জেলর ছিলেন এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন মেজর নাথ।

আবার হাজারীবাগ জেলে (১৯৪১-৪২)

দুদিন পর (২ জানুয়ারি ১৯৪২) আমি আবার আমার নিজের ঘরে ফিরে এলাম। সতের-আঠারো দিন পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা, বই পড়া ইত্যাদি নিয়ে কাটালাম। ৭ জানুয়ারি শীতকালে লালসেনার প্রত্যাক্রমণ-এর ওপর আলোচনা করার জন্য আমি আমার ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'(১) লালসেনার পিছু হটা তার দুর্বলতা নয়, সৈনিক নীতিও কারণ। (২) আজ তাড়াতাড়ি এগিয়ে না যাওয়ার পিছনে জমি দখল না করে জার্মান সেনাকে আরো বেশি করে উত্তক্ত করার চিন্তাই কাজ করছিল।'

কমিউনিস্টদের নীতি বদলে যাওয়াতে কংগ্রেসী খবরের কাগজগুলো কমিউনিস্টদের খুব গালাগাল দিচ্ছিল। 'কিন্তু এত করার পরও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের গতিপথকে নির্দিষ্ট করে মহান আদর্শপথের পথিক মার্ক্সবাদীদের প্রভাব কমাবার এটা পন্থা নয়। সাধারণ মানুষ (কৃষক, মজদুর) কমিউনিস্টদের নামে এই গালাগালিতে বিভ্রান্ত হবার নয়। 'রাশিয়ার বন্ধু'—এটাকে ওরা গালাগাল বলে বুঝবে না, যতক্ষণ না ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে, 'রাশিয়া পাক্কা শয়তান, সে মজদুর-কৃষক-কল্যাণের শত্রু'। যদি রাশিয়া ভালো হয় তাহলে ওর বন্ধুরা কি করে খারাপ হবে?' (১৬ জানুয়ারি)।

২০ জানুয়ারি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের অতিরিক্ত সচিব টোটনহম-এর স্বাক্ষরিত একটা নোটিশ এল যাতে লেখা ছিল 'তোমাকে—রাহুল সাংকৃত্যায়ন—ভারত রক্ষা আইন (২৬খ)-এর অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে নজরবন্দী করা হয়েছে, কেননা তুমি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার, যে কমিউনিস্ট পার্টি তার ঘোষিত প্রোগ্রাম—হিংসাত্মক বিপ্লবের দ্বারা ক্ষমতা দখল-এর সফলতার জন্যে যুদ্ধ পরিচালনায়

সক্রিয়ভাবে বাধা সৃষ্টি করছে।' পরের দিকে এও লেখা ছিল যে, আমার অভিযোগ আবার বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। যদি এই ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য থাকে সেটা লিখে জানাতে পারি। আমি আমার ২৩ জানুয়ারির চিঠিতে উত্তর দেবার সময় লিখলাম, 'এখন আমি এই যুদ্ধকে নিজের এবং জনতার যুদ্ধ বলে মনে করি, সেইজন্য সক্রিয়ভাবে এতে যোগ দেওয়া আবশ্যক বলে মনে করছি।'

১৭ জানুয়ারি থেকে আমি 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন'-এর পরবর্তী অংশ লিখতে শুরু করি এবং ১১ মার্চ বইটা শেষ করি। মাঝে কোষবৃদ্ধির অপারেশনের জন্যে ২৯ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাজারীবাগ সদর হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। মেজর গুপ্ত একজন সিদ্ধহস্ত সার্জন ছিলেন। তিনি খুবই নিপুণতার সঙ্গে অপারেশন করলেন। আগের বার অনশন-ধর্মঘটের পর আমি যখন সদর হাসপাতালে এসেছিলাম,ধর্মঘটের সেই সময় যে তিনজন রোমন ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী ওখানে রুগী পরিচর্চার কাজ করছিলেন তাঁরা এখনও ওখানে ছিলেন। ক্রোশিয়ার (যুগোস্লাভিয়া) সহৃদয় ভিক্ষুণী এখনও ওখানে ছিল। যুগোস্লাভিয়ার ওপর হিটলারের আক্রমণের জন্যে সে খুবই ক্ষুণ্ণ ছিল। সে জানতো যে আমার স্ত্রী এবং সন্তান লেলিনগ্রাদে আছে, সেইজন্যে আমাদের দুজনের মধ্যে সমবেদনা ছিল। ওর রোমন-ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্মের ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আমাকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হতো। সে আমায় রোমন-ক্যাথলিকের বাইবেল-ইতিহাস দিয়েছিল। গল্পগুলো চিত্তাকর্ষক লাগছিল কিন্তু একেবারেই শিশুদের উপযুক্ত। ৯ জানুয়ারি আমরা সবাই জেলে চলে আসি।

২৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীকার্যানন্দ শর্মা এবং আরো কিছু সাথী জেল থেকে ছাড়া পেল। জাপান সিঙ্গাপুর দখল করে নিয়েছিল। ১০ মার্চ রেঙ্গুনকেও ইংরেজরা খালি করে দিল। এখন জাপানি ফ্যাসিস্ট ভারতের সীমানার কাছে পৌছে যাচ্ছিল। আমরা এই সময় জেলের মধ্যে দুশ্চিন্তায় কাটাচ্ছিলাম, কেননা আমরা বুঝেছিলাম যে এই সময় আমাদের কাজ জেলের বাইরে। কিন্তু ইংরেজ সরকার যুদ্ধ জেতার দিকে ততটা চিন্তা করছিল না যতটা চিন্তা করছিল ভবিষ্যতে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার। আমরা কবে ছাড়া পাবো তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, তাই সময়ের সদ্‌ব্যবহার করা দরকার ছিল। ১২ মার্চ আমি 'বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ' লিখতে শুরু করি এবং ২৪ তারিখে সেটা শেষ করি।

ক্রিপ্স আলোচনা—২৩ তারিখে জানা গেল যে, স্যার স্ট্র্যাফোর্ড ক্রিপ্স দিল্লী পৌছে গেছেন। যদিও এমরী এবং চার্চিলের ভারত সম্বন্ধে কি নীতি আমরা তা ভালো করেই জানতাম কিন্তু যুদ্ধ একটা স্বতন্ত্র শক্তি যা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয়। দিল্লীর খবরের দিকে আমরা খুবই উৎসুকতার সঙ্গে মনোযোগ রাখছিলাম। এরই মধ্যে ৬ এপ্রিল কলম্বো এবং ৭ বিশাখাপট্টনম, কোকনাডার ওপর জাপানিদের বিমান আক্রমণ হলো।

৮ এপ্রিলের খবরে জানা গেল, ক্রিপ্স আলোচনা ভেঙে গেছে কিন্তু পরের দিন আবার আশাপ্রদ খবর এল। ১১ এপ্রিলের চিঠি থেকে জানা গেল, আলোচনা ভেঙে গেছে। খুবই নিরাশ হলাম কেননা আমরা সবাই মনে করেছিলাম যে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই

করার জন্যে ভারতের পুরো মনোবল ও লোকবল ব্যবহার করা উচিত এবং এটা আমাদের নিজস্ব সরকার হলে তবেই সম্ভব। আমাদের নেতারা বুঝতে পারল না যে, যুদ্ধ নিজে একটা স্বতন্ত্র শক্তি যা নিরস্ত্রদের অস্ত্র দেয়, দলিতদের উঠে দাঁড়াতে দেয় এবং শৃঙ্খলিতদের বন্ধনমুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়। ওরা বুঝতে পারল না একবার যুদ্ধের মধ্যে ঢুকে যেতে পারলে আমাদের সম্পূর্ণভাবে সৈন্যবাহিনী গঠন করতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। ওরা যুদ্ধ-পরিস্থিতির চেয়ে টুকরো কাগজের ওপর বেশি বিশ্বাস করলো এবং চাইলো যে ইংরেজ শাসক যেন থালা সাজিয়ে তৈরি খাবার ওদের সামনে রেখে দেয়। চার্চিল-এমরী স্বেচ্ছায় ক্রীপ্সকে পাঠায়নি। মিত্রদেশের নাগরিকদের লম্বা-চওড়া কথা বলে চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের ভোল ওরা পাল্টে ফেলেছে। যুগোশ্লাভিয়া, ইতালি, গ্রীকের অতীতের যুদ্ধ-ইতিহাস থেকে জানা যায় যে যখন এ-দেশের সাহসী নাগরিকরা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়তে আরম্ভ করল সেই সময় বিলিতি টোরিদের ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার কোনো কারণই ছিল না। যাইহোক, আমাদের দেশ একটা বড় সুযোগ হারাল। ইংরেজ শাসকেরা ভারতের ফ্যাসিস্ট বিরোধী মতবাদকে দাবিয়ে রাখতে খুবই সাফল্য লাভ করল। ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের নিরাশা তাদের জাপানিদের দিকে তাকাতে বাধ্য করল। ক্রিপ্স ম্যাকডোল্যান্ডের মতোই মিথ্যাবাদী ও বেইমান প্রতিপন্ন হল।

আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, ভারতের ইতিহাসের বিষয়বস্তু ব্যবহার করে এমন কিছু উপন্যাস এবং গল্প লিখি যা আমাদের প্রগতিশীলতায় সহায়তা করবে। আমি তখন পর্যন্ত ('বাইশবী সদী'কে নিয়ে) দুটো উপন্যাস লিখেছিলাম। ত্রিপিটক পড়ার সময় আমি দেখেছিলাম যে, সেইসময় ভারতে যে কেবল রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতাই ছিল না তা নয়, উপরন্তু পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতে অনেক প্রজাতন্ত্রও ছিল। বৈশালীর লিচ্ছবিদের প্রজাতন্ত্র এত শক্তিশালী ছিল যে মগধ এবং কৌশলের রাজারাও তাদের সম্ভ্রম করে চলতো। আমি ঐ সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক-আর্থিক অবস্থার সাথে সাথে জনতন্ত্রের রূপকে এক উপন্যাসের মাধ্যমে চিত্রিত করতে চাইলাম যার পরিণাম হল 'সিংহ সেনাপতি'। এটা আমি ৭ মে লেখা শুরু করে ২৬ মে শেষ করি।[১]

ইউরোপ থেকে ফেরার সময় (জানুয়ারি ১৯৩৩) দুটো বই লেখা ঠিক করেছিলাম, যার মধ্যে প্রথমটা ('সাম্যবাদ হী কোঁ') ১৯৩৪ সালেই লিখে ফেলেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় বইটায় আমি দেখাতে চাইছিলাম যে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতার যারা দোহাই দেয় তারা প্রাচীনতার নাম করে মিছিমিছি আমাদের রাস্তায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতা কখনোও অচল থাকে নি, তার প্রতিটি অঙ্গে প্রচুর পরিবর্তন হতে থেকেছে। 'মানবসমাজ' লেখার সময় আমি এও অনুভব করি যে অনেক পাঠকের পক্ষে এর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ বোঝা সহজ হবে না। এই

[১] উপন্যাসটি লেখা শেষ হয় ১৯৪৪ সালে। 'জিনে কে লিয়ে'-এর পর এটি লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস। কিতাব মহল (এলাহাবাদ) থেকে প্রকাশিত।—স·ম·

মতবাদকে যদি জাতীয় ইতিহাসপ্রবাহকে ফুটিয়ে তোলে এমন গল্পে অঙ্কিত করা যায়, তাহলে পাঠকদের বুঝতে সহজ হয়ে যাবে। প্রায় এইরকমই চিন্তা করে শ্রীভগবতশরণ উপাধ্যায় বেশ কয়েকটা গল্প লিখেছিলেন যার জন্যে তাঁকে আমি প্রশংসাও করেছিলাম এবং যদি পুরো সময়ের পরিধিটাকে নিয়ে তিনি একটা বই লিখে ফেলতেন তাহলে হয়ত আমি এই কাজে হাত দিতাম না। অতএব এইসব চিন্তা করে আমি ১ জুন 'বোল্গাসে গঙ্গা'র প্রথম গল্প 'নিশা' লিখি। আর গ্রন্থের কুড়ি নম্বর ও অন্তিম গল্প 'সুমের' ২১ জুন শেষ হয়।

যতদিন পর্যন্ত জেল থেকে না বেরোন যায় ততদিন কিছু লেখাপড়া করা উচিত। ২৬ জুন থেকে আমি 'জপনিয়াঁ রাছছ' এবং অন্য সাতটা নাটক ছাপরার ভাষা (মল্লিকা)-তে লিখি। আমি ১৯২১ থেকেই ছাপরায় বক্তৃতা করার সময় ওখানকার ভাষাই ব্যবহার করছিলাম। আমি এই মাতৃভাষাগুলোর ক্ষমতা এবং সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতাম। সোভিয়েত দেশে যাওয়ার পর সেখানের মাতৃভাষাগুলোর ব্যবহার দেখে ভাল করে বুঝতে পারলাম যে ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের এই ভাষাগুলোর ওপর অনেক কাজ করতে হবে। এই কথা ভেবে ১৯৩৯ সালে ছাপরা থেকে ওখানকার ভাষায় একটা খবরের কাগজ বার করতে চেয়েছিলাম এবং সেই কথা ভেবেই এই আটটা নাটক লিখেছিলাম। এর মধ্যে চারটে 'জপনিয়াঁ রাছছ', 'দেশ-রাচ্ছক', 'জরমনবাঁকে হার নিচ্ছিয়', 'ই হমার লড়াই' ফ্যাসিস্ট বিরোধী মতের প্রচারের জন্য লেখা হয়েছিল। 'ঢুনমুন নেতা'য় বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। 'নইকী দুনিয়া' এবং 'জোঁক'-এ সাম্যবাদী মতবাদ এবং সাম্যবাদের আবশ্যকতাকে এবং 'মেহরারুনকে দুরদসা'য় নারীদের দুর্দশা দেখানো হয়েছিল।[১]

কংগ্রেস কমিটি তাদের এলাহাবাদের প্রস্তাব এবং পরের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রস্তাবে যে দুটি লক্ষ স্থির করেছিল তা আমার কাছে ভুল বলে মনে হল। ১৬ জুলাই এই ব্যাপারে আমার ডায়েরিতে লিখেছিলাম—'এই (১৫ জুলাই-এর) প্রস্তাব এবং গান্ধীজীর বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছে যে, যদি ইংরেজ শাসকদের মতি ঠিক না হয় তাহলে গান্ধীজী কেবল হুমকি দিচ্ছেন না। এটা গান্ধী এবং কংগ্রেসের জীবন-মরণের প্রশ্ন। যদি এই লড়াই চলাকালীন ওরা চুপ করে বসে থাকতে চায় তাহলে ওরা খতম বলে বুঝে নিতে হবে। যে-রকম আর্থিক সংকট হতে চলেছে তাতে জনগণ-আন্দোলন বিকট রূপ ধারণ করতে পারে। যখন ইংবেজদের একের পর এক পরাজয়ের খবর শুনে লোকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল তখন সমস্ত নেতাদের ধরে জেলে ঢুকিয়ে দিনে কাজ হবে না। কংগ্রেস মতবাদের সবচাইতে বড় ত্রুটি ছিল যে তারা মুসলিম লীগকে কেবলমাত্র ইংরেজ শক্তির সাহায্যে লম্ফঝম্ফ করার এক সংস্থা ভেবে ভুল করছিল এবং মুসলিম নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা ওদের কতখানি আছে তা বুঝতে পারছিল না। এই ভুল বোঝার জন্য তারা

[১] লেখকের এই আটটির নাটকের মধ্যে তিনটি নাটক *কিতাব মহল* থেকে প্রকাশিত হয়। বাকি পাঁচটি প্রকাশ করেন ছাপরার অচ্যুতানন্দ সিং।—স·ম·

—১৯৪২—

মুসলিম লিগের সঙ্গে আপসে মিটমাট করতে রাজি ছিল না।

৯ জুন ও তারপরে আমি 'পাকিস্তান ঔর জাতিয়োকী সমস্যা'র বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখি। তাতে ভারতকে একটা বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিয়ে সমস্যাগুলোকে দেখতে গুরুত্ব দিলাম।

শেষ পর্যন্ত ২৩ জুলাই এলো আর সকালেই আমাকে হাজারীবাগ জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল।

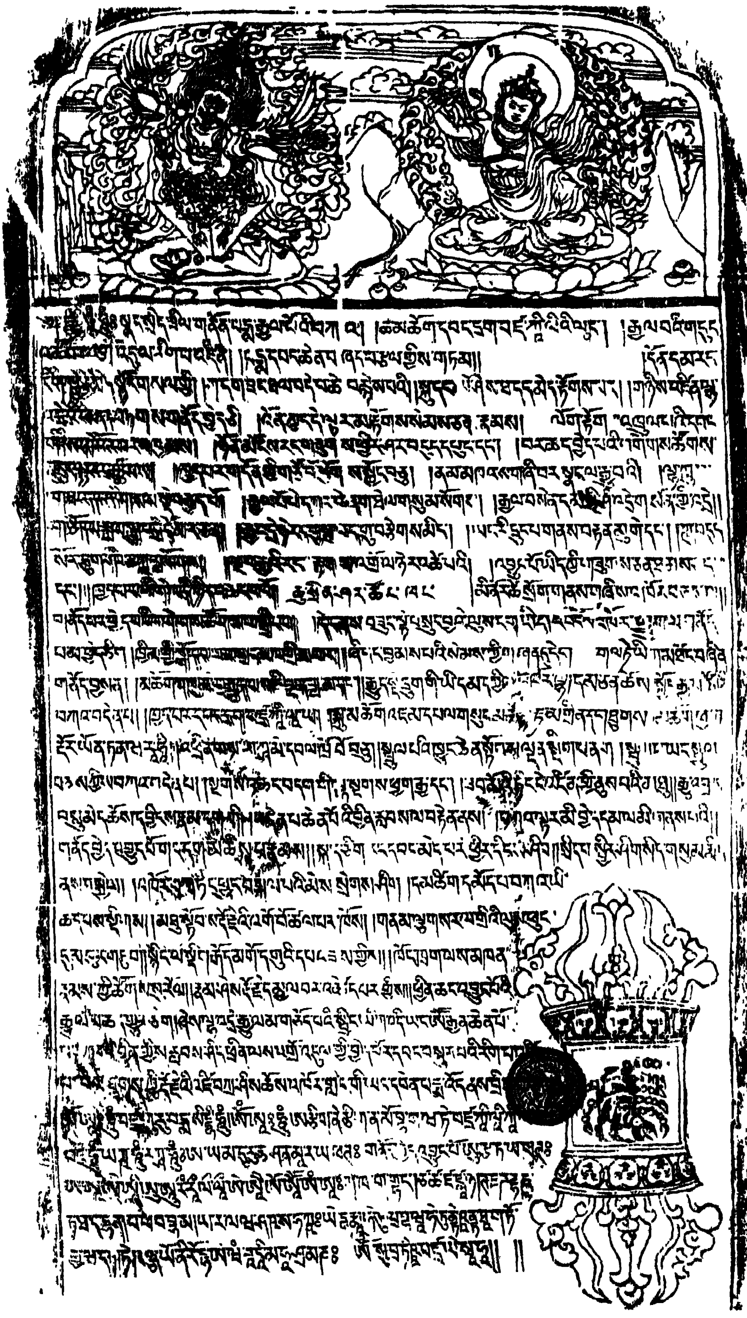

তিব্বত যাত্রায় প্রাপ্ত উডব্লক প্রিন্টিং

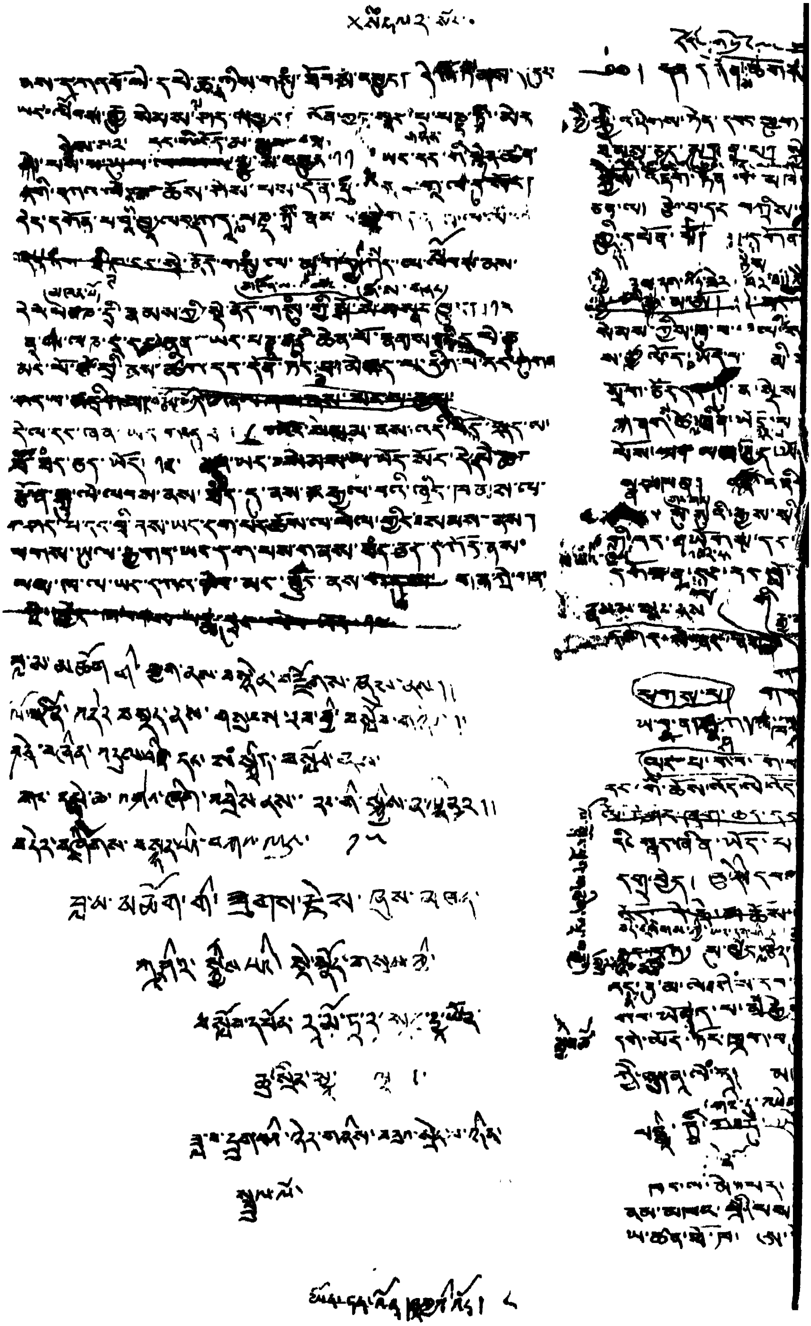

রাহুল সাংকৃত্যায়নের হাতে লেখা তিব্বতী রচনার পাণ্ডুলিপি